উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমানের চিন্তা ও চেতনার ধারা

ওয়াকিল আহমদ
(পি.এইচ.ডি. ডি.লিট)

রীডার্স কর্নার
৫ শঙ্কর ঘোষ লেন। কলিকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৯৬

—প্রকাশক ও মুদ্রাকর—
শ্রীশশিভূষণ দত্ত
'বসুমতী' প্রেস, কলিকাতা

অনুপম ও স্বপনকে ও, যারা আমার প্রবাস
কালে পিতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত ছিল,
তাদের হাতে তুলে দিলাম।

প্রস্তাবনা

বাঙালির জাতীয় জীবনের ইতিহাসে উনবিংশ শতাব্দীর গুরুত্ব অনেক। এই শতাব্দীতে নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি যুগের অবসান এবং আর একটি নতুন যুগের আবির্ভাব ঘটে। এই পালাবদলের কালে বাঙালি যা অর্জন করেছে এবং যা অর্জন করতে পারেনি, তা-ই দিয়ে তার জাতীয় সম্পদ, জাতীয় চরিত্র গঠিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ বিশ্লেষণ করলে পরিবর্তনের ধারাগুলি বোঝা যায় এবং তদনুযায়ী জাতীয় জীবনের রূপ-প্রকৃতি ও গতিবিধি নির্ণয় করা যায়।

বাংলার দুটি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু ও মুসলমান। উভয়ের জীবন একসূত্রে বাঁধা থাকলেও উভয়ের ভাগ্য এক নিয়মে গড়ে ওঠেনি। এক রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বসবাস করলেও তাঁরা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা সমভাবে পাননি এবং ধর্মনীতি, সমাজনীতিতে ভেদ থাকায় ঐতিহাসিক ঘটনাবলী তাঁদের উপর সমভাবে ক্রিয়া করেনি। মধ্যযুগে মুসলমান শাসক রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকায় মুসলমানের একটি শ্রেণী যে সুবিধা ভোগ করেছেন, হিন্দুগণ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় বঞ্চিত হয়ে তা পাননি। আবার আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তৃতীয় পক্ষের হাতে গেলে হিন্দু ও মুসলমানের উপর তার প্রভাবও সমভাবে পড়েনি। কোম্পানির শাসনের শুরু থেকে হিন্দু সম্প্রদায় যেসব সুযোগ গ্রহণ করে অগ্রসর হন, মুসলমান সম্প্রদায় প্রথম দিকে সেসব সুবিধা পরিহার করে পিছিয়ে পড়েন। তাঁরা নবযুগের পরিবর্তনের ধারাটিও উপলব্ধি করতে দেরী করেন। মুসলমান সম্প্রদায়ের চৈতন্যোদয় হয় উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে। তখন থেকে তার ভাগ্যোন্নয়নের পালা শুরু হয়। নবজীবনের দৌড়-পাল্লায় অন্যূন পঞ্চাশ বছরের এই ব্যবধান বাংলার দুটি সম্প্রদায়কে দুটি স্বতন্ত্র কক্ষে স্থাপন করে এবং পরস্পর স্বার্থে বিবদমান দুটি শিবিরের সূচনা করে।

শিল্পসাহিত্যকে সমাজের দর্পণ বলা যায়। শিল্পী-সাহিত্যিকগণ বাহ্যদৃষ্টির অতিরিক্ত একটি অন্তর্দৃষ্টির অধিকারী হন। এই দৃষ্টি দিয়ে তাঁরা সমাজের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেন এবং সমাজের অন্তর্নিহিত শক্তির যোগসূত্রগুলি উপলব্ধি করেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগের পূর্বে মুসলমান সমাজে নবজীবনের পদধ্বনি শোনা যায়নি, সেজন্য তার আধুনিক সাহিত্যও রচিত হতে পারেনি। যা রচিত হয়েছে, তা প্রাচীন ধারারই এক অবক্ষয়ী রূপ। মুসলমান সমাজের গতি পরিবর্তনের এই যুগসন্ধিক্ষণে তার সাহিত্য কিভাবে ও কিরূপে গড়ে উঠেছে, এবং সে সাহিত্য সমাজের মানুষের জীবনকে কিরূপে ও কি পরিমাণে ধরে রেখেছে, তা নিরূপণ করার ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। বিশেষত বাংলাভাষাকে মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ ও প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের ভেতর দিয়ে বাঙালি মুসলমানের স্বদেশ-চেতনা তথা জাতীয়তাবোধের প্রথম উন্মেষ হয়। সমাজের জাগ্রত বিবেক হিসেবে সাহিত্যিকগণের মন ও মনন, চিন্তা ও চেতনা, ধ্যান ও কল্পনা যুগের সঙ্গে কিভাবে ক্রিয়া করেছে, তার

প্রকৃত স্বরূপ ও তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রয়াসে এ গ্রন্থ রচনা করেছি। ১৮৫৭ সালে সিপাহি-বিদ্রোহ হয়। মোঘল সম্রাটের ছত্রচ্ছায়ায় দেশীয় সামন্ত-প্রভুদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধারেব শেষ সম্মিলিত প্রয়াস ব্যর্থ হয়। সিপাহিবিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে ঔপনিবেশিক শাসকচক্রেরও চৈতন্যোদয় হয়। পরের বছর ভিক্টোরিয়া কোম্পানির শাসন রহিত করে সরাসরি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অধীনে নিয়ে নেন। প্রশাসনিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সরকারের মনোভাবেব যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৮৭২ সালে বিচার-সালিশীর মাধ্যমে ওয়াহাবী আন্দোলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ফলে ব্রিটিশ সরকারের সাথে সহযোগিতা করা ছাড়া মুসলমানদের গত্যন্তর ছিল না। বস্তুত মুসলমান নেতৃবৃন্দ এ-সময় নতুন করে চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন। এ-প্রক্রিয়া ১৯০৫ সাল পর্যন্ত চলে। ১৯০৫ সালে বঙ্গ ভঙ্গের ফলে দেশের রাজনীতির ধারা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। এতে সরকারের 'ভেদ ও শাসন নীতি'র সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত আমাদের আলোচ্য পর্ব হলেও ১৯০৫ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দুটি বড় রাজনৈতিক ঘটনাকে প্রান্তিক সীমার অন্তর্ভুক্ত করেছি। সমগ্র বিষয়টিকে ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সময়সীমাকে গ্রহণ করেছি। মোট চারটি অধ্যায়ে ভাগ করে মূল উপপাদ্যের উপর আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়ে 'পটভূমিকা'। বাংলার মুসলমান সমাজের গঠনরূপ ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করার জন্য আমরা সমাজের গোড়াপত্তন থেকে শুরু করেছি, কেবল মূলসূত্রগুলি ধরার চেষ্টায় এ আলোচনা সংক্ষেপে সম্পন্ন করেছি। ঊনবিংশ শতাব্দীব উভয় পর্বের যুগধর্মের বৈশিষ্ট্য এবং সেইসূত্রে সমাজের অবস্থা ও সমাজমানসের রূপ-রূপান্তর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছি। এটিকে রূপ দেওয়ার জন্য মূল তথ্যেব এবং পূর্বসূরিদের আলোচনা ও মতামতের সাহায্য নিয়েছি, অবশ্য যথাযথ তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই না করে কোন মত গ্রহণ ও পরিবেশন করিনি।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের দুটি অংশ—'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' এবং 'সভা-সমিতি'। যুগের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কবি-সাহিত্যিক ব্যতীত আর যেসব চিন্তানায়ক ও সমাজকর্মী ব্যক্তিগতভাবে সমাজগঠনে অংশ নিয়েছিলেন সেসব গণ্যমান্য ব্যক্তির জীবন ও কর্মধারা নিয়ে প্রথম অংশ এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যেসব প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে যৌথভাবে ঐ কর্মে জড়িত ছিলেন সেসবের ধারাবাহিক বিবরণ নিয়ে দ্বিতীয় অংশ রচিত হয়েছে। একটি গঠনশীল সমাজের সামগ্রিক অবস্থা জানার জন্য এসব আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। সমাজের নেতৃবৃন্দ ও সভা-সমিতিগুলির একত্রে ধারাবাহিক আলোচনা, যতদূর জানা যায়, এর আগে কেউ করেননি। সাধারণভাবে বাংলার মুসলমান সমাজের যে হতাশ্বাস ও নিষ্প্রাণতার কথা বলা হয়ে থাকে, এ অধ্যায়ে তা অংশত ভ্রান্ত প্রমাণিত হবে।

তৃতীয় অধ্যায়েরও দুটি অংশ—'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' এবং 'পত্র-পত্রিকা'। পুস্তক-পুস্তিকায় ব্যক্তিচিন্তা এবং পত্র-পত্রিকায় যৌথচিন্তাব ছাপ পড়ে। এই পর্বের মুসলমান সাহিত্যিকদের সাহিত্যকর্ম নিয়ে ইতঃপূর্বে কিছু কিছু আলোচনা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক, অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান, ডক্টর আনিসুজ্জামান এবং মুস্তাফা নূর-উল-ইসলামের নাম উল্লেখ করতে হয়। তাঁদের আলোচনা মনোজ্ঞ ও তথ্যসমৃদ্ধ। তবে তথ্যাবলী ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়ে তাঁদের বিষয় থেকে আমার বিষয়ের পার্থক্য আছে। দ্বিতীয়ত তথ্য সংযোজন ও পরিবেশন রীতিতে

আমি তাঁদের অনুসরণ করিনি। পূর্বসূরিগণ মূলত প্রধান লেখক ও তাঁদের রচনাবলীর শিল্পমূল্যায়ন ও অন্যান্য বিষয় বিচার করেছেন, আমি 'প্রধান' ও 'অপ্রধান' এরূপ দুটি উপবিভাগ করে সকল সাহিত্যিক ও তাঁদের সব রচনা একত্রে বিবেচনা করেছি এবং আমার গবেষণার বিষয়-পরিকল্পনা অনুযায়ী সামগ্রিক ভাবধারা ও চিন্তাধারার জন্মসূত্রগুলি অনুসন্ধান ও মূল্যায়ন করেছি। প্রায় দেড় শত 'অপ্রধান' বা 'গৌণ' রচয়িতার একত্র ধারাবাহিক আলোচনা এই প্রথম করা হলো। সমাজের নানা স্তরে নানা ধরনের ছিদ্র আছে, সমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত থেকে তাঁরা যেসব বক্তব্য তুলে ধরেছেন, মুষ্টিমেয় 'প্রধান' লেখকের রচনায় সেসবের সম্পূর্ণ প্রতিফলন হওয়া সম্ভব নয়। এগুলির অধিকাংশেরই শিল্পমূল্য নেই, কিন্তু সামাজিক মূল্য যথেষ্ট আছে। সুতরাং সমাজমানসের পূর্ণ রূপটি অনুধাবন করতে হলে উভয়ের একত্র আলোচনার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। ব্যক্তি-সাহিত্যের পরিপূরক সাময়িকপত্র প্রসঙ্গে বলা যায়, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিনয় ঘোষ প্রমুখের অনুপ্রেরণায় ডক্টর আনিসুজ্জামান ও ডক্টর মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম মুসলমান সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন, আমি সেগুলি পড়ে উপকৃত হয়েছি, তবে মূলের সঙ্গে পবখ না করে কোনো তথ্যই নির্বিচারে গ্রহণ করিনি। মুসলমানের প্রথম বাংলা সংবাদপত্র 'বালারঞ্জিকা' (১৮৭৩, সাপ্তাহিক), এ তথ্য পূর্বসূরিদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ব্যক্তি-সাহিত্যের সঙ্গে সাময়িক-সাহিত্যপত্রের একত্রে আলোচনা ও বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে নতুন ও নিজস্ব।

'সমকালীন চিন্তার স্বরূপ' শিরোনামে চতুর্থ অধ্যায়টি আমার আরব্ধ গবেষণাকর্মের সবচেয়ে সারবাহী অংশ। 'ধর্ম', 'সমাজ', 'শিক্ষা' ও 'ভাষা ও সাহিত্য' এই চারটি ধারায় সাজিয়ে শিল্প-সাহিত্য রচনায় ও অন্যান্য কর্মে বাঙালি মুসলমানের যেসব চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা প্রকাশিত হয়েছে, সেসবের কার্যকারণসূত্র বিশ্লেষণ করেছি এবং মুসলিম মানসের সামগ্রিক গতি-প্রকৃতির স্বরূপ নিরূপণ করেছি। একটি নবোত্থিত সমাজের অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতিতে যেমন দ্বন্দ্ব দ্বিধা ছিল, সমাজের নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীদের চিন্তাধারারও তেমনি সীমাবদ্ধতা ছিল। এই দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-সংশয়-সীমাবদ্ধতার ভেতর দিয়ে নবচেতনার উন্মেষ হয়েছে এবং জাতীয় জীবনের অতীত তমিস্রা ভেদ করে নবদিগন্তের উন্মোচন হয়েছে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমি এসব বিষয়ের স্বরূপ উদঘাটনে চেষ্টিত হয়েছি। পূর্ব নির্দিষ্ট কোনো ধারণার বশবর্তী না হয়ে একান্তভাবে মৌলিক তথ্যের ভিত্তিতে আমি আমার সিদ্ধান্তে উপনীত হবার প্রয়াসী হয়েছি। সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি তথা যুগধর্মের পটভূমিতে বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যসাধনা ও মননশীলতার এ ধরনের সামগ্রিক বিশ্লেষণ পূর্বে হয়েছে বলে আমার জানা নেই।

বাঙালি জাতীয় জীবনের একটি যুগের ইতিহাসে বাংলা সাহিত্যের ভাবধারা ও চিন্তাধারার এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি সুধীসমাজের নিকট সাগ্রহে গৃহীত হলে আমি আমার শ্রম সফল ও সার্থক মনে করব।

ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'পিএইচ. ডি.-উত্তর গবেষণাবৃত্তি' লাভ করে ১ এপ্রিল ১৯৭৬ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ ডক্টর দেবীপদ ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে আমি বর্তমান গবেষণা কার্য আরম্ভ করি। তিনি আমাকে অজস্র তথ্যের সন্ধান ও অবিরত অনুপ্রেরণা দান করে উৎসাহিত করেছেন। গবেষণা বিষয়ে তাঁর মনোজ্ঞ

আলোচনা ও মূল্যবান উপদেশে আমি বিশেষ উপকৃত হয়েছি। এজন্য আমি তাঁর নিকট চিরকৃতজ্ঞ।

পশ্চিমবঙ্গে জাতীয় গ্রন্থাগার, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, চৈতন্য লাইব্রেরী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আরকাইভস, সেক্রেটারিয়েট লাইব্রেরী এবং বাংলাদেশে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরী, জাতীয় গ্রন্থাগার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানে আমার গবেষণার তথ্যসমূহ অনুসন্ধান করেছি এবং অনেক মূল্যবান দুষ্প্রাপ্য পুস্তক, পত্রিকা, নথি ও দলিল সংগ্রহ করেছি। ঐসব প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট কর্মচারীবৃন্দের আন্তরিক সহযোগিতা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি।

শ্রদ্ধেয় পরলোকগত বিনয় ঘোষ তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীটি ব্যবহার করার সুযোগ দিয়ে এবং অনেক তথ্যের সন্ধান দিয়ে আমাকে সাহায্য করেছেন। অধ্যাপক আলী আহমদের অপ্রকাশিত 'গ্রন্থপঞ্জী' ব্যবহার করে আমি প্রভূত উপকার লাভ করেছি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর আহমদ শরীফ, জাতীয় অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাক এবং অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর মুহম্মদ আবদুল কাইউম ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে আমাকে কিছু তথ্য দান করেছেন। বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত 'মশাররফ রচনা সম্ভার' (২ খণ্ড) এবং ডক্টর মুস্তাফা নূর-উল-ইসলাম সম্পাদিত 'শেখ জমিরুদ্দীন রচনাবলী' দেখার সুযোগ লাভ করায় আমার পরিশ্রম অনেকাংশে লাঘব হয়। ব্যক্তিগত পত্র দিয়ে তথ্য সরবরাহ করেছেন আজহারউদ্দীন খান (মেদিনীপুর), অধ্যাপক মুহম্মদ আবূ তালিব (রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)। আমি এঁদের সকলের নিকট আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

ওয়াকিল আহমদ

সূচিপত্র

প্রস্তাবনা

প্রথম অধ্যায় : পটভূমিকা ১
বাঙালি মুসলমান ১
মুসলমান সমাজ ও আধুনিকতা ২১
উনিশ শতকেব প্রথমার্ধ ও মুসলমান সমাজেব পতন ২৯
উনিশ শতকেব দ্বিতীযার্ধ ও মুসলমান মধ্যবিত্ত। ৩৮

দ্বিতীয অধ্যায : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব, সভা ও সমিতি ৭২

জমিদার :
সৈযদ নওযাব আলী চৌধুবী ৭৫
আলী নওযাব চৌধুবী ৭৭
আব্দুল মজিদ চৌধুবী ৭৭
হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী ৭৮
মীব মোহাম্মদ আলী ৭৯
সৈযদ এরফান আলী ৭৯
আবদুস সোবহান চৌধুবী ৮০
কবিমুন্নেসা খানম ৮০
ফযেজুন্নেসা চৌধুবাণী ৮১
আবদুব বহিম বক্স পেস্কাব ৮১
মোহাম্মদ বখত মজুমদাব ৮২
আলিমুজ্জামান চৌধুবী। ৮৩

নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি :
আবদুল লতিফ ৮৪
ওবাযদুল্লাহ আল ওবাযদী সোহবাওযার্দী ৮৯
আবদুল জব্বাব ৯১
আদালত খান ৯১
সিবাজুল ইসলাম ৯৩
খোন্দকার ফজলে রাব্বি ৯৩
সৈযদ আমীর আলী ৯৫
দেলওযাব হোসেন আহমদ ১০০
আবদুল ওযালি ১০১
হেমাযেতউদ্দীন আহমদ ১০৩
সৈযদ শামসুল হোদা ১০৪
আবদুস সালাম ১০৬
আবদুল আজিজ ১০৭
আবদুর বহিম ১০৮
আবদুব বসুল ১০৯
সৈযদ ওযাহেদ হোসেন ১১০
আবু নসব ওহীদ ১১১
মির্জা সুজাত আলী বেগ ১১২
হামিদউদ্দিন আহমদ ১১২
সৈযদ ওসমান আলী ১১৩
বজলুব বহিম ১১৩
কাজী মোহাম্মদ আহমদ ১১৪
গজনফব আলী খান ১১৪
মোশাববফ হোসেন। ১১৪

সভাসমিতি : ১১৫
আঞ্জমন ইসলামী ১১৮
মহামেডান লিটাবেবী সোসাইটি ১২১
মাদ্রাসা লিটাবেবী এণ্ড ডিবেটিং ক্লাব ১৩০
সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিযেশান ১৩১
সমাজ সম্মিলনী সভা ১৫০
ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৫০
নূর-অল-ইমান সমাজ ১৫৪
সাতক্ষীবা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৫৬
এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা ১৫৬
আঞ্জমনে হেমাযেতে এসলাম ১৫৭
আঞ্জমনে মঈনাল এসলাম ১৫৯
বঙ্গপুর নূরুল ইমান জামাযাত ১৬০
কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন ১৬১
মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৬৪
মহামেডান এলগিন স্পোর্টিং ক্লাব ১৬৫

মোহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন ১৬৬
আঞ্জুমনে আশ-আতে ইসলাম ১৬৯
ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা ১৭০
বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়ন মুসলমান সমিতি ১৭১
সুবার্বন মহামেডান এসোসিয়েশন ১৭৩
আঞ্জুমনে নূরুল ইসলাম ১৭৪
মোসলমান শিক্ষা সভা ১৭৬
মহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব ১৭৭
কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা ১৭৭
মোসলেম ইনস্টিটিউট ১৭৯
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি ১৮০
বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি ১৮৭
আঞ্জুমনে মফিদুল ইসলাম ১৯০
মেদেনীপুর মোসলেম সোসাইটি ১৯০
মহামেডান লিটারেরী একাডেমী ১৯১
আঞ্জুমনে ইসলামিয়া। ১৯১

তৃতীয় অধ্যায় : সাহিত্য ও সাহিত্যিক ২০৭
মীর মশাররফ হোসেন ২২১
মোহাম্মদ নইমুদ্দীন ২৩৭
আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী ২৪১
কায়কোবাদ ২৪৭
মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ২৫০
রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী ২৫৩
শেখ আবদুর রহিম ২৫৬
মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক ২৬১
মোহাম্মদ নজিবর রহমান ২৬৭
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা ২৬৮
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ২৭৩
শেখ আবদুস সোবহান ২৮১
নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী ২৮৩
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ২৮৮
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন ২৯১
মতীয়র রহমান খান ২৯৪
শেখ ওসমান আলী ২৯৫
আবু মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী ২৯৭
মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী ৩০০
সৈয়দ এমদাদ আলী ৩০৫
সৈয়দ আবদুল মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ৩০৬
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ৩১০
শেখ ফজলুল করিম ৩১২
কাজী ইমদাদুল হক। ৩১৫

অপ্রধান লেখকবৃন্দ : ৩১৮
খোন্দকার শামসুদ্দীন সিদ্দিকী ৩১৮
মুনশী আজিমুদ্দীন ৩২০
মুনশী নামদাব ৩২০
গোলাম হোসেন ৩২১
শেখ আজিমদ্দী ৩২১
আযেন আলী শিকদার ৩২২
মোহাম্মদ ইসমাইল ৩২২
মীব আশরাফ আলী ৩২৩
সৈয়দ আবদুল রহিম ৩২৪
মুনশী মোহাম্মদী ৩২৪
মোহাম্মদ আবদুল করিম ৩২৫
মোহাম্মদ আবেদিন ৩২৬
ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ৩২৭
শেখ আবদুল লতিফ ৩২৮
কাজিমউদ্দীন আলী খান ৩২৯
কাদের আলী ৩২৯
মোহাম্মদ আবদুল কাদের ৩৩০
জহিরুদ্দীন আহমদ ৩৩০
আবদুল আলা ৩৩১
সলিমুদ্দীন আহমদ ৩৩২
আবদুল গণি ৩৩২
আজিজুননেসা খাতুন ৩৩৩
ফজলর রহমান ৩৩৩
মোহাম্মদ আব্বাস আলী ৩৩৩
সৈয়দ আবদুল আগফর ৩৩৪
হাফেজ নিয়ামতুল্লা ৩৩৫
মোহাম্মদ এহসানউল্লা ৩৩৬
দৌলত আহমদ ৩৩৬
আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী ৩৩৮
মকবুল আলী ৩৩৯
মেয়রাজউদ্দীন আহমদ ৩৪১
গোলাম কিবরিয়া ৩৪৩
চৌধুরী মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী ৩৪৩
একিনুদ্দীন আহমদ ৩৪৩
আবিদ আলী খান ৩৪৪

আলাউদ্দীন আহমদ ৩৪৫
তজমুল আলী ৩৪৬
মোহাম্মদ ইব্রাহীম খাঁ ৩৪৭
মোহাম্মদ ইয়াকুব ৩৪৭
মোসলেমউদ্দীন খান ৩৪৮
সৈয়দ আবদুল গাফ্ফার আলকাদরী ৩৪৯
শেখ তোহাদ রহিম ৩৪৯
মোসাব্বত আলী খান ৩৫০
মোহাম্মদ কাজেম আলী ৩৫০
আবদুল করিম ৩৫১
মোহাম্মদ রহিম বক্স ৩৫৩
কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ ৩৫৪
সমিনউদ্দীন আহমদ ৩৫৫
মানিকউদ্দীন আহমদ ৩৫৫
মোল্লা খোদাদাত ৩৫৬
সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ৩৫৬
ওহাজুদ্দীন আহমদ ৩৫৮
শেখ সাজ্জাদ করিম ৩৫৯
বদরুদ্দোজ্জা চৌধুরী ৩৫৯
মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন মণ্ডল ৩৬০
আবদুর রশিদ খান ৩৬১
মোহাম্মদ আবদুল আজিজ ৩৬১
মযেজউদ্দীন আহমদ ৩৬২
আফতাবউদ্দীন আহমদ ৩৬৩
দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ ৩৬৪
সমীবরুদ্দীন আহমদ ৩৬৫
শাহ আবদুল্লা ৩৬৬
দীন মোহাম্মদ ৩৬৬
আবদুল বারি ৩৬৬
আবদুর রহমান ৩৬৭
সৈয়দ আবুল হোসেন ৩৬৭
খোন্দকার গোলাম আহমদ। ৩৬৮

পত্রপত্রিকা : ৩৭৭
মহাম্মদি আখবার ৩৭৯
আখবারে এসলামীয়া ৩৮০
মুসলমান বন্ধু ৩৮১
আহমদী ৩৮২
সুধাকর ৩৮২
হিতকরী ৩৮৪
ইসলাম প্রচারক ৩৮৫
মিহির ৩৮৭
মিহির ও সুধাকর ৩৮৮
হাফেজ ৩৮৯
কোহিনুর ৩৯০
প্রচারক ৩৯৩
লহরী ৩৯৪
নূর-অল-ইমান ৩৯৪
নবনূর। ৩৯৫

চতুর্থ অধ্যায় :
সমাজ : ৩৯৮
পর্দা ও অবরোধ প্রথা ৪০১
বাল্যবিবাহ বহুবিবাহ বিধবাবিবাহ তালাক-প্রথা ও বাঁদীপ্রথা ৪০৪
সমাজের অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় চিন্তা ৪০৭
হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক ৪১৪
গো-হত্যা ৪২৬

ধর্ম : ৪৩৬
বহির্দ্বন্দ্ব – ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম ৪৩৯
ইসলাম ও বাউল মতবাদ ৪৬০
অন্তর্বিরোধ : — সুন্নি ও শিয়া ৪৬৩
হানাফি ও মোহাম্মদি ৪৬৫

শিক্ষা : ৪৭২
আধুনিক শিক্ষা ৪৮৫
ছাত্রাবাস আন্দোলন ৪৮৮
পাঠ্যপুস্তক ৪৯১
নারীশিক্ষা ৪৯৫

ভাষা ও সাহিত্য : বাংলা-উর্দুর দ্বন্দ্ব ৫০২

রাজনীতি : ৫১৮
ব্রিটিশ আনুগত্য ৫২১
জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলমান ৫২৪
মুসলিম জাতীয়তাবাদ ৫২৭
বিশ্ব-মুসলিমবাদ ৫২৮
হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও শিবাজী উৎসব। ৫৩১

উপসংহার : ৫৩৪

পরিশিষ্ট : ৫৪৩

গ্রাজুয়েট–তালিকা ৫৪৪
সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন -- চাঁদাদাতা সদস্যবৃন্দ ৫৬৭
ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদানকারী প্রতিনিধিবৃন্দ ৫৭৭
সরকারি উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ ৫৮০
এসিয়াটিক সোসাইটির মুসলমান ৫৮৩
সুবিয়া বিজয় ৫৮৫
জাতীয় ফোয়ারা ৫৮৫
ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ–সংস্কার ৫৮৬
জমিদার দর্পণ ৫৮৬
বিষাদ–সিন্ধুর উৎসর্গপত্র ৫৮৭
মতিচূর গ্রন্থের উৎসর্গপত্র ৫৮৭
বসন্তকুমারী নাটক ৫৮৮
কাসেমবধ কাব্য ৫৮৯
Bust -- Nawab Bahadur Abdul Latif C I E ৫৮৯
Memorial Tablet ৫৯০
Central National Muhammedan Association ৫৯১
National Muhammedan Association Rangpur Branch ৫৯২
National Muhammedan Association Mymensingh Branch ৫৯৩
Malda Muhammedan Association ৫৯৫
Muhammedan Reform Association ৫৯৭
ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর অনুষ্ঠানপত্র ৫৯৭
Anjuman-i-Ashaati Islam ৫৯৮
Tipperah Hito sadhinee Sava ৫৯৯
আঞ্জুমনে নূরুল ইসলাম ৬০০
কলিকাতা মুসলমান শিক্ষাসভা ৬০১
Anjuman-i-Islam ৬০৩
বিষাদ–সিন্ধু ৬০৪
অশ্রুমালা ৬০৪
বঙ্গীয় মুসলমান ৬০৫
ইসলাম-প্রচারকের প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ৬০৭
মিহিরের প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ ৬০৯
সুধাকরের অনুষ্ঠানপত্র। ৬১১

গ্রন্থপঞ্জি : ৬১৩
নির্ঘণ্ট : ৬২৯

চিত্রসূচি : ৬৪৯-৬৮০

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)
আলী নওয়াব চৌধুরী
হাফিজ মাহমুদ আলী খান পন্নী
নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮-১৮৯৩)
ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৬)
খোন্দকার ফজলে রাব্বি (১৮৪৮ ১৯১৭)
সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯–১৯২৮)
হেমায়েত উদ্দীন আহমদ (১৮৬০-১৯৪১)
আবদুস সালাম (১৮৬১–১৯৪১)
সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০–১৯৩৪)
বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৯৮০-১৯৩২)
আবদুল অজিজ (১৮৬৩-১৯২৬)
সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২–১৯২২)
আবদুল করিম বিএ (১৮৬৩-১৯৪৩)
আবদুর রহিম (১৮৬৭–১৯৫২)
আবদুর রসুল (১৮৭৬ ১৯১৭)
মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭ ১৯১২)
কায়কোবাদ (১৮৫৮–১৯৫২)
শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১)
শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯–১৯৫৩)
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০–১৯৩০)
কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)
মোহিনী প্রেম–পাশ নাটক
প্রেম- হার
আঁখিজল
কাসেমবধ কাব্য
The Origin of the Musalmans of Bengal
Vernacular Educatoin in Bengal
সুধাকর
হিতকরী
ইসলাম-প্রচারক
মিহির ও সুধাকর
নবনূর।

প্রথম অধ্যায়

পটভূমিকা

বাঙালি মুসলমান

১২০৩ খ্রীস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গ-বিজযেব পব থেকে এদেশে মুসলমান শাসনেব গোড়াপত্তন হয। তখন থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিরাজদ্দৌলাব পতন পর্যন্ত সাড়ে পাঁচশ' বছব প্রায় অবিচ্ছিন্নভাবে মুসলমান সুলতান-সুবেদার-নবাব-নাজিম বাংলাদেশে বাজত্ব কবেন। মাঝখানে বাজা গণেশ (১৪১৪-১৪১৮) চাব বছব স্বাধীনভাবে বাংলাব সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বাজা তোডরমল (১৫৮০-৮২) এবং মানসিংহ (১৫৮৯-৯৬) বাংলাদেশ শাসন কবেছিলেন ; কিন্তু তাঁবা ছিলেন আকবরেব প্রতিনিধি-নাজিম। বাংলাদেশ বিজিত হওযাব অনেক আগে অষ্টম শতকের গোড়াব দিকে উত্তব ও উত্তব পশ্চিম ভাবতে আববীয় মুসলমানদেব আগমন ঘটে। ক্রমে তাঁরা ভারতেব অধীশ্বব হন। মামলুক, খিলজি, ঘোরি, বলবন, শূর, মোঘল বংশেব নৃপতিগণ বাজত্ব কবেন। মোঘল বাদশাহ্ আওবঙ্গজেবেব (১৬৫৮-১৭০৭) মৃত্যুর পব দিল্লীর কেন্দ্রীয় শক্তি ক্রমশ দুর্বল হযে পড়ে। এর পঞ্চাশ বছর পব ইংবেজগণ প্রথমে বাংলা এবং প্রায় এক শত বছবেব মধ্যে অন্যান্য প্রদেশ দখল কবে ভারতে একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত কবেন।

মুসলমানদেব ভাবত বিজয থেকে ইংবেজদেব আবিভাবকাল পর্যন্ত মধ্যবর্তী কালকে ভাবতেব মধ্যযুগ ধরা হয। কমবেশি এ সময়ের ব্যবধানে ভাবতের অন্যান্য প্রদেশেব মত বাংলাদেশে মুসলমান সমাজেব পত্তন, গঠন, বিকাশ ও সমৃদ্ধি সম্পন্ন হয। হজরত মহম্মদ (৫৭১-৬৩৩) আবব ভূমিতে সাত শতকেব প্রথমার্ধে ইসলাম ধর্মেব প্রবর্তন কবেন।[১] নতুন ধর্মাদর্শে উদ্দীপিত আরবেবা সাম্রাজ্য বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে বাণিজ্য বিস্তাবেও তৎপর হয। ভারতের পশ্চিম ও পূর্বের সামুদ্রিক বন্দরগুলিতে প্রথমে আরব-বণিকেবা বাণিজ্যতবী নোঙর কবেন। এক কালে তাঁরাই ভূমধ্য সাগর, পাবস্য উপসাগব, ভারত মহাসাগব নিয়ন্ত্রণ করতেন। বাংলায তুর্কিব রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তাবের আগেই সামুদ্রিক বন্দব চট্টগ্রামে আবব-বণিকদের আগমন ঘটে। পাহাডপুবেব ভগ্নাবশেষ থেকে বাদশাহ্ হারুনব বশীদের নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে। ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, অষ্টম শতকের এই মুদ্রা আরব-বাণিজ্যের ব্যবসায়িক লেনদেনের ফল। বণিকদেব জাহাজে চড়ে আবব-ইবানের ধর্মপ্রচারক ওলি-আউলিয়া, পীর-দববেশ বাংলাদেশে এসেছিলেন, তা আজ নানাভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুফী দরবেশগণ অনেকে আস্তানা, খানকাহ, দরগাহ,

১ চল্লিশ বছব বযঃক্রমকালে (৬১০ খ্রিঃ) হজবত মহম্মদ 'নবুয়ত' বা ওহি লাভ করেন। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকে আববে ইসলামের পত্তন ও প্রচাব শুরু হয়।

মসজিদ নির্মাণ করে স্থায়ী বসবাস আরম্ভ কবেছিলেন, তাবও প্রামাণিক নিদর্শন আছে। চট্টগ্রাম শহরে একটি ক্ষুদ্র 'আবব কলোনী'র অস্তিত্বের কথা অনেকে স্বীকাব করেছেন। ইসলাম ধর্ম প্রচারশীল ; পীব-আউলিয়া-দববেশ ধর্ম প্রচারের দায়িত্ব নিয়ে দেশ-বিদেশে ছড়িয়ে পড়েন, কেননা ধর্ম প্রচারকে তাঁরা পবিত্র কর্ম বলে মনে করতেন। ইসলাম ধর্মনীতি ও মুসলমান সমাজব্যবস্থায় এমন কতকগুলি গুণ ছিল, যা সে যুগের মানুষকে চমকিত কবেছিল। ভারতের হিন্দু ধর্মনীতিতে ও সামাজিক আচরণবিধিতে কতক বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ কবা হত, বিশেষ কবে, বর্ণভেদ প্রথা, দাসপ্রথা, অস্পৃশ্য প্রথাব কারণে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের সামাজিক মর্যাদা ও মানবিক অধিকাব বলতে বিশেষ কিছু ছিল না।[২] মূল ইসলামে জাতিভেদ, বর্ণভেদ অস্পৃশ্য প্রথাব স্থান নেই, ববং তা নীতিগতভাবে সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শ সমর্থন করে। ইসলামেব প্রথম গৌরবোজ্জ্বল যুগের এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে পীর-দরবেশগণ মানবসেবায় ও পরহিতব্রতে আত্মোৎসর্গ কবেছিলেন। তাঁবা সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করতেন এবং সাধাবণ মানুষের মাঝে থেকে তাদের প্রতি দয়াধর্ম প্রদর্শন কবতেন। তাঁবা অনেকে আধ্যাত্মিক মহিমা ও অলৌকিক শক্তিব অধিকারী ছিলেন। তাঁদেব ধর্ম, কর্ম ও চবিত্রমাহাত্ম্যে মুগ্ধ হয়ে সাধাবণ মানুষ তাঁদের কাছে আসতো এবং ক্রমে ভক্তশ্রেণীতে পবিণত হত। একটি বিদেশী বাষ্ট্রে ভিন্ন ধর্মাবলম্বী শাসকেব অধীনে ধর্ম প্রচাবকগণ কখন বলপ্রয়োগ করতে পাবেন না, সাধাবণ দয়াধর্ম, হৃদয়ধর্ম ও মানবধর্মেব আবেদনকে তাঁবা মোক্ষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার কবেন। গ্রাম-বন্দর ছাড়া বাজদরবারেও দববেশগণের প্রভাব পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে 'সেক শুভোদয়া' বর্ণিত লক্ষ্মণ সেনেব বাজসভায় শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজীব কথা স্মবণ কবা যায়। লক্ষ্মণ সেনেব সভাকবি হলায়ুধ মিশ্র এটি বচনা কবেন। শেখ জালালউদ্দীন আধ্যাত্মিকশক্তিতে বলীয়ান ছিলেন। তিনি বহু জনপদকে নিপীডনেব হাত থেকে উদ্ধাব কবেন এবং তাদেব ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।[৩] কেবল বণিক ও পীব-দববেশ নয়, বেতনভোগী তুর্কিসেনাবও আগমন এবং আবাস স্থাপনেব প্রমাণ আছে। গোবিন্দপাল (১১৫৫-৬২) 'তুবস্কদণ্ড' নামে একটি রাজকবের প্রবর্তন কবেন। এটি বহিবাগত তুবস্কদেব উপব ধার্য করা হয়। তুর্কিবা অশ্বাবোহী সৈন্য হিসাবে অত্যন্ত দক্ষ ও সাহসী ছিল। তাবা স্থানীয় রাজা বা ভৌমিকদেব অধীনে বেতনভোগী সৈন্যরূপে কাজ কবত।[৪] ত্রয়োদশ শতকে তুর্কি বিজয়েব ফলে বাংলাদেশে পীব-দববেশদেব যেমন সংখ্যা বাড়ে, তেমনি ধর্মান্তবীকবণও ত্বরান্বিত হয়। তখন উচ্চ পদ, ব্যবসায়ে সুবিধা, সামাজিক মর্যাদা ইত্যাদি ক্ষেত্রে লোভ ও লাভেব প্রশ্ন দেখা দেয়। কোথাও কোথাও তববারির ভয়ও উপস্থিত হয়েছিল। ধর্ম প্রচারে সুলতান

২. বৈদিক যুগে বর্ণভেদেব বাড়াবাড়ি ছিল না। পৌবাণিক যুগে বর্ণভেদেব উপব কড়াকড়ি নিয়ম প্রবর্তিত হয়। 'মনুসংহিতা'য় শূদ্রেব বিরুদ্ধে ঘৃণা, অবজ্ঞা, এমন কি যুদ্ধ করাব কথা বহু জায়গায় উল্লিখিত হয়েছে। 'ঐতবেয় ব্রাহ্মণে' আছে যে, প্রভু অবাধ্য দাস শূদ্রকে হত্যা পর্যন্ত কবতে পাবেন। নিম্ন বর্ণেব লোকেব এবং বৌদ্ধ শ্রমণেব দর্শনে, স্পর্শে পাপ —একথা প্রচাব কবা হত।
গোপাল হালদাব—*সংস্কৃতিব রূপান্তব*, ওবিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ: ১৭৩-৭৫

৩. Sukumar Sen (edited)--*Sekasuvodaya*, The Asiatic Society, Calcutta, 1962

৪ সুশীলা মণ্ডল—*বঙ্গদেশেব ইতিহাস* (মধ্যযুগ : প্রথম পর্ব), প্রকাশ মন্দির প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ: ৩৪ (পবিশিষ্ট)।

জালালউদ্দীন (১৪১৮–৩২) এবং সোলায়মান কররানির সেনাপতি কালাপাহাড় (১৫৬৫–৮৩) তরবারি প্রয়োগ করেছিলেন।[৫] এদিকে শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সামরিক ব্যক্তি, প্রশাসনিক কর্মচারী, ব্যবসাদার, শিক্ষাবিদ ও আরও অনেক ভাগ্যান্বেষীর দল এসেছিলেন। কেন্দ্রের রাষ্ট্রবিপ্লবের ফলে অনেকে বিতাড়িত হয়ে ভারতের পূর্বপ্রান্ত বাংলায় আশ্রয়প্রার্থী হয়েছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে দিল্লীতে অনেকবার রাষ্ট্রবিপ্লব হয়েছে। শেষের দিকে মারাঠা, অমেঠি, নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালির আক্রমণ ও লুণ্ঠনের ফলে দিল্লীর নাগরিক জীবন বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয়। জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার কারণে লোকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ত। এঁদের একটি স্রোত বাংলাদেশে প্রবাহিত হয়েছে। পরে শান্তি স্থাপিত হলেও তাঁদের অনেকেই আর ফিরে যাননি। তাঁরা বসতি গড়ে তোলেন এবং স্থানীয় নারী-পুরুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক প্রভৃতি বহিরাগত মুসলমান, ধর্মান্তরিত স্থানীয় জনসাধারণ এবং বৈবাহিকসূত্রে জাত মিশ্র রক্ত-ধারার মানুষ—এই ত্রিবিধ পদ্ধতিতে বাংলায় মুসলমান সমাজের সৃজন, গঠন ও বর্ধনের কাজ সারা মধ্যযুগ ধরে চলেছিল। সুতরাং বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মের প্রচার এবং মুসলমান সমাজের পত্তন কোন আকস্মিক ঘটনা নয়, দীর্ঘকালের ঐতিহাসিক ও সামাজিক প্রক্রিয়ার দ্বারাই বাঙালি মুসলমানের গঠন ও বিকাশের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

মধ্যযুগে লোকগণনার কোন রীতি ছিল না। সুতরাং কোন শ্রেণীর মুসলমান কি হারে বৃদ্ধি পেয়েছে তা আর নির্ণয় করার উপায় নেই। মুসলমান আমলে এদেশ সম্বন্ধে যেসব ইতিহাস রচিত হয়েছে, সেসব ইতিহাসে প্রধানত রাজবংশের উত্থান-পতনের কাহিনী প্রাধান্য লাভ করেছে, জনসাধারণের কথা প্রায়ই স্থান পায়নি। ব্রিটিশের শাসন-আমলে ইংরেজ রাজকর্মচারী এবং পণ্ডিতগণ শাসনকার্য পরিচালনার জন্য সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব প্রভৃতি বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞানের আলোকে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁদেরই প্রচেষ্টায় ১৮৭২ সালে প্রথম 'আদম শুমারী' অনুষ্ঠিত হয়। ১৮৮১ সালে দ্বিতীয়, ১৮৯১ সালে তৃতীয় ইত্যাদি দশ বছর অন্তর অন্তর নিয়মিতভাবে লোকগণনা রীতি চলতে থাকে। ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী মূল বাংলার ৩,৫৭,৬৯,৭৩৫ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ১৭,৬০৯,১৩৫ এবং হিন্দুর সংখ্যা ১৮,২০০,৪৩৮। বাকি অন্য সম্প্রদায়ের লোক। শতকরা হিসাবে হিন্দু-মুসলমানের হার যথাক্রমে ৫০.১% এবং ৪৮.৮%।[৬] ১৮৮১ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী মোট ৩৫,৬০৭,৬২৮ জনের মধ্যে মুসলমান ১৭,৮৬৩,৪১১ (৫০.১৬%) ও হিন্দু ১৬,৩৭০,৯৬৬ (৪৮.৪৫%)।[৭]

৫ কালাপাহাড় বাংলার স্বাধীন সুলতান সোলায়মান কররানির (১৫৬৫–৭২) সেনাপতি ছিলেন। তিনি উড়িষ্যা আক্রমণ করে দখল করেন এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দির ধ্বংস করেন। তার পূর্বনাম ছিল রাজু। গণেশ পুত্র সুলতান জালালউদ্দীনের পূর্বনাম ছিল যদু। জালালউদ্দীন ও কালাপাহাড় উভয়ে ধর্মান্তর গ্রহণ করেন।

Jadunath Sarkar (edited)--*History of Bengal* Vol II, University of Dacca, Dacca, 1972, pp 183-84, 202 (2nd ed.)

৬ *Report on the Sensus of Bengal*, 1872, Calcutta, 1872, pp XXXII-XXXIII (General statement IB)

৭ *Report on the Sensus of Bengal*, 1881, Calcutta, 1883, p. 74.

আগের রিপোর্টে প্রায় ছয় লক্ষ মুসলমান কম ছিল, পরের রিপোর্টে মুসলমানের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ১৫ লক্ষ বেশি হয়েছে। ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা ১৫ লক্ষেরও অধিক দেখা যায়।[৮]

বাংলার মুসলমানের কুল-পরিচয় এবং সেই সঙ্গে সংখ্যা বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্ন বর্ণের জনগণের ব্যাপক হারে ধর্মান্তর গ্রহণের উপর জোর দিয়েছেন। হিন্দু সমাজের জাতিভেদের কঠোরতার কারণে মুসলমান পীর-দরবেশগণ নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের সহজে ধর্মান্তরিত করতে পেরেছেন। আরব, পারস্য, আফগানিস্তান থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর বসতি স্থাপনের ফলে বাংলার মুসলমানের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, একথা তাঁরা স্বীকার করেন না।[৯] বাংলার মুসলমানের ভাষা, ধর্মবিশ্বাস, সামাজিক রীতিনীতি, দৈহিক গঠন ইত্যাদি বিষয়ের উপর আলোকপাত করে তাঁরা এরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। গ্রিয়ার্সন, হান্টার, ডাল্টন, উইলিয়াম ক্রুক, জেমস ওয়াইজ, হার্বার্ট রিজলি, জেমস লঙ প্রমুখের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। তাঁরা বাংলাদেশের জনতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষা-সমাজ ও ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কে গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন।[১০]

মুসলমান পণ্ডিতগণের কেউ কেউ ইউরোপীয়দের এ-তত্ত্ব মানতে চাননি। তাঁরা এটাকে মুসলমানের পক্ষে অবমাননাকর এবং অন্যের চক্ষে মুসলমান সম্প্রদায়কে হেয় প্রতিপন্ন করার ষড়যন্ত্র বলে মনে করেছেন। মুর্শিদাবাদ স্টেটের দেওয়ান খোন্দকাব ফজলে রাব্বি তাঁর 'হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) গ্রন্থে এ সম্পর্কে প্রথম প্রতিবাদ তোলেন। তিনি বাংলার মুসলমান আমলের নবাব-সুলতানদের ধারাবাহিক ইতিহাস, পারিবারিক ইতিহাস, মুসলমানদের নৃতত্ত্ব ও অন্যান্য লক্ষণ বর্ণনা করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশ থেকে আগত অভিজাত শ্রেণীর লোক।[১১]

---

৮. *Report on the Sensus of Bengal*, Vol III, 1891, p 147

৯. Shila Sen--*Muslim Politics in Bengal* (1937-1947), New Delhi 1976, p 3

১০. Grierson--*Linguistic Survey of India* (5 Vols.)
Hunter--*Annals of Rural Bengal (1868), The Indian Mussalmans* (1871)
Dulton--*Descriptive Ethnology of Bengal* (1872)
Wise--*The Races, Castes and Tribes of Eastern Bengal* (1883)
Crooke--*The Popular Religion and Folklore of Northern India* (1893)

১১. Khondker Fuzli Rubbee--*The Origin of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, 1895.
খোন্দকাব ফজলে রাব্বির যুক্তিগুলি ছিল এরূপ :- (১) বাংলা বখতিয়ার খিলজির সময় থেকে কোম্পানিব দেওয়ানী লাভের সময় পর্যন্ত মুসলমান শাসকের অধীনে ছিল.। (২) মুসলমান শাসকগণ অন্য অঞ্চলের স্বধর্মীদেব আহ্বান করেছেন ; সৈয়দ, মোঘল, পাঠানদের চাকুরি দিয়েছেন, শিক্ষিত, ধার্মিক, নিঃস্ব ব্যক্তিদের করমুক্ত ভূমি দিয়েছেন বসবাস করার জন্য। গিয়াসউদ্দীন (১২১৪-২৭), নাসিরুদ্দীন (১৪২৬-৫৭), হুসেন শাহ (১৪৯২-১৫১৮) সম্ভ্রান্ত ও ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিদের বাংলায় আসতে এবং বসতি করতে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। (৩) বাংলার শাসকগণ সৈন্যবাহিনী বাইরের মুসলমান দ্বারা গঠিত ; তাদের অধিকাংশ এদেশে থেকে গেছে। (৪) উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বাস্তুত্যাগী ও পলাতকদের আশ্রয়স্থল ছিল বাংলাদেশ ; বিশেষ করে, স্বাধীন সুলতানদের দু'শো বছর রাজত্বকালে (১৩৩৮-১৫৭৬) এ ধরনের রাজনৈতিক আশ্রয় অনেক ছিল। ঘোরি বংশের পত্তনের কালে এবং

খোন্দকার ফজলে রাব্বির বক্তব্যের মধ্যে কিছু সত্যতা আছে ঠিকই, তবে বাংলার সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান বিদেশাগত বনেদী মুসলমানদের দ্বারা গঠিত হয়েছিল, এটি মেনে নেওয়া যায় না। মুহম্মদ আবদুর রহিম তুর্কি ও মোঘল আমলে বাংলায় আগত বিদেশী মুসলমান অপেক্ষা হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমানের সংখ্যা বেশি বলে উল্লেখ করেছেন।[১২] ইউরোপীয় ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছেন, এক হাতে তরবারি, অন্য হাতে কোরান নিয়ে মুসলমানরা ধর্ম প্রচার করেছেন। বাংলাদেশে ইসলাম প্রচার সম্পর্কে এ কথা মেনে নেওয়া যায় না এজন্য যে, এদেশে ইসলাম প্রচারে শাসক শ্রেণী অপেক্ষা সাধক শ্রেণীর ভূমিকা অধিক ছিল। সাধু-দরবেশগণই ইসলাম ধর্ম প্রচারের মূল দায়িত্ব পালন করেন। তাঁদের হাতে কোরান ছিল বটে, কিন্তু তরবারি ছিল না। বাংলার পীর-দরবেশগণ সুফীমতের ধারক ছিলেন। সুফীরা উদার মানবতাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলাদেশে শত শত দরগাহ, খানকাহ, মাজার, মসজিদ আছে যেগুলি শহর-বন্দর অপেক্ষা গ্রামে-গঞ্জে বেশি ছড়িয়ে আছে। পীর-দরবেশগণ লোকালয়ের মধ্যে সাধারণ মানুষের সংসর্গে থাকতেন ; তাঁদের সৈন্য-সামন্ত বা দেহরক্ষী ছিল না, তাঁরা উচ্চ বিত্তেরও মালিক ছিলেন না ; তাঁরা অতি সাধারণভাবে জীবনযাপন করতেন। কেউ কেউ সরকারের দেওয়া নিষ্কর ভূমি তথা পীরোত্তর সম্পত্তির সুবিধা ভোগ করতেন সত্য, তবে বেশির ভাগ সাধু-সন্ত ভক্তের স্বতঃস্ফূর্ত 'দর্শনি'র উপর নির্ভর করে চলতেন। তাঁরা বলপ্রয়োগ করলে গ্রামাঞ্চলে টিকতে পারতেন না। শাসকদের হাতে তরবারি ছিল ; শাসক শ্রেণী থাকতেন সৈন্য-সামন্ত পরিবেষ্টিত দুর্গের মধ্যে। মধ্যযুগীয় সামন্ত শাসনের ধারায় রাজার সঙ্গে প্রজার সম্পর্ক ছিল আনুগত্য স্বীকার ও রাজস্ব প্রদানের সম্পর্ক। বাংলার পাঠান সুলতানগণ ছিলেন বিদ্রোহ-প্রবণ। তাঁরা সামান্য সুযোগে দিল্লীর কেন্দ্র-শক্তির বিরুদ্ধে প্রায়ই বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। পাঠান সুলতানগণ প্রায় দু'শো বছর (১৩৩৮-১৫৭৬) স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছেন। দিল্লীর রক্তচক্ষু, আভ্যন্তরীণ বিপ্লব পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের আক্রমণ ইত্যাদির আশঙ্কা নিয়ে সুলতানেরা প্রজাগণের উপর 'চণ্ডনীতি' পোষণ করতে পারেন না। এদিকে কি কেন্দ্রের, কি প্রদেশের শাসক গোষ্ঠীর নীতি ছিল 'বীরভোগ্যা বসুন্ধরা'র নীতি। এ ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। ভারতের ইতিহাসে মুসলমানে-মুসলমানেও কম বিপ্লব, বিদ্রোহ, দ্বন্দ্ব, সংঘর্ষ হয়নি। মধ্যযুগে দিল্লীর মত বাংলার ইতিহাস ছিল রাজপ্রাসাদের ক্ষমতার লড়াইয়ের ইতিহাস ; এক বংশ থেকে আর এক বংশের দ্বন্দ্ব, এমন কি, একই বংশের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ অনবরত লেগেছিল। গণচেতনা বলে তখন কোন কিছু ছিল না। যে সেনাবাহিনীকে সংগ্রামের শক্তিরূপে ব্যবহার করা হত, তা ছিল সম্পূর্ণ ভাড়াটে, তাদের সংগ্রামের প্রেরণার মূলে দেশপ্রেম ছিল না। রাজার সঙ্গে রাজার দ্বন্দ্ব ছিল, রাজার সঙ্গে প্রজার দ্বন্দ্ব ছিল না। রাজতন্ত্রের সঙ্গে পীরতন্ত্রের সম্পর্ক কখন ভাল ছিল, কখন মন্দ ছিল। আধ্যাত্মিক নেতা

মুহম্মদ তুঘলকের রাজত্বকালে বহু মুসলমান পরিবার বাংলায় আশ্রয় গ্রহণ করে। আকবরের রাজত্বকালেও অনেক ধর্মীয় নেতা বাংলায় প্রেরিত হয়েছেন। (৫) অনেক ব্যক্তি বাংলার সম্পদের প্রাচুর্য ও ভূমির উর্বরতায় আকৃষ্ট হয়ে এদেশে এসে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেছে।

১২. Muhammad Abdur Rahim--*Social and Cultural History of Bengal.* (Vol I, 1200-1576), Vol. II, (1576-1757), Karachi, 1961.

নূর কুতবে আলমের আমন্ত্রণক্রমে জৌনপুরের শাসনকর্তা ইব্রাহিম শর্কি বাংলা আক্রমণ করে রাজা গণেশকে সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য করেন, তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে জালালউদ্দীন নাম ধারণ করে সিংহাসনে বসেন (১৪১৮)। সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ (১৩৩৮–১৩৫২) রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে সইদা নামে একজন সুফী ফকির এবং তাঁর সঙ্গীদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। আবার তাঁরই আমলে সুফীরা রাজার ফরমান অনুযায়ী বিনা 'পারানি'তে খেয়া পার হতেন এবং স্থানান্তরে গেলে লোকের কাছ থেকে 'অর্ধ দিনার' উপহার পেতেন।[১৩] খোন্দকার ফজলে রাব্বি লাখেরাজ রায়তিস্বত্ব বা নিষ্কর ভূমির ভোগস্বত্বের যে ২৭টি দানের উল্লেখ করেছেন, সেগুলির মধ্যে 'মদদ-ই মাশ', 'আয়মা', 'নাযুরাত' ও 'পীরান' এই ৪টি মুসলমান ধর্মীয় নেতা, আধ্যাত্মিক উপদেষ্টা এবং সৈয়দ ও উচ্চ বংশজাত অভিজাত শ্রেণীকে দেওয়া হত। 'খানকাহ', 'নজরি দরগাহ', 'জমিন-ই-মসজিদ', 'নজরি হজরত' নামের আরও ৪টি দান যথাক্রমে খানকাহ, দরগাহ, মসজিদ নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং ধর্মানুষ্ঠান পালনের জন্য দেওয়া হত।[১৪] ধর্মপ্রচারে ও ধর্মকার্য সম্পাদনের জন্য পীর-মুর্শিদগণ শাসকেব কাছ থেকে এসব সুবিধা ভোগ করলেও ইউরোপের যাজকতন্ত্রের মত পীরতন্ত্র বা মোল্লাতন্ত্র কোন সুগঠিত সঙ্ঘ শ্রেণীভুক্ত ছিল না। এগুলি অধিকাংশ ব্যক্তিগত বিচ্ছিন্ন প্রয়াস ও উদ্যোগ ছিল। খ্রিস্টান জগতে রাজতন্ত্রের সাথে যাজকতন্ত্রেব যে বাজনৈতিক সম্পর্ক, মুসলিম বিশ্বের রাজতন্ত্র ও পীরতন্ত্রের মধ্যে ঐরূপ সম্পর্ক ছিল না। এমন কি, ভরতবর্ষে প্রাচীন কালে হিন্দু রাজতন্ত্রের সাথে পুরোহিততন্ত্রের পরস্পর স্বার্থেব একটা ঘনিষ্ঠ যোগসম্পর্ক ছিল। পীর-দববেশগণ দরবারে সম্মান পেতেন, কিন্তু দরবারে স্থায়ী আসন পেতেন না। আকবর সলিম চিশতি নামক একজন আলেম-দরবেশের ভক্ত ছিলেন, তিনি পীবের উদ্দেশ্যে ফতেপুর সিক্রিতে রাজপ্রাসাদেব অতি সন্নিকটে বিরাট মসজিদ নির্মাণ কবেন ; তাঁর দরবারে সুফী-দরবেশদেব নিয়ে 'সামা' নাচ-গানেব ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু এসব আকবর ব্যক্তিগতভাবে করেছিলেন, আওরঙ্গজেব এগুলি তুলে দেন। সুতরাং মুসলমান কর্তৃক রাজ্য বিজয়েব পূর্বে, কি পরে সুফীবা নিজেরা তরবারি ধারণ করেননি, এমন কি কৃপাণধারী শাসকশ্রেণীর ছত্রচ্ছায়াও তাঁরা সমভাবে ও অবিচ্ছিন্নভাবে পাননি।

ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অধিক কেন এ প্রশ্নের মীমাংসা পুরোপুরি হয়নি। ইউরোপীয় ঐতিহাসিক ও পণ্ডিতগণ ধর্মান্তরের কারণ হিসাবে হিন্দুর 'জাতিভেদ প্রথা'র উল্লেখ করেন ; এইচ, ব্রেভার্লি ১৮৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্টে জেলাভিত্তিক লোকসংখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে ঢাকা, মালদহ, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার তুলনায় রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, যশোহর, ফরিদপুর, ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম, বাকেরগঞ্জ প্রভৃতি জেলায় মুসলমানের হার অনেক বেশি। এরূপ সংখ্যাতত্ত্বের ভিত্তিতে তিনি মন্তব্য করেছেন, "This circumstances again seems to point out to the conclusion that the existence

১৩. Mehdi Husain (edited)--*The Rehla of Ibn Battuta*, Oriental Institute, Baroda, 1953

১৪. *The Origin of the Musalmans of Bengal* P. 69 70.

of Muhammadans in Bengal is not due so much to the introduction of Mughul blood into the country as to the conversion of the former inhabitants for whom a rigid system of caste discipline rendered Hinduism intolerable."[১৫]

এ প্রথা অবশ্য ভারতের হিন্দু সমাজের মধ্যে সর্বত্র ছিল। একজন আধুনিক গবেষক মনে করেছেন, বাংলার মুসলমানের সংখ্যাবৃদ্ধির কারণ 'দাসপ্রথা'।[১৬] ইবন বতুতা চট্টগ্রামে মানুষের কেনাবেচা দেখেছেন। তিনি নিজেই 'আশুরা' নামে একটি সুন্দরী দাস-বালিকা এক স্বর্ণ দিনার এবং 'লুলু' নামে একটি দাসবালক দুই স্বর্ণ দিনারে ক্রয় করেছিলেন।[১৭] পর্তুগীজ দস্যুরা এদেশে দাস-ব্যবসায় পবিচালনা করত। নিম্নবর্ণের দুঃস্থ লোকেরা ও পাহাড়-পর্বতের আদিবাসীরা দুর্ভিক্ষের কারণে এবং সাংসারিক অভাব-অনটনের কারণেও স্ত্রী-পুত্রকন্যা বিক্রয় করত। যুদ্ধ বন্দীদেরও দাস রূপে বিক্রয় করা হত। ইসলামে দাসপ্রথার স্বীকৃতি আছে ; তবে দাস-দাসীদিগের প্রতি আচরণ সম্পর্কে মুসলমানগণ অনেক উদাব ছিলেন। "The Muslims treated the slaves humanely, in fact the slaves were allowed to marry and bring up families."[১৮] ক্রীতদাসগণ দিল্লী ও গৌড়ে কেবল উচ্চ রাজপদই পাননি, তাঁরা সিংহাসনের অধিকারী হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্ত বিবল নয়। মামলুক বংশীয় সুলতানরা দাস ছিলেন। এই দাসপ্রথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও প্রচলিত ছিল। খোন্দকার ফজলে বাব্বি বলেছেন, মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকায় ঐ সমাজে সন্তানেব সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে বেশি।[১৯] এ যুক্তিও সব অঞ্চলের মুসলমানের জন্য প্রযোজ্য।

এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ সমাজের কথা ভেবে দেখতে হয়। অষ্টম থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রায় চারশ' বছর বাংলার বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধ রাজার শাসনাধীন ছিল। পাল রাজাদেব অনেকে সুশাসক ছিলেন। পাল আমলে দেশীয় সংস্কৃতির সম্যক বিকাশ ঘটেছিল। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতিতে বৌদ্ধ সংস্কৃতির কেন্দ্র গড়ে ওঠে। বাঙালি পণ্ডিত শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্যের সম্মান পেয়েছিলেন। ঐ যুগের বিপুল সংখ্যক বাঙালি বৌদ্ধ কোথায় গেলেন? ১৮৭১ সালের সেন্সাসে বৌদ্ধ-জৈন মিলে মাত্র

১৫. *Report on the Sensus of Bengal*, 1872, P. 132.

১৬. Hossainur Rahman--*Hindu-Muslim Relations in Bengal* (1905-1947), Nachiketa Publications Limited, Bombay, 1974, P. 1
উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত কলিকাতাব বাজাবে প্রকাশ্যে দাস বিক্রি হত। ক্যাথলিন ব্লেচিনডেল লিখেছেন, "The Picture of Slavery in Calcutta at close of the Eighteenth century, horrible as it is, was no by means overdrawn, and the hide outs did not die out till nearly fifty years after that period." (*Calcutta Past and Present*, 1905)। ১৮৪৩ সালে পঞ্চম আইনে ভাবতে দাসপ্রথা বেআইনী ঘোষিত হয়।
রমেশচন্দ্র মজুমদাব—*বাংলাদেশেব ইতিহাস* (৩য় খণ্ড), পৃ: ৩৬৪ ; বিনয় ঘোষ--*বিদ্রোহী ডিবজিও*, পৃ: ২২ ; পার্থ চট্টোপাধ্যায়— *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীর নবজাগরণ*, পৃ: ১২১

১৭. *The Rehla of Ibu Battuta.*

১৮. *Hindu-Muslim Relations in Bengal* (1905-1947), P. 1.

১৯. *The Origin of the Mussalmans of Bengal*, P. 121

৮৪,৯৪১ জন পাওয়া যায়। পালদের পর সেনরা একশ' বছর শাসন করেন। বৌদ্ধদের সঙ্গে হিন্দুদের সম্পর্ক ভাল ছিল না। বিশেষত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির তীব্র দ্বন্দ্ব ছিল।[২০] সেন-বর্মণ যুগে বৌদ্ধ বিরোধিতার পশ্চাতে রাষ্ট্রীয় সমর্থন ছিল। বর্মণ-রাজ জাতবর্মার রাজত্বকালে 'বঙ্গাল সৈন্য' সোমপুর বিহারের একাংশ অগ্নি সংযোগে বিনষ্ট করেছিল। ধর্মপূজার প্রবর্তক রামাই পণ্ডিত 'শূন্যপুরাণ' লেখেন। এটি ত্রয়োদশ শতকের রচনা। শূন্যপুরাণের 'নিরঞ্জন রুষ্মা'য় সদ্ধর্মীরা মুসলমানদের মুক্তিদূত রূপে দেখেছেন। সেখানে ব্রাহ্মণের অত্যাচার থেকে মুক্তি পাওয়ার উল্লাস আছে। তুর্কি আক্রমণের প্রথম আঘাত হিন্দু-বৌদ্ধ উভয়ের উপর পড়েছিল। কিছু সংখ্যক লোক নেপাল-তিব্বতে চলে গেছিলেন ব্রাহ্মণ্য সংঘর্ষ না মুসলিম সংঘর্ষকালে তা সঠিক বলা যায় না। জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী বলেন, "বঙ্গে যখন তুর্ক-আফগানের আবির্ভাব ঘটে, তখন তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের প্রায় ভগ্নদশা। স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিলেও অনেক বৌদ্ধ হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নস্তর আশ্রয় করিয়া ছিলেন। সমাজে তাঁহারা ছিলেন অপাঙক্তেয়। নবাগত তুর্ক-আফগান বঙ্গ-বিহারের বহু সঙ্ঘারাম ধূলিসাৎ করিয়াছিলেন, ফলে অনেক বৌদ্ধ নেপাল-তিব্বতে পলায়ন করিয়াছিলেন। আবার অনেকে স্বেচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[২১] ভগ্নদশাপ্রাপ্ত বৌদ্ধরা বিপুল সংখ্যায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। 'হিন্দু সম্প্রদায়ের নিম্নস্তর'কে আশ্রয় করে অপাঙক্তেয় হয়ে থাকার চেয়ে সাম্যবাদী ইসলাম গ্রহণ করে সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা লাভ অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করেছিলেন তাঁরা। বস্তুত নব গঠিত মুসলমান সমাজে বৌদ্ধদের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। শূন্যপুরাণের 'নিরঞ্জনের রুষ্মা' তারই স্বাক্ষর বহন করে। যেক্ষেত্রে বর্ণবিভক্ত হিন্দু সমাজে জাতিচ্যুতকে জাতে তোলা কঠিন দায় ছিল, সেক্ষেত্রে অন্য ধর্মাবলম্বীদের আশ্রয় দান অকল্পনীয় ছিল। বস্তুত হিন্দু সমাজে ধর্মান্তরীকরণের কোন রীতি বা বিধি ছিল না।

সেন্সাস রিপোর্টের জেলাভিত্তিক সংখ্যাতত্ত্বের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, বাংলার সব জেলায় মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। কতকগুলি জেলায় তাদের সংখ্যা বেশ কম। বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতে হিন্দু এবং পূর্ববঙ্গের জেলাগুলিতে মুসলমানের সংখ্যা বেশি। পশ্চিমবঙ্গের ঐসব অঞ্চলে বর্ণহিন্দুর প্রভাব বেশি। বাংলাদেশ আর্যীকরণ সর্বত্র সমভাবে হয়নি। পশ্চিমবঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব যত বেশি, পূর্ববঙ্গে তত নয়। নদীয়ার নবদ্বীপ, বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুর প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সুদৃঢ় কেন্দ্র ছিল। হিন্দু সম্প্রদায়ের উচ্চবর্ণের লোক অপেক্ষা নিম্নবর্ণের লোকে অধিক ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে। সেন আমলে সংখ্যালঘু ব্রাহ্মণ-ক্ষয়িত্র-কায়স্থগণ বেশি সুবিধা ভোগ করতেন। তাঁরা সামাজিকভাবে সচেতন ছিলেন, তাঁদের শিক্ষা-সংস্কৃতির মান উন্নত ছিল। তাঁরা নিজ নিজ অস্তিত্ব ও অন্যান্য স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে রক্ষণশীল মনোভাব পোষণ করতেন। ফলে তাঁরা প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। ঐসব জায়গায় ইসলাম ধর্ম সহজে

২০. বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ : প্রথম পর্ব), পৃ: ৬৯-৭০।
২১. জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী—'বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজমত', *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩য় বর্ষ, ১৯৭৫

প্রবেশ লাভ করতে পারেনি। শুধু বাংলাদেশ নয়, সমগ্র উত্তর ভারতের ক্ষেত্রেও একথা প্রযোজ্য। ফলকথা, ধর্মান্তরীকরণ পদ্ধতি মুসলমান সংখ্যাবৃদ্ধির একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল যার প্রচারকযন্ত্র হিসেবে পীর-দরবেশ, অলি-আউলিয়াগণ গভীরভাবে জড়িত ছিলেন। তাঁরা যেখানে বাইরে থেকে শাসক শ্রেণীর ছত্রচ্ছায়া লাভ করেছিলেন আর ভেতর থেকেও বাধার সম্মুখীন হননি সেখানে তাঁদের সাফল্য অধিক। টমাস ওয়াকার আরনল্ড বলেন, "It is in Bengal, however, that the Muhammadan missionaries in India have achieved their greatest success as far as numbers are concerned.... The long continuance of the Muhammadan rule would naturally assist the spread of Islam."[২২] জনপ্রবাহের এই মূলধারার সাথে আরব-ইরান-তুরস্ক-খোরাসান-আফগানিস্তান থেকে আগত একটি উপধারা মিলিত হয়েছে। দুই ধারার মধ্যস্থলে আছে মিশ্ররক্তের প্রবাহ। এই তিন ধারার শতকরা হিসেব নির্ণয় করা আজ আর সম্ভব নয়।[২৩]

খোন্দকার ফজলে রাব্বি বখতিয়ার খিলজি (১২০৩) থেকে নাজিমউদ্দৌলা (১৭৭৪) পর্যন্ত মোট ৭৬ জন শাসকের তালিকা দিয়েছেন। এঁদের মধ্যে ১১ জন ঘোরি ও খিলজি বংশের দিল্লীর প্রতিনিধি, খিলজি, মামলুক ও শূর বংশের ২৬ জন নরপতি এবং বাকী ৩৪ জন ছিলেন মোঘল সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত নবাবনাজিম।[২৪] গণেশের পুত্র জালালউদ্দীন ও আহমদ শাহ ধর্মান্তবিত বাঙালি মুসলমান। গণেশ, তোডরমল ও মানসিংহ ভারতীয়, বাকী সব বহিরাগত। শাসনকর্তার সাথে আমীর-ওমরাহ ও সৈন্য-সামন্ত থাকতেন। শাসন পরিচালনা ও রাজস্ব সংগ্রহের জন্য জায়গিরদার, জমিদার, সুবাদার, দেওয়ান, নায়েব ইত্যাদি কর্মচারী, সৈন্যবিভাগে ফৌজদার, মনসবদার, সিপাহসালার, লস্কর প্রভৃতি পদস্থ ব্যক্তি, বিচার বিভাগে কাজী-অল-কুজ্জাত, কাজী, মুফতি, মুন্সেফ প্রভৃতি পদবীর কর্মচারী ছিলেন।[২৫] তাঁরা সুলতান-নবাবকে শাসনকার্যে সহায়তা করতেন। রাজস্ব বিভাগে

২২. Thomas Walker Arnold--*Preaching of Islam, Lahore*, 1896, P. 277

২৩. ১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে ময়মনসিংহের আবু এ, গজনবীর প্রদত্ত বিবরণ উদ্ধৃত হয়। 'মুসলমান বিদেশী বংশোদ্ভূত'—এ তত্ত্বে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ময়মনসিংহ জেলার মুসলমানের বংশ-রক্ত-কুলগত পবিসংখ্যান প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বর্তমানে জেলার মুসলমানের মধ্যে মোটামুটিভাবে ২০% ভাগ বিদেশাগত বংশধব, ৫০% ভাগ মিশ্র রক্তেব লোক এবং বাকী ৩০% ভাগ ধর্মান্তরিত অধিবাসী।

The Census Report of India (1905) by E. A. Gait, Vol. VI, 1902, P. 261.

মুহম্মদ আবদুব বহিম প্রমাণ করাব চেষ্টা কবেছেন যে, মধ্যযুগে বাঙালি মুসলমানের ৩০% ভাগ বহিরাগত বংশধর, ৭০% ভাগ স্থানীয় হিন্দু, বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত। তাঁর মতে, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি প্রথার কারণে দ্রুত বংশবৃদ্ধি দ্বারা বহিরাগত মুসলমানের সংখ্যা উক্ত ৩০% ভাগে দাঁড়ায়। ধর্মান্তবিত মুসলমানের মধ্যে প্রায় সমপরিমাণ অভিজাত ও নিম্নবর্ণের হিন্দু-বৌদ্ধের বংশধর আছে।

Social and Cultural History of Bengal (Vol., 1200-1757), Dacca, 1961.

২৪. *The Origin of the Musalmans of Bengal*, PP. 12-22.

২৫. মোঘল আমলে একটি সুবাহ বা প্রদেশের শাসনপ্রণালী ছিল এরূপ : "প্রতি সুবাহ বা প্রদেশে মোঘল বাদশাহগণ দুজন প্রধান প্রশাসক নিযুক্ত করতেন—একজন ছিলেন নাজিম, অপরজন দিওয়ান। নাজিম ছিলেন বাদশাহের প্রতিনিধি বা প্রদেশপাল। তিনি ছিলেন শাসনকর্তা ও সামরিক প্রধান ; তিনি ফৌজদারী বিচার পরিচালনা করতেন। দিওয়ান সরাসরি বাদশাহের অধীনস্থ ছিলেন, প্রদেশের

দেশীয় লোক নিয়োগ করতেন ; মুর্শিদকুলী খাঁর আমলে জমিদারি প্রথা চালু হয়, তাতে স্থানীয় হিন্দু জমিদারের সংখ্যা বেশি ছিল, পরবর্তীকালেও এর ব্যতিক্রম হয়নি।[২৬] সেনাবিভাগে ও বিচারবিভাগে একচেটিয়া মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল। সিরাজদ্দৌলার সময়ে সেনাবিভাগে মীরমদন, মোহনলাল উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। রাজবল্লভ ঢাকার এবং নন্দকুমার হুগলীর স্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন। সৈন্য-সামন্ত পরিবেষ্টিত হয়ে রাজা দুর্গ অথবা রাজপ্রাসাদে আবদ্ধ থাকতেন, জমিদারগণ নিজ দায়িত্বে রাজকোষে রাজস্ব পৌঁছে দিতেন, তাঁরা রাজদরবারে সম্মান পেতেন না। জমিদারগণ নিজ এলাকায় রাজতুল্য আচরণ করতেন, প্রজার সাথে সম্পর্ক ছিল প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক। নবাব নাজিম, আমীর-ওমরাহ তথা শাসক শ্রেণী প্রজাদের নিতান্ত তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, কৃষক-শ্রমিক, মাঝি-মাল্লা, জেলে-জোলা, ডোম-চণ্ডাল সমানভাবে অবহেলিত, শোষিত, নিপীড়িত, বঞ্চিত সর্বহারা শ্রেণীভুক্ত ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি যেরূপ নবাব, আমীর-ওমরাহ্ ও পদস্থ রাজপুরুষদের সরিয়ে ইউরোপীয়দের নিয়োগ করেছিলেন, দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদী সরকারও সেরূপটি করেছিলেন। ইংরাজগণ নেটিভদের প্রথমে চাকুরী দিয়েছেন দোভাষী, কেরানী, সরকার, গোমস্তা, মুৎসদ্দী, দেওয়ান, পণ্ডিত, মুনশী প্রভৃতি অধস্তন পদে। ১৮৪৪ সালের আগে পর্যন্ত প্রশাসন বিভাগে কোন দেশীয় ব্যক্তি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের চাকুরী পাননি, এটা ইংরাজ রাজত্বের একশ বছর পরের কথা। মুসলমান আমলে মধ্যস্বত্তভোগী মধ্য ও নিম্ন বিত্তের একটি শ্রেণী ছিল প্রশাসন, রাজস্ব, বিচার ও সেনাবিভাগের সঙ্গে যুক্ত অধস্তন কর্মচারী এবং ছোটখাটো ব্যবসাদার হিসেবে। কোতোয়াল, কয়াল, কলমচি, কাগজি, খাজাঞ্চি, খালাসী, খানসামা, খাসনবিশ, গোমস্তা, চঙ্গদার, চাপরাশি, চৌকিদার, জমাদার, জলবাস, ডিহিদার, তবকচি, তবলচি, তহশিলদাব, তালুকদার, দফাদাব, দরজি, দস্তিদার, দারোগা, দালাল, নকিব, পাইক, পেয়াদা, পোদ্দার, পেশকার, বরকন্দাজ, বাবুর্চি, বিলদার, ভিস্তি, মশালচি, মুনশী, মহলানবিশ, মুহুরী, মোক্তার, মোল্লা, শরফ, শিকদার, সবকার, সারেঙ্গ, সেরেস্তাদার, হাওলাদার ইত্যাদি পদবীর চাকুরীতে বহিরাগতদের সাথে দেশীয় ব্যক্তিরাও সুযোগ

নাজিমের সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল স্বাধীন। তিনি অর্থমন্ত্রীর দাযিত্ব পালন কবতেন এবং রাজস্ব সংক্রান্ত শাসন ও দেওযানী বিচাব বিভাগ পবিচালনা কবতেন। সুতবাং প্রদেশের প্রশাসনযন্ত্রে সম্পূর্ণ দুটি স্বাধীন চক্র ছিল। নাজিমের অধীনে যাঁবা কাজ করতেন তাঁবা হলেন নাযেব-নাজিম, সেবলস্কর, ফৌজদার, কোতোয়াল এবং থানাদাব (দারোগা)। দিওযানের অধীনে বিচার বিভাগে ছিলেন কাজী-অল-কুজ্জাত (প্রধান বিচারপতি), কাজী, মুফতি, মীর আদল ও সদর এবং রাজস্ব বিভাগে ছিলেন নায়েব (স্থানীয় দিওয়ান), আমিল, শিকদাব, কারকুন, কানুনগো ও পাটোয়াবী। অনেক সময় ফৌজদাবী ও দেওয়ানী বিচার বিভাগ নাজিম ও দিওয়ান উভয়ের প্রভাব মুক্ত হয়ে সবাসরি কেন্দ্রের বিচাবপতি সদর-ই-জাহান বা আইনমন্ত্রীব অধীনস্থ হত। সদব-ই-জাহান তাঁব আচরণমালার জন্য স্বযং বাদশাহেব নিকট দায়ী থাকতেন।”

.Abdus Salam, --*The Riaz-us-Salatin* by Ghulam Hosain Salim, (English translation), Baptist Mission Press, Calcutta 1904, P. 6 (fn).

২৬. সিরাজদ্দৌলার সময়ে বড় জমিদারের মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিল ২০ এবং হিন্দুর (আর্মেনিয়াসহ) সংখ্যা ছিল ১৭৩ ; উভয়ের হার যথাক্রমে ১১% এবং ৮৯.%

Abdul Khair Nazmul Karim--*The Modern Muslim Political Elite in Bengal* (Doctoral Thesis University of London, unpublished), 1964, P. 78.

পেতেন। ইতিহাস গ্রন্থ, মধ্যযুগের সাহিত্য, পর্যটকদের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত ইত্যাদি রচনায় এদের কিছু না কিছু পরিচয় পাওয়া যায়। মুকুন্দরাম 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে নতুন নগর পত্তনে যেসব লোকের বসতির কথা বলেছেন, তাতে এ শ্রেণীর অনেক এবং আরও নতুন পদবীর লোকের কথা আছে। এসব চাকুরীতে সুযোগ পাওয়ার প্রবণতা ধর্মান্তর গ্রহণের একটা কারণ হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু সে-সংখ্যা কত? ইসলামের দৃষ্টিতে মানুষে মানুষে ভেদ নেই—মনুষ্যত্ব ও সাম্যবাদের এই আবেদনের এবং সামাজিক বন্ধনমুক্তির আশ্বাসের বশবর্তী হয়ে সাধারণ শ্রেণীর মানুষ ইসলাম গ্রহণ করেছে। তারা 'কলেমা' বা দীক্ষামন্ত্র পাঠ করে মুসলমান হয়েছে, কিন্তু রাজপুরুষের সংস্কৃতি পায়নি। তারা পূর্বপুরুষের ভাষা-সংস্কৃতি, আচার-সংস্কার রাতারাতি পাল্টাতে পারেনি। পীর-দরবেশগণ দীক্ষা দিয়ে ভক্তের সংখ্যা বাড়িয়েছেন, এবং তাদের দান-খয়রাত করেছেন, কিন্তু এর বেশি অন্য সুযোগ করে দিতে পারেননি। মসজিদ-মক্তব-মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল, সে-শিক্ষা ধর্মীয় আচার পালনের রীতিনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, উচ্চ শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষার ব্যবস্থা দুর্লভ ছিল। সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করে বাংলার সাধারণ মুসলমান যে সমাজ ও সংস্কৃতিগতভাবে আলাদা কোন চরিত্র লাভ করেছিল, ইতিহাসে তার বেশি প্রমাণ পাওয়া যায় না। পীরপূজা, কবরপূজা, মানত মানা, দরগাহ বানান, তাজিয়া নিয়ে শোভা যাত্রা করা, মার্সিয়া গাওয়া, মনসা-শীতলাব উদ্দেশ্যে ভোগ দেওয়া, যাত্রা-মেলাদিতে অংশ গ্রহণ করা, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করা, বিবাহাদিতে লৌকিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করা ইত্যাদি কুসংস্কার ও বীতিনীতি মুসলমান সমাজে প্রচলিত ছিল তার ভুরিভুরি প্রমাণ আছে। এসব আচরণ গ্রামের মানুষের মধ্য থেকে আজও তিরোহিত হয়নি। বাংলাদেশে ইসলাম আসার ফলে বৈষয়িক, মানসিক, শিক্ষা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে কোন গুরুতর পবিবর্তন হয়নি বা বিপ্লব আসেনি, এটাই ধ্রুত সত্য। বাজার সংস্কৃতি, প্রজার সংস্কৃতি এক ছিল না ; রাজপুরুষের সংস্কৃতি প্রজাসাধারণ গ্রহণ করে। রাজকার্য পেতে হলে ফারসি শিখতে হত, ধর্মকর্মের জন্য আরবি শিখতে হত। ভাষা, ধর্ম, সাহিত্য ও জ্ঞান শিক্ষার মাধ্যমে আরব-ইরানের সংস্কৃতি বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ঐসব দেশের ইতিহাস, কাহিনী, ভাবধারা নিয়ে বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়েছে। রাজপুরুষদের মধ্যে যারা স্থায়িভাবে বসবাস স্থাপন করেছেন, তাঁরা দেশীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করেছেন। সৈয়দ সুলতান, সৈয়দ আলাওল, কাজী দৌলত, সৈয়দ মর্তুজা, শেখ ফয়জুল্লাহ, মাগন ঠাকুর প্রমুখ মুসলমান কবি আরবীয়-ইরানীয় এবং দেশীয় ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে কাব্যচর্চা করেছেন। এঁরা কেউ কেউ রাজপুরুষ ছিলেন। হোসেন শাহ, বাবরক শাহ, পরাগল খান, ছুটি খান রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ কার্যে হিন্দু কবিদের উৎসাহিত করেছেন। ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের নবাবেরা ঘটা করে মহররম উৎসব, বেরা উৎসব ও দীপালী উৎসব পালন করতেন। মীরজাফর মৃত্যুকালে হিন্দুদেবীর পাদোদক পান করেছিলেন।[২৭] ফকির সম্প্রদায়ের লোকেরা ধর্মাচরণে দেশীয় রীতিনীতি পালন করত। পটুয়া ও বেদেরা

২৭. Kalikinkar Dutta--*Studies in the History of the Bengal Subah*, Calcutta 1936, P. 95

নিজেদের অর্ধ মুসলমান অর্ধ হিন্দু বলে পরিচয় দিত। সুতরাং কি ধর্ম, কি সংস্কৃতি ও অন্যান্য বিষয়ে হিন্দু-মুসলমানে একটা সমন্বয় সাধিত হয়েছিল।

ইসলাম ধর্ম মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর মূল নিয়ন্ত্রক। ইসলামে নীতিগতভাবে বর্ণবৈষম্যহীন ব্যবস্থার নির্দেশ থাকলেও, বাস্তবক্ষেত্রে তা প্রতিপালিত হয়নি। আরব রাষ্ট্র প্রথম চারজন খলিফা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন, কিন্তু তার পরপরই বংশগত রাজতন্ত্রের প্রথা চালু হয়। ক্রমে উম্মিয়া, আব্বাসীয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষ খিলজি, তুঘলক, ঘোরি, মামলুক, শূর, মোঘল প্রভৃতি রাজবংশ রাজত্ব করেন। বাংলাদেশেও ঐসব বংশের প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। রাজা প্রজার দণ্ডমুণ্ডের মালিক ; রাজার স্বার্থে প্রজার স্বার্থ—রাষ্ট্রের শাসন কাঠামোয় সাম্রাজ্যবাদী এই নীতি পুরোপুরি বহাল ছিল।

বাংলা তথা ভারতের নবগঠিত মুসলমান সমাজ-কাঠামোর মধ্যে ভারতীয় বর্ণবৈষম্যবাদ তিরোহিত হয়নি। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বা রক্ত ভিত্তিক চতুর্বর্ণের ভেদরীতি কেবল নাম পাল্টিয়ে আশরাফ, আতরাফ, আজলাফ, আরজল প্রভৃতি নাম গ্রহণ করেছে।[২৮] সমাজের মানুষের মধ্যে এই শ্রেণীভেদ প্রধানত 'খানদান' বা রক্তধারা দিয়ে নির্ণীত হয়েছে। বিত্ত ও বিদ্যা সমাজস্তর গঠনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। সৈয়দ, শেখ, মোঘল ও পাঠান প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত বংশের মুসলমানরা নিজেদের আশরাফ বলে পরিচয় দেন। মহম্মদের বংশধর সৈয়দ, আসহাব বা মহম্মদের অনুসরণকারীদের বংশধর শেখ, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের অধিবাসীরা পাঠান ও মোঙ্গলীয় রক্তধারার লোকেরা মোঘল নামে পরিচিত। সৈয়দ বংশজাত লোকেরা হোসাইনি, রিজভি, নকভি, ইসমাইলি, বোখারি, কিরমানি প্রভৃতি এবং শেখ বংশজাত লোকরা সিদ্দিকী, ফারুকী, আব্বাসী ইত্যাদি পদবী ব্যবহার করেন। ধর্মীয় নেতাগণ শাহ, খোন্দকাব উপাধি ব্যবহার কবতেন। পাঠানেরা খান, শূর প্রভৃতি এবং মোঘলরা মীর্জা, বেগ, মীর, মল্লিক, লস্কর প্রভৃতি উপাধি ধারণ করতেন।[২৯] এগুলি পেশাগত উপাধি ছিল। কাজী ও চৌধুরী উক্ত চার শ্রেণীর

২৮. চতুর্বর্ণ প্রথমে পেশা বা কর্মভিত্তিক ছিল। শক, হূণ, গ্রিক প্রভৃতি বিদেশী শক্তির আক্রমণের ফলে ভারতের সমাজব্যবস্থায় ভাঙন ধরেছিল। সপ্তম শতকে মনু সমাজ-কাঠামো রক্ষার এবং একটা শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্য ঐরূপ কর্মের ভিত্তিতে সমাজের মানুষেব শ্রেণীকবণ করেন। পরে এটি কৌলিক ভেদপ্রথায় রূপান্তরিত হয়। এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীব মানুষের সামাজিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানা প্রকার বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। শরিফ (আরবি) শব্দের অর্থ পবিত্র, মান্য ; শরিফের বহুবচন আশরাফ ; অনুরূপ 'তরফ (শ্রম) শব্দজাত আতরাফ ; 'জিলফ' (নীচ) শব্দজাত আজলাফ 'রজীল' (ইতর) শব্দজাত আরজল।

F Steingass (edited)--*Persian-English Dictionary*, London 1954 (4th edition).

২৯. ১৮৯১ সালে সেন্সাস রিপোর্টে মোট ২০টি 'উপাধি'র উল্লেখ আছে : অক্ষরানুক্রমিক সাজালে সেগুলির নাম হয় আখন্দজি, আতরাফ, খান, গাইন, গাজী, চৌধুরী, দফাদার, দেওয়ান, নায়ক, পাঠান, বিশ্বাস, বেগ, মীর, মীর্জা, মোঘল, শেখ, শানা, সরদার, সৈয়দ ও হাজরা।

Census of India., 1891. Vol.V(Lower Provinces of Bengal and their Feudatories), Calcutta 1893, P. 17.

সকলেই পেশা অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারতেন। শেখ, খান, মালিক প্রভৃতি পদবী ধর্মান্তরিত ব্যক্তিগণ সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী গ্রহণ করতেন।[৩০] এঁরা রাজপদ, ধর্মচর্চা, শিক্ষাদান প্রভৃতি শ্রমহীন কাজে নিযুক্ত হতেন। আশরাফ বা অনভিজাত শ্রেণীর লোকদের আতরাফ ও আজলাফ বলা হয়। তাদের 'খানদান' উচ্চবংশীয় ছিল না। তাদের প্রধান কাজ ছিল কায়িক শ্রম। কর্ম অনুযায়ী তাদের মান-সম্মানের ও সামাজিক মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত ছিল। যারা কৃষিকর্মে নিযুক্ত ছিল, তারা নিজেদের জোলা, তাঁতি, দর্জি প্রভৃতি অপেক্ষা বড় মনে করত। জোলা, দর্জি শ্রেণীর লোকেরা আবার জেলে, মাঝি-মাল্লা, কলু কসাই, কামলা, খালাসী, ধুনারী প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের অধস্তন মনে করত। আরও নিম্নমানের পেশার লোক ছিল যেমন মুচি, দফালি, হাজ্জাম ভাট, ধোবি, ঘেসেড়া, নাট, বাদিয়া প্রভৃতি। আতরাফের মধ্যে এদের স্থান ছিল সর্ব নিম্নে। ভাঙ্গর, মেহতর, কসবি, হিজরা, মাঙ্গতা প্রভৃতি যারা অতি নীচু স্তরের পেশায় নিযুক্ত ছিল, তারা আরজাল বা ইতব শ্রেণী রূপে গণ্য হত।[৩১] হিন্দু নিম্ন স্তরের শূদ্রদের পেশার সাথে এদের পেশার মিল ছিল। সাধারণত আতরাফ আজলাফ ও আরজল শ্রেণীব লোকদের ধর্মান্তরিত দেশীয় অধিবাসী হিসাবে গণ্য করা হত। ঐসব বৃত্তিধারী মানুষ কমবেশি হিন্দু সমাজেও বিদ্যমান ছিল, উচ্চ বংশীয় হিন্দু-বৌদ্ধগণ শেখ নাম ধাবণ করে আতরাফ শ্রেণীভুক্ত হতেন। আবার মোঘল-পাঠানদের মধ্যে কিছু শ্রেণীর লোক নিম্নমানের পেশায় নিযুক্ত হয়ে আতরাফ-আজলাফ বলে পরিচিত হত। বলা বাহুল্য, এদের মধ্যে লেখাপড়া বা সংস্কৃতি চর্চা ছিল না। এদের রুচিবোধ ও নৈতিকবোধ নীচু স্তরের ছিল, দারিদ্র্য ছিল নিত্য সঙ্গী।

সামাজিকভাবে মেলামেশা, বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন এবং আহার-বিহারের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীভেদ কোন কোন অঞ্চলে কঠোরভাবে পালন করা হত। 'অনুলোম' পদ্ধতির বিবাহ কোথাও কোথাও হলেও 'প্রতিলোম' পদ্ধতির বিবাহ সামাজিকভাবে অচল ছিল। বিত্তবান গৃহস্থ ঘরের কন্যা বিত্তহীন আশরাফগণ গ্রহণ করতেন, কিন্তু আশরাফগণ কোন অবস্থায়

৩০ *The Origin of the Musalmans of Bengal*, PP. 101-02

৩১ ১৮৯১ সালেব সেন্সাস বিপোর্টে মুসলমান সমাজে মোট ১০২টি পেশাজীবী মানুষেব উল্লেখ আছে, সেগুলি হল : আবদল, বাদ্যকব, বাজিকর, বকলি, বাখো, বোবহি, বোরজিব, বেহারী, বেপাবি, বেসাতি, বেশ্যা, ভণ্ড, ভাট, ভাতিয়াবা, ভিস্তি, চামাব, চৌধুবী, চৌকিদাব, ছিপিগড়, চিক, চিত্রকব, চুণাবি, চুরিহব, দফালি, দহিযারা, দাই, দালাল, দপ্তবি, দর্জি, ধবি, ধাওয়া, ধোপা, ধুনিয়া, ফকির, ফেরুশ, গদি, গজনবি, গোলাম, হাজ্জাম, হিজড়া, গোলদাব, গোয়ালা, ঝাড়ুদার, জোলা, জোতদার, খয়াজি, কাহার, কলাল, কলু, করদার, কাবিগর, কসাই, কসবি, কাজি, খোজা, খোন্দকার, কুসিয়াবা, লাহেবি, মহলদার, মাহিফেরুস, মালা, মাল-বৈদ্য, মালী, মালিক, মণ্ডল, মাঝি, মশালচি, মৌলবী, মেহতর, মেওয়াফেরুস, মিরিয়াসি, মিস্ত্রি, মৃধা, মুকেরি, মোল্লা, মুনশী, নগরচি, নলবানধ্, নলিয়া, নিকারি, নূরবাফ, পাসি, পাটনি, পটুয়া পাটুরিয়া, পাওয়ারিয়া, পেসকার, রঙ্গরেজ, রসুয়া, সাজগার, সরকাব, সাইন, শিকলগর, শিকারী, সিনলি, সোরিয়া, তরফদাব, তকলিহর, তুতিয়া। বিদেশী শাসককৃত তালিকায় কিছু কিছু ত্রুটি থাকতে পারে, তবে বেশির ভাগ পেশাজীবী মানুষের অস্তিত্ব ছিল।
Census of India, 1891, Vol. IV, PP. 17-19.

কৃষক, জেলে, জোলার ঘরে কন্যার বিবাহ দিতেন না। এতে খানদানের অবমাননা হত, এটাই সংস্কার ছিল। তবে বিত্তবান ও প্রভাবশালী আতরাফগণ বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে সামাজিকভাবে উচ্চ মর্যাদার অধিকারী হতেন। মীর মশাররফ হোসেনের আত্মজীবনীতে দেখা যায়, তাঁর পিতামহ মীর ইব্রাহীম হোসেন এক মলঙ্গ ফকিরের কন্যাকে বিবাহ করেছিলেন। স্বয়ং মশাররফ হোসেনের দ্বিতীয় বিবাহিতা স্ত্রী কুলসুম বিবি ছিলেন এক দরিদ্র কৃষককন্যা। মীর পরিবারের কোন কন্যার বিবাহ নিম্ন বংশের কোন ঘরে দেওয়া হয়নি।[৩২] পাদরী জেমস লঙ বলেছেন যে, আরজল বা নীচ শ্রেণীর লোকেরা মসজিদে প্রবেশ করতে এবং সাধারণ গোরস্থানে মৃতদেহ দাফন করতে পেত না।[৩৩]

অবশ্য মুসলমান সমাজের এই শ্রেণীভেদ প্রথা হিন্দু সমাজেব জাতিভেদ প্রথার মত বিধি-নিষেধের কঠোর প্রাচীর হয়ে দাঁড়ায়নি। হিন্দু সমাজে এক বর্ণ থেকে অন্য বর্ণের মধ্যকার বাধা বা দূরত্ব দুর্ভেদ্য ও দূরতিক্রম্য। ধর্মের দিক থেকে সামাজিক শ্রেণী বিচারে বিধিনিষেধ না থাকায়, মুসলমান সমাজে জাতিভেদ প্রথা সর্বত্র অটুট বা অলঙ্ঘনীয় ছিল না। নিম্ন শ্রেণী থেকে উচ্চ শ্রেণীতে ওঠার পথ অবরুদ্ধ ছিল না। এক শ্রেণীর মানুষ বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি সাধন করতে পারলে উপরের তলায় উঠে যেতে পারত এবং আশরাফের সমমর্যাদার অধিকারী হত। মুসলমান সমাজে প্রচলিত দুটি প্রবাদের উল্লেখ করা যেতে পারে যেখানে জাতিভেদের শিথিল বাঁধনের রূপটি ধরা পড়ে :

(১) আগে থাকে উল্লা তুল্লা শেষে হয় উদ্দীন,
তলের মামুদ উপরে যায় কপাল ফেরে যদ্দিন।

(২) গত বছর আমি একজন 'জোলা' ছিলাম, এ বছব আমি একজন 'শেখ',
আগামী বছর ভাল দব পেলে আমি একজন 'সৈয়দ' হব।[৩৪]

উভয় স্থলে আর্থিক উন্নতিব দ্বারা সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে। হিন্দু সমাজে এক বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন ছাড়া সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধির অন্য কোন উপায় ছিল না। সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান ইত্যাদি শ্রেণীভেদের ধর্মীয় ভিত্তি ছিল না, মুসলমান দেশগুলিতে এ ধরনের ভেদাভেদের কোন সামাজিক তাৎপর্য নেই। ভারতে হিন্দু সমাজের জাতিভেদের প্রভাবেই নিতান্ত কৃত্রিম এই শ্রেণীভেদের উদ্ভব হয়েছে। জে. ডি. কানিংহাম

৩২. দেবীপদ ভট্টাচার্য (সম্পাদিত)— *আমাব জীবনী,* কলিকাতা, ১৯৭৭

৩৩. Rev James Long--*An Introduction to the Sociology of Islam*, 1931-33, P. 104.

৩৪. দ্বিতীয়টি প্রাচীন হওয়া সম্ভব, ফাবসিতে এব একটি রূপ পাওয়া যায় :

পেশ আজ ইন কাসাব বুঁদে
বাদাজান গুশতেঁ শৈখ
ঘালা চুঁ আবজান শাওয়াদ
ইস সাল সৈযদ মেশাওযেঁ।

অর্থ—প্রথম বছর আমবা কসাই ছিলাম, পরের বছর শেখ, বর্তমান বছরে যদি দাম পাই তবে আমবা সৈয়দ হব।

The Modern Muslim Political Elite in Bengal, P. 189.

মন্তব্য করেন, "The Mahametans of India fancifully divided themselves into classes after the manner of Hindus, viz, Syeds, Shekhes, Moughls and Pathans".[৩৫]

ধর্মরীতি ও মতবাদের ঈষৎ পার্থক্যের ভিত্তিতে বিশ্বের মুসলমানের মত ভারতবর্ষের মুসলমানের মধ্যেও দুটি প্রধান সম্প্রদায় আছে—শিয়া ও সুন্নি। উভয়ে তৌহিদবাদে বিশ্বাসী এবং মহম্মদের নবীত্বে আস্থাবান ; তাদের মূল বিরোধ 'ইমামতি' বা 'খলিফাত্ব' নিয়ে। সুন্নিগণ ধর্মগুরু হিসাবে 'খলিফায়ে বাশিদিন' বা চার খলিফার নেতৃত্ব স্বীকার করেন ; চার খলিফা হলেন হজরত আবু বকর, হজরত ওমর, হজরত ওসমান ও হজরত আলী। শিয়াগণ মনে করেন একমাত্র হজরত মুহম্মদের বংশধরেরই 'ইমাম' (আধ্যাত্মিক গুরু) হওয়ার অধিকার আছে, সেই সূত্রে হজরত মহম্মদের জামাতা ও পিতৃব্যপুত্র হজরত আলী এবং দৌহিত্র ইমাম হাসান ও ইমাম হোসেন ইমাম হওয়ার যোগ্য। এই মতভেদের কারণে হজরত আলী আততায়ীর হাতে নিহত হন, ইমাম হাসান বিষপ্রয়োগে ও ইমাম হোসেন কারবালার যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করেন। এর সবটার মূলে ষড়যন্ত্র ছিল। শিয়াগণ কারবালার বিষাদময় ঘটনাকে স্মরণ করে মহরমের শোকোৎসব পালন করে। সুন্নিগণ মহরমেব তাজিয়া, দরগাহ, মর্সিয়া, নকল মকবেরা, দুলদুল ইত্যাদি আচার পদ্ধতির বিরোধী। তারা দোয়া, দরুদ, নামাজ, দান-খয়রাত ইত্যাদি রীতিতে মহরমের শোক দিবস পালনের নির্দেশ দেয়। ইবান ও আফগানিস্তানে শিয়া এবং তুরস্ক ও ভারতে সুন্নিদের প্রভাব বেশি। ১৮৭২ সালেব সেন্সাস রিপোর্টে বৃহৎ বাংলার সুন্নি ও শিয়ার সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ২০,৯৬৪,৬৫৭ ও ২৬২,২৯৩ জন। উভয়ের অনুপাত ৮০ : ১। রংপুর, দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ এবং হুগলীতে শিয়ার সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশি ছিল। সুন্নিগণেব সংখ্যা সর্বত্রই বেশি ছিল।[৩৬] উল্লেখ করা যেতে পারে যে বাদশাহ হুমায়ুন ইরানের সহযোগিতায় দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার কবেছিলেন। তখন থেকে ভারতবর্ষে শিয়াদের আগমন ঘটে। বাংলায় নিযুক্ত মোঘল রাজপ্রতিনিধি ও কর্মচারীদের মাধ্যমে এদেশে শিয়াদের প্রভাব পড়ে।

সুন্নিগণ চারজন বড় শাস্ত্রকারের ব্যাখ্যার অনুসারী হিসেবে চারটি মজহাবে বিভক্ত যথা—হানাফি, মালেকি, সাফি ও হাম্বেলি। তাঁরা ধর্মপালনের 'তরিকা' বা পথ এবং সমাজ গঠনের 'আহকাম' বা পদ্ধতিব চুলচেরা বিবরণ বিশ্লেষণ করে গেছেন। ধর্মীয় ও সামাজিক আইনসমূহ তাঁদের ব্যাখ্যার ভিত্তিতে রচিত হয়েছে। কোথাও কোথাও সামান্য মতভেদ ছাড়া তাঁদের মতের মধ্যে বিরোধ ছিল না।

ালামে শরীয়ত ও মারিফত নামে ধর্ম পালনের দুটি ধারা প্রচলিত আছে। হাদিস ধর্ম পালনের যে রীতিনীতির বিবরণ আছে, সেই অনুযায়ী একেশ্বরে বিশ্বাস এবং

J D Cunningham--*A History of the Shikhs*, 1903-31
Report on the Sensus of Bengal, 1872, P. 81.

তাঁর উপাসনা করার নাম শরীয়ত মত। এটা শুষ্ক জ্ঞানবাদের ধারা। মারিফত হল অধ্যাত্মমুখী সাধন-ভজনের মত ও পথ। শরীয়ত মতে সৃষ্টিকর্তা ও সৃষ্ট জীবের মধ্যে দ্বৈত সম্পর্কের কথা বলা হয়। মানুষ উপাসনার দ্বারা পুণ্য অর্জন করে মৃত্যুর পর স্বর্গবাসী হবে। মারিফতপন্থীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে অদ্বৈত সম্পর্কের কথা বলে। 'জিকর' বা আরাধনার মাধ্যমে মানুষ কামেল ইনসান বা 'পূর্ণ মানবে' পরিণত হতে পারে। তখন ঈশ্বরের সাথে তার সম্পর্ক দ্বৈতাদ্বৈত রূপ লাভ করে। সুফী সাধকগণ এই মতের ধারক। সুফীরা মধ্যস্থ হিসাবে পীর বা মুর্শিদকে মান্য করে। এই পীরবাদ হিন্দু গুরুবাদ ও বৌদ্ধ থেরবাদের অনুরূপ। হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের দেহসাধনার বিষয়ও সুফিসাধনায় গৃহীত হয়েছে। মুরিদ মুর্শিদের নির্দেশে নাসূত, মালকুত, জবরুত ও লাহুত এই চারটি স্তর পরম্পরায় সাধনা করবেন, সাধনায় সফল হলে তিনি সিদ্ধপুরুষ তথা 'পূর্ণ মানবে' পরিণত হবেন। এই তত্ত্ব থেকে 'আশিক-মাশুকে'র তত্ত্ব এসেছে। ঈশ্বর মাশুক অর্থাৎ প্রেমের পাত্র এবং মানুষ 'আশিক' বা প্রেমিক। প্রেম সাধনার দ্বারা ভক্ত বা মুরিদ ঈশ্বরে লীন হতে পারেন। ঈশ্বরে প্রেমলীনতার নান 'ফানাফিল্লাহ'।[৩৭] তখন মুর্শিদ-মওলায় কোন তফাৎ থাকে না। সুফীরা দেহসাধনা অথবা অধ্যাত্মসাধনা উভয় পদ্ধতিতে আল্লাহর আবাধনা করতে পারে। বিখ্যাত সুফী সাধক মনসুর হল্লাজ 'আনাল হক' বা 'আমি ঈশ্বর' এই তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন। ঈশ্বর সত্য, আমি সত্য, অতএব আমিই ঈশ্বর এই পদ্ধতিতে তিনি ঐ তত্ত্বে উপনীত হয়েছিলেন। এই তত্ত্বের জন্য তিনি শরীয়ত পন্থীদের হাতে প্রাণ হারান। জ্ঞানসাধনা ও অধ্যাত্মসাধনা উভয় ধাবা হজরত মহম্মদের মধ্যে ছিল। তিনি হজরত আলীকে অধ্যাত্মবাদের গুপ্ত সাধনার কথা বলে যান।[৩৮] সেই ধারণা থেকে আরবে অধ্যাত্মসাধনার উদ্ভব হয়েছিল। পরে এটি ইরানের সুফী সাধকদের দ্বারা সুগঠিত ও সম্প্রচারিত হয়। সেখান থেকে সুফীমত ভারতভূমিতে বিস্তার লাভ করে। বাংলার ইসলাম প্রচারক পীর-দরবেশগণ এই সুফীমতের ধারক ছিলেন। বাংলার মাটি ও আবহাওয়া যেমন নরম, বাঙালির মনও তেমনি আবেগপ্রবণ ; এই আবেগপ্রবণ মনোভূমি সুফীমতের উত্তম ক্ষেত্র। ইরানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাথে বাংলার সবুজ শ্যামলিম প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মিল আছে। এজন্য পীরবাদী মারিফত ধারার প্রভাব বাংলাদেশে বেশি পড়েছে। এছাড়া গুরুবাদ ও থেরবাদের স্রোত, নাথ, বৌদ্ধ সাধনার মধ্য দিয়ে পূর্ব হতেই প্রবাহিত ছিল। এজন্য সুফীমত অবাধে প্রচার লাভ করেছে। এম. টি. টাইটাসের অভিমত, "In fact, it was through Sufism that Islam really found a point of contact with

৩৭ পূর্বোক্ত, *বাংলা সাহিত্য পত্রিকা*, ১৩৭৫

৩৮ 'এই মহাত্মা (হজরত আলী) মুসলমানদিগেব আধ্যাত্মিক মহাধর্মগুরু। প্রেরিত মহাপুরুষ (হজরত মহম্মদ) প্রধানতঃ ইহাকেই পাবমার্থিক বিদ্যায় সুশিক্ষিত কবতঃ আধ্যাত্মিক বিষয়ে স্বীয় স্থলাভিষিক্ত করিয়াছিলেন। পৃথিবীব প্রায় সমুদয় তাপসমণ্ডলীই ইঁহার পদানুসরণ করিয়া, পরমার্থ জ্ঞান লাভ করিয়াছেন।"
আলাউদ্দীন আহমদ—*উপদেশ-সংগ্রহ*, কলিকাতা, ১৮৯৪, পৃ: ৮ (পাদটীকা)।

Hinduism and an effective entrance to Hindu hearts".”[৩৯] তিনি আরও বলেছেন, “It (Sufism) is rather a natural revolt of human heart against the cold formalism of a ritualistic religion.”[৪০] মরমীয়াবাদের সাথে এই মানবতাবাদের সংমিশ্রণ ছিল বলে সুফীমত মানুষের হৃদয় জয় করেছে। বাংলাদেশে সতের শতকের পর থেকে বেশরা ফকিরী বা বাউলমত গড়ে ওঠে, তা এই সুফীমতেরই পরিবর্তিত লোকায়ত রূপ। শাস্ত্রজ্ঞান বর্জিত লোকেরা নানা প্রকার লৌকিক আচার-সংস্কারের সঙ্গে লোকশ্রুত সুফীমতের মিশ্রণ ঘটিয়ে বাউলমতের সৃষ্টি করে। তাই বাউল মতবাদ লোকধর্ম, শাস্ত্রধর্ম নয়। সমাজের একটি অংশে বাউলদের প্রভাব পড়ে, সর্বত্র পড়েনি।

হানাফি প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোকেরা পীরবাদী সুফীসাধনাকে গ্রহণ করেন। সুফীবাদে পীর-গুরুর প্রাধান্য বেড়ে যাওয়ায় ক্রমে তাঁদের মাজার-মকবেরা-দরগাহ-আস্তানাহ নির্মাণ করে তাতে শিরনি, মানত, ধূপধূনা দেওয়া, জিয়ারত করা, উরস পালন করার রীতির উদ্ভব হয়। এসবেব বিরুদ্ধে আরবের আবদুল ওহাব (১৭০৩-৯২) আঠার শতকে ধর্মসংস্কার আন্দোলন করেন। তিনি কেবলমাত্র কোরান ও হাদিসের নির্দেশ মত নিয়মতান্ত্রিক ধর্ম পালনের মতবাদ প্রচার করেন। আবদুল ওহাবের আন্দোলনের আদর্শ বহন করে ভারতবর্ষে প্রথম ধর্মসংস্কার আন্দোলন করেছিলেন রায়বেরেলীর শহীদ সৈয়দ আহমদ (১৭৮৬-১৮৩১)। বাংলাদেশে ঐ আদর্শে আন্দোলন করেন ফরিদপুরেব হাজি শরীয়তুল্লা (১৭৬৪-১৮৪০) এবং পুত্র দুধু মিঞা (১৮১৯-১৮৬২)। প্রথমটি ‘ওয়াহাবী আন্দোলন’ এবং দ্বিতীয়টি ‘ফারায়েজী আন্দোলন’ নামে পরিচিত। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে উভয় আন্দোলন ব্যাপকতর আকাব ধারণ করে। উভয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল ‘ইসলামীকরণ’। ইসলামধর্মে ও মুসলমান সমাজে যেসব অনৈসলামিক রীতিনীতি রয়েছে, সেগুলি দূর করে শাস্ত্রের নির্দেশমত ধর্মকর্ম পালন করার কথা এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রচার কবা হয়। ফারায়েজীগণ হানাফীমতের বিরোধিতা করেননি, কিন্তু ওয়াহাবীগণ কোন মধ্যস্থ গুরু হিসাবে পীর-মুর্শিদের ভূমিকা মানতে চাননি। পিউরিটান মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তাঁরা শরা-শরীয়তমতে খাঁটি ইসলামে ফিরে যেতে চান। এঁদেবই একটি ‘স্কুলে’র নাম হয় ‘আহলে হাদিস’। এটিও উনিশ শতকের কথা ; মধ্যযুগ অবধি বাংলাদেশে কোন রকম ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়নি।

নবাব, সুলতান, আমীর-ওমরাহ অভিজাত শ্রেণী সংস্কৃতি চর্চার ভাষা হিসাবে ফারসি ব্যবহার করতেন। বাঙালি মুসলমান আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা করলেও কাব্যচর্চা করেছেন বাংলায়। হিন্দু লেখকগণ বাংলা ভাষায় সংস্কৃতের অনুবাদ, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবকাব্য, শাক্তসাহিত্য, নাথসাহিত্য ও জীবনী-সাহিত্য রচনা করেছেন ; সেই সঙ্গে সংস্কৃত ভাষারও চর্চা করেছেন তাঁরা। মুসলমান কবিগণ সুফীসাহিত্য, অনুবাদ সাহিত্য, রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান এবং সুফী-বৈষ্ণব ভাবমিশ্রিত পদাবলী রচনা করেছেন। শাহ মোহাম্মদ সগীর, জৈনুদ্দীন, শেখ কবির, দোনা গাজী চৌধুরী, সৈয়দ সুলতান, শেখ

৩৯ *M.T. Titus--Islam in India and Pakistan*, London, 1930.
৪০ Ibid.

ফয়জুল্লাহ, মোহাম্মদ খান, মাগন ঠাকুর, কাজী দৌলত, সৈয়দ আলাওল, আবদুল হাকিম, নওয়াজিস খান, মুজাম্মিল, সৈয়দ মর্তুজা, শেখ মুত্তালিব প্রমুখ কবি মধ্যযুগে বাংলা কাব্যচর্চা করেছেন। ধর্মসাহিত্য এবং ধর্মনিরপেক্ষ মানবকাব্য উভয় শ্রেণীর রচনা পাওয়া যায়। অনেকে আরবি-ফারসি থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছেন, অনেকে সংস্কৃত, হিন্দি-অবধী থেকে, আবার কেউ কেউ দেশীয় ঐতিহ্য থেকে ভাবধারা সংগ্রহ করেছেন। ধর্মশাস্ত্র বাংলায় রচনা করতে গিয়ে কোন কোন কবিকে জবাবদিহি দিতে হয়েছে। শেখ মুত্তালিব বলেছেন যে, 'মুসলমানী শাস্ত্রকথা' বাংলা ভাষায় রচনা করায় তাঁর 'বহু পাপ' হল। মোহাম্মদ জান 'নামাজনামা' গ্রন্থে বলেছেন যে, আরবি কথা বাংলা ভাষায় রচনা করলে 'সত্তর নবী বধে'র অপরাধ হবে। আবদুল হাকিম বাংলা ভাষা বিরোধী একটি শ্রেণীর মনোভাবের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, 'কর্মদোষে বঙ্গদেশে বাঙালি উৎপন।' কিন্তু বিরোধী দলের অভিযোগ উপেক্ষা করে তাঁরা বাংলায় কাব্য লিখতে প্রয়াসী হয়েছেন, তার প্রধান কারণ ছিল, আরবি-ফারসি অনভিজ্ঞ এদেশের সাধারণ শ্রেণীর মানুষের কাছে ঐ ভাষার সম্পদ পৌঁছে দেওয়া। সৈয়দ সুলতান লিখেছেন,

আরবী ফারসী ভাসে কিতাব বহুত।
আলিমনে বুঝে ন বুঝে মূর্খসূত॥
দুঃখ ভাবি মনে মনে করিলুং ঠিক।
রসুলেব কথা যথ কহিম অধিক॥ —শব-ই-মিরাজ

শেখ মুত্তালিবের উক্তি,

আরবীতে সকলে ন বুঝে ভাল মন্দ।
তে কারণে দেশী ভাষে রচিলু প্রবন্ধ॥
মুসলমানী শাস্ত্রকথা বাঙ্গালা করিলু।
বহু পাপ হৈল মোর নিশ্চয় জানিলু॥ —কিফায়িতুল মুসল্লীন

মোহাম্মদ কবিরের উক্তি,

পণ্ডিত জনার ঘিন্না মূর্খের গোহারি।
শিরে ধরি কাব্য কথা দিলুং সঞ্চারি॥
মোহাম্মদ কবিরে কহে ভাবিয়া আকুল।
কি জানি ডুবিব শেষে এই কূল অই কূল॥ —মধুমালতী

আরবি-ফারসি ধর্মশাস্ত্রের ও প্রেমোপাখ্যানের অনুবাদগুলিতে ইসলামী ভাবধারা, পদাবলী ও পীর-পাঁচালীগুলিতে ইসলামী ও হিন্দুয়ানী মিশ্রিত ভাবধারা এবং গোরক্ষ-বিজয়, বিদ্যাসুন্দর চন্দ্রাবতী প্রভৃতি আখ্যানকাব্যে হিন্দুয়ানী বিষয় গৃহীত হয়েছে। কোন কোন কবি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন এবং বাংলা ভাষা ও কাব্যরীতি উত্তমরূপে আয়ত্ত করেছিলেন। মাগন ঠাকুর, কাজী দৌলত, সৈয়দ আলাওল রাজসভার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। শাহ, সৈয়দ, শেখ উপাধিধারী কবিদের কৌলিন্য মর্যাদাও উচ্চ ছিল। সুফীমতের

চর্চা বেশি হয়েছে ; 'বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি'র সংখ্যা ছিল শতাধিক।[৪১] রাজা প্রজা উভয়ে তাঁদের রচনার পাঠক বা শ্রোতা ছিলেন। এক শ্রেণীর গোঁড়া মোল্লাদের বিরোধিতার কথা স্মরণে রেখেও নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, বাংলার মুসলমান সমাজ বাংলা ভাষাকে বর্জন না করে সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ করে নিয়েছিল। 'ইউসুফ-জোলেখা' প্রণেতা শাহ মোহাম্মদ সগীর গিয়াসউদ্দীন আজম শাহের (১৩৮৯-১৪১০) পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিলেন। সুতরাং পনের শতকের গোড়া থেকেই মুসলিম সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়। বাংলা 'রামায়ণ' রচয়িতা কৃত্তিবাস ঐ সময় আবির্ভূত হন। 'অমাত্য তনয়' আলাওল আরাকান রাজসভায় বসে ছয়খানি বাংলা কাব্য লিখেছেন ; প্রধান মন্ত্রী মাগন ঠাকুর, রাজমন্ত্রী সৈয়দ মূসা, সোলায়মান, সৈন্যমন্ত্রী সৈয়দ মহম্মদ ছিলেন তাঁর পৃষ্ঠপোষক রাজপুরুষ। 'লায়লী-মজনু' রচয়িতা দৌলত উজির বাহরাম খান 'দৌলত উজির' উপাধি উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। কৃত্তিবাস বাংলা শ্লোক পড়ে 'গৌড়েশ্বর'কে নিজ পরিচয় জ্ঞাপন করেছিলেন। ইনি ছিলেন জালালউদ্দীন মুহম্মদ শাহ (১৪১৮-৩১)। 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' রচয়িতা মালাধর বসু রুকনউদ্দীন বারবক শাহের (১৪৫৯-৭৪) কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি পেয়েছিলেন। সুতরাং মুসলমান রাজপরিবারে বাংলা ভাষা যে একেবারে অজ্ঞাত বা উপেক্ষিত ছিল তা নয়। ধর্মকাব্যে যেমন অধ্যাত্মপ্রেমের কথা আছে, রোমান্টিক আখ্যানে তেমনি মানবপ্রেমের কথা আছে। মুসলমান সমাজের তখন গৌরবের কাল ; সে সমাজের সাহিত্যে ভোগ ও উল্লাসের চিত্র থাকবেই। গোরক্ষ-বিজয়, হানিফার দিগ্বিজয়, গাজী-বিজয়, রসুল-বিজয়, ইমাম-বিজয় প্রভৃতি কাব্যে জয়োল্লাস এবং পদ্মাবতী, চন্দ্রাবতী, সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামাল, হানিফা-কয়রাপরী, ইউসুফ-জোলেখা, লায়লী-মজনু, সতীময়না-লোর-চন্দ্রানী, গুলে বকাওলী প্রভৃতি কাব্যে প্রেমোন্মত্ততা প্রকাশিত হয়েছে। সাহিত্য যদি সমাজের দর্পণ হয় তবে মধ্যযুগে মুসলমান সমাজ যে একটা শক্ত ভিত্তি ও স্থিতি লাভ করেছিল তা এসব সাহিত্যের ভাবজগৎ, রূপজগৎ ও রসজগতের প্রকৃতি ও উৎকর্ষ থেকে বুঝা যায়। কবিরা দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট উদার ছিলেন ; বিশেষত বিষয় নির্বাচনে তাঁরা কূপমণ্ডুকতার পরিচয় দেননি। এটাই জীবন্ত সমাজমানসের লক্ষণ। মধ্যযুগ ছিল স্থূল বৃদ্ধির যুগ, গতিশীল ঊর্মিমুখর যুগ ছিল না। সামন্তপতি দুর্গে বন্দী থেকে রাজপ্রাসাদের ষড়যন্ত্রে ব্যস্ত থাকেন, রাজনৈতিকভাবে জনগণকে সচেতন করে তোলার কোন দায়িত্ব পালন করেন না। অর্থাৎ জনগণকে শক্তির উৎস হিসাবে না দেখে তিনি প্রাসাদের কতক রাজপুরুষের ইচ্ছার পুত্তলি হয়ে পড়েন। ডক্টর জগদীশ নারায়ণ সরকার বাংলার মোঘল-পূর্ব যুগের (১২০৩-১৫৭৬) রাজনীতির গতি-প্রকৃতির বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন যে, সে ইতিহাস ছিল : "...a dreary and sickening story of frequent dynastic or gubernatorial changes, palace intrigues, disputed successions, short reigns, rebellions, usurpations and murders. In these political upheavals, the nobles

---

৪১ যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য— *বাঙ্গালা বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি*, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬১ (২সং)।

and the principal officers played an important part, either as king-makers or as active participants in the game of power politics. Sometimes Kings reigned but did not rule. An ambitious minister or a group of officers or nobles ruled through the medium of the royal puppet."[৪২] সব সামন্ত শাসনের ধারাই ছিল এইরূপ। মোঘল সামন্ত প্রভুরা প্রতিনিধি হয়ে বাংলাদেশ শাসন করতেন ; শিরে কেন্দ্রের আশীর্বাদ থাকায় তাঁরা প্রজাপালন অপেক্ষা আত্মরতির চর্চা করতেন বেশি। মোঘল শাসকদের ভোগবিলাসিতায় কালযাপন একটা স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থবলই প্রধান বল। রাজভাণ্ডার অর্থপূর্ণ থাকলে তবে সৈন্য-সামন্ত গঠন, আমীর-ওমরাহ পোষণ এবং প্রজা শাসন-শোষণ। মোঘল সামন্তপতিরা নির্দিষ্ট কর কেন্দ্রে প্রেরণ করে বাকী অর্থে আত্মপোষণ করতেন। ফল হত এই — প্রজার দিকে কল্যাণের হস্ত কেউ বাড়াতেন না। রাজা-প্রজার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন থাকায় প্রজারা রাজনৈতিক ভাবে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থেকে যায়। এজন্য দেখা যায়, রাজার পতন প্রজার পতন নয়, আবার রাজার উত্থান প্রজার উন্নতি নয়। ব্যক্তিত্বের বিকাশ না ঘটায় কোন সমাজপতি সমাজসংগঠন দ্বারা সাধারণ মানুষকে সামাজিক-রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তোলার আন্দোলনে এগিয়ে আসেননি। এক চৈতন্যদেবের ধর্ম-আন্দোলন সমাজের এক অংশে আলোড়ন এনেছিল, কিন্তু তাতে আধ্যাত্মিকমুক্তির সুর ছিল, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক মুক্তির ডাক ছিল না। ভোগী, স্বার্থান্বেষী, ক্ষমতান্ধ স্বৈরাচারী রাজপুরুষদের অত্যাচার-অবিচার নীরবে সহ্য করা ছাড়া জনগণের অন্য উপায় ছিল না। এজন্যই এ সমাজকে আমরা নিশ্চল স্থবির নিষ্ক্রিয় গতিহীন বলে অভিহিত করেছি। সুযোগ-সুবিধা ভোগের কিছু তারতম্য ছিল ; নচেৎ হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজের কলেবর বৃদ্ধি ছাড়া এ যুগে আর কিছু হয়নি। যেটুকু সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করা যায়, সেটুকু স্বাভাবিক বিকাশের ফল, সুসংগঠিত আন্দোলনের দ্বারা জাতির জন্য কোন নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়নি। রাজশক্তির অধিকারী হয়েও মুসলমান সমাজ মধ্যযুগের এই সীমাবদ্ধতা দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে, একে অতিক্রম করে নতুন বিপ্লব আনতে পারেনি।

অর্থনীতির দিক থেকেও একই নিশ্চলতার কথা ওঠে। কৃষি ও কুটীর শিল্প ভিত্তিক অর্থনীতিতে সচলতা আসতে পারে না, যদি না উৎপাদন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আসে। গতানুগতিক পদ্ধতিতে চাষ এবং সীমাবদ্ধ পুঁজি ও প্রযুক্তিবিদ্যা নিয়ে কুটীর শিল্প সমাজের অর্থনৈতিক বিপ্লব ঘটাবার পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। তবে স্বল্পতুষ্ট গ্রামীণ

৪২. Jagadish Narayan Sarkar--*Islam in Bengal*, Ratna Prakashan, Calcutta, 1972, P. 2

_ ডক্টর সুশীলা মণ্ডল দেখিয়েছেন যে, তুর্ক-আফগান যুগের (১২০০–১৫২৬) মোট ৫২ জন শাসক ও সুলতানের মধ্যে প্রায় ৩০ জনের মৃত্যু হয়েছিল অপঘাতে। তাঁর মতে তুর্ক-আফগান যুগের বৈশিষ্ট্য ছিল, সিংহাসনেব জন্য দ্বন্দ্ব এবং রক্তপাত। কেননা ইসলামে রাজতন্ত্র ছিল না বলে সিংহাসনের জন্য উত্তরাধিকাবনীতিও ছিল না।
বঙ্গদেশের ইতিহাস (মধ্যযুগ : প্রথম পর্ব), পৃ: দ: (ভূমিকা)।

সমাজের চাহিদা এতে মিটে যেত। স্বনির্ভর অর্থনীতির জন্য স্যার মেটফাক বাংলার গ্রামগুলিকে ছোট ছোট গণরাষ্ট্র বলে অভিহিত করেছেন।[৪৩] অনুন্নত রাস্তাঘাট, নদীনালা-খালবিল পবিবেষ্টিত জলাজঙ্গলাকীর্ণ প্রকৃতি পরিবেশের কারণে ছোট ছোট গণরাষ্ট্র পবস্পর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন ছিল। কোন বিশেষ স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা পরস্পরের সান্নিধ্যে আসা সহজ ব্যাপার ছিল না। স্বনির্ভর অর্থনীতির কারণে বাঙালির মধ্যে জীবিকাব জন্য কোন সংগ্রামী মনোভাব জাগেনি বা বহির্জগতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। সুতরাং বাঙালির চিত্তের বিকাশ, চিন্তার বিকাশ, মূল্যবোধের পবিবর্তন, ভাবধারার পরিবর্তন হবার মত ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি। অন্তত ভেতর থেকে এ ধরনেব তাগিদ ছিল না। ইসলাম এর মধ্যে অনুপ্রবেশ লাভ করে সামান্য হেরফের দ্বারা আপন স্থান করে নিয়েছে মাত্র। সামাজিক ও অর্থনৈতিক গতানুগতিক ব্যবস্থা ভেঙে ফেলে নতুন কবে গড়ার মত বিদ্যা ও হাতিয়ার আরব-ইরান-তুরস্কের নব্য শাসক গোষ্ঠীর ছিল না। এজন্য তাঁরা সমঝোতা ও সমন্বয় চেয়েছেন, সংঘাত বা বিপ্লব চাননি। ইংরাজগণই প্রথম ব্যবহারিক, মানসিক, সাংস্কৃতিক প্রচণ্ড শক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন যার ফলে দীর্ঘকালের গতানুগতিক প্রবহমানতা, আড়ষ্টতা, মন্থরতা ও নিষ্প্রাণতার আবরণ খুলে যায় এবং নবজীবনের চিন্তাভাবনা, কর্মকুশলতা, মননশীলতার বিকাশ ঘটে। আর তাতেই নবযুগ বা আধুনিক যুগের সূচনা হয়।

মুসলমান সমাজ ও আধুনিকতা

ধর্ম, সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি, রাজনীতির মধ্যযুগীয় ঐতিহ্য নিয়ে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান ব্রিটিশ আমলে প্রবেশ করেছে ; বাঙালির ইতিহাসে এটাই আধুনিক যুগ। আরবদের মত ইংরাজদেরও প্রথমে বাণিজ্যতরী বাংলার মাটিতে নোঙর করেছিল। ১৬৯০ সালে জব চার্নক সূতানটী, গোবিন্দপুর ও কলিকাতা ক্রয় করে বাণিজ্য-কুঠি নির্মাণ করেন। ১৬৯৬ সালে নিরাপত্তার কারণে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মিত হয়। ১৭১৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দিল্লীর সম্রাট ফররুখশিয়রের কাছ থেকে এক ফরমান লাভ করে বাংলায় বিনাশুল্কে বাণিজ্য করার সুবিধা পায়। ১৭৫৭ সালে পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতন হলে কোম্পানি সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। ১৭৬৫ সালে বকসারের যুদ্ধে মীর কাসেমকে পরাভূত করে এবং দিল্লীর সম্রাট শাহ আলমের ফরমানের বলে দেওয়ানী লাভ করে কোম্পানি বাংলার রাজস্ব আদায়ের মালিক হয়। ১৭৭২ সালে দ্বৈতশাসনের অবসান ঘটিয়ে এবং মুর্শিদাবাদ থেকে কলিকাতায় রাজধানী স্থানান্তরিত করে কোম্পানি বাংলার সর্বময় প্রভুত্ব লাভ করে। ১৭৮৯ সালে ইউরোপে 'শিল্পবিপ্লব' হয়। নতুন নতুন যন্ত্রের আবিষ্কার ও কলকারখানার প্রতিষ্ঠার ফলে এই শিল্পবিপ্লব ঘটে। সামন্ততন্ত্র বিদায় নিয়ে ধনতন্ত্রের বিকাশ হয়। ব্যক্তির মালিকানা ও ভোগাধিকার পুঁজিবাদের বড় কথা। ব্যক্তিত্ববোধ ও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য চেতনা ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই ফল। সামন্ততন্ত্রে ব্যক্তি ছিল অবহেলিত, ব্যক্তি সমষ্টির অধীন ছিল। ব্যক্তিত্ববোধে উজ্জীবিত মানুষ জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চার দ্বারা মানসিক উৎকর্ষ লাভ করে এবং

---

৪৩. বিনয় ঘোষ—*বাঙালীর নবজাগৃতি*, ১ খণ্ড, ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৩৫৫, পৃ: ২৫

মনুষ্যত্বের নতুন মূল্যবোধ রচনা কর।[৪৪] ইউরোপের রেনেসাঁসের এটি ছিল প্রধান লক্ষণ। ইংরাজগণ যখন বাংলাদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করেন, তখন তাঁরা এই রেনেসাঁসের মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। যন্ত্র চালাবার জন্য কাঁচা মাল সংগ্রহ এবং শিল্পোৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজার সৃষ্টি অত্যাবশ্যক, তাই ভারতের মত বিরাট উপমহাদেশে উপনিবেশ স্থাপন অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। পরস্পর বিবদমান ক্ষয়িষ্ণু সামন্তশক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরাজগণ ছলে বলে কৌশলে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনে সফল হয়। কোম্পানির লক্ষ্য ছিল অপরিমিত শোষণ। ইংরাজগণ এদেশের কুটীরশিল্প ধ্বংস করেন, নিজ দেশের পণ্য আমদানির জন্য। তাঁরাই রাজ্যের মালিক, রাজস্বের মালিক, বাণিজ্যের মালিক। ভারতবর্ষের সমস্ত পুঁজি কোম্পানির জাহাজে করে ইংলণ্ডে গেছে এবং সেখানকার পুঁজিপতির উদর স্ফীত করেছে। কোম্পানির শাসনে বাংলা তথা ভারতের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে, জনগণের দুর্দশা চরমে ওঠে। ভারতবাসীর বস্তুগত লাভের চেয়ে ক্ষতি হয়েছে বেশি। যা লাভ হয়েছে, সেটি তাদের মন ও মানসের জগৎ, শিক্ষা ও সংস্কৃতির জগৎ। কোম্পানির বাণিজ্যতরীতে পণ্যের সাথে ইউরোপের রেনেসাঁসের ফসলও এসেছে। পাশ্চাত্য বিদ্যা, শিক্ষা ও সভ্যতা তখন গতিশীল ও বিচিত্রমুখী ছিল। গতানুগতিক আবর্তসঙ্কুল আবহমান ভারতীয় সংস্কৃতির উপর প্রাণচঞ্চল ইউরোপীয় সংস্কৃতির প্রভাব সুদূরপ্রসারী ফল বহন করে। এই প্রথম ভারতীয় চিত্ত জেগে ওঠে, তার অন্তর্জীবনে বিরাট পরিবর্তন আসে। জীবনের পুরাতন মূল্যবোধ ধ্বসে পড়ে, নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি হয় যার মধ্য দিয়ে নবজাগরণের লক্ষণ বিকশিত হয়।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রথম পঞ্চাশ বছর ক্রান্তিকাল ছিল। প্রশাসনিক কাঠামো গঠন; নীতি উদ্ভাবন, নীতি নির্ধারণ ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত ছিল। উনিশ শতকের গোড়া থেকেই ইউরোপীয় সভ্যতার প্রত্যক্ষ ফল ফলতে শুরু করে। ১৮০০ সালে কলিকাতায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হয় ইংরাজ সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার জন্য। এতে দেশীয় লোকেরা শিক্ষা লাভের সুযোগ পেলেন না, কিন্তু শিক্ষা দান ও গ্রন্থ প্রণয়নের সুযোগ পেলেন। ইংরাজ শিক্ষক ও পণ্ডিতের সাথে বাঙালি শিক্ষক ও পণ্ডিতগণ বাংলা গদ্যে পুস্তক রচনা করেন যা বাঙালির সাংস্কৃতিক জগতে নব অধ্যায়ের সূচনা করে। আধুনিক মন ও মনন, বিদ্যা ও বুদ্ধি, চিন্তা ও চেতনা বিকাশের অন্যতম বাহন গদ্য। এই গদ্যশিল্পের উদ্ভবকে ইংরাজদের একটা বড় দান বলে স্বীকার করতে হয়। বাংলা ভাষার জন্মের প্রায় হাজার বছর পর বাংলা গদ্য দলিল-দস্তাবেজের অঙ্গন ছেড়ে সাহিত্য রচনায় এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। এই গদ্যশিল্প অল্পকাল পরে স্কুল-কলেজ শিক্ষায়, পাঠ্য পুস্তক ও সাহিত্য রচনায়, ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলনে, বাক-বিতণ্ডায়, পত্র-পত্রিকায় সৃজনশীল ও মননশীল লেখায়, সভা-সমিতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। গদ্যের মধ্য দিয়েই ব্যক্তিকেন্দ্রিক আধুনিক বাংলা সাহিত্যের উদ্ভব।

৪৪. "It indicates the endeavour of men to reconstitute himself as a free being, not as the thrall of theological despotism." *Encyclopeadia Britannica*, Vol. XXIII, P. 83.

শাসক গোষ্ঠীর সহিত রাজকার্য এবং বাণিজ্যিক লেনদেনে ও নানাবিধ ব্যবহারিক নিত্যকর্মে ইংরাজি ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যা শিক্ষা অত্যাবশ্যক ছিল। ১৮৩৭ সালে ফারসির স্থলে ইংরেজি রাজভাষা হলে এরূপ শিক্ষার গুরুত্ব আরও বেড়ে যায়। কোন কোন ব্যক্তি ও খ্রীস্টান মিশনারীর উদ্যোগে প্রথমে কলিকাতা শহর ও শহরতলীতে ইংরেজি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮১৭ সালে হিন্দু কলেজ স্থাপিত হলে বর্ণহিন্দুর সন্তানেরা উচ্চ মানের ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ পান। এই কলেজকে কেন্দ্র করেই 'ইয়ং বেঙ্গল দলে'র (১৮২৬) আবির্ভাব ঘটে। ইংরেজি বিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার মাধ্যমে ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা আসে, ধর্মের পরিবর্তে মানবিক ও বৈজ্ঞানিক শাখার নানাবিধ জ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮১৩ সালে কোম্পানি কর্তৃক নতুন সনদ লাভের সময় বাংলা সরকার প্রতি বছর এক লক্ষ টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয় করার অনুমতি পায়।[৪৫] সরকারের উদ্যোগে ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। ক্রমে জেলা স্কুল ও কলেজ স্থাপন করে শহরের বাইরে আধুনিক শিক্ষার সম্প্রসারণ করা হয়। ইংরেজি ভাষা শিক্ষা এবং সে ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান শিক্ষার ভেতর দিয়ে বাঙালির আত্মার জাগরণ, ব্যক্তিচিন্তার উন্মেষ এবং সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ ঘটে। ব্যক্তিত্ববোধের উদ্বোধন, মনুষ্যত্বের উপলব্ধি, স্বদেশ ও স্বজাতি চিন্তা, সামাজিক ও রাজনৈতিক সচেতনতা এরূপ বিদ্যাচর্চার ফল। ব্যক্তিগতভাবে এবং ক্রমশ যৌথভাবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন তখনই সম্ভব হয়েছে। মনুষ্যত্বকে জলাঞ্জলি দিয়ে যেসব কুসংস্কার, অন্ধবিশ্বাস, অন্যায় আচরণ সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, এতকাল পরে সে সবের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, সমাজশাস্ত্রের স্থলে মানবতার জয় ঘোষিত হয়। গঙ্গাজলে সন্তান বিসর্জন ও সতীদাহ প্রথা নিরোধ এবং বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তনের ভেতর দিয়ে লাঞ্ছিত মানবতার মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য শিক্ষার এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দান। সেকুলার বা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার ফলে মানুষ যুক্তিবিদ্যা ও মুক্তবুদ্ধির অধিকারী হয়েছে।

১৭৭৮ সালে শ্রীরামপুরে প্রথম ছাপাখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর আগে খড় ও পালকের কলমে তালপাতা, তুলট কাগজে হাতের লেখা পুথি ছিল বিদ্যাচর্চার উপায়। ছাপাখানার চাহিদা মিটাবার জন্য কাগজের কলও স্থাপিত হয়। ১৮২৯ সালে কলিকাতায় গমপেষার কল, ১৮৫৩ সালে কাপড় তৈরির কল স্থাপিত হয়। রাণীগঞ্জে কয়লা তোলা শুরু হয় ১৮২০

৪৫. ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির ১৮১৩ সালের সনদের ৪৩ ধারা মতে আইনটি ছিল এরূপ :
"It shall be lawful for the Governor General in Council to direct that out of many surplus which may remain of the rents, revenues and profits, a sum of not less than one lakh of rupees in each year shall be set apart and applied to the revival and improvement of literature and the encouragement of the learned natives of India, and for the introduction and promotion of knowledge of the Science among the inhabitants or the British territories in India." H. Sharp (edited)--*Selection From Educational Records*, 1771--1839, Part I, Calcutta, 1920, P. 22.

সালে। এ হল যন্ত্রযুগের ও যন্ত্রশিল্পের পদধ্বনি। উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যন্ত্র আসতে শুরু করে। এ পর্বে রেল-লাইন বসে এবং তাতে কলের গাড়ী চলে (১৮৫১)। টেলিগ্রাফ পদ্ধতিও আমদানি হয় (১৮৫৩)। এগুলি হল যোগাযোগ ব্যবস্থাকে উন্নততর করার উপায়। দূর ও নিকটকে একসূত্রে বেঁধে দিয়ে এসব যন্ত্র মানুষের প্রভূত কল্যাণ সাধন করেছে। গ্রামের সাথে শহরের সম্পর্ক স্থাপন সহজতর হয়েছে, দূর-দূরান্ত থেকে মানুষের শহরে আসা এবং শহরের সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ যন্ত্র মানুষের জীবনকে গতিশীল ও সূচীমুখী করে তুলেছে। এটিও ইউরোপীয় সভ্যতার দান।

কলিকাতার মত আধুনিক কসমোপলিটান শহর এবং শহরকেন্দ্রিক আধুনিক মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ ইংরাজের শাসন আমলে সম্পন্ন হয়। কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির দরুন বাংলার সংস্কৃতি ছিল মূলত গ্রামীণ সংস্কৃতি। প্রাচীন ও মধ্যযুগে শহর ও বন্দর ছিল, কিন্তু সেগুলি মুখ্যত দুর্গকেন্দ্রিক ছিল। রাজা-বাদশাহ, আমীর-ওমরাহ্-পারিষদ দুর্গের অভ্যন্তরে বাস করতেন। দুর্গের চতুষ্পার্শ্বে সেনাবাহিনী শিবির করে থাকত। রাজপুরুষ ও সেনাবাহিনীর খাদ্যপানীয় সরবরাহ ও সেবাশুশ্রূষার জন্য কিছু লোক শহরে বাস করত। ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য দোকানপাট থাকত, মুসাফিরখানা, মন্দির, মসজিদ থাকত। মোঘল যুগে ভূমির মালিকানার মত দরবারেও ব্যক্তি-সম্পত্তির মালিকানা ছিল না। আমীর-উজির লোকান্তরিত হলে 'ফৌৎ আইনে' তাঁর অর্জিত সম্পত্তির বেশির ভাগ যেত রাজভাণ্ডারে, তাঁর পরিবার-পরিজন সামান্য ভাগ পেতেন।[৪৬] সমস্ত ভূমির মালিকানা স্বয়ং সম্রাটের ; জায়গীরদার, মনসবদার, নবাব-নাজিম কেবল রাজস্ব আদায় ও তাব অংশবিশেষ ভাগ ও ভোগের অধিকার পেতেন। ভূমি বণ্টন ব্যবস্থা সম্পূর্ণ রাজার ইচ্ছাধীন ছিল। ব্যক্তিগত সম্পত্তি অর্জন এবং বংশধরদের জন্য সঞ্চয় করার প্রবৃত্তি না থাকায় মানুষ শহরমুখী হয়নি। মোঘল যুগে ভোগের প্রবণতা এজন্য খুবই বেশি ছিল। ইংরাজের তৈরি শহরের রীতিনীতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ব্যক্তি-সম্পত্তির উপর ভোগাধিকার এবং সঞ্চয়ের নিশ্চয়তা ও নিরাপত্তা ছিল বলে ধনবান লোকেরা শহরে এসেছেন এবং গৃহনির্মাণ করে বসবাস স্থাপন করেছেন।[৪৭] সিরাজদ্দৌলা ঢাকার নায়েব-নাজিমের সহকারী রাজদুর্লভের কাছে অর্থ চেয়ে পাঠালে তিনি পুত্র কৃষ্ণদাসকে দিয়ে ঐ সম্পত্তি কলিকাতায় ইংরাজের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দেন। ইংরাজ কর্তৃক ক্ষমতা লাভের পর শাসন কাঠামোর পরিবর্তন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, শিক্ষা-দীক্ষার উন্নতি, কলকারখানার প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে কলিকাতা শহরের গুরুত্ব অনেক বেড়ে যায়। রাজধানী শহরে সরকারি বেসরকারি কর্মচারী, কারখানার শ্রমিক ও ছোট বড় ব্যবসায়ী ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর আগমন

৪৬. আবদুল মওদুদ—*মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর*, নওবোজ কিতাবিস্তান ঢাকা, ১৯৬৯, পৃ: ৪২

৪৭. প্যারিচাঁদ মিত্র মন্তব্য করেন, "When Fort William was built, the Hindu seem to have looked upon it as a place of refuge and the setts, Gobardhan Mitra, Nabaskissen, and other families settle there." 'Notes on Early Commerce in Bengal', *Calcutta Review*, Vol. LXXII, 1881, P.116.

ঘটেছে। এই শহরবাসীর সমন্বয়েই একটি শ্রেণী-সচেতন মধ্যবিত্ত সমাজ গড়ে উঠেছে। উৎপাদনের সহিত সম্পর্কহীন একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী মধ্যযুগেও ছিল, কিন্তু সেটি সংখ্যায় ক্ষীণাঙ্গ এবং নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত ছিল। তারা প্রায় নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় ছিল ; শ্রেণী-সচেতনতা না থাকায় সমাজকে নতুন করে কিছু দিতে পারেনি। পোলার্ড বলেছেন, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার ছাড়া মধ্যশ্রেণীর বিকাশ হয় না, আর মধ্যশ্রেণী ছাড়া সমাজে নবজাগরণ আসে না।[৪৮] আধুনিক মধ্যবিত্ত সমাজ এক জাগায় কেন্দ্রীভূত হয়ে গতিশীল, কর্মচঞ্চল ও অধিকার-সচেতন হয়ে উঠে। এটি সংকর শ্রেণী হলেও সমস্বার্থে ঐক্যবদ্ধ জীবনব্যবস্থায় বসবাস করতে থাকে এবং সমাজের সারবান জাগ্রত অংশ হিসাবে ক্রমশ সমাজের নেতৃত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করে। ব্যক্তিত্ববোধের উন্মেষ হলে ও ব্যক্তি-অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা জাগলে মধ্যবিত্ত শ্রেণী জনগণের স্বার্থের সহিত একাত্মতা স্থাপন করে এবং ঔপনিবেশিক শত্রুর বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। অবশ্য জীবিকার জন্য পরনির্ভরশীল বলে এর ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা আছে—কায়েমী স্বার্থের এ শ্রেণী সরাসরি দ্বন্দ্বে নামতে পারে না। আর্থিক কারণেই ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব বেড়ে যায় এবং সামাজিকভাবে স্বার্থপর হয়ে ওঠে। এসব দোষগুণের সমন্বয়ে গঠিত শহরকেন্দ্রিক শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণী বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের ফল বলে স্বীকার করতে হয়।

এখন প্রশ্ন হল, ইংরাজের আবির্ভাবের ফলে বাঙালির অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনে যে পরিবর্তন সূচিত হয়, তা বাঙালিব মুসলমান সমাজকে কিভাবে এবং কি পরিমাণে স্পর্শ করেছে। একথা ঠিক যে, এসব পরিবর্তনের সূত্র ধরেই আংশিকভাবে হলেও বাংলাদেশে নবজাগরণ এসেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে এই নবজাগরণের পদধ্বনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আধুনিক ভাষা শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা, পত্র-পত্রিকার প্রকাশ, সভাসমিতির গঠন, বাংলা গদ্যের বিকাশ ও তার মাধ্যমে আধুনিক সাহিত্য সৃষ্টি, কলকারখানা স্থাপন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, নগর সৃষ্টি এবং নগরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব, শিক্ষা-ধর্ম সমাজ সংস্কার আন্দোলন এবং তার মধ্য দিয়ে মুক্তবুদ্ধির ও মানবতাবোধের বিকাশ — আধুনিকতার এসব লক্ষণ দিয়েই নবজাগরণের আত্মপ্রকাশ হয়। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম থেকে এসব লক্ষণ হিন্দু সমাজকে যতখানি আলোড়িত ও স্পন্দিত করেছিল, মুসলমান সমাজকে ততখানি করেনি। পূর্ব থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সহিত ব্যবসায়ের লেনদেনে যাঁরা দোভাষী, দালাল, খাজাঞ্চী, ঠিকাদার, মহাজন, বেনিয়ান, গোমস্তা, মুৎসুদ্দী, সরকার, দেওয়ান, মুনশী ও কেরানীর কাজ করতেন কোম্পানির শাসনকালে তাঁরাই আর্থিক সুবিধা ভোগের অধিকারী হন।[৪৯] সরকারি-বেসরকারি অফিসে, শিক্ষা

৪৮. বিনয় ঘোষ—*বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ: ৫৮

৪৯. এ প্রসঙ্গে নবকৃষ্ণ (হেস্টিংসের মুন্সী), কান্তবাবু (মিঃ সাইকসের বেনিয়ান), লক্ষ্মীকান্ত (ক্লাইভের বেনিয়ান), দর্পনারায়ণ (মিঃ হুইলারের দেওয়ান), শান্তিরাম সিংহ (টমাস রামবোল্ডের দেওয়ান), রামদুলাল দে (ফেয়ারলি কোম্পানির দেওয়ান), গোকুলচন্দ্র ঘোষাল (ভেরেলস্টের দেওয়ান) প্রভৃতির নাম স্মরণ করা যায় যাঁরা প্রভূত অর্থের মালিক হয়েছিলেন। শেখ ইতিসামুদ্দীন তাঁর ইউরোপ-ভ্রমণবৃত্তান্ত 'শিগুর্ফ নামা-ই-বেলায়েত' (১৭৮০) গ্রন্থে নিজের নামসহ মোট আট জন

প্রতিষ্ঠানে, মিল-কারখানায় চাকুরির সুবিধা তাঁরাই পান। ঐসব কাজে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকের সাথে ইংরাজদের প্রথমে যোগাযোগ হয়েছিল। মুসলমান শাসনামলে ব্যবসায় ও মহাজনী কারবারে হিন্দুগণ অধিকতর নিযুক্ত ছিলেন। কলিকাতার ভৌগোলিক অবস্থানহেতু হুগলী, হাওড়া, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী পায়ে হেঁটে কলিকাতার সহিত যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ পেয়েছে। এসব জেলা হিন্দুপ্রধান অঞ্চল ছিল, ফলে হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকে অধিক পরিমাণে কলিকাতায় সমবেত হয়েছে। দূরবর্তী জেলাগুলিতে, বিশেষ করে, পূর্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যা বেশি ছিল। শহরে যাতায়াত ও অবস্থান করার মত আর্থিক অবস্থা যাদের ছিল, সাধারণত তারাই শহরমুখী হয়েছে। মুসলমানের অধিকাংশ সংখ্যা ছিল কৃষিজীবী ; চাকুরিজীবী খুব কম ছিল। মুসলমান আমলে চাকুরি সম্প্রসারিত ছিল না। ভূমির স্থায়ী আর্থিক নির্ভরতা ত্যাগ করে মুসলমানগণ শহরের অনিশ্চিত আর্থিক জীবনের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেনি। যাঁরা চাকুরি ও অন্যান্য রাজকার্যে নিযুক্ত ছিলেন, শাসন ক্ষমতা হারানোর পর তারা কৃষিকার্যে যোগ দিয়েছেন, খ্রীস্টান শাসকের অধীনে গোলামি কবা পছন্দ করেননি। খোন্দকার ফজলে রাব্বি বলেছেন যে, অভিজাত শ্রেণীর জীবিকার্জনের সর্বোৎকৃষ্ট ও সর্বাধিক সম্মানজনক উৎস ছিল তরবারি, কলম পেশা ও ভূসম্পত্তি থেকে প্রাপ্ত আয়। তাঁরা এগুলি ছাড়া অন্য সমস্ত পেশা, হস্তশিল্প, দোকানদাবি, ব্যবসায় ইত্যাদি কাজকে উচ্চপদ ও মর্যাদার পক্ষে হানিকর মনে করতেন।[৫০] তাঁরা ছিলেন বহিরাগত মুসলমান। তাঁরা স্বহস্তে কৃষিকাজকে উত্তম পেশা বলে মনে করতেন না সত্য, কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর ভূমি ও চাষ ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। রাজকার্যের চাকুরি হারিয়ে ঐ শ্রেণীর লোকেরা কৃষিকার্যে গ্রামের দিকে ঝুঁকেছেন, শহরের নানাবিধ পেশার দিকে যাননি। যাঁরা চাকুরি হারাননি, তাঁরা অবশ্য পূর্ব পেশায় নিযুক্ত ছিলেন, যেমন বিচার বিভাগে কাজী, মুফতী, উকিল, মোক্তার, মুহুরী প্রভৃতি। যাদের চাকুরি ও ভূমি কিছুই ছিল না, তারা কেউ কেউ ভাগ্যের সন্ধানে শহরে ভিড় করে। ডক্টর এম. কে. এ. সিদ্দিকী কলিকাতায় মুসলমান বসতির এক বিবরণে লিখেছেন যে, কতকগুলি কাজ মুসলমানের একচেটিয়া ছিল, যেমন নগর নির্মাণ কালে রাজমিস্ত্রির কাজ, বন্দর উন্নতির কালে

মুনশীর নাম কবেছেন যাঁরা কলিকাতায় কোম্পানির অধীনে চাকুরি করতেন। তাঁরা হলেন, ১. মুনশী আমানুল্লাহ, ২. মুনশী ফকরুদ্দীন (তাজউদ্দীনের পুত্র), ৩. মুনশী মোহাম্মদ আসলাব, ৪. মুনশী আবদুল বারী, ৫. মুনশী মোহাম্মদ ফয়েজ (মেজর কর্নলের অধীনস্থ), ৬. মুনশী মীর সদরুদ্দীন (কর্নেল কুটের অধীনস্থ), ৭. মুনশী সলিমুল্লাহ (গবর্নর হেনরী ভেন্সিটাটের অধীনস্থ) ও ৮ মুনশী শেখ ইতিসামুদ্দীন। Syed Aulad Hussain--'The Vilayetnama', *The Dacca Review*, Feb.--Mar 1917, P 328. এঁরা কেউ বিত্তের মালিক হননি। এ সময় গোলাম হোসেন নামে একজন মুসলমানের নাম পাওয়া যায় যিনি কোম্পানির দালালী করে ৯০ লক্ষ টাকা উপার্জন করেছিলেন।
আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ—*সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪, পৃ: ১৩৬

৫০. *The Origin of the Musalmans of Bengal*, P. 107

খালাসী-সারেঙ্গের কাজ, কাপড় সেলাই-এর পেশায় দর্জির কাজ, কসাই-এর কাজ, ফলমূল ও শাকসব্জির ব্যবসায়ে দোকানদারি ও ফেরিওয়ালার কাজ, গাড়ী চালনায় সহিষ্ণু-কোচোওয়ানের কাজ, ভিস্তির কাজ, রান্নার পেশায় খানসামা-বাবুর্চির কাজ, বই-পুস্তক বাঁধাই-এর কাজ, চামড়ার ট্যানারির কাজ, ঘোড়া-গরু ছাগল কেনাবেচায় ব্যাপারীর কাজ ইত্যাদি। এগুলিতে বেশির ভাগ বাঙালি মুসলমান নিয়োজিত ছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে বিহার ও অন্য অঞ্চলের মুসলমানের প্রাধান্য ছিল।[৫১] এরা প্রধানত শ্রমজীবী শ্রেণী ছিল। ডক্টর সিদ্দিকী কলিকাতার নানাবিধ দরগাহ, খানকাহ, মাজার, ইমামবাড়া, মসজিদ, মাদ্রাসার বিবরণ লিপিবদ্ধ করে দেখিয়েছেন যে, ধর্মপ্রচারক পীর-দরবেশ, শিক্ষাদাতা মৌলবী-মোল্লা শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরাও এখানে সমবেত হয়েছিলেন। এর উপরের তলায় আছেন নবাব-নাজিম ও অন্যান্য অভিজাত পরিবারের লোকজন। অর্থাৎ কর্মী, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, চাকুরিজীবী ও বৃত্তিভোগী অভিজাত পরিবার—এসব শ্রেণীর মানুষ নিয়ে কলিকাতার মুসলমান সমাজ গড়ে ওঠে।[৫২]

১৭৮০ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। কলিকাতার মুসলমানরা হেস্টিংসের কাছে এর জন্য দরবার করেছিলেন। মাদ্রাসা স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল, .. "to promote the study of the Arabic and Persian Languages and of Muhammadan Law, with a view more especially to the production of qualified officers for the Courts of Justice "[৫৩]

১৮২৯ সালে মাদ্রাসায় প্রথম ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয় ; প্রথম বছর ছাত্র ছিল ৪২ জন।[৫৪] ১৮৩৬ সালে হুগলী কলেজ স্থাপিত হয় ; সেখানে ইংরাজি বিভাগে মুসলমান ছাত্র ছিল ৩১ জন (হিন্দু ছাত্র ৯৪৮ জন)।[৫৫] ১৮১৭ সালে স্থাপিত হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্রের পড়ার অধিকার ছিল না। কলিকাতা ও শহরতলীর খ্রীস্টান মিশনারী বিদ্যালয়গুলিতে ধর্মান্তরের ভয়ে মুসলমান অভিভাবকগণ তাঁদের সন্তানদের পাঠাতেন না। কেউ কেউ বিক্ষিপ্তভাবে পড়াশুনা করত। সুতরাং মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তার লাভ করেনি। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হিন্দু পণ্ডিতদের সাথে মুসলমান মুনশী-মৌলবীরা ছিলেন। এক সময় তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩০ জনেরও অধিক। কিন্তু তাঁরা উর্দু-ফারসি ভাষার চর্চা করেছিলেন, তাঁদের কেউ বাংলা গদ্য বা পদ্য কিছুই লেখেননি। তাঁরা অনেকেই পাটনাবাসী, লক্ষ্মৌবাসী, দিল্লীবাসী ছিলেন।[৫৬] কলিকাতার 'স্কুল বুক

৫১. M. K A. Siddiqui--*Muslims of Calcutta,* Calcutta 1974, PP. 19-20

৫২. Ibid, P. 28

৫৩. Abdul Karim, B. A.--*Mohammedan Education in Bengal*, Metcalfe Press, Calcutta, 1900, P. 1

৫৪. A. R. Mallick--*British Policy and the Muslims in Bengal*, P. 187

৫৫. *Muhammedan Education in Bengal*, P. 14

৫৬. **ডক্টর এম. কে. এ. সিদ্দিকী ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সহিত জড়িত ৩০ জন লেখকের কথা বলেছেন, তাঁদের ২২ জনের নাম উল্লেখ করেছেন : তাঁরা হলেন সৈয়দ বকসিস আলী ফৈজাবাদী,**

সোসাইটি'র (১৮১৭) পরিচালক কমিটিতে ৪ জন এবং 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র (১৮১৮) পরিচালক কমিটিতে ৪ জন মুসলমান সদস্য ছিলেন, তাঁরাও বাংলা ভাষা চর্চা করেননি, তাঁদের উপর উর্দু ও ফারসি ভাষার পুস্তক প্রণয়নের ও পর্যবেক্ষণের দায়িত্ব ছিল।[৫৭] মুসলমানের সম্পাদনায় কয়েকখানি উর্দু ও ফারসি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু বাংলা পত্রিকা একখানাও প্রকাশিত হয়নি। ১৮৩১ সালে শেখ আলীমুল্লাহর সম্পাদনায় 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' নামে দ্বিভাষী এবং ১৮৪৬ সালে রজব আলীর সম্পাদনায় 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' নামে পঞ্চভাষী পত্রিকায় বাংলার স্থান ছিল বটে, কিন্তু তা ছিল উর্দু-ইংরাজি সংবাদের বাংলা তরজমা মাত্র ; সে তরজমাও অত্যন্ত দুর্বল ছিল, বাংলা গদ্যের কোন আদর্শ বহন করে না তা।[৫৮] আধুনিক মন ও মননের বাহন হিসাবে যে বাংলা গদ্যের বিকাশ হয়েছিল, ঐযুগে বাংলার মুসলমান তার অংশভাগী ছিল না। সভারাজেন্দ্র ও ভাস্করের গদ্যাদর্শ কোন বাঙালি মুসলমানকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেনি, করলে ঐ সময় দু'একজন গদ্য লেখককে পাওয়া যেত।

আধুনিক যুগের উন্মেষ পর্বে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের গতি ছিল ভিন্নমুখী। ব্রিটিশ সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা লাভ করে এবং ইংরাজি শিক্ষার দ্বারা চাকুরি-

মোহাম্মদ আলী ইবন নিসাব আলী, সৈয়দ মনসুব আলী হোসাইন, ফজর আলী ফজলি, মোহাম্মদ বকস, মীব মোহাম্মদ আতা খান তহসীন, মীব আমন, মীব বাহাদুব আলী হোসাইন, মীব শের আলী আফসোস, হাযদার বকস হাযদাবী, মজহার আলী খান ওয়েলা, মীর্জা কাজিম আলী জওয়ান, হাফিজুদ্দীন বর্ধমানী, খলিল আলী আশক, মীর মইনুদ্দীন ফয়েজ, বাসিত খান, আমানাতুল্লা সৈয়দ, মীর্জা লুৎফ জান তাপিস, মৌলভী ইকবাম আলী, মীর্জা মোঘল নিশান, খান নেয়ামত। *Muslims of Calcutta*, P 23 টমাস রোবাক ১৮১৮ সালে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের আরবী-ফারসী ও উর্দু বিভাগে কর্মরত ৩৩ জন মৌলবী-মুনশীর নাম দিযেছেন। তাঁরা হলেন—আববী-ফারসী বিভাগ : করম হোসেন, আবদুর রহিম, জান আলী, শেখ আহম্মদ, বাহাদুর আলী, হোসেন আলী, তেগ আলী, হিসাম উদ্দীন, মির্জা নূর আলী, মওলা বকস, আব্বাস আলী, কোরবান আলী, নাদিব আলী, মির্জা হাসান আলী, সৈয়দ কাজিম আলী, ফরহাত আলী, মহম্মদ আলী, কলব আলী, মীর বকসিস আলী, মহম্মদ ওয়াসি, বাবউল্লাহ, দলিল উদ্দীন, মাহফুজ আলী, মীর তসাদ্দক হোসেন, বাহাদুর আলী, মীর মনসুর আলী ও মীব সৈয়দ আলী।
Thomas Roebuck (edited)--*The Annals of the College of Fort William*, Hindoostans Press, Calcutta, 1819, PP. 47-48 (Appendix).

৫৭. স্কুল বুক সোসাইটির সদস্যদের নাম : মৌলবী আমানুল্লা, কোম্পানির উকিল, সদর দেওয়ানী, মৌলবী কবম হোসেন, ফারসী ও আববী পণ্ডিত, মৌলবী আবদুল ওয়াহিদ, সোসাইটিব সম্পাদক, মৌলবী আবদুল হামিদ।
ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটির সদস্যদের নাম : মীর্জা কাজিম আলী খান. সরকারি সেক্রেটারী অফিসের ফারসী মুনশী, বেলায়েত হোসেন, মুফতী, কলিকাতা হাইকোর্ট, দরবেশ আলী, বেনারসের রাজার উকিল, নুরুন্নবী, রামপুরের নবাবের উকিল।
A. F. Salahuddin Ahmed--*Social Ideas and Social Changes in Bengal (1818-1835)*. Calcutta 1976, P. 24 (2nd. Edition).

৫৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— *বাংলা সাময়িকপত্র*, ১ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭৯ পৃ: ৩৯, ৮৮ (৪সং)।

বাকুরিতে সুযোগ করে নিয়ে হিন্দুগণ উন্নতির দিকে, এবং ব্রিটিশ সরকারের প্রতি অমনোযোগী ও ইংরাজি শিক্ষার প্রতি বিমুখ থেকে চাকুরি ও ব্যবসায়ের সুযোগ হারিয়ে মুসলমানগণ অবনতির দিকে অগ্রসর হয়। হিন্দু-মুসলমান সমাজ, বিশেষ করে, মধ্যবিত্তের এই অসম বিকাশ বাংলার সামাজিক ইতিহাসের একটি বড় রকমের দুর্ঘটনা ছিল। বিনয় ঘোষ ঐ সময় মধ্যবিত্ত মুসলিম বুদ্ধিজীবীর অনুপস্থিতিকে সমাজের 'ট্র্যাজেডী' বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৯]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ ও মুসলমান সমাজের পতন

মুসলমান আমলে অভিজাত রাজপুরুষ, মধ্যস্বত্বভোগী সরকারি-বেসরকারি কর্মচারী, জমিদার-জোতদার, ছোটখাট ব্যবসায়ী ও কারিগর শ্রেণী এবং গ্রামের ক্ষেতচাষী, দিনমজুর, জেলে-জোলা, মাঝি-মাল্লা—এই তিন শ্রেণীর মানুষ নিয়ে মুসলমান সমাজ গড়ে উঠেছিল, তা আমরা পূর্বে দেখেছি। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর কতকগুলি দিক দিয়ে মুসলমান সমাজে প্রত্যক্ষ আঘাত আসে। পলাশী-যুদ্ধের অব্যবহিত পরে দেশীয় সামরিক বাহিনী বিপুল পরিমাণে হ্রাস পায়। লর্ড ক্লাইভ সামরিক ক্ষমতা কোম্পানির নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেন, উচ্চ পদগুলি ইংরাজ অফিসার দ্বারা পূর্ণ করেন। 'পুতুল' নবাব মীরজাফরের অধীনে পরিমিত সৈন্য রাখা হয়। পরে ব্যক্তিগত নিরাপত্তা রক্ষার কাজে যে সামান্য সংখ্যক সেনাবাহিনী ছিল, সেটাও অপ্রয়োজনবোধে সরকার তুলে দেন।[৬০] ১৭৬৫ সালে দেওয়ানী লাভের পর রাজস্ববিভাগেও কোম্পানির কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের শাসনভার নামে মাত্র মুর্শিদাবাদের নবাবের হাতে থাকে। মোহাম্মদ রেজা খান বাংলায় এবং সিতাব রায় বিহারে কিছুকাল নায়েব-নাজিম ছিলেন বটে, কিন্তু আস্তে আস্তে রাজস্ব বিভাগে জেলা-কালেক্টর ও দেওয়ানী আদালতে জজ-ম্যাজিস্ট্রেটের পদগুলিতে ইউরোপীয়দের নিয়োগ করা হয়। ১৭৭২ সালে দ্বৈত শাসনেব অবসান ঘটিয়ে ওয়ারেন হেস্টিংস বাংলা বিহার উড়িষ্যার সর্বময় কর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করেন এবং 'গভর্নর জেনারেল' উপাধি ধারণ করেন। মুর্শিদাবাদের নবাব বৃত্তিভোগী হয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত হন। নবাবের ভাতা প্রথমে ছিল ৫৩ লক্ষ টাকা, পরে পরিমাণ কমে ৩২ লক্ষ এবং আরও পরে ১৬ লক্ষ টাকা হয়। নবাবের বৃত্তির পরিমাণ হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে তাঁর অধীনস্থ কর্মচারী, আশ্রিতজন ও অনুগ্রহ ভাজনের সংখ্যাও হ্রাস পায়। বিচার বিভাগে কিছুকাল মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল বটে কিন্তু ক্রমে সেখানেও ইংরাজদের হাত পড়ে এবং উচ্চ পদগুলি তাঁরা গ্রাস করেন। প্রথমে সদর দেওয়ানী আদালত (১৭৭২) এবং পরে সদর নিজামত আদালত (১৭৯০) কলিকাতায় স্থানান্তরিত হয় ; সদর দেওয়ানী আদালতের সভাপতি হন স্বয়ং গভর্নর। জেলা দেওয়ানী আদালতে বিচারের ভার থাকে জেলা-কালেক্টরের উপর। দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে কাজী-অল-কুজ্জাত, কাজী, আমীন, দারোগা, মুফতি,

৫৯ *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, পৃ: ২২

৬০. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, P. 101

মৌলবী, মুন্থরী প্রভৃতি শ্রেণীর মুসলমান কর্মচারীর প্রভাব আরও কিছুকাল অব্যাহত থাকে।[৬১]

দেশের কর্তৃত্বভার গ্রহণ করে হেস্টিংস প্রথমে রাজস্বের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, কেননা ভূমি-রাজস্বই সরকারের আয়ের প্রধান উৎস ছিল। রাজা, মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদার, আয়মাদার, মদদ-ই মাশ, ইজারাদার প্রভৃতি বিচিত্র ধরনের মালিকানায় ভূমির ভোগস্বত্ব ছিল। রাজা মহারাজা বংশ পরম্পরায় ভূমির মালিকানা পেতেন। জায়গীরদার নগদ টাকার পরিবর্তে নিষ্কর অথবা সামান্য করের বিনিময়ে জায়গীরদারী পেতেন। রাজা, মহারাজা ও জায়গীরদার নিজ নিজ এলাকায় জমিদার নিয়োগ করে রাজস্ব আদায় করতেন। জমিদারের অধীন দেওয়ান, গোমস্তা প্রভৃতি কর্মচারী থাকতেন। খাস ভূমির মালিক সরকার ছিলেন ; সরকার নায়েব, আমিল, সোজওয়াল প্রভৃতি কর্মচারী নিয়োগ করে রাজস্ব সংগ্রহ করতেন। প্রথমে লর্ড হেস্টিংস ও পরে লর্ড কর্নওয়ালিস ভূমি-ব্যবস্থার এসব জটিল পদ্ধতি তুলে দিয়ে একটা সুষ্ঠু ও সমন্বিত পদ্ধতি চালু করার চেষ্টা করেন। একশালা, পাঁচশালা, দশশালা এবং পরিশেষে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত (১৭৯৩) পদ্ধতি স্থাপন করে ভূমি সংস্কারের ব্যবস্থা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে জমিদার ভূমি ও ভূমিস্থ প্রজার মালিক হন। তিনি সরকারকে নিয়মিত বাৎসরিক নির্ধারিত কর প্রদান করে বংশ পরম্পরায় জমিদারী ভোগ করার অধিকার পান। এর সাথে 'সূর্যাস্ত আইন' নামে একটি আইন যুক্ত হয়। এই আইনের বলে নির্দিষ্ট সময় জমিদারীর খাজনা রাজকোষে পৌঁছে দিতে না পারলে সে-জমিদারী নিলাম হয়ে যেত। বিত্তশালীরা জমিদারী নিলামে কিনে নিতেন। সরকারের উপর্যুপরি এসব ব্যবস্থার ফলে বনেদী জমিদারীগুলি বিধ্বস্ত হয় ; এক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর রাজা, মহারাজা, জমিদার, জায়গীরদার

প্রকৃতপক্ষে ১৭৯৩ সালে এক আইনের বলে ভারতীযদেব উচ্চপদাধিকাব রহিত কবা হয়। ঐ বছর বিখ্যাত 'কর্ণওয়ালস কোর্ড' অনুযায়ী বিচাব বিভাগ ও শাসন বিভাগকে পৃথক করে জেলা-জজ, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের উপব দায়িত্ব ন্যস্ত কবে দেশীয়দের আধিপত্যেব অবসান ঘটান হয়। ঐতিহাসিকেবঅভিমত—"The net result of the changes introduced by Cornwalis was to devide the entire administrative work in a district between two European officers, one acting as a Collector of Revenue, and the other a Judge and Magistrate. Indians were deliberately excluded from officers involving trust and responsibility." রাজস্ব ও বিচার বিভাগ থেকে দেশীয় কর্মচারী অপসারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল আরো আগে থেকে। দেশের প্রচলিত আইন পরিবর্তন করে কোম্পানির স্বার্থোপযোগী আইন প্রণয়ন ও বাস্তবাযনের লক্ষ্য তাঁদের সব সময় ছিল কিন্তু কাজী ও ফৌজদাবগণ সহযোগিতা না করায় তাঁরা প্রথমে সুবিধা করতে পারেননি। কিন্তু পরে কোম্পানির জয় হয়। ১৭৮৬ সালে দেওয়ানী বিচার ক্ষমতা এবং ১৭৯০ সালে ফৌজদারী ক্ষমতা দেশীয় কর্মচারীর নিকট থেকে কেড়ে নেওয়া হয়। ১৭৯৩ সালে 'কর্ণওয়ালিশ কোর্ডে' উক্ত প্রক্রিয়ার আরও প্রসার ঘটে।

Roychoudhury, Majumder and Datta--*An Advanced History of India*, Calcutta, 1953, P. 788 ; সুরেশচন্দ্র মৈত্র— *বাংলা কবিতার নবজন্ম*, র‍্যাডিক্যাল বুক ক্লাব, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ: ৬৯ ; ডক্টর সিরাজুল ইসলাম—'স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস', *দৈনিক বাংলা*, ২৬ মার্চ, ১৯৮১

ক্ষতিগ্রস্ত হন। বর্ধমান, বীরভূম, নদীয়া, নাটোর থেকে শুরু করে ছোটখাটো জমিদারী এক হাত থেকে অন্য হাতে চলে যায়। যাঁরা জমিদারী কিনতেন তাঁরা বেশির ভাগ কলিকাতার নব্য বিত্তবান।[৬২] তাঁরা কোম্পানির দেওয়ানী, বেনিয়াগিরী, মুৎসুদ্দীগিরী, দালালী, গোমস্তাগিরী, পোদ্দারী, মহাজনী করে টাকা উপার্জন করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এ শ্রেণী হিন্দু সমাজের লোক। পুরাতন হিন্দু ও মুসলমানের জমিদারী নব্য হিন্দু বিত্তবানের হাতে যায়। ১৮৭২–৭৩ সনে বাংলা বিহারের মোট ৩৮টি জেলায় জমিদারের সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ :[৬৩]

বড় জমিদারী (২০,০০০ একর ও তদূর্ধ্বে)	৫৩৩
মাঝারি জমিদারী (৫০০–২০,০০০ একরের মধ্যে)	১৫,৭৪৭
ছোট জমিদারী (৫০০ একরের নীচে)	১৩৭,৯২০
	সর্বমোট ১৫৪,২০০

১৭৯৩ সালে জমিদারীর সংখ্যা ছিল ৩১৭টি। সিটনকারের হিসাব মতে ১৮৫৮ সালে 'সদর জমিদারী'র সংখ্যা ছিল ৪,৫৫০টি। ইচ্ছামতী থেকে গঙ্গা পর্যন্ত এই সদর জমিদারীগুলি বিস্তৃত ছিল। এগুলির মালিক ছিলেন যথাক্রমে হিন্দু ৩,৮৫৫টি (৮৫%), মুসলমান ৬৪৩টি (১৪%) এবং ইউরোপীয়ান ৫২টি (১%)।[৬৪] মুসলমানেব জমিদারীগুলিব বৃদ্ধি ছিল না, উপরন্তু এগুলি উত্তরাধিকারী আইনের ফলে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। ফলে এককালেব জমিদার কয়েক পুরুষের ব্যবধানে ভূমি-কৃষকে পরিণত হন।[৬৫]

মুসলমান আমলে লাখেরাজ বা নিষ্কর রায়তিস্বত্বের অধিকারী এক শ্রেণীর ভূমি-মালিক ছিলেন। সমাজের উচ্চ বংশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক নেতা ও গুণী ও জ্ঞানী ব্যক্তি এসব লাখেরাজ সম্পত্তি ভোগ করতেন। মসজিদ, মন্দির, দরগাহ নির্মাণ, ধর্মানুষ্ঠান পালন, এমন কি নিঃস্ব ভিখারী ও মুসাফিরের জন্য লাখেরাজ দানস্বত্ব ছিল। খোন্দকার ফজলে রাব্বি এরূপ ভোগদখলকারীর ২৭ প্রকার নাম কবেছেন, যেমন জায়গীর, আল-তমঘা, মদদ-ই-মাশ, আয়মা, মসকান, নজুরত খানকাহ, ফকিরান, নজরি দরগাহ,

৬২ বমেশচন্দ্র দত্তেব মন্তব্য, "Decendants of old house found their estates pass into hands of money-lenders and speculators from Calcutta."
Ramesh Chandra Dutt--*The Economic History of India Under Early British Rule*

৬৩. Hailing Berry--*The Bengal Administration Report of 1872-73*, Vol. 1, P 314 (Appendix)

৬৪ *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, P. 142.

৬৫. "Owing to the Muhammadan Law of inheritence, there is a tendency for all Muhammadan families to gradually become impoverished, and many of the Ashraf (noble born) have thus been merged into the rank of the Ajlaf (low born)."
Census Report of India, 1901, Vol, IV. P. 442.

নজরি ইমামাইন, জমিন-ই-মসজিদ, নজরি হুজরত, খরচি মুসাফিরান, মেরামতি মসজিদ, মা-আফি, পীরান, খয়রাতি, খারিজ জমা, মিনহাই, ব্রহ্মোত্তর, মেহতেরান, মালেক ও মালেকানা, দেবোত্তর, শিবোত্তর, সুরজপর্বত ইনাম ও মানকর।[৬৬] এগুলির মধ্যে ব্রহ্মোত্তর, দেবোত্তর, শিবোত্তর, সুরজপর্বত, এই পাঁচটি কেবল হিন্দু এবং জায়গীর, আলতমঘা, খারিজ জমা, মিনহাই, মালেকানা, ইনাম ও মানকর এই সাতটি হিন্দু-মুসলমান উভয় এবং বাকী পনেরটি মুসলমানরা ভোগ করত। রাব্বি সাহেব কয়েকটি জেলার কেবলমাত্র আয়মা সম্পত্তির একটি তালিকা দিয়েছেন এরূপে :[৬৭]

বর্ধমান	১,৭০৫
হুগলী	৮৯৪
মুর্শিদাবাদ	৭০০
বগুড়া	৬৯৪
২৪-পরগণা	১৬
মেদিনীপুর	১২
সর্বমোট	৪,০২১

১৮২৮ সালের 'নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনে' এসব সম্পত্তির অধিকাংশ মুসলমানদের হাত ছাড়া হয়ে যায়। ফলে বহু সম্ভ্রান্ত পরিবার দরিদ্র অথবা ধ্বংস হয়ে যায়।

শরীফ মুসলমানদের শেষ অবলম্বন ছিল রাজভাষা ফারসি। আদালতে ফারসি ভাষা চালু থাকায় বিচার বিভাগে অনেকে চাকুরিতে নিযুক্ত হতেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় ফারসিতে মুসলমান আইন শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। প্রথম দিকে সরকার মাদ্রাসার সার্টিফিকেট ব্যতিরেকে চাকুরিতে বহাল না করার নির্দেশ দিয়ে বিচার বিভাগের এই চাকুরিগুলিতে মুসলমানদের একচেটিয়া দখল বলবৎ রেখেছিলেন। লর্ড বেন্টিঙ্ক (১৮৩৩-৩৮) ফারসি রহিত করে ইংরাজিকে রাজভাষা করেন। মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ইংরাজি-বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। পরবর্তী কালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা হলেও মুসলমান ছাত্ররা ঐ ভাষা শিক্ষার জন্য আগ্রহ দেখায়নি। ফলে বিচার বিভাগে তাদের চাকুরির ভিত ভেঙে পড়ে। ১৮৪৪ সালে লর্ড হার্ডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮) নিয়ম করেন যে, যাঁদের ইংরাজিতে ডিগ্রী আছে, তাঁরাই সরকারি চাকুরিতে অগ্রাধিকার পাবেন।[৬৮] ইংরাজি জ্ঞান

৬৬. *The Origin of the Musalmans of Bengal*, PP. 69.70

৬৭. ঐ, পৃ: ৭২

৬৮. 10 October, 1844, Resolution No. 1

" . that in every possible case a preference shall be given to those who have been educated in institutions thus established (Zillah Schools and Central College) and especially to those who distinguished themselves therein of a more than ordinary degree of merit and attainments."

ছাড়া চাকুরিতে নিয়োগ প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ সময় হিন্দুগণ ইংরাজি শিক্ষায় অনেক দূর অগ্রসর হয়েছিলেন। অতএব অফিস-আদালতে তাঁদেরই চাকুরি হল, মুসলমানরা নেপথ্যে গেল। ১৮৩৫ সালে লর্ড টমাস ব্যাবিন্টন মেকলের পরামর্শ অনুযায়ী আইন হয় যে, কেবল ইংরাজি বিদ্যালয়গুলি সরকারি সাহায্য পাবে, অন্য প্রতিষ্ঠান পাবে না।[৬৯] ১৮২৮ সালের নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন, ১৮৩৫ সালের শিক্ষা সংক্রান্ত আইন, ১৮৩৭ সালের রাজভাষার পরিবর্তন, ১৮৪৪ সালের নতুন চাকুরিতে নিয়োগ পদ্ধতির প্রবর্তন—পরপর এই সব নিয়মের ফলে মুসলমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায় ; এতে অনেক শিক্ষক, মৌলবী, মুনশী জীবিকা হাবান ও চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হন।[৭০] নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন প্রবর্তনকে হান্টার মুসলমানের জন্য 'মরণাঘাত' বলে উল্লেখ করেছেন।[৭১] বস্তুত ১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধে পবাজয়ে রাজক্ষমতাচ্যুতি, ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে জমিদারীব সংখ্যা হ্রাস, ১৮২৮ সালে বাজেযাপ্ত আইনে নিষ্কর ভূমিব

Bengal Education Consultations (1843-52). (qouted from '*British Policy and the Muslims in Bengal*, P 324)

৬৯ ভাবত সবকাব কর্তৃক গৃহীত ৭ মার্চ, ১৮৩৫ সালেব ১৯ ধারাব প্রস্তাবটি ছিল একপ :

'His Lordship in Council is of the opinion that great of the British Government ought to be promotion of European Literature and Science amongst the natives of India, and all the funds appropriated for purposes of education would be best employed on English education alone"

এই প্রসঙ্গে আবও বলা হয যে, ছাত্র-শিক্ষককে প্রদত্ত পুবাতন বৃত্তিগুলি চালু থাকবে, কিন্তু নতুনভাবে আব দেওয়া হবে না ; প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাষাব ছাত্রেব সংখ্যা অনুযায়ী নতুন শিক্ষক নিযোগেব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। প্রাচ্য বিদ্যাব যেসব পুস্তক শিক্ষা খাতেব টাকায ছাপান হত, তা বন্ধ কবে, উক্ত টাকায় গ্রামের লোকদেব ইংরাজি ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেওযাব কথা বলা হয়।

British Policy and the Muslims in Bengal, P 222

৭০ ১৮৩৮ সালে মুর্শিদাবাদ, বীবভূম, বর্ধমান, দক্ষিণ বিহাব ও ত্রিহুত এই পাঁচটি জেলায ফারসি ভাষার হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকেব সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১৯ ও ১১৫ জন। ১৮৭২-৭৩ সালে ২৪-পবগণা, নদীয়া, যশোহব ও কলিকাতা এই পাঁচটি জেলায় হিন্দু ও মুসলমান শিক্ষকেব সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬৯ ও ৮ জন।

W Adam--*Third Report on the State of Education in Bengal* 1938 *General Report of Public Instruction in Bengal* 1872-73, P 411

১৭৮৫ সালেই লর্ড হেস্টিংস এই পতন দেখেছিলেন। তিনি ২১ জানুয়াবি ১৭৮৫ সালেব এক 'মন্তব্যপত্রে' পতনের ছবিটি বর্ণনা করেছেন এভাবে : "Since the management of revenues has been taken into our hands, it has chiefly been carried on by the English servants of this Company, and by the Hindus, In consequence of this change Mahomedan families have lost their sources of private emoluments which would enable them to bestow much expence on the education of their children, and are deprived of the power which they formerly possessed, of endowing and patronizing public seminaries of learning."

Bengal : Past and Present, **Vol. VIII, PP. 109-11**

৭১. *The Indian Mussalmans*. P. 167

রায়তিস্বত্ব লোপ এবং ১৮৩৭ সালে ফারসির রাজভাষাচ্যুতি পরপর এই চারটি বড় আঘাতে পূর্বের শাসকশ্রেণী নিঃস্ব রিক্ত নিরক্ষর নিষ্ক্রিয় নির্জীব জাতিতে পরিণত হয়। ইংরাজদের প্রশাসনিক আইন ও শিক্ষানীতির ফলেই এরূপটি হয়েছে। মূলত অভিজাত শ্রেণীটি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। কৃষক, শ্রমিক, বিত্তহীন শ্রেণীর লোকেরা এসব আইনের বাইরে ছিল ; তবে বণিক কোম্পানির শোষণনীতি থেকে তারাও রেহাই পায়নি। কোম্পানি এদেশের কুটীরশিল্প ধ্বংস করেন বিদেশী পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য। কোম্পানির বাণিজ্যনীতির ফলে তাঁতি সর্বস্বান্ত হয়। নীলচাষে কৃষকের সর্বনাশ ঘটে। এর উপর রোগব্যাধি, দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হয়ে তারা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। আধুনিক জীবনের ফল তারা কিছুই পায়নি। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য তাদের ঘোর অন্ধকারের দিকে টেনে নিয়ে গেছে।

কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করে আবদুল লতিফ (১৮২৮–৯৩) ১৮৪৯ সালে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৫৫ সালে কলিকাতায় প্রথম মুসলমান প্রতিষ্ঠান 'আঞ্জমনে ইসলামী' বা 'মহামেডান এসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। মুসলমান আইন ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মজহার এর নেতৃত্ব দেন। কলিকাতা হাইকোর্টেব কাজী-অল-কুজ্জাত বা প্রধান বিচাবক কাজী ফজলুর রহমান আঞ্জমনের সভাপতি ছিলেন। আবদুল লতিফ এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। মুসলমান সমাজের দাবী-দাওয়া সবকাবের নিকট গোচরীভূত করা উক্ত সমিতির উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ হয়। এটি হিন্দু-মুসলমান মিলিত সিপাহীদের স্বতঃস্ফূর্ত বিদ্রোহ ছিল, তবে তাদের মদদ জোগিয়েছিলেন ইংরাজের দুর্নীতি, শাসননীতি ও কূটনীতর ফলে বঞ্চিত কতিপয় ভারতীয় সামন্তপতি। দিল্লীব সম্রাট দ্বিতীয় শাহ আলম এই বিদ্রোহেব সাথে জড়িয়ে পড়েন। তাঁরা হৃত মোঘল সাম্রাজ্যের পুনরুদ্ধাব চেয়েছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু, হৃতবল ও অপরিণামদর্শী সামন্ত শক্তি সুসংগঠিত ও সুশৃংখল সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শক্তির কাছে হার মানে। বৃদ্ধ শাহ আলম বন্দী অবস্থায় রেঙ্গুনে নির্বাসিত হন ; মোঘল সাম্রাজ্যের শেষ প্রদীপ নির্বাপিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের আগুন সারা ভারতবর্ষে ছড়িয়েছিল। ইংরাজ কঠোর হস্তে এ বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। এতে চার কোটি টাকা রাজকোষ থেকে ব্যয় হয়েছিল। এই প্রথম 'ব্রিটিশ সিংহ' প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খায় এবং নিজ কৃতকর্মের জন্য সমালোচনার সম্মুখীন হয়। ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শতাব্দীকালের শাসনের অবসান ঘটিয়ে ইংলণ্ডের রানী ভিক্টোরিয়া ভারতের শাসনভার গ্রহণ করেন এবং ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সকল প্রজা জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নির্বিঘ্নে ধর্মকর্ম পালন, ন্যায় বিচার ও মানবিক অধিকার লাভের সুযোগ পাবে। মুসলমানদের রাজ্য হারানোর ক্ষোভই সিপাহী বিদ্রোহের প্রধান কারণ ছিল বলে ইংরাজদের ধারণা হয়েছিল। ফলে মুসলমানের প্রতি তাঁদের মনোভাব কঠোরতর হয়, কিন্তু সেই সাথে তাদের দাবী-দাওয়াকে তাঁরা অস্বীকার বা উপেক্ষা করতে পারেননি। ১৮৬৩ খ্রীস্টাব্দে আবদুল লতিফ কলিকাতায় 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করেন। ভারতের বড় লাট এলগিন

সোসাইটি স্থাপনে উৎসাহিত করেছিলেন। আবদুল লতিফের প্রধান লক্ষ্য ছিল দুটি, মুসলমানদের প্রতি বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর সন্দেহ ও বিরূপ মনোভাব দূর করা এবং ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারের দ্বারা ক্ষুব্ধ, বঞ্চিত, পশ্চাদপদ মুসলমানদের সরকারের প্রতি অনুগত করে তোলা। তিনি তাঁর কর্মসূচীর প্রতি স্থির লক্ষ্য রেখে কলিকাতা ও কলিকাতার বাইরের অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের একত্র করেছিলেন এবং যৌথচিন্তা ও কর্মের আদর্শে অনুপ্রাণিত করে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা স্বজাতির মন ও মননকে উদ্বোধিত করেছিলেন। আবদুল লতিফই প্রথম বাংলার মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব ভার গ্রহণ করেছিলেন।

১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৬৩ সাল পর্যন্ত নূন্যাধিক এই পঁচিশ বছর মুসলমান সমাজের পতনের চূড়ান্ত কাল ছিল। এ সময় পর্যন্ত সমাজ ছিল কাণ্ডারী শূন্য। ছিন্ন পাল, ভগ্ন হাল নিয়ে তা অকূলে ভেসে গেছে। এদিকে হিন্দু সমাজের গতিপ্রকৃতি ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। রামমোহন রায়ের (১৭৭২-১৮৩৩) মত শক্তিধর নেতা আবির্ভূত হয়ে শতাব্দীর গোড়ার দিকেই সমাজের মানুষকে আধুনিক জীবনের মূল্যবোধ সম্পর্কে সজাগ ও সচকিত করে দিয়েছিলেন। তিনি শিক্ষা, সমাজ ও ধর্ম সংস্কারের ত্রিমুখী আন্দোলন চালিয়েছিলেন। পুস্তক প্রণয়ন, সভা গঠন, পত্রিকা সম্পাদন, তর্ক-বিতর্কে অংশ গ্রহণ করে তিনি তাঁর আন্দোলনকে সজীব ও গতিশীল করে তুলেছিলেন। সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে তিনি মানবতারই জয় ঘোষণা করেন ; হিন্দু সমাজের আবহমান কালের বদ্ধ অচলায়তন সংস্কারের ভিত ভেঙে পড়ে। হিন্দু কলেজে উচ্চমানের ইংরাজি শিক্ষা সমাজের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ ছিল। জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যম হিসাবে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করে হিন্দু সাহিত্যিক ও মনীষিগণ সমাজের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কলিকাতায় হিন্দুগণই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন ; কলিকাতার নগরজীবনের সুযোগ সুবিধা তাঁরাই বেশি পরিমাণে লাভ করেন। ইংরাজদের সংসর্গে ও সহযোগিতায় চাকুরি ও ব্যবসায় করে তাঁরা অর্থের মালিক হন, তাঁরাই জমিদারী কিনে প্রভাবশালী হয়ে উঠেন। কয়েকটি ধনী পরিবারকে কেন্দ্র করে কলিকাতায় একটি নব্য অভিজাত শ্রেণীর সাথে 'নব্য বাবু' বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীরও উদ্ভব হয়। এঁদের মধ্যে প্রাচীনপন্থী গোঁড়া প্রকৃতির লোক ছিলেন, যাঁরা পুরাতন মূল্যবোধ ধরে রাখতে চান ; আবার নবীনপন্থী প্রগতিশীল মানুষও ছিলেন, যাঁরা আধুনিক জীবনের মূল্যবোধে বিশ্বাসী ছিলেন। এই দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ভেতর দিয়ে সমাজ এগিয়ে যায় ; বলা বাহুল্য, নবীনরাই জয়ের গৌরবটিকা লাভ করেন। তাঁরাই আচার-সংস্কারে জর্জরিত সমাজকে গ্লানি ও বন্ধন থেকে মুক্ত করেন এবং সমাজদেহে নবতেজ ও নবপ্রাণ সঞ্চার করেন। সুতরাং হিন্দু সমাজ ও মুসলমান সমাজের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত মুখী ও ভিন্নধর্মী ছিল। ধর্ম, শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতির যেসব সংস্কার-আন্দোলনের মধ্য দিয়ে হিন্দু সমাজ এগিয়ে যায়, উনিশ শতকের প্রথমার্ধে সেসব ধরনের আন্দোলন মুসলমান সমাজে হয়নি। মুসলমানেরা হিন্দুদের এসব আন্দোলনে যোগদানও করেনি। আমরা পূর্বে দেখেছি, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাথে

যাঁরা যুক্ত ছিলেন, তাঁরা উর্দুর চর্চা করেছেন। তাঁদের মধ্যে ক্বচিৎ কেউ বাঙালি ছিলেন। উর্দুর সাথে বাঙালি মুসলমানের আত্মিক যোগ ছিল না। উপরন্তু তাঁরা যা রচনা করেছেন তা দিয়ে উর্দুভাষী ও উর্দুজ্ঞানী মুসলমানের চিত্তেও নতুন ভাব ও আশার সঞ্চার করতে পারেননি। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা পণ্ডিতদের হাতে বাংলা গদ্যে কেবল সংস্কৃতের প্রভাব পড়েনি, সেই সাথে ইতিহাস চেতনা ও ঐতিহ্যবোধ সংযুক্ত হয়েছে। প্রতাপাদিত্যকে বীর চরিত্র রূপে আঁকা হয়েছে, কৃষ্ণচন্দ্রকে মহৎ করে দেখান হয়েছে। 'স্কুল বুক সোসাইটি' ও 'ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি'র সাথে যে আট জন মুসলমান বিদ্বান ব্যক্তি জড়িত ছিলেন, তাঁরাও বাংলা ভাষার চর্চা করেননি ; অন্য কোন ভাবেও সমাজের মধ্যে তাঁদের প্রভাব প্রতিফলিত হয়নি। বাংলা ও ইংরাজি পত্রিকার সাথে মুসলমানদের যোগ কোথাও দেখা যায় না। উর্দু ও ফারাসিতে কয়েকখানি পত্রিকা মুসলমানগণ প্রকাশ করেছিলেন বটে কিন্তু ভাষার ব্যবধান পেরিয়ে সেগুলিও সমাজমনকে আলোড়িত করতে পারেনি। আত্মীয় সভা, ব্রহ্মসভা, হিন্দুসভা প্রভৃতি যেগুলি ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ছিল, সেগুলিতে মুসলমানদের যোগদানের কথা নয়, কিন্তু সমাজ-সংস্কৃতিমূলক কতকগুলি প্রতিষ্ঠান ছিল (যেমন সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা, বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সমিতি ইত্যাদি), সেগুলিতেও মুসলমানেরা যোগদান করেননি। উইলিয়ম কেরীর 'এগ্রিকালচারাল এণ্ড হর্টি কালচারাল সোসাইটি'তে (১৮২৩) ঢাকার নবাবের নাম পাওয়া যায়। 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন' বা 'ভূম্যধিকারী সভা'য় (১৮৩১) চারজন মুসলমান ছিলেন ; এঁরা হলেন গোলাম নবী, মোহাম্মদ আমীর, হাবিবুল হোসেন এবং আমীনুদ্দীন।[৭২] 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৬) ছিল 'ইয়ং বেঙ্গল দলে'র সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এই গোষ্ঠীর সহিত মুসলমানদের সম্পর্ক ছিল না, অথচ প্রগতিশীল ও যুক্তিবাদী চিন্তার আদর্শ তারাই আমদানি ও প্রচার করে। উক্ত সভায় কোন মুসলমান সদস্য ছিল না, কিন্তু তাদের অপর সভা 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়া সোসাইটি'তে (১৮৪৩) দুজন মুসলমান সদস্যের নাম পাওয়া যায়, তাঁরা হলেন শাহজাদা জালালুদ্দীন ও মুনশী ফজলুল করিম।[৭৩] 'বেথুন সোসাইটি'তে (১৮৫১) আবদুল লতিফকে সদস্য হিসাবে দেখা যায়। আবদুল লতিফ সোসাইটির বিভিন্ন সভায় যোগদান করতেন এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করতেন।[৭৪] তিনি পৃথক পৃথক সভায় দুটি প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। আবদুল লতিফের আগে অন্য কোন মুসলমান বুদ্ধিজীবীকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায় না। নীরব থাকার প্রধান কারণ ছিল, হিন্দুগণ যেসব কারণে সভায় মিলিত হতেন, সেসব অধিকাংশ মুসলমানদের মর্যাদা ও স্বার্থের পরিপন্থী ছিল।[৭৫] ১৮৩৫ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার কথা রটলে কলিকাতার মুসলমানগণ ৮৩১২ জনের স্বাক্ষরসহ একটি আবেদনপত্র সরকারের কাছে পেশ

---

৭২ সুরেশচন্দ্র মৈত্রেয়—'উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান রাজনীতি', *অনুশীলন*, আশ্বিন, ১৩৭২

৭৩. ঐ।

৭৪. *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

৭৫. পূর্বোক্ত, *অনুশীলন*, আশ্বিন ১৩৭২

করেছিলেন।[৭৬] ১৮৩৭ সালে আদালতের ভাষা ফারসি তুলে দিলে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোকে আপত্তি করেছিল। উনিশ শতকের প্রথমার্ধের পুরো সময়টা পর্যালোচনা করলে মুসলমান সমাজের নিষ্ক্রিয়তা, নির্জীবতা, নিশ্চলতা ও প্রতিক্রিয়াশীলতার ছবিই ফুটে ওঠে। এরূপ অবস্থায় সমাজের জাগরণ আশা করা বৃথা।

এই সময় কলিকাতার মুসলমান সমাজ নিষ্ক্রিয় ছিল বটে, কিন্তু গ্রামের মুসলমান সমাজ বেশ সক্রিয় ছিল। ২৪-পরগণায় তিতুমীর, (১৭৮২-১৮৩১) ফরিদপুরের হাজি শরীয়তুল্লাহ (১৭৬৪-১৮৪০) ও দুধু মিঞা, (১৮১৯-৮২) এবং ওয়াহাবী নেতৃবৃন্দ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে হলেও বেশ জোরেশোরে আন্দোলন করেছিলেন। এসব আন্দোলনে ধর্মের প্রভাব থাকলেও 'শ্রেণী সংগ্রামে'র একটা অন্তর্লীন রূপ ছিল। হিন্দু-মুসলমান-খ্রীস্টান নির্বিশেষে জমিদার-নীলকরদের শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন পরিচালিত হয়।[৭৭] স্থানীয় জমিদাররা এঁদের দমন করতে পারেননি ; ব্রিটিশ সরকারকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছিল। 'বাঁশের কেল্লা' নির্মাণ করে তিতুমীর লড়াই করে শহীদ হয়েছিলেন (১৮৩১)। তিনি ছিলেন সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সন্তান। সাধারণ কৃষকের সন্তান হাজি শরীয়তুল্লাহ ও দুধু মিঞা ফারায়েজী আন্দোলন করে জমিদার ও নীলকরদের চক্রান্তে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন। সৈয়দ আহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১) 'ওয়াহাবী আন্দোলনে' বাংলার কৃষকেরা মুজাহিদ ও অর্থ সংগ্রহ করে সীমান্তের সংগ্রামে প্রেরণ করত। 'সিপাহী বিদ্রোহে'ও এদের হাত ছিল। ব্রিটিশ সরকার কঠোর হস্তে এদের দমন করেন ; অনেককে ষড়যন্ত্রও মামলায় জড়িত করে জেল, দ্বীপান্তর ও মৃত্যুদণ্ড দেন। এরূপ ব্যাপক ধরপাকড় ও বিচারসালিশীর পর ১৮৭০ সালে ওয়াহাবী আন্দোলনের অবসান হয়।[৭৮] সাধারণত একটি আন্দোলনের সাথে অপর আন্দোলনের যোগসূত্র ছিল না; এগুলি দেশব্যাপী প্রচার লাভ করেনি, আঞ্চলিকতায় সীমাবদ্ধ ছিল ; উপরন্তু শিক্ষিত সমাজের সমর্থন পায়নি বরং বিরোধিতাই পেয়েছে।[৭৯] ফলে এসব শ্রেণী-সংগ্রাম

৭৬ *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, P. 234

৭৭ হান্টার লিখেছেন, "In the present uprising around Calcutta in 1831, they broke into the house of Mussalman and Hindu landholders with perfect impartiality."
The Indian Mussalmans, P 107

৭৮. ওয়াহাবী আন্দোলনের গুরুত্ব ও গৌরব উপলব্ধি করে গোপাল হালদার লিখেছেন, "ওহাবি প্রেরণা রাজনীতি ক্ষেত্রে ঝড় তুলল। বিদ্রোহ হিসাবে সে এক আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সম্প্রদায়ের গৌরবের কথা। পরবর্তী সময়ে আমিন খাঁনের ওহাবি মামলা সেদিন ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত হিন্দুদেরও স্বাধীনতা-স্পৃহাকেও প্রেরণা দেয়, হিন্দুদের মনেও ইংরেজ-বিরোধ বাড়িয়ে তোলে। আর্থিক ক্ষেত্রেও বাঙলার ওহাবি আন্দোলন দেশের অত্যাচারিত প্রজা-রায়তের, সাধারণ হিন্দু-মুসলমানের সহায়তা পেয়েছিল।"
গোপাল হালদার—বাঙালি সংস্কৃতির রূপ, মুক্তধারা, ঢাকা ১৯৭৫, পৃ: ৫২-৫৩

৭৯. ওয়াহাবী আন্দোলন সম্পর্কে জেমস ওয়াইজের বক্তব্য, "...a movement unsupported by the landlords, or the richer classes and discouraged by the State, spread far and wide embracing the large agricultural and manufacturing classes."
James Wise--'The Muhammedan in Eastern Bengal', *Journal of the Asiatic Society of Bengal*, Vol. LXII, No. 1, 1894, P. 47

সাময়িকভাবে সফল হলেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। শহরের বুদ্ধিজীবী সমাজ এসব আন্দোলনকারীদের 'শ্রেণী-শত্রু' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন এবং এদের দমনে সাম্রাজ্যবাদী সরকারের হাতকেই দৃঢ় করেছেন। তাঁরা সরকারের সাথে কণ্ঠ মিলিয়ে এদের 'ডাকাত', 'দেশদ্রোহী' বলেছেন।[৮০] শহরের শিক্ষিত সমাজ যদি এদের সমর্থন দিতেন তা হলে 'নীলবিদ্রোহে'র (১৮৬০) মত এসব আন্দোলনেও সফলতা আসত। কেবল নীলবিদ্রোহে মধ্যবিত্তশ্রেণী কৃষককে সমর্থন দিয়েছিলেন। এর অবশ্য কারণ ছিল ; নীলচাষে জমিদাররাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন ; তাঁদের স্বার্থে আঘাত লাগায় তাঁদের অর্থে ও পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত সংবাদপত্রে নীলকরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়, নচেৎ রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর কৃষকের উপকার হচ্ছে বলে নীলচাষের পক্ষেই রায় দিয়েছিলেন।[৮১]

নীচশ্রেণীর ও নিম্নবিত্তের সাধারণ হিন্দু এবং কৃষক শ্রমিক শ্রেণীর সাধারণ মুসলমানের জীবন অন্ধকারেই ছিল। বর্ণ-বিত্তের ভেদাভেদ তুলে দিয়ে নীচ ও গরীব শ্রেণীকে উপরে তোলার আন্দোলন কেউ করেননি। সাম্রাজ্যবাদী নীতির কারণে বিদেশী বণিক সরকার অপরিমিত শোষণ করেছেন। স্বদেশী উঠতি মধ্যবিত্ত ও নব্য অভিজাত শ্রেণীচরিত্রের ধর্ম অনুযায়ী আত্মরতির সেবায় মগ্ন ছিলেন, অগণিত জনগণের দিকে ফিরে তাকাননি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ গঠন পর্ব ছিল ; এ সময়ে শাসকের শ্রেণীস্বার্থের সাথে শাসকের আশ্রয়পুষ্ট মধ্যবিত্তের শ্রেণীস্বার্থের বিরোধ বাধেনি। কিন্তু গঠনপর্বের পরেই উভয়ের মধ্যে ক্ষমতা ও সুবিধা ভোগের ভাগাভাগি নিয়ে সংঘাত দেখা দেয় ; তখনই ক্ষমতাহীন দুর্বল এই শ্রেণীর স্বদেশচিন্তা, স্বদেশপ্রেম, স্বদেশহিতৈষণা, স্বাজাত্যবোধ জাগ্রত হয়। প্রবলের বিরুদ্ধে শ্রেণী-দ্বন্দ্বে জনগণের সমর্থন লাভ অত্যাবশ্যক বিবেচনায় তাঁরা গণমুখী চিন্তা ও কর্মে উদ্বুদ্ধ হন এবং স্বদেশবাসী হিসাবে তাদের সঙ্গী করে নেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে এরূপ রাজনৈতিক চেতনাব উন্মেষের পর সমাজের গতি-প্রকৃতি নতুন মোড় নেয়, নতুনভাবে আন্দোলন শুরু হয়। বিশ শতকে এর পুরো ফল ফলে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ ও মুসলমান মধ্যবিত্ত

যেহেতু 'বিত্তের' মাপকাঠিতে মধ্যবিত্তের শ্রেণীকরণ, সেহেতু মার্কসের সমাজতত্ত্বের আলোকে এর সংজ্ঞা দাঁড়ায় "..a middle class in the literal sense of the term is interpreted...as a previleged upper minority feeding on surplus value and

১৯০১ সালের সেন্সাস রিপোর্টেও প্রায় অনুরূপ মত প্রকাশ করা হয় : In all cases it is the Ajlaf, or the lower class of the Muhammadans, who are most attracted by the preaching of the reformer (i.e. the Wahabis) ; the better classes generally hold aloof."
Census of India, 1901, Vol., Part 1, P. 373

৮০. আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ—*সমাজ সংস্কৃতি ইতিহাস*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭, পৃ: ১৩৭

৮১. সুপ্রকাশ রায়—*ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, কলিকাতা, ১৯৭২, পৃ: ১৫৯ (২সং)।

State favouratism and inexorably driving its victims into ranks of the proleteriat."[৮২]

সমাজতান্ত্রিক সমাজে বিত্তের মালিক রাষ্ট্র : বিত্ত উৎপাদন করে রাষ্ট্রের সমগ্র জনগণ। রাষ্ট্রপ্রধান থেকে সর্বনিম্ন ব্যক্তি পর্যন্ত কর্মী-শ্রমশক্তি ও বুদ্ধিবৃত্তি অনুযায়ী তাঁরা রাষ্ট্রের সুবিধা ভোগ করেন। সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে নীতিগতভাবে কোন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না। ধনতান্ত্রিক সমাজে পুঁজিপতিরা বিত্তের মালিক, তাঁরা সমাজের উঁচু স্তরের লোক ; সমাজের নীচের তলায় আছে শ্রমজীবী জনসাধারণ। এই দুই শ্রেণীর মধ্যস্তরে 'প্যারাসাইট' বা পরান্নজীবী সংখ্যালঘু মধ্যবিত্তশ্রেণী বিরাজ করে। সমাজে এদের সহজেই চিহ্নিত করা যায়। সমালোচকের ভাষায়, "...the middle class includes within its ranks the middling size enterpreneur in industry and trade ; the simple producer of goods, such as the artisan and farmer ; the small shopkeeper and tradesman ; and the official and salaried employee."[৮৩]

সমাজবিজ্ঞানীরা বলেন যে, প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থাতেও মধ্যবিত্ত ছিল। রাজতান্ত্রিক ও সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজপুরুষ এবং পারিষদবর্গ সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন, রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদেব তাঁরাই মালিক ; তাঁদের নীচের তলায় ছিল বেতনভুক ও অনুরূপ সুবিধাপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী ভূম্যধিকারী ব্যবসায়জীবী একটি মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণী ; এদের নীচে ছিল কায়িক শ্রমোপজীবী প্রজা সাধারণ। সামন্ত সমাজে মধ্যস্তত্বভোগী শ্রেণীটি আকারে ক্ষুদ্র ছিল, কেননা রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক কার্যকলাপ বেশি ছিল না। সামরিক, রাজস্ব ও বিচার বিভাগ ছিল বটে, কিন্তু এর কোনটিই আধুনিক যুগের মত জটিল ও ব্যাপক ছিল না। শ্রেণীচরিত্রের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তারা শাসকগোষ্ঠীর বংশবদ হয়ে থাকত ; প্রজাদের পণ্যে জীবিকা নির্বাহ্ করলেও প্রভুর স্বার্থে প্রজাদের উপর খবরদারি করত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে প্রশাসন, ভূমি ও ব্যবসায় কেন্দ্রিক উক্ত মধ্যস্বত্বভোগীর অস্তিত্ব ছিল বটে, কিন্তু শ্রেণীস্বার্থ সম্পর্কে তারা সচেতন ছিল না ; কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির কারণে তারা গ্রামে ছড়িয়ে থাকত ; কেন্দ্রের প্রশাসনযন্ত্র বিস্তৃত না হওয়ায় রাজধানীতেও তাদের সংখ্যা বেশি ছিল না। ফলে তারা কোন এক জায়গায় একত্র হওয়ার সুযোগ পায়নি। এসব কারণে তারা দেশের সমাজ-সংস্কৃতিতে কিংবা অর্থনীতি-রাজনীতিতে নিজস্ব প্রভাব ফেলতে পারেনি। সমাজে তাদের কোন স্বাধীন, গতিশীল সত্তা ছিল না।[৮৪] সে যুগে এক 'দরবার-সংস্কৃতি', আর এক 'লোক-সংস্কৃতি' ছিল, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল না। সামন্ত যুগের প্রাসাদকেন্দ্রিক রাজনীতি এবং ভূমি ও কুটীরশিল্প কেন্দ্রিক অর্থনীতির স্থবিরতা ভেঙে দিয়ে যখন প্রশাসনযন্ত্রের পরিবর্তন ঘটে ও কলেবর বৃদ্ধি পায় এবং বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে বৈচিত্র্য, প্রসারতা ও গতিশীলতা আসে তখনই দেখা দেয় জটিল, সংকরধর্মী আধুনিক

---

৮২. Edwin R.A. Seligman (ed.)--*Encyclopeadia of Social Sciences*, Vol. 9, The Macmillan Company, New York, 1950, P. 407 (Reprinted).

৮৩. *Encyclopeadia of Social Sciences*, Vol. 9, P. 407

৮৪. *বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, পৃ: ৫৭

মধ্যবিত্তশ্রেণী। নতুন নতুন কর্মক্ষেত্রের উদ্ভব ও বিস্তারের ফলে আগের তুলনায় এর আকৃতি বেড়ে যায়। প্রকৃতির দিক থেকেও অনেক পরিবর্তন ঘটে। এর গঠনে বহুমাত্রিক উপাদান থাকলেও শহর-নগরে একত্র বসবাসের ফলে জীবন ধারা, আচরণ পদ্ধতি, চিন্তাকর্ম ও সামাজিক মূল্যবোধের একটি অভিন্ন শ্রেণী-ঐক্য গড়ে ওঠে।[৮৫] জাগ্রত, শিক্ষিত, উন্নত শ্রেণী হিসাবে একটি মার্জিত ও পরিশীলিত সংস্কৃতির উদ্ভব হয় যা কেতাদুরস্ত দরবার-সংস্কৃতি ও স্থূল রুচির লোক-সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। আঞ্চলিকতামুক্ত সকলের বোধগম্য ভাষা মৌখিক কথাবার্তার ও সাহিত্যের বাহন হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই মধ্যবিত্তশ্রেণী সমাজে নেতৃত্ব দেয়। উদ্ভাবনীশক্তি ও মননশীল ক্রিয়াকলাপ দ্বারা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে কতক ক্ষেত্রে এ শ্রেণীর পিছুটানও ছিল। উৎপাদনের সহিত প্রত্যক্ষ যোগ না থাকায় এ শ্রেণী সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি ; খাদ্য ও নিত্য ব্যবহার্য দ্রব্যের জন্য তাকে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণীর মুখাপেক্ষী হতেই হয়। পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতি ও ক্ষমতাশীলদের তাবেদারী করতে হয়। এরূপ পরনির্ভরশীলতার জন্য শ্রেণী-সংঘাত বা বিপ্লবের ঝুঁকি নিতে পারে না। এ-শ্রেণী মেধা, বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশক্তি, কুশলতা ও সৃজনশীলতার কারণে সমাজের সারভাগ হিসাবে সুবিধা ভোগ করে ঠিক, কিন্তু সেই সঙ্গে উপর তলার প্রভুদের এবং নীচু তলার সর্বহারাদের মধ্যকার শোষণ ও বঞ্চনার হাতিয়ার হিসাবেও কাজ করে।

সামাজিক শ্রেণী হিসাবে নগরকেন্দ্রিক মধ্যবিত্তের উদ্ভব ও বিকাশের মূল উৎস যন্ত্রশিল্প ও বাণিজ্য। বাণিজ্যিক পুঁজিপতি ও শিল্পপতিরাই ইউরোপীয় সামন্ত-শাসনের অবসান ঘটান এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। এঁদের কলকারখানা, ফার্ম, ব্যাংক, গিল্ড, পার্টি, এজেন্সী চালাবার জন্য এবং রাষ্ট্রযন্ত্রের যাবতীয় কাজকর্ম পরিচালনার জন্য কায়েমী স্বার্থবাদী মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়। ইংরাজ কর্তৃক শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ভারতবর্ষে সামন্ত সমাজ ব্যবস্থাই চালু ছিল। ভূমির রাজস্ব ছিল রাজভাণ্ডারের মূল উৎস। কৃষকের ঘর থেকে এই রাজস্ব আসত। তবে একথা ঠিক যে, মোঘল সাম্রাজ্যের শেষভাগে মহাজনী কারবারে ও বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগ করে একটি ধনিক শ্রেণীর হাত ক্রমশ শক্ত হয়েছিল। সিরাজদ্দৌলার টাকশালের মালিক ছিলেন জগৎ শেঠ। উমি চাঁদ ছিলেন বিত্তশালী বণিক। এঁরা নবাবদের বিলাসিতায় ও যুদ্ধে অর্থ যোগাতেন, ইংরাজ কোম্পানিকেও ঋণ দিতেন। অর্থের পাহাড় বানিয়ে এঁরা সামন্তপ্রভুর কাছে সামাজিক উচ্চ মর্যাদা পেতেন না, ধনসম্পত্তির নিরাপত্তাও ছিল অনিশ্চিত। ফলে

৮৫. বি. বি. মিশ্র লিখেছেন, "though heterogeneous and even mutually conflicting at times, exhibited in great measure an element of uniformity not only in their behaviour pattern and style of life, but also in their mode of thinking and social values."
B.B. Misra--*The Indian Middle Class*, Oxford University Press, London, 1961, P. 12.

তাঁদের সাথে সামন্তশক্তির দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, এক্ষেত্রে বণিক কোম্পানি তাঁদের সহায়ক হয়েছে।

বণিক সরকার কোম্পানির দ্বারাই কলিকাতায় আধুনিক মধ্যবিত্তের পত্তন হয়। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েও কোম্পানি ঔপনিবেশিক বাণিজ্যনীতি বজায় রাখেন, প্রথমে এদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করেননি। প্রশাসন ও বাণিজ্যের উপর তলায় সমাসীন থেকে দেশ শাসন ও শোষণ করতে থাকেন। এক্ষেত্রে পুরাতন সামন্ত ব্যবস্থাকে ভেঙে না দিয়ে বরং টিকিয়ে রাখেন, কারণ রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে এঁদের সহযোগিতা আবশ্যক ছিল, উপরন্তু সামরিক নিরাপত্তা, সামাজিক মর্যাদা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা দিয়ে এঁদের অনুগত করে রাখা সম্ভব হবে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমিতে বংশ পরম্পরায় ভোগাধিকার দিয়ে জমিদারদের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত করেন। পরপর কতকগুলি রাজস্বনীতির প্রবর্তনের ফলে পুরাতন জমিদাররা ধ্বংস হন, তার স্থলে শহরের নব্য বিত্তবানরা জমিদারী কিনে ভূমির মালিক হন। কলিকাতার বিত্তবানদের এছাড়া পুঁজি বিনিয়োগের অন্য পথও ছিল না। বাণিজ্য প্রায় একচেটিয়া কোম্পানির দখলে ছিল। ইংরাজ এদেশে কলকারখানা স্থাপন করতে চাননি, তাঁরা এদেশের কাঁচা মাল দিয়ে ম্যানচেস্টারের মিল চালাতেন। বহির্বাণিজ্যে পুঁজি বিনিয়োগের ঝুঁকি নিতে সাহস করতেন না দেশীয় ধনী ব্যবসায়ীরা। দ্বারকানাথ প্রথম বহির্বাণিজ্যে পুঁজি খাটিয়ে ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে পারেননি।[৮৬] ফলে ভূমির দিকেই ঝোঁক বাড়ে। ভূস্বামী হয়ে অনেকে কৌলিন্যের মর্যাদা বাড়াতে অভিলাষী হয়েছেন। ফলে দেশে সামন্ত-প্রভাব বজায় থাকল। ডক্টর নজমুল করিম মোঘল শাসনকে 'সামরিক সামন্ততন্ত্র' বলেছেন[৮৭], বণিক কোম্পানির শাসনকে 'ঔপনিবেশিক সামন্ততন্ত্র' বলা যেতে পারে। ইংরাজগণ রাজস্বনীতি, ভূমিসংস্কার ব্যবস্থার পরিবর্তন সাধন করে রাজস্ব বিভাগকে সম্প্রসারিত করেন। ভূমিতে প্রজাস্বত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, ফলে কেনাবেচায় রেজিস্ট্রেশন আবশ্যক হয়ে পড়ে। নতুন ভূমি উদ্ধার ও ভোগদখল নিয়ে প্রজায় প্রজায়, কি জমিদারে জমিদারে মামলার সংখ্যা বেড়ে যায় ; ফলে দেওয়ানী আদালতের দায়িত্ব বাড়ে ও আইন ব্যবসায়ে কর্মচারীর সংখ্যা বাড়ে। উকিল, মোক্তার, ব্যারিস্টার, সলিসিটর, এ্যাটর্নি, মুন্সেফ, জাস্টিস, পেস্কার, ভেণ্ডার প্রভৃতি কর্মচারীর আবির্ভাব হয়।

ইংরাজগণ প্রশাসন ব্যবস্থায় বহুবিধ সংস্কার সাধন করেন। গভর্নর-জেনারেল সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ; তিনি কার্যকরী সংসদের পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন। গভর্নর-জেনারেলের অধীনে বিভাগগুলিতে ডিভিশনাল কমিশনার, জেলাগুলিতে ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট, মহকুমায় ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট, থানায় পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর এবং গ্রামে চৌকিদার থাকবেন। চৌকিদার ছাড়া আর আর সব রাজকার্যের নিজস্ব দপ্তর আছে

৮৬. বিনয় ঘোষ—*বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা* (১৮০০-১৯০০), পাঠভবন, কলিকাতা, ১৯৬৮, পৃ: ১১৫

৮৭. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, P. 36.

সেগুলির বিভিন্ন কর্মচরী আছে। গভর্নর থাকেন রাজধানী কলিকাতায় রাজভবনে, কলিকাতায় একটি উচ্চ আদালতও স্থাপিত হয় (১৭৯১)।

ইংরাজ আমলে শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন হয়। টোল-চতুষ্পাঠী, মক্তব-মাদ্রাসার যুগ পেরিয়ে পাঠশালা, স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের যুগ আসে। ইংরাজগণ ক্রমে ক্রমে দেশব্যাপী একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থার প্রবর্তন করেন। ইংরাজি ভাষা, পাশ্চাত্য বিদ্যা, পাশ্চাত্য শিক্ষা পদ্ধতি আমদানী হয়। মানবিক বিদ্যা, বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরে শিক্ষা সম্প্রসারিত হয়। বিদ্যালয়ের সংখ্যা ও শিক্ষার হার বৃদ্ধির সাথে শিক্ষক-অধ্যাপক-শ্রেণীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির প্রশাসন কাজ চালাবার জন্য কর্মচারীও দরকার হয়। একটি বিপুল আকার শিক্ষা বিভাগ গড়ে উঠল যার প্রধান কেন্দ্র হল কলিকাতা। শিক্ষা ব্যবস্থা তদারক করার জন্য প্রথমে 'জেনেরাল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' (১৮২৩), পরে কাউন্সিল অব এডুকেশন' (১৮৪৩) এবং তৎপর 'ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন' (১৮৫৪) গঠিত হয়। শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মচারী হিসাবে বহু লোক চাকুরিজীবী হলেন। শিক্ষা, সাহিত্য, সংবাদপত্র, মুদ্রণশিল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে পেশাদার-অপেশাদার বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর উদ্ভব হয়।

ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে আমদানি-রপ্তানির সম্প্রসারণ ঘটে এবং নতুন নতুন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলিতে ম্যানেজার, এ্যাকাউন্ট্যান্ট, কেরানী, সুপারভাইজার, এজেন্ট, পিয়ন, চাপরাশীর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। কাগজ, কাপড়, তেল, ধান, পাট, নীল প্রভৃতির ছোটখাট কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়, সেগুলিতে শ্রমিক ও কর্মচারীর ভিড় জমে। রেল, স্টীমার চালু হলে গার্ড, ড্রাইভার, টিকিট-চেকার, স্টেশন-মাস্টার, সারেঙ্গ, খালাসী, কুলি ইত্যাদি লোকের আবির্ভাব হয়।

ডাক-তার-টেলিফোন ইত্যাদি বিভাগে কর্মচারী নিযুক্ত হয়। এসব বিভাগের প্রধান কেন্দ্র হল কলিকাতা। কলিকাতায় ভাগ্যান্বেষীর দল সমবেত হয়ে বিভিন্ন পেশাজীবী মিশ্র সমাজস্তর গড়ে তোলে যাকে শহরকেন্দ্রিক শ্রেণীসচেতন আধুনিক মধ্যবিত্তশ্রেণী বলা হয়েছে। রাজধানী-শহর, শিল্প-শহর, বন্দর-শহর প্রভৃতি অঞ্চলে এক এক কাজের গুরুত্ব অনুসারে কর্মচারী ও শ্রমিকশ্রেণীর ভিড় হয়েছে ও শহরের কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে। ইউরোপীয় শহরগুলিতে মধ্যবিত্তের গঠনে শিল্প ও বাণিজ্যিক কর্মী ও কর্মচারীর সংখ্যা বেশি। ভারতীয় শহরগুলিতে প্রধানত সরকারি ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, শিক্ষক-ডাক্তার, আইনজীবী প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীর সমন্বয়ে মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে উঠেছে।[৮৮] ডক্টর বি. বি. মিশ্র ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিশ্লেষণ করে এগারটি গ্রুপ নির্ণয় করেছেন, সেগুলি হল :

১. আধুনিক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের মার্চেন্ট, এজেন্ট, প্রোপাইটার, সংশ্লিষ্ট পার্টনার, ডিরেক্টর ইত্যাদি।

৮৮. *The Indian Middle Class*, P. 12

২. ব্যাংক, বাণিজ্য ও শিল্প-ব্যবসায়ে নিযুক্ত উচ্চ কর্মকর্তা তথা ম্যানেজার, ইনস্পেক্টর, সুপারভাইজার এবং প্রযুক্তিবিদ।

৩. ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক সংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, জনকল্যাণমূলক সংস্থা, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানের উচ্চ বেতনভুক্ত কর্মচারী।

৪. সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারিবৃন্দ।

৫. আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, অধ্যাপক, উচ্চ ও মাঝারি শ্রেণীর লেখক, সাংবাদিক, গায়ক, চিত্রশিল্পী, ধর্ম প্রচারক ও পুরোহিত।

৬. মাঝারি ধরনের জোতদার, খামার মালিক ইত্যাদি।

৭. ভাল পসার আছে এমন দোকান, হোটেল ইত্যাদির মালিক এবং সেগুলিতে নিযুক্ত ম্যানেজার, একাউন্ট্যান্ট প্রভৃতি কর্মচারী।

৮. কৃষি খামারের মালিক এবং কর্মচারী।

৯. বিশ্ববিদ্যালয়ের স্তরে অধ্যয়নরত ছাত্রবৃন্দ।

১০. বিপুল সংখ্যক কেরানী, সহকারী এবং অনুরূপ কায়িক শ্রমহীন কর্মচারী।

১১. মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চ পদের শিক্ষক, স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের অফিসার, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দ।[৮৯]

শাসন ক্ষমতায় আসাব আগে বণিক কোম্পানির সংসর্গে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা প্রধানত দোভাষী, কেরানী, গোমস্তা, দালাল, সরকার, মুৎসুদ্দী, মুনশী, দফাদার, ঠিকাদার, দেওয়ান ইত্যাদির কাজ করতেন। গন্ধবণিক, সুবর্ণবণিক প্রভৃতি দেশীয় কারিগর কলিকাতায় বসতি স্থাপন করেন। বর্গী হাঙ্গামার সময় (১৭৪২) উপদ্রুত অঞ্চলের ধনী লোকেরা নিরাপত্তার জন্য কলিকাতায় আগমন করে বসবাস শুরু করেন।[৯০] কোম্পানি কর্তৃক দেশের শাসন ভার গ্রহণের পর কলিকাতা রাজধানীর মর্যাদা লাভ করে, ফলে সেখানকার প্রশাসন ক্ষেত্রে চাকুরির সুযোগ বৃদ্ধি পায়। উচ্চ পদগুলিতে ইউরোপীয়দের একচেটিয়া অধিকার ছিল, অধস্তন পদগুলি দেশীয় কর্মচারী দ্বারা পূরণ করা হত। ক্রমে ক্রমে দেশের শিল্প ধ্বংস হয়ে যাওয়ায় এবং নতুন শিল্পের (বিশেষ করে যন্ত্রশিল্পের) আমদানি না হওয়ায় দেশীয় লোকের কাছে কৃষি, ক্ষুদ্র ব্যবসায় ও চাকুরি ছাড়া আর কিছু উপায় ছিল না। কেরানী, মুনশী, পিয়ন, চাপরাশি চাকুরির কাজে বাঙালিরা কলিকাতায় সমবেত হয়। ক্রমে এদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার হয়, সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকুরির সংখ্যা বাড়ে, পরে কিছু কিছু উচ্চ পদ লাভের সুযোগ ঘটে ; আইন, ডাক্তারী, শিক্ষকতা প্রভৃতি স্বাধীন পেশারও উদ্ভব হয়। এদের সমন্বয়ে শিক্ষিত মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে ওঠে। দেশের মফস্বল শহরগুলিতে কলিকাতার আদর্শেই মধ্যবিত্তের বিকাশ হয় ; গ্রামাঞ্চলে ভূমির সাথে সম্পৃক্ত ভূস্বামী, তালুকদার, পত্তনিদার, গাঁতিদার,

৮৯. *The Indian Middle Class*, PP. 12-13

৯০. *Muslims of Calcutta*, P. 15 ; ***বাঙালীর সংবাদপত্র ও নবজাগরণ***, ৮৫

জোতদার, দাদনদার, মহাজন, জমিদারী আমলার সমন্বয়ে মধ্যবিত্তের একটি প্রবাহ কমবেশি পূর্বকাল হতেই ছিল। ব্যবসায়িক পেশাগত এবং ভূমিসম্পৃক্ত মধ্যবিত্তশ্রেণীর এই তিনটি ধারা আধুনিক মধ্যবিত্তের প্রধান উপাদান ছিল। এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে যে, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে যে ভাবে মধ্যবিত্তের উদ্ভব হয়েছিল, ভারতবর্ষে সে ভাবে হয়নি। উভয়ের মধ্যে উপাদানের দিক থেকেও পার্থক্য আছে। বাণিজ্য দ্বারা ইউরোপে যখন ধনতন্ত্রের বিকাশ হয় তখন সেখানে মধ্যবিত্ত বলতে বুর্জোয়াশ্রেণী ছিল। এই বুর্জোয়া মধ্যবিত্ত যন্ত্রশিল্পে পুঁজি বিনিয়োগ করে পুঁজিপতি হন। ইউরোপীয় মধ্যবিত্তশ্রেণী মুখ্যত সেই শিল্প ও বাণিজ্যিকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। আমাদের দেশে হিন্দু ও মুসলমান আমলেও একটা ধনী ব্যবসায়ী ও ভূস্বামী শ্রেণী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা ইউরোপীয় ধনিক শ্রেণীর মত রাজনৈতিক শক্তির অধিকারী ছিলেন না। এজন্য তাঁরা ইউরোপীয় পুঁজিপতিদের মত সরাসরি কোন ভূমিকা পালন করতে পারেননি। ইংরাজদের সহযোগিতায় যে মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভব হল, তা প্রধানত প্রশাসনিক চাকুরি ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠল।[৯১]

আমরা পূর্বে দেখেছি ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদের পতনে মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার, ১৭৯৯ সালে মহীশূরের পতনে টিপু সুলতানের রাজপরিবার এবং ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার পতনে শাহ ওয়াজিদ আলীর নবাব পরিবার কলিকাতায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। এসব পরিবারের সাথে বিপুল সংখ্যক কর্মচারী, দাসদাসী ও আশ্রিত বাৎসল্যজনেরও আগমন ঘটে। ১৭৮০ সালে স্থাপিত কলিকাতা মাদ্রাসার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বিচার কার্যে দক্ষ কর্মচারী তৈরি করা। রাজভাষা ফারসি ও আদালতে মুসলমান আইন বলবৎ থাকায় মুসলমানদের একটি শ্রেণী রাজকার্য পেয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। বিশেষত সদর আমীন, আমীন, কাজি-অল-কুজ্জাত, কাজি, মুফতি, মুনশী, মৌলবী, উকিল, মুহুরী, নকলনবিশ, অনুবাদক, জেলর, দারোগা প্রভৃতির কাজে মুসলমানদের প্রাধান্য ছিল।[৯২] ধর্মপ্রচার ও শিক্ষকতার পেশায় আর একটি শ্রেণী নিযুক্ত ছিলেন। কতকগুলি ছোটখাটো ব্যবসায় বাঙালি-অবাঙালি মুসলমানের একচেটিয়া দখলে ছিল, সেকথাও পূর্বে উল্লেখ করেছি। ভূমির সাথেও তাদের একটা অংশ যুক্ত ছিল। হিন্দুর সহিত তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা কম হলেও মধ্যবিত্তের সব স্তরে তাদের স্থান ছিল। কিন্তু যখন একদিকে মধ্যবিত্তের গঠনের পালা চলছে এবং অপরদিকে আধুনিক শিক্ষার মাধ্যমে নতুন মূল্যবোধ, নতুন জীবনধারার সৃষ্টি হচ্ছে তখন হিন্দু ও মুসলমানের বিকাশ একমুখী হয়নি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত দুই সম্প্রদায়ের গতি যে প্রায় বিপরীত মুখী ছিল, সেকথাও পূর্বে আলোচনা করেছি।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাঙালি মুসলমানের নতুন যাত্রা শুরু হয়। আধুনিক জীবনের প্রধান 'জীয়ন-কাঠি' ছিল ইংরাজি শিক্ষা ও পাশচাত্য বিদ্যা ; সেই ভাষা ও বিদ্যা

৯১. *The Indian Middle Class*, P. 5 (preface).
৯২. *British Policy and the Muslims in Begnal*, P. 47

শিক্ষার মধ্য দিয়েই মুসলমান সমাজের নবচেতনা জাগ্রত হয়। পঞ্চাশ বছর আগে হিন্দু সমাজ যা করেছিল, পঞ্চাশ বছর পরে মুসলমান সমাজকে সেই পথ অনুসরণ করতে হল। রামমোহন রায় (১৭৭৩–১৮৩৩) ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, জন ডিগবীর অধীনে সেরেস্তাদারের চাকুরি করার সময় তিনি ইংরাজি শিখেন, ১৮১৫ সালে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'আত্মীয় সভা' স্থাপন করেন এবং কলিকাতার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মনে একটা নতুন পথের সন্ধান দেন। কলিকাতা মাদ্রাসার জুনিয়র স্কলারশিপ পাশ ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ (১৮২৮–১৮৯৩) ১৮৫৯ সালে আলীপুরে বদলী হয়ে আসেন ; ১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করে কলিকাতার শরিফ মুসলমানদের চিন্তার জগতে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন।

কলিকাতা ও কলিকাতার বাইরে বাংলার যে কয়টি অভিজাত পরিবার ছিল, সেগুলি আধুনিক যুগের গতি–প্রকৃতি, শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে প্রায় উদাসীন ছিল। পরিবারের সদস্যগণ আরবি–ফারসি ভাষা ও সাহিত্যকে উন্নত মনে করতেন এবং সেসব ভাষাতেই সন্তানদের শিক্ষা দিতেন। ফারসি ভাষার ক্লাসিক মর্যাদা ছিল ; ফারসি সাহিত্যও উন্নত মানের ছিল। প্রথমে যে ইংরাজি বিদ্যা শিখানো হত, তা মূলত সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিল, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, দর্শন শিক্ষার ব্যবস্থা হয় অনেক পরে। এক চাকুরির সুবিধা পাওয়া ছাড়া ইংরাজির প্রতি শরীফ মুসলমানেরা অন্য কোন আকর্ষণ অনুভব করেননি। প্রথম দিকে অফিস–আদালতে ফারসি চালু থাকায় চাকুরির কারণে ইংরাজি শিক্ষার তাগিদও ছিল না। ফারসি শিক্ষাব প্রতি মোহ ও ইংরাজি শিক্ষার তাগিদের অভাব—এই উভয়বিধ কারণে তাঁরা পূর্বপুরুষেব শিক্ষা–দীক্ষা, আচার–আচরণ ও চিন্তার জগতে মগ্ন ছিলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর তাঁদের মনে ক্ষোভ থাকা খুবই স্বাভাবিক ছিল ; এর উপর ইংরাজদের হাতে মুসলমান শক্তিগুলির একের পর এক পতনে তাঁদের মর্মজ্বালা বৃদ্ধি পায়। কলিকাতা থেকে সমস্ত অভিযান চালান হত।[৯৩] উত্তর ভারতের মুসলমানদের মনে এ ব্যাপারে গভীর প্রতিক্রিয়া হয়। আফগান সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির সমালোচনা করে এ দেশের কোন এক উর্দু পত্রিকায় লেখা হয় যে, আফগানরা ব্রিটিশ সিংহকে লাথি মেরে আরব সাগরে নিক্ষিপ্ত করবে।[৯৪] সুতরাং ইংরাজদের সাথে তাদের সদ্ভাব ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসে। কলিকাতার উঠতি, 'বাবু শ্রেণী'র ও ধনিকশ্রেণীর মনে এ ধরনের বিরোধ বা প্রতিক্রিয়া বিশেষ একটা ছিল না। ইংরাজ বিজয়কে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁরা সভা, পার্টি, উৎসব করতেন। বার্মা ও শিখ যুদ্ধে ঈশ্বরগুপ্ত ইংরাজ বিজয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। টিপু পতনের পর একজন হিন্দু রাজাকে সিংহাসনে বসানো হলে কলিকাতার

৯৩ ১৭৯৯ সালে মহীশুরের পতন, ১৮৪৩ সালে সিন্ধুর আমীরদের পতন, ১৮৫৫ সালে আফগানিস্তানের পরাজয়, ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার পতন, ১৮৫৭ সালে দিল্লীর পতন হয়। শিখ ও মারাঠার পরাজয়ে মুৎসুদ্দী হিন্দু শ্রেণীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি। ব্রিটিশ সৈন্যের কাছে শিখদের পবাজয়ে কবি–সাংবাদিক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত উল্লাস প্রকাশ করেন।

৯৪. পূর্বোক্ত, *অনুশীলন*, আশ্বিন ১৩৭২

হিন্দুগণ কোম্পানির কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।[৯৫] শিক্ষিত প্রগতিশীল হিন্দু নেতৃবৃন্দ যেসব ধর্মীয় ও সামাজিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন মুসলমান সমাজের পক্ষে সেসব আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা ছিল না। গঙ্গাজলে সন্তান বিসর্জন, সতীদাহ, বিধবাবিবাহ, কুলীনপ্রথা ইত্যাদি মুসলমান সমাজের সমস্যা ছিল না। সরকারের সাথে দাবীদাওয়ার ব্যাপারে হিন্দু নব্য সম্প্রদায় যে সুর তুলেছেন, সেগুলি মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল : যেমন ফারসির স্থলে ইংরাজীকে রাজভাষা করা, সরকারি চাকুরিতে ইংরাজি শিক্ষিত যুবকদের অগ্রাধিকার দেওয়া, চাকুরি নিয়োগে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়া ইত্যাদি। উগ্রপন্থী ইয়ং বেঙ্গলরা তাঁদের মুখপত্র 'রিফর্মার', 'জ্ঞানান্বেষণ' ও 'এনকোয়ারে' এসব ব্যাপারে জোর আন্দোলন করেছে।[৯৬] সুতরাং হিন্দুদের সাথে একত্রে মিলে আন্দোলন করাও সম্ভব হয়নি। বস্তুতপক্ষে কলিকাতার শরীফ শ্রেণী জীবনের কাছে পরাজিত হয়ে ক্রমশ নির্জীব ও নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন। এরূপ অবস্থায় প্রাচীন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আঁকড়ে পড়ে থাকা ছাড়া আর গত্যন্তর ছিল না। সরকারি অর্থে পরিচালিত সর্ব প্রাচীন কলিকাতা মাদ্রাসাকে যুগোপযোগী শিক্ষার অঙ্গন করে তাঁরা আধুনিকতার সাথে খাপ খাইয়ে চলতে পারতেন। কিন্তু কার্যত তা হয়নি। ১৮২৩ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজি শিক্ষার প্রস্তাব উঠলে পর মাদ্রাসায় প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮২৬ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত ২০ বছরের ইতিহাসে আবদুল লতিফ ও ওয়াহিদুন্নবী মাত্র দুজন জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করতে সক্ষম হয়। ঐ সময়ের মধ্যে হুগলী কলেজ থেকে সৈয়দ ওয়ারেস আলী ও মুসা আলী জুনিয়র স্কলারশিপ পাশ করেন। সৈয়দ ওয়ারেস আলী ছিলেন সৈয়দ আমীর আলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। উক্ত চার ব্যক্তি ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কালেক্টর হয়েছিলেন।[৯৭]

আবদুল লতিফ ১৮৪৯ সালে ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট হন। তিনি ১৮৫৩ সালে ১০০ টাকার পুরস্কার ঘোষণা করে একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহবান করেন। প্রবন্ধের বিষয় ছিল ভারতের বর্তমান অবস্থায় মুসলমান ছাত্রের জন্য ইংরাজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার উপকারিতা এবং সে-শিক্ষার গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি।[৯৮] এডুকেশন কাউন্সিলের তদানীন্তন সেক্রেটারী এফ. জে. মোয়াট আবদুল লতিফকে এ ব্যাপারে উৎসাহ ও সহযোগিতা দান করেন। ইংরাজি শিক্ষার পক্ষে ও বিপক্ষে অনেক প্রবন্ধ এসেছিল। বোম্বাই এর জনৈক আরবি-ফারসি শিক্ষক (সৈয়দ আবদুল ফাত্তাহ) ইংরাজি শিক্ষার পক্ষে প্রবন্ধ লিখে পুরস্কার পান।[৯৯] বাংলার ছোটলাট স্যার জে.পি. গ্রান্টের নির্দেশ ক্রমে

৯৫. পূর্বোক্ত, *অনুশীলন*, আশ্বিন ১৩৭২
৯৬. ঐ।
৯৭. সৈয়দ মর্তুজা আলী—*মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃ: ৭২
৯৮. Enamul Huq (edited)--*Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, Samudra Prakashani, Dacca, 1968, P. 179
৯৯. ঐ, পৃ: ১৮০

আবদুল লতিফ ১৮৬১ সালে হুগলী মাদ্রাসা সম্পর্কে তদন্ত করেন এবং ঐ বছর ডিসেম্বর মাসে একটি সুচিন্তিত রিপোর্ট প্রদান করেন।[১০০] তিনি ১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করেন। সোসাইটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা বিস্তার করা।[১০১] আবদুল লতিফের পর সৈয়দ আমীর আলীর আবির্ভাব হয় ; তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ. বিএল এবং বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি করেন। ১৮৭৭ সালে তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' গঠন করেন। এটি মূলত রাজনৈতিক সংগঠন হলেও এব কর্মসূচীতে সমাজ, শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সৈয়দ আমীর আলী ইংরাজি শিক্ষার পুরোপুরি সমর্থক ছিলেন। প্রায় একই সময়ে দিল্লীর সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮) ইংরাজি শিক্ষার সপক্ষে সারা উত্তর ভারতে এক প্রবল আন্দোলন শুরু করেন। ১৮৭৫ সালে 'আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো-ওরিয়েন্টাল কলেজ' স্থাপন করে তাঁর আন্দোলনকে বাস্তব রূপ ও ভিত্তি দান করেন। সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ সিপাহী বিদ্রোহ সমর্থন করেননি ; সন্দেহপরায়ণ ইংরাজ শাসকের মনোভাব যাতে কঠোরতর না হয় সেজন্য তাঁরা উভয়ে নীলকণ্ঠের মত বশ্যতার হলাহল পান করে বিদেশী শাসকের পক্ষাবলম্বন করেন ; তাঁরা চেয়েছেন স্বজাতিব পক্ষ হয়ে বিরূপ শাসকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করতে। ভারতবর্ষেব মুসলমান জাতির ভাগ্যাকাশে হতাশার যে ধূম্রাচ্ছন্ন মেঘ জমেছিল, তাব আবরণ ভেদ করে নবীন সূর্যের উদয় হল। একটি ম্রিয়মান সুপ্তিমগ্ন জাতি আত্মসম্বিৎ ফিরে পেল এবং নতুন আশায় বুক বেঁধে কাজ করার প্রেরণা লাভ করল।

মুসলমান সমাজের গোঁড়া ও সংস্কাবপন্থী একটি অংশ ইংরাজি শিক্ষার বিরোধিতা করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ শহীদ এদেশকে 'দারুল হরব' (শত্রুভূমি) ঘোষণা করে 'জেহাদ আন্দোলন' শুরু করেছিলেন। বিধর্মী শাসিত রাষ্ট্রে ধর্মপালনে বাধা-বিঘ্ন সৃষ্টি হলে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ করা ইসলামে নির্দেশ আছে। সৈয়দ আহমদ শহীদ প্রথমে শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন (১৮২৬), পরে তাঁর অনুসারীদের সাথে কোম্পানির সংঘর্ষ হয়।[১০২] সৈয়দ আহমদ শহীদের সীমান্ত যুদ্ধে সাহায্য করার জন্য বাংলাদেশ থেকে চাঁদার অর্থ ও মুজাহিদ প্রেরিত হত।[১০৩] সৈয়দ আহমদ শহীদ আবদুল ওয়াহাবের

১০০. ঐ, পৃ: ১৯৭৩

১০১. দ্বিতীয় অধ্যাযেব 'সভাসমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

১০২. শিখদের বিরুদ্ধে সৈয়দ আহদ শহীদের অভিযোগ ছিল যে, শিখদের অত্যাচারে শিখরাজ্যে মুসলমানরা স্বাভাবিকভাবে নামাজ পড়তে পারে না, সেখানে গো-বধ নিষিদ্ধ, মুসলমান মেয়েদের ধর্মান্তব গ্রহণে বাধ্য করা হয় এবং মুসলিম-শিখ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়। মুসলমানদের মুক্ত কবার জন্য এক্ষেত্রে ধর্মযুদ্ধ জায়েজ (সিদ্ধ)। অমলেন্দু দে— *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, রত্না প্রকাশন, কলিকাতা., ১৯৭৪, পৃ: ১৭

১০৩. *The Indian Mussalmans*, P. 67

(১৭০৩–১৭৯২) আদর্শে ইসলামীকরণ উদ্দেশ্যে খাঁটি শরীয়ত অনুযায়ী ধর্মকর্ম করার মত প্রচার করেন ; এর নাম ছিল 'তরিকায়ে মহম্মদীয়া'। ভারতবর্ষে এই আন্দোলন 'ওয়াহাবী আন্দোলন' নামে আখ্যাত হয়। অপর কোন জাতির ভাষা ও জ্ঞান শিক্ষার ব্যাপারে ইসলামের নীতিগত কোন বাধা ছিল না। কিন্তু ওয়াহাবী আন্দোলনের সমর্থকেরা ইংরাজ জাতির প্রতি বিদ্বেষ বশত ইংরাজি ভাষা ও বিদ্যার প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করে ঐ ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষা 'হারাম' (নিষিদ্ধ) বলে প্রচার করেন। বাংলাদেশে ওয়াহাবীপন্থী ও গোঁড়া মোল্লাশ্রেণী ঐরূপ মনোভাবের দ্বারা লালিত হয়ে ইংরাজি শিক্ষার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলেন। গ্রামদেশে এর প্রভাব পড়ে। কিন্তু শহরের অভিজাত ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত পরিবারে ইংরাজি শিক্ষার প্রতি কোন সংস্কার ছিল না।[১০৪] তবে তাঁদের সংস্কৃতির ভাষা ফারসির প্রতি মোহ এবং সমৃদ্ধ ফারসি সাহিত্য-দর্শন সম্পর্কে গর্ব ছিল।[১০৫] প্রথম দিকে চাকুরির কারণেও ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজন হয়নি, ফারসি শিখলেও চাকুরি পাওয়া যেত। ইংরাজি ভাষার প্রতি তাঁদের অনাগ্রহ বা বিমুখতা ছিল সত্য, কিন্তু বিরোধিতা ছিল না। যখন ইংরাজি শিক্ষার আবশ্যকতা দেখা দিল, তখন নানা কারণে অনেক পরিবার দরিদ্র হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে ইংরাজি শিক্ষা শহরে কেন্দ্রীভূত ছিল। শহরে পাঠিয়ে ব্যয়বহুল

১০৪. *British Policy and the Muslims in Bengal*, PP 189-90

১০৫. পাদরী জেমস লঙের অভিমত, "খুব সঙ্গত কারণেই মুসলমানেরা আরবি ও ফারসি ভাষার জন্য গর্ব অনুভব করে। এই দুটো ভাষা মুসলিম ধর্মের ও শাসনের বাণীবাহক এবং তাঁদের মহান ঐতিহ্যের ধারক ছিল। এই বিষয়ে তাঁদের অনুভূতি তখনও খুব প্রখর ছিল।" *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ*, পৃ: ১৫৬ (জেমস লঙের ১৮৬৯ সালে লেখা 'সোস্যাল কনডিশন অব দি মহামেডানস' প্রবন্ধের বরাত দিয়ে তিনি ঐ উক্তি করেছেন।) অবশ্য, বনেদী মুসলমান সম্পর্কে এ-উক্তি প্রযোজ্য, যাঁদের বেশির ভাগই অবাঙালি ছিলেন। ১৮৮০ সালে সঈদ (দেলওয়ার হোসেন আহমদের ছদ্মনাম) 'দি ফিউচার অব দি মহামেডানস অব বেঙ্গল' নামক পুস্তিকায় ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ না করার পিছনে প্রায় অনুরূপ যুক্তি দিয়েছেন। তাঁর অভিমত, "This aversion to English education is traceable to pride of race not felt by the Hindus, to their possesion of a rich literature of their own, to their greater religious bigotry and partly to their poverty."
The Calcutta Review, Vol LXXII, No CXLIV, 1881, P. V
১৮৮১ সালে 'এডুকেশন রিপোর্টে' হান্টার মন্তব্য করেন', "A candid Mahomedan would probably admit that the most powerful factors are to be found in pride of race, a memory of by-gone superiority, relegious fears and a not unnatural attachment to the learning of Islam"
W W Hunter--*Report of the Indian Education Commission*, 1883.
স্কুল ইন্সপেক্টর আবদুল করিম তাঁর 'এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে বলেছেন যে, ধর্মের দিক থেকে হিন্দুদের মত মুসলমানদের তেমন ভয় ছিল না, কেননা ইসলামের নীতিগুলি সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাস সহজে বিচলিত হওয়ার কথা নয়। তিনি বলেন, "...ancient conquering race cannot easily divert itself of the traditions of its nobler days. The Musalmans, confident of the implicity of their system of education, continued to pursue their old studies."
Mohammedan Education in Bengal, P. 6

ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করার মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁদের ছিল না।[১০৬] যাঁদের সামর্থ্য ছিল তাঁরা নেতৃত্বের অভাবে দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। জীবিকার জন্য ইংরাজি শিক্ষা যখন আবশ্যক হয়ে উঠল এবং আকাঙ্ক্ষিত নেতৃত্বও পাওয়া গেল তখন শরীফ পরিবারে ঐ শিক্ষার প্রতি অবাধ আগ্রহ দেখা দেয় এবং ইংরাজি চর্চা শুরু হয়। সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ জাতির সেই সুপ্ত চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁদের স্থির লক্ষ্য ও নিরলস প্রচেষ্টার ফলেই মোহের আবরণ ছিন্ন হয় এবং পরিবারে ঐ শিক্ষার প্রতি অবাধ আগ্রহ দেখা দেয় এবং ইংরাজি চর্চা শুরু হয়। একটি হতোদ্যম জাতির নবজন্ম সম্ভাবিত হয়। উইলিয়াম এ্যাডাম প্রমুখের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে মুসলমান সমাজে শিক্ষার একটা ধারা প্রবহমান ছিল ; কিন্তু সে-শিক্ষা প্রধানত মোল্লা তৈরির শিক্ষা ছিল।[১০৭] হিন্দু সমাজে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ শ্রেণীর মূল পেশাই ছিল শিক্ষা-দীক্ষা। মুসলমান সমাজে ধর্মশিক্ষা আবশ্যক ছিল, এজন্য মক্তব-মাদ্রাসার প্রতি তাদের আকর্ষণ ছিল বেশি। মোল্লাশ্রেণীর সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। পঠন-পাঠন ও লিখন-লিপিকরণ সম্মানিত বৃত্তি ছিল। সম্রাট আওরঙ্গজেব নিজহস্তে কোরান নকল করতেন। অনেকে বলেন যে, শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি মুসলমান সমাজে একটা 'সাধারণ অনীহা' ছিল।[১০৮] কথাটা পুরোপুরি সত্য নয়। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা হিন্দু মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে ছিল না। সুতরাং তাদের প্রসঙ্গ স্বতন্ত্র। যে শরীফ শ্রেণীর মধ্যে গৃহকর্ম ও ধর্মকর্মের জন্য শিক্ষাচর্চা অব্যাহত ছিল, সে শ্রেণীকে নতুন মন্ত্রে উজ্জীবিত করার প্রয়োজন ছিল। সৈয়দ আহমদ, আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী যখন সেই মন্ত্রে ডাক দিয়েছেন, তখন সমাজের মানুষের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া পাওয়া গেছে। গোঁড়া শ্রেণীর কাছ থেকে সামান্য বাধা এসেছিল বটে, কিন্তু তা দূরতিক্রম্য ছিল না। তাঁদের প্রধান সংগ্রাম করতে হয়েছে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, গোঁড়াপন্থীদের বিরুদ্ধে নয়। সুতরাং একটি সুষুপ্ত জাতির মোহ ভঙ্গ হতে দেরী হয়নি।

১০৬. ২৫ এপ্রিল, ১৮৫২ সালেব এক 'মন্তব্যপত্রে 'সিসিল বিডন লিখেছেন, মুসলমানেব আর্থিক অবস্থা এমন নয় যে তাঁবা সন্তানের শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়েব উচ্চ বেতনের ব্যয়ভার বহন করতে পারেন ; হিন্দু কলেজের ছাত্রদের সেরূপ অর্থদৈন্য ছিল না।

১০৭. এ্যাডাম ১৮৩৮ সালেব শিক্ষা বিষয়ক তৃতীয় রিপোর্টে মুর্শিদাবাদ, বর্ধমান ও বীরভূমে বাংলা, হিন্দি ফারসি, আববি ইংরাজি শিক্ষার অবস্থা সম্পর্কে একটি তালিকা দিয়েছেন :

	মুর্শিদাবাদ			বর্ধমান			বীবভুম		
ভাষা	শিক্ষায়তন	ছাত্র		শিক্ষায়তন	ছাত্র		শিক্ষাযতন	ছাত্র	
		হিন্দু	মুসলমান		হিন্দু	মুসলমান		হিন্দু	মুসলমান
বাংলা ও হিন্দি	৬২+৫	৯৯৮	৮২	৬২৯+0	১২৪০৮	৭৬৯	৪১১+১	৬১২৫	২৩২
ফারসি	১৭	৬১	৪১	৯	৪৪৮	৪৫১	৭১	২৪৫	২৪0
আরবি	২	১	৬	১১	৪	৬৮	২	0	৫
ইংরাজি	১	১0	২	৩	১১২	৬	২	৬৩	0

কাজী আবদুল মান্নান— *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা*, পৃ: ৫২৯ (২ সং)।

স্মরণ থাকা প্রয়োজন যে, এদেশে হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষার ঐতিহ্য বরাবর ছিল। সেজন্য হিন্দুর সংখ্যা বেশি হওয়া বিচিত্র নয়।

১০৮. *Hındu-Muslım Relations in Bengal*, P. I

১৮৩৫ সালে লর্ড মেকলের শিক্ষা সংক্রান্ত 'মন্তব্য পত্রে'র 'অভিসেচনতত্ত্ব' অনুযায়ী সমাজের উপর তলায় ইংরাজি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। লক্ষ্য ছিল, উচ্চ বর্ণের লোকেরা শিক্ষা পেয়ে পরে তাঁরা স্বদেশবাসীর মধ্যে শিক্ষার বিস্তার ঘটাবেন। বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্ক মেকলের প্রস্তাব গ্রহণ করেন। শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে ইংরাজি গৃহীত হয় ; এবং ইংরাজি বিদ্যালয়গুলিতে সরকারি সাহায্যের ব্যবস্থা হয়। ইংরাজি বিদ্যালয় কেবল কলিকাতা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, অতএব কলিকাতার ভদ্র ও ধনী পরিবারের সন্তানরা এ শিক্ষার সুয়োগ পায়। ১৮৫৪ সালে চার্লস উডের 'ডেস প্যাচে'র প্রস্তাব অনুসারে ভারতের শিক্ষা বিষয়ে বড় রকমের পরিবর্তন ঘটে। ভারতের দেশীয় ও ইংরাজি ভাষা শিক্ষার উন্নতি ও প্রসার ছিল ডেসপ্যাচের মুখ্য উদ্দেশ্য। এর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি ছিল, প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া, দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, উচচ শিক্ষার জন্য কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে তিনটি পৃথক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা আর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, একটি আলাদা 'শিক্ষা বিভাগে'র উপর শিক্ষার প্রশাসনিক দায়িত্ব অর্পণ করা। এর আগে 'শিক্ষা পরিষদে'র উপর শিক্ষা তদারকের দায়িত্ব ছিল। উডের ডেসপ্যাচে আরও বলা হয় যে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ট্রেনিং দেওয়ার জন্য স্কুল স্থাপন করতে হবে, সরকারি কলেজ ও স্কুলগুলি যথাযথভাবে তদারক করতে হবে এবং প্রয়োজন সাপেক্ষে সেগুলির সংখ্যা বাড়াতে হবে। মধ্য-স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার কাজে উৎসাহ দেওযার জন্য 'থোকদান প্রথা' (গ্র্যান্ট ইন-এড) প্রবর্তন কবতে হবে।[১০৯] প্রাথমিক শিক্ষার উপব গুরুত্ব আরোপ করায় গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয স্থাপিত হয়, সেখানে স্বল্পবিত্তের সাধারণ পরিবারের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়ার সুযোগ পায়। ১৮৫০ সালে দেশের প্রথম পাটকল স্থাপিত হয়, ফলে পাটচাষের পরিমাণ বাড়ে এবং পাটের দামও বাড়ে। অর্থকরী ফসলের জন্য মুসলমান কৃষকের হাতে নগদ টাকা আসে। অবস্থাপন্ন গৃহস্থ ঘবেব ছেলেবা বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করে। আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীব আলী এ সময় শিক্ষা আন্দোলন শুরু করেন। তাঁরা ধর্মীয় শিক্ষার কেন্দ্র মাদ্রাসাগুলির শিক্ষাপদ্ধতিব পরিবর্তন সাধন করে সেগুলিতে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা কবে কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসায় এ্যাংলো-আরবি ও এ্যাংলো-ফারসি বিভাগ পূর্ব থেকে চালু ছিল। ১৮৭৪ সালে মহসীন ফাণ্ডের টাকায় রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা খোলা হয়। মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্রাবাসের ব্যবস্থা ছিল। মহসীন ফাণ্ডের টাকা থেকে ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়, ৯টি জেলা-স্কুলে ফারসি শিক্ষক নিযুক্ত করা হয় এবং স্কুল ও কলেজের মুসলমান ছাত্রদের বেতনের দুই-তৃতীয়াংশ ঐ ফাণ্ড থেকে প্রদান করা হয়।[১১০] ১৮৮৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসার ইংরাজি বিভাগে এফ. এ. ক্লাস পর্যন্ত পড়ানোর ব্যবস্থা হয় এবং ১৮৮৮ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের সাথে ঐ বিভাগ যুক্ত করা হয় যার ফলে

১০৯. সি. ই বাকল্যাণ্ড শিক্ষা বিষযক উডেব ডেসপ্যাচকে 'ভাবতেব শিক্ষার সনদ' বলেছেন। লর্ড ডালহাউসিব অভিমত, এতে 'সাবা ভারতের শিক্ষা পরিকল্পনা' প্রতিফলিত হয়েছে। অর্থাৎ এই শিক্ষাব্যবস্থায় সর্বভারতীয় ঐক্য ও সমন্বয় সাধিত হয়।

C.E Buckland--*Bengal under the Lietenant Governors (1854-94)*. Vol 1 Calcutta, 1961, P 7

১১০. *Nawab Babadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, P. 216

মাদ্রাসার ছাত্ররা প্রেসিডেন্সীতে ক্লাস করার সুযোগ পায়।[১১১] মুসলমানদের শিক্ষার ব্যাপারে সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন হয় এবং একটি পশ্চাৎপদ সম্প্রদায়ের মধ্যে কিভাবে শিক্ষার হার বাড়ানো যায় তার জন্য সরকার নতুন পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। ১৮৫৩ সালে হিন্দু কলেজকে প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তির করা হয় এবং সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের ছাত্রের পড়ার সুযোগ হয় ; পূর্বে হিন্দু কলেজে মুসলমান ছাত্র ভর্তি হতে পেত না। ১৮৭১ সালে বড়লাট লর্ড মেয়োর (১৮৬৯-৭২) সাথে এক সাক্ষাতের সুযোগে আবদুল লতিফ ভারতের মুসলমানের শোচনীয় দুরবস্থা ও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতার কথা বলেন। তিনি মহসীন ফাণ্ডের অপব্যবহারের প্রতিও বড়লাটের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়লাট ঐ বছর মুসলমানদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আররি-ফারসি পড়ার ব্যবস্থা গ্রহণের এবং বিদ্যালয়গুলিতে মুসলমান শিক্ষক নিয়োগের নির্দেশ দিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[১১২] স্পষ্টতঃই প্রস্তাবটিতে উডের ডেসপ্যাচের শিক্ষানীতির প্রতিফলন ঘটেছে। ব্রিটিশ ভারতে শিক্ষার অবস্থা তদন্ত করার জন্য ১৮৮২ সালে হান্টারকে সভাপতি করে 'এডুকেশন কমিশন' গঠিত হয়। হান্টার মুসলমান শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আবদুল লতিফ কমিশনে সাক্ষ্য দেন এবং একটি লিখিত 'স্মারকলিপি' প্রদান করেন। সৈয়দ আমীর আলীও সাক্ষ্য দেন। তিনি 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র পক্ষ থেকে বড়লাট লর্ড রিপনকে (১৮৮০-৮৪) যে 'স্মারকলিপি' দিয়েছিলেন, সেটিও কমিশনের কাছে প্রেরিত হয়। এসব সাক্ষ্য, স্মারকলিপি ও অন্যান্য তথ্যের ভিত্তিতে শিক্ষা কমিশন 'মুসলিম শিক্ষা' শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে (১৫শ অধ্যায়) প্রস্তাবাকারে ১৮টি সুপারিশ পেশ করেন।[১১৩] ১৮৮৫ সালে শিক্ষা কমিশনের সুপারিশসমূহ, এসোসিয়েশনের স্মারকলিপি, ব্যক্তিগত বিভিন্ন আবেদনপত্র একত্রে বিবেচনা করে বড়লার্ট ডাফরিন (১৮৮৪-৮৮) কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। প্রস্তাবে শিক্ষা কমিশনের যথাক্রমে ৮, ১১, ১৪, ও ১৬ সংখ্যক সুপারিশ গৃহীত হয়। শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের সরকারি চাকুরীতে পৃথকভাবে সুবিধা দানের প্রস্তাবটি (১৭-সংখ্যক সুপারিশ) পক্ষপাতিত্বের কারণে সরকার নাকচ করে দেন।[১১৪] স্যার আজিজুল হক হান্টারের ১৭ দফা সুপারিশসমূহকে বাংলার মুসলমানের শিক্ষা-অধিকারের সনদ বলে উল্লেখ করেন।[১১৫] সৈয়দ আমীর আলী ডাফরিনের গৃহীত প্রস্তাবসমূহকে মুসলিম অধিকারের 'ম্যাগনা কার্টা' হিসাবে অভিনন্দিত করেন।[১১৬]

১১১. Muhammad Azizul Haq--*History and Problems of Muslim Education in Bengal,* Calcutta, 1917. মুস্তফা নূরউল ইসলাম কৃত অনুবাদ— *বাংলাদেশের শিক্ষাব ইতিহাস ও সমস্যা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৬৯, পৃ. ৪৫

১১২. *The Proceedings of the Government of Indiai in the Home Department* (Education) No. 300 Simla, 7 August 1871.

১১৩. W. W. Hunter--*Report of the Indian Education Commission,* 1883.

১১৪. ১৭- সংখ্যাক সুপারিশিটি ছিল এরূপ : That the attention of the Local Government be invited to the question of proporion in which the partronage is distributed among educaned Mahomedans and others"
Report of the India, IIndians Education Commission, 1883.

১১৫. *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা,* পৃ. ৪০

১১৬. *বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ,* পৃ. ১৭৫

মুসলমান নেতৃবৃন্দের শিক্ষা-আন্দোলন, সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা এবং আধুনিক শিক্ষার প্রতি সমাজ মানসের পরিবর্তন ইত্যাদি কারণে মুসলমান সমাজে পূর্বে যে অচল অবস্থায় উদ্ভব হয়েছিল, তা ক্রমশ অপসারিত হয়, এবং প্রয়োজন অনুপাতে শিক্ষার হার পরিমিত না হলেও তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পায়। স্যার আজিজুল হক 'হিস্টরি এণ্ড প্রবলেমস অব মুসলিমস এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯১৭) গ্রন্থে ১৮৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে বাংলার বিভিন্ন শিক্ষায়তনে মুসলমান ছাত্রের একটি তালিকা দিয়েছেন ; তালিকাটি এরূপ[১১৭] :

সারণি—১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	মোটছাত্র সংখ্যা	মুসলমান ছাত্র সংখ্যা	হার
ইংরাজি কলেজ	২৭৩৮	১০৬	৩.৮
প্রাচ্য কলেজ	১০৮৯	১০৮৮	৯৯.১
উচ্চ বিদ্যালয়	৪৩৭৪৭	৩৮৩১	৮.৭
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৩৭৯৫৯	৫০৩২	১৩.২
দেশীয় মাধ্যমিক বিদ্যালয়	৫৬৪৪১	৭৭৩৫	১৩.৭
দেশীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়	৮৮০৯৩৭	২১৭২১৬	২৪.৬
উচ্চ ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়	১৮৪	—	—
মাধ্যমিক ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয়	৩৪০	৬	১.১
দেশীয় মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যায়	৫২৭	৬	১.১
দেশীয় প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয়	১৭৪৫২	১৫৭০	৮.৯
শিক্ষক শিক্ষণ-কেন্দ্র (নর্মাল স্কুল)	১০০৭	৫৫	৫.৫
শিক্ষয়িত্রী শিক্ষণ-কেন্দ্র	৪১	—	—
অপরিদর্শিত বেসরকারি বিদ্যালয়	৫৭৩০৫	২৫২৪৪	৪৪.০

তিনি আরো বলেছেন যে, ১৮৭১ সালে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা ২৮১৪৮ (১৪.৪%) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৮৮২ সালে ২৬১১০৮ (২৩%) জনে দাঁড়ায়।[১১৮] সহকারি স্কুল ইন্সপেক্টর আবদুল করিম বিএ তাঁর 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে ১৮৯০-৯১ সালে বাংলার মুসলমান বিদ্যার্থীর কিরূপ অবস্থা ছিল তার একটি তালিকা-দিয়েছেন। তালিকাটি এরূপ [১১৯]

১১৭. *বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস ও সমস্যা*, পৃ. ৩৭-৩৮

১১৮. *ঐ*, পৃ. ৩৮

১১৯. *Mahomedan Education in Bengal*, See Appendix.

সারণি—২

সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান	মোট ছাত্র সংখ্যা	মুসলমান ছাত্র	সংখ্যার হার
আর্টস কলেজ	৫২৩২	২৯৩	৫.৬
উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়	৭৮৭২৭	৮২৬৫	১০.৫
মধ্য ইংরাজি বিদ্যালয়	৬১০০০	৮৮৮৪	১৪.৫
মধ্য বাংলা বিদ্যালয়	৬৭৭৪১	১০৩২৯	১৫.২
উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৩৮৯৫০	২৬৬৮৮	১৯.৩
নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়	৯৭৭৬৩২	২৭১২২২	২৭.৭
প্রফেশনাল কলেজ	১৪৯৩	৫২	৩.৫
ট্রেনিং স্কুল	১৯৮৩	২২০	১১.১
মাদ্রাসা	২৪২৬	২২৭৯	৯৭.৯
সর্বমোট	১৩৩৬৮৮৬	৩২৮৬৪৯	২৪ ৫

১৮৮৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত উচ্চ শিক্ষার অবস্থা কিরূপ ছিল, তা নিচের সংখ্যাতত্ত্ব থেকে নির্ণয় করা যায় : [১২০]

সারণি—৩

বৎসর	এমএ	বিএ (অনার্স)	বিএ (পাশ)	বি এ		
১৮৮৫	১	১	৯	৩	১২	৪৪
১৮৮৬	২	১৩	২৬	৯		
১৮৮৭	৩	১১	২১	৪	৩১	৫১
১৮৮৮	২	৫	১৬	৬	১৯	১১৩
১৮৮৯	৩	৭	২৩	৩	—	৫৪
১৮৯০	২	৬	২২	৮	৫৭	১২৫
১৮৯১	২	৬	১২	১২	১৬	১১০
১৮৯২	৪	৭	১৫	৮	৪৭	৮৫
১৮৯৩	—	৬	২৪	৩	৩৫	১৭২
১৮৯৪	৪	৮	২৭	৩	৩১	১৩৪
১৮৯৫	৪	৫	২৩	২	৫৯	১৫৩

১২০. এমএ, বিএ, (অনার্স ও পাশ) এবং বি এল-এর সংখ্যা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯২৯ সালে প্রকাশিত ক্যালেণ্ডার (২য় খণ্ড) থেকে সংকলিত হয়েছে। এফ এ, আই এ এবং এন্ট্রান্সের সংখ্যা আজিজুল হকের পূর্বোক্ত গ্রন্থ (পরিশিষ্ট জ) থেকে গৃহীত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সব কলেজের মুসলমান ছাত্র গণ্য করা হয়েছে। তখন বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, উত্তর প্রদেশ, পাঞ্জাব, রেঙ্গুন প্রভৃতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল।

১৮৯৬	২	৫	২১	১৫	৫৩	১৪১
১৮৯৭	৩	৪	১২	১২	৫২	২৪১
১৮৯৮	৩	৮	২২	৬	৬৬	১৭৮
১৮৯৯	৩	৮	২৮	৭	৬৮	২০৩
১৯০০	৫	৯	৩১	৬	৫৯	২৫৩
১৯০১	৩	৬	২১	৮	৫২	২০৯
১৯০২	৩	৪	২৩	১০	৭৯	২৫৮
১৯০৩	৫	৪	২১	৬	৬৫	১৭৬
১৯০৪	৫	৬	১৬	১৬	৭০	১৩৩
১৯০৫	২	৬	২৮	৭	৪৬	১৮০

প্রথম এম. এ. (ইতিহাস) পাশ করেন সৈয়দ আমীর আলী ১৮৬৮ সালে হুগলী কলেজ থেকে। ১৮৭১ সালে আলী রেজা খান (আরবি) আগ্রা কলেজ, ১৮৭৭ সালে আমজাদ আলী (আরবি), আশরাফ আলী (আরবি), রাজা হোসেন (ফারসি) যথাক্রমে বেনারস ও মুইর সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন।

১৮৮২ সালে হাসমতুল্লাহ (আরবি) মুইর সেন্ট্রাল কলেজ থেকে এমএ পাশ করেন। ১৮৮৫ সালের আগে আর কোনো মুসলমান ছাত্র এমএ পাশ করেননি। প্রথম বিএ পাশ করেন হুগলীর আহমদ (পরে দেলওয়ার হোসেন আহমদ নাম গ্রহণ করেন) প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে ১৮৬১ সালে। ১৮৫৮ সালে বঙ্কিমচন্দ্র ও যদুনাথ বসু সর্বপ্রথম গ্রাজুয়েট হন। ১৮৬৫ সালে দ্বিতীয় মুসলমান গ্রাজুয়েট শ্রীহট্টের মোহাম্মদ দায়েম। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে পাশ করেন। ১৮৬৬ সালে তৃতীয় গ্রাজুয়েট আবদুল আজিজ। তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে পাশ করেন। এরূপে ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত মোট গ্রাজুয়েটের সংখ্যা ৫৫ জন। ১৮৬৯ সালে প্রথম বিএল গ্রাজুয়েট হন আমীর আলী ও ওবায়দুর রহমান। ১৮৬৯ সাল থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত মোট ল গ্রাজুয়েট হন ১৬ জন। ১৮৭৮ সালে সৈয়দ হোসেন কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এম বি পাশ করেন। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত আর কেউ ঐ ডিগ্রী পাননি। লাইসেন্সিয়েট ইন ল ডিগ্রী পান ১৮৬৯ সালে ১জন এবং ১৮৭৩ সালে ৪ জন। ১৮৭১ থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত এম এল এস ডিগ্রী পান ১৭ জন। ১৯০০ সালে তোফায়েল আহমদ ও ১৯০৩ সালে এস. এম. আবদুল আজিজ বি. ই ডিগ্রী এবং ১৮৯০ সালে আবদুর রহমান এল. ই ডিগ্রী পান। উক্ত তিন জন কলিকাতা সিভিল্ ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ থেকে পাশ করে। ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই সংখ্যাতত্ত্বটি ডিগ্রী অনুযায়ী সাজালে এরূপ দাঁড়ায় :[১২১]

১২১. এই সংখ্যার মধ্যে কিছু পুনরাবৃত্তি আছে, কারণ একই ব্যক্তি বিএ, বিএল, এম এ পাশ করেছেন। এই সংখ্যার মধ্যে কতজন বাঙালি মুসলমান আর কতজন অবাঙালি মুসলমান তা সঠিক বলা যায় না।

সারণি—৪

এম এ	৬৭
বিএ (অনার্স)	১৩৬
বিএ (পাশ)	৫০২
বি এল	১৬৮
লাইসেন্সিয়েট ইন ল	৫
এম বি	১
এম এল এস	১৭
বি. ই	২
এল ই	১
সর্বমোট	৮৯৯

এর সঙ্গে ধরতে হয় বিলাত-ফেরত কয়েকজন ব্যারিস্টারকে। এই সংখ্যায় বাঙালি-অবাঙালির মিশ্রণ আছে, দু'দশজন রাজ পরিবার ও ধনী পরিবারের সন্তানও আছে, তবে এব অধিকাংশই যে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, তাতে সন্দেহ নেই।[১২২] এন্ট্রান্স থেকে ব্যারিস্টার—এই নব্য শিক্ষিতদের সমন্বয়েই আধুনিক মুসলমান মধ্যবিত্তের গঠন ও বিকাশ হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে ধর্মীয় শিক্ষার একটি ধারা মোল্লা-মুনশীর মধ্যে প্রবাহিত ছিল। এসব শিক্ষিত ব্যক্তি সরকারি-সওদাগরি অফিসে চাকুরি করেছেন, কোর্ট-কাচারিতে আইন ব্যবসায় করেছেন, স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেছেন, বই-পুস্তক লিখেছেন, পত্র-পত্রিকা প্রকাশ করেছেন, সভা-সমিতি গঠন করেছেন, রাজনীতি, ধর্ম, শিক্ষা ও অন্যান্য আন্দোলন করেছেন। এভাবেই সমাজে তাঁদের প্রতিষ্ঠা এসেছে। ১৮৮২ সালে মুসলমানগণ সরকারি চাকরিতে কি ভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, তার একটি তালিকা নিম্নরূপে দেওয়া যায় :[১২৩]

১২২. ১৮৬৯ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় এ্যাংলো-আরবি বিভাগে অধ্যয়নবত ১১৫ জন ছাত্রের কুলগত পরিচয় ছিল এরূপ : জমিদার ৩৩, তালুকদার ৩৭, মুনশী ১৩, ব্যবসায়ী ৬, কাজী ৬, মুন্সেফ ৩, দারোগা-শিক্ষক-উকিল-আয়মাদার ইত্যাদি-অবশিষ্ট। এ্যাংলো ফারসি বিভাগের ২৮০ জন মোক্তার ২২, নকলনবিশ ২০, সরকারি কোর্ট অফিসার ১৩, ডাক্তার ৯, কেরানী ৮, সরকারি পেন্সনভোগী ৮, পুলিশ অফিসার ৫, রুটি প্রস্তুতকারী ১, অপেশাজীবী ৫।
Selections from the Records of India, Home Deptt, Calcutta 1886, PP. 22, 31

১২৩. তালিকাটি ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন কর্তৃক প্রণীত 'স্মারকলিপি' থেকে সংকলিত K. K. Aziz --*Ameer Ali : His Life and Works*. Karachi, PP. 29--31

সারণি—৫

কলিকাতা

পদ	মুসলমান	হিন্দু	খ্রিস্টান	মোট
পররাষ্ট্র বিভাগ	১	১৪	৩৯	৫৪
স্বরাষ্ট্র, রাজস্ব ও কৃষি বিভাগ	১	২৩	৩৯	৬৩
আইন, রাজনীতি ও চাকুরী-নিয়োগকারী বিভাগ	২	৬৪	১৬	৮২
রেভিনিউ বোর্ড	১	৮৮	২৪	১১৩
কম্পট্রলার-জেনেরাল অফিস	৫	২২৬	৩৪	২৬৫
পোস্ট-মাস্টার জেনেরাল অফিস	৩৭	২৩৪	৬৫	৩৩৬
ডাক বিভাগ (বাংলার পশ্চিমাঞ্চলের জন্য)	২২	৭৬৩	৭	৭৯২
ডাক বিভাগ (বাংলার পূর্বাঞ্চলের জন্য)	৯	১৫১	৩	১৬৩
ডাক বিভাগ (বিহার ও উড়িষ্যা)	৩৭	৩৫৩	১৯	৪০৯
জেনেরাল রেজিস্ট্রেশন	১	৬	৩	১০
শিক্ষা বিভাগ	৩৮	৪২১	১১৪	৫৭৩
হাইকোর্ট	৯২	১৩১	২০	২৪৩
লিগ্যাল রিমেমব্রান্সার অফিস	১	১১	১	১৩
ছোট আদালত	১	১৮	৮	২৭
সার্ভেয়র-জেনেরাল অফিস	১০	১৮	৫৫	৮৩
ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর	২২	১৫৩	৪১	২১৬
ছোট আদালতের জজ ও সাবঅর্ডিনেট জজ	৩	৪৪	৯	৫৬
মুন্সেফ	১৪	২৪৭	—	২৬১
পুলিশ বিভাগ	৯	৩৮	১১৮	১৬৫
জনকল্যাণ বিভাগ	১৭	২১৭	১৬৭	৪০১
চিকিৎসাবিভাগ	৩	২৪	৯৮	১২৫
জনশিক্ষা বিভাগ	৬	৯৮	৫৩	১৫৭
রেজিস্ট্রেশন বিভাগ	৩	১৮	৪	২৫

সারণি— ৬

মফস্বল (বিবিধ পদ)

	মুসলমান	হিন্দু	মোট
বগুড়া	৩৩	৯১	১২৪
বর্ধমান	১৪	১১৭	১৩১
ফরিদপুর	৩০	৩৩৬	৩৬৬
হাওড়া	৮	২০৬	২১৪
মুর্শিদাবাদ	৩৯	৩৪৩	৩৮২
ময়মনসিংহ	২০	৩২৪	৩৪৪
মেদিনীপুর	৩৯	৪৬০	৪৯৯
পাবনা	২৬	১৭৯	২০৫
রাজশাহী	৫৭	২৮৭	৩৪৪
বরিশাল	৩৪	৩৮৯	৪২৩

তালিকায় বিচার বিভাগ, ডাক বিভাগ ও শিক্ষা বিভাগে মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা বেশি, অন্যান্য বিভাগে সংখ্যা খুবই নগণ্য। তালিকার অপর বৈশিষ্ট্য, শহর অপেক্ষা মফস্বলে নিয়োগের সংখ্যা বেশি। হিন্দু কর্মচারীর ক্ষেত্রে সেরূপটি হয়নি। তাঁদের সদর-মফস্বল কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সংখ্যা-সাম্য আছে। মুসলমান শিক্ষিতগণ কর্মব্যপদেশে কর্মস্থলে বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিলেন, শহরে কেন্দ্রীভূত হতে পারেন নি। মুসলমানের সংগঠনগুলি যথেষ্ট পরিমাণে শক্তিশালী না হওয়ার পেছনে এটা একটা প্রধান কারণ ছিল। অর্থাৎ আধুনিক প্রগতিশীল আন্দোলনগুলির মূল শক্তিকেন্দ্র যে নগরের শ্রেণী-সচেতন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ, সেটি দানা বাঁধবার সুযোগ পায়নি।

ভূমির সাথে যুক্ত ছোট জমিদার, তালুকদার, পত্তনিদার, দরপত্তনিদার, গাঁতিদার, জোতদার, ইজারাদার, নায়েব-গোমস্তা-তহশিলদার-কেরানী প্রভৃতি আমলা ভূমি সংশ্লিষ্ট মধ্যবিত্ত নামে পরিচিত। মুসলমান বড় জমিদার বলতে কয়েকজন মাত্র ছিলেন : যেমন ঢাকার খাজা পরিবার, বগুড়ার নবাব পরিবার, ধনবাড়ীর চৌধুরী পরিবার, শ্রীহট্টের মজুমদার পরিবার, শায়েস্তাবাদের মীর পরিবার প্রভৃতি। অধিকাংশ জমিদার ছিলেন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির মালিক। উত্তরাধিকার আইনের জন্য মুসলমান জমিদারিগুলি ভাগ হয়ে ক্ষুদ্রাংশে পরিণত হয়। জোতদার, তালুকদার, দানদার প্রভৃতি নিজ হস্তে কৃষিকাজ করেন না, প্রজার বা ক্ষেত-মজুরের উৎপাদনে ভাগ বসান। জমিদার-পত্তনিদারগণ প্রজার কাছ থেকে কর আদায় করেন ; জোতদার-দাদনদারগণ ভাগচাষী, বর্গাদার প্রভৃতির শ্রমোৎপাদিত ফসল ঘরে তোলেন। বড় জমিদার পত্তনিদারদের নিয়োগ করে তাঁদের কাছ থেকে কর আদায় করেন। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় ভূমির উপরে ব্যক্তির স্বত্বাধিকার

প্রতিষ্ঠিত হলে ভূমির মালিক জোতদারের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। শহরের ধনী ব্যক্তিরা অথবা সরকারি পদস্থ কর্মচারীরা জমি কিনে তালুকদার, ইজারাদার নিয়োগ করতেন, তাঁরাই ভূমির সাথে যোগাযোগ রাখতেন, নব্য ভূস্বামিগণ শহরে বাস করতেন। এভাবে ভূমিজ মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়।[১২৪] তাঁদের সংখ্যা নিতান্ত কম ছিল না। লর্ড হেস্টিংসের সময় বড় জমিদারীর সংখ্যা ছিল কমবেশি ১০০ ; একশ' বছর পরে ছোটবড় জমিদারীর সংখ্যা দাঁড়ায় ১৫৪২০০।[১২৫] ১৮৫৫ সালে কাউন্সিল সদস্য জে, পি. গ্রান্ট বলেন যে, বাংলার দুই-তৃতীয়াংশ ভূমির মালিক ছিলেন তালুকদার-পত্তনিদারগণ।[১২৬] ১৮৭১-৭২ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জমিদার ও কৃষকের মধ্যবর্তী বিভিন্ন স্তরের মধ্যস্বত্ব-উপস্বত্বভোগী ও কর্মচারীদের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার নিম্নরূপ একটি তালিকা দেওয়া যায়।[১২৭]

সারণি—৭

কৃষক	৬৩৯১০৭৪
জমিদার	৪২৬১৮
ইতমামদার	৫৮৬
ঠিকাদার	৩০৩
ইজারাদার	৩৩৫৪
লাখেরাজদার	২৩০৭০
জায়গীরদার	৩৬৫
ঘাটোয়াল	৬৬৮
আয়মাদার	২০০৪
মকরারীদার	৯৯৩৩
	৯৬০৫০
	৩৩০২
খোদকস্ত প্রজা	৭৫৫২
মহলদার	১১২৮
জোতদার	১৯৫৬৪
গাঁতিদার	৩৮২৪
হাওলাদার	৯৩৪৩
গোমস্তা	১৮৪০২
তহশিলদার	১০৫৪৬
পাটোয়ারী	১৩৭৬
পাইক	১৪৭৯৭

১২৪. *The Indian Middle Class*, PP.123, 133-34.
১২৫. *Bengal Administration Report 1872-73*, P. 73
১২৬. *The Indian Calss*, P. 137
১২৭. *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, ৫ম খণ্ড, পৃ: ২৬

জমিদারের ভৃত্য	১১০৩০
দফাদার	২০২
দেওয়ান	১০৪
মণ্ডল	১৬২০
নায়েব	৫৮১
এস্টেট ম্যানেজার	২১

হিন্দুর সহিত তুলনায় মুসলমানের সংখ্যা কম হলেও তাঁদের অস্তিত্ব উপেক্ষা করার মত ছিল না। বরং গ্রামজীবনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত থেকে তাঁরাই সমাজের কর্ণধার হিসেবে কাজ করেছেন। প্রয়োজনে তাঁরাই সমাজের নেতৃত্ব দিয়েছেন। তিতুমীর, শরীয়তুল্লাহ, দুধু মিঞা মধ্যবিত্ত জোতদারের সন্তান ছিলেন ; ওয়াহাবী আন্দোলনে বাংলার কৃষকের ঘর থেকে মুজাহিদ (স্বেচ্ছা-বাহিনী) ও চাঁদার অর্থ সীমান্ত-শিবিরে যেত। শহরের মানুষ সাম্রাজ্যবাদী শত্রুর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার অনেক আগে গ্রামের জোতদার-তালুকদারগণ কৃষকদের সংগঠিত করে 'শ্রেণী শত্রু'র বিরুদ্ধে লড়েছেন, প্রাণ দিয়েছেন, জেল-জুলুম সহ্য করেছেন। অবশ্য উভয়ের অর্থনৈতিক ভিত্তি আলাদা ছিল বলেই এরূপ সম্ভব হয়েছে।

শহরকেন্দ্রিক মুসলমান ব্যবসায়িক মধ্যবিত্তের গঠন সম্পর্কে পূর্বে উল্লেখ করেছি। দর্জি, ট্যানারি, বই বাঁধাই, বই বিক্রয়, খালাসী-সারেঙ্গ প্রভৃতি কাজে বাঙালি মুসলমান নিযুক্ত ছিল। হোটেলওয়ালা, বাবুর্চি, খানসামা, ভিস্তি, কোচওয়ান, কসাই, ফলবিক্রেতা, খুচরা ব্যবসায়ী অবাঙালি ছিল। বোম্বাই-গুজরাট-করাচীর মেমন, খোজা, বোহরা প্রভৃতি শ্রেণীর বড় ব্যবসায়ীও ছিলেন। কোনো কোনো ব্যবসায়িক সংগঠনে দুচার জন মুসলমান ব্যবসায়ীর নাম উনিশ শতকের প্রথম ভাগেও শোনা যায়, সে সংযোগ ছিল পুরোপুরি ব্যবসায়িক স্বার্থে, সমাজসেবা কিংবা কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা সমবেত হননি।[১২৮] উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এর কিছু পরিবর্তন দেখা যায়, তাঁরা সভা-সমিতিতে সমবেত হয়েছেন কেবল চাঁদা-দাতা সদস্য হিসাবে নন, তাঁদের কার্যকলাপে সামাজিক সংহতিচিন্তা ও পরোপচিকীর্ষাবৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে। মাদ্রাসা, স্কুল, ছাত্রাবাস, এতিমখানা মসজিদ নির্মাণে ও পরিচালনায় তাঁদের অনেকে অংশ গ্রহণ করেছেন। কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রাবাস এলিয়ট হোস্টেল (১৮৯৬) নির্মাণে অনেক জমিদারের সাথে অনেক ব্যবসায়ী চাঁদা দিয়েছেন। ঐ মাদ্রাসায় তাঁদের সন্তানেরা লেখাপড়া করছে, ১৮৬৯ সালের ছাত্রদের কুল-পরিচিতির তালিকায় তা দেখা যায়।

১২৮. সুরেশচন্দ্র মৈত্রেয় লিখেছেন, হিন্দু উদ্যোক্তাগণ কোনো কোনো সভার বা প্রতিষ্ঠানের ধর্ম-বর্ণহীন সর্বভারতীয় রূপ দেওয়ার জন্য উচ্চ কুল ও উচ্চবিত্তের মুসলমানদের নিমন্ত্রণ করে আনতেন ; এক চাঁদা দেওয়া ছাড়া তাঁদের অন্য কোনে কাজ ছিল না
পূর্বোক্ত, *অনুশীলন*, আশ্বিন ১৩৭২

বাংলার হিন্দু মধ্যবিত্তের সহিত তুলনায় মুসলমান মধ্যবিত্ত কেবল ক্ষুদ্রাকার ছিল না, গঠনগত উপাদান ও প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকেও পার্থক্য ছিল। এর সাথে কালগত পার্থক্যের কথাও স্বীকার করতে হয়। ডক্টর আবু মহামেদ হবিবুল্লাহর একটি উক্তি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায় : "আর্থিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠা লুপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান কেমন করে দ্রুত গতিতে শ্রেণীচ্যুত হয়ে গেল সে কাহিনীর উল্লেখ হয়ত নিষ্প্রয়োজন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে প্রায় একশ' বছর ধরে বাঙলার হিন্দু যে অর্থনৈতিক ধারার ভেতর দিয়ে এসেছে, বাঙালী মুসলমানের জীবনে সে অবস্থা এসেছে মাত্র সেদিন--উনিশ শতকের শেষের দিকে। এই সময়গত পার্থক্য ছাড়াও হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্মেতিহাসের একটা ব্যাপার লক্ষণীয়, যা এই দুই সম্প্রদায়ের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সাংস্কৃতিক পরিণতিকে স্বতন্ত্র করেছে। মুসলমান আমলে হিন্দুরা যে সুবিধা ভোগ করেছে, রাষ্ট্রশাসনে বা অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় যে নির্দ্দিষ্ট স্থান তাদের ছিল, ইংরাজ আগমনের ফলে তা কিয়ৎ পরিমাণে আলোড়িত হলেও মূলত ধ্বংস হয়নি। ব্যবসায় বা শাসন ক্ষেত্রে তারা শাসক শ্রেণীর একান্ত প্রয়োজনীয় সহকারীরূপে চিরকালই একটা ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে এসেছে। এক যুদ্ধকার্য ছাড়া ধনোৎপাদন ও ব্যবসায়ী হিসাবে পণ্য বিতরণ, সরকারি চাকুরি ইত্যাদি প্রায় প্রত্যেক জীবিকাই তাদের মুসলমান আমল থেকে আজ পর্যন্ত অব্যাহত আছে এবং ফলে তাদের আর্থিক স্থায়িত্ব রয়েছে অক্ষত। মুসলমান শাসক ও তাঁদের সহযোগী শ্রেণীর যুদ্ধ ও শাসনকার্য ছাড়া অন্য জীবিকা ছিল না, সেজন্য নতুন শাসকশ্রেণীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের অর্থনৈতিক ধারাবাহিকতা গেল ধ্বংস হয়ে। ... হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন যত সহজ হয়েছিল (কারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের মধ্যে চিরকালই একটা না একটা ছিল) মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী তত সহজে দ্রুত তৈরি হতে পারেনি। রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন ছাড়াও হিন্দুর মধ্যে উন্নতশীল মধ্যবিত্ত শ্রেণী গঠিত হবার একটা মজ্জাগত ক্ষমতা আছে, মুসলমানের নেই এবং নেই বলেই এদের মধ্যবিত্ত শ্রেণী রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়া সত্ত্বেও এখনও (বিভাগোত্তর কালে) সম্পূর্ণরূপে গড়ে উঠতে পারেনি। বাঙালী মুসলমান এখনও বুর্জোয়ার মত পরিবর্তন বিমুখ বা আত্মপরিতৃপ্ত হয়ে উঠেনি।"[১২৯] ডক্টর হবিবুল্লাহর এই দীর্ঘ উক্তির কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল : (ক) হিন্দু মধ্যবিত্তের একটি প্রাচীন ভিত্তি আছে (খ) তার ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা আছে, (গ) অর্থনৈতিক সচলতা আছে। এর সাথে আরও দুটো বিষয় যোগ করা যায়— যথা, (ঘ) হিন্দু মধ্যবিত্তের কাঠামোগত সুশৃঙ্খল ও অবিমিশ্র রূপ আছে এবং (ঙ) আবহমানকালের দেশীয় ঐতিহ্য আছে। বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের বয়স কম, জন্মকালে এটি একটা মিশ্র উপাদান দিয়ে তৈরি হয়েছে, আলোচ্য যুগ পর্যন্ত এর অর্থনৈতিক সচলতা অক্ষুণ্ণ থাকে নি, এবং সেই সূত্রে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, সামাজিক কাঠামোর মধ্যে উপাদানগত তারতম্য ঘটেছে এবং সর্বোপরি এর ঐতিহ্যিক ভিত্তির মধ্যে ভিন্নতা আছে। এক কথায়, বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্ত ঐ সময় পর্যন্ত পরিণত ও স্থিতিশীল ছিল না।[১৩০]

---

১২৯. *সমাজ, সংস্কৃতি ইতিহাস*, পৃ. ১৫৯-৬০

১৩০. মধ্যযুগের মুসলমান মধ্যবিত্তের পরিচয় দিতে গিয়ে গোপাল হালদার স্থিতিশীলতার অভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, "মুসলিম কোন কারণে (যেমন রাজকার্যের, বিচার, দপ্তর,

আমরা পূর্বে বলেছি, সপ্তম শতকের দিকে মনু হিন্দু সমাজকে পেশার দিকে থেকে চারটি বর্ণে ভাগ করে দিয়েছিলেন। এক এক বর্ণের এক এক ধর্ম : যথা, *"প্রথম বর্ণ ব্রাহ্মণের ধর্ম—যজন, যাজন, অধ্যয়ন, দান ও প্রতিগ্রহ। দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ের ধর্ম—যাজন, অধ্যয়ন, দান ও রক্ষণ।* তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যের ধর্ম—যজন, অধ্যয়ন, দান ও কৃষি বাণিজ্যাদি। চতুর্থ বর্ণ শূদ্রের ধর্ম—উক্ত বর্ণত্রয়ের সেবা ; তাহাতে জীবিকা নির্বাহ না হইলে বাণিজ্য।"[১৩১] বাংলাদেশে ক্ষত্রিয় বর্ণ প্রায় ছিল না : ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র এই তিন বর্ণের মানুষ বসবাস করত। এই পেশাগত বর্ণভেদ পরে ধর্মগত সংস্কার লাভ করলে স্বাভাবিক রক্ত মিশ্রণ বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ব্রাহ্মণ সন্তানের কুলগত পরিচয় হয়েছে ব্রাহ্মণ, বৈশ্য সন্তানের বৈশ্য, শূদ্র সন্তানের শূদ্র। বর্ণগত ধর্মগুণে ব্রাহ্মণ পুরোপুরি এবং বৈশ্য আংশিক মধ্যবিত্তের চরিত্র পেয়েছে, যাঁরা বিদ্যাচর্চা, ধর্মচর্চা, দানধ্যান করতেন। প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগ পর্যন্ত সামাজিক এই কাঠামোর পরিবর্তন হয়নি। তাঁরা জীবিকার ও জীবনযাপনের জন্য বৈশ্যের একাংশ এবং শূদ্রের সর্বাংশের সেবা পেয়ে এসেছেন। ব্রাহ্মণদের মধ্যে আছে আর্যরক্ত ; বিদেশাগত আর্যগণ দেশীয় অনার্যদের সহিত তুলনায় দৈহিক ও মানসিক গঠনে এবং আধ্যাত্মিক চিন্তায় উন্নততর জাতি ছিলেন। তাঁরা শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কর্ম গুণে সমাজে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করেছেন, সমাজে প্রভাব-প্রতিপত্তি বিস্তার করেছেন। যুগের পরিবর্তন অনুযায়ী তাঁদের চিন্তা-ভাবনা, সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের পরিবর্তন হয়েছে এবং এরূপ হয়েছে বলেই তাতে সচলতা ও গতি এসেছে। কায়িক শ্রমে জীবিকা নির্বাহ করেন না বলে তাঁরা রাজপুরুষের ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে নিজ অস্তিত্ব অক্ষুণ্ন রেখেছেন। হিন্দু আমলে সংস্কৃত, মুসলমান আমলে ফারসি, ব্রিটিশ আমলে ইংরাজি ভাষা ও বিদ্যা রপ্ত করে ধর্ম-কর্ম, রাজকার্য ও ব্যবসায়-বাণিজ্য করেছেন। যখন রাজার পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছেন তখন বেশি আর্থিক সুবিধা ভোগ করেছেন, যখন পৃষ্ঠপোষকতা পাননি, তখন সুবিধা কম ভোগ করেছেন— এইটুকুই পার্থক্য, নচেৎ বর্ণগত শ্রেষ্ঠত্ব, সামাজিক মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক সমুন্নতির বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। হিন্দু মধ্যস্বত্বভোগী বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পূর্বোক্ত রূপ, গুণ ও প্রকৃতিগত

ফৌজের ছোট আমলা হয়ে, ব্যবসায়সূত্রে) মধ্যবিত্তের কোঠায় উঠলে সহজেই অভিজাতের পদবীতেও উঠে যেতে পারত। হিন্দু ছোট কর্মচারী বা বৃত্তিধারীরা (দোকানী, পশারী ও কবিরাজ, পণ্ডিত, ছোট মুন্সি, কেরানী কায়স্থ প্রভৃতি) অত সহজে সে পর্যায়ে উঠতে পারত না। দ্বিতীয়ত, মুসলমান উত্তরাধিকার আইন ও অনেকাংশে মুসলমানী জীবনযাত্রাপদ্ধতি, আয়েসি মনোভাব ও অভ্যাস সহজেই অবস্থাপন্ন মুসলমান মধ্যবিত্তকে টেনে নিচে নামিয়ে আনত।" (বাঙালী সংস্কৃতির রূপ, পৃ. ৪৬) আমরা এর সাথে পূর্বোক্ত একটি প্রবাদের কথা স্মরণ করতে পারি, সেখানে একজন 'জোলা' ভাগ্যোন্নয়ন দ্বারা প্রথমে 'শেখ' ও পরে 'সৈয়দ' হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করেছে। (বর্তমান অধ্যায়ের ২৫পৃষ্ঠা. দ্রষ্টব্য)।

১৩১. সুবল মিত্র সংকলিত—*সরল বাঙ্গালা অভিধান*, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:, কলিকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৫১৮ (৮সং)।

বৈশিষ্ট্যের প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই। এরই পাশাপাশি বাংলার মুসলমান মধ্যবিত্তের রূপ-প্রকৃতির বিচার করলে পার্থক্যটা সহজে ধরা পড়ে। আমরা পূর্বে দেখেছি যে, মধ্য যুগে রাজকার্য, ভূমি ও ব্যবসায়ে লিপ্ত যে মধ্যস্বত্বভোগী শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল, তার মধ্যে বিদেশাগত মুসলমান (আরব-তুরস্ক প্রভৃতি সেমিটিক ও তাতার রক্তধারাজাত), স্থানীয় হিন্দু-বৌদ্ধ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমান এবং বিবাহের মাধ্যমে উভয়ের সংমিশ্রণজাত মুসলমান এই ত্রিবিধ উপাদান আছে। ধর্মের ভাষা আরবি, সংস্কৃতির ভাষা ফারসি এবং মাতৃভাষা রূপে বাংলা (অংশত উর্দুও) চর্চা করেছেন। তাঁরা আরব-পারস্যের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সাথে একাত্মতা অনুভব করেছেন এবং ভাব ও আধ্যাত্মিক জীবনে তার মধ্যেই অবগাহন করেছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁরা দেশীয় ঐতিহ্যকেও গ্রহণ করেছেন এবং সেই সূত্রে উভয় ঐতিহ্যের মধ্যে একটা সমন্বয়ের ধারা রচনা করেছেন। পরবর্তীকালে আবার দেশীয় ভাষা, দেশীয় ভাবধারা, ঐতিহ্য বর্জন করারও আন্দোলন হয়েছে। উনিশ শতক পুরো এবং বিশ শতকেও বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা উর্দু না বাংলা হবে এ নিয়ে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের মধ্যে তর্ক-বিতর্ক করেছে। উনিশ শতকে ইসলামীকরণ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশীয় ভাবধারা ও কৃষ্টি বর্জন করার প্রশ্ন উঠেছে। মুসলমান আমলে এ শ্রেণী যেরূপ সুবিধা ভোগ করেছিলেন, ব্রিটিশ আমলে তা পাননি। রাজনৈতিক ক্ষমতার হাতবদল হলে নিজেদের অদূরদর্শিতা ও অন্যান্য সংস্কার এবং নতুন শাসকশ্রেণীর প্রশাসনিক নীতির দরুন এ শ্রেণী কিভাবে ধ্বংস হয়ে যায়, তাও আমরা পূর্বে লক্ষ্য করেছি। কোম্পানি আমলের প্রথম একশ' বছর এই পতন ও ধ্বংসের পালা চলে। রাজকার্য, ভূমি ও অন্যান্য পেশার সুযোগ লাভ করে যে শরীফ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গঠন হয়েছিল কোম্পানির আমলে তাঁদের একটা বড় অংশ গ্রামে শ্রমজীবী কৃষক ও ক্ষেত-মজুরে পরিণত হয়েছে, আর একটি ক্ষুদ্র অংশ কমবেশি পূর্ব পেশায় টিকে থেকে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। আর্থিক দিক থেকে এই পরিবর্তনকালে মুসলমান সমাজে রক্তধারার আবার পরিবর্তন হয়। শরীফ-অশরীফের মিলন-মিশ্রণে সমাজে এক সংস্কার ছাড়া ধর্মগত কোনো বাধা ছিল না ; আর্থিক বিপর্যয়ের কারণে শরীফ শ্রেণী কৃষক-মজুর-মাঝি-মাল্লার সমপর্যায়ে আসে এবং এরূপ অবস্থায়, সাংস্কৃতিক ও বৈবাহিক লেন দেন চলে। এতে সামাজিক স্তর অবনমিত হয়।[১৩২] উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করে যে মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে তাঁদের কুল পরিচয় যাই থাক, আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অপেক্ষাকৃত দরিদ্র শরীফ শ্রেণীর সাথে তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়।[১৩৩] এজন্য দেখা যায় যে, অনেক শিক্ষিত বাঙালি উর্দু পরিবারের কন্যাকে বিবাহ করেছেন। উর্দু ও ফারসি চর্চা করতেন তাঁরাই যাঁরা নিজেদের

১৩২. দেলওয়ার হোসেন আহমদ 'দি ফিউচার অব দি মহামেডানস অব বেঙ্গল' (১৮৮০) গ্রন্থে বলেছেন যে, শরীফ মুসলমান ও ধর্মান্তরিত দেশীয় মুসলমানের আন্তঃবিবাহে পূর্ব শ্রেণীর দেহ, মন ও নীতিব দিক থেকে অবনতি ঘটে, এমন কি তারা নিম্নশ্রেণীর সমপর্যায়ে নেমে আসে। *The Calcutta Review*, 1881

১৩৩. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, P. 257.

বনেদী শরীফ বলে দাবি করতেন। যাঁরা নব্যপন্থী পাশ্চাত্য তাঁরাই সেকুলার শিক্ষার পক্ষপাতী, আর যাঁরা প্রাচীনপন্থী তাঁরা প্রাচ্যবিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী। মোল্লাশ্রেণী গতানুগতিক ধর্মশিক্ষার প্রতি অনুগত ও তাতেই আবদ্ধ। মধ্যপন্থী সংস্কারবাদীরা দেশীয় ভাষা ও ভাবের উপর আরবীয়-ইরানীয় প্রভাব মিশিয়ে ইসলামী বর্ণ ও চরিত্র দেওয়ার কথা বলেছেন।[১৩৪] ফলে সংকরধর্মী মানুষের মিশ্রধর্মী সংস্কৃতির উদ্ভব হয়। দোভাষী পুথিতে এর একটা ধারা খুব সহজে চোখে পড়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ পর্যন্ত মুসলমান উঠতি মধ্যবিত্তের এইরূপ পরিবর্তনশীল, দ্বন্দ্বসংকুল মিশ্র রূপ বিদ্যমান ছিল। নজমুল করিম বলেন, "The Bengal Muslim Middle Class, like its Hindu counterpart, had its roots in agararian set-up but, unlike its counterpart, began to be recruited from various Muslim social classes as the 19th century was to a close and this feature began to get more opportunities in jobs, etc. with the first partition of Bengal (1905) and introduction of reserved quota for muslim in Government Service,"[১৩৫] হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্তের এই বিষম উপাদান অসম বিকাশের জন্য উভয় শ্রেণীর মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে তফাৎ দেখা দেয়। এটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় সামাজিক বিবর্তন ধারার অনিবার্য ফল। এর সঙ্গে যখন শ্রেণীস্বার্থ উজ্জীবিত হয়েছে তখন উভয়ের চিন্তাধারা ও কর্মপদ্ধতি নিজ নিজ পথ ধরেছে। বাঙালি হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যকাব বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রকৃত বীজ এখানে নিহিত আছে। আর্থিক সুবিধা ও প্রশাসনিক তথা রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাগাভাগির প্রশ্নে শ্রেণীস্বার্থ যত মাথা চাঁড়া দিয়েছে ততই ধর্ম, বর্ণ, রক্ত, ভাষা, ভাব, সংস্কৃতি প্রভৃতির বেড়াজাল রচিত হয়েছে এবং দুটি প্রতিযোগী, প্রতিবাদী, বিবদমান শিবিরের জন্ম দিয়েছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে শাসক গোষ্ঠীর ঔপনিবেশিক স্বার্থ। শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্রিটিশ সরকার এমন কিছু করবেন না, যাতে তাঁর শাসন ও শোষণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়। সুতরাং ঔপনিবেশিক শোষণবাদী অর্থনীতিতে একই সঙ্গে ত্রিমুখী স্বার্থের দ্বন্দ্ব বেধেছিল। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অন্যত্র না থাকায় বাঙালি মধ্যবিত্তের চাকুরীর উপর নির্ভরশীলতা বাড়ছিল। পুঁজিহীন নিঃস্ব মুসলমান সমাজে সেটা আরও বেশি করে প্রকাশ পেয়েছিল। তাই মুসলমান নেতাদের ক্রমাগত দাবী উঠছিল যে, বাংলার মোট লোকসংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি মুসলমান, অতএব লোকসংখ্যার অনুপাতে তাদের চাকরীতে স্থান দিতে হবে। লর্ড রিপনকে প্রদত্ত 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র ১৮৮২ সালের 'স্মারকলিপি'তে এ বিষয়টার উপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছিল। সেখানে বলা হয়, মুসলমানদের পুঁজি নেই যে তারা ব্যবসায় করে বা

১৩৪. সৈয়দ আমীর আলী প্রগতিশীল নব্যপন্থী, আবদুল লতিফ রক্ষণশীল মধ্যপন্থী এবং মোল্লাশ্রেণী প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়াপন্থী ছিলেন। বাংলা সাহিত্যেও ঠিক এ ধরনেব স্তর দেখা যায়। মীব মোশাররফ হোসেন প্রগতিবাদী, মোজাম্মেল হক, ইসমাইল হোসেন সিরাজী উদারপন্থী সংস্কারবাদী এবং মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়াপন্থী ছিলেন।

১৩৫. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal,* P. 257

শিল্পোৎপাদনের অনুসন্ধান করে : তাদের শিক্ষাও এমন উন্নত নয় যে, প্রতিযোগিতায় প্রতিবেশি হিন্দুদের সাথে পাল্লা দেয় ; এক্ষেত্রে একমাত্র উপায় হল মুসলমানদের জন্য চাকরীতে নিয়োগের যোগ্যতাবলীর শর্ত শিথিল করা এবং তাদের বিশেষ সুবিধা দান করা।[১৩৬] বলা বাহুল্য, উচ্চশিক্ষিত অধিক অগ্রসরমান হিন্দুগণ সাধারণ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে চাকরীর দাবী করতেন। উভয়ের স্বার্থের সংঘর্ষ এখানেই। এরূপ সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মত-পার্থক্য দেখা দেয়। হিন্দু রাজনীতিবিদরা চাইতেন নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মুসলমান রাজনীতিবিদরা চাইতেন মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র নির্বাচনের মাধ্যমে জনসংখ্যার অনুপাতে প্রতিনিধি প্রেরণ।

রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান 'জাতীয় কংগ্রেসে' (১৮৮৪)* যোগদানের ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে দীর্ঘদিন সন্দেহ, মনোমালিন্য ও কোন্দল চলেছিল। সম্পাদক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে গঠিত কংগ্রেসে হিন্দুগণের স্বার্থ প্রতিফলিত হয়, এই অভিযোগ থেকে মুসলমান কংগ্রেসকে ভাল চক্ষে দেখেনি। কংগ্রেসের শুরু থেকেই নেতাদের সন্দেহ ছিল। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী যোগদান করেননি। বাংলা পত্র-পত্রিকায় মুসলমান লেখকগণ অনুরূপ কণ্ঠ তুলে বলেছিলেন যে বাংলার মুসলমান একটি অনগ্রসর জাতি, অগ্রসর হিন্দু জাতির সাথে রাজনীতি করে ব্রিটিশ সরকারের বিরাগভাজন হওয়া মুসলমানদের পক্ষে আত্মঘাতী ব্যাপার হবে ; আগে শিক্ষাদীক্ষায় উপযুক্ত হয়ে তবে মুসলমানদের রাজনীতি করা সঙ্গত হবে। রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে যেমন, অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানেও তেমনি দুই সম্প্রদায়ের মানুষ মেলামেশা করেনি। হিন্দুদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু সদস্য-সংখ্যাই সর্বাধিক, মুসলমানদের প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমান সদস্য-সংখ্যাই সর্বাধিক। শহর-মফস্বল সর্বত্রই একই রূপ। এটা তখন প্রায় ধরেই নেওয়া হত যে, মুসলমানের প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং হিন্দুর প্রতিষ্ঠানগুলি হিন্দু সম্প্রদায়ের স্বার্থ নিয়ে গঠিত, অতএব উভয়ের একত্রে মেলা-মেশা চলে না। সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে আদান-প্রদানেও দূরত্ব রচিত হয়েছে। হিন্দুগণ 'শিবাজী উৎসব' (১৮৯৫) উদ্‌যাপন করে মুসলমানের প্রাণে আঘাত দেন। মুসলমানগণ গো-হত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের পক্ষে আন্দোলন করে হিন্দুর প্রাণে আঘাত দেন। এসবই শ্রেণীস্বার্থের ভেতরকার দ্বন্দ্বের ফল—কোনটি প্রত্যক্ষ দ্বন্দ্ব, কোনটি পরোক্ষ দ্বন্দ্ব। আগেই বলেছি, শাসক ইংরাজ তাঁর ঔপনিবেশিক স্বার্থে দুটি প্রধান সম্প্রদায়ের পরস্পর দ্বন্দ্বের বিরোধ-নিষ্পত্তির চেয়ে বিরোধ-বৃদ্ধির বেশি কৌশল করেছেন, ১৯০৫ সালের বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ যার একটি প্রত্যক্ষ ফল। প্রশাসন কার্যের সুবিধার জন্য ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের কথা যতই বলা হোক, বঙ্গ ভঙ্গের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য যে বেশি ক্রিয়া করেছে, তা ধ্রুবের মত সত্য।

১৩৬. Ameer Ali : His Life and Works, PP. 35-36

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে মুসলিম মধ্য বিত্তের কর্মধারার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল স্ব-শ্রেণী ও সমাজের মধ্যে ইংরাজি ভাষার প্রচলন ও আধুনিক বিদ্যাশিক্ষার বিস্তার। আবদুল লতিফ এ ব্যাপারে প্রথম প্রবক্তা ছিলেন ; তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল 'শরীফ শ্রেণী' যার মধ্যে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্তের লোক আছেন। ইংরাজি শিক্ষা প্রচলনে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল সরকারি, সওদাগরি চাকুরির সংস্থান করা যাতে করে মুসলমান পরিবারে যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় এসেছে তা কাটিয়ে উঠতে পারে। তিনি মক্তব-মাদ্রাসায় আরবি-ফাবসি শিক্ষার ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর মতে আরবি-ফারসি না জানলে শরীফ সমাজের মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করা যায় না। শরীফ শ্রেণীর পারিবারিক ভাষা উর্দু, আবদুল লতিফ জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে উর্দুর সপক্ষে ওকালিত করেন। আবদুল লতিফের সমর্থক গোষ্ঠীরও ঐরূপ মনোভাব ছিল। তাঁরা ইংরাজি শিক্ষাকে যে অর্থে গ্রহণ করেছেন, যেভাবে প্রাচীন শিক্ষাধারার সমর্থন দিয়েছেন, এবং মাতৃভাষা হিসাবে বাংলাকে বর্জন করেছেন, তাতে তাঁরা যে প্রগতিশীল চিন্তাব অধিকাবী ছিলেন, তা বলা যায় না। সমাজে নতুন বিপ্লব ঘটানোর কথা তাঁরা ভাবেন নি ; ইংবাজি ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞানবিজ্ঞান বাংলার হিন্দু সমাজেব অন্তর্জীবনে যে ভাববিপ্লব এনেছিল, 'লতিফ-গোষ্ঠী'র মধ্যে তার প্রতিফলন দেখা যায় না। তিনি মহামেডান লিটারেরী সোসাইটিতে যাঁদের একত্রিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ক্ষয়িষ্ণু সামন্তপতিও ছিলেন। তাঁরা মধ্যযুগীয় খানদান, চালচলন, ভাববিলাসিতা ও সংস্কৃতির মধ্যে নিজেদের গৌরব মর্যাদা ও সম্মানের সূত্র খুঁজতেন, অন্য কথায় তাঁবা পুবান আভিজাত্যের মোহ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি। 'লতিফ-গোষ্ঠী'র শিক্ষা-আন্দোলনে একপ পিছুটান ছিল। সৈয়দ আমীর আলী 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'ব মাধ্যমে শিক্ষা ও রাজনৈতিক আন্দোলন করেছিলেন, তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিও প্রগতিশীল ছিল, কিন্তু সমাজবিপ্লব আনতে পারেন নি। তিনি মাদ্রাসার শিক্ষার বিপক্ষে ছিলেন, তবে উর্দু ভাষাকে বাঙালির মাতৃভাষা করতে চেয়েছেন কেননা উর্দু ভারতীয় মুসলমান সমাজে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' হিসাবে কাজ করবে। সর্বস্তরে ইংরাজি শিক্ষার জন্য তিনি জোর ওকালতি করেন। তিনি আজীবন ইংরাজি চর্চা করেছেন : আইন, ইতিহাস ও ধর্ম বিষয়ক তাঁর বহু মূল্যবান গ্রন্থ ইংরাজি ভাষায় রচিত হয়। কিন্তু তাঁরও দৃষ্টিভঙ্গির সীমাবদ্ধতা ছিল। আবদুল লতিফের মত আমীর আলীও 'আবেদন-নিবেদনে'র রাজনীতি করেছেন ; ইংরেজদের প্রতি সম্পূর্ণ আনুগত্য বজায় রেখে স্বজাতির অধিকারের প্রশ্ন তুলেছেন ; তবে দাবি-দাওয়ার সে প্রশ্ন ক্ষুরধার ছিল না। রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও উদারপন্থী হয়েও তিনি কংগ্রেসে যোগ দিতে পারেন নি। মুসলমান সমাজের দুরবস্থা তাঁকে বিচলিত করেছিল, এজন্য তিনি সমাজের সমকালীন সমস্যার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। সৈয়দ আহমদের রাজনৈতিক মতাদর্শের সহিত তাঁর মতাদর্শের মিল ছিল, যার জন্য তিনি ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তার কথা ভেবেছেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি মোটেই গুরত্ব দেননি। ইসলাম ধর্মের প্রতি খ্রিস্টানদের আক্রমণাত্মক সমালোচনায় তিনি আহত হয়েছিলেন। উইলিয়ম মুইর-এর 'লাইফ অব মহামেডান' (১৮৬৯) গ্রন্থের প্রতিবাদে সৈয়দ আহমদ হজরত মুহম্মদের জীবনী লিখেছিলেন ; আমীর আলী 'স্পিরিট অব ইসলাম' (১৮৯১) গ্রন্থে ইসলামের শরীয়তী আদর্শের মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্লেষণ করে এবং আরবের প্রথম যুগের

মুসলমানের গৌরব ও বীরত্বের কাহিনী রচনা করে ইসলাম ও মুসলমানের মর্যাদা বাড়িয়েছেন। 'আমীর-গোষ্ঠী'র মধ্যে উদীয়মান নব্য শিক্ষিতের সংখ্যা বেশি ছিল। ডক্টর নজমুল করিম 'লতিফ-গোষ্ঠী'কে 'ওল্ড এলিটি' এবং 'আমীর গোষ্ঠী'কে 'নিউ এলিট' বলেছেন।[১৩৭] আমীর আলীর পিতা অযোধ্যা থেকে কটক হয়ে এসে হুগলীতে হেকিমী চিকিৎসা করতেন ; তাঁর আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল না। বৃত্তির টাকার উপর নির্ভর করে ওয়ারেস আলী ও আমীর আলী দুই সহোদর লেখাপড়া করেন এবং প্রখর মেধাশক্তির গুণে উচ্চ রাজপদ লাভ করেন। আমীর আলী হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। ব্যক্তি জীবনের এই পটভূমি যাঁর এবং যিনি জীবনে ঝুঁকি নিতে চান না, তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ কায়েমী স্বার্থের উর্ধে উঠতে পারে না।[১৩৮] সুতরাং কাণ্ডারীহীন সমাজের মুখপাত্র হয়ে আবদুল লতিফ ও আমীর আলী অধঃপতিত মানুষের মতিগতি ফিরিয়েছিলেন বটে কিন্তু সমাজচিত্তে আমূল পরিবর্তনের বৈপ্লবিক বীজ বপন করতে পারেন নি। আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর অনুসারীর একটা ক্ষুদ্র অংশ দেলওয়ার হোসেন আহমদ, সৈয়দ শামসুল হুদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন পুরাতন মৃত আভিজাত্যের মোহ থেকে বেরিয়ে এসে নতুনভাবে শিক্ষা ও সমাজ আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। তাঁরাই প্রথমে 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' (১৮৯৩) এবং পরে 'প্রাদেশিক বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯০৩) স্থাপন কবে তাঁদের আন্দোলনকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। তাঁদের চিন্তা ধারার প্রধান গুণ ও অভিনবত্ব হল এই যে বাংলা ভাষাকে বাঙালির মাতৃভাযা হিসাবে গণ্য করে তারই মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে ব্যাপক শিক্ষা বিস্তার করা। ইংরাজি, বাংলা ও আববি সকল প্রকার শিক্ষাব প্রসারে দেশব্যাপী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য তাঁরা শিক্ষা সমিতি গঠন করেছিলেন। কলিকাতার চৌহদ্দি পেরিয়ে তাঁরা গ্রামের সাথে সম্পর্কে স্থাপন করেন এবং গ্রামের মানুষকে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম গ্রাজুয়েট দেলওয়ার হোসেন আহমদ পুরোপুরি যুক্তিবাদী ছিলেন। তিনি মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতার কারণ হিসাবে ধর্মীয় ও সামাজিক আইন, প্রথা ও প্রতিষ্ঠানকেই দায়ী করেন। উত্তরাধিকার আইন, মহাজনী কারবার, বহুবিবাহ প্রথা ইত্যাদি সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করে তিনি একাধিক প্রবন্ধ ও পুস্তিকা রচনা করেন।[১৩৯] এঁদের সাথে বাঙালি লেখক ও সম্পাদক যোগ দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমেদ, শেখ আবদুর রহিম, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী শিক্ষা-সমিতির অধিবেশনে অংশ গ্রহণ করেন এবং কর্মসূচি প্রণয়নে সাহায্যে

করেন। তবে এ আন্দোলনও বেশি দূর অগ্রসর হয়নি। দুটি অধিবেশন খুব গুরুত্বের সাথে হয়েছিল। তারপর এল বঙ্গ-বিচ্ছেদ, নতুনভাবে রাজনৈতিক আন্দোলনের জোয়ার। শিক্ষা-সমিতির আন্দোলন দু'এক বছরের মধ্যে ভাটা পড়ে যায়। শিক্ষা-সমিতির আন্দোলনেও কর্মীদের বিপ্লবী মনোভাব ছিল না। সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন উৎসাহী প্রগতিশীল যুবক ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি যাঁদের সাথে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে রক্ষণশীল লোকের সংখ্যা বেশি ছিল। এজন্য কয়েক ধাপ এগিয়ে এসেও শিক্ষা-সমিতির আন্দোলনে সাড়া জাগান ফল পাওয়া গেল না।

ব্যক্তি-প্রচেষ্টার সাথে যৌথ-প্রচেষ্টা পাশাপাশি চলেছিল যার ফলে বিভিন্ন সংগঠনের জন্ম হয়। মুসলমানের প্রথম সংগঠন কলিকাতার 'মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৫৫), পরে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৬৩), 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৭), 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩) ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। মফস্বল শহরগুলিতেও এসবের আদর্শে অনেক সভা-সমিতি স্থাপিত হয়। মুসলমান সমাজে মানুষের মনে অধিকার সম্বন্ধে সচেতনতা, সংহতিবোধ এবং সমাজমুখী চিন্তাধারা জাগ্রত হয় এসব সংগঠনের মাধ্যমে। সংগঠনের উদ্যোক্তাগণ সমকালীন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সেগুলির সমাধানের জন্য কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন। শিক্ষা বিস্তার, ধর্ম ও সমাজ সংস্কার প্রতিষ্ঠানগুলির প্রধান কর্মসূচি ছিল। কোনো কোনটিতে রাজনৈতিক চিন্তারও প্রতিফলন ঘটেছে। প্রতিষ্ঠানগুলি মুসলমান সমাজের সমস্যার প্রতি বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। এগুলিতে হিন্দু সদস্য প্রায় থাকতেন না এবং হিন্দু-মুসলমানের যৌথ চিন্তা ও কর্মের স্থানও ছিল না। মিলনের অপেক্ষা বিরুদ্ধাচরণের প্রয়াস ছিল বেশি। বিশেষ করে, গো-বধ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল কয়েকটি সভা-সমিতি সে-বিষয়ে খুব সোচ্চার ছিল ; অন্য অন্য বিষয়েও সমিতিগুলি মুসলমান সমাজের অধিকারের সপক্ষেই আন্দোলন করেছে।

বাঙালি মুসলমানের হাতে আধুনিক সাহিত্যের চর্চা এ পর্বেই শুরু হয়। এর আগে শিক্ষিত লোকেরা বাংলা ভাষা শিখতেন না, বাংলা সাহিত্যের চর্চা করতেন না। তাঁদের লক্ষ্য ছিল উর্দু-ফারসি ; তবে তাঁরা উর্দু ফারসিতেও অধিক অগ্রসর হয়েছেন, এমনও নয়। আবদুল লতিফের জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবদুল গফুর উর্দু কবি ছিলেন।[১৪০] তাঁর পিতা কাজী ফকির মোহাম্মদ ফারসিতে ইতিহাস গ্রন্থ লিখেছেন। উর্দু বাঙালির মাতৃভাষা নয়, মাতৃভাষা ছাড়া জাতীয় চিন্তা-চেতনার বিকাশ সম্ভব নয়। শিক্ষিত শ্রেণীর আরবি-ফারসি মোহের ঘোর কাটতেই প্রায় সত্তর বছর কেটে যায়। এ সময়ের মধ্যে অল্প শিক্ষিত একটি শ্রেণী যা রচনা করেছেন তা 'দোভাষী পুথি' বা 'বটতলার সাহিত্য' নামে পরিচিত। এগুলি

বাংলা ভাষার সাথে আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দের মিশ্রণে রচিত কৃত্রিম পদ্য সাহিত্য। মীর মশাররফ হোসেন প্রথম বলিষ্ঠ গদ্য লেখক। তিনি যথেষ্ট উদারতা ও যুক্তিশীলতাকে আশ্রয় করে বাংলা সাহিত্যে অবতীর্ণ হন। কিন্তু তখন চারদিকে অন্ধকার জমে আছে, মন পিছনে পড়ে আছে, স্বার্থচিন্তা ও ধর্মান্ধতার পাকে সমাজের গতি অচল, স্থবির। লেখকের মুক্তচিন্তার ডাকে সমাজ সাড়া দেয়নি, বরং তাঁকে টেনে নিজ গহ্বরে নিয়ে গেছে। তিনি 'গো-জীবন' (১৮৮৭) লিখে সমাজের কাছ থেকে 'কাফের ফতোয়া' পান এবং মামলায় জড়িয়ে পড়ে বিপদগ্রস্ত হন। কাজেই তিনি ঐ পথ ছেড়ে 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৩), 'মোসলেম বীরত্ব' (১৯০৭) 'এসলামের জয়' (১৯০৮) প্রভৃতির দিকে ঝুঁকে পড়েন। বিশুদ্ধ শিল্প-সাহিত্য, সুস্থ চিন্তাধারাকে গ্রহণ করার মত সমাজের অবস্থা ছিল না। মশাররফ হোসেনের ঈষৎ পরে টাঙ্গাইলের মোহাম্মাদ নইমুদ্দীন, যশোহরের মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, নদীয়ার শেখ জমিরুদ্দীন, বরিশালের মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, ২৪-পরগণার শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ গদ্য লেখকের আবির্ভাব হয়। তাঁরা প্রধানত রক্ষণশীল ছিলেন। তাঁদের সমসাময়িক কালে ঢাকার কায়কোবাদ, শান্তিপুরের মোজাম্মেল হক, রংপরর শেখ ফজলুল করিম, মেদিনীপুরের শেখ ওসমান প্রভৃতি কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক ছিলেন যাঁরা সুস্থ চিন্তা করেছেন সমাজের আবেগ অনুভূতিতে ভারসাম্য আনার জন্য। তবে তাঁরাও মুসলিম সমাজের মুক্তি চেয়েছেন ইসলামের পুনরুজ্জীবনের মধ্য দিয়ে। মুসলমানের অতীত গৌরব, ইসলামের মহিমা কীর্তন করে তাঁরা পাঠকের মনে প্রেরণা সঞ্চার করতে চেয়েছেন। সুতরাং লক্ষ্যের দিক থেকে রক্ষণশীলদের সাথে তাঁদের বিশেষ তফাৎ ছিল না। শুধু বলা যায় যে, তাঁরা গোঁড়ামি মুক্ত ছিলেন। সেকুলার ভাবাদর্শে লেখনি ধারণ করেনি সে যুগের মুসলমান পরিচালিত ও সম্পাদিত পত্র-পত্রিকাগুলিও। পত্র-পত্রিকা যৌথকর্ম সাধনের ও যুক্তচিন্তা প্রকাশের একটি উত্তম মাধ্যমে। প্রথম শ্রেণীর লেখকগণই সাময়িকগুলি চালাতেন ; কোনো কোনো ক্ষেত্রে সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতাকর্ম একই উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ 'আখবারে এসলামীয়া' (১৮৮৪), 'ইসলাম-প্রচারক' (১৮৯১) প্রভৃতি পত্রিকার সাথে মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ সম্পাদক জড়িত ছিলেন। তাঁরা ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের যে আন্দোলন করেন, তার মূলবৃত্ত ছিল 'ইসলামীকরণ'। কেউ কেউ আবার প্যান-ইসলামি ভাবাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। তাঁরা মুসলমানের ধর্মশাস্ত্র ও ইসলামের ইতিহাসের মধ্যে জাতীয় প্রেরণার উৎস খুঁজে পেলেন, বাংলার ও বাঙালির ইতিহাস প্রায় উপেক্ষিত হল : সমকালের বাস্তব সমস্যাগুলিকেও যুক্তিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ও সহনশীল মনোভাব নিয়ে তাঁরা বিচার বিশ্লেষণ করেন নি। ফলে প্রতিবেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি অসহিষ্ণুতার মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছে বেশি ; তখনকার হিন্দুনেতা ও সাহিত্যসেবীদের কাছ থেকেও যথেষ্ট পরিমাণে উদারতা ও মিলনের বাণী উচ্চারিত হয়নি। খ্রিস্টান পাদরীগণ মিশননীতির উদ্দেশ্যে ইসলাম ধর্মকে এবং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ রাজনীতির স্বার্থে মুসলমানের ইতিহাসকে বিকৃত করে আলোচনা-সমালোচনা করতেন ; হিন্দু সমাজের

উঠতি নব্য বুদ্ধিজীবীদের মনে তার প্রভাব পড়ে। ইংরাজি প্রভাবে তাঁদের মনের দুয়ার খুলেছিল যার জন্য তাঁরা শতাব্দীর গোড়াতেই ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন করেছিলেন। একে তো সমাজের বুকে নানা গলদ জমে ছিল, তার উপর খিস্ট্রান মিশনারীদের কাছে থেকে আঘাত এসেছিল। ফলে হিন্দুত্বের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন তাঁদের মধ্যেও দেখা দেয়। খুব স্বাভাবিকভাবে তাঁরা ভারতীয় ভাবাদর্শ, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস প্রভৃতির উপর জোর দেন। তখন বাংলা সাহিত্যের তাঁরাই ছিলেন রূপকার ; তাঁদের রচিত সাহিত্যকর্মে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রলেপ পড়ে, তাঁরা আরব-ইরানের সংস্কৃতিকে গ্রহণ করতে পারেন না, তাঁদের ধর্ম-সমাজ আন্দোলনের সঙ্গে এ সংস্কৃতির যোগসূত্র ছিল না। ক্রমে তাঁদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রসার ও বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ ঘটে এবং একটি শ্রেণী সচেতন নব্যসমাজের উদ্ভব হয়। প্রথমে ব্রিটিশ সরকারের সাথে তাঁদের বিরোধ ছিল না, বরং ব্রিটিশ শাসকের সাথে সহযোগিতা করে ভাগ্যোন্নয়নের সুযোগকে তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। এজন্য শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তোষণনীতি তাঁদের মধ্যেও ছিল। শাসককে অসন্তুষ্ট করে আর্থিক সুবিধাগুলি (যা ক্রমে কায়েমী স্বার্থে পরিণত হয়) ত্যাগ করতে তাঁরা পারেন না। কিন্তু ঐ অবস্থাও বেশি দিন টিকেনি। সমাজের উঁচু তলার মানুষের মধ্যে সমস্যা দেখা দেয়, শিক্ষা ও যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরী, মর্যাদা তাঁরা পান নি।[১৪১] সাহেবরাই সব বড় চাকুরী ও ক্ষমতার পদগুলিতে সমাসীন ; বাঙালি নব্য শিক্ষিত যুবকেরা তার ভাগীদার হতে চান। আবার রাজনৈতিক চিন্তার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শাসন ক্ষমতারও অংশীদার হওয়ার দাবি উঠতে থাকে। ফলে ইংরাজ শাসকের সাথে বাঙালির সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এরূপ চেতনা ও দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র আজীবন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। কেবল নেটিভ বলে তাঁর পদোন্নতি হয়নি। আই. সি. এস. পাশ করেও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের চাকুরী হয়নি। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের এই সংঘর্ষ সাহিত্য রচনায় প্রতিফলিত হয়। নব জাতীয়তাবোধ ও স্বদেশপ্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁরা নতুন ভাববিপ্লব নিয়ে এলেন। সরাসরি ইংরাজের বিরুদ্ধে যাওয়ার মত সমাজ সংহতি, রাজনৈতিক সংগঠন ও আন্দোলন তখন গড়ে ওঠেনি ; অতএব তাঁরা লেখনির মাধ্যমে তাঁদের সংগ্রামী মনোভাবকে তুলে ধরলেন। দুই শক্তির দ্বন্দ্ব দেখাতে ভারতবর্ষে মুসলমান আমলের ইতিহাস ছিল প্রশস্ত ক্ষেত্র। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রমশেচন্দ্র দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ লেখক ইতিহাসের মধ্যেই তাঁদের সংগ্রামী অনুপ্রেরণার উৎস খুঁজেছেন। তাঁরা ইতিহাসের উপাদানের জন্য নির্ভর করলেন ইংরাজ পণ্ডিতদের রচিত গ্রন্থগুলির উপর। পাঠান ও মোঘল আমলের মারাঠা, রাজপুত, শিখ, জাঠ, অমেঠি প্রভৃতি জাতির বীরত্বকাহিনী কাব্যকাহিনী কাব্য-উপন্যাস-নাটকের বিষয়বস্তু হল। বাংলার প্রতাপাদিত্য, সীতারামের সামান্য ক্ষমতা ও সামান্য ইতিহাস অসামান্য হয়ে উঠল। ইতিহাসের সত্যাসত্য যাচাই করার প্রয়োজন হয় নি, প্রয়োজন হয় নি প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মনে কি প্রতিক্রিয়া হবে

১৪১. *বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২১১-১২

তার। তখন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যই বড় ছিল। তাঁদের চিন্তায় পৃথ্বিরাজ, রাণাপ্রতাপ সিংহ, জয়সিংহ, শিবাজী নায়ক হলেন, আলাউদ্দীন, আকবর, আওরঙ্গজেব শত্রু হলেন ; এটি যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সামন্তবাদী শক্তির লড়াই ছিল, এই সত্য চাপা পড়ে যায়। মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা হিন্দু শক্তির পুনরভ্যুত্থানের এই ধারাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন নি ; বরং তাঁদের মনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে সর্বত্র। ইংরাজি 'সুয়োরানী-দুয়োরানী নীতি'র কথাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। হিন্দু উদীয়মান শক্তির পরিচয় পেয়ে শাসক-গোষ্ঠীর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, আশ্রিতবাৎসল্যের দিন গেছে। সুতরাং এখন অপর একটি অনগ্রসর সম্প্রদায়কে 'পুশ' করার প্রয়োজন। মুসলমান সম্প্রদায়কে সুযোগ-সুবিধা দিয়ে শাসননীতির কিছু পরিবর্তনও ঘটেছে এ সময়। আবদুল লতিফ, মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। কিন্তু তাঁদের চিন্তা ও ভাবাদর্শ ভিন্ন ছিল। মুসলমান সমাজের যে অবস্থা তাতে তাকে রক্ষা করাই দায়, তাকে সংগ্রামের মুখে ঠেলে দেওয়া উচিত হবে না ভেবে রাজনৈতিকভাবে সচেতন হয়েও আবদুল লতিফ, আমীর আলী হিন্দু সমাজের সংগ্রামী ভাবান্দোলনের সাথে মিলতে পারেন নি। আবদুল লতিফ বলেন যে, স্কুল-কলেজের পাঠ্যপুস্তক হতে ইসলাম বিরোধী বিষয়গুলি দূর করতে হবে, গ্রামের মুসলমানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা দিতে হবে কিন্তু সে-বাংলায় আরবি-ফারসি শব্দের আমদানী কবতে হবে। আমীর আলী সবকারি অনুগ্রহ বণ্টনের ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সুবিধা দাবি করেন। মুসলমান সমাজপতিদের এরূপ মনোভাবকে পুঁজি করে মুসলমান লেখক সাংবাদিকগণ সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ; ঠিক ঐ সময় হিন্দু সমাজনেতা ও সাহিত্যিকগণের মনোভাবের উল্টো ধারা চলছে। ফলে প্রতিক্রিয়া হলো বেশি, বলতে গেলে এই প্রতিক্রিয়া থেকে মুসলমান পরিচালিত বাংলা সাময়িক পত্রগুলির জন্ম। এজন্য সমাজ, ধর্ম, ইতিহাসের ক্ষেত্রে যেখানেই ভুল তথ্য আছে বা আঘাত-আক্রমণের সুর আছে সেখানেই প্রতিবাদ হয়েছে। একদিকে এই প্রতিবাদের সুর তুলে এবং অপরদিকে সমাজ সংগঠনে হিন্দুয়ানি উপাদান বর্জন করে সে স্থলে ইসলামী উপাদান আমদানী করে 'জাতীয় সাহিত্য' নির্মাণের আন্দোলন করেছেন তাঁরা।[১৪২] সামাজিকভাবে মিলতে না পারলে সাহিত্যেও মিলন হয় না। রবীন্দ্রনাথ সেযুগের সাহিত্যে হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বের কথাটি এভাবে বলেছেন, "আজকাল শিক্ষিত সম্প্রদাদের মধ্যে নূতন হিন্দুয়ানি অকস্মাৎ নারদের ঢেকি অবলম্বন করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছেন। তাঁহারা নবোপার্জিত আর্য অভিমানকে সজারু শলাকার মত আপনাদের চারিদিকে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছেন ; কাহারো কাছে ঘেঁসিবার যো নাই। হঠাৎ বাবুর বাবুয়ানার মত তাঁহাদের হঠাৎ হিন্দুয়ানি অত্যন্ত অস্বাভাবিক উগ্রভাবে প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। উপন্যাসে নাটকে কাগজপত্রে অকারণে বিধর্মীদের প্রতি কটাক্ষপাত করা হইয়া থাকে। আজকাল অনেক মুসলমানেও বাঙ্গালা শিখিতেছেন এবং বাঙ্গালা লিখিতেছেন। সুতরাং স্বভাবতই একপক্ষ

১৪২ এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা তৃতীয় অধ্যায়ে করা হয়েছে।

হইতে ইট এবং অপর পক্ষ হইতে পাটকেল বর্ষণ আরম্ভ হইয়াছে"।[১৪৩] অবশ্য কিছু কিছু হিন্দু-মুসলমানের মিলনসূচক প্রবন্ধ ছাপা হত ; একটি পত্রিকা 'হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী' (১৮৮৭) মুনশী গোলাম কাদের মাগুরা থেকে প্রকাশ করেছিলেন। আবদুর হামিদ খান ইউসফজয়ী সম্পাদিত 'আহমদী' (১৮৮৬) পত্রিকার উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, নিখিলনাথ রায়, দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার, রামপ্রাণ গুপ্ত, গিরিশচন্দ্র সেন প্রমুখ প্রোথিতযশা লেখক মিলনের ডাক দিয়েছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁদের সকলের কণ্ঠ চাপা পড়ে যায়। সমাজের সংগঠন ও জাগরণের কাজে যাঁরা অংশ নিয়েছেন, তাঁরা সেটা করতে চেয়েছেন মুসলমান সম্প্রদায়ের স্বার্থে ভাবাদর্শের পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে। মুসলমানকে বাদ দিয়ে হিন্দুর পুনর্জাগরণ এবং হিন্দুকে বাদ দিয়ে মুসলমানের পুনর্জাগরণ সম্ভব নয়—এ বিষয়টি ঐ শতাব্দীর সংস্কার-আন্দোলনকারীরা ভেবে দেখেন নি। তবে খণ্ডিত হলেও তাঁরা যে নিজ নিজ সম্প্রদায়ের জন্য পরিবর্তন এনেছেন, একথা সত্য। এর অপর নাম 'রিভাইভালিজম'। রেনেসাঁসের প্রধান ধর্ম যুক্তিবাদ, মুক্তবুদ্ধি, স্বাধীন ও সেকুলার চিন্তা এবং মানবিক মুল্যবোধের প্রতি আস্থা —এখানে সেগুলি পুরোপুরি প্রতিফলিত হয় নি। সেক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাব, ধর্মবুদ্ধি ও স্বার্থ স্থান পেয়েছে। ইসলামের ধর্মনীতি অধিক সুসংগঠিত এবং বক্ষণশীল। এজন্য মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম ও আদর্শ নিয়ে বিভেদ ও বিবাদ কম হয়েছে ; বরং তাঁরা বাঁচার তাগিদে ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নামে অল্প সময়ে একটি শক্তিশালী আন্দোলন গড়ে তুলেছেন এবং সফলতা লাভ করেছেন। এরূপ মত পোষণ করে বি. বি. মিশ্র বলেন, " the traditional orthodoxy of Islam and the time-lag in the Western education of Muhammadans made revivalism a relatively stronger force in that community, and this was reinforced by the economic decline of the Muslim community"[১৪৪] জাতির ভাগ্যবিপর্যয় ও দুর্গতির সাধারণ শত্রু যে বিদেশী শাসক, এটা যথাসময়ে এবং ঠিকভাবে চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়ে হিন্দু ও মুসলমান যুক্তভাবে বাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য বিপ্লব না করে সাম্প্রদায়িক স্বার্থের দিকে ঝুঁকে পড়ে স্বতন্ত্র পথেই গেছে, সমগ্র জাতির অভিন্ন স্বার্থে তা পরিচালিত হয়নি। অর্থাৎ 'বাঙালী জাতীয়তাবাদে'র আদর্শে তাঁরা সম্মিলিত হয়নি। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত এই আন্দোলন প্রধানত শহরের শিক্ষিত ও সুবিধাপ্রাপ্ত উচ্চ ও মধ্যবিত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ; বৃহত্তর জনগণকে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিখণ্ডিত ও দ্বিধাগ্রস্ত আংশিক জাগরণকে সমগ্র জাতির জন্য নবজন্ম বা রেনেসাঁস বলা যায় না, একে সামাজিক-সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে হিন্দু জাতীয়তা ও মুসলিম জাতীয়তার রিভাইভালিজম বা পুনরভ্যুত্থান বলাই যুক্তিসংগত।

১৪৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—'হিন্দু ও মুসলমান', *সাধনা,* চৈত্র ১৩০১
১৪৪. *The Indian Middle Class,* P. 17

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব

একটি মানব সমাজে বিপ্লব, বিবর্তন বা পুনর্জাগরণ আসে হয় কোনো প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহামানবের চিন্তাশক্তির প্রভাব ও সফল কর্মপ্রয়াসের ফলে, যেমন যীশুখ্রিস্ট, বুদ্ধদেব, মহম্মদ দ্বারা হয়েছে ; আর না হয় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনে অর্থনৈতিক ভারসাম্য এক শ্রেণীর হাত থেকে অন্য শ্রেণীর হাতে গেলে যেমন পশ্চিম ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের ফলে সামন্ততন্ত্রের অবসানে ধনতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। মধ্যযুগে ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদের আশ্রয়ে ছোট ছোট সামন্ততন্ত্র ছিল। আঠার শতকের গোড়ার দিকে ভারতে ওলন্দাজ, পর্তুগীজ, ফরাসি, ইংরাজ প্রভৃতি জাতির বাণিজ্যের প্রভাব পড়তে থাকে। ঐ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ রাজশক্তির অভ্যুত্থান হয়। ইংরাজগণ এদেশের মাটিতে শিল্প-কলকারখানা গড়ে তুলে এবং বিজ্ঞানের প্রসার ঘটিয়ে ইউরোপের তুল্য অর্থনৈতিক বিপ্লব আনতে পারতেন, কিন্তু বণিক সরকার ভারতবর্ষকে কাঁচামাল সরবরাহকারী ও শিল্পপণ্যের আমদানীকারী উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহার করেছেন। তাঁরা সমাজব্যবস্থাতে কোনো গুরুতর পরিবর্তন আনেননি, বরং সাম্রাজ্যবাদী শাসননীতি ও ঔপনিবেশিক শোষণনীতি টিকিয়ে রাখার জন্য এদেশের সামন্তশ্রেণীকে লুপ্ত হতে দেননি। তাঁরা পুরাতন সামন্তদের ধ্বংস করেন, পাছে তাঁদের কায়েমী স্বার্থ ব্রিটিশ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়[১], পুরাতন সমান্তদের উৎখাত করে নতুন বশংবদ পাতি-সামন্তপতির সৃষ্টি করেন। ফলে ভারতবর্ষে অর্থনীতি বা সমাজ কাঠামোর দিক থেকে কোনো গুরুতর পরিবর্তন আসেনি। কেবল ধীর গতিতে পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষার মাধ্যমে এদেশের নবোত্থিত মধ্যবিত্তশ্রেণীর মানুষের মধ্যে মানসিক, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এসেছে যাকে 'ভাববিপ্লব' বলা যায়। শাসকগোষ্ঠীর সহযোগিতায় ইংরাজি শিক্ষা লাভ করে উনিশ শতকের গোড়ায় হিন্দু সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে বিপ্লবের লক্ষণ প্রকাশ পেতে শুরু করে, নিম্ন বর্ণ ও নিম্নবিত্তের হিন্দুরা ঐরূপ সুযোগ-সুবিধা পায়নি বলে তাদের মধ্যে কোনই আলোড়ন, আবর্তন জাগেনি। অনুরূপভাবে মুসলমান সমাজও পিছিয়ে পড়ে।

১. বণিক সরকার মুঘল জমিদারের ধ্বংস কামনা করেছিল, তার প্রমাণ ওয়ারেন হেস্টিংসের বিবরণীতে পাওয়া যায়: "বড়বড় জমিদার তাঁদের প্রচণ্ড প্রভাব ব্যবহার করে থাকেন সরকারের বিরুদ্ধে এবং সেই জন্যই তাঁদের প্রভাব নষ্ট করা বাঞ্ছনীয়।"—
Introduction to the Fifth Report.

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার মুসলমান সমাজে পরিবর্তনের সুরধ্বনিত হয়। ইংরাজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা গ্রহণ করে একটি নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। তারাই ক্রমশ স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন হয়ে সমাজের মানুষকে সচেতন করে তোলার আন্দোলন করে। একই শাসকের শাসননীতি ও অর্থনীতির মধ্যে বিরাজ করে হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণহিন্দুর তুলনায় মুসলমান সম্প্রদায়ের শরীফশ্রেণীর প্রায় পঞ্চাশ বছর পিছিয়ে পড়ার প্রধান কারণ এই নবদীক্ষিত, মধ্যবিত্তের অনুপস্থিতি। কিভাবে, কাদের দ্বারা, কত হারে, মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠে, আমরা প্রথম অধ্যায়ে তা আলোচনা করেছি। এখানে কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিজীবনের উত্থান ও কার্যকলাপ সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। উনিশ শতকের এই গঠনমূলক পর্বে তাঁদের চিন্তাধারা ও ক্রিয়াকলাপ বুঝতে পারলে মুসলিম নবজাগরণের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, গতি ও মাত্রা সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা হবে। সত্যকার সমাজকর্মী নেতার সংখ্যা খুব বেশি হবে না, এককভাবে নেতৃত্বদানের শিরোপাও কাউকে দেওয়া যাবে না, কিন্তু প্রথমে একটি কণ্ঠস্বরের সাথে আর একটি এবং তৎপরে দুটি, তিনটি করে আরও কণ্ঠস্বর মিলে সমস্বরের সৃষ্টি করেছে। সভা-সমিতি ও পত্রপত্রিকার মাধ্যমে যৌথভাবে উচ্চস্বরও ধ্বনিত হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের পঞ্চাশ বছরের মধ্যে এরূপ পদ্ধতিতে ব্যক্তির প্রয়াস সমষ্টির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট আকারে ও প্রকৃতিতে দানা বেঁধেছে। যেহেতু সমাজের এই পরিবর্তন অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, বদ্ধদশা থেকে মুক্তির দিকে সেহেতু একে 'নবজাগরণ' আখ্যা দেওয়া যায়।

ঐ সময় কি হিন্দু কি মুসলমান সমাজে কোনরূপ আন্দোলনের পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। বাইরের বৈবিশক্তি ও ভেতরের বিরোধী শক্তির সাথে রীতিমত সংগ্রাম করতে হয়েছে। রাষ্ট্রক্ষমতা হারানোর ফলে মুসলমান সমাজের অর্থনৈতিক ভিত একেবারে ভেঙে পড়ে। অজ্ঞতা, অশিক্ষার কারণে সামাজিক রীতিনীতি, অসৎ আচার-আচরণ, কুসংস্কার, কুরীতি সমাজ জীবনে প্রবেশ করে সমাজ দেহকে পঙ্গু করে ফেলে। এদিকে ব্যবসায়, শিল্প, মহাজনী, চাকরী-বাকরী দ্বারা অর্থ উপার্জনের পথ প্রায় বন্ধ, সেগুলি অধিকাংশই শাসক ইংরাজ ও শিক্ষিত বর্ণহিন্দুর দখলে চলে যায়।[২] ১,৫০০ টাকা ও তার ঊর্ধে উচ্চ পদে ইউরোপীয় শাসক ও ভারতীয় হিন্দু-মুসলমানের স্থান ছিল এরূপ :

সাল	মোট পদ	ইউরোপীয়ান	হিন্দু	মুসলমান
১৮৬৭	২১৮২	০৪৮(৯৩.৮%)	৯৯(.৫%)	৩৫(১.৬%)
১৯০৩	৩৮৬০	৩২৫৪(৮৪.৩%)	৫০৮(১৩.১%)	৯৮(২.৬%)

২. Bimanbihari Majumdar-- *Indian Political Associations and Reform of Legislature (1818-1917)*, Firma K.L Mukhopadhaya, Calcutta, 1965, p. 220.

সমাজের এক শ্রেণীর মানুষ বলেছে, ইংরাজি ভাষা 'কুফরে কালাম' —সে ভাষা শিক্ষা 'হারাম' ; পাশ্চাত্য বিদ্যা 'এলমে বেদিন'—সে বিদ্যা অর্জন অসিদ্ধ। আবার কোনো কোনো শ্রেণীর মানুষ ভাতরবর্ষকে 'দারুল হরব' বা শত্রুভূমি মনে করে জেহাদের নীতি অনুসরণ করেছে। নিতান্ত দায়ে ঠেকে সামাজিক বাধা, ধর্মীয় কুসংস্কার ঠেলে কেউ যদি লেখা পড়া শিখতে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, সে দেখেছে শিক্ষাক্ষেত্রে বাধাবিপত্তি ; শিক্ষা লাভ করে কর্মজীবনেও বাধা – হিন্দুর সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এঁটে উঠতে পারছে না। সেকালের পত্র-পত্রিকা ও নথিপত্র থেকে জানা যায়, নিজেদের অক্ষমতা, অজ্ঞানতা ও আমলাদের ষড়যন্ত্রের কারণে মুসলমানদের অনেক জমিদারী হাত ছাড়া হয়ে গেছে। এক কথায়, সমাজের তখন ভরাডুবি অবস্থা। প্রায় সব দিক থেকে প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করে যে কয়জন ব্যক্তি সমাজের নবজাগরণের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। একটি জাতির ইতিহাসে তাঁদের দানের গুরুত্ব অনেক। মধ্যবিত্ত পরিবারের কতিপয় আধুনিক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন। কেউ কেউ পুরাতন ভগ্নদশাপ্রাপ্ত, শক্তিহীন, অভিজাত রাজপরিবারের সান্নিধ্য কামনা করেছেন. কিন্তু তাঁদের উপস্থিতি ছিল নিতান্ত শিখণ্ডীর মতই। কলিকাতাতে ইংরাজদের অনুগ্রহভাজন বৃত্তিধারী মহীশূর পরিবার, অযোধ্যা পরিবার, মুর্শিদাবাদ পরিবার ও অন্যান্য অভিজাত পরিবারভুক্ত লোক ছিলেন। তাঁরা সরকারের সাথে যোগরক্ষাকারী, সভা-সমিতির কর্মকর্তা ও শিক্ষা-সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানে অর্থসাহায্য দানকারীব ভূমিকা নিলেও কেউ নেতৃত্ব দিতে পাবেন নি। ঢাকাব নবাব পরিবারও তাই। ঐ পরিবারের সন্তান নবাব আবদুল গণি (১৮১৩-৯৬), নবাব আহসানুল্লাহ (১৮৪৬-১৯০১) প্রচুর বিত্তের মালিক, তাঁরা দান খয়রাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন, ভোগ বিলাসিতায় আরও বেশি ; সমাজের উপরে প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, সরকারি মহলেও তাঁদের উচ্চ মর্যাদা ; তথাপি উনিশ শতকের নতুন ভাবাদর্শ, চিন্তাবৃত্তি, জীবনচেতনা নিয়ে তাঁরা এগিয়ে আসেননি। এদিক থেকে কলিকাতার ঠাকুর পরিবার, দেব পরিবার, সিংহ পরিবার, দত্ত পরিবার, মল্লিক পরিবার, কি ঘোষ পরিবারের সাথে অনেক তফাৎ আছে। মুর্শিদাবাদের বনেদী নবাব ও ঢাকার উপাধিপ্রাপ্ত নবাব যেটুকু করেছেন, সেটুকু নিজেদের শিক্ষার জন্যই করেছেন, অন্য শ্রেণীর জন্য তাঁরা তেমন মাথা ঘামান নি।[৩] এজন্য উকিলের সন্তান আবদুল লতিফ ও হেকিমের সন্তান সৈয়দ আমীর আলীব জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। সৈয়দ শামসুল হোদা, সিরাজুল ইসলাম, দেলওয়ার হোসেন আহমদ, ওবায়দুল্লাহ আল-ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ সবাই মধ্যবিত্তের সন্তান। গ্রামের নানা স্থানে ক্ষুদ্র বৃহৎ জমিদার ছিলেন, তাঁরাও লেখাপড়ার দিকে মনোনিবেশ করেননি। দু'একজন উচ্চ শিক্ষালাভ করলেও সমাজ সেবার

নবাব আব্দুল গণি পুত্র আহসানুল্লাহকে লিখিত এক পত্রে ঢাকার 'রইস বাসিন্দাদেব' আধুনিক শিক্ষা দিতে নিষেধ কবেন। তাঁরা লেখাপড়া শিখে নিজেদের অবস্থা জানতে পারলে নবাব পরিবারেব নেতৃত্ব টিকবে না বলে ঐ পত্রে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়। নবাব এস্টেটের ওয়াকফ জমিদারীগুলির কাগজপত্র পবীক্ষা করার সময় আবুল হুসেন ঐ পত্র-খানির সন্ধান পান এবং সমকালের এক পত্রিকায় তা প্রকাশ করেন (১৯২১-২২)। কামরুদ্দীন আহমদ—*বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ*, ঢাকা, ১৩৮২, পৃ. ৩৪

কাজে এগিয়ে আসেননি। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা বিএ, কি এমএ ডিগ্রী নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে দশ-পনের জনের বেশি জমিদার পুত্র পাওয়া যায় না।[৪] অর্থের অভাব না থাকলেও তাঁরা যে লেখাপড়া শিখেননি, তার মূল কারণ চেতনাহীনতা ও ভোগ-বিলাসিতা। তবু নতুন যুগের নতুন ডাকে তাঁরা কেউ কেউ সাড়া দিয়েছেন ; সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, আবদুল মজিদ চৌধুরীর মত জমিদার কোন কোন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তবে একথা সত্য, জমিদাররা নব্যচিন্তার জন্মদাতা নন, তাঁরা শিক্ষিতদের চিন্তাধারার সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করেছেন মাত্র। বস্তুত গ্রামের বিত্তবান জমিদার শ্রেণীর সাহায্যে শহরের মধ্যবিত্ত কর্মচারী-বুদ্ধিজীবীরা মিলে নবজাগরণের বীজ বপন করেছিলেন। তাঁদের পারিবারিক পটভূমি, ব্যক্তিজীবন ও কর্মজীবনের পরিচয় থেকে জানা যায়, তাঁদের শক্তির সীমাবদ্ধতা ছিল, কোথাও পশ্চাৎমুখিতা, কোথাও মতবিরোধ, কোথাও বা শ্রেণীচরিত্র হিসাবে ঝুঁকি না নেওয়ার প্রবণতা। এজন্য সমাজের অগ্রগতি ছিল মন্থর। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিপ্লব অবশ্যই আসেনি, এ ছিল কেবল সমাজগতভাবে স্বীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতনতা ও স্বাধিকার চিন্তার নবোন্মেষ। সে-সূত্রেই সমাজ, শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তনের সূচনা হয়। হুমায়ুন কবীর বাংলার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলিম মানসকে 'নেতিমর্ধী' বলেছেন।[৫] নেতিধর্মী মানসিকতা কিছু গড়তে পারে না। কিন্তু এ যুগের ঐ শ্রেণীর মানসচিন্তায় গড়ার আবেগ, আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা নিহিত আছে। স্বসমাজের সমস্যা তাঁরা বড় করে দেখেছেন। সেটা যে ক্রমশ ধর্ম-সংস্কৃতির বাতাবরণে একটি স্বতন্ত্র বর্ণ লাভ কবে তা সত্য। তবে এর গঠনমুখী প্রবণতাকে অস্বীকার করা যায় না। সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থকে বড় করে দেখেছেন বলে উনিশ শতকের হিন্দু রিভাইভ্যালিজমের মত একে 'মুসলিম রিভাইভ্যালিজম' নামে আখ্যাত করা যায়। এখানে কতিপয় জমিদার ও নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যাঁরা সমাজের নবজাগরণের ও পুনর্গঠনের কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

জমিদার

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)

সেকালের বাংলার জমিদারগণের মধ্যে সবচেয়ে খ্যাতিমান ছিলেন নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী। ময়মনসিংহের ধনবাড়ী ছিল তাঁর আবাসভূমি। দেশের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সাথে তাঁর অধিক সম্পর্কে ছিল। কলিকাতা থেকে প্রকাশিত 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৫) ও 'প্রচারক' (১৮৯৯) পত্রিকাদ্বয় তাঁর অর্থানুকূল্য ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ

৪. কুমিল্লার আবদুর রসুল, মেদিনীপুরের আবদুর রহিম, ফরিদপুবের আলিমুজ্জামান চৌধুবী, দেলদুয়াবের আবদুল করিম ও অগুদচল হালিম গজনভী ভ্রাতৃদ্বয়, ঢাকার আলাউদ্দীন আহমদ, বীরভূমেব মোহাম্মদ সামসুজ্জোহা, জহিরুদ্দীন আহমদ,বর্ধমানের আবুল কাসেম, ত্রিপুরার মকবুল আলী প্রমুখ জমিদারপুত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রী পেয়েছিলেন।

৫ *বিনয় সরকারের বৈঠকে*, ১ ভাগ. চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৪৪ (২সং), ৬৩৬

করে। 'মিহির ও সুধাকর' মুদ্রণের জন্য স্ত্রী আলতাফুন্নেসার নামে তিনি কলিকাতায় 'আলতাফী প্রেস' স্থাপন করেন।[৬] পত্রিকাটি তাঁকে 'বিদ্যোৎসাহী জমিদার' বলে উল্লেখ করেছে।[৭] 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকা 'স্বধর্মপরায়ণ ও সাহিত্যানুরাগী জমিদার' বলে তাঁর প্রশংসা করেছে।[৮] মুসলমান লেখকের লেখা বিদ্যালয়ের পাঠ্যোপযোগী পুস্তকের অভাব ছিল। তিনি ঐরূপ পুস্তক রচনায় লেখকদের উৎসাহিত করেন এবং মুদ্রণে আর্থিক সাহায্য দেন। শুধু তাই নয়, তিনি এবং কাজী ইমদাদুল হক শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষের উপর প্রভাব খাটিয়ে সেগুলিকে পাঠ্য-তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেন। ইসলামী সংস্কৃতি ও ভাবধারা নিয়ে রচিত পুস্তক স্কুল-পাঠশালায় পড়ান হয় না, এরূপ একটি অভিযোগ মুসলমান সম্প্রদায়ের ছিল। পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদীর 'সুরিয়া বিজয়' (১৩০২) গ্রন্থখানি 'অশেষ গুণালঙ্কৃত ধর্মপরায়ণ, সমাজহিতৈষী, উদার হৃদয়, দানশীল মুসলমান জমিদার কুলরত্ন জনাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'র নামে উৎসর্গ করা হয়।[৯] নদীয়ার কবি দাদ আলী তাঁর 'সমাজ শিক্ষা' (১৯১০) পুস্তকখানি নওয়াব আলী চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গ লিপিটি ছিল এরূপ :

সৈয়দ নবাব আলী খান বাহাদুর
পতিত সমাজে রক্ষাকারী, তুমি শূর।
দীন দাদ আলী, তব সুশিব ভিখারী।
তোমার অশিব নাশ করিবেন বারি।[১০]

নদীয়ার আর এক কবি মোজাম্মেল হক তাঁর 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৯১২) গ্রন্থখানি 'অনারেবল নবাব সৈয়দ নওয়াব আলি চৌধুরী'কে উৎসর্গ করেন। কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) কাব্যের প্রথম খণ্ড 'ধনবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'কে উৎসর্গ করেন।[১১]

কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলের সভা-সমিতির সঙ্গে তাঁর যোগ ছিল। তিনি 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র (১৯০৫) একজন সম্পাদক ছিলেন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' (১৯০০) নামে অপর একটি প্রতিষ্ঠানের তিনি সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে'র সভায় বাংলাদেশে মাতৃভাষা শিক্ষা বিষয়ক একটি লিখিত ভাষণ পাঠ করেন।[১২] ১৯১২ সালে যে 'আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা কমিটি' গঠিত হয়, তার একজন সদস্য ছিলেন। তিনি

৬. *লেখক সংঘ পত্রিকা*, জৈষ্ঠ ১৩৬৮
৭. *মিহির ও সুধাকার*, ২৭ পৌষ ১৩০৭
৮. *ইসলাম-প্রচারক*, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬
৯. গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।
১০. গোলাম সাকলায়েন—'কবি দাদ আলী,' *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
১১. কায়কোবাদ রচিত মহাশ্মশান কাব্যের 'উৎসর্গপত্র' দ্রষ্টব্য।
১২ *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা* , পৃ. ৩৮২-৩৮৩

রাজনীতির সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। তিনি ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিচ্ছেদের জোর সমর্থক ছিলেন। ১৯০৬ সালের 'সিমলা ডেপুটেশনে'র একজন সদস্য ছিলেন এবং ঐ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত 'মুসলিম লীগে'র প্রধান ছিলেন। ১৯০৬ থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্য ছিলেন। ১৯১৬ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। ১৯২১ সালে প্রদেশিক সরকারের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি 'খিলাফত আন্দোলনে' (১৯২১) সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ১৯০৬ সালে 'খান বাহাদুর', ১৯১৭ সালে 'নবাব' এবং ১৯২৪ সালে 'সি. আই. ই.' উপাধি লাভ করেন। তিনি 'ঈদুল আজহা' (১৯০০) ও 'মৌলুদ শরিফ' (১৯০৩) নামে দুখানি বাংলা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর 'ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) এবং 'প্রাইমারী এডুকেশন ইন রুরাল এরিয়াজ' (১৯০৬) নামে দুখানি শিক্ষা সংক্রান্ত ইংরাজি পুস্তিকাও আছে।

আলী নওয়াব চৌধুরী

ত্রিপুরার (বর্তমান কুমিল্লার) পশ্চিমগাঁও–এর আলী নওয়াব চৌধুরী বনেদী জমিদার ছিলেন।[১৩] তাঁর পূর্ব পুরুষ আমীর মির্জা হুমায়ুন খান হোমনাবাদ জমিদারীর প্রতিষ্ঠা করেন। হুমায়ুন খানের পিতা প্রিন্স মির্জা জাহানদার ত্রিপুরা জয় করেন। বিরাট জমিদারী উত্তরাধিকারীদের মধ্যে ভাগ–বাটোয়ারা হয়ে যায়। পশ্চিমগাঁও–এর জমিদারীব মালিক হন আলী নওয়াব চৌধুরী। তিনি 'শাহাজাদা মির্জা আওরঙ্গজেব' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁর প্রাসাদের নাম ছিল 'খুরশিদ মঞ্জিল'। তিনি কুমিল্লায় দরিদ্র বালকদের জন্য ইংরেজি–বাংলা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। একটি সাধারণ পাঠাগারও স্থাপন করেন। এছাড়া, তাঁর স্থানীয় বহু দানকর্মও আছে। এরূপ জনহিতকর কাজের জন্য সরকারের নিকট থেকে তিনি ১৮৯৭ সালে 'খান বাহাদুর' উপাধি পান।[১৪] 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতি'র একজন উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ঐ সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন (১৯০৪) তাঁরই গৃহে অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি হিসেবে অধিবেশনের গুরু দায়িত্ব তাঁকেই পালন করতে হয়।[১৫]

আবদুল মজিদ চৌধুরী (জন্ম ১৮৫৭)

তিনি রংপুর জেলার মহীপুরের জমিদার ছিলেন। এটি অত্যন্ত বনেদী পরিবার ছিল। এগার শতকে জমিদারীর পত্তন হয়। আবদুল মজিদের পিতার নাম ছিন শেখ জিয়াউল্লাহ

১৩. ময়মনসিংহের ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর সাথে ত্রিপুরার পশ্চিমগাঁও –এর জমিদার আলী নওয়াব চৌধুরীকে অনেকে এক করে ফেলেন, যেমন ডক্টর সুফিয়া আহমেদ এরূপটি করেছেন (মুসলিম কমিউনিটি ইন বেঙ্গল, পৃষ্ঠা ৮৯)। কিন্তু তাঁরা আলাদা ব্যক্তি ; দুজনেই সমসাময়িক ছিলেন ; সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রতিপত্তি অধিক ছিল। তিনি 'খান বাহাদুর' ও 'নবাব' উপাধি পান। আলী নওয়াব চৌধুরী কেবল 'খান বাহাদুর' উপাধি পান।

১৪. Who"s Who in India, Vol. V,1911, P.29

১৫. কোহিনুর, বৈশাখ ১৩১২

চৌধুরী। তিনি সংস্কৃতিবান ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। আবদুল মজিদ রংপুর কলেজিয়েট স্কুলে পড়াশুনা করেন। তিনি রংপুর জেলার এবং বাইরের অনেক সভা-সমিতির সাথে জড়িত ছিলেন। 'রংপুর মহামেডান এসোসিয়েশন' ও 'রংপুর ইসলাম মিশনে'র প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসাবে তিনি ঐগুলি পরিচালনার দায়িত্বভার দীর্ঘদিন বহন করেছিলেন। সমিতির মাধ্যমেই তিনি রংপুর মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করেন[১৬] মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দিন আহমদ সম্পাদিত 'সোলতান' (১৩০৯) পত্রিকাখানি আবদুল মজিদ চৌধুরী ও মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত হয়। 'দামেস্ক হেজাজ রেলওয়ে'র জন্য তিনি অর্থদান করেন। সমাজে শিক্ষা বিস্তারেও তিনি উদ্যোগী ছিলেন। এ ব্যাপারে অর্থ সাহায্য প্রার্থনা কবে সরকারের সাথে তাঁব পত্র বিনিময় হয়। তিনি নিচের দিকে শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য মক্তব-মাদ্রাসা পদ্ধতিব সমর্থক ছিলেন, তবে সেগুলিব শিক্ষা প্রণালীব সংস্কার কামনা করেছিলেন। ফারসি-উর্দুর সাথে বাংলাভাষা শিক্ষার কথাও বলেছেন।[১৭] তিনি একটি স্কুল, একটি মাদ্রাসা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করে সেগুলির ব্যয়ভার বহন করতেন। 'প্রচাবক' পত্রিকার সম্পাদক ভ্রমণ বৃত্তান্তে লিখেছেন, "অদ্য আমরা খান বাহাদুর সাহেবেব (আবদুল মজিদ চৌধুবীব) দাতব্য ডাক্তাবখানা, মাদরাসা এবং স্কুল (মধ্য বাঙ্গালা) দর্শন করিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম। স্কুলে প্রায় ৫০/৫৫ জন ছাত্র উপস্থিত দেখিলাম। এই সকল ছাত্রের সকলি প্রায় মোসলমান। যে সকল মুসলমান কপ্নি পরিয়া বেড়ায, খান বাহাদুর সাহেব তাহাদেব সন্তানদিগকে শিক্ষিত করিবার জন্য অশেষ প্রকারে চেষ্টা করিয়াছেন।[১৮]" তিনি রংপুরের অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন।

হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী

টাঙ্গাইলের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে করটীয়াস্থ পন্নী পরিবারের বিশেষ অবদান আছে। সাদত আলী খান পন্নী, তৎপুত্র হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী এবং তৎপুত্র ওয়াজেদ আলী খান পন্নী স্কুল-কলেজ, মাদ্রাসা, পত্রিকা, প্রেস, সমিতি প্রভৃতি স্থাপন ও পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো না কোনো প্রকারের ভূমিকা নিয়েছিলেন। করটীয়ার 'মাহমুদীয়া প্রেস' হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর অর্থানুকূল্যে প্রতিষ্ঠিত হয়। জমিদারী: কাগজপত্র, দলিল, রেকর্ড মুদ্রিত করার উদ্দেশ্যে এটি স্থাপিত হলেও এখান থেকেই মোহাম্মদ নইমুদ্দীন 'আখবারে এসলামীয়া' (১২৯১) পত্রিকাখানি প্রকাশ করেন। এতে মাহমুদ আলীর আর্থিক সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা পুরামাত্রায় ছিল। এছাড়া, মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের অনূদিত কয়েকখানি গ্রন্থ মাহমুদীয়া প্রেস থেকে মাহমুদ আলী খান পন্নীর 'অনুমত্যানুসারে' ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। 'করটিয়া মাহমুদীয়া হাই স্কুল', 'করটিয়া

১৬. মোতাহাব হোসেন সুফী– *তসলিমুদ্দীন আহমদ*, পৃ. ৫৬
১৭. *প্রচারক*, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৮
১৮. ঐ।

সাদত কলেজ' এই পন্নী পরিবারেরই দান। দেলদুয়ারের গজনভী পরিবারের সহিত তুলনায় রক্ষণশীল হয়েও পন্নী পরিবার বাংলা ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে অগ্রণী ছিলেন। মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহিম প্রণীত 'ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার' (১৮৯০) গ্রন্থখানি 'হাফেজ মাহমুদ খান চৌধুরী'র নামে উৎসর্গীকৃত হয়।

মীর মোহাম্মদ আলী

মীর মোহাম্মদ আলী ফরিদপুরেব পদমদীর জমিদার ছিলেন। সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন তাঁর জ্ঞাতি-ভ্রাতা ছিলেন। তিনি 'জমিদার দর্পণ' (১৮৭১) নাটকখানি মীর মোহাম্মদ আলীর নামে উৎসর্গ করেন। শেষ বয়সে মীর মশাররফ হোসেন তাঁর এস্টেটের ম্যানেজার হন। তিনি মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত 'সুধাকর' (১৮৯০) পত্রিকার একজন পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র ১৮৮৯ সালেব 'কার্যনির্বাহক কমিটি'র সহ-সভাপতি ছিলেন। তিনি 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'ব (১৮৭৬) প্রথম থেকেই সদস্য ছিলেন। ভার্নাকুলাব প্রেস এ্যাক্ট (১৮৭৮) এবং সিভিল সার্ভিস রেগুলেশন এ্যাকটেব (১৮৭৭) প্রতিবাদে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদক আনন্দমোহন বসু এক সভার (২৪ ফেব্রুয়ারী ১৮৭৯) আয়োজন করেন। নবাব মীব মোহাম্মদ আলী ঐ সভার সভাপতি হন।[১৯] সরকারি মহলেও তাঁর প্রতিপত্তি ছিল। ১৮৭৬ সালে বাংলার 'ব্যবস্থাপক সভা'র সভ্য মনোনীত হন। সমাজ সেবার জন্য ইংরাজ সরকারের কাছ থেকে 'নবাব' উপাধি পান। তিনি মৃত্যুকালে জমিদারীর একটি মোটা অংশ সৎকার্যে দান করে যান। ইংরাজি ও বাংলা বিদ্যালয়, আরবি-ফারসি মাদ্রাসা, দাতব্য ঔষধালয় এবং অতিথিশালা নির্মাণ ও পরিচালনার ব্যয়ের জন্য এই দানের ব্যবস্থা করেন।[২০]

সৈয়দ এরফান আলী

বীরভূমের জমিদার সৈয়দ এরফান আলী সমাজে প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার করেছিলেন। তিনি 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র হুগলী শাখা ও বীরভূমের 'আঞ্জুমানে ইসলামিয়া'ব সাথে জড়িত ছিলেন। ১৮৯৮ সালে লাহোরে যে 'মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স' হয় তাতে সৈয়দ এরফান আলী বাংলার একমাত্র প্রতিনিধি ছিলেন।[২১] কলিকাতা মাদ্রাসায় একশত টাকার 'উডবার্ন পদক'টি তিনি দান করেন। যে ছাত্র আরবিতে সর্বোচ্চ নম্বর পাবে, তাকে এ পুরস্কার দেওয়া হবে। তাছাড়া, মাদ্রাসার হোস্টেল

১৯. Nirmal Sinha--*Freedom Movement in Bengal (1818-1905)*, P 353 ; *Muslim Community in Bengal (1884-1912)*. p. 164.
২০. *The Moslem Chronicle*, 5 December, 1896.
২১. **ঐ, ১৮ ডিসেম্বর ১৮৯৮**

নির্মাণেও মোটা টাকার চাঁদা দেন।[২২] তিনি 'পবিত্র কাব্য' নামে হজরত মোহাম্মদের নীতিশিক্ষা বিষয়ক একখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন।[২৩]

আবদুস সোবহান চৌধুরী

বগুড়ার নবাব সৈয়দ আলতাফ আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র নবাব আবদুস সোবাহান চৌধুরী খুব প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। সভা-সমিতি ও পত্রপত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে তিনি সমাজের সাথে সম্পর্ক রেখেছিলেন। নবাব-জমিদারগণ আভিজাত্যের গৌরবে সেযুগে সচরাচর এরূপটি করতেন না। আবদুস সোবহান চৌধুরী 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র বগুড়া শাখার সভাপতি ছিলেন। বগুড়ার মাদ্রাসাটি তিনিই স্থাপন করেন।[২৪] বগুড়া শহরে উকিল-ঘর নির্মাণের জন্য ৫০০ টাকা অর্থ সাহায্য দান করেন।[২৫] 'বগুড়া তাহিরন্নেসা মহিলা হাসপাতালে'র খরচ চালাবার জন্য তিনি বাৎসরিক ৩০০ টাকা আয়ের নিষ্কর ভূমিদান করেন। তাছাড়া, ছোটলাট উডবার্নের (১৮৯৮-১৯০২) বগুড়া পরিদর্শনের স্মৃতিরক্ষার্থে বগুড়া শহরে 'উডবার্ণ আলতাফন্নেসা পার্ক' নামে একটি উদ্যান নির্মাণে ৫০০০ টাকা দান করেন।[২৬] ব্যক্তিগত গুণাবলী ও জনহিতকর কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি সরকারের নিকট থেকে 'নবাব' উপাধি পান (১৮৯৩)।[২৭]

করিমুন্নেসা খানম (১৮৫৫-১৯২২)

টাঙ্গাইলের দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী করিমুন্নেসা খানম ছিলেন শিক্ষানুরাগিনী ও সাহিত্যিকমনা। বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তাঁরই সহোদরা বোন ছিলেন। বেগম রোকেয়া তাঁর 'মতিচূর' (২য় খণ্ড, ১৯২১) গ্রন্থখানি করিমুন্নেসার নামেই উৎসর্গ করেন।[২৮] রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের তাঁদের পিতা ছিলেন। আবদুল করিম গজনভী (১৮৭২-১৯৩৯) ও আবদুল হালিম গজনভী (১৮৭৪-১৯৫৮) করিমুন্নেসার দুই কৃতী সন্তান ছিলেন। মাতার ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় তাঁরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী সম্পাদিত 'আহমদী' (১২৯৩) পত্রিকা খানি সম্পূর্ণ তাঁরই অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় প্রকাশিত হয়। বেগম রোকেয়া 'লুকানো রত্ন' প্রবন্ধে বলেছেন যে, করিমুন্নেসা খানম কবিতা লিখতেন। তাঁর রচিত কয়েকটি কবিতা 'সাবের বংশের জনৈক কন্যা' এরূপ নামে 'কলিকাতার কোনো হিন্দু পরিচালিত পত্রিকা'য় ছাপা হয়েছিল।[২৯] সম্পূর্ণ উর্দু পরিবারে লালিত হয়ে তিনি নিজ

২২. ঐ, ৮ মে ১৮৯৭
২৩. ঐ , ২ জানুয়ারি ১৮৯৬
২৪. ঐ, ৯ জানুয়ারি ১৮৯৭
২৫. আখবারে এসলামীয়া, শ্রাবণ ১৩০২
২৬. *The Moslem Chronicle*, 29 September.
২৭. *Who"s Who in India*, Part V. P. 27
২৮. আবদুল কাদির সম্পাদিত— *রোকেয়া রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা , ১৯৭৩, পৃ. ৭
২৯. ঐ, পৃ. ২৮৭

চেষ্টায় বাংলা ও ইংরাজি শিক্ষা করেছিলেন। তিনি 'দুঃখ তরঙ্গিনী' ও 'মানস বিকাশ' নামে দুখানি গ্রন্থ (অপ্রকাশিত) রচনা করেন।

মীর মশাররফ হোসেন তাঁরই এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন (১৮৮৪-১৮৯২)। তিনি 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫) গ্রন্থখানির প্রথম সংস্করণ 'করিমুন্নেসা খাতুনে'র নামে উৎসর্গ করেন।[৩০]

ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী (১৮৩৪-১৯০৪)

ত্রিপুরার হোমনাবাদের জমিদার ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী বিদ্যানুরাগিনী ও সাহিত্যানুরাগিনী ছিলেন। 'ঢাকা প্রকাশে' তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে মন্তব্য করে লেখা হয় : "অদ্য আমরা আমাদিগের পূর্ব বাঙ্গালার একটি মুসলমান মহিলারত্নের পরিচয় দান না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। ... ইনি যেমন বিদ্যানুরাগিনী ও বিষয়কার্য্য পারদর্শিনী সেই রূপ সৎকার্য্যেও সমুৎসাহিনী। বাহিরে ইঁহার আত্মপর মাত্র নাই .. শুনিলাম ইঁহার আবাস স্থানে সচরাচর যেরূপ করিয়া থাকেন, এখানেও (ঢাকা) সেইরূপ বিনাড়ম্বরে নিরুপায় দরিদ্রদিগকে দান করিয়াছেন।"[৩১] তিনি 'ঢাকা প্রকাশ'কে নগদ অর্থ সাহায্য দান করেন। কলিকাতার 'সুধাকর' (১২৯৬) ও 'ইসলাম প্রচারক' (১২৯৮) পত্রিকা দুটিকেও আর্থিক সাহায্য দান করেন। ১৮৭৩ সালে তিনি কুমিল্লায় একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় ও একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন। কুমিল্লা সদর হাসপাতালের 'মহিলা ওয়ার্ড' তাঁর আর্থিক সাহায্যে নির্মিত হয়। (১৮৯৩)।[৩২] লেখিকা হিসাবেও তাঁর পরিচয় আছে। তাঁর 'রূপজালাল' (১৮৭৬) একটি রূপক জাতীয় রচনা এবং 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' (১৮৮৭) ধর্ম ও রাজনীতি বিষয়ক কাব্য গ্রন্থ।[৩৩] তাঁর 'সঙ্গীসার ও 'সঙ্গীত লহরী' নামে আরও দুখানি গ্রন্থ আছে। গ্রন্থ দুটি এখন দুষ্প্রাপ্য। এগুলি সঙ্গীতপ্রীতির স্বাক্ষর বহন করে। ঐ সময় মুসলিম গৃহে সঙ্গীত চর্চা একটা অভাবনীয় বিষয় ছিল। বিদ্যালয় স্থাপন, পথঘাট নির্মাণ, মসজিদ ও মুসাফিরখানা প্রতিষ্ঠার জন্য এবং সমাজোন্নয়নমূলক কাজে সরকারকে সহায়তা দানের জন্য তিনি 'নবাব' (১৮৮৯) উপাধি পান। তিনি চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। সপত্নী কোন্দলের কারণে তাঁর দাম্পত্য জীবন সুখের হয়নি।

তিনি কলিকাতার 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন'র একজন সদস্যা ছিলেন।

আবদুল রহিম বক্স পেস্কার

আবদুল রহিম বক্স পেস্কার জলপাইগুড়ির জমিদার ছিলেন। তিনি জলপাইগুড়ি শহরের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র (১৮৯২) সভাপতি ছিলেন। তিনি নইমুদ্দীনকৃত কোরানের

৩০. 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।
৩১. *ঢাকাপ্রকাশ*, ৫ মাস ১২৮১
৩২. মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস—'জেলার কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি', *নকীব*, কুমিল্লা, ১৯৭৫
৩৩. ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী—*তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত*, বাঙ্গালা প্রেস, ঢাকা ১৮৮৭

বঙ্গানুবাদ মুদ্রণে ১৫০ টাকা দান করেন।[৩৪] শিক্ষা ও সমাজের কাজের জন্য তিনি ব্রিটিশ সবকারের নিকট থেকে 'খান বাহাদুর' (১৮৯৯) উপাধি পান।

তিনি 'ওয়াকফনামা' (১৯০৪) নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। তিনি ধর্মীয় কার্যে প্রায় আঠার হাজার টাকার সম্পত্তি 'ওয়াকফ' করেন। সেই দানস্বত্ব ও ওয়াকফ সম্পত্তি পরিচালনার নিয়মকানুন এই পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ হয়েছে। তিনি একস্থানে লিখেছেন, "... আমি নিজ জীবদ্দশায় স্বীয় চেষ্টাতে ও পরিশ্রমে নিজে অনেক উপার্জন করিয়াছি ; ... আমি সরলভাবে স্বেচ্ছাপূর্বক সুস্থ শরীরে স্থির জ্ঞানে ধার্মিকগণের পরামর্শানুযায়ি শরা-শরীফের মতে আমার স্বোপার্জিত নিজ স্বত্ব দখলি নিম্ন তফসিলের লিখিত সম্পত্তিসমূহ রাহে লিল্লা ওয়াকফ করিলাম। ইহাব আনুমানিক মূল্য ১৮০০০ মবলগে আঠাব হাজাব টাকা। উক্ত সম্পত্তিতে আমার মালিক স্বরূপ যে স্বত্ব স্বামিত্ব দখল অধিকাব ছিল তাহা অদ্য হইতে স্থগিত হইয়া তৌলিয়ত (ওয়াকফ) অর্পিল।"[৩৫] ১৬ ফাল্গুন ১৩১০ সনে উক্ত 'ওয়াকফনামা' তৈরি হয়। এই ওয়াকফনামা থেকেই জানা যায় যে বহিম বক্সের পূর্ব পূরুষ নোযাখালীব ছাগলনাইয়ার অন্তর্গত বল্লভপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতা মুনশী খান মোহাম্মদের পেশা ছিল 'টি-প্লানটারি ও লাখেবাজদারি'।[৩৬]

মোহাম্মদ বখত মজুমদার (১৮৬৭-১৯৩৬)

তিনি শ্রীহট্টের প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। তিনি লোকাল বোর্ডের সদস্য, অনাবেরী ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা-পবিদর্শক ছিলেন। তাঁব পিতা সৈয়দ বখত মজুমদার সিপাহী বিদ্রোহেব সময় ইংরাজদেব সহায়তা করে সবকারের সুদৃষ্টিতে পড়েন। সৈয়দ বখত মজুমদাব ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি মক্কা নগরীতে সেরিফ কাউন্সিলর ছিলেন, তিনি তুবস্কের সুলতানের কাছ থেকে সম্মানিত উপাধি পেয়েছিলেন (১৮৭৯)।[৩৭] বিপিনচন্দ্র পাল আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে, লর্ড নর্থব্রুক (১৯৭২-৭৬) শ্রীহট্ট পরিদর্শনে এসে সৈযদ বখত মজুমদাবেব আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন।[৩৮] মোহাম্মদ মজুমদার শ্রীহট্টের জনহিতকব কাজে উৎসাহ প্রদান করতেন। মুরারি কলেজের উন্নতিকল্পে তিনি অর্থদান কবেন। 'মন্টেগু চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার' প্রবর্তিত হলে তিনি আসাম ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হন এবং বাঙালিদের মধ্যে সর্বপ্রথম ডেপুটি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি

৩৪ আবদুল কাদিব —'মোহাম্মদ নইমুদ্দীন', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬
৩৫ আবদুল বহিম বক্স পেসকাব— *ওয়াকফনামা,* বেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃ. ১-২
৩৬ ঐ, পৃ ১
৩৭. নবেন্দ্রকুমার গুপ্ত চৌধুবী— *শ্রীহট্ট-প্রতিভা,* পৃ. ২৫
৩৮. বিপিনচন্দ্র পাল —*সত্তর বছব।*

কাউন্সিলে শ্রীহট্ট জেলার বঙ্গভুক্তির বিরোধিতা করেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন দিতেন, যার পুরস্কার স্বরূপ তিনি 'খান বাহাদুর' (১৯০৯) উপাধি পান।[৩৯]

আলিমুজ্জামান চৌধুরী (মৃত ১৯৩৬)

তিনি ফরিদপুর জেলার বেলগাছির জমিদার ছিলেন। তিনি ১৮৮৭ সালে হুগলী কলেজ থেকে বি-এ পাশ করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি প্রধানত রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন ; লোকাল বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। ১৮৯৯ সালের লক্ষ্ণৌ এবং ১৯০০ সালের লাহোরের বার্ষিক অধিবেশনে বাংলাদেশ থেকে তিনিই একমাত্র মুসলমান প্রতিনিধি ছিলেন। কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ১৯০১ সালের অধিবেশনেও তিনি প্রতিনিধি ছিলেন।[৪০]তিনি 'বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে' কংগ্রেসকে সমর্থন দেন। তিনি পরবর্তীকালে 'ভারত ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য হন। তিনি ভারত সরকার কর্তৃক প্রথমে 'খান বাহাদুর' ও পরে 'সি. আই. ই'. উপাধি পান।[৪১]

এছাড়া শিক্ষামূলক ও অন্যান্য জনহিতকর কাজে অল্পবিস্তার দান অনেক জমিদারই করেছেন। ত্রিপুরার জমিদার রয়েজুদ্দীন মোহাম্মদ, আলী হয়দার নামে একটি যুবকের বিলেতে পড়ার জন্য এককালীন ৭০০ টাকা দান করেন।[৪২] মুর্শিদাবাদেব পাটকা বাড়ির জমিদার কাজী মোহাম্মদ হোসেন রেজা 'মোহাম্মদপুর মাদ্রাসা' নিজ ব্যয়ে পরিচালনা করেন। তিনি ঐ মাদ্রাসার সেক্রেটারী ছিলেন।[৪৩] চট্টগ্রামের পরাগলপুরের জমিদার রহমতুল্লাহ চৌধুরী সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে 'পরাগলপুর মধ্য ইংরেজি বিদ্যালয়' স্থাপন করেন। তিনি মাদ্রাসার অনেক ছাত্রের ব্যয়ভারও গ্রহণ করেন।[৪৪] চট্টগ্রামের অপর জমিদার চৌধুরী সোলতান আহমদ খান একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য ২০০০ টাকা মূল্যের জমি দান করেন।[৪৫] জলপাইগুড়ির বাকালির জমিদার জিয়ান মোহাম্মদ নিজ ব্যয়ে 'বাকালি ইসলামিয়া মাদ্রাসা'র প্রতিষ্ঠা করেন।[৪৬] ফরিদপুরের হাতুড়িয়ার জমিদার চৌধুরী গোলাম আলী স্কুল গৃহ, দাতব্য চিকিৎসালয় ও পাকা রাস্তাঘাট নির্মাণ করেন। বরিশালের সরকারি এন্ট্রান্স স্কুলের পাকা দালান তাঁরই অর্থ ব্যয়ে নির্মিত হয়।[৪৭] বাঁকুড়া জেলার

৩৯ *শ্রীহট্ট-প্রতিভা*, পৃ. ২৫
৪০. Muslim Community in Bengal, PP. 388, 391
৪১ *মোয়াজ্জিন*, বৈশাখ ১৩৪৩
৪২ *মিহির ও সুধাকর*, ৯ ফাল্গুন, ১৩০৮
৪৩ *The Moslem Chronicle*, 12 Sepember 1896
৪৪ ঐ, নভেম্বর ১৮৯৬
৪৫ *ইসলাম-প্রচারক*, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১০
৪৬. ঐ, বৈশাখ, ১২৯৯
৪৭ Loknath Bose-*The Thiefs, Nobles and Zemindars, P. 298.*

রোলের 'বিদ্যোৎসাহী' জমিদার মোহাম্মদ তৈয়ৰ (মৃত ১৯০১) রোলে একটি এন্ট্রান্স স্কুল স্থাপন করেন।[৪৮] জলপাইগুড়ির জমিদার রহিমুন্নেসা ও বর্ধমানের কুসুমপুরের জমিদার মোহাম্মদ ইব্রাহিম 'মিহির ও সুধাকর' প্রকাশে অর্থ সাহায্য দেন।[৪৯] ফরিদপুর জেলার গোপালপুরের জমিদার সৈয়দ আবদুর রউফ চৌধুরী স্বধর্মপরায়ণ ও স্বজাতিবৎসল ছিলেন। তিনি নিজ বাটিতে একটি এন্ট্রান্স স্কুল, একটি মাদ্রাসা ও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন করেন।[৫০] মুর্শিদাবাদের ভাবতার জমিদার মোহাম্মদ আবদুল আজিজ শেখ জমিরুদ্দীনকে পুস্তক প্রকাশে অর্থ সাহায্য দেন ; তিনি নিজে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। খুলনার ধামানিয়ার জমিদার আবদুর আহাদ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন ; শেখ জমিরুদ্দীন আহমদ তাঁর 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' (১৯০০) পুস্তক খানি আবদুল আহাদের নামে উৎসর্গ করেন।[৫১] হুগলীর জাহানাবাদের ভূম্যধিকারিণী কমরন্নেসা বিবি 'মুসলমান ছাত্রদিগের বিদ্যাশিক্ষা এবং বাৎসরিক ফতেহা ইত্যাদির জন্য বার্ষিক ৫০০ টাকা আয়ের ভূসম্পত্তি ওয়াকফে সমর্পণ' করেন।[৫২] শায়েস্তাবাদেব জমিদাব সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন বরিশাল সরকারি স্কুলের ছাত্রাবাস (বেল ইসলামিয়া বোর্ডিং) নির্মাণে অর্থ সাহায্য দান করেন।[৫৩]

নব্য শিক্ষিত ব্যক্তি

আবদুল লতিফ (১৮২৮–১৮৯৩)

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই বাংলার মুমূর্ষু নিমজ্জমান একটি সম্প্রদায়কে হতাশা, বঞ্চনা এবং ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করে নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ ও নবমন্ত্রে দীক্ষিত করে আত্মসম্বিৎ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন যে দু'জন সমাজকর্মী মনীষী তাঁরা হলেন আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী। ঠিক ঐ সময় উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদের (১৮১৭–৯৮) আবির্ভাব। তাঁদের চিন্তার ব্যাপ্তি ও কর্মের বিস্তৃতির তারতম্য আছে, তবে তাঁরাই প্রথম ভারতীয় মুসলমান সমাজকে মধ্যযুগীর অবক্ষয়, পশ্চাদপদতা ও অসাড়তার পঙ্ক থেকে উদ্ধার করে জাতির কাছে আধুনিক জীবনের স্বাদ ও মূল্য পৌঁছে দিয়েছিলেন।

ফরিদপুর জেলার রাজাপুর গ্রাম ছিল আবদুল লতিফের পৈতৃক আবাস ভূমি। পিতা কাজী ফকির মোহাম্মদ (মৃত ১৮৪৪) কলিকাতার সদব দেওয়ানী আদালতের উকিল ছিলেন। ফারসি ভাষায় তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল— তিনি 'জমিউল তাওয়ারিখ' (১৮৩৬)

৪৮. *মিহির ও সুধাকর*, ২৭ পৌষ ১৩০৭
৪৯. *মুসলিম মানস ও বাঙলা সাহিত্য*, পৃ. ৩১১
৫০ *প্রচারক*, কার্তিক–অগ্রহায়ণ ১৩০৮
৫১. *ঐ*, বৈশাখ–জ্যৈষ্ঠ ১৩০৮
৫২ *সুধাকর*, ৬ পৌষ ১২৯৬
৫৩. *The Moslem Chronicle*, 28 February 1895.

নামে একখানি ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। সেকালের আর পাঁচটি ভদ্র পরিবারের সন্তানদের মত আবদুল লতিফ কলিকাতা মাদ্রাসায় বিদ্যাশিক্ষা আরম্ভ করেন এবং জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষা পাশ করেন। এখানে প্রাচ্য ভাষার সাথে নিম্নবৃত্তিমানের ইংরাজি শিক্ষারও সুযোগ হয়েছিল তাঁর। মাদ্রাসা শিক্ষা শেষ করে ১৮৪৬ সালে মাদ্রাসার শিক্ষক হিসাবে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। তিনি ১৮৪৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন। ১৮৫৯ সালে আলিপুরের প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে উন্নীত হয়ে ১৮৮৪ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৮৬২ সালে নব গঠিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৭০ ও ১৮৭৩ সালেও ঐ সভার সদস্য হন। তিনি ১৮৬৩ সালে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করেন। ১৮৬৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো নির্বাচিত হন। ১৮৬৩–৯৩ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য ছিলেন। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় পরীক্ষক বোর্ডেরও সদস্য ছিলেন। এছাড়া, ১৮৬১–৬৫ সালে কলিকাতার আয়কর কমিশনের ও বাংলা–বিহার–উড়িষ্যার শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৮৬০ সালে 'এশিয়াটিক সোসাইটি' এবং ১৮৭০ সালে 'বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনে'র সদস্যভুক্ত হন।

সিপাহী বিদ্রোহের সময় ইংরাজ সরকারকে সহযোগিতা করা, সরকারি চাকুরিতে নিষ্ঠা ও দক্ষতা প্রদর্শন করা, সমাজ ও সংস্কৃতি ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করা এবং শাসক শ্রেণীর প্রতি পুরোমাত্রায় আনুগত্য স্বীকার করার জন্য আবদুল লতিফ ১৮৭৭ সালে 'খান বাহাদুর', ১৮৮০ সালে 'নবাব', ১৮৮৩ সালে 'সি.আই. ই.' এবং ১৮৮৭ সালে 'নবাব বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত হন।

সিপাহী বিদ্রোহের পর ভারতে ব্রিটিশ শাসননীতির পরিবর্তন ঘটে। এটি হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত অভ্যুত্থান হলেও সমস্ত ঘটনা বিশ্লেষণ করে ব্রিটিশ সরকারের ধারণা হয়েছিল যে, এ বিদ্রোহের পেছনে রাজক্ষমতাচ্যুত মুসলমানদের হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করা একটা লক্ষ্য ছিল। অত্যধিক বঞ্চনা ও হতাশ্বাস থেকে তারা এই স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তাদের যথাযথ সুযোগ–সুবিধা না দিলে আবার বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। কি করে মুসলমান সমাজের উন্নতি করা যায়, তাদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন করা যায় এবং দারিদ্রদশা দূর করা যায়, তার সদেচ্ছা নিয়ে তাঁরা বাংলা থেকে আবদুল লতিফ এবং উত্তর প্রদেশ থেকে সৈয়দ আহমদকে নির্বাচন করেছিলেন। ঐ সময় তাঁরাই ছিলেন ইংরাজি জানা ব্যক্তি ; উভয়েই বিচক্ষণ ও কর্মদক্ষ ছিলেন। তাঁরা সরকারের মনোভাব বুঝে এই সুযোগের পুরোমাত্রায় সদ্ব্যবহার করেছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহ দমিত হলেও ওয়াহাবী আন্দোলন আরও কিছু কাল চলেছিল। আদুল লতিফের প্রথম কাজ হল ইংরাজদের প্রতি স্বধর্মাবলম্বীদের যে বিরূপ মনোভাব হয়েছে, তা দূর করে সরকারের প্রতি তাদের অনুগত করে তোলা। মুসলমানরা চরম আর্থিক দৈন্যে ভুগছে তার কারণ সরকারি চাকরি–বাকরি না করা তারা ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ না করলে সে সুযোগ পাবে না। অতএব তাঁর দ্বিতীয় কর্মসূচি হল স্বসমাজের মানুষের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তার

করা। আধুনিক শিক্ষা দীক্ষা গ্রহণ করে ও ব্যবসায়-বাণিজ্যে উন্নতি করে প্রতিবেশি হিন্দু সম্প্রদায় অনেক দূর অগ্রসর হয়েছে। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে মুসলমানদের টেকা দায়। এজন্য তাঁর তৃতীয় কর্মপন্থা হল সরকারের নিকট থেকে মুসলমানদের জন্য তুল্যমূল্যভাবে নয়, বিশেষভাবে সুযোগ-সুবিধা আদায় করা। সাংগঠনিক চিন্তা ও ঐক্যবদ্ধ কর্মপ্রয়াসের আদর্শ দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি চতুর্থ কর্মসূচি হিসাবে সভাসমিতি স্থাপন করেন। সমাজের মধ্যে উচ্চ-নিচু, ধনী-দরিদ্র শ্রেণীবৈষম্য ছিল, মানুষের মধ্যে অকর্মণ্যতা, নিষ্ক্রিয়তা, উদ্যমহীনতা, প্রেরণাশূন্যতা বিরাজ করছিল। 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র এক সময় সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় পাঁচ শত। এই পাঁচ শত সদস্য সমাজের অভিজাত ও মধ্যবিত্তশ্রেণী থেকেই এসেছিলেন। সোসাইটির বার্ষিক সম্মিলনে সহস্রাধিক লোকের সমাগম হত। এঁরা সকলেই উচ্চবিত্তের, উচ্চ পদমর্যাদার লোক ছিলেন না। উচ্চবিত্তেব সাথে মধ্যবিত্তেব মেলামেশার সুযোগ হয়েছিল সোসাইটির মাধ্যমে। 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত পুরা পনের বছর কলিকাতার মুসলিম সমাজকে এই সোসাইটি আলোড়িত করে রেখেছিল।

ওয়াহাবী আন্দোলনের প্রভাবের ফলে হোক অথবা কাঠমোল্লাদের প্রচারের ফলে হোক, 'কুফরে কালাম' ইংরাজি ভাষা ও 'এলমে বেদিন' পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রতি এক শ্রেণীব মানুষের বিরূপ মনোভাব ছিল। দ্বিতীয়ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল। মক্তব-মাদ্রাসায় গতানুগতিক শিক্ষাব্যবস্থা চালু ছিল। তৃতীয়ত অত্যধিক দারিদ্রহেতু ব্যয়বহুল আধুনিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা দুঃসাধ্য ব্যাপাব ছিল। পঞ্চমত মুসলমানদের আববি-ফারসি শিক্ষার প্রতি মোহ ছিল বেশি। ধর্মশিক্ষা ছাড়া বিজ্ঞান শিক্ষা বা অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষাব প্রতি বিশেষ ঝোঁক ছিল না। শিক্ষা আন্দোলনে নেমে আবদুল লতিফকে এরূপ পঞ্চবিধ সমস্যাব সম্মুখীন হতে হয়েছে। মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষা ও আররি-ফারসি-উর্দু ভাষা শিক্ষার তিনি নিজেও সমর্থক ছিলেন, তবে এর সাথে অধিক পরিমাণে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা হোক তা তাঁর কাম্য ছিল। এজন্য তিনি পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তনের কথা ১৮৬১ সালে হুগলী মাদ্রাসা ও ১৮৬৯ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা তদন্ত রিপোর্টে বলেছেন। ধর্মশিক্ষার জন্য মহসিন ফাণ্ড ও অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তির অর্থ নতুন বিদ্যালয় স্থাপন, মুসলমান হোস্টেল নির্মাণ, বিদ্যার্থীদের বৃত্তিদান ইত্যাদি কাজে ব্যয় করা হোক—এ বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে বিভিন্ন রিপোর্টে এবং সোসাইটির পক্ষ থেকে স্মারকলিপিতে সরকারকে জানিয়েছেন। উচ্চ শিক্ষার জন্য কলিকাতায় একটি স্বতন্ত্র কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর অভিপ্রায় ছিল। কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে আপত্তিকর ইংরাজি কবিতা আছে, তার উল্লেখ করে তিনি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এসবের ফল কিছু না কিছু ফলেছে। মহসিন ফাণ্ডের টাকা বাঁচিয়ে রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রামে মাদ্রাসা স্থাপিত হয়েছে (১৮৭৪)। এর সাথে মুসলমান শিক্ষক নিয়োগেরও ব্যবস্থা হয়। উচ্চ শিক্ষার্থে সরকারি খরচে প্রেসিডেন্সী কলেজ (১৮৫৪) স্থাপিত হলে সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয়ের জন্য প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হয়। মাদ্রাসা সংলগ্ন 'এলিয়ট

হোস্টেল' (১৮৯৬) নির্মাণের পরিকল্পনা তাঁর জীবীতকালেই হয়। তাঁর সুপারিশের ভিত্তিতে ১৮৫৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজি-ফারসি বিভাগ খোলা হয় এবং উর্দু ও বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। হুগলী মাদ্রাসা তদন্ত রিপোর্টে মাদ্রাসার ইংরাজি-আরব বিভাগকে এন্ট্রান্স পরীক্ষার উপযোগী করার সুপারিশ করেছিলেন, সরকার সেটি নাকচ করে দেন। কলিকাতা মাদ্রাসায় কেবল ভদ্র পরিবারের ছেলেরা পড়ার সুযোগ পেত, সাধারণ শ্রেণীর মানুষের ছেলেদের শিক্ষার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য কলিঙ্গায় একটি শাখা মাদ্রাসা স্থাপিত হয়। গরীব ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য ২৮,০০০ টাকার বৃত্তি-তহবিল গঠিত হয়।

আবদুল লতিফ ১৮৫৩ সালে ভারতের মুসলমানদের কাছ থেকে ফাবসিতে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছিলেন। বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতের মুসলমান যুবকদের পক্ষে ইংরাজি শিক্ষার উপকারিতা ও তার গ্রহণযোগ্য শিক্ষাব্যবস্থা '। ইংরাজি শিক্ষার পক্ষে যুক্তি দেখিয়ে বোম্বাই-এর ইংরাজি শিক্ষক আবদুল ফাত্তাহ পুরস্কার (১০০ টাকা) পেয়েছিলেন। ইংরাজি শিক্ষার বিরুদ্ধেও কিছু লেখা এসেছিল, তাঁরা শুধু ইংরাজি শিক্ষার বিবোধিতাই করেন নি, পুরস্কারদাতাকে ইসলামের শত্রু বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। এরূপ প্রতিকূল অবস্থার ভেতব দিয়ে তাঁকে অগ্রসর হতে হয়েছে। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "দেশের জনসাধারণেব শিক্ষার জন্য বিশেষত মুসলমানদেব শিক্ষার উন্নতির জন্য আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ বছরগুলি অতিবাহিত করেছি।" মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির মাধ্যমে তিনি একাধারে মুসলমানদেব একত্র করে তাদের নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন কবে দিয়েছেন, অন্যধারে যৌথভাবে সরকারের কাছে সমাজের দাবি দাওয়া পেশ কবেছেন ; উপবন্তু 'প্রদর্শনী মেলা', 'সম্বর্ধনা সভা' ইত্যাদির মাধ্যমে সরকারেব সাথে নিয়ত ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখে মুসলমানদের প্রতি শাসকদের সহানুভূতি বাড়িয়েছেন। আবদুল লতিফ অত্যধিক রাজভক্তি দেখিয়েছেন ; তাঁর কর্ম প্রয়াস আবেদন-নিবেদনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, তিনি রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ধারে-কাছেও যাননি, রক্ষণশীল মনোভাব বজায় রেখে তিনি শিক্ষা-সংস্কার চেয়েছেন। উইলফ্রেড স্কয়েন ব্লান্ট তাঁকে 'প্রাচীন পন্থী নেতা' বলেই উল্লেখ করেছেন। আবদুল লতিফের চিন্তাধারা ও কর্মধারার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কবতে গিয়ে এ ধরনের মন্তব্য করা হয়। তাঁর সম্পর্কে এগুলি প্রযোজ্য সত্য, তবে একথাও সত্য যে, তিনি যা করেছেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য নয়, সমাজের স্বার্থের জন্যই করেছেন। অন্যায়ের প্রতিবাদ করার মনোবল যে তাঁর ছিল, তা সাতক্ষীরায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে (১৮৫৪) নীলকরদের বিরোধিতা করার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে। তখন 'নীলদর্পণ' (১৮৫৮) নাটকাদি লেখাই হয়নি। এরূপ মনোভাব হয়ত বজায় থাকতো তাঁর, কিন্তু সিপাহী বিদ্রোহ ও ওয়াহাবী আন্দোলনের সর্বনাশা প্রতিক্রিয়া আঁচ করে তিনি মনোভাব পরিবর্তন করেন। ছোটলাট স্যার ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে (১৮৫৪-৫৯) সন্দেহ করেছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহে কলিকাতা মাদ্রাসার ছাত্রগণ জড়িত ছিল। এজন্য মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার প্রস্তাবও তিনি বড় লাটের কাছে করেছিলেন। রাজভক্ত আবদুল লতিফের

অনুরোধে বড়লাট সে প্রস্তাব আগ্রাহ্য করেন। ১৮৭০ সালে মৌলভী কেরামত আলীকে আহ্বান করে এনে সোসাইটির সভায় বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। বক্তৃতার মৌলিক বিষয় ছিল— ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে 'জিহাদ' নয়। ব্রিটিশ শাসনের অধীনে থেকে ধর্মকর্ম করতে বাধা নেই। আর বাধা যখন নেই (রাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্র অনুযায়ী) তখন ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' নয়, 'দারুল ইসলাম'। আবদুল লতিফ উক্ত বক্তৃতার ধারাবিবরণী নিজে প্রণয়ন করে তার পাঁচ হাজার কপি ভারতের মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। ইংরাজ শাসকের সন্দেহ তবু দূর হতে চায় না। ১৮৭১ সালে পরপর দুটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে তাঁদের সন্দেহবহ্নি আরও জ্বলে ওঠে। ঐ সালে উইলিয়ম হান্টারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়, ভারতের মুসলমানরা ধর্মের কারণে রাণীর শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে বাধ্য কিনা। উল্লেখযোগ্য যে, মুসলমান আইনে রাষ্ট্রনেতা হিসাবে নারীর শাসন অচল ও অবৈধ। 'আওয়ার ইণ্ডিয়ান মুসলমানস, আর দে বাউণ্ড ইন কনসেন্স টু রিবেল এগেন্‌স্ট দি কুইন' (১৮৭১) গ্রন্থখানি হান্টারের এই তদন্তের ফল। এসব ঘটনা আবদুল লতিফের চোখের সামনে ঘটেছে। এরূপ অবস্থায় তিনি সরকারের বিরোধিতা করতে পারেন না। তিনি সরকারের মনরক্ষা করে চলেছিলেন, অধঃপতিত একটি সমাজকে নিশ্চিত ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য। একথা স্মরণ রেখেই আবদুল লতিফের 'রাজভক্তি' ও 'তোষণনীতি'র সমালোচনা করতে হবে। স্মরণীয় যে, প্রথম দিকে একই পন্থা সৈয়দ আহমদও গ্রহণ করেছিলেন।

আবদুল লতিফ মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি চালু রেখে ধর্মশিক্ষাও প্রাচ্য বিদ্যার সপক্ষে ওকালতি করেছেন ; এতে তিনি মধ্যযুগীয় গোঁড়ামিকেই প্রশ্রয় দিয়েছেন বলে অভিযোগ করা হয়। কিন্তু চাপেই তা করেছেন ; সমাজকে আঘাত না করে সমাজের সাথে আপোষ করে সমাজের গতিমুখ ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন তিনি। এর অধিক করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। আবদুল লতিফের সীমাবদ্ধতার কথা বলে 'সোম প্রকাশে' (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮) লেখা হয় "বঙ্গদেশে এমন অনেক মুসলমান দৃষ্ট হয়, যাঁহারা কুসংস্কার পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু মুসলমান সমাজের ক্ষমতা এত প্রবল যে, কুসংস্কার মুক্ত ব্যক্তিরা প্রকাশ্য রূপে কোনো কাজ করিতে সাহসী হন না। মৌলবী আবদুল লতিফের সদৃশ ব্যক্তিদিগেরও অগত্যা গোঁড়ার দলে মিশ্রিত হইতে হইয়াছে ; তাঁহারা ভীরু স্বভাব নহেন, কিন্তু কি করেন গোঁড়ার দল এত পুষ্ট যে, বিপরীত চেষ্টা করিতে গেলে আপনাদিগকে অপদস্ত হইতে হয়।" উল্লেখযোগ্য যে, ১৮৫৩ সালে ইংরাজি প্রচলনের সপক্ষে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করলে অনেক লেখক তাঁকে 'ইসলামের শত্রু' বলে অভিহিত করেছিলেন। সৈয়দ আহমদ ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারে উদ্যোগী হলে, তিনিও সমাজের কাছ থেকে বাধা পেয়েছিলেন।

'এ মিনিট অন হুগলী মাদ্রাসা' (১৮৬১) শীর্ষক একটি তদন্ত রিপোর্ট, বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশনে'র সভায় পঠিত দুটি প্রবন্ধ 'দি নেচার অব অবজেকটস এণ্ড এডভ্যানটেজেস অব পিরিয়ডিক্যাল সেন্সাস' (১৮৬৫), 'এ পেপার অন মহামেডান

এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৮৬৮), 'দি মহামেডান ল' অব ম্যারেজ এণ্ড ডাওয়ার (১৮৭৫), 'পেপার অন দি প্রেজেন্ট কনডিশন অব দি ইণ্ডিয়ান মহামেডানস এণ্ড দি বেস্ট মীনস ফর দি ইমপ্রুভমেন্ট' (১৮৮০), প্রভৃতি মূল্যবান রচনা তাঁর আছে। 'এ শর্ট এ্যাকাউন্ট অব মাই পাবলিক লাইফ' (১৮৮৫) ও 'এ শর্ট একাউনট অব মাই হাম্বল এফর্টস টু প্রমোট এডুকেশন, এস্পেস্যালি এমং দি মহামেডানস' (১৮৮৬) শীর্ষক দুখানি আত্মজীবনীমূলক পুস্তিকা আবদুল লতিফ প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলা ভাল জেনেও বাংলা গ্রন্থ লেখেননি, উচ্চ শ্রেণীর জন্য উর্দু ভাষা শিক্ষার পক্ষে অভিনত দিয়েছিলেন, কেবল নিম্নবৃত্তির লোকেরা বাংলা শিখবে। বাংলার প্রতি তাঁর এরূপ মনোভাব পোষণের যে কারণই থাক, তা দূরদর্শিতার পরিচায়ক হয়নি ; এতে বাংলার মুসলমান সমাজের অগ্রগতি ব্যাহত হয়েছে। কলিকাতার ক্ষয়িষ্ণু, ভগ্ন, জরাগ্রস্ত সামন্তবৃত্তের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে যদি বাংলার জনগণের সাথে একাত্মতা স্থাপন করতে পারতেন, তবে তাঁর কর্মের অধিক সুফল ফলত।

আবদুল লতিফের চারপুত্র—ব্যারিস্টার এ. এম. আবদুর রহমান খান বাহাদুর, এ. কে. এম. আবদুস সোবহান খান বাহাদুর, এ. এফ. এ. আবদুল ওয়াহাব ও এ. এম. আবদুল আলী। তাঁরা সকলেই উচ্চশিক্ষিত ছিলেন এবং কর্মজীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন।[৫৪]

ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৬)

তিনি মেদিনীপুর শহরের বিখ্যাত 'সোহরাওয়ার্দী' পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পরিবারের ঐতিহ্য অনুসারে তিনি প্রথমে আরবি ও ফারসিতে শিক্ষা লাভ করেন ; কিন্তু পরবর্তীকালে নিজ চেষ্টায় উত্তম ইংরাজি রপ্ত করেন। ইংরাজি ভাষা ও আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর প্রথম চাকুরি হয় ভাইসরিগ্যাল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের অনুবাদ বিভাগের প্রধান মুনসী হিসাবে, তারপর হুগলী কলেজে এ্যাংলো-আরবি অধ্যাপক হন (১৮৬৫)। সৈয়দ আমীর আলী তাঁর ছাত্র ছিলেন। ইমামবাড়ার মতওয়াল্লী সৈয়দ কেরামত আলীর (মৃত ১৮৭৩) সাথে তাঁর বন্ধুত্ব ছিল। ১৮৭৪ সালে ঢাকা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হলে ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট নিযুক্ত হন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন। এখানে কবি কায়কোবাদ ও খান বাহাদুর আবদুল আজিজ তাঁর সুযোগ্য ছাত্র ছিলেন। ঢাকার নবাব আবদুল গণি ও নবাব আহসানুল্লাহর সাথে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে তিনি সৈয়দ আহমদের আলিগড় আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। তিনি আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো-

৫৪. তথ্যপঞ্জি —

১ *'Nawab Bahadur Abdul Latif His Writings and Related Documents* Dhaka, 1964.

২. *Muslim Community in Bengal (1884-1912)*, Dhaka 1974 p. 18.

৩ *Twelve Men of Bengal i the Nieeteenth Century* , Calcutta 1910, PP. 111-139.

ওরিয়েন্টাল কলেজের একজন প্রতিষ্ঠাতা ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি ১৮৬৪ সালে 'রেসিপ্রকাল ইনফ্লুয়েন্স অব মহামেডান এণ্ড ইউরোপীয়ান সিভিলাইজেশন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করে চালর্স ট্রিভলিয়ান ঘোষিত পুরস্কার লাভ করেন। ১৮৬৫ সালে সেটি ছাপা হয়। হুগলীতে অবস্থান কালে তিনি ও আমীর আলী একত্রে সৈয়দ কেরামত আলীর 'মখজুল উলুম' ফারসি গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ করেন। তিনি সৈয়দ আহমদের 'তহজিবুল আখলাক' পত্রিকায় নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন। তাঁর কবিতার সংকলন 'দিওয়ান–ই ওবায়দী' ১৮৮৬ সালে মুদ্রিত হয়। ইংরাজি ব্যাকরণের আদর্শে 'দস্তুরি ফারসি আমোজ' (১৮৭৭) নামে একখানি ফারসি ব্যাকরণ রচনা করেন। কলিকাতার 'দি বেঙ্গল ম্যাগাজিন' (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩) পত্রিকায় 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

ঢাকার সামাজকি সাংস্কৃতিক জীবনের সাথেও তাঁব ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে ছিল। ঢাকার 'সমাজ সম্মিলনী সভা' (১৮৭৯) নামে একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। তাছাড়া 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩) স্থাপনের ক্ষেত্রেও তিনি মূল প্রেরণাদাতা ছিলেন। তিনি একজন প্রগতিশীল শিক্ষাবিদ ছিলেন। মদ্রাসা শিক্ষা সংস্কারের পক্ষে তিনি আন্দোলন করেন।

ওবায়দুল্লাহ আল ওবাযদী সোহরাওয়ার্দীব জ্ঞান সাধনা ও সমাজ সেবার পুরস্কাব স্বরূপ সরকার তাঁকে 'বাহরুল উলুম' (বিদ্যাসাগর) উপাধিতে ভূষিত করেন। পরবর্তীকালে তাঁর সুযোগ্য পুত্র হাসান সোহরাওয়ার্দী (১৮৭২–১৯৬৩) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ১৫০০ টাকা দান করে পিতার স্মরণে 'বাহরুল উলুম ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী' নামে একটি পদক সৃষ্টি করেন। আরবি ও ইসলামি স্ট্যাডিজ বিষয়ে অনার্স শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকারী ছাত্রকে এটি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। আবদুল আজিজের 'ওবেদী বিয়োগ' (১৮৮৪) কবিতা পুস্তিকা ও নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর 'ওবেদী' কবিতা তাঁর মৃত্যুতে শোক–প্রকাশ করে লেখা হয়। সৈয়দ আমীর আলী খান আত্মজীবনীতে ওবায়দী সম্পর্কে লিখেছেন, "He (Obaidullah)was a scholarly man conversant with English... He was a man of worthy of respect, but he had one failing , common in India, of relating ordinary gossip without goiving one weight to its consequences".

ওবায়দুল্লাহর জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী (১৮৭০–১৯৩৫) মুসলিম আইন সম্পর্কে গবেষণা–নিবন্ধ বচনা করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ. ডি. ডিগ্রী লাভ করেন। (১৯০৮)। হাসান সোহরাওয়ার্দীও উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। তিনি ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে প্রথম এফ. আর. সি. এস. ছিলেন।[৫৫]

৫৫. তথ্যপঞ্জি

১. Syed Martuza Ali --*Personality Profile*, Dhaka, 1965, pp. 40-42.

আবদুল জব্বার (১৮৩৭-১৯১৮)

বর্ধমান জেলার জমিদারের সন্তান আবদুল জব্বার ১৮৫৯ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। তখন থেকে শুরু করে পরবর্তী ৩০ বছর তিনি নানা সম্মানিত পদে বৃত ছিলেন। তিনি মাঝে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট (১৮৮৯-৯৪) হিসাবে কাজ করেছেন। তিনি বাংলা ব্যবস্থাপক সভায় ১৮৮৪, ১৮৮৬, ও ১৮৯৩ সালে মোট তিনবার সদস্য মনোনীত হন। চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণের অব্যবহিত পরে তিনি ভুপালের প্রধানমন্ত্রী (১৮৯৭-১৯০২) নিযুক্ত হন। 'নবাব' উপাধি সেখানেই পান। নবাব আবদুল লতিফের সাথে তাঁর অন্তরঙ্গতা ছিল। তিনি 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র সহিত যুক্ত ছিলেন। ১৯০০ সালে সোসাইটির সভাপতি হন। তাঁর ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল। এসব ব্যাপাবে তিনি আবদুল লতিফকে সমর্থন দিতেন। চাকরিতে নিষ্ঠা ও সরকারের প্রতি আনুগত্যের পুরস্কার স্বরূপ তিনি 'খান বাহাদুর' ও 'সি. আই. ই,' (১৮৯৫) উপাধি পান।

ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আবদুল মোমেন (১৮৭৬-১৯৪৬) তাঁর পুত্র এবং বিখ্যাত সাংবাদিক ও রাজনীতিবিদ আবুল কাসিম ভাগ্নেয় ছিলেন। আবদুল জব্বার হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে সম্মানের আসন পেয়েছিলেন। রামপ্রাণ গুপ্ত 'নবনূরে' (আশ্বিন ১৩১০) প্রেরিত একখানি পত্রে বলেন. 'বঙ্গদেশে বহু শিক্ষিত মুসলমান আছেন, তাঁহাদের অনেকেই হিন্দু সমাজের সম্মান ও শ্রদ্ধাভাজনও বটেন, কিন্তু আবদুল জব্বার সাহেবই সর্বাপেক্ষা অধিক সম্মান ও শ্রদ্ধালাভ কবিয়াছেন।" শ্রদ্ধালাভ করিয়াছেন।"

আদালত খান (১৮৪৪-৯৪)

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মুনশী আদালত খান একজন একনিষ্ঠ শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানসাধক ছিলেন। সরকাব ১৮৫৪ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ তুলে দিয়ে 'বোর্ড অব একজামীনার্স'-এর অধীনে সিভিলিয়ানদের শিক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেন। আদালত খান ১৮৬২ সালে বোর্ড অব একজামীনার্সের অফিসে মুনশী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি ফারসি ও হিন্দি বিষয়ে শিক্ষা দিতেন। তিনি অধ্যাপক হিসাবে চাকরিতে রত অবস্থায় ১৮৯৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। দক্ষ শিক্ষক ও বিদ্বান ব্যক্তি হিসাবে তাঁর খ্যাতি ভারতবর্ষ ছাড়িয়ে ইউরোপেও প্রচার লাভ করে। বাংলার ছোটলাট আদালত খানকে প্রদত্ত একটি 'প্রশংসাপত্রে' (২ ডিসেম্বর ১৮৭৯) বলেন,

২. Syed Razi Wasti (edited)-- *Memoirs and other Writings of Syed Ameer Ali*, Lahore, P. 21.
৩. অমলেন্দু *দে-বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদী*, রত্না প্রকাশনী, কলিকাতা ১৯৭৪
৪. মহম্মদ আবদুল কাইউম —'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', *মাহে-নও*, বৈশাখ ১৩৭৪

"Professor (Adalat) Khan have been working with officers of Her Majesty's Army and Indian Civli Service for the last 17 years. He is Well-known among the officers throughout the length and breadth of Hindustan and his reputation as an oriental Scholar has travelled by this country (England)."

আদালত খান ঢাকার মানিকগঞ্জের নিকটবর্তী দাদরখি গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জুলফিকার খান ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রাচ্যশাখার গ্রন্থগারিক ছিলেন। দাদরখির এই 'মুনশী পরিবারে'র বিত্তে-বিদ্যায় সুনাম ছিল। আসালত খান, আল্লাহদাদ খান, আদালত খান ও আকবর খান—চার ভ্রাতাই উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। আদালত খান কলিকাতা মাদ্রাসায় ও প্রেসিসেন্সী কলেজে লেখাপড়া করেন। প্রতিযোগিতামূলক 'উচ্চতর পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা' পাশ করে তিনি উক্ত মুনশীর পদ লাভ করেন।

নিরলস জ্ঞান চর্চা আদালত খানের ব্রত ছিল। তিনি আত্মপ্রচারকামী ছিলেন না। সভা-সমিতিতে বেশি একটা যাতায়াত কবতেন না। বই পড়ে এবং লিখে তিনি বেশির ভাগ সময় অতিবাহিত করতনে। তাঁব রচনার দুটি ধারা—পাঠ্য পুস্তক ও অভিধান। পাঠ্যপুস্তকগুলি সবই ইংরাজি ভাষায় অনূদিত। এগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, কলিকাতা মাদ্রাসা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতেও আদালত খানের পুস্তকের নাম পাওয়া যায়। তিনি যেসব গ্রন্থ ইংরাজিতে অনুবাদ করেন, সেসবের নাম মূল ভাষাসহ নিম্নে দেওয়া হল :

১. বেতাল পচিশি (১৮৬৪), ব্রজভাষা
২. বোস্তাঁ (১৮৬৮), ফারসি (সাদী)
৩. বেতাল পঞ্চবিংশতি (১৮৭০), বাংলা (বিদ্যাসাগর)
৪. রামায়ণ (২য় সর্গ, ১৮৭১), হিন্দি (তুলসী দাস)
৫. প্রেম-সাগর ও বাগ ও বাহার (১৮৭৫), ফারসি
৬. ভারতবর্ষের ইতিহাস ও বাগ ও বাহার (১৮৭৭), সংকলন
৭. গুলিস্তাঁ (১৮৮০), ফারসি
৮. ইকদ-ই গুল (১৮৮৩), ফারসি (গুলিস্তাঁ ও আনোয়ার সুহেলি থেকে সংকলিত)
৯. গুলে বকাওলি, উর্দু
১০. তোতাকাহিনী, উর্দু।
১১. বাহার-ই দানিশ, ফারসি
১২ আলিফ লায়লা, আরবি
১৩. চাহার দরবেশ, হিন্দি।

'A Vocabulary of words for the higher standards in Hindustani, Persian and Bengali' (1872) নামে ত্রি-ভাষায় অভিধান তিনি সংকলিত করেন। আদালত খানের *'A Vocabulary of thousand words in five languages'* (১৮৮০, ৩য় সংকলন) নামে বাংলা, ইংরেজি, ফারসি, উর্দু ও হিন্দি পঞ্চ ভাষার একখানি অভিধান জর্জ গ্রীয়ার্সনের

'লিঙ্গুস্টিক সার্ভে অব ইণ্ডিয়া' (৫ম খণ্ড) গ্রন্থে উল্লেখ আছে। সম্ভবত এটি প্রথম অভিধানেরই সম্প্রসারিত সংস্করণ। এসব গ্রন্থ থেকে আদালতের ভাষাজ্ঞান কত বিস্তৃত ছিল, তা সহজেই বুঝা যায়। তাঁর পাঠ্য-পুস্তকগুলি ছাঁচে-ঢালা ছিল না, টীকা-টিপ্পনী দিয়ে তিনি সেগুলিকে পাঠকের কাছে সহজবোধ্য করে তুলেছেন। ভারত ও আরব-ইরানের ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, জাতিতত্ত্ব ও ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর যে গভীর জ্ঞান ছিল তা অনুবাদকর্ম ও টীকা-টিপ্পনী থেকে বুঝা যায় 'দি ইকদ্-ই-মনজুম' নামে তিনি সাদীর বোস্তাঁর যে ইংরাজি অনুবাদ করেছেন,তাতে পাশ্চাত্য আদর্শে গবেষণার নিদর্শন আছে। গ্রন্থে সংযুক্ত শেখ সাদীর জীবন বৃত্তান্তটি লেখকের মৌলিক গবেষণার ফল। বিষয়-জ্ঞান ও ভাষাজ্ঞানেব জন্যই এরূপটি সম্ভব হয়েছে। তাঁর যুগে এরূপ ভাষাজ্ঞান দুর্লভ ছিল।

সিরাজুল ইসলাম (১৮৪৮-১৯২৩)

কুমিল্লা জেলার পেরাকান্দি গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান সিরাজুল ইসলাম বুদ্ধিবৃত্তির গুণে শিক্ষিত সমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ্যাতি অর্জন করেন। তাঁর পিতা কাজী মোহাম্মদ কাজেম রাজস্ব দারোগা ছিলেন। তিনি ১৮৬৭ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ ও ১৮৭৩ সালে বি এল পাশ করে কলিকাতা হাইকোর্টে ওকালতি শুরু করেন। তিনি ঢাকা কলেজের (১৮৭৩) প্রথম মুসলমান গ্রাজুযেট। সরকার গঠিত বিভিন্ন কমিটি ও পরিষদ এবং বেসরকারি নানা সভা-সমিতির সাথে যুক্ত থেকে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ উন্নতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন কবেন। তিনি ১৮৯৩ ও ১৯০২ সালে দুবার 'বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভা'র সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৯৫ সালে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্বাচিত হন। 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সহকারি সম্পাদক (১৮৮৫) এবং 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র অনারেরি সদস্য ছিলেন (১৯০৩)। তিনি ব্রাহ্মণবাড়িয়ার 'হিতসাধিনী সভা'র সভাপতি ছিলেন। তিনি ঐ সভার পক্ষ থেকে সরকারকে লিখিত এক পত্রে চট্টগ্রাম বিভাগকে বাংলা থেকে বিছিন্ন করে আসামের অন্তর্ভুক্ত করার প্রতিবাদ করেন। তিনি 'দি মুসলমান' (১৯০৬) পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দান করেন।[৫৬]

খোন্দকার ফজলে রাব্বি (১৮৪৯-১৯১৭)

'হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ্' প্রণেতা খোন্দকার ফজলে রাব্বি মুর্শিদাবাদ এস্টেটের দেওয়ান ছিলেন। তিনি বেগমজাদী শামসি জাহান ফেরদৌস মহলের প্রাইভেট সেক্রেটারী রূপেও কাজ করতেন। পিতা আবদুল আকবর বাংলার নবাব নাজিমের চাকুরি করতেন।

৫৬. তথ্যপঞ্জি –
১. J C Dasgupta--*National Biography of India*, Dhaka.
২. A K. Nazmul Karim--*The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, London, 1964 (unpublished Thesis)
৩. *Consolidated Alphabetical Index to the Proceedings of the Government of Bengal, Political Department (1857-1908)*, Calcutta.

খোন্দকার ফজলে রাব্বি অতি অল্প বয়সে ঐ চাকুরিতে যোগদান করেন (১৮৬৬)। তিন বছর পর বিলাতে যান, সেখানে অবস্থানরত নবাব বাহাদুরের কেরানী হিসাবে। ১৮৭৪ সালে মুর্শিদাবাদে ফিরে এসে প্রথমে ম্যানেজার ও পরে দেওয়ান হন (১৮৮১)। তিনি মুর্শিদাবাদের অনারেরি ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট ও মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সালে 'খান বাহাদুর' উপাধি পান।[৫৭]

হান্টার, রিজলি, ব্রেভালি প্রমুখ ইংরাজ পণ্ডিত বাংলার মুসলমানদের দেশীয় তফসিলীভুক্ত ধর্মান্তরিত বংশধর বলে অভিমত ব্যক্ত করেন। ফজলে রাব্বি মুখ্যত এ মতের প্রতিবাদ করেই 'হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলায় তুর্কিদের রাজনৈতিক ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে সুলতান, সুবেদার, নবাব, নাজিম, উজির, দেওয়ান, জায়গীরদার, জমিদার, আয়মাদার, তালুকদার প্রভৃতি শ্রেণীর প্রধান প্রধান পরিবারের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে বাঙালি মুসলমানদের উৎপত্তি আরব, ইরান, তুরস্ক, আফগানিস্তান, খোরাসান প্রভৃতি অঞ্চল থেকে আগত অভিজাত সম্প্রদায়ের শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বসতি স্থাপনের ফলেই হয়েছে। ধর্মান্তরিত নিম্ন শ্রেণীভুক্ত মুসলমান আছে, তবে এরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য তিনি স্বয়ং 'দি অরিজিন অব দি মুসলমান অব বেঙ্গল' (১৮৯৫) নামে গ্রন্থখানির ইংরাজি অনুবাদ করেন। 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস' (১৮৭১) গ্রন্থে হান্টারের প্রধান বক্তব্য ছিল, ভারতের মুসলমানরা ধর্মের কারণে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জেহাদী মনোভাব পোষণ করত। খোন্দকার রাব্বি এ মতের বিরোধিতা করে বলেন, মুসলমানদের ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাবের প্রকৃত কারণ ধর্ম-সংস্কার নয়, ব্রিটিশ শাসননীতির ধারার সাথে তাল রক্ষা না করে নিজেদের পূর্বতন ঐতিহ্যকে আঁকড়ে থাকা এবং অমূলক আশঙ্কার বশবর্তী হয়ে মুসলমানদের প্রতি শাসকগোষ্ঠীর উপেক্ষা প্রদর্শন করা।[৫৮]

শেখ আবদুর রহিম 'হাফেজ' মাসিক পত্রে প্রথম সংখ্যা (জানুয়ারি, ১৮৯৭) থেকেই 'বাঙ্গালার মুসলমান' নাম দিয়ে উক্ত গ্রন্থের অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন। তিনি অনুবাদের ভূমিকায় লেখেন। "... গ্রন্থখানি ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা ও ভারতবর্ষের বিদ্বৎসমাজে সাদরে গৃহীত, সমাদৃত ও সুখ্যাতির সহিত সমালোচিত হইয়াছে। বাঙ্গালার মুসলমান ভ্রাতাদের জন্য উল্লিখিত উৎকৃষ্ট গ্রন্থের বাঙ্গালা অনুবাদ একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া আমরা তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।"[৫৯] আবদুল হামিদ খান

৫৭. তথ্যপঞ্জি —
১ *মিহির ও সুধাকর*, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯
২ *The Moslem Chronicle*, 14 March 1895
৩ *Muslim Community in Bengal*, p. 231
৪ *Who's Who in India*, P 105

৫৮. *The Origin of the Musalmans of Bengal*, Calcutta, 1895, PP. 105-19

৫৯. *হাফেজ*, জানুয়ারি ১৮৯৭

ইউসফজয়ী 'বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদিবৃত্তান্ত' (১৮৯৯) নাম দিয়ে ঐ গ্রন্থের অপর বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন।[৬০]

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯-১৯২৮)

শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত সৈয়দ আমীর আলী প্রথম শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর পিতা সৈয়দ সা'দত আলী অযোধ্যার উন্নাও অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। তিনি প্রথমে উড়িষ্যার কটক ও পরে হুগলীর চুঁচুড়ায় বসতি স্থাপন কবেন। তিনি হেকিমী চিকিৎসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহ কবতেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না, আমীর আলীকে বৃত্তির উপর নির্ভর করে অর্থকষ্টের মধ্যে লেখাপড়া করতে হয়েছে। আমীর আলী হুগলী জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। সাহিত্যিক অক্ষয়কুমার সরকার তাঁর সহপাঠী ছিলেন। তিনিই প্রথম স্থান অধিকার কবেন, আমীর আলী প্রথম দশজনের মধ্যে স্থান পান। তিনি প্রথম শ্রেণীর বৃত্তিলাভ করে হুগলী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৬৭ সালে বিএ, ১৮৬৮ সালে ইতিহাসে এম এ এবং ১৮৬৯ সালে বি এল পাশ করেন। ঐ বছব স্টেট স্কলারশিপ পেযে বিলাতে পডতে যান। ১৮৭৩ সালে ব্যাবিস্টারী পরীক্ষা পাশ কবেন। ঐ বছর কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। ১৮৭৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযেব 'ফেলো' ও ১৮৮৪ সালে 'টেগোর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। ১৮৭৫–৭৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের 'মুসলিম আইনে'র অধ্যাপক হন। ১৮৬৪ ও ১৮৭৩–৮৩ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য মনোনীত হন। ১৮৯০–১৯০৪ সালে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচাবপতি হন। বাংলার মুসলমানের মধ্যে তিনিই প্রথম এ সম্মানের অধিকারী ছিলেন। ইংল্যান্ডের প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হন। ইতিপূর্বে আর কোনো ভারতীয় এ সম্মান পাননি। তিনি ১৮৬৪ সালে 'খান বাহাদুর', ১৮৭৫ সালে 'নবাব' ও ১৮৮৭ সালে 'সি. আই. ই.' উপাধি লাভ করেন।

১৮৭৮ সালে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠার পর থেকেই দেশের সমাজ, শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতির সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। ১৮৭৪ সালে তিনি কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যভুক্ত হন। হুগলীর ইমামবাড়ার সভাপতি হন ১৮৬৪ সালে। ১৯০৪ সাল পর্যন্ত ঐ পদে সমাসীন ছিলেন। ১৯০৯ সালে লণ্ডনে মুসলিম লীগের শাখা স্থাপন করে সেটি নিজেই পরিচালনা করতেন। সেন্ট্রাল এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক হিসাবে (১৮৭৮–৯০) সৈয়দ আমীর আলীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তিনি বিভিন্ন প্রদেশে শাখা স্থাপন করে একে সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব প্রদান করেন। মুসলমান সমাজের সকল প্রকার স্বার্থরক্ষা ও উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সৈয়দ আমীর আলী সংগ্রাম করেছেন। সরকারের সঙ্গে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে না নেমে, বরং সরকারের সম্পূর্ণ আনুগত্য মেনে নিয়েই

---

৬০. **আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী** --*বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদিবৃত্তান্ত, কলিকাতা,* ১৩০৬

তিনি আইন সঙ্গত ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে স্বসমাজের দাবিগুলি তুলে ধরেন। সমাজের মানুষের আর্থিক, বৈষয়িক ও মানসিক উন্নতির জন্য ইংরাজি শিক্ষার বিস্তার চেয়েছেন। সরকারি চাকুরিতে মুসলমানদের অধিক নিয়োগ কামনা করেছেন। ১৮৮২ সালে 'স্মারকপত্রে' এবং ১৮৮৪ সালে ১০ই মার্চ বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিবকে লিখিত পত্রে আমীর আলী মুসলমানদের জন্য চাকুরির সংরক্ষিত সুবিধা চেয়েছেন। বড়লাটের ব্যক্তিগত সচিবকে তিনি জানান, ".......the unequal distribution of State patronage is the most important question of all ; it has given rise to the greatest discontent and bitterness of feeling, and will continue to do so unless Govt. emphatically lay down the principle that in Bengal at least one-third of State employment should be reserved for Mahommedans "[৬১]

ঠিক তোষণনীতি নয়, আপোষমূলক নীতিব দ্বারা কার্যোদ্ধারের পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। 'সিপাহী বিদ্রোহে'র পরে 'ওয়াহাবী আন্দোলনে' এবং কয়েকটি হিংসাত্মক হত্যাকাণ্ডের (মুসলমান গুপ্তঘাতকের হাতে ১৮৭১ সালে বিচারপতি নরম্যান ও বড়লাট লর্ড মেয়োর মৃত্যু) ফলে ব্রিটিশ সরকারের সন্দেহ ও অবিশ্বাস দূরীভূত হওয়ার কথা নয়। সেজন্য সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফ ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ তো দূরের কথা, কোনো রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে জড়িত হতে চান নি। তাঁরা আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমেই জাতীয় নবজাগরণ চেয়েছিলেন। সৈয়দ আমীর আলী এরূপ রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা পছন্দ করতেন না। ইংরাজি শিক্ষা দানের সঙ্গে সঙ্গে জাতিকে যদি রাজনৈতিকভাবে সচেতন কবে তোলা যায়, তবে ফল দ্রুত ফলবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। তিনি এসোসিযেশনকে এ উদ্দেশ্যেই গড়ে তোলেন। সৈয়দ আহমদ ও আবদুল লতিফের চিন্তাধারার সাথে সৈয়দ আমীব আলীর চিন্তাধারার এখানেই পার্থক্য। অবশ্য পরে সৈয়দ আহমদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। ১৮৭২ সালে হান্টার বলেছিলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে এমন কোনো ব্যবস্থা নেই যে তাদের দুবস্থার কথা সরকারের কাছে যথাযথভাবে তুলে ধরে। একথা স্মরণ রেখে এবং হিন্দুদের রাজনৈতিক সচেতনতা লক্ষ্য করে তিনি স্মৃতিকথায় (মেময়ার্স) লিখেছেন, "আমি ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে রাজনৈতিক শিক্ষার অভাব লক্ষ্য করি এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতিপত্তি দেখতে পাই। এজন্য আমি ১৮৭৮ সালে ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করি।"[৬২] তিনি সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে ছিলেন। কংগ্রেসে যোগদান

৬১. Amir Ali to Private Secretary, Viceroy, 10 March, 1884 (British Museum, Indian State Papers 290/8) quoted in The Emergence of Indian Nationalism by Anil Seal (Cambridge, 1971), P. 312 (fn).

৬২. "Perceiving the complete lack of political training among the Moslem inhabitants of India, the immense advantage and preponderance the Hindu organisations gave to their community, I had founded in 1878 the National Mahommedan Association".

না করেও তিনি ১৮৮৫ সালে কলিকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনকে সফল করে তুলতে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে পূর্ণ সহযোগিতা দান করেছিলেন। পরে স্যার সৈয়দ আহমদ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে কংগ্রেস থেকে সরে আসেন। হিন্দু নেতাদের জাতীয়তাবাদ মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী হবে বলে তাঁর ধারণা হয়েছিল। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি লীগের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় মতাদর্শ সমর্থন করেন। লণ্ডনে লীগের শাখা করে সে আদর্শই প্রচার করতেন। মুসলিম লীগের সাথে যুক্ত থাকলেও তিনি সাম্প্রদায়িক মনোভাব প্রসূত কোনো কর্ম করেছেন, এমন দৃষ্টান্ত নেই। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি, এজন্য সে যুগের সাম্প্রদায়িক বিষ-কুণ্ডলী থেকে মুক্ত থাকতে পেরেছিলেন।

জ্ঞানগর্ভ, তথ্যভিত্তিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীল বিবিধ গ্রন্থ প্রণয়ন আমীব আলীর অবিস্মরণীয় কীর্তি। গ্রন্থগুলির পাতায় তাঁর জ্ঞানানুশীলন, মননশীলতা ও বিচক্ষণতার ছাপ রয়েছে। ইসলাম ধর্ম, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে এগুলি রচনা করেন। উদ্দেশ্য একই—মুসলিম চিন্তার উৎকর্ষবিধান, আত্মজিজ্ঞাসার উদ্বোধন এবং জাতীয়তাবোধের উন্মেষ দ্বারা সম্প্রদায়ের পুনর্জাগরণ সম্ভাবিত করা। রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতা হারিয়ে ভারতের মুসলমান মানসিক দৈন্যে ভুগছে। ধর্ম ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে খ্রিস্টান, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অমুসলমান সম্প্রদায়ের আক্রমণ ক্রমশ তীব্র হয়ে উঠছে। অজ্ঞতা ও অক্ষমতাবশত মুসলমানরাও অধঃপতনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তাদের উন্নত ধর্মাদর্শ, গৌরবময় ইতিহাস-ঐতিহ্য ছিল, সেসব ভুলতে বসেছে। প্রতিবেশী হিন্দুগণ হিন্দুধর্ম ও ভারতের পুরাণ ও ইতিহাসকে আশ্রয় করে পুনর্জাগরণ ও জাতীয়তাবাদের সুর তুলেছেন ; ইসলাম ধর্মের অনুসারী হিসাবে মুসলমানদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না। হজরত মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলাম ধর্ম বিশ্বের মুসলমানদের পবিত্র ধর্ম, সাত শতকে সে ধর্ম প্রবর্তিত ও প্রচারিত হওয়া পর থেকে আরব ও অন্যান্য মুসলমান রাষ্ট্রের গৌরবময় ঐহিত্য সৃষ্টি হয়েছে। অতীতের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস ও ইসলামের গণতান্ত্রিক ও সাম্যবাদের আদর্শ এদেশের নির্বীর্য, হতঃচেতন, হীনমন্য জাতির মনে প্রেরণা সঞ্চার করবে এরূপ আকাঙ্ক্ষার বশবর্তী হয়ে তিনি হজরত মুহম্মদের জীবনী, ইসলাম ধর্মের অন্তর্নিহিত ধর্মনীতি, আরবদের ইতিহাস, মুসলমান আইন বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করেন। তাঁর কোনো কোনো গ্রন্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর পাঠ্য পুস্তক হিসাবে নির্বাচিত হয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশে তাঁর গ্রন্থ আদৃত হয়েছিল। তাঁর তথ্যপূর্ণ ও যুক্তিশীল রচনার দ্বারা খ্রিস্টান জগতের অনেক ভ্রান্তি ও অজ্ঞানতা দূরীভূত হয়। বিশ্ববাসীর চোখে ইসলামের ও মুসলমানদের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সৈয়দ আমীর আলী ইসলামের বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যানুভূতিতে বিশ্বাস করতেন, বিশ্বমুসলমানের ঐক্যের প্রতীক 'খিলাফত' প্রথা পছন্দ

K.K. Aziz-- *Ameer Ali : His Life and Works,* Lahore, 1968, p. 557.

করতেন। এজন্য পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের দূরভিসন্ধিতে কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের রাজপদ এবং সেই সঙ্গে খিলাফত প্রথা তুলে দেওয়ার চেষ্টা করলে আমীর আলী ইসমত পাশার কাছে লিখিত পত্র দ্বারা তা অক্ষুণ্ন রাখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। জামালউদ্দীন আফগানী কলিকাতায় এলে হিন্দু নেতাদের সহযোগিতায় আলবার্ট হলে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা তিনিই করেছিলেন। রাজনৈতিক মতাদর্শের জন্য ব্রিটিশ সরকার জামালউদ্দীনকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির অসহযোগিতায় মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করতে পারেননি।

সৈয়দ আমীর আলীর অধিকাংশ গ্রন্থ ইংরাজিতে রচিত ; দু'একটি উর্দু গ্রন্থও আছে। তাঁর প্রধান গ্রন্থ এরূপ :

ক. এ ক্রিটিক্যাল একজামিনেশন অব লাইফ এণ্ড টিচিং অব মহম্মদ, এডেনবার্গ, ১৮৭৩
খ. পারসনাল ল' অব দি মহামেডান, লণ্ডন, ১৮৮০
গ. মহামেডান ল' (টেগোর লেকচার্স), ক্যালকাটা, ১৮৮৪
ঘ. স্পিরিট অব ইসলাম, লণ্ডন, ১৮৯১
ঙ. লিগ্যাল স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন ইসলাম, লণ্ডন, ১৮৯১
চ. এ শর্ট হিস্টরী অব দি সারাসিনস, লণ্ডন, ১৮৯৮
ছ. ক্রিশ্চিয়ানিটি ফ্রম দি ইসলামিক স্ট্যাণ্ডপয়েন্ট, লণ্ডন, ১৯০৬
জ. ইসলাম, লণ্ডন, ১৯০৬

এছাড়া, 'কমেন্টারি অব দি ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এ্যাক্ট' (১৮৯৮), 'কমেন্টারি অব দি বেঙ্গল টেন্যান্সি এ্যাক্ট' (১৯০৪), 'কমেন্টারি অব সিভিল প্রসিডিয়র কোড' প্রভৃতি সমকালীন সমস্যা ভিত্তিক আইনের গ্রন্থ আছে। 'আইন-উল-হিদায়া' হানাফী আইনের হিদায়া গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ। 'মেময়ার্স' (১৯৩১-৩২) নামে তাঁর আত্মজীবনীও রচিত হয়েছিল। 'ক্রুসেড' গ্রন্থের জবাবে 'জিহাদ' লিখেছিলেন। কোনো কোনো অবস্থায় মুসলমানদের পক্ষে ধর্মযুদ্ধ সিদ্ধ, এতে তাই বর্ণিত হয়েছে। তিনি কলিকাতার 'মডার্ণ রিভিউ' ও লণ্ডনের 'দি নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছিলেন।

'স্পিরিট অব ইসলাম' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। ইসলাম অভ্রান্ত, অকৃত্রিম ও অপরিবর্তনীয় ধর্মমত, ইসলামের বিধিগুলিও সুগঠিত ও সর্বজনীন। সুতরাং যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এগুলির নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই—মূল তত্ত্ব হিসাবে তিনি এটাই প্রমাণিত করেছেন 'স্পিরিট অব ইসলাম' গ্রন্থে। এর সাথে হজরত মহম্মদের সামগ্রিক জীবনকে আদর্শ হিসাবে মুসলমানদের অনুসরণ করা আবশ্যক বলে বিবেচনা করেছেন। মহম্মদ সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শে একটি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলেন। বর্ণে বিত্তে ভেদাভেদ ইসলাম স্বীকার করে না। মুসলমান জাতির পতনের কারণ ইসলামের আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ না করা —ইসলামকে পূর্ণ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা ও হযরত মুহম্মদের জীবনাদর্শের অনুসরণ দ্বারাই মুসলমানদের পুনর্জাগরণ সম্ভব বলে তিনি বিশ্বাস করতেন।

তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, 'In the following pages I have attempted to give the history of the evolution of Islam as a world-religion ; of its rapid spread and the remarkable hold it obtained over the conscience and minds of millions of people within a short space of time. The impulse it gave to the intellectual development of the human race is generally recognised. But its great work in the uplifting of humanity is either ignored or not appreciated ; nor are its rationale, its ideals and its aspirations properly understood. It has been my endeavour in the survey of Islam to elucidate its true place in the history of religions. The review of its rationale and ideals, however feeble, may be of help to wanderous in quest of a constructive faith to steady the human mind after the strain of the recent cataclysm, it is also hoped that to those who follow the Faith of Islam it may be of assistance in the understanding and exposition of the foundations of their convictions."[৬৩]

সৈয়দ আমীর আলীর চিন্তাশীল কর্মধারা ও মননশীল রচনাবলী বাংলার মানুষের কাছে যদি সরাসরি পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হত, তা হলে হয়ত তিনি বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলনের জোয়ার আনতে পারতেন। হাইকোর্টের বিচারপতি হওয়ার পর থেকে ক্রমশ তাঁর জন–সংযোগ হ্রাস পায়। লণ্ডনে যাওয়ার পর থেকে তা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ফলে রমেশচন্দ্র দত্ত, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ হিন্দু নেতা স্বজাতির জন্য যা করতে পেরেছিলেন, সৈয়দ আমীর আলী ঠিক ঐরূপটি করতে পারেননি। তাঁর মত একজন মনীষীকে পেয়েও মুসলমান সমাজে বিপ্লব আসেনি। তবে তিনি সমাজের বদ্ধমুখ, রুদ্ধগতি অপসারিত করে নবজাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে পেরেছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। উনিশ শতক শেষ হওয়ার আগেই দেশে ও দেশের বাইরে আমীর আলীর একটি বুদ্ধিদীপ্ত 'ভাবমূর্তি' রচিত হয়েছিল। প্রথম দিকে ভাষাগত ব্যবধানবশত আমীর আলীর চিন্তার ফসল সরাসরি দেশবাসীর কাছে পৌঁছেনি, তবে কিছুকাল পরে শিক্ষিত বাঙালি যুবকদের প্রচেষ্টায় বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে তা প্রচারিত হওয়ার সুযোগ লাভ করে। রংপুরের শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'আরবজাতির ইতিহাস' নাম দিয়ে দুই খণ্ডে (১ খণ্ড, ১৩১৭ ও ২ খণ্ড ১৩১৯) 'এ শর্ট হিস্টরি অব দি সারাসিনস' গ্রন্থের অনুবাদ করেন। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ পড়ে সৈয়দ আমীর আলী লণ্ডন থেকে একটি ব্যক্তিগত পত্রে (১৮ সেপ্টেম্বর ১৯১১) শেখ রেয়াজুদ্দীনকে লিখেছিলেন,

I was very pleased with the first part of the Bengali rendering of my short History of the Saracenes which appeared to me, so far as my limited knowlege of the Bengali language allows me to Judge excellent."

৬৩. Syed Ameer Ali --*The Spirit of Islam* (a history of the evolution and ideals of Islam with a life of the Prophet), Christophers, London. 1955 (amplified and revised 8th edition), P. VII (Preface).

'নবনূর', (অগ্রহায়ণ ১৩১২) পত্রিকায় মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লাহ 'মুসলমানের সর্বনাশ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধের উৎস সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "শ্রদ্ধেয় জাস্টিস আমীর আলী সাহেব ১৮০২ সালের আগস্ট এবং ১৯০৫ সালের অক্টোবর মাসে 'নাইনটিনথ সেঞ্চুরি' পত্রিকায় 'এ ক্রাই ফ্রম ইণ্ডিয়ান মুসলমান' এবং 'অ্যান ইণ্ডিয়ান রেট্রোস্পেকশন এ্যাণ্ড কমেন্টস' শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতীয় মুসলমানদের সর্বনাশের কথা অতি সূক্ষ্মরূপে আলোচনা করিয়াছেন। বর্তমান প্রবন্ধে উক্ত প্রবন্ধদ্বয়ের মর্ম প্রকাশিত হইল।"

আমীর আলীর অবদানের কথা স্মরণ করে আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী লিখেছেন, "অনারেবল আমীর আলী সাহেবের পাণ্ডিত্য ও বিজ্ঞতা এবং স্বজাতির হিতচিন্তার কথা নূতন আর কি বলিব? ইনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহারথী এবং বিশেষ চিন্তাশীল।... 'লাইফ অব মহম্মদ' এবং 'স্পিরিট অব ইসলাম' প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি যে অসাধারণ ও জাতীয় জ্বলন্তভাব প্রকাশ করিয়াছেন, শতাব্দীর পরও তেমন কেহ চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ স্থল।" শেখ আবদোস সোবহান তাঁর 'হিন্দু-মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থখানি সৈয়দ আমীর আলীর নামে উৎসর্গ করেন।[৬৪]

দেলওয়ার হোসেন আহমদ (১৮৪০-১৯১২)

হুগলী জেলার দাদপুর থানার বাবনান গ্রামের দেলওয়ার হোসেন আহমদ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট ছিলেন। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল আহমদ, পরে ঐ নাম গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে ১৮৫৮ সালে সিনিয়র স্কলারশিপ পান। ১৮৬১ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে বিএ পাশ করেন। দেলওয়ার হোসেন আহমদ প্রথমে আলিপুর কোর্টের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং পরে ইনস্পেক্টর জেনারেল অব সাবরেজিস্ট্রেশন পদে উন্নীত হন (১৮৯৫)। সে যুগে এটি ছিল বাংলার মুসলমান কর্তৃক অধিকৃত সর্বোচ্চ পদ। তিনি ১৮৯৩ সালে 'খান বাহাদুর' উপাধি পান। ১৯০০ সালে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। বিভিন্ন সরকারি কমিটি ও বেসরকারি সভা-সমিতির সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। ১৮৮০ সালে'এসিয়াটিক সোসাইটি'র সদস্যভুক্ত হন। ১৮৯৭ সালে, 'সেন্ট্রাল টেকসবুক 'কমিটির সদস্য ছিলেন। 'কলিকাতা

৬৪. তথ্যপঞ্জি—

(১) K.K. Aziz (edited)-- Ameer Ali : His Life and Works. Lahore, 1968.
(২) Syed Razi Wasti (edited) --*Memoirs and other Writings of Syed Amir Ali.* 1968
(৩) *Struggle for Independence*, Pakistan Publications, Karachi, 1958
(৪) Jagadish Saran Sharma-- *The National Biographical Dictionary* of India, Starling Publishers Private Limited, New Delhi, 1972
(৫) *হাবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী*—বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮
(৬) পূর্ণেন্দু প্রসাদ ভট্টাচার্য— *ভারতকোষ*, ১খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, কলিকাতা।
(৭) শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ — *আরব জাতির ইতিহাস*, ২ খণ্ড, ব্রাহ্ম মিশন প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৭, ১৩১৯

মহামেডান ইউনিয়ন' (১৯০৩) এবং 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সহ-সভাপতি মনোনীত হন। তিনি ১৮৯৯ সালে বাংলার ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নিযুক্ত হন।

দেলওয়ার হোসেন আহমদ একজন প্রগতিশীল চিন্তাবিদ, সমাজকর্মী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। তাঁর চিন্তার ফসল সেকালের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত কয়েকটি উচ্চমানের ইংরাজি প্রবন্ধে নিহিত আছে।[৬৫] তিনি মুসলমান সমাজ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। বিশেষ করে মুসলমান 'উত্তরাধিকার আইনে'র সংস্কার চেয়েছিলেন এজন্যে যে, সন্তান-সন্ততির মধ্যে ধন-বণ্টনের জন্য মুসলমানরা তাড়াতাড়ি দারিদ্রে পতিত হয়। তিনি অন্য একটি প্রবন্ধে ইসলামের ধর্মনীতিরও সমালোচনা করেছিলেন। এজন্য সমাজে বিতর্কের ঝড় ওঠে। বলা বাহুল্য, রক্ষণশীলরাই প্রতিবাদমুখর হন। ধর্মে ও সমাজে যা আছে, তাই উত্তম ও অভ্রান্ত এরূপ রক্ষণশীল মনোভাবের জন্য সমাজে তাঁর যুক্তি ও চিন্তাকর্মের কোনো সুফল দেখা দেয়নি। তবে তিনি বিদ্বৎসমাজ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন। 'ইণ্ডিয়া আণ্ডার রিপন-এ প্রাইভেট ডায়রী' (১৯০৯) গ্রন্থের লেখক উইলফ্রেড স্কয়েন ব্লান্ট দেলওয়ার হোসেনকে 'সেন্সিবল ম্যান' বলেছেন। ব্লান্ট ১৮৮০-৮১ সালে কলিকাতায় এসে আবদুল লতিফ, সৈয়দ আমীর আলী, দেলওয়ার হোসেন আহমদ প্রমুখের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। দেলওয়ার ব্লান্টের কাছে বাংলার মুসলমান সমাজের শোচনীয় দারিদ্র্য ও বঞ্চনার কথা ব্যক্ত করেন।[৬৬] তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে 'মোসলেম ক্রনিকলে'র (২ মে ১৮৯৬) মন্তব্য— "A gentleman of wide reading, studious habits, and starling worth withal, quite and unobstrussive in nature, he is respected by all classes of people".

আবদুল ওয়ালি (১৮৫৫-১৯২৬)

কলিকাতার এসিয়াটিক সোসইটির সদস্য পদ লাভ, সোসাইটির সভায় প্রবন্ধ পাঠ এবং জার্নালে প্রবন্ধ প্রকাশ করা দেশীয় পণ্ডিতের জন্য উচ্চ গৌরব ও মর্যাদার বিষয় ছিল। আভিজাত্যের ও উচ্চ বিত্তের বলে নয়, বুদ্ধিবৃত্তির গুণে আবদুল ওয়ালি সোসাইটির সান্নিধ্যে যান এবং প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের পণ্ডিত মহলে সুপরিচিত হয়ে উঠেন। ১৯২৬ সালে তাঁর মৃত্যু হলে সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক জোহান ভ্যান ম্যানেন আবদুল ওয়ালির স্মৃতির উদ্দেশ্যে বলেন যে, যৌবনের সূচনা থেকেই তিনি জ্ঞান চর্চা পছন্দ করতেন। ভারতের ইতিহাস ও পুরাতত্ত্ব গবেষণার প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল। বিগত ২৫ বছর

৬৫ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ এরূপ ঃ
(১) দি প্রেজেন্ট ইকনমিক কনডিশন অব *দি বেঙ্গল* , *দি আলীগড় ইনস্টিটিউট গেজেট*, ২৭ নবেম্বর ও ১১ সিডেম্বর ১৮৭৭
(২) *ল' অব টেস্টামেন্টারি সাকসেশন* , *দি মহামেডান অব ইণ্ডিয়া*, *ক্যালকাটা রিভিউ*, ১৮৮২
(৩) মহামেডান অব ইনহেরিটান্স, দি মোসলেম ক্রনিকল , ১৮ জানুয়ারি ১৮৯৬
(৪) পপুলেশন এণ্ড ফুড, ঐ ,১৮ জানুয়ারি, ৫ আগস্ট ও ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬
(৬) এসেজ অন মহামেডান সোস্যাল রিফর্ম, ঐ ১১ জুলাই ১৮৯৬
(৬) এ নোট অন দি মেমন বিল, ঐ ২২ মে ১৮৯৭।

৬৬. Wilfred Scawen Blunt--*India under Ripon--A Private Diary*, London, 1909 P. 115.

ধরে তিনি প্রায় ২০টি প্রবন্ধ সোসাইটি পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। তিনি নিজের খরচে ইসলাম বিষয়ক কয়েকটি প্রবন্ধ ও পুস্তিকা প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রধানত ফারসি ভাষার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন। তিনি ফারসি থেকে ইংরাজিতে এবং ইংরাজি থেকে ফারসিতে একাধিক বিষয় অনুবাদ করেন। তিনি কয়েকটি লেখায় ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের সমকক্ষতা অর্জন করেন।.. তাঁর ব্যক্তিজীবন ও মনন চর্চা সোসাইটির চত্বরে কেন্দ্রীভূত ছিল। জীবনের শেষ ক'টি বছর তিনি সোসাইটির মাসিক সাধারণ সভায় নিয়মিত উপস্থিত থেকে সক্রিয় ভূমিকা নিতেন।[৬৭] সমকালের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থেকে আবদুল ওয়ালি একাগ্রচিত্তে জ্ঞানানুসন্ধান ও জ্ঞানানুশীলন করেছেন। তাঁর আবেদন ছিল মূলত মস্তিষ্কে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ তাঁর সমসাময়িক ছিলেন। তাঁরা ভারতের হিন্দুর জাতীয়তাবাদের ভিতকে দৃঢ় করে তোলেন। আবদুল ওয়ালি ভারতের ও অন্যান্য রাষ্ট্রের মুসলমানের ধর্ম, সমাজ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার করে মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত রচনার প্রয়াস পান। এদিক থেকে আমীর আলীর সাথে তাঁর মিল আছে।

আবদুল ওয়ালি খুলনা জেলার শরুলিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আবদুর রউফ মুন্সেফ ছিলেন। তাঁর পিতামহ মোল্লা নঈম ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পারস্য-আরবির অধ্যাপক ছিলেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে এন্ট্রাস এবং সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে এফ এ পাশ করেন। প্রেসিডেন্সী কলেজে বি-এ পড়ার সময় তাঁর সহোদর ও অভিভাবক আবদুল মতিনের মৃত্যু হয়। আবদুল ওয়ালি পাঠ অসমাপ্ত রেখে রুরাল সাব-রেজিস্ট্রারের চাকুরি গ্রহণ করেন (১৮৮৪)। ১৯০২ সালে তিনি স্পেশাল সাব-রেজিস্ট্রার হন, ১৯১০ সালে জেলা-সাব-রেজিস্ট্রার পদে উন্নীত হন। অতঃপর রেজিস্ট্রেশন অফিসের ইন্সপেক্টর হিসাবে ১৯১৫ সালে অবসর গ্রহণ করেন। ১৯১২ সালে তিনি পণ্ডিত্য ও ব্যক্তিগত গুণাবলীর কারণে সরকার কর্তৃক 'খান সাহেব' উপাধি পান।[৬৮]

আবদুল ওয়ালির মূল প্রবণতা ছিল ইতিহাস ও পুরাতত্ত্বের দিকে। এজন্য ঐতিহাসিক চরিত্র, পুরাকীর্তি ও জাতিতত্ত্বের কথা বেশি আলোচিত হয়েছে। তবে সমকালের জীবনধারা, চেতনাপ্রবাহ ও সমস্যাবলী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিলেন না। জাতীয় জীবনের আবেগ, উদ্দেশ্য ও সমস্যাকে স্পর্শ করে, এমন রচনাও তাঁর আছে। 'এথনোগ্রাফিকাল নোট্স অন দি মহামেডান কাস্টস্ অব বেঙ্গল' (১৯০৪) এবং 'দি কজ অব ব্যাকওয়ার্ডনেস অব দি মহামেডান অব বেঙ্গল ইন এডুকেশন' (১৯০৭) প্রবন্ধ দুটি খুবই মূল্যবান। হান্টার, জেমস ওয়াইজ, খোন্দকার ফজলে রাব্বি, দেলওয়ার হোসেন আহমদ প্রমুখ বাংলার মুসলমানের জাতিতত্ত্ব ও আত্ম-পরিচয় সম্পর্কে যে আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন, আবদুল ওয়ালির রচনায় তার প্রতিধ্বনি আছে। শিক্ষা-বিষয়ক দ্বিতীয় প্রবন্ধটি ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় 'অল ইণ্ডিয়া মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে'র ত্রয়োদশ বার্ষিক অধিবেশনে লেখক পাঠ করেন। এটি পরিবর্ধিত আকারে মোসলেম

৬৭. *Proceedings of the Asiatic Society of Bengal for 1926*, pp. CLXXIV--V.

৬৮ Mohammad Sharif Hossani --*An Introduction to the Life and Works* of Maulvi Abdul Wali 'Folklor', No. 2-3 January 1978, pp. 38-42

ইনস্টিটিউট জার্নালে প্রকাশিত হয়। কোম্পানির ভূমি-সংস্কার ও নতুন রাজনীতির প্রবর্তন এবং পুরাতন শিক্ষার পদ্ধতি ও ইংরাজি ভাষার প্রবর্তনের ফলে মুসলমান ধনী ও শিক্ষিত পরিবারগুলি ধ্বংস হয়ে যায়। অত্যধিক দারিদ্র্যের কারণে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়ে মুসলমান সমাজ পিছিয়ে পড়ে বলে আবদুল ওয়ালি অভিমত ব্যক্ত করেন।[৬৯] তাঁর অন্যান্য প্রবন্ধ ও পুস্তিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল (ক) অন কিউরিয়াস টেনেটস এণ্ড প্র্যাক্‌টিসেস অব এ সার্টেন ক্লাস অব ফকিরস্ ইন বেঙ্গল (১৯০০), (খ) মুণ্ডারি সংস (১৯০৭, (গ) দি বাহমনি ডাইন্যাষ্টি (১৯০৯), (ঘ) দি এন্টিকুইটিজ অব বার্ডওয়ান (১৯১৭); (ঙ) হিন্দুইজম একর্ডিং টু মুসলিম সুফিজম (১৯২৩), (চ) নোটস অব আর্কিওজিক্যাল রিমেন্স্ ইন বেঙ্গল (১৯২৪), (ছ) আওরঙ্গজেবস রিলেসনস্ উইথ রাজপুতস্, মারাটাজ এণ্ড আদার্স (১৯২৫) ইত্যাদি।

ফারসি ভাষায় আবদুল ওয়ালির অসামান্য দক্ষতা ছিল। তাঁর অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ব বিষয়ক প্রবন্ধের উৎস ফারসি পুস্তক ও নথিপত্র। তিনি ফারসি ভাষায় কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন, যেমন (ক) ফেসানা-এ-দিলকস (কলিকাতা, ১৮৭৭), (খ) ওয়াকায়ে তাসাল্লতে রাশিয়া বার এশিয়া ওয়া বিলায়েত খানানে তুর্কিস্তান (আগ্রা, ১৯০০) প্রভৃতি। ফারসি ভাষায় দক্ষতা ও জ্ঞানের জন্য তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' থেকে 'স্বর্ণপদক' লাভ করেন। আবদুল ওয়ালি উর্দু ও বাংলা ভাষা জানতেন। তাঁর বাংলা লেখার কোনো নিদর্শন নেই। সে যুগে উচ্চ শিক্ষিত হিন্দু বুদ্ধিজীবীর সহিত তুলনায় মুসলমান বুদ্ধিজীবীর এখানে বিরাট পার্থক্য ছিল। ইংরাজি-ফারসি অনভিজ্ঞ ব্যক্তি তাঁদের জ্ঞান ও চিন্তার বিষয় সরাসরি উপলব্ধি ও আস্বাদন করতে পারেনি।

হেমায়েতউদ্দীন আহমদ (১৮৬০-১৯৪১)

বরিশাল নিবাসী হেমায়েতউদ্দীন আহমদ শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। তিনি ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে বিএ এবং ১৮৯১ সালে বি. এল. পাশ করেন। ঢাকা মাদ্রাসায় কিছুদিন শিক্ষকতা করার পর তিনি বরিশাল জজকোর্টে সরকারি উকিল নিযুক্ত হন। তিনি বাকী জীবনে ঐ পেশাতেই নিরত ছিলেন। তিনি বরিশালের 'আঞ্জমনে হেমায়েত ইসলামে'র (১৮৯৩) প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৫ সালে শহরে যে 'বেল ইসলামিয়া হোস্টেল' নির্মিত হয়, তাতে তাঁর অবদানই ছিল সর্বাধিক। 'মিহির ও সুধাকর' (১ কার্তিক ১৩০৮) লিখেছে, "বেল ইসলামিয়া বোর্ডিং তাঁহার (হেমায়েতউদ্দীন) অকাতর পরিশ্রম ও আত্মোৎসর্গের উৎকৃষ্ট ফল। তিনি বোর্ডিং-এর জীবন ও বল।" ঢাকার 'ডাফরিন হোস্টেল' নির্মাণেও তিনি প্রধান ভূমিকা পালন করেন। স্বসমাজে শিক্ষা বিস্তার ও অগ্রগতির জন্য তিনি নানা পন্থা অবলম্বন করতেন। বরিশাল কেন্দ্র থেকে

৬৯. Abdul Wali-- 'The cause of backwardness of the Muhammedan of Bengal in education' , *The Journal of the Moslem Institute*, Vol 11, No. 4, April-June 1907, p. 294

যেসব মুসলমান ছাত্র এন্ট্রান্স পরীক্ষা দি'ত, তিনি তাদের সন্ধ্যা-পার্টিতে আমন্ত্রণ জানিয়ে উৎসাহিত করতেন। তাঁরই উদ্যোগে ও চেষ্টায় বরিশালের 'আসমত আলী খান ইনস্টিটিউশন' (১৯১৩) স্থাপিত হয়। তিনি দীর্ঘকাল জেলা স্কুল কমিটির সম্পাদক ও ব্রজমোহন কলেজ কাউন্সিলের সদস্য ছিলেন। ঋণ ভারগ্রস্ত কৃষকদের মুক্তির জন্য বরিশালে 'কো-অপারেটিভ ব্যাংক' (১৯৩২) স্থাপন তাঁর একটি মহৎ কীর্তি। 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র সহকারী সম্পাদক ও 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র মফস্বল সভ্য মনোনীত হন। বরিশাল শহরে তাঁর নামে একটি খেলার মাঠ ও একটি প্রধান সড়ক আছে।[৭০]

সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২-১৯২২)

কুমিল্লা জেলার ব্রাহ্মণবাড়িয়ার গোকর্ণ গ্রামের 'সৈয়দ পরিবারে' জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শাহ্ সৈয়দ রিয়াজতুল্লাহ্ কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ফারসি 'দূরবীন' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। সৈয়দ শামসুল হোদা মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি হুগলী কলেজ থেকে এন্ট্রান্স এবং প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এল. (১৮৮৬) পাশ করেন। ১৮৮৯ সালে প্রাইভেট ছাত্র হিসাবে ফারসিতে এম. এ. পাশ করেন। তিনি কিছুদিন কলিকাতা মাদ্রাসায় আরবি-ফারসি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষকতা করার পর ১৮৮৭ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। তিনি আইনজীবী হিসাবে সুনাম অর্জন করেন এবং ১৯১৭ সালে জজের পদে উন্নীত হন। একদিকে ওকালতি ও অন্যদিকে শিক্ষা, সমাজ ও সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত থেকে তিনি নিরলস ভাবে কাজ করে গেছেন। মুসলমান সমাজের দুঃস্থ জনগণের অনেক মামলা বিনা পারিশ্রমিকে পরিচালনা করতেন। শ্যামবাজারের 'টালা দাঙ্গা'য় অভিযুক্ত মুসলমান আসামীদিগের পক্ষ থেকে ওকালতি করেন। ইসলাম-প্রচারক (আশ্বিন ১২৯৮) লিখেছে, 'এই মোকদ্দমায় হাইকোর্টের মাননীয় স্বজাতিবৎসল উকিল জনাব মৌলবী সৈয়দ শামসুল হোদা এম. এ, বি. এল. সাহেব যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম, যত্নচেষ্টা ও স্বার্থত্যাগের জ্বলন্ত উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছেন, তাহা মুসলমান মাত্রেরই অনুকরণীয়।" তিনি ১৮৯৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটর এবং ১৯০২ সালে ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিষয়ক 'টেগোর ল' অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সভাপতি মনোনীত হন। তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সদস্য ছিলেন। কলিকাতার 'কারমাইকেল হোস্টেল' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের তিনি মূলশক্তি

৭০. **তথ্যপঞ্জি** —
(১) *Who's who in India,* Lucknow, 1912, PP. 83-84
(২) *The Moslem Chronicle*, 4 April 1895
(৩) সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়— *বরিশাল জেলা ইসলামিয়া হোস্টেল*, বরিশাল, ১৯৪০
(৪) *গুলবাগ*, ১ম সংখ্যা, বরিশাল, ১৩৫২।

ছিলেন। মুসলমানদের জন্য কলেজ স্থাপনের আন্দোলনেও তিনি নেতৃত্ব দেন। এর ফলে ওয়েলেসলি স্ট্রিটের ইসলামিয়া কলেজের জন্য ৯ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূমি কেনা হয়। কলিকাতার 'কড়েয়া মুসলিম বয়েজ স্কুল' তাঁরই উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুলের পরিচালনা কমিটির সদস্য ছিলেন। ঐ স্কুলের জন্য সরকারি অর্থ সাহায্যের সুপারিশ করতেন তিনি। ঢাকা বিশ্বদ্যিালয়ের প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর যথেষ্ট অবদান আছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬ জন প্রতিষ্ঠাতা সদস্যের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম সদস্য। শিক্ষা বিভাগের চাকুরিতে মুসলমানদের নিয়োগের জন্যও তিনি বিভিন্ন সময়ে সরকারের কাছে সুপারিশ করেন। এসব কর্ম প্রয়াস মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারে সুদূর প্রসারী প্রভাব ফেলে। উল্লেখযোগ্য যে, কলিকাতার বাংলা পত্রিকা 'সুধাকর' (মাসিক) এবং ইংরাজি পত্রিকা 'দি মহামেডান অবজারভার' (সাপ্তাহিক) প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি এক সময় 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকার স্বত্ব ক্রয় করে সেটি পরিচালনা করতেন। তিনি 'উর্দু গাইড প্রেস' নামে একটি মুদ্রাযন্ত্র ক্রয় করেন। সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর আকর্ষণ উত্তরাধিকার সূত্রেই জন্মেছিল। তিনি রাজনীতির সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। ১৯২২ সালে নিখিল ভারত মুসলিম লীগের সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি সুবক্তা ও তার্কিক ছিলেন। ছোটলাট আলেকজান্ডার ম্যাকেঞ্জি তাঁর বাগ্মিতার পরিচয় পেয়ে তাঁকে বাংলার প্রাদেশিক কার্যকরী সভার সদস্য মনোনীত করেন। এরূপ সম্মান বাঙালি মুসলমানের মধ্যে তিনিই প্রথম পান। ১৯১০ সালে পূর্ববঙ্গের মুসলমান প্রতিনিধি হিসাবে ভারতীয় আইনসভার সদস্য হন। ঠাকুর আইন অধ্যাপক হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রিন্সিপলস অফ ক্রাইমস ইন ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া' বিষয়ে একাধিক বক্তৃতা দেন। এতেই তিনি আইনবিশেষজ্ঞ হিসাবে সুনাম অর্জন করেন। ১৮৯৫ সালে 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে 'ইণ্ডিয়ান পলিটিক্স এ্যাণ্ড দি মহামেডানস' শীর্ষক ইংরাজি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইংলণ্ডের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় তাঁর লেখা মুদ্রিত হয়।

বহুমুখী কর্মসূচিব পুরস্কার স্বরূপ সৈয়দ শামসুল হোদা ব্রিটিশ সরকারের নিকট থেকে ১৯১৩ সালে 'নবাব' ও ১৯১৫ সালে 'কে. সি. আই. ই.' উপাধি লাভ করেন। মধ্যবিত্তের সন্তান হয়ে কেবল বুদ্ধিবৃত্তির গুণেই তিনি পদমর্যাদা ও উচ্চ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন। শিক্ষা বিভাগে সহকারী মুসলিম পরিচালক ও মুসলিম শিক্ষা পরিদর্শকের পদ সৃষ্টি তাঁর উদ্যোগের ফল। তিনি স্ত্রীর নামে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ছাত্রদের জন্য 'আসমাতন্নেসা ছাত্রাবাস' স্থাপন করেন। গোকর্ণে 'ওয়ালী উল্লা উচ্চ বিদ্যালয়' স্থাপনেও তাঁর অবদান রয়েছে।[৭১]

৭১. তথ্যপঞ্জি –
(১) Syed Martuza Ali--*Personality Profile*, Dhaka, 1965, PP. 31-33
(২) মোহাম্মদ ইদরিস আলী—*মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ*, ঢাকা, ১৯৬৫
(৩) মোশফেকা মাহমুদ— *পত্রে রোকেয়া পরিচিতি*, ঢাকা, ১৯৬৫

আবদুস সালাম (১৮৬১-১৯৪১)

আবদুস সালাম যশোহর জেলার শীর গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন।[৭২] তিনি সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে বি. এ. (১৮৮৩) এবং ইংরাজিতে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৮৯৩ সালে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হন এবং পরে প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট পদে উন্নীত হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৩-৮৪ সালে কেন্দ্রীয় ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের কার্য নির্বাহক কমিটির সদস্য, পরে ঐ সমিতির সম্পাদক হন।[৭৩] ১৮৯৫ সালে এসিয়াটিক সোসাইটির সদস্যভুক্ত হন। ছাত্রাবস্থায় সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় প্রবন্ধ লিখে তিনি 'স্বর্ণপদক' পান (১৮৮২)। এর পর তিনি 'উরফি' ও 'সিহনসর-ই-জহুরি' নামে দুখানি গ্রন্থের ইংরাজি অনুবাদ করেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি গোলাম হোসেন সলিমের বিখ্যাত ফারসি গ্রন্থ 'রিয়াজ-উস-সলাতিনে'র (১৭৮৬-৮৮) ইংরাজি ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদনা। এটি প্রকাশ করে তিনি সে যুগের বিদ্বৎসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটি 'রিয়াজউস সলাতিন অর এ হিষ্টরি অব বেঙ্গল' (১৯০৪) নাম দিয়ে এটি প্রকাশ করে। আবদুস সালাম অনুবাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন, "For my labours, such as they have been, I shall, however, feel amply rewarded if these pages in any measure contribute to awaken amongst my co-religionists in Bengal an enlightened consciousness of the historic past, coupled with an earnest longing in the present to avail themselves of the opportunity afforded by a progressive and beneficent Government for the future social and intellectual regeneration ; and also if they widen the mutual sympathies of the two great nationalities in Bengal by infusing sentiments of closer and more cordial comradeship, in that they have been fellow-traveller over the same tract for many long centuries and although not least, if they evoke the stympathetic interest."[৭৪] সহধর্মিনী জান্নাতুন্নেসা বেগমকে তিনি গ্রন্থটি উৎসর্গ করেন।

আবদুস সালামের ভ্রাতা আবদুল হামিদ বি. এ. ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত সাপ্তাহিক 'দি মোসলেম ক্রনিকলে'র সম্পাদক ছিলেন। 'মোসলেম ক্রনিকল' সে সময়

(৪) *The Moslem Chronicle,* 12 September 1895.
(৩) *ইসলাম প্রচারক,* আশ্বিন ১২৯৮
(৬) *মিহির ও সুধাকর,* ৩০ ভাদ্র ১৩১২
(৭) *নকীব,* কুমিল্লা, ১৯৭৫

৭২. সতীশচন্দ্র মিত্র— *যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ২য় খণ্ড,* কলিকাতা, ১৯৬৫ (২ সং, শিবশঙ্কর মিত্র সম্পাদিত), পৃ. ৮৪৮

৭৩. *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,* পৃ. ৭৭

৭৪. Riyazus Salatin or a History of Bengal of Ghulam Hussain Salim by Maulvi Abdus Salam, Bengal Provincial Civil Service, Member of A. S. B. Author of Translations of Urf and Sih-Nasri-Zahuri, Asiatic Society, Calcutta, 1904.

মুসলমান সম্পাদিত একমাত্র ইংরাজি পত্রিকা ছিল। তিনি সেই সুবাদে কলিকাতার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন। সেকালের সমাজ ও শিক্ষা সংগঠনমূলক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বাহাওয়ালপুর কলেজের অধ্যক্ষ হন।[৭৫]

আবদুল আজিজ (১৮৬৩-১৯২৬)

নোয়াখালী জেলার ফেনী মহকুমার পরশুরাম থানার অন্তর্গত উত্তরগুথুমা গ্রামের অধিবাসী আবদুল আজিজ বিদ্যাবত্তা ও সৎকর্মের গুণে সমাজে সুনাম ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁর পিতা আমজাদ আলী চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনারের পেস্কার (পরে পারসনাল এ্যাসিস্ট্যান্ট) ছিলেন। তিনি ইংরাজি জানতেন। আমজাদ আলী ও তমিজউদ্দিন পরস্পর বৈবাহিক ছিলেন।

আবদুল আজিজ ১৮৮৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন, ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর সংগঠনশক্তির প্রকাশ ঘটে। হিম্মত আলী, হেমায়েতউদ্দীন, আব্দুল মজিদ, জোহাদর রহিম জাহিদ, আবদুল আজিজ একত্রে মিলে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' (১৮৮৩) প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নোয়াখালীর 'আঞ্জমনে আশাআতে ইসলাম' (১৮৯৬) প্রতিষ্ঠার সাথেও তিনি জড়িত ছিলেন। স্কুল সাব ইনস্পেক্টর হিসাবে যখন চট্টগ্রামে ছিলেন তখন সেখানে 'মোসলমান শিক্ষাসভা' (১৮৯৯) স্থাপন করে তিনি এর সম্পাদক হিসাবে কাজ করেন। চট্টগ্রাম শহরের 'ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল' তাঁর উদ্যমের ফল। এছাড়া, 'কবিরুদ্দিন মেমোরিয়াল লাইব্রেরী', 'ফ্রি ইসলামিয়া রিডিং রুম' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারেও তাঁর অবদান ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্বে প্রায় দুলক্ষ টাকা মূল্যের সম্পত্তি জনহিতে ওয়াকফ করে যান।[৭৬] আবদুল আজিজ ১৮৮৮ সালে শিক্ষক হিসাবে প্রাদেশিক সরকারের শিক্ষা বিভাগে যোগদান করেন ; ১৯১০ সালে সাবস্কুল-ইনস্পেক্টর পদ লাভ করেন। আবদুল আজিজের শিল্পীসুলভ মন ছিল। ওবায়দুল্লা আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দীর স্মরণে 'ওবেদী বিয়োগ' (১৮৮৪) তাঁর রচনা। ৮ পৃষ্ঠার এই শোক পুস্তিকাটি ঢাকার গিরিশ প্রেসে ছাপা হয়।[৭৭] 'মায়াদনোল উলুম' (১৮৯২,২য় সং) নামে আর একখানি অনুবাদ গ্রন্থ তিনি লিখেছিলেন। এটি মুসলমান সমাজের ধর্মীয় ও সামাজিক আচরণ-বিধি সংক্রান্ত পুস্তক।[৭৮] 'কবিতা কলিকা' (১৮৮৫) তাঁর অপর কাব্যগ্রন্থ।[৭৯]

কর্মদক্ষতা ও শিক্ষানুরাগিতার পুরস্কার স্বরূপ তিনি সে যুগের সম্মানিত পদবী 'খান বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তিনি মন্ত্রী হবীবুল্লাহ্ বাহার ও তদভগ্নী শামসুন্নাহার মাহমুদের মাতামহ ছিলেন। তিনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। কাজী নজরুল ইসলামের 'বাংলার আজীজ' কবিতাটি তাঁর স্মৃতি উপলক্ষে রচিত।[৮০]

৭৫. *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ৮৩
৭৬. *হবীবুল্লাহ্ বাহার রচনাবলী* ; পৃ. ৩৮৪-৭৫ ; মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ, পৃ. ৭৯
৭৭. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ২য় ত্রৈমাসিক খতিয়ান, ১৮৮৫
৭৮. *ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ১
৭৯. *হবীবুল্লাহ্ বাহার রচনাবলী*, পৃ. ৩৭২
৮০. *মাসিক মোহাম্মদী*, কার্তিক ১৩৩৪

আবদুল আজিজ নামে অপর এক ব্যক্তি ১৮৮৭ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন। তিনি শিক্ষক হিসাবে পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তিনি সম্ভবত উড়িষ্যার কটক কলেজে ছিলেন। তিনি 'আরব্য ও পারস্য মধুপাক' (১৮৯১) নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২)

তিনি মেদিনীপুরে ধনী জমিদার পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমে মেদিনীপুর সরকারি হাইস্কুল ও পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে শিক্ষা লাভ করেন। ঐ কলেজ থেকে ১৮৮৫ সালে বি. এ. এবং ১৮৮৬ সালে ইংরাজিতে এম. এ. পাশ করেন। ভূপালের বেগম সাহেবা বিলাতে আইন পরীক্ষার্থীদের জন্য যে বৃত্তির ব্যবস্থা করেন, আবদুল রহিম সে বৃত্তিলাভ করে বিলাত গমন করেন। ১৮৯০ সালে ব্যারিস্টারি পাশ করেন। দেশে প্রত্যাবর্তন করে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় শুরু করেন। আবদুর রহিম ১৯০০–০৩ সাল পর্যন্ত কলিকাতা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট পদে বহাল ছিলেন। ১৯০৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ঠাকুর আইন অধ্যাপক' নিযুক্ত হন। তিনি ঐ সময় মুসলমান ব্যবহার শাস্ত্র সম্পর্কে যেসব বক্তৃতা দেন, সেগুলি পরে 'প্রিন্সিপলস্ অব মহামেডান জুরিস্প্রুডেন্সেস' নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৯০৬ সালে সিমলা ডেপুটেশনে তিনি একজন প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন। ঐ বছর ঢাকায় মুসলিম লীগের পত্তনে ও লীগের গঠনতন্ত্র প্রণয়নে তাঁর দান অগ্রগণ্য ছিল। ১৯০৮ ও ১৯১৫ সালে দু'বার মাদ্রাজের হাইকোর্টের পিউনি জজ নিযুক্ত হন। এরপর বাংলা সরকারের কার্যকরী সভার সদস্য (১৯৩৩) ও সভাপতি ছিলেন। তিনি ১৯৫২ সালে করাচীতে মৃত্যুবরণ করেন।

বরাবর উচ্চপদে সমাসীন থাকার ফলে তাঁর গণসংযোগ বড় একটা হয়নি। ১৮৯৬ সালে স্থাপিত কলিকাতার 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশনে'র যুগ্ম–সম্পাদক হিসাবে ঐ এসোসিয়েশনের কর্মসূচি প্রতিপাদনে তাঁকে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায়। পরে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালে তিনি 'কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা' নামে একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। উক্ত সভার মাধ্যমে তিনি কলিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে একটি 'আদর্শ মক্তব' স্থাপন করেন। মক্তবে শিক্ষার মাধ্যমে উর্দু ভাষা গৃহীত হওয়ায় 'মিহির ও সুধাকর' আবদুর রহিমকে আক্রমণ করে। আবদুর রহিম বাংলা লিখেছেন, এমন নিদর্শন পাওয়া যায় না। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম ট্রাস্টি ছিলেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত বঙ্গ-বিচ্ছেদ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই। তিনি বাংলা সরকারের মন্ত্রীত্ব ও অন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল থেকে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান নবজাগৃতির একজন প্রবক্তা হিসাবে কাজ করেছেন।[৮১]

আবদুর রসুল (১৮৭০-১৯১৭)

একজন প্রখর বুদ্ধিদীপ্ত রাজনৈতিক তরুণ নেতা হিসাবে ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের ভাবমূর্তি আজও অম্লান। বিদেশী শাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি তথা স্বাধীনতা লাভ তাঁর রাজনৈতিক জীবনের প্রধান স্বপ্ন ছিল। বাঙালি জাতীয়তাবোধ তাঁর মধ্যে স্ফূরিত হয়েছিল যার জন্য তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বলা বাহুল্য, তিনি কংগ্রেসের নীতির প্রতি আস্থা রাখতেন ; তিনি ১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ঐ সভায় রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বঙ্গ-ভঙ্গ সমর্থন করেন নি ; হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত শক্তিকে দুর্বল এবং জাতীয় চেতনাকে খণ্ডিত করার ষড়যন্ত্র হিসাবে তিনি এটাকে দেখেছিলেন। এজন্য তিনি স্বসমাজের স্বার্থবাদী মানুষের কাছে নিন্দার ভাগী হন।

আবদুর রসুল কুমিল্লার গুণিয়াউকের জমিদার পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা গোলাম রসুল প্রভাবশালী জমিদার ছিলেন। আবদুর রসুল অল্প বয়সে পিতাকে হারান, মা সন্তানকে সুশিক্ষিত করার দায়িত্ব নেন। এ সময় তাঁরা কিশোরগঞ্জে বসতি স্থাপন করেন। আবদুর রসুল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল থেকে ১৮৮৮ সালে প্রথম বিভাগে এন্ট্রান্স পাশ করেন এবং ঐ বছর উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলাতে গমন করেন। তিনি ১৮৯২ সালে লণ্ডনের কিংস কলেজ থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন ; ১৮৯৬ সালে অক্সফোর্ডের সেন্ট জোনস কলেজ থেকে বিএ এবং ১৮৯৮ সালে এম. এ. পাশ করেন। ঐ বছর তিনি মিডল টেম্পল থেকে বার-এট-ল ও বি সি এল ডিগ্রী লাভ করেন। ১৮৯৮ সালেই তিনি দেশে ফিরে এসে কলিকাতা হাইকোর্টে আইনজীবী হিসাবে যোগদান করেন। তিনি যোগ্যতা, দক্ষতা ও কর্মনিষ্ঠার গুণে আইন বাবসায়ে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এন্ট্রান্স পরীক্ষার ইংরাজি পত্রের প্রধান পরীক্ষক নিযুক্ত হন (১৮৯৯-১৯০২)। কলিকাতার ইংরাজি সাপ্তাহিক 'দি মুসলমান' (স্থাপিত ৬ ডিসেম্বর ১৯০৬) আবদুর রসুলের পৃষ্ঠপোষকতা, অর্থানুকূল্য ও প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। তিনি সময় সময় ঐ পত্রের সম্পাদকীয় নিবন্ধও রচনা করতেন। সাম্প্রদায়িকতা-মুক্ত

৮১. তথ্যপঞ্জি –
(১) ভারতকোষ (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, পৃ. ৩০০-০১
(২) *The Moslem Chronicle*, 23 May 1896 (Supplementary).
(৩) *মিহির ও সুধাকর*, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯
(৪) *Struggle for Independence*, P. 49

দৃষ্টিভঙ্গি অক্ষুণ্ন রেখে পত্রিকাখানি সে যুগে সমাজের জাগরণের বিশেষ দায়িত্ব পালন করে গেছে। আবদুর রসুল বিদেশী মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। জীবনের মধ্যগগনে অকাল মৃত্যু হলে তাঁর আদর্শ চিন্তা ও কর্মে ছেদ পড়ে। হিন্দু-মুসলমান দুটি জীবন-প্রবাহকে একত্রে বেঁধে দেওয়ার স্বপ্নও দূরীভূত হয়।[৮২]

সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০-১৯৩৪)

কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন একজন উৎসাহী বুদ্ধিজীবী হিসাবে কলিকাতার বিদ্বৎসমাজে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। এটা তাঁর কর্মোদ্দীপনা ও প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। তিনি ১৮৮৯ সালে রিপন কলেজ থেকে বি. এল পাশ করেন। 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' ও ইউনিয়নের আশ্রয়ে গঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই সম্পাদক হিসাবে গুরু দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিশেষ করে, 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' তাঁরই উদ্যোগে এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জন্ম লাভ করে। সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যসমূহ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করে সমিতির নামযুক্ত প্রচারপত্রটি (ইংরাজী ও বাংলা) তিনিই প্রণয়ন করেন। পুস্তিকাটির উপর ভিত্তি করে মির্জা আবদুল ফজল 'নবনূরে' (শ্রাবণ ১৩১০), মন্তব্য করেন, "এই অধ:পতিত সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে তিনি (ওয়াহেদ হোসেন) যেরূপ প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে কতকটা কৃতকার্যতার আশা করা যাইতে পারে। এজন্য তিনি সমগ্র মুসলমান সমাজের ধন্যবাদের পাত্র।" কলিকাতার 'মুসলিম গার্লস মাদ্রাসা' (১৮৯৭) নামে প্রথম একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেনের অপর্যাপ্ত দান ছিল। 'মোসলেম ক্রনিকলে'র (১৬ জানুয়ারী ১৮৯৭) অভিমত, তাঁরই উদ্দীপনা ও পরিশ্রমের ফলে বিদ্যালয়টি অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল। কলিকাতার আমহার্স্ট স্ট্রিটের জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসাবেও তিনি কাজ করতেন। কলিকাতার গ্রীয়ার পার্কে 'আঞ্জুমানে ওয়ায়েজিন' (১৩১৭) নামক প্রতিষ্ঠানটি তাঁর ও শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ কতিপয় সমাজ সেবকের প্রযত্নে স্থাপিত হয়। পরবর্তীকালে সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন অসহযোগ আন্দোলন ও খিলাফত আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে কংগ্রেসের সেবা করে কারাবরণ করেন। এরপর স্বরাজ্য দলে যোগদান করে তিনি বাংলা কাউন্সিল ও কর্পোরেশনে প্রবেশ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি বেঙ্গল প্রেসিডেন্সী মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন' (১৯০২) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য যে ৫ জন মুসলমানের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন, ওয়াহেদ হোসেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন। 'তালিমে উর্দু' নামে উর্দু শিক্ষা বিষয়ক পুস্তক এবং ইংরাজিতে ইসলাম ধর্মমূলক গ্রন্থ রচনা করেন।

৮২ তথ্যপঞ্জি –
(১) *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ১০৫-১১৩
(২) Who's Who in India, 1911, P. 127

আইনের উপর গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখে তিনি তিন বার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অনাথনাথ দেব পুরস্কার' লাভ করেন। তাঁর পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রবন্ধ তিনটি ছিল যথাক্রমে 'Theory of Sovereignty in Islam (1931), Administration of Justice in Moghal India (1932) ও Labour Legislation in British India (1937)। শেষের পুরস্কার ছিল মরণোত্তর। তিনি স্যার সৈয়দ আহমদের মৃত্যু উপলক্ষে 'অশ্রুপহার' নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তকও প্রণয়ন করেন।[৮৩]

আবু নসর ওহীদ (১৮০৭-১৯৫৩)

আবু নসর ওহীদ মুখ্যত একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি শ্রীহট্ট শহরে এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ জাবিদ বখত ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। 'কবি' হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। শ্রীহট্টের সরকারি হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং মুরারিচাঁদ কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করেন (১৮৯২)। ১৮৯৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে আরবিতে এম. এ. পাশ করেন। তিনি প্রথমে শ্রীহট্টের সরকারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে কলিকাতা মাদ্রাসা ও গৌহাটি কটন কলেজের অধ্যাপক হন (১৯২১)। ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। ১৯২১ সালে এডুকেশন সার্ভিসে উন্নীত হন। ঐ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হলে আরবি ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। কর্মজীবনে শিক্ষকতার সাথে সাথে শিক্ষা সংস্কারের প্রয়াস চালিয়ে যান। মাদ্রাসার পাঠ্যসূচি এমন যে, মাদ্রাসা শিক্ষার শেষে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় না। ইংরাজি শিক্ষার অভাব ও পাঠ্যবস্তুর অসমতার জন্যই এরূপটি হত। এজন্য আবু নসর ওহীদের প্রথম চেষ্টা হল কিভাবে মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি বিধান করা যায়। তিনি তদানীন্তন ছোটলাট স্যার ব্রুমফীল্ড ফুলারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং 'রিফর্মড মাদ্রাসা স্কীমে'র প্রস্তাব দেন। তাঁর এই নতুন চিন্তাধারা কার্যে রূপান্তরিত করার জন্য নবাব সলিমুল্লাহ্, নওয়াব আলী চৌধুরী ও সৈয়দ শামসুল হোদা তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন। আবু নসর ওহীদ মিসর, সিরিয়া, তুরস্ক প্রভৃতি মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশের শিক্ষা-পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করার জন্য ঐসব দেশ ভ্রমণ করেন। ১৯০৭ সালে তিনি দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯০৮ সালে ঢাকা, চট্টগ্রাম, হুগলী মাদ্রাসায় পরীক্ষামূলকভাবে 'নিউ স্কীম' পদ্ধতিতে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয়। এর পশ্চাতে আবু নসর ওহীদের অবদান ছিল বেশি। গতানুগতিক শিক্ষা

৮৩. তথ্যপঞ্জি –
(১) ১৩২২ *বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পত্রিকা,* বাঁকীপুর, ১৩২৩
(২) এস. ডব্লিউ. হোসেন—বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন, কলিকাতা, ১৯০৩
(৩) Muslim Community in Bengal, P. 91.
(৪) *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র,* পৃ. ১২৫
(৫) *বুলবুল,* ৩ বর্ষ, ৯ সংখ্যা, পৌষ, ১৩৪৩
(৬) *The Calendar* (Calcutta University) 1942, P. 184.

ব্যবস্থা যুগের চাহিদা মিটাতে পারছে না, সে যুগের দু'একজন প্রগতিশীল চিন্তানায়কের মত তিনিও তা উপলব্ধি করেন এবং এর সংস্কারের জন্য আন্দোলন করেন। তিনি বহু শ্রম স্বীকার করে এবং বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তারপর এই নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে সক্ষম হন। এটাই তাঁর জীবনের জ্ঞান-সাধনা ও তাঁর চিন্তাকর্মের প্রধান কীর্তি। মাদ্রাসা শিক্ষার উপযোগী করে 'বাকুরাতুল আদাব' নামক দু'খানি আরবি প্রাইমার গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বাংলা, ইংরাজি, ফারসি ও আরবিতে পারদর্শী ছিলেন। তিনি ১৯০১ সালে 'শামসুল ওলামা' উপাধিতে ভূষিত হন।[৮৪]

মির্জা সুজাত আলী বেগ

ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রতাপশালী দেওয়ান মোহাম্মদ রেজা খানের বংশধর মির্জা সুজাত আলী বেগ মুর্শিদাবাদের সাহেবজাদী বেগম শামসি জাহান ফেরদৌস মহলের দেওয়ান ও সেক্রেটারী ছিলেন। তিনি সেকালে কলিকাতার সাংস্কৃতিক জীবনের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সভাপতি ছিলেন। ১৮৯৯ সালের 'মুসলমান শিক্ষা সম্মেলন'কে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য জনমত গঠনে ও চাঁদা সংগ্রহে তিনি এবং সৈয়দ শামসুল হোদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা প্রমুখ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। উক্ত সম্মেলন উপলক্ষে কবি মোজাম্মেল হক 'জাতীয় সঙ্গীত' নামে যে কবিতাটি লিখেছিলেন, সেটি পুস্তিকা আকারে ১৩০৬ সনের ১৩ পৌষ ছাপা হয়। পুস্তিকাটি মির্জা সুজাত আলী বেগকে উৎসর্গ করা হয়। কবির ভাষায় 'উপহার' পত্রটি এরূপ : "সর্বগুণ নিলয় স্বজাতি হিতপরায়ণ মহামনস্বী মাননীয় শ্রীযুক্ত খান বাহাদুর মৌলবী মহোদয়ের সুকোমল করকমলে এই অকিঞ্চিৎকর জাতীয় সঙ্গীত আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ সমর্পিত।"[৮৫] কলিকাতায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও তাঁর দান আছে। মির্জা সুজাত আলী বেগ ১৮৯৯ সালে 'খান বাহাদুর' উপাধি লাভ করেন। তিনি এক সময় পারস্যে ভারত সরকারের কন্সাল নিযুক্ত হন।

হামিদউদ্দিন আহমদ

হামিদউদ্দিন আহমদ ১৮৭৩ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে 'লাইসেন্সিয়েট ইন ল' পাশ করেন। তিনি ময়মনসিংহের অধিবাসী ছিলেন ; ময়মনসিংহ কোর্টে ওকালতি করতেন। তিনি 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' ময়মনসিংহ শাখার অনারারি সম্পাদক ছিলেন। তিনি প্রথমে কংগ্রেসের রাজনীতি করতেন। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে যোগদান করেন। পরে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে তিনি কংগ্রেস বিরোধী

৮৪. তথ্যপঞ্জি –
(১) *শ্রীহট্ট-প্রতিভা*, পৃ. ২৪১-৪২
(২) *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ১৩৫-৪৪

৮৫. মোজাম্মেল হক—*জাতীয় সঙ্গীত*, কলিকাতা, ১৩০৬, 'উপহার' অংশ দ্রষ্টব্য

আন্দোলনে যোগ দেন। সৈয়দ আহমদের সাথে এ ব্যাপারে তাঁর পত্রালাপ ছিল।[৮৬] ঢাকায় 'কংগ্রেস বিরোধী আন্দোলন সাব কমিটি' গঠিত হয়। নবাব পরিবারের খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ এর সভাপতি ছিলেন। তাঁরা ১১ নভেম্বর, ১৮৮৮ সালে ঢাকার নবাব বাড়িতে ঐ উদ্দেশ্যে একটি বিরাট জনসভার আয়োজন করেন। হেমায়েতউদ্দীনের মত হামিদউদ্দীন মুসলমান সমাজের আঞ্চলিক নেতৃত্ব দেন। ময়মনসিংহ শহরে হামিদউদ্দীন আহমদের নামে একটি রাস্তা আছে।

সৈয়দ ওসমান আলী

সৈয়দ ওসমান আলী কলিকাতার বিদ্বৎসমাজের একজন উৎসাহী কর্মী ও সংস্কৃতিসেবক হিসাবে পরিচিত ছিলেন। কলিকাতার বিভিন্ন সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার সাথে তাঁর সম্পর্ক ছিল। তিনি 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র সদস্যভুক্ত ছিলেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সদস্য হিসাবে সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। কলিকাতায় 'এলিয়ট হোস্টেলে'র গৃহ নির্মাণে ১০০ টাকা চাঁদা প্রদান করেন। তিনি সাহিত্যিক ও সম্পাদক শেখ আবদুর রহিমের আত্মীয় (মামা শ্বশুর) ছিলেন।[৮৭] পত্রিকা সম্পাদক ও প্রবন্ধ লেখক হিসাবেও তাঁর নাম ছিল। তিনি 'মিহির ও সুধাকর' পত্রিকাখানি শেষের দিকে (১৯০৮) সম্পাদনা করেন।[৮৮] ঐ পত্রিকায় তাঁর একাধিক প্রবন্ধ ছাপা হয়। তিনি দীর্ঘদিন ইংরাজি সাপ্তাহিক 'দি মোসলেম ক্রনিকলে'র ম্যানেজার ছিলেন।

বজলুর রহিম

নোয়াখালী পরশুরাম থানার গুতুমা গ্রামের অধিবাসী বজলুর রহিম ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৫ সালে বি. এ. এবং ১৮৮৭ সালে বি. এল. পাশ করেন। তাঁর পিতা তমিজউদ্দীন নোয়াখালীর মোক্তার ছিলেন। বজলুর রহিম ঐ জেলার সরকারি উকিল ছিলেন। তিনি নোয়াখালীর 'আঞ্জমনে আশআত ইসলামে'র (১৮৯৬) প্রতিষ্ঠাতা-সভাপতি ছিলেন।[৮৯] শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়া ও ধর্ম প্রচার করা এই আঞ্জমনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। জনহিতকর কাজের জন্য তিনি ১৯০০ সালে 'খান বাহাদুর' উপাধি পান। ফজলুল করিম, বজলুর রহিম, আবদুল ওদুদ ও শামসুদ্দীন আহমদ সহোদর ভ্রাতা ছিলেন, চারজনেই গ্রাজুয়েট হন।[৯০] জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ফজলুল করিম ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৩ সালে বি. এ. ও ১৮৮৫ সালে বি. এল. পাশ করেন। তিনি মুন্সেফ ছিলেন। আবদুল ওদুদ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ থেকে ১৮৯৫ সালে বি. এ. পাশ করেন। তিনি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। শামসুদ্দীন আহমদ বঙ্গবাসী কলেজ থেকে ১৯০২ সালে বি. এল. পাশ করে প্রথমে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও পরে ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন হন। কনিষ্ঠ ভ্রাতা মোহাম্মদ মাসুদ আলীগড়ে পড়াশুনা করে সাব-রেজিস্ট্রার হন।[৯১]

৮৬. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, PP. 117-18
৮৭. *শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী*, ২ খণ্ড, পৃ. ২৫৭
৮৮. *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ১২
৮৯. *The Moslem Chronicle*, 12 December, 1896.
৯০. *হবীবুল্লাহ্ বাহার রচনাবলী*, পৃ. ৩৭২
৯১. *ঐ, পৃ. ১৫৭*

কাজী মোহাম্মদ আহমদ

শ্রীহট্টের দুল্লভপুর নিবাসী কাজী মোহাম্মদ আহমদ একজন শিক্ষানুরাগী ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ১৮৭০ সালে নিজ গ্রামে একটি মধ্য বঙ্গবিদ্যালয় ও মৌলভী বাজারে একটি জুনিয়র মাদ্রাসা স্থাপন করেন। তিনি শ্রীহট্টের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন। একজন বক্তা হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। বাংলা, উর্দু, ফারসি ভাষায় তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁর রচিত 'শ্রীহট্ট দর্পণ' (১২৯২) বাংলা ভাষায় রচিত শ্রীহট্টের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ।[৯২] এটি শ্রীহট্টের জমিদার হামিদ বখ্‌ত মজুমদারের উর্দু ভাষায় রচিত 'আয়শ-এ-হিন্দু' (তিন খণ্ডে সমাপ্ত) গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত। তাঁরা উভয়ে সমসাময়িক ছিলেন।[৯৩]

গজনফর আলী খান (১৮৭২-১৯৬৯)

তিনি শ্রীহট্ট শহরের নিকটবর্তী বিরাইপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯০ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৮৯৭ সালে তিনি আই. সি. এস. পরীক্ষা দেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করে উত্তীর্ণ হন। গজনফর আলী খান রাজকার্যে প্রবেশ করে বাংলার বাইরে কর্মজীবন অতিবাহিত করেন। তিনি মধ্যপ্রদেশের হুসঙ্গাবাদ ও নাগপুর বিভাগের কমিশনার হিসাবে কাজ করেন। ১৯৩২ সালে অবসর গ্রহণের পর তিনি স্বগ্রামে ফিরে আসেন এবং পল্লী উন্নয়ন ও অন্যান্য সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। স্কুল স্থাপন, কূপ খনন, চিকিৎসালয় স্থাপন, তাঁতকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও কৃষিশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল তাঁর সমাজ সেবার নিদর্শন। অকৃতদার এই উচ্চ পদস্থ ব্যক্তি রাজনীতির দিকে না গিয়ে সমাজসেবার মধ্যেই আত্মমুক্তির সন্ধান করেছিলেন।

মোশাররফ হোসেন (১৮৭৩-১৯৬৬)

কুমিল্লার চৌদ্দগ্রাম থানার চিওড়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন কাজী মকরম আলী। ১৮৯৮ সালে বি. এ. পাশ করেন। জলপাইগুড়িতে আইনজীবী হিসাবে কর্মজীবন শুরু করেন। তিনি চা বাগানের মালিক খান বাহাদুর রহিম বক্সের কন্যার পাণি গ্রহণ করেন; তিনি নিজেও চা বাগানের মালিক হন। নিজে উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন বলে বিদ্যার মূল্য দিতেন। কলিকাতার 'ইসলামিয়া কলেজ' প্রতিষ্ঠায় তাঁর আর্থিক অবদান আছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'লিটন বৃত্তি' তাঁরই দানে সৃষ্টি। স্বগ্রাম চিওড়ায় ৫০,০০০ টাকা ব্যয়ে স্ত্রী ফয়জুন্নেসার নামে উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি একাধিকবার বঙ্গীয় আইন সভার সদস্য হন। ১৯২৫, ১৯৩৭ ও ১৯৪২ সালে বাংলা সরকারের মন্ত্রী হন। তিনি 'খান বাহাদুর' ও 'নবাব' উপাধি পান।[৯৪]

৯২. *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ. ১১১
৯৩. *শ্রীহট্ট প্রতিভা*, পৃ. ১৮
৯৪. *নকীব*, ১৯৭৫, পৃ. ৩০

সভা-সমিতি

সামাজিক প্রাণী হিসাবে মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে থাকতে ভালবাসে। 'একতাই বল', 'ঐক্যে জয়, ভেদে পতন' ইত্যাদি প্রাচীন প্রবাদগুলি সংঘবদ্ধতার আদর্শ প্রচার করে। ব্যক্তির শক্তি ও সামর্থ্য সীমিত, সমষ্টির শক্তি ও সামর্থ্য সীমাহীন। ব্যক্তি-চিন্তা সমষ্টি-চিন্তার মধ্যে সঞ্চারিত ও সম্প্রসারিত করার প্রয়োজনবোধ থেকে মানুষের সংঘবদ্ধ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগে। আমাদের দেশে ইংরাজি শিক্ষার বিস্তারের ফলে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উন্মেষ হয়। তখন থেকে আধুনিক ধরনের সমাজসংঘ প্রতিষ্ঠার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরাজি শিক্ষিত রামমোহন রায় (১৭৭৪-১৮৩৩) প্রথম 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) স্থাপন করেন। প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে হিন্দু শিক্ষিত-সমাজে বহু সভা-সমিতি গড়ে উঠে। বাংলার মুসলমানদের প্রথম সংগঠন 'আঞ্জমনে ইসলামী' বা 'মহামেডান এসোসিয়েশন' ১৮৫৫ সালে স্থাপিত হয়। আঞ্জমনের উদ্যোক্তাগণ প্রায় সকলেই সরকারি কর্মচারী ছিলেন। অধিকার-সচেতনতা ও আত্মবিকাশের মনোভাব থেকে যে হিন্দু-মুসলমানের সভাগুলির জন্ম হয়েছিল, তা সেগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করে জানা যায়। ঔপনিবেশিক ও অগণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসক-শাসিতের সম্পর্ক হয় অধিকার-হরণ ও অধিকার-দাবীর সম্পর্ক। অধিকার বঞ্চিত ব্যক্তিত্ব আহত হয়ে সংঘবদ্ধ আন্দোলনের পথ বেছে নেয়, কেননা বলবান শাসকের বিরুদ্ধে সরাসরি দ্বন্দ্বের মধ্যে যাওয়া সম্ভব ছিল না। এ শুধু বৈদেশিক রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে নয়, সমাজের অভ্যন্তরের বৈরী শক্তিগুলিব বিরুদ্ধেও যুক্তশক্তির সাহায্যে সংস্কার, প্রতিকার ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হয়। মানুষের কল্যাণমুখী কোন কিছু গড়ার কাজেও সংযমশক্তির প্রয়োজন হয়। এক কথায়, ব্যক্তিচেতনা ও সমাজচেতনার সমন্বয়ে এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আদর্শে আধুনিক সভা-সমিতি, সংঘ-সমাজ গঠিত হয়েছে। নানা দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এগুলিই ছিল সংগ্রামের হাতিয়ার, আত্মরক্ষার কবচ, আত্মপ্রকাশের উৎস ও ভাবসম্মিলনের কেন্দ্র।

যতদূর জানা যায়, স্যার উইলিয়াম জোনসের 'এসিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪) কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত প্রথম সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। এতে প্রথম দিকে ভারতীয়দের স্থান ছিল না।[১] রামমোহনের 'আত্মীয় সভা'র পরপরই এদেশে সভা-সমিতির জোয়ার আসে। প্রথম পঞ্চাশ দশকের মধ্যে কেবল কলিকাতাতে বহু সংখ্যক ও বিবিধ বিষয়ক সমিতি গড়ে ওঠে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রসন্নকুমার ঠাকুরের 'গৌড়ীয় সমাজ' (১৮২৩),

১. ১৮২৯ সালের পূর্বে কোন ভারতীয় এসিয়াটিক সোসাইটির সভ্য শ্রেণীভুক্ত হতে পারেন নি। ঐ বছর রামকমল সেন সোসাইটির সদস্য মনোনীত হন। ১৮৩২ সালে তিনি নেটিভ সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। *The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. I No. 12,* December, 1832, P. 559.

রাধাকান্ত দেবের 'ধর্মসভা' (১৮২৮), ডিভিয়ান ডিরোজিওর 'একাডেমিক সভা' (১৮২৮), 'ব্রাহ্ম সমাজ' (১৮২৯), 'জ্ঞানসন্দীপন সভা' (১৮৩০) 'ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন' (১৮৩১), 'বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা' (১৮৩৬), তারাচাঁদ চক্রবর্তীর 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা' (১৮৩৮), দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৮), 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি' (১৮৪৩), 'বঙ্গভাষানুবাদক সমাজ' (১৮৫০), 'বেথুন সোসাইটি' (১৮৫১), 'ফ্যামিলি লিটারেরী ক্লাব' (১৮৫৭) ইত্যাদি ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান।[২] নব জাগরণের যুগে ধর্ম-শিক্ষা-সমাজ সংস্কার আন্দোলনের জন্ম এসব সভাসমিতির দ্বারাই হয়েছে। নব অধ্যাত্মবাদ, দেশাত্মবোধ, জাতীয়তাবাদ, স্বাধীনতাস্পৃহা, যুক্তিবিদ্যা, মানবতাবোধ প্রভৃতি আধুনিক ভাবধারা ও আদর্শচিন্তা এসব সভাসমিতি থেকে উৎসারিত হয়েছে। সুতরাং আধুনিক জীবনস্পন্দন ও জাগরণ উল্লাসের বাহক হিসাবে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, পত্র-পত্রিকা, বই পুস্তক প্রভৃতির মত সভাসমিতির গুরুত্বও কম নয়। বিশেষ করে, বিকাশোন্মুখ যুগে এ ভূমিকা ছিল অধিক তাৎপর্যবহ। উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে বাংলার মুসলমান সমাজের আত্মবিকাশের মাধ্যম হিসাবে মুসলমানের সমিতিগুলিও সমভাবে ক্রিয়া করেছে। সমকালের সমাজের ভাবধারা ও গতিধারা উপলব্ধি করার জন্য এগুলির পরিচয় জানার আবশ্যকতা আছে। ১৮৫৫ সালে 'আঞ্জমনে ইসলামী' স্থাপনের সময় থেকে শুরু করে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কলিকাতা ও মফস্বলে যতগুলি সভা, সমাজ, ক্লাবের সন্ধান পাওয়া গেছে, এখানে সেগুলিকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। শিক্ষা, ধর্ম, সমাজ, সাহিত্য, রাজনীতি, ক্রীড়া বিবিধ বিষয়কে অবলম্বন করে সমিতিগুলি গঠিত হয়েছে। তবে শিক্ষা-সমাজ-ধর্ম বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। আরবি-ফারসি-উর্দুর মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা এবং ইংরাজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার আন্দোলনের কাজ সমিতিগুলি করেছে। অনৈসলামিক রীতিনীতি, ধর্মান্ধতা, নীতিহীনতা, কুসংস্কারাচ্ছন্নতা দূর করে শরীয়তধর্মের আদর্শ প্রচার করে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন করেছে। কলিকাতার সমিতিগুলি ভাষার প্রশ্নে ফারসি-উর্দুর প্রতি সমর্থন দিয়েছে, কিন্তু মফস্বলের অধিকাংশ সমিতি বাংলা ভাষার সপক্ষে প্রচার চালিয়েছে। ইংরাজি বিধর্মীর ভাষা, বাংলা হিন্দুদের ভাষা—এ ধরনের মনোভাব সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ছিল, অনেক সমিতি এরূপ মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেছে। অর্থকরী বিদ্যা হিসাবে বিজ্ঞান শিক্ষার উপর গুরুত্ব অরোপ করা হয়েছে। কোন কোনটি সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে। শরীরচর্চা ও দেহগঠনের দিকে জোর দিয়ে ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিষ্ঠান কলিকাতা ও ঢাকায় স্থাপিত হয়েছে। বিতর্কমূলক সভাগুলিতে যুক্তিবিদ্যার চর্চা হয়েছে, প্রতিযোগিতার মনোভাব জাগ্রত হয়েছে। কোন কোনটি স্বতন্ত্র জাতিত্বের প্রশ্ন তুলে সমাজের স্বার্থ উদ্ধার ও অক্ষুণ্ন রাখার চেষ্টা করেছে। এভাবে দেখা যায়, বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠান উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে

২. গোপাল হালদার—*বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা*, ২ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭২ (২য়) ; বিনয় ঘোষ—*বাংলার বিদ্বৎসমাজ*, কলিকাতা, ১৩৮০

মুসলিম পুনর্জাগরণের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। জাতীয়তার প্রশ্নে প্রথমে সর্বভারতীয় মনোভাব থাকলেও ক্রমশ বাঙালী জাতীয়তার কথা উঠেছে। ভাষার ক্ষেত্রে এটি বেশ স্পষ্ট বুঝা যায়। সমাজের ভেতরকার অপশক্তিগুলিকে ধ্বংস করে সমাজকে মুক্তির ও প্রগতির পথ দেখানোর কাজ সমিতি দ্বারা এভাবেই এগিয়েছে। ক্ষমতার সীমাবদ্ধতায় ও প্রতিবন্ধকতায় আশানুরূপ ফল এ-পর্বে ফলেনি সত্য, তবে নির্জীব, নিস্তেজ, নিশ্চল জাতির অধঃপতনের গতিরোধ করে সে জাতিকে সচেতন করে তোলার সাফল্য অবশ্যই অর্জন করেছে। আত্মমর্যাদাবোধ, আত্মজিজ্ঞাসা ও ঐক্যবদ্ধচেতনা সমিতিগুলির মাধ্যমেই জাতীয়জীবনে প্রথম সঞ্চারিত হয়। এগুলি উচ্চনীচ শ্রেণীগত ব্যবধান দূর করার পক্ষে সহায়ক হয়েছে। উচ্চবিত্তের নবাব-জমিদারেরা মধ্যবিত্তের শিক্ষিত শ্রেণী এবং শিক্ষিত শ্রেণী নিম্নবিত্তের সাধারণ শ্রেণীর সাথে মিশেছেন। অর্থাৎ সামাজিক সেতুবন্ধনের কাজটা এভাবেই সম্পন্ন হয়েছে। আত্মমুখী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক মনোভাব সমাজমুখী ও সমষ্টিকেন্দ্রিক রূপ লাভ করেছে। ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ্ কলিকাতায় এলে 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব' ও 'ইণ্ডিয়া সাইক্লিস্ট এসোসিয়েশনে'র যৌথ উদ্যোগে তাঁর কাছে একটি ডেপুটেশন দেওয়া হয়। দেলওয়ার হোসেন আহমদ ও মির্জা সুজাত আলী বেগ এতে নেতৃত্ব দেন। নবাব আহসানুল্লাহ্ তাঁদের বলেছিলেন যে, শুধু শরীর গঠন নয়, সংস্কৃতি ও বুদ্ধিবৃত্তির চর্চার দিকেও মনোযোগ দিতে হবে।[৩] অংশত রক্ষণশীল, অংশত প্রগতিশীল বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে, তা অনস্বীকার্য।

বিষয়ের দিক থেকে বিচার করলে সমিতিগুলিকে ১. সমাজ, ২. ধর্ম, ৩. শিক্ষা, ৪. সাহিত্য-সংস্কৃতি, ৫. রাজনীতি, ৬. বিজ্ঞান ও ৭. ক্রীড়া এই কয় ভাগে ভাগ করা যায়। তবে আলোচনার সুবিধার জন্য কালানুক্রমিকভাবে সাজিয়ে লেখা হয়েছে। কেবল শাখাগুলিকে কেন্দ্রের সাথে যুক্ত করে এবং সমনামের সমিতিগুলিকে একত্র করে আলোচনা করা হয়েছে। কলিকাতার সমিতির সংখ্যা বেশি। মফস্বলে মেদিনীপুর, হুগলী, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, বগুড়া, রংপুর, ফরিদপুর প্রভৃতি জেলায় একাধিক সমিতি ছিল। সমিতিগুলির আলোচনায় প্রবেশ করলে সহজে বুঝা যায় যে, কি সদর, কি মফস্বল কোন স্থলে হিন্দু-মুসলমানের যুক্ত প্রয়াস নেই ; কোন কোন সভায় হিন্দু-মুসলমানের একত্র মিশবার পক্ষে বাধা ছিল না, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, হিন্দুর সভায় মুসলমান ও মুসলমানের সভায় হিন্দু বড় একটা যোগদান করেন নি। সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের 'গঠনতন্ত্রে' (৮ ধারায়) মুসলমান ও অমুসলমান সদস্যের সমান অধিকার ছিল না। 'হিন্দু মেলা'র কর্মসূচি এমনই ছিল যে, তাতে মুসলমানরা যোগদানের উৎসাহ বোধ করতেন না। সমিতির নামের সাথে 'মুসলমান', 'ইসলাম', হিন্দু', 'ব্রাহ্ম' প্রভৃতি শব্দ সংযুক্ত করে স্বাতন্ত্র্যের প্রতি ঈঙ্গিত করা হয়েছে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান স্বসমাজ ও স্বশ্রেণীর স্বার্থে প্রকাশ্যভাবে অন্য সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশ করেছে। কি হিন্দু কি মুসলমান উভয়ের পরিচালিত প্রায় প্রতিষ্ঠানের গতিধারা ছিল একই—জাতিস্বার্থে প্রায় দ্বিমুখী। ধর্মীয়

The Moslem Chronicle, 18 March, 1899

ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তো দূরের কথা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও দুটি প্রধান সম্প্রদায় একত্রে মিলিত হতে পারেনি। সমাজ বিকাশের এই গতিধারাটি সভাসমিতিগুলিতে যত স্পষ্ট ধরা পড়েছে, অন্যক্ষেত্রে ততখানি নয়। সমাজ-মানসের প্রকৃতি ও চরিত্র অনুধাবনে সভাসমিতিগুলির এরূপ গুরুত্ব থাকায় আমরা এখানে সেগুলির বিস্তৃত আলোচনা করেছি।

আঞ্জমন ইসলামী

আঞ্জমন ইসলামী বা মহামেডান এসোসিয়েশন বাংলা কেন, ভারতের মুসলমানের প্রথম যৌথ প্রতিষ্ঠান। আঞ্জমনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন মৌলবী মোহাম্মদ মজহার। তাঁর পিতা কাজী গোলাম সোবহান ছিলেন সদর আদালতের 'কাজী-অল-কুজ্জাত'। মোহাম্মদ মজহারের তালতলার বাড়িতে ১৮৫৫ সালে ৬ই মে তারিখে আঞ্জমন গঠনের উদ্দেশ্যে প্রথম সভা হয় ; সভায় শহরের অভিজাত ও গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে 'আঞ্জমন ইসলামী' নামকরণ করে উক্ত সমিতি স্থাপন করা হয় এবং নিম্নের সদস্য সমন্বয়ে একটি 'কার্যনির্বাহী কমিটি' গঠন করা হয় :

সভাপতি—কাজী ফজলুর রহমান, খান বাহাদুর, কাজী-অল-কুজ্জাত
সহ-সভাপতি—কাজী আবদুল বারি, কলিকাতা সদর আদালত
সম্পাদক—মোহাম্মদ মজহার ও মোহাম্মদ আবদুর রউফ।

সদস্য—মোহাম্মদ ওয়াজিহ্, আবদুস সামাদ, আবদুল লতিফ খান, আবদুল জব্বার, ফজলুল করিম, গোলাম ইসহাক, রহমত আলী, আহমদ, জোওয়াদ, আবদুল হামিদ ও গোলাম ইয়াহিয়া।[৪]

ভারতের মুসলমানের মঙ্গল সাধন আঞ্জমনের উদ্দেশ্য হবে বলে ঐ সভায় ঘোষণা করা হয়। ফারসি ও ইংরাজি ভাষায় আঞ্জমনের কাজ পরিচালনা করা হবে। আঞ্জমনের প্রতি জনগণের সমর্থন আছে, এই মর্মে মত গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রচারপত্র বিলি করার এবং গঠনতন্ত্র প্রণয়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[৫]

দূরবীন (ফারসি সাপ্তাহিক) ৪ ও ৭ মে, ১৮৫৫ কলিকাতা। কাজী আবদুল বারি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করেন। কলিকাতা সদর আদালতে ১৮২৭ সাল থেকে ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত কাজী পদে রত ছিলেন। মোহাম্মদ মজহার মুসলমান আইন-অফিসার ছিলেন। মোহাম্মদ ওয়াজিহ ছিলেন কলিকাতা মাদ্রাসার প্রধান আরবি অধ্যাপক। মোহাম্মদ আবদুর রউফ ভারত সরকারের ব্যবস্থাপনা বিভাগের 'প্রথম অনুবাদক' ছিলেন। আহমদ (পরবর্তী নাম দেলওয়ার হোসেন আহমদ) হুগলীর অধিবাসী ছিলেন, তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলমান গ্রাজুয়েট (১৮৬২)। গোলাম ইয়াহিয়া বীরভূমের প্রধান সদর আমীন (১৮৪৩-৫৫) ছিলেন।

Selection from the Records of the Govt. of India, Home Dept. Calcutta, 1886, PP. 23, 49, 74.

৭।

সমকালের 'বেঙ্গল ডাইরেক্টরি এণ্ড এ্যানুয়াল রেজিষ্টারে' আঞ্জমনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় :

1. For seeking the interests and promoting the welfare of the subjects of the E. I. Company generally, and of Mahomedans particularly, and for removing general evils existing previously, or those that might hereafter occur, by petitions to the Authorities here or in England, and by every other legitimate means in its power.

2. For promoting the prosperity of the religion of Islam and preserving Mahomedan Subjects of the E. I. Company from evil ways and pursuits by all proper means, not betraying any rebellions spirit against the British Government. (*Bengal Directory and Annual Register*, Part ix, 1858, Calcutta, p. 100)

আঞ্জমনে ইসলামীর জন্মের ২৩ দিন পরে 'সোম প্রকাশে' (২৯ মে, ১৮৫৫) 'মুসলমানের সভা' শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়, তাতে লেখা হয়— "নগরবাসি সদ্বিদ্বান ও সম্ভ্রান্ত যবনেরা স্বজাতির হিত বন্ধনার্থে এক সভা স্থাপন করিয়াছেন, তাহার বিবরণ আমরা ইংরাজি পত্রে পাঠ করিয়া যে প্রকার সন্তুষ্ট হইয়াছি, তাহা লিখিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। ইংরাজ ও বাঙালির মধ্যে বহুবিধ সভা স্থাপিত থাকাতে অনেক বিষয়ে তাঁহাদিগের উপকার হইতেছে ও ইংরাজ জাতির সহিত হিন্দু জাতির সদ্ভাবের ক্রমশ আধিক্য হইয়া আসিতেছে এবং হিন্দু মণ্ডলীর মধ্যে একতা বন্ধনের সূত্র সঞ্চারিত হইয়াছে ; কিন্তু কি পরিতাপ। যবন জাতির মধ্যে একাল পর্যন্ত কোন প্রকার সভা স্থাপিত হয় নাই, গবর্নমেন্ট যাহা ইচ্ছা তাহা করুন, তাঁহাদিগের কার্যবিষয়ে যবনজাতি কোন কথাই উল্লেখ করেন না, ইহাতে সভ্য লোকেরা ভারতবর্ষবাসি যবনগণকে অসভ্য বলেন। —এদেশে অল্প যবন বাস করে না, কোন কোন প্রদেশে হিন্দু ও অন্যান্য জাতি অপেক্ষা যবনের সংখ্যা অধিক, অতএব তাহাদিগের মঙ্গলোদ্দেশ্যে কোন প্রকার সভা না থাকাতে আমরা অতিশয় দুঃখিত ছিলাম ; অধুনা নগরবাসি সম্ভ্রান্ত ও সদ্বিদ্বান যবনেরা আমাদিগের সেই দুঃখ নিবারণ করিলেন। এইক্ষণে আমরা পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি এই নবীন সভা চিরস্থায়ী হউক এবং নগরীয় ও অন্যান্য স্থানের যবনগণে তাহার প্রতি বিহিত সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানপূর্বক স্বজাতির সম্মান বৃদ্ধি করুন।"[৬] 'সোমপ্রকাশে' উল্লিখিত 'মুসলমানদের সভা' যে 'আঞ্জমন ইসলামী' তাতে সন্দেহ নেই। 'নিউ ক্যালকাটা ডাইরেক্টরীতে (১৮৫৬) 'আঞ্জমনে ইসলামী'র উল্লেখ আছে।[৭] সে যুগে সভা-সমিতির উপযোগিতা কি ছিল, তা 'সোমপ্রকাশ' 'যবনদের' এক প্রকার চোখে আঙুল

৬. বিনয় ঘোষ—*সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র*, ২য় খণ্ড, পাঠভবন, কলিকাতা, ১৯৬৬, পৃ. ৭৭৫
৭. *New Calcutta Directory*, 1856, PP. 78-79

দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মুসলমানদের এরূপ সমিতির আবির্ভাবে পত্রিকাটি উল্লাস প্রকাশ করেছে এবং সমিতিকে উৎসাহ দিয়েছে। ১৮৫৬ সালের ৩১ শে জানুয়ারি 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' (১৮৫১) এক প্রস্তাবে আঞ্জুমন ইসলামী বা মহামেডান এসোসিয়েশন স্থাপিত হওয়ায় আনন্দ প্রকাশ করেন এবং পরবর্তীকালে আঞ্জুমনের সহযোগিতা লাভ করায় ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।[৮]

১৮৫৩ সাল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির নতুন সনদ লাভের বছর। কলিকাতার 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন' ১৮৫৩ সালে এক সভার প্রস্তাবের মাধ্যমে আইন ও শাসনসংক্রান্ত দাবী–দাওয়ার একটি আবেদনপত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রদান করেন। ঐ আবেদনপত্রে ভারতবর্ষের জন্য একটি স্বতন্ত্র 'বিধান পরিষদ' গঠনের প্রস্তাব ছিল ; পরিষদে ভারতীয় প্রতিনিধি থাকবে বলে দাবী করা হয়। স্যার হ্যালিডে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উক্ত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন এই বলে যে, ভারতের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে গুরুতর মতপার্থক্য আছে, সুতরাং উপযুক্ত ভারতীয় নেতা থাকলেও কোন একজন ব্যক্তিকে উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রতিনিধি মনোনীত করা কঠিন হবে। লর্ড এলেনবরা হ্যালিডের মত সমর্থন করেন এবং আইন প্রণয়নের জন্য হিন্দু ও মুসলমানের দুটি পৃথক পরামর্শ–সমিতি গঠন করার প্রস্তাব দেন। 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন'কে ভারতের মুসলমানরা নিজেদের প্রতিষ্ঠান মনে করতেন না ; তাঁরা হ্যালিডের মতের পোষকতা করে নিজেদের উপযোগী 'মহামেডান এসোসিয়েশন' গঠন করেন। ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে কলিকাতার 'মহামেডান এসোসিয়েশন' স্থাপনের প্রকৃত পটভূমি ছিল এটাই।[৯] সুতরাং আঞ্জুমন ইসলামী প্রতিষ্ঠার মূলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল, যদিও উদ্যোক্তরা একে অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে অভিহিত করেছেন।[১০]

'আঞ্জুমন ইসলামী' সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট ছিল বলে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে'র মত আঞ্জুমন ইসলামীও 'সিপাহী বিদ্রোহ' সমর্থন করেনি, বরং উভয় প্রতিষ্ঠানই পৃথক পৃথক সভা করে এর নিন্দা করে। সিপাহী বিদ্রোহ দমন কার্য শেষ হলে 'আঞ্জুমন ইসলামী' ১৮৫৮ সালের ১৪ই নভেম্বর রানী ভিক্টোরিয়াকে 'অভিনন্দনবাণী' প্রেরণ করেন।[১১] সরকারের আনুগত্য লাভ এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। আঞ্জুমনের কর্মসূচিতেও এর স্পষ্ট উল্লেখ ছিল, "No measures should on any occasion be adopted that might in any measure appear inimical to British Government."[১২] নব্যশিক্ষিত হিন্দুগণ চাকুরির ক্ষেত্রে উচ্চ সরকারিপদে দেশীয়দের নিয়োগের জন্য আন্দোলন করছিলেন। হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্রগণ তারাচাঁদ চক্রবর্তীর

৮. Bimanbihari Majumdar--*Indian Political Associations and Reform of Legislature (1818-1917)*, Firma, K. L. Mukhapadhay, Calcutta, 1965 P. 221.

৯. রমেশচন্দ্র মজুমদার—*বাংলাদেশের ইতিহাস, ৩য় খণ্ড*, কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ৫৩৬–৩৭

১০. *দূরবীন*, ২১ মে ১৮৫৫

১১ *Indian Political Associations and Reform of Legislature*, P. 221.

১২. সুরেশচন্দ্র মৈত্রেয়—'উনিশ শতকের প্রথমার্ধে মুসলমান রাজনীতি', *অনুশীলন*, আশ্বিন ১৩৭২

নেতৃত্বে ১৮৪৩ সালের ১৮ই এপ্রিল এবং রামগোপাল ঘোষের উদ্যোগে ১৮৫৩ সালে ঐ বিষয়ে প্রকাশ্য সভায় মিলিত হন। মুসলমানগণ ইংরাজি শিক্ষায় পশ্চাৎপদ ছিলেন। এ আন্দোলন তাঁদের স্বার্থের পরিপন্থী ছিল বলে তাঁরা এসব সভায় যোগদান করেন নি, বরং পরিস্থিতির উপর দৃষ্টি রেখে আঞ্জমনের সংগঠনসূচিতে অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, "It percludes all idea of any union with Hindoo Association, which altogether repudiates the principal."[১৩] এরূপ অবস্থায় ব্রিটিশ সরকারের অনুগ্রহই একমাত্র ভরসা ছিল। হিন্দুদের সহিত ব্রিটিশ-বিরোধী কোন আন্দোলনে যোগদান করা তাঁদের পক্ষে আত্মঘাতী হবে।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে 'আঞ্জমন ইসলামী'র কয়েকটি শাখা ছিল, কলিকাতার লিটারেরী সোসাইটি (১৮৬৩) স্থাপনের আগেই এটি বন্ধ হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য যে, মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা আবদুল লতিফ আঞ্জমনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মহম্মদ ওয়াজিহ্, কাজী আবদুল বারি, মোহাম্মদ আবদুর রউফ সোসাইটির কার্যকরী কমিটির সদস্যভুক্ত হন।

মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি (১৮৬৩)

১৮৬৩ সালের ২রা এপ্রিল আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফের ১৬ তালতলা লেনের বাড়িতে অনুষ্ঠিত এক সভায় কলিকাতার 'মহমেডান লিটারেরী সোসাইটি'র আনুষ্ঠানিক জন্ম হয়। 'এ ব্রিফ হিস্টরি অব দি মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি অব ক্যালকাটা' (১৯২২) নামক একখানি অনুষ্ঠানপত্র থেকে জানা যায়, ভারতের তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড এলগিন সমিতি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে আবদুল লতিফকে উৎসাহিত করেছিলেন। 'এ শর্ট এ্যাকাউন্ট অব মাই পাবলিক লাইফ' (১৮৮৫) নামক আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থে আবদুল লতিফ সোসাইটি স্থাপনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, Being fully aware of the prejudice and exclussiveness of the Mahomedan Community and anxious to imbue its members with a desire to interest themselves in Western learning and progress, and to give them an opportunity for the cultivation of social and intellectual intercourse with the best representatives of English and Hindoo Socieaty, I founded the Mahomedan Literary Society in April, 1863."

উদ্বোধনী সভার সভাপতি ছিলেন কলিকাতা মাদ্রাসার আরবি বিভাগের প্রধান মৌলবী মোহাম্মদ ওয়াজিহ্। আবদুল লতিফ কলিকাতার উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের কাছে এ ধরনের সভা-সমিতির উপযোগিতা ব্যাখ্যা করে একটি ফারসি প্রবন্ধ পাঠ করেন। ভারতের ব্যবস্থাপক বিভাগের অনুবাদক মোহাম্মদ ওয়াজিহ্ ঐ একই বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করেন। ওয়াহাবী মতবাদের কতকগুলি বিধি-নীতি অস্বীকার করে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন মাদ্রাসার একজন ছাত্র। প্রবন্ধটি মোহাম্মদ ওয়াজিহ্ রচনা করেছিলেন। কাজী আবদুল

---

১৩. ঐ

বারি এবং মৌলবী হাফিজ আজিজ আহমদ (ধর্মনেতা) প্রথম থেকেই সোসাইটির সঙ্গে জড়িত ছিলেন।[১৪]

সোসাইটির প্রথম বার্ষিক সভা হয় ১৮৬৪ সালের ৩০শে মে। সভায় সোসাইটির গঠনতন্ত্র তৈরি হয়। নিম্নরূপ একটি 'কার্যনির্বাহী কমিটি' গঠিত হয় :

পৃষ্ঠপোষক—স্যার সিসিল বিডন (ছোটলাট, ১৮৬৭-৭১)
সভাপতি—মোহাম্মদ ওয়াজিহ্
সহ-সভাপতি—কাজী আবদুল বারি ও হাফিজ আজিজ আহমদ
সম্পাদক—আবদুল লতিফ।[১৫]

মাসিক সভা : সোসাইটির মাসিক সভার নিয়ম ছিল। প্রথম এক বছরে উল্লেখযোগ্য সভা ছিল দ্বিতীয়, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও দ্বাদশ সভা। ১৩ই মে তারিখের দ্বিতীয় সভায় ইতিহাস, ভূগোল, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য এবং সংবাদপত্রের উপর প্রবন্ধ পড়া হয় ও আলোচনা হয়। ৭ আগস্ট তারিখের পঞ্চম সভায় টেলিগ্রাফ বিভাগের সহকারী ডিরেক্টর জেনারেল এফ. জি. তীলে 'ইলেকট্রিসিটি ও ইলেকট্রিক টেলিগ্রাফে'র উপর ইংরাজিতে প্রবন্ধ পড়েন। আবদুল লতিফ তার উর্দু তর্জমা করেন। ৬ অক্টোবর তারিখের ষষ্ঠ সভায় আলীগড়ের বিখ্যাত নেতা সৈয়দ আহমদ ভারতবর্ষে 'স্বদেশ প্রীতি ও জ্ঞানোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করেন। ৬ই মে তারিখের দশম সভায় ডক্টর কানাইলাল দে (রায় বাহাদুর) 'দহনক্রিয়া'র উপর বক্তৃতা করেন। পরের বছরগুলিতে বিজ্ঞান, ইতিহাস, সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দান অথবা প্রবন্ধ পাঠ করেন জে. গিব. রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র, রেভারেণ্ড ই. লোফোঁ, এইচ. ডব্লিউ. ম্যাককান, ডক্টর সি. এইচ.উড, ডক্টর এ. এফ. আর. হোর্নলে, এইচ. উডরো, ডক্টর জে. এ. পি. কোলস, রেভারেণ্ড সি. এইচ. এ. ডল., মহেন্দ্রলাল সরকার, তারাপ্রসন্ন রায় প্রমুখ। শ্রোতার কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য আবদুল লতিফ এগুলির উর্দু তরজমা করতেন।[১৬]

বার্ষিক মেলা : তৃতীয় বছরে সোসাইটি একটি নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে। বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের সাথে যোগাযোগ স্থাপন ও ভাববিনিময়ের জন্য 'বার্ষিক মেলা'র আয়োজন করে। ১৮৬৫ সালের ১৩ই মার্চ তারিখে কলিকাতার টাউন হলে প্রথম বার্ষিক মেলা হয়। ছোটলাটসহ হিন্দু, মুসলমান, পার্সি, খ্রিস্টান সকল সম্প্রদায়ের গণ্যমান্য ব্যক্তি মেলায় যোগদান করেন। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শিল্পদ্রব্য ঐসব মেলায় দেখান হত এবং সেগুলির ব্যবহার-পদ্ধতি ব্যাখ্যা করে বুঝান হত। ১৮৬৭ সালের ২ মার্চ তারিখের ঐরূপ বার্ষিক মেলায় ভারতের বড়লাট স্যার জন লরেন্স (১৮৬৪-৬৯) উপস্থিত হয়ে সাধারণ

১৪. A Quarter of the Mahomedan Literary Society of Calcutta (A Resume of its works from 1889) ; *Nawab Bahadur Abdul Latif ; His writings and Related Documents*, PP. 140-55.

১৫. ঐ, পৃ. ১৪৪-৪৫

১৬. *Nawab Bahadur Abdul Latif : His writings and Related Documents*, P. 148

শিক্ষা ও বিজ্ঞান চর্চার স্বীকৃতি স্বরূপ সম্পাদক আবদুল লতিফকে এক সেট 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' ও একটি স্বর্ণপদক উপহার দেন। এ সময় স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন বেইলীর (ছোটলাটের সচিব) প্রদত্ত প্রশংসাপত্রে (২৩শে এপ্রিল ১৮৬৭) বলা হয়, By founding the Mahomedan Literary Society...you have successfully led the Mahomedans, not only of Bengal, but of India generally to look beyond the narrow bounds of their own system and to explore those accumulated treasures of thought and feeling which are to be found embodied in the English language... you have materially promoted a good understanding between this class of the community and their rulers and fellow subjects."[১৭] মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির উদ্যোগে পরবর্তী বছরগুলিতে নিয়মিত বার্ষিক মেলা হয়েছে ; ডিউক অব এডিনবার্গ, লর্ড মেয়ো থেকে শুরু করে সিয়ামের রাজা ও রাজকন্যা, হোলকার, ইনদোর, জয়পুর, পাতিয়ালা, উলওয়ার, পুন্নাহ ও কুচবিহারের মহারাজা ও ভুপালের বেগম সাহেবা সেগুলিতে যোগদান করেন।[১৮] সোসাইটির উদ্যোক্তাগণ এরূপ মেলার মাধ্যমে মুসলমান সমাজের লোকের মনে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কৌতূহল, শিক্ষার প্রতি আগ্রহ ও অনুপ্রেরণা সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সংবর্ধনা সভা : ইংরাজ শাসক গোষ্ঠীর প্রতি ভারতীয় মুসলমানদের আনুগত্য আছে এটি প্রমাণ করার জন্য সোসাইটি ভারতের বড়লাটের ও বাংলার ছোটলাটের কর্মভার গ্রহণ ও দায়িত্বভার ত্যাগের সময় সংবর্ধনা সভার এবং বিদায় সভার আয়োজন করত। ১৮৬৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি সোসাইটির পক্ষ থেকে প্রথম সংবর্ধনা দেওয়া হয় বড়লাট লর্ড মেয়োকে (১৮৬৯-৭২)। অনুরূপভাবে আর্ল অব নর্থব্রুক (১৮৭২-৭৬), আর্ল অব ডাফরিন (১৮৮৪-৮৮) এবং মার্কুইস অব ল্যাণ্ডসডোন (১৮৮৮-৯৪) সাহেবকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ২৫ বছরের ব্যবধানে সোসাইটি ছোটলাট উইলিয়াম গ্রে (১৮৬৭-৭১), জর্জ ক্যাম্বেল (১৮৭১-৭৪), রিচার্ড টেম্পল (১৮৭৪-৭৭), এ্যাসলে ইডেন (১৮৭৭-৮২), রিচার্ড থমসন (১৮৮২-৮৭) এবং স্টুয়ার্ট কলভিন বেইলীকেও (১৮৮৭-৯০) সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। কর্মত্যাগ করে তাঁরা যখন চলে যান তখন তাঁদের উদ্দেশ্যে বিদায়-অভিনন্দন জানান হয়। ১৮৭৭ সালে ইংলণ্ডের রানী 'ভারতেশ্বরী' উপাধি লাভ করলে সোসাইটি দিল্লীতে অভিনন্দনবাণীসহ প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। ১৮৭২ সালে ওয়েলসের রাজকুমার রোগমুক্ত হলে সোসাইটি 'শুকরিয়া' সভার আয়োজন করে। ১৮৭৫ সালে কলিকাতায় আগমন উপলক্ষে ওয়েলসের রাজকুমার ও কনটের ডিউককে অভ্যর্থনা জানান হয়। আবদুল্লাহ্র হাতে কলিকাতার বিচারপতি জে. পি. নরম্যান (২০ সেপ্টেম্বর ১৯৭১) এবং শের খানের হাতে বড়লাট লর্ড মেয়ো (৮ ফেব্রুয়ারি ১৮৭২) নিহত হলে সোসাইটি

১৭. Op Cit., P. 170
১৮. Ibid., P. 149

শোকসভার আয়োজন করে এবং ঐরূপ হত্যাকাণ্ডের তীব্র ভাষায় নিন্দা করে।[১৯] সংবর্ধনা সভাগুলিতে যে সমস্ত মানপত্র পাঠ করা হত, সেগুলিতে মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া থাকত। এসব কারণে অনেক শাসক শ্রেণীর সহানুভূতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতে সোসাইটি সক্ষম হয়।

বিশেষ ধর্মসভা : ইংরাজ সরকারের সন্দেহ, ভ্রান্তি ও অবিশ্বাস দূর করে তাঁদের কাছ থেকে আনুগত্য ও সহানুভূতি পাবার জন্য 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে। ১৮৭০ সালের ২৩শে নভেম্বর সোসাইটির উদ্যোগে একটি সভা হয়। জৌনপুরের বিখ্যাত মৌলবী কেরামত আলী সভায় বক্তৃতা দিতে আহূত হন। তিনি প্রথম ঘোষণা করেন, খ্রীস্টান ধর্মাবলম্বী ব্রিটিশদের শাসনাধীনে থাকলেও ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' (শত্রুভূমি) নয়, 'দারুল ইসলাম' (শান্তি বা মিত্রভূমি)। সুতরাং শাসকদের বিরুদ্ধে জিহাদ ধর্মনির্দেশের পরিপন্থী। তিনি মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও আইনশাস্ত্র থেকে একাধিক দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। সভায় একই মতের সমর্থন করে মৌলবী ফজলি আলী ফারসিতে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন ; আরব থেকে আগত শেখ আহমদ ইফেন্দি আনসারি, সভাপতি কাজী আবদুল বারি, আবদুল লতিফ, আবদুল হাকিম, আবদুর রউফ প্রমুখ বক্তাও বিভিন্ন যুক্তি সহকারে কেরামত আলীর মতের সমর্থনে বক্তৃতা করেন।[২০] ধর্মনীতিতে ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধে 'জেহাদ' বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা সংগত কিনা এ নিয়ে সারা ভারতে মুসলমান সমাজে দ্বন্দ্ব ও বিতর্ক দেখা দিয়েছিল। ওয়াহাবীরা ধর্মযুদ্ধের পক্ষপাতী ছিলেন। 'দারুল হরবে'র কথা তাঁরাই প্রচার করেন। উন্নত ও শক্তিশালী ইংরাজদের বিরুদ্ধে দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত মুসলমানগণের সংগ্রাম হবে সম্পূর্ণ আত্মঘাতী ও ধ্বংসমুখী। আবদুল লতিফ ও তাঁর সহকর্মীরা এটা অনুধাবন করে ঐরূপ একটি মীমাংসা-বাণী কামনা করেছিলেন। আবদুল লতিফ কেরামত আলীর বক্তৃতাসহ সভার পুরো ধারাবিবরণীর পাঁচ হাজার কপি ভারতবর্ষের মুসলমানদের মধ্যে বিতরণ করেছিলেন। এমন কি, মক্কায় পাঠিয়ে মুফতির কাছ থেকে সমর্থনসূচক ফতোয়া আনা হয়েছিল।[২১] সোসাইটির এই প্রচেষ্টার কথা স্মরণ করে পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে যে 'অনুষ্ঠানপত্র' প্রকাশিত হয় তাতে লেখা হয়, "Thus the Mahomedan Literary Society were able to remove such misconception from the minds of the Ruling Authorities, as well as restore confidence among their own community in the good faith of the Government. It may here be added that the Society succeeded to a great extent in disabusing the minds of their co-religionists of many false notions, which were unfavourable to their

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮-৫০

২০. Abstract of Proceedings of Mahomedan Society of Calcutta at a Meeting held on wednesday. The 23 November 1870 (lecture by Moulvi Keramat Ali), Calcutta, 1871.

২১. *Muslim Community in Bengal*, P. 172

material improvement ; and that while the Society advocated the cause of English education, never did they encourage the adoption by their co-religionists of customs and habits inconsistent with the priciples of Islam."[২২]

মৌলবী কেরামত আলীর বক্তৃতার যে বিবরণী ১৮৭১ সালে প্রকাশিত হয়, তাতে ঐ সময়ে মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যদের একটি তালিকা সংযুক্ত হয়। তালিকাটি এরূপ :

পৃষ্ঠপোষক—স্যার উইলিয়াম গ্রে (ছোটলাট)
সভাপতি—কাজী আবদুল বারি
সহ-সভাপতি—আব্বাস আলী
সম্পাদক—আবদুল লতিফ

সদস্যবৃন্দ—প্রিন্স মোহাম্মদ রহিমুদ্দীন (মহীশূব পরিবার), শেখ এসাউ বিন কার্তাস, মির্জা আহমদ বেগ, মোহাম্মদ কাসিম আলী খান, মোহাম্মদ আবদুর রউফ, আবদুল হাকিম, সৈয়দ মর্তুজা বিহবিহানী, ডাক্তার মীর আশরাফ আলী, সৈয়দ আউলি আহমদ ও মীর লতাফত হোসেন।[২৩]

শিক্ষাসূচি : শিক্ষা-বিস্তার ও শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রেও মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। ১৮৬৯ সালে স্যার উইলিয়াম গ্রে কলিকাতা মাদ্রাসার পশ্চাৎমুখী শিক্ষা ব্যবস্থার সংস্কার সাধন করে একে কিভাবে পুনর্গঠিত করা যায় সে-সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য একটি তিন সদস্য বিশিষ্ট শিক্ষা-কমিশন গঠন করেন। সি. এইচ ক্যাম্বেল (প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার), জে. সাটক্লিফ (প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ) ও আব্দুল লতিফ ঐ কমিটিতে ছিলেন। সোসাইটি একটি সাধারণ সভায় এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে এবং সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কমিশনকে প্রদান করে। সোসাইটির অধিকাংশ সুপারিশ কমিশন গ্রহণ করেন।[২৪] ১৮৮২ সালের হান্টার কমিশনের কাছেও সোসাইটি বক্তব্য পেশ করেছিল। মুসলমানদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবে এরূপ আশঙ্কার কথা জানিয়ে সোসাইটি জনশিক্ষা পরিষদের গৃহীত নতুন শিক্ষানীতির সমালোচনা করে। ধর্মীয় শিক্ষা ও দান কার্যের জন্য প্রদত্ত যেসব সম্পত্তি আছে, সেগুলি যাতে দাতাদের অভিপ্রায় অনুযায়ী ধর্মীয় শিক্ষা ও সৎকার্যে ব্যয় হয়, সে বিষয়ে সোসাইটি কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার দানের ব্যবস্থা করে। ১৮৮৩ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি লর্ড রিপন কলিকাতা মাদ্রাসা পরিদর্শন করেন। তাঁর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য ২০ টাকা করে দুটি বার্ষিক

২২. Abstract of Proceedings of the Mahomedan Literary Society of Calcutta at a meeting held on Wednesday the 23rd November, 1870 (Lecture by Moulvi Keramat Ali), Calcutta 1871, PP. 151-152.

২৩. Ibid.

২৪. *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, P. 152

পুরস্কার দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। তা ছাড়া, সোসাইটি ও সোসাইটির ১১ জন সদস্যের প্রদেয় চাঁদার টাকায় (প্রায় ১৭,০০০ টাকা) আরও কয়েকটি ছাত্রবৃত্তি ও পুরস্কার ঘোষিত হয়।[২৫] ঐ সময় লর্ড রিপনকে দেওয়া এক স্মারকপত্রে আমীর আলীর নেতৃত্বে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র মাদ্রাসা শিক্ষার বিরোধী প্রস্তাবের নিন্দা করা হয় এবং মাদ্রাসা শিক্ষা চালু রাখার সপক্ষে সুপারিশ জানান হয়।[২৬]

ডেপুটেশন ও রিপ্রেজেন্টেশন : শিক্ষার মত সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রেও সোসাইটি উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছে। স্বসমাজের স্বার্থ রক্ষার জন্য সোসাইটি হয় সরকারের কাছে সাক্ষাৎকারে মিলিত হয়েছে, অথবা সরকারের অভিপ্রায় অনুক্রমে তাঁর কাছে আপন মতামত ব্যক্ত করেছে। কেন্দ্রীয় আইন সভা প্রস্তাবিত খোজাদের 'ল অব টেস্টামেন্টারি এণ্ড ইন্টেস্টেল সাকসেশন' বিষয়ক বিল সম্পর্কে সোসাইটি সরকারের কাছে স্বীয় অভিপ্রায় জ্ঞাপন করে। মুসলমান বিবাহে যে 'কাবিননামা' রীতি আছে তাতে সরকার 'টিকিট–কর' আরোপ করলে মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি এর বিপক্ষে আপত্তি জানিয়ে একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে ; সরকার তাঁর সিদ্ধান্ত বাতিল করেন।[২৭]

মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির গৌরবময় অধ্যায় প্রথম পঁচিশ বছরের ফল হল শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক এসব কর্মসূচি। ১৮৮৯ সালে সোসাইটির সম্প্রসারিত কার্যনির্বাহক কমিটির গঠনটি ছিল নিম্নরূপ :

পৃষ্ঠপোষক — স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন বেইলি (ছোটলাট)
সভাপতি — প্রিন্স মোহাম্মদ রহিমুদ্দীন (মহীশূর পরিবার)
সহ–সভাপতি — প্রিন্স মির্জা জাহান কদর বাহাদুর (অযোধ্যা পরিবার) ও প্রিন্স মোহাম্মদ নাসিরুদ্দীন হায়দার (মহীশূর পরিবার)।
সম্পাদক — নবাব আবদুল লতিফ

সদস্যবৃন্দ—প্রিন্স মির্জা আসমান জাহ্ (অযোধ্যা পরিবার), প্রিন্স মির্জা মোহাম্মদ জাহ্ আলী বাহাদুর (ঐ), আবদুল জব্বার, খান বাহাদুর, প্রিন্স মোহাম্মদ হরমুজ শাহ্ (মহীশূর পরিবার), প্রিন্স মোহাম্মদ বখতিয়ার শাহ্ (ঐ), হাজী সৈয়দ সাদিক শুস্তারি, মির্জা মোহাম্মদ বাকর শিরাজী, নবাব আহমদ হাসান খান, মোহাম্মদ আবদুর রউফ, এ. এফ. এম. আবদুর রহমান, আবদুল হাই, কাসিম আরিফ, বজলুল হক, হাফিজ মোহাম্মদ হাতিম, মীর লতাফত হোসেন, কলিমুর রহমান, আলী বক্স, মোহাম্মদ, নুরুল আলম।[২৮]

২৫. Ibid., P. 152
২৬. *Report of the Indian Education Commission, 1883*, P. 307
২৭. *of cit.*, PP. 152-53
২৮. *Op. cit.*, P. 139

১৮৮৫ সালের 'মেমোন বিল', ১৮৯১ সালের 'সহবাস-সম্মতি বিল' ইত্যাদি সম্পর্কে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি মুসলমান আইনের দিক থেকে নিজ মতামত সরকারকে জ্ঞাপন করে।[২৯]

১৮৯৩ সালে নবাব আবদুল লতিফের মৃত্যু হলে পর মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির কর্মোৎসাহে ভাটা পরে। তাঁর জ্যেঠ পুত্র ব্যারিস্টার এ. এফ. এম. আবদুর রহমান সোসাইটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। পিতার মত কর্মদক্ষতা ও সামাজিক প্রতিপত্তি পুত্রের ছিল না। তিনি সোসাইটির পূর্ব গৌরব অক্ষুণ্ন রাখতে পারেন নি। পূর্ব রীতির অনুসরণে রাজন্যবর্গের আগমন ও বিদায় উপলক্ষে আনুষ্ঠানিক সভা করার মধ্যে সোসাইটির কর্মসূচি সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। ১৮৯৫ সালে ছোটলাট চার্লস এলিয়টকে (১৮৯০–৯৫) বিদায়, আর্ল অব এলগিনকে ১৮৯৪ সালে অভ্যর্থনা ও ১৯৯৮ সালে বিদায় উপলক্ষে সভার আয়োজন হয়। ১৮৯৯ সালে লর্ড কার্জনকে ও ১৯০৫ সালে লর্ড মিন্টোকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। লর্ড কার্জন ঐ সভায় বলেছিলেন, "It will be the utmost pleasure and with profound respect that I shall receive from you during my tenure of office any representation that you may care to address to me, and I confidently rely upon such communications to assist me in the task of Government, as well as to broaden both my acquintancy and my sympathies with the Mahomedans of the Eastern World."

এর সঙ্গে বার্ষিক মেলাও নিয়মিত অনুষ্ঠিত হত। ১৯০১ সালে জনশিক্ষার পরিচালক স্যার আলেকজাণ্ডার পেডলার (১৮৯৯–১৯০৩) মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার সাধনের জন্য প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। তিনি যে ছয়জন সদস্যের মতামত জানতে চান তাঁদের মধ্যে নবাব আবদুর রহমান ছিলেন একজন।[৩০] তিনি মাদ্রাসা পাঠ্যসূচি সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপক্ষে রায় দেন।[৩১]

১৯০০ সালে সোসাইটির 'কার্যনির্বাহক কমিটি' ছিল এরূপ :
পৃষ্ঠপোষক—স্যার জন উডবার্ন (ছোটলাট)
সভাপতি—আবদুল জব্বার, খান বাহাদুর, সি. আই. ই.
সহ-সভাপতি—প্রিন্স কমর কাদের মির্জা আবেদ আলী বাহাদুর (অযোধ্যা পরিবার), নবাব কাদের সৈয়দ হোসেন আলী মির্জা বাহাদুর (নিজাম পরিবার), নবাব সৈয়দ মহম্মদ শুজাউল মূলক আশফদ্দৌলা জয়নুল আবেদীন, খান বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ

২৯. *The Moslem Chronicle*, 22 May 1897

৩০. অন্যান্য ব্যক্তি ছিলেন কলিকাতা মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক আমজাদ আলী, সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ আমীব হোসেন, ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট আবদুল মুনিম, চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিন্টেন্ডেন্ট মোহাম্মদ ইয়াকুব ও মহামেডান ডিফেন্স এসোসিয়েশনের সম্পাদক সৈয়দ করিম আগা।
Muslim Community in Bengal, PP. 36-69.

৩১. *The Moslem Chronicle*, 12 January 1901.

(ঐ), শামসুল উলেমা আবদুল হাই, শামসুল উলেমা জুলফিকার আলী, সৈয়দ মোহাম্মদ খান বাহাদুর, সাহেবজাদা আহমদ হোসেন খান (মহীশূর পরিবার)।

সম্পাদক—এ. এফ. এম. আবদুল রহমান, খান বাহাদুর

সহকারী-সম্পাদক—আহমদ, শামসুল উলেমা, ও মীর্জা আশরাফ আলী, শামসুল উলেমা।

সদস্যবৃন্দ— প্রিন্স মীর্জা কররাতুল আইন বাহাদুর (অযোধ্যা পরিবার), প্রিন্স মীর্জা মোহাম্মদ মকিম বাহাদুর (ঐ), সাহেবজাদা মোহাম্মদ ফরিদুল শাহ (মহীশূর পরিবার), সাহেবজাদা ওয়ালি মোহাম্মদ শাহ (ঐ), শামসুল উলেমা আতাওর রহমান, শামসুল উলেমা বেলায়েত হোসেন, খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন (বরিশাল), খান বাহাদুর খোন্দকার ফজলে রাব্বি (মুর্শিদাবাদ), খান বাহাদুর আলী নওয়াব চৌধুরী (ত্রিপুরা), আগা মীর্জা মোহাম্মদ বাকের শিরাজী, আগা সৈয়দ হোসেন শুস্তারি, আগা হাজী আলী মোহাম্মদ জাফর, হাজী শেখ মোহাম্মদ আবদুর রাজ্জাক, হাজী আহম্মদ ইব্রাহিম, সৈয়দ মেহদী হাসান খান ওরফে বাদশাহ (বোহরা), শেখ মোহাম্মদ আলী, গোলাম হোসেন আরিফ, চৌধুরী মোহাম্মদ এরশাদ আলী খান (রাজশাহী), জিল্লুর রহমান (তালিবপুর), আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুস সোবহান (বীরভূম), আবুল ফাত্তাহ মোহাম্মদ আবদুল হাফিজ (ছাপরা), আবু মঈন মোহাম্মদ আজদুদ্দীন (শাহবাজপুর), এ. কে. ফজলুল হক, এম–এ. বি–এল. মাহদুদ বিএ, বি–এল, কাজী আবদুল বারি, কাজী হাফিজ মোহাম্মদ আবদুল হামিদ, ইকরাম আলী খান, আবদুল্লাহ, ডাক্তার মীর্জা মোহাম্মদ মাসুম ও এ. কিউ. এম. নূরুল আলম (ফরিদপুর)।[৩২]

১৯২২ সালে সোসাইটির ইতিহাস সম্পর্কিত একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। তাতে সোসাইটির পতনশীল অবস্থানের কথা বলা হয়েছে।[৩৩] ১৯২৩ সালের সংশোধিত সমিতি–তালিকায় দেখা যায়, ঐ সময় সোসাইটির সদস্য সংখ্যা মাত্র ৪২ জন। নবাব আবদুল লতিফের অপর পুত্র ব্যারিস্টার এ. এফ. এম. আবদুল আলী ছিলেন সম্পাদক। আবুল কাসিম এম. এল. এ. সভাপতি ও এ. কে. ফজলুল হক সহ–সভাপতি ছিলেন। ঐ নথিতে বলা হয় যে, সোসাইটি যদিও কাজ করছে না, তথাপি এটি একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি।[৩৪]

মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ, কর্মসূচি, কার্যনির্বাহক কমিটি ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, তা থেকে আমরা নিম্নরূপ মন্তব্যগুলি করতে পারি :

৩২. Abstract of the Proceedings of an Extra-ordinary Meeting of the Committee of the Mahomedan Literary Society of Calcutta, 9th June, 1930, P. 11

৩৩. *A Brief History of the Mahomedan Literary Society of Calcutta*, 1922.

৩৪. *Revision of the List of Associations recognized by the Government, 1923*, P. 5

(ক) সোসাইটি প্রধানত শিক্ষা ও সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠান। ওয়াহাবীদের বিরোধিতা করা ও ইংরাজদের আনুগত্য স্বীকার করার পেছনে পরোক্ষভাবে রাজনৈতিক মনোভাব কাজ করেছে।

(খ) পশ্চাদপদ মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ইংরাজি ভাষা, ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞানের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির যে মৌলিক উদ্দেশ্য নিয়ে সোসাইটির জন্ম হয়েছিল, তা অনেকাংশে সফল হয়েছে।

(গ) সোসাইটি অভিজাত ও উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীর স্বার্থকেই বরাবর প্রাধান্য দিয়েছে ; সেখানে সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানের কথা তেমন গুরুত্ব পায়নি।

(ঘ) সোসাইটি ইংরাজির সাথে ফারসি ও উর্দু ভাষার চর্চা করেছে ; বাংলা ভাষার চর্চা তো দূরের কথা, উল্টো ঐ ভাষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করেছে। এটি সোসাইটির চরম অদূরদর্শিতারই পরিচায়ক।

(ঙ) শাসকশ্রেণীর আনুগত্য লাভের জন্য সোসাইটি তোষণনীতি গ্রহণ করেছে। বিনিময়ে স্বসমাজের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা আদায় করেছে।[৩৫] স্বাধীনতা স্পৃহা একেবারেই প্রকাশ পায়নি ; সাম্রাজ্যবাদী শাসনকে শুধু মেনেই নেয়নি, তাকে মদদও যোগিয়েছে। সোসাইটির ইংরাজি নামকরণ ইংরাজ প্রীতিরই লক্ষণাক্রান্ত।

(চ) মুসলমান সমাজের স্বার্থ সম্পর্কে সচেতন থেকে কতকগুলি সমস্যার যুগোপযোগী সমাধান দিয়েছে এবং সে-সূত্রে অংশত মুসলমানদের জাগ্রত ও একত্র করতে সমর্থ হয়েছে।

(ছ) ধর্ম শিক্ষার সাথে আধুনিক অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষার প্রচার করেছে। অবশ্য আরবি-ফারসির মাধ্যমে ধর্ম ও প্রাচ্যবিদ্যার সাথে ইংরাজির মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যার সমন্বয় সাধন করতে পারেনি।[৩৬]

(জ) সাধারণভাবে স্বজাতির স্বার্থের কথা ভাবলেও 'জাতীয়তা' সম্পর্কে সোসাইটির কোন পরিষ্কার ধারণা ছিল না। তবে ভারতীয় মুসলমান জাতীয়তার অস্ফুট অভিব্যক্তি ছিল।

(ঝ) মুর্শিদাবাদ, অযোধ্যা, মহীশূর প্রভৃতি রাজবংশের বৃত্তিভোগী ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত সন্তানগণ সোসাইটির সাথে জড়িত ছিলেন। তাঁরা সম্মানিত ও উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, কিন্তু তাঁরা পুরাতন মূল্যবোধ নিয়ে চলতেন, নতুন যুগের প্রাণস্পন্দন তাঁদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়নি। এই পুরাতন অভিজাত শ্রেণীর মনোভাব দ্বারা সোসাইটি প্রভাবিত হয়েছে।

৩৫. "লিটারেরী সোসাইটি চেয়েছিলেন ইংরেজদের পক্ষপুটে থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ কবতে।" *বাংলা সাহিত্যে মুসলিম মানস*, পৃ. ৮৮

৩৬ সৈয়দ আহমদ একপ সমন্বয় সাধন কবতে পেরেছিলেন। আলিগড় মহামেডান এ্যাংলো-ওবিয়েন্টাল কলেজে শিক্ষার মাধ্যমে এবং বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ রচনা ও পত্রিকা প্রকাশের দ্বারা গবেষণা কর্মের মাধ্যমে তিনি ইউরোপের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেন। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে তিনি এ বিষয়ে প্রথম পথপ্রদর্শক।

(ঞ) সোসাইটির কর্মক্ষেত্র প্রধানত কলিকাতা শহরের উপর তলার মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তবে শহরের ও মফস্বলের অনুরূপ কোন কোন প্রতিষ্ঠান গড়তে অনুপ্রাণিত করেছে।[৩৭]

(ট) শাসকশ্রেণীর ও মুসলমান সম্প্রদায়ের পরস্পরের প্রতি ভ্রান্ত ধারণা ও অমূলক অবিশ্বাস দূর করে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সোসাইটি সেতুবন্ধনের কাজ করেছে। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে এটিই সোসাইটির বড় সাফল্য ছিল।

(ঠ) প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব থাকায় নব্যশিক্ষিত বুদ্ধিজীবীদের কোন বিপ্লবী চেতনায় উদ্বোধিত করতে পারেনি। বরং সামন্তবাদী মনোভাব নিয়ে উদীয়মান মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে উপেক্ষাই করেছে। সোসাইটির পতনের এটিই অন্যতম কারণ।[৩৮]

(ড) সোসাইটির সংগঠনশীল দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল। কোন 'মুখপত্র' বের করা, অনুবাদ করা বা বই পুস্তক প্রকাশ করার দিকে একেবারেই নজর দেয়নি। এমন কি, সভার ধারাবিবরণীগুলি সংগ্রথিত করার চেষ্টা করেনি। কোন স্বতন্ত্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও সোসাইটি গড়েনি। এটি সোসাইটির চিন্তাশক্তি ও দূরদৃষ্টির অভাবকেই সূচিত করে।

(ঢ) নামের সাথে মহামেডান শব্দ ধারণ করলেও সোসাইটিতে হিন্দু-খ্রিস্টান বিদ্বান ব্যক্তিও অংশগ্রহণ কবতে পারতেন। সমকালীন সভাসমিতিগুলিতে সচরাচব এরূপটি দেখা যেত না। এদিকে থেকে সোসাইটির একটি উদার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল।

(ণ) ভাষাগত দূরত্ব ও ব্যবধান থাকায় এবং বাঙালির স্বার্থ সম্পর্কে বিশেষ দৃষ্টি না থাকায় সোসাইটির ফল জাতির জীবনে সুদূরপ্রসারী হয়নি।

(ত) স্বাতন্ত্র্যবাদী মনোভাব পোষণ না করলেও সেকালে অন্যদের স্বাতন্ত্র্যকামী চেতনার প্রতিবাদ বা প্রতিকার সোসাইটি করেনি।

(থ) সুস্পষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শ না থাকায় জাতির কাছে সোসাইটি সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনামা তৈরি করতে পারেনি।

(দ) সোসাইটি ইসলামপন্থী ছিল, এটিই তার মৌলিক পরিচয়। বলা যায়, স্মরণ করে রাখার মত এটিই তার ভাবমূর্তি।

মাদ্রাসা লিটারেরী এণ্ড ডিবেটিং ক্লাব (১৯৭৫)

'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় 'কলিকাতা মাদ্রাসা লিটারেরী এণ্ড ডিবেটিং ক্লাব' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৭৫ সালে। এটি ঐ মাদ্রাসার ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান ছিল।

৩৭ সৈয়দ আহমদ আবদুল লতিফের কাছ থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে ১৮৬৬ সালে কলিকাতা থেকে প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরে 'গাজীপুর সায়েন্টিফিক সোসাইটি' স্থাপন করেন। আবদুল লতিফ এর কার্যকবী কমিটির সদস্য মনোনীত হন। কলিকাতা মাদ্রাসা লিটারেরী ক্লাব, মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি, কোহিনূর সাহিত্য সমিতি (ফরিদপুর), বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি ইত্যাদি সোসাইটির অনুকরণে প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩৮. সোসাইটির কার্যনির্বাহক কমিটিতে শিক্ষিত যুবকদের স্থান প্রথম দিকে তো ছিলই না, ১৯০০ সালেও এদের সংখ্যা নগণ্য ছিল। এদের মধ্যে বাঙানি মুসলমানের সংখ্যা আরও কম ছিল।

সাহিত্যচর্চা ও জ্ঞানানুশীলন এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। ক্লাব বিতর্ক-সভার আয়োজন করে সমাজ-শিক্ষা-সংস্কৃতি বিষয়ক সমস্যার উপর আলোচনা করত। 'দি মাদ্রাসা লিটারেরী বাজেট' নামে একখানি মাসিক পত্রিকা 'ক্লাবের সদস্যগণের সম্পাদনা'য় প্রকাশিত হত। পত্রিকার প্রথম খণ্ডের প্রথম সংখ্যা ১৮৭৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার 'মিনার্ভা প্রেস' থেকে মহেন্দ্র নাথ সোম কর্তৃক এটি মুদ্রিত হয়।[৩৯]

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন (১৯৭৮)

'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপনের পনের বছর পরে কলিকাতার 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয় (১২ মে ১৮৭৮)। এটি মুখ্যত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ; তবে সমাজ ও শিক্ষা এর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য : ১৮৮৩ সালে এসোসিয়েশনের প্রথম পঞ্চ বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। এব উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে এতে বলা হয়, "The Association has been formed with the object of promoting, by all legitimate and constitutional means, the well-being of the Mussulmans of India. It is founded essentially upon the principle of strict and loyal adherence to the British Crown. Deriving its inspirations from the noble traditions of the past, it proposes to work in harmony with western culture and the progressive tendencies of the age. It aims of the political regeneration of the Indian Mahomedans by a moral revival and by constant endeavours to obtain from Government a recognition of their just and reasonable claims."[৪০]

মুসলমানদেব অবস্থার কথা সরকারের কাছে তুলে ধরার মতো প্রতিনিধিমূলক কোন যোগ্য প্রতিষ্ঠান ছিল না। এজন্য রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও আইন সংক্রান্ত বিষয়ে তাদের স্বার্থ ঠিক মতো প্রতিফলিত হত না। ভারতের অমুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের অভাব ছিল না। স্বসমাজের এই শূন্যতা ও অসুবিধা দূর করার জন্য ব্যারিস্টার সৈয়দ আমীর আলী ' ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ঐ বছর কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হন। এসোসিয়েশনের সম্পাদকের দায়িত্বভার তিনি নিজ স্কন্ধেই তুলে নেন। পাটনার নবাব আমীর আলী সভাপতি ও সৈয়দ আমীর হোসেন সহ-সভাপতি হন। ১৮৮৩ সালে শাখা-এসোসিয়েশন স্থাপিত হন ; তখন নামের আগে 'সেন্ট্রাল' শব্দ যুক্ত হয়।

গঠনতন্ত্র : ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন প্রথম থেকেই একটি সুগঠিত ও সুপরিকল্পিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক প্রতিবেদনে

৩৯. *Bengal Library Catalogue*, 1st. Quarterly Report, 1877.

৪০. Rules and Objects of the Central National Mahomedan Association and its Branch Associations with the Quinqunnial and Annual Reports and List of Members. Thomas S. Smith, City Press, Calcutta, 1885, P. 11

গঠনতন্ত্রের বিধিবিধান লিপিবদ্ধ হয়েছে। ২০টি মুখ্যধারা ও ১৮টি উপধারার সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়। এর উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ধারা এরূপ :

মুখ্যধারা : এসোসিয়েশনের একজন সভাপতি, তিনজন সহ-সভাপতি একজন সম্পাদক, একজন যুগ্ম-সম্পাদক ও দুজন সহকারী সম্পাদক থাকবেন। (১)

২৪ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বাহক কমিটির উপর এসোসিয়েশনের দায়িত্বভার ন্যস্ত থাকবে ; কমপক্ষে ৫ জনের উপস্থিতিতে সভার 'কোরাম' হবে। (৬)

কার্যনির্বাহ কমিটি একজন অমুসলমানকে স্বাভাবিক নিয়মমেই সাধারণ সদস্য নির্বাচন করতে পারবেন। কেবল নিজ সম্প্রদায়ের স্বার্থজড়িত প্রশ্ন ছাড়া তিনি অন্যত্র সাধারণ সদস্যেব মত ভোট দানের অধিকার পাবেন। (৮)

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এসোসিয়েশনের সকল আদান-প্রদান ইংরাজির মাধ্যমে করবেন। (১৭)

যুগ্ম-সম্পাদক মাতৃভাষায় ঐরূপ আদান-প্রদান করবেন। (১৮)

সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ এসোসিয়েশনের বার্ষিক সভায় ধারাবিবরণী ও হিসাব পত্র দাখিল করবেন। জুলাই মাসে এরূপ সভা হবে। সভা কার্যনির্বাহক কমিটির ঐ ধারাবিবরণী ও হিসাবপত্র বৈধ বিবেচনায় অনুমোদন করবেন।

উপধারা : বিশেষভাবে মুসলমানেব ও সাধারণভাবে সকল শ্রেণীর মানুষের মঙ্গলের জন্য কার্যনির্বাহক কমিটি যে-কোন রাজনৈতিক দলের সহিত সহযোগিতা করতে পারবেন। (৭)

মুসলমান সম্প্রদাযেব রাজনৈতিক শিক্ষার উন্নতির জন্য কার্যনির্বাহক কমিটি মাঝে মাঝে বক্তৃতার আয়োজন করবেন, এতোদ্দেশ্যে সময় ও স্থান তাঁরা স্থির করবেন। (৮)

শাখা এসোসিয়েশনের সভাপতিগণ পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় এসোসিযেশনের অনারেরি সহ-সভাপতি হিসাবে গণ্য হবেন এবং কলিকাতায় অবস্থানকালে তাঁরা কার্যনির্বাহক কমিটির অথবা এসোসিশয়েনের সাধারণ অথবা বিশেষ যে-কোনো সভায় ভোট দিতে পারবেন। (৭)

শাখা-এসোসিয়েশনগুলি স্থানীয় বিষয় ও নিজস্ব অর্থ-সমস্যা স্বাধীনভাবেই পরিচালনা করবেন। তবে মুসলমান জনসাধারণের প্রশ্নের ক্ষেত্রে এবং সরকারের জাতীয় স্বার্থে প্রতিনিধি প্রেরণের ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সঙ্গে তাঁদের ভাবধারার আদান-প্রদান করতে হবে এবং ঐ প্রতিনিধি প্রেরণ সম্ভাব্যক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের মাধ্যমেই করতে হবে। (১১)

শাখা এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি ও সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সদস্যভুক্ত হবেন।[৪১] (১৫)

Rules Objects of the Central National Mahomedan Association and its Branch Associations with the Quinquinnial and Annual Reports and List of members, Thomas and Smith City Press, Calcutta, 1885, PP. iv-ix.

এসোসিয়েশনের শুরুতে (১৮৭৮) সদস্য সংখ্যা ছিল ২০০ জন, পাঁচ-ছয় বছরের মাথায় তা ৭০০ জনে গিয়ে দাঁড়ায়। প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে যে সদস্যতালিকা প্রকাশিত হয় তাতে দেখা যায়, বাংলা, ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং ইংলণ্ডের অধিবাসী এর সদস্যভুক্ত হযেছে। লণ্ডন ন্যাশনাল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের সম্পাদিকা শ্রীমতি ম্যানিং এর জীবন-সদস্যা ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে বাংলায় বগুড়া, চট্টগ্রাম, হুগলী, জাহানাবাদ এবং বাংলার বাইরে ভাগলপুর, পাটনা, গয়া, মতিহারী প্রভৃতি স্থানে শাখা খোলা হয়। তাছাড়া 'মীরাট সমিতি', 'লক্ষ্ণৌ রিফর্ম এসোসিয়েশন', 'বোম্বে আঞ্জমনে ইসলাম' কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের আদর্শে ও অনুকরণে স্থাপিত হয়। এগুলির সহিত কেন্দ্রের সম্পর্ক ছিল।[৪২] ১৮৮৩-৮৪ সালে এসোসিয়েশনের 'কার্যনির্বাহক কমিটি'র গঠনটি ছিল এরূপ :

সভাপতি—প্রিন্স মোহাম্মদ ফাররুক শাহ (মহীশূর পরিবার)

সহ-সভাপতি—নবাব মীর মোহাম্মদ আলী, জমিদার (পদমদী, ফরিদপুর), সৈয়দ আমীর হোসেন, খান বাহাদুর (প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট) ও হাজী নূর মোহাম্মদ।

সম্পাদক—সৈয়দ আমীর আলী এম. এ.

যুগ্ম-সম্পাদক—কবিরুদ্দিন আহমদ, খান বাহাদুব

সহকারী সম্পাদক—সিরাজুল ইসলাম বি. এ., বি. এল ও বদরুদ্দীন হায়দার।

সদস্য—মোহাম্মদ ইউসুফ বি. এ., দীন মোহাম্মদ, গোলাম সারওয়ার (অনুবাদক, কলিকাতা হাইকোর্ট), সৈয়দ মোজাফফর হোসেন (সায়েস্তাবাদ, বরিশাল), মির্জা মোহাম্মদ খলিল শিরাজী, আগা শেখ মোহাম্মদ জিলানী, জহিরুদ্দীন আহমদ (ডাক্তার), হাজি আবদুল্লাহ্ দগমান, শাহ মীর লতফত হোসেন (মোক্তার, কলিকাতা হাইকোর্ট), শালিগ্রাম সিংহ, কে. এম. চট্টোপাধ্যায়, হাকিম মোহাম্মদ সাজ্জাদ, আবদুস সালাম এম.এ., আবদুল হাসান খান, আশরাফউদ্দীন আহমদ (মতওয়াল্লী, হুগলী ইমামবাড়া) ও আবুল খায়ের এম. এ. (অধ্যাপক, কলিকাতা মাদ্রাসা)।[৪৩]

কর্মসূচি : প্রথম পাঁচ বছরের কর্মসূচিকে চারভাগে ভাগ করা যায়, যথা— সমাজ, শিক্ষা ও সাহিত্য, আইন ও রাজনীতি।

সমাজ : এসোসিযেশন শহরের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমালদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে, কিন্তু অর্থাভাবে অল্পকালের মধ্যে সেটি বন্ধ হয়ে যায়। শহরের মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্য ও বিচ্ছিন্নভাব দূর করার জন্য সামাজিক মিলন-উৎসবের আয়োজন করে। বিবাহ ও অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানে মুসলমানরা অযথা অর্থব্যয় করে। এসোসিয়েশন এ ব্যয় সংকোচের অভিযান চালায় এবং শাখা-এসোসিয়েশনকে অনুরূপ কাজে উৎসাহিত করে। উপরি উক্ত বিষয় নিয়ে একটি প্রবন্ধ-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। আবদুস সালাম বি.এ. ঐরূপ প্রবন্ধ লিখে স্বর্ণপদক পান।[৪৪]

৪২. *Op. cit*, PP 3-4
৪৩. *Ibid*. PP. 14-15
৪৪. *Op. cit., pp*. 5-6

শিক্ষা ও সাহিত্য : স্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সুস্থ সাহিত্য সৃষ্টি এবং মাতৃভাষার সাহিত্যের উন্নতির জন্য এসোসিয়েশন প্রচার চালায়। ১৮৮০ সাল থেকে পদক ও অন্যান্য পুরস্কার দান করে এ ব্যাপারে উৎসাহিত করে আসছে। ফারসি কাব্যের উপর প্রবন্ধ লিখে আবদুল ওয়ালি অপর একটি স্বর্ণপদক পান। ১৮৮২ সালে ১৭ জানুয়ারি তারিখের পুরস্কার বিতরণী সভায় লর্ড রিপন উপস্থিত ছিলেন। তাঁর স্মৃতির সম্মান স্বরূপ ঐ বছর থেকে মুসলমান ছাত্রদের জন্য চারটি 'রিপন স্কলারশিপ' দেওয়ার ব্যবস্থা গৃহীত হয়। ছাত্রদের সাহায্য দানের জন্য ১৫,০০০ টাকার একটি তহবিল গঠনের পরিকল্পনাও নেওয়া হয়। নবাব খাজা আহসানুল্লাহ (জীবন সদস্য) ৩,০০০ টাকা, প্রিন্স মোহাম্মদ ফারুক শাহ (সভাপতি) ১,০০০ টাকা, হাজি নূর মোহাম্মদ (সহ-সভাপতি) ১,০০০ টাকা চাঁদা দিতে সম্মত হন। পরবর্তীকালে ইঞ্জিনিয়ারিং ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের ঐ বৃত্তি দেওয়া হয়।[৪৫] কলিকাতা মাদ্রাসাকে কলেজ স্তরে উন্নীত করার জন্য এসোসিয়েশন প্রথম থেকেই চেষ্টা করে এসেছে। ১৮৮৪ সালে মাদ্রাসায় কলেজ মানের ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৭৪ সালের জুলাই মাসে মাদ্রাসার লিটারেরী ক্লাব এ বিষয়ে এসোসিয়েশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রক্ষণশীলরা বাধা দেওয়ায় নারীশিক্ষার বিষয়টি প্রায় অচল অবস্থায় ছিল। এসোসিয়েশন একটি 'স্ট্যাণ্ডিং কমিটি' গঠন করে এবং প্রগতিশীল ও রক্ষণশীলদের কাছে গ্রহণযোগ্য এর একটি সমাধান বের করার চেষ্টা করে।[৪৬]

আইন : এসোসিয়েশন ১৮৭৭ সালের ১০ ধারা আইনের দোষত্রুটি সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরকারের অভিপ্রায় অনুযায়ী 'কাজী বিল' সম্পর্কেও এসোসিয়েশন অভিমত জ্ঞাপন করে। মুসলমানদের একটি পুরাতন ও প্রয়োজনীয় এজেন্সির স্বপক্ষে উক্ত বিলটি আইনে পরিণত হয়। বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ সংক্রান্ত রেজিস্ট্রেশন খসড়া বিলের প্রতিও এসোসিয়েশনের দৃষ্টি পড়ে। বিবাহের রেজিস্ট্রেশন বাধ্যতামূলক হবে না পূর্বের মতো ঐচ্ছিক থাকবে এ নিয়ে মতভেদ ছিল। বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদের এই বিতর্কে এসোসিয়েশন একটি মধ্যপন্থার পরামর্শ দেয়। অ-রেজিস্ট্রিকৃত বিবাহে কতকগুলি প্রতিবন্ধকসূচক শর্ত আরোপের কথা বলা হয়। সরকার শেষ পর্যন্ত বিবাহ-রেজিস্ট্রেশন বিলটি নাকচ করে দেন।[৪৭]

রাজনীতি : এসোসিয়েশন বড়লাট লর্ড রিপনকে সংবর্ধনা ও ছোটলাট স্যার এ্যাসলি ইডেনকে বিদায়-সম্ভাষণ জ্ঞাপন করে। ১৮৮২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে সংবর্ধনা কালে লর্ড রিপনকে এসোসিয়েশন ২৮টি পরিচ্ছেদের একটি দীর্ঘ 'স্মারকপত্র' প্রদান করে।[৪৮] এটি মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে পরবর্তীকালে সরকারের গৃহীত নীতিসমূহের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে।

৪৫. *The Moslem Chronicle*, 21 March 1895
৪৬ *Op Cit.*, pp 6-8
৪৭ *Ibid.*, p. 9
৪৮ *Ibid.*, p. 10

স্মারকপত্র : বস্তুত এসোসিয়িশনের সম্পাদক সৈয়দ আমীর আলীর সুচিন্তিত অনুধ্যানের ফল ১৮৮২ সালের এই 'স্মারকপত্র'। তিনি স্বয়ং রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিলেন বলে যুগের স্পন্দনটি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। হিন্দু সম্প্রদায়ের সাহিত্য, সভা-সমিতি, ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন, পত্র পত্রিকা, রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদির সহায়তায় যে জাতীযতাবাদ ও পুনর্জাগরণের জোয়ার এসেছে তিনি তার অন্তর্লীন মর্মসুর উপলব্ধি করেছিলেন। স্বসমাজের মৃতপ্রায় অবস্থার প্রেক্ষাপটও তাঁর জানা ছিল। ইংরাজ শাসকগোষ্ঠীর বর্তমান নমনীয় ও সহানুভূতিপূর্ণ নীতি সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। এরূপ পরিস্থিতিতে সমাজ-স্বার্থে হাল ও পাল কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়, তারই পূর্ণ রূপ এই স্মারকপত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। মুসলমান সমাজের অনগ্রসরতা, শিক্ষায় পশ্চাদবর্তিতা, অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও রাজনৈতিক নিষ্ক্রিয়তার একটি ইতিহাসভিত্তিক তথ্যপূর্ণ পটভূমি রচনা করে প্রতিবন্ধক স্বরূপ এগুলির অবসান কামনা করেছেন এবং তৎসঙ্গে সমাজের উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য বিশেষ ও স্বতন্ত্র দাবী উত্থাপন করেছেন। একজন উদ্দীপ্ত বুদ্ধিজীবী হিসাবে যে আইনানুগ নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমাজ উন্নয়নের আদর্শে এসোসিয়েশনেব লক্ষ্য নিরূপিত করেছিলেন এই স্মারকপত্রে অনেক কিছুর সীমাবদ্ধতার মধ্যে সে ভাবটি স্পন্দিত হয়েছে। মুসলমান ব্রিটিশ সরকারের অনুগত কিন্তু বর্তমান দুর্গতির জন্য তাদের ক্ষোভ আছে, ইংরাজ শাসকদের গৃহীত নীতির জন্য মুসলমানদের দুরবস্থা, সুতরাং তাদের অবস্থার উন্নতি শাসকশ্রেণীর সহানুভূতির দ্বারাই সম্ভব—স্মারকপত্রের এটাই মূল সুর। তিনি প্রধানত শিক্ষা ও চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সুযোগ-সুবিধা চেয়েছেন। তিনি ইংরাজি শিক্ষার সমর্থক ছিলেন। দারিদ্র্যহেতু ব্যয়বহুল ইংরাজি স্কুল-কলেজে লেখাপড়া করা সম্ভব হচ্ছে না। এজন্য একাধারে মাদ্রাসাগুলিতে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়াব ব্যবস্থা করা, মুসলমান অঞ্চলে মুসলমান শিক্ষক ও ইনস্পেক্টর নিয়োগ করার কথা বলেন, অন্যধারে মহসিন ফাণ্ডের ও অন্যান্য ওয়াকফ সম্পত্তির টাকা কেবলমাত্র মুসলমান শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও ছাত্রদের শিক্ষার জন্য ব্যয়িত হবে — এরূপ অভিমত জ্ঞাপন করেন। শিক্ষা-বিভাগ, বিচার-বিভাগ, প্রশাসন-বিভাগ, পররাষ্ট্র-বিভাগ সর্বত্র মুসলমান কর্মচারীর সংখ্যা খুবই কম। মুসলমান যোগ্যপ্রার্থী থাকা সত্ত্বেও নিয়োগকর্তার বঞ্চনার জন্য চাকরি পাচ্ছে না, এ অভিযোগ স্মারকপত্রে করা হয়। কেউ চাকরি পেলেও অনেক সময় তাকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র হয়। কলিকাতা ও মফস্বলে সরকারি উচ্চ চাকরিতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টানের সংখ্যা কিরূপ ছিল তার একটা তালিকা দিয়ে বলা হয়েছে, মুসলমান না জনসংখ্যার অনুপাতে না শিক্ষার অনুপাতে ঐসব চাকরিতে স্থান পেয়েছে। ইংরাজি শিক্ষায় মুসলমানরা পশ্চাদপদ, সুতরাং প্রতিযোগিতায় তারা সম্পূর্ণ অক্ষম। এক্ষেত্রে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলমানদের জন্য চাকরিতে নিয়োগ পদ্ধতির স্বতন্ত্র ব্যবস্থা না হলে অধিক পরিমাণ চাকরি পাওয়া সম্ভব হবে না। দেশের খয়রাতি সম্পত্তিগুলির সুষ্ঠু তদারকির ব্যবস্থা করে সেগুলির অর্থ শিক্ষা খাতে নিয়োজিত করার জন্য একটি এবং মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা বিবেচনা করে চাকরি

ক্ষেত্রে নিয়োগের বাস্তব পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য অপর একটি কমিশন প্রতিষ্ঠার অনুরোধ ঐ স্মারকপত্রে করা হয়েছে। স্মারকপত্রে বিহারে নাগরির পরিবর্তে আরবি লিপি রাখা এবং আদালতের ভাষারূপে উর্দু চালু রাখার পক্ষে ওকালতি করা হয়েছে। মুসলমানদের দুরবস্থা কেবল মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য ক্ষতিজনক নয়, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের স্বার্থেরও পরিপন্থী হবে বলে উপসংহারে মন্তব্য করা হয়েছে। [৪৯]

কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের এই স্মারকপত্র ব্যর্থ হয়নি, ভারত সরকার এর নকল প্রাদেশিক সরকার ও শিক্ষা-বিভাগ, সভা-সমিতি ও হান্টার কমিশনের কাছে পাঠান। এঁদের মতামতের ভিত্তিতে এবং হান্টার কমিশনের সুপারিশে ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই বড়লাট লর্ড ডাফরিনের এক শিক্ষা প্রস্তাবে মুসলমানদের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়।

ডেপুটেশন ও রিপ্রেজেন্টেশন : কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন অধিকাংশ ডেপুটেশন দিয়েছে বড়লাট ও ছোটলাটের কাছে তাঁদের আগমন ও বিদায়কালীন সংবর্ধনার সময়। ১৮৮৭ সালের ১২ নভেম্বর করাচিতে এসোসিয়েশনের এক প্রতিনিধি দল লর্ড ডাফরিনের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং মুসলমানদের অনুন্নত অবস্থার কথা ব্যক্ত করে। ১৮৮৮ সালের ২৪ মার্চ কলিকাতায় রাজভবনে অনুষ্ঠিত বিদায় সংবর্ধনায় তিনি স্বীকার করেন যে, ঐতিহাসিক কারণে মুসলমানদের অসন্তোষজনক অবস্থায় পড়তে হয়েছে। তিনি আশ্বাস দেন যে, তাঁদের দুরবস্থা দূর করার সংগ্রামে তাঁরা সরকারের সহানুভূতি ও সমর্থন পাবেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন সৈয়দ আমীর আলী।[৫০] ১৮৮৮ সালে ২২ ডিসেম্বর তারিখে নব নিযুক্ত বড়লাট ল্যান্সডোনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। ১২০ জনের এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রিন্স ফাররুক শাহ। তিনি এক মানপত্রে ভাঁরতীয় মুসলমানরা অন্য সম্প্রদায়ের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছে তার চিত্র তুলে ধরেন। বড়লাট প্রত্যুত্তরে জানান যে, মুসলমানরা সংখ্যানুপাতে সম্পদের ভাগ পাচ্ছে না ; তিনি বলেন যে, সঙ্ঘশক্তির অভাবে নিজেদের বক্তব্য তুলে ধরতে না পারার দরুন তারা সরকারী সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।[৫১]

সভা : কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের ১৮৮৮৩-৮৪ সালের বার্ষিক ধারাবিবরণীতে সদস্য-সংখ্যা ছিল ৭০০। আগের বছর ৬০০ ছিল। ১৮৮৩ সালের ৩৬০ জন সদস্যের এই তালিকায় মুসলমান ছাড়া হিন্দু, খ্রিস্টান, পার্সি (মোট ২৯) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের লোক আছেন। বিত্ত ও বিদ্যার দিক থেকে শ্রেণী বিন্যাস করলে দেখা যায় যে, এতে প্রধানত

Memorial of the National Mahomedan Association, Calcutta, February 1882 (Reprinted) in *Ameer Ali : His Life and Works,* edited by K. K. Aziz, Lahore, pp. 23-40.

৫০. Ram Gopal–*Indian Muslims, A Political History (1858-1947)*, Asia Publishing House, Calcutta 1964 (Reprinted), pp. 80-81.

৫১. *Ibid,* p. 81

নবাব, রাজা, জমিদার শ্রেণীর সামন্তপতি আছেন এবং সরকারি কর্মচারী, আইন ব্যবসায়ী, ডাক্তার, শিক্ষক প্রভৃতি নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত আছেন। পেশার দিক থেকে এরূপ একটি তালিকা নির্ণয় করা যায় : [৫২]

অভিজাত শ্রেণী		সরকারি কর্মচারী		স্বাধীন পেশাজীবী		অন্যান্য		পেশা অজ্ঞাত
জমিদার	২৫	ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	১৯	উকিল	১	তালুকদার	১	১৭৩
নবাব	৯	অনুবাদক, কেরানী	১৯	ব্যারিস্টার	৮	দেওয়ান	২	
প্রিন্স	৯	সব-রেজিস্ট্রার	১০	মোক্তার	৭	মতওয়াল্লী	১	
রাজা	১	পুলিশ কর্মচারী	৮	এটর্নি	৩	ব্যবসায়ী	১	
		মুন্সেফ-জজ-সাবজজ	১২	ডাক্তার	৬			
		ডেপুটি কলেক্টব	৪	হাকিম	২			
		পেসকার	২	স্কুল শিক্ষক	৫			
		ম্যাজিস্ট্রেট, সহকাবী-ম্যাজিস্ট্রেট	২	অধ্যাপক	২			
		ডেপুটি স্কুল ইনস্পেক্টর	১					
	৪৪		৭৭		৬১			১৭৩

পুরাতন অভিজাত শ্রেণী (১২.৫/) অপেক্ষা নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর (৮৭.৫/.) সংখ্যা বেশি। কার্যনির্বাহী কমিটিতে এক প্রিন্স ফাররুক শাহ ও জমিদার মীর মোহাম্মদ আলী ছাড়া অন্যরা মধ্যবিত্তের লোক। মহামেডান লিট্যারেরী সোসাইটির সাথে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের এখানেই একটা বড় রকম পার্থক্য ছিল। প্রফেসর এ. কে. নজমুল করিম এসোসিয়েশনকে উদীয়মান বাঙালি মুসলমান মধ্যবিত্তের 'মুখপত্র' বলে অভিহিত করেছেন।[৫৩]

পরিণতি : ১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হলে এবং সম্পাদকের পদ ত্যাগ করলে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের কর্মোদ্দীপনায় ভাটা পড়ে। ১৯০৪ সালে অবসর গ্রহণ করে সৈয়দ আমীর আলী লন্ডনে স্থায়ী বসবাস শুরু করেন। তখন এসোসিয়েশনের সাথে তাঁর সম্পর্ক প্রায় ছিন্ন হয়ে যায়। সৈয়দ আমীর আলীর পর এসোসিয়েশনের সম্পাদকের দায়িত্ব নেন পাটনার সৈয়দ আমীর হোসেন (১৮৯৩)। দু-তিন বছরের মধ্যেই এসোসিয়েশনের সভ্যদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। ফলে এর পূর্বের মর্যাদা হ্রাস পায়। ১৮৯৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি 'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত একটি পত্রে সম্পাদক সৈয়দ আমীর হোসেনকে পদত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। এসোসিয়েশনের গঠনতন্ত্র সংস্কারের প্রশ্নেও সভ্যদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা

৫২. *Muslim Community in Bengal, pp.* 225-26.
৫৩. *The Modern Muslim Political Elite in Bengal*, p. 300.

দেয়।[৫৪] 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন' (১৮৯৬) অভিযোগ করে যে, সমাজের চোখে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন বিরক্তির কারণ হয়েছে, শহরের নেতৃবৃন্দ সভায় বড় একটা যোগদান করে না।[৫৫]

ঐ সময়ের দিকে সোসাইটি ও এসোসিয়েশন উভয় প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। 'মোসলেম ক্রনিকলে' মন্তব্য করা হয় — "...the only service of activity which has been characteristic of our Associations (i. e. **MLS** and **CNMA**) is to be seen in dancing attendance on coming and retiring of Viceroys and Lieutenant Governors, and swallowing in silence bitter replies to unsolicited, unasked for fulsome addresses of welcome and farewell."[৫৬]

মুসলমান সমাজের উন্নতি বিধানের মৌলিক উদ্দেশ্য এক হওয়া সত্ত্বেও সোসাইটি ও এসোসিয়েশনের মধ্যে মতৈক্য অপেক্ষা মতবিরোধই বেশি ছিল। এর প্রধান কারণ আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্ব। উভয়ে মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান, উভয়ের কর্মস্থল কলিকাতা। আবদুল লতিফ কলিকাতা মাদ্রাসার জুনিয়ার স্কলারশিপ পাশ, আমীর আলী বিলাত-ফেরত ব্যারিস্টার। বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ দ্বারা উভয়ে উন্নতিব শিখরে আরোহণ করেছেন। দৃষ্টিভঙ্গির দিক দিয়েই তাঁদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য। আবদুল লতিফ রক্ষণশীল সংস্কারক ছিলেন, আমীর আলী ছিলেন প্রগতিশীল সংস্কারক। মাদ্রাসা শিক্ষাব সংস্কার নিয়ে তাঁরা একমত হতে পাবেননি। আবদুল লতিফ আরবি-ফারসি ভাষাসহ ধর্মশিক্ষা অক্ষুণ্ন রাখতে চেয়েছেন, আমীর আলী ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। এসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সৈয়দ আমীর হোসেন মাদ্রাসা তুলে দেওয়ার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। আমীর আলীর প্রস্তাবিত সরকারি চাকুরির ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ও সুবিধার দাবি আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আহমদ যুক্তি-যুক্ত মনে করেননি। উইলফ্রেড স্কয়েন ব্লান্ট দুই ব্যক্তিত্বের মধ্যে তিক্ত সম্পর্কের কথা বলেছেন : তাঁর ভাষায়— "It is a pity they (i, e, Abdul Latif and Ameer Ali) hate each other so that they cannot join any common action."[৫৭]

মীর মশাররফ হোসেন সোসাইটি ও এসোসিয়েশনের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের কথা বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'সাহিত্য-সমিতি ও জাতীয় সমিতির মধ্যে মর্মগত, আত্মগত, ব্যক্তিগত, অব্যক্ত মনোমালিন্য' ছিল।[৫৮] 'ইসলাম-প্রচারকে' সৈয়দ এমদাদ আলীও উভয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অনৈক্যের কথা বলেছেন ; সমাজের গভীরে এগুলির প্রভাব প্রসারিত হয়নি। তিনি লিখেছেন, "কেহ কেহ বলিতে পারেন, আমাদের মহামেডান লিটারেরী

৫৪. *The Moslem Chronicle,* 26 December 1896.
৫৫. *Ibid.*, 29 February 1896.
৫৬. *Ibid.*, 3 Ocober 1896.
৫৭. *India under Ripon–A Private Diary.*
৫৮. মীর মশাররফ হোসেন, 'সৎপ্রসঙ্গ', *কোহিনুর,* ভাদ্র ১৩০৫।

সোসাইটি, সেন্ট্রাল মহামেডান এসোসিয়েশন প্রভৃতি সভা আছে, এই সভাসমূহের যাহারা নেতা, তাঁহারা যদি একযোগ হইয়া কার্য করেন, তবেই ত আমাদের নেতার অভাব পূরণ হয়। আমরা যেরূপ আদর্শ নেতার (সর্বজনমান্য নেতা) কথা বলিয়াছি, এ সমুদয় সমিতিতে কি তেমন কোন নেতা আছেন?"[৫৯] তিনি যখন এই প্রবন্ধ লিখেন তখন মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন আবদুর রহমান এবং কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আমীর হোসেন। উনিশ শতকের নব্বই দশকের দিকে প্রতিষ্ঠান দুটি তাদের পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলেছিল, ঐ দশকের কলিকাতা ও মফস্বলে স্থাপিত বিভিন্ন সভা-সমিতির অভিযোগের মধ্যেও তা প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' (১৮৯৩) ও 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন' (১৮৯৬) ঐগুলির লুপ্ত গৌরবের প্রশ্ন তুলে আপন আপন প্রতিষ্ঠানের উদ্ভবের যাথার্থ প্রমাণ করেছে।

১৯২৩ সালে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের অস্তিত্ব ছিল। তখন এর সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯৭। এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ছিলেন খান বাহাদুর আবদুস সালাম।[৬০]

কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের পূর্বাপর প্রকৃতি, উদ্দেশ্য ও ক্রিয়াকলাপের উপর সামগ্রিকভাবে আলোকপাত করে নিম্নরূপ মন্তব্য করা যায় :

ক. কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশন মুখ্যত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, তবে শিক্ষা ও সমাজ বিষয়ক সমস্যাও এর কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

খ. ইংরাজ-আনুগত্য ও রাজভক্তি ক্ষুণ্ণ করে এসোসিয়েশন কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করেনি।

গ. বাংলা ও ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের, বিশেষ করে মুসলমান সমাজের উন্নতির চিন্তা ও সাধনা এসোসিয়েশনের ব্রত ছিল।

ঘ. সংগঠনের দিক থেকে উদার সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, কিন্তু স্বসমাজের স্বার্থের বাইরেও কোন কর্মসূচি গ্রহণ করেনি। সমাজগতভাবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ও উন্নতি কামনা করলেও রাজনীতিগতভাবে মুসলমানের স্বাতন্ত্র্যবোধের উন্মেষকেই প্রশ্রয় দিয়েছে।

ঙ. এসোসিয়েশনের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। শিক্ষার ক্ষেত্রে আধুনিক অর্থকরী বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষার উপর জোর দিয়েছে। জাতীয় কংগ্রেসের সাথেও সহযোগিতা করতে চেয়েছে (১৮৮৫), কিন্তু শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়ায়।

৫৯ সৈয়দ এমদাদ আলী, 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব', *ইসলাম-প্রচারক* , চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৯-১০।

৬০. *Revision of the List of Associations,* p. 4.

চ. উদীয়মান প্রভাবশালী নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর 'মুখপত্র' হিসাবে এসোসিয়েশনের সংগঠনশক্তি ও কর্মক্ষমতা অনেক বেশি ছিল।

ছ. শাখা-এসোসিয়েশনের মাধ্যমে চিন্তাধারা ও আদর্শাবলী সমাজের বিস্তৃত পটভূমিতে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছে এবং সেদিক থেকে সফলকামও হয়েছে।

জ. শাসকশ্রেণীর সাথে আপোষমূলকনীতি ও আবেদন-নিবেদনের মনোভাব বজায় থাকায় রাজনৈতিক চেতনার পূর্ণ বিকাশ হয়নি। এজন্য সমাজকে জাগাবার কাজ অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

ঝ. 'জাতীয়তা'র প্রশ্নে এসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় চিন্তা থাকলেও পরিচ্ছন্ন ধারণা নিয়ে অগ্রসর হতে পারেনি। উর্দুভাষার সমর্থন দিয়েছে এবং ইসলামধর্ম ও মুসলমানদের অতীত গৌরবের উপর ভিত্তি করে মুসলিম-সংস্কৃতির বিকাশ ও উন্নতি কামনা করেছে। স্বয়ং আমীর আলী ঐরূপ সংস্কৃতির সাধনা করেছেন।

ঞ. পত্র-পত্রিকা, বই-পুস্তক, কিংবা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে কোনো নিজস্ব স্কুল গড়ে তুলতে পারেনি। মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির মতো কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনেরও এখানে ব্যর্থতা।

শাখা এসোসিয়েশন : এসোসিয়েশনের কর্মসূচিকে কলিকাতার বাইরে সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে শাখা-এসোসিয়েশনের পরিকল্পনা। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ নিজেদের দাবী-দাওয়া সম্বন্ধে সচেতন হয়ে নানা স্থান থেকে আবেদন তুলুক যে, তারা বঞ্চিত, দুর্গত ও অসন্তুষ্ট। নিজেদের অস্তিত্ব, অধিকার ও আত্মমর্যাদা সম্পর্কে সচেতন করে সমাজের মানুষকে নিশ্চল, নিষ্কর্ম অবস্থা থেকে সক্রিয়, সরব ও জাগ্রত করে তুলতে পেরেছিল, এটাই এসোসিয়েশনের বড় সাফল্য। বাংলার ও বাংলার বাইরে ভারতবর্ষে এসোসিয়েশনের শাখা ছিল। ১৮৮৮ সাল অবধি ভারত ও বাংলাদেশ মিলিয়ে এর শাখা সংখ্যা ছিল ৫২টি। রাম গোপালের মতে এগুলি হলো : করাচি, শাহজাদপুর, শিকারপুর, লারকানা, সুক্কুর, লাহোর, অমৃতসর, দিল্লী, হারদই, হিসার, গুজরাট, আম্বালা, লুধিয়ানা, বেরেলী, বদাউন, মোহন, এলাহাবাদ, আজমীর, লক্ষ্ণৌ, গাজীপুর, সুরাট, দিন্দিগল, বাঙ্গালোর, টুমকুর, ভিজাগাপত্তম, ভিজিয়ানাগ্রাম, সাসারাম, আররাহ, দিনাপুর, গয়া, পাটনা, ছাপরা, সেওয়ান, মজাফফরপুর, মতিহারি, ভাগলপুর, হুগলী, জাহানাবাদ, পাণ্ডুয়া, রঙ্গপুর, মেদিনীপুর, বগুড়া, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, কুমিল্লা, শিলং, চট্টগ্রাম, দুমকা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও কটক।[৬১] ১৯০৯ সালে বাংলাদেশের শাখাগুলির নাম ছিল — বর্ধমান, পাবনা, রঙ্গপুর, মালদহ, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, হুগলী, জাহানাবাদ, বরিশাল, খুলনা, যশোহর, মেদিনীপুর, গায়বান্ধা, চুয়াডাঙ্গা।[৬২] কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের সাথে শাখা এসোসিয়েশনের সম্পর্ক কিরূপ থাকবে

৬১ *Indian Muslim : A Political History*, p. 329 (Appendix)
৬২ *Muslim Communlity in Bengal*, *pp* 179-80 (footnote).

তা আমরা পূর্বেই গঠনতন্ত্রে লক্ষ্য করেছি। এখন বাংলার কতক শাখা-এসোসিয়েশনের বিবরণ দেওয়া হল :

১. বগুড়া শাখা

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের প্রথম পঞ্চ-বার্ষিকী রিপোর্টে (১৮৮৩) বগুড়ার 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র কার্যকরী কমিটির সদস্যসহ মোট ৭৮ জনের একটি সভ্য-তালিকা স্থান পেয়েছে। কার্যকরী কমিটির ঐ সময়ের গঠন রূপটি ছিল এরূপ :

সভাপতি—সৈয়দ আবদুস সোবহান চৌধুরী
সহ-সভাপতি—শাহ নাজমুদ্দীন আবুল হোসেন ও সৈয়দ ওয়ালিউল্লা,
সম্পাদক—সমিরুদ্দীন ও মোহাম্মদ আবদুল করিম
সহকারী সম্পাদক—মোহাম্মদ ইসহাক মহসিন ও বাহাজুদ্দীন
কোষাধ্যক্ষ—খাজা আজিজুদ্দীন ও গোলাম মহিউদ্দীন
সদস্যবৃন্দ—খোন্দকার মফিজ উদ্দীন, আবদুর রশিদ, শামসুর রহমান খান, আমীরুদ্দীন, মোহাম্মদ হাসান মহসীন, মোতারফ আলী খান ও নাসিরুদ্দীন আহমদ।[৬৩]

'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত একটি পত্রে (৫ জানুয়ারি ১৮৯৭) জনৈক পত্র-লেখক বলেন যে, বগুড়ার এসোসিয়েশনের প্রাক্তন সম্পাদক সমীরুদ্দীনের মৃত্যুর পর এটি নির্জীব হয়ে পড়ে। বর্তমান সময়ে মুসলমান সমাজে পরিবর্তন এসেছে এবং এসোসিয়েশনটি পুনর্গঠিত হয়েছে। পত্র-লেখক তৎকালীন সম্পাদক সাজ্জাদ আলীর নিকট বগুড়ার ধ্বংসমুখী মাদ্রাসাটিকে রক্ষা করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন।[৬৪] ১৯০৫ সালে বগুড়া 'জাতীয় মুসলমান সমিতির অনুষ্ঠানপত্র' শিরোনামে ৮ পৃষ্ঠার একটি নিয়মাবলী প্রকাশিত হয়। এটি শেখ জমিরদ্দীন বগুড়ার 'রায় প্রেস' থেকে প্রকাশ করেন।[৬৫]

২. চট্টগ্রাম শাখা

'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র প্রথম পঞ্চ-বার্ষিক রিপোর্টে চট্টগ্রাম শাখা-এসোসিয়েশনের ৬৪ জন সদস্যের একটি তালিকা স্থান পেয়েছে। জমিদার, সরকারি কর্মচারী, আইনজীবী, শিক্ষক, ধর্মনেতা, ব্যবসায়ী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর লোক ঐ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ইকরাম রসুল খান বাহাদুর সভাপতি এবং চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট জুলফিকার আলী সম্পাদক ছিলেন। [৬৬]

৬৩. *Report of the Committee of the Central National Mahomedan Association for the past Five years,* 15 April 1883, p. 41
৬৪. *The Moslem Chronicle,* 9 January 1897.
৬৫. *Revision of the List of Associations* p. 41.
৬৬. *পূর্বোক্ত,* পৃ. ৫১-৫৪

৩. খুলনা শাখা (১৮৯০)

'খুলনা জেলা মহামেডান এসোসিয়েশন' ১৮৯০ সালে স্থাপিত হয়। 'সুধাকার' পত্রিকায় 'খুলনা মুসলমান সমিতি'র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত একটি সভার (২ মার্চ ১৮৯০) সংবাদ প্রকাশিত হয়। 'মুসলমান বোর্ডিং' স্থাপনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা সভার উদ্দেশ্য ছিল। জহুর আহমদ, লোতফর রহমান, আবদুল লতিফ, আতাওল হক সভায় বক্তৃতা করেন। ধামালিয়ার জমিদার আবদুল আহাদ সভায় উপস্থিত হতে না পেরে সমিতির হিতকার্যে ঐক্যমত জ্ঞাপন করে একটি পত্র প্রেরণ করেন।[৬৭]

৪. হুগলী শাখা (১৮৮৩)

হুগলী জেলার 'ন্যাশনাল মহামেডান এসে'সিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠার বছরে কার্যকরী কমিটির সদস্যবৃন্দ ছিলেন এরূপ :

সভাপতি—প্রিন্স বশিরুদ্দীন
সহ-সভাপতি—প্রিন্স আমীরুদ্দীন ও নাজিরুদ্দীন আহমদ, খান বাহাদুর
সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—আশরাফ উদ্দীন আহমদ, মতওয়াল্লী, ইমামবাড়া
সহকারী সম্পাদক—ইজাদ বক্স বিএ, বিএল ও মির্জা মোহাম্মদ শরীফ
যুগ্ম সম্পাদক—মযহারুল আনোয়ার বিএ, বিএল, উকিল ও জমিদার
সদস্যবৃন্দ—আলী আহমদ, খান বাহাদুর, সৈয়দ আবদুল মোজাফফর, জমিদার, মির্জা রমজান আলী, আইনুদ্দীন আহমদ, প্রধান কেরানী, ইমামবাড়া, হাজি মোহাম্মদ শিরাজী, সৈয়দ আমজাদ আলী, অফিসার, ডাক বিভাগ ও আবদুল জলিল, শিক্ষক, হুগলী কলেজ।[৬৮]

'১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় হুগলীর শাখা এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, জেলার মুসলমানদের আশা-আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরা এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব রক্ষা করা এর লক্ষ্য।[৬৯] ১৮৯০ সালে সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে মুসলমানদের বিরত থাকার যে অভিযান চালান হয় তাতে কেন্দ্রীয় এসোসিয়েশনের নির্দেশে হুগলীর শাখাও অংশ গ্রহণ করে।[৭০]

১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে' অংশ গ্রহণ করার জন্য এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত প্রতিনিধি পাঠান হয় :

মির্জা সুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর (সহ-সভাপতি), সৈয়দ আশরাফউদ্দীন আহমদ (সম্পাদক), মযহারুল আনোয়ার (যুগ্ম-সম্পাদক), সৈয়দ ইরফান আলী,

৬৭. *সুধাকর*, ২ চৈত্র ১২৯৬।
৬৮. *Op. cit.*, p. 56.
৬৯. *Revision of the List of Associations*, p. 22.
৭০. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, p 112.

জমিদার, বীরভূম, সৈয়দ খয়রাত আলী, মীর খয়রাত আলী, মীর হায়দার হোসেন, অফিসার, ইমামবাড়া, ইমদাদ আলী, জমিদার ও মোহাম্মদ আলী।[৭১]

৫. জাহানাবাদ শাখা

সম্ভবত শাখাটি ১৮৮৫ সালের গোড়ার দিকে স্থাপিত হয়। 'মুসলমান বন্ধু' পত্রিকায় (৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫) বলা হয়, 'কলিকাতার জাতীয় মুসলমান সভার একটি শাখা সভা মেদিনীপুরে স্থাপিত হইবার জন্য কল্পনা হইতেছে।' 'মুসলমান বন্ধু'র পরবর্তী সংখ্যায় (১৬ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫) 'আত্মোন্নতি বিধায়িনী সভা'র খবর প্রকাশিত হয়। তাতে বলা হয়, জাহানাবাদের কয়েকটি গ্রামের অধিবাসীরা মিলিতভাবে সভাটি স্থাপন করেন। রসুলপুরের ডাক্তার গোলাম হোসেন এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। এই সভাই পরবর্তীকালে কেন্দ্রীয় মহামেডান এসোসিয়েশনের শাখাভুক্ত হয়। তখন এর নামও পরিবর্তিত হয়। ১৮৯০ সালে ২০ মে সমিতির সম্পাদক গোলাম হোসেন চৌধুরী স্যার সৈয়দ আহমেদকে সম্বোধন করে একটি পত্র লিখেন। ব্যবস্থাপক সভার সদস্য বৃদ্ধির জন্য একটি বিল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিবেচনাধীন ছিল। সে বিলের সপক্ষে স্যার সৈয়দ আহমদ এক স্বাক্ষর অভিযান পরিচালনা করেন। বাংলাদেশে এ-দায়িত্ব অর্পিত হয় কেন্দ্রীয় মহামেডান এসোসিয়েশনের উপর। কেন্দ্রীয় এয়োসিয়েশন শাখা-এসোসিয়েশনগুলিকে স্বাক্ষর সংগ্রহের নির্দেশ দেন। গোলাম হোসেন চৌধুরীর পত্রখানি ছিল তাঁর অঞ্চলের মুসলমানদের স্বাক্ষর-পত্র প্রেরণের বিষয় সম্পর্কিত।[৭২]

৬. মেদিনীপুর শাখা (১৮৮৪)

সকল প্রকার ন্যায়ানুগ পদ্ধতিতে ও আইনসঙ্গত উপায়ে জেলার মুসলমান সমাজের উন্নতি বিধান ছিল মেদিনীপুর ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। স্থানীয় ভূস্বামী, শিক্ষিত ব্যক্তি, আইনজীবী, ডাক্তার, সরকারি কর্মচারী, ধর্মপ্রচারক, ব্যবসায়ী প্রভৃতি এর সদস্য হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হতেন।[৭৩] ১৮৯৫ সালে ১৪ ফেব্রুয়ারি 'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত এক সংবাদে জানা যায় যে শাখা-সমিতির ঐ সময়ে সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর ইকরাম রসুল এবং সম্পাদক ছিলেন ব্যারিস্টার সৈয়দ আবদুর রহমান। ঐ সময় বাংলার ছোটলাট চালর্স এলিয়ট (১৮৯০-৯৫) মেদিনীপুর পরিদর্শনে গেলে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হয় এবং একটি স্মারকপত্রে মুসলমান সমাজের দাবী-দাওয়া তুলে ধরা হয়। একটি মাদ্রাসা ও একটি স্কুল বোর্ডিং-এর উন্নতিকল্পে অর্থমঞ্জুরি এবং চাকুরিতে মুসলমানদের যথাযথ নিয়োগের আবেদন জ্ঞাপন ছিল স্মারকপত্রের প্রধান বক্তব্য। [৭৪]

৭১. *The Moslem Chronicle,* 30 September 1899.

৭২. *Hnidu-Muslim Relations in Bengal,* p. 124

৭৩. *Revision of the List of Associations*, p. 26.

৭৪ *The Moslem Chronicle,* 14, February 1895.

১৯০০ সালের আগস্ট মাসে ছোটলাট জন উডবার্ন (১৮৯৮–১৯০২) মেদিনীপুর পরিদর্শনে গেলে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তাঁকেও সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল কাদের তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। এসোসিয়েশনের সম্পাদক ইকরাম রসুল 'অভিনন্দন–বাণী' পাঠ করেন। আবদুল বারি উর্দুতে এবং সদর কাজী বাহাউদ্দীন আরবিতে প্রশস্তি পাঠ করেন।[৭৫]

৭. রাজশাহী শাখা (১৮৮৪)

'রাজশাহী মহামেডান এসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠাতা–সভাপতি ছিলেন নাটোরের জমিদার এরশাদ আলী খান চৌধুরী এবং সম্পাদক ছিলেন ইমামুদ্দীন। মুসলমান সমাজের উন্নতি এসোসিয়েশনের সর্বাত্মক লক্ষ্য ছিল। হিন্দু জমিদার ও গণ্যমান্য ব্যক্তি পরিচালিত 'রাজশাহী সভা' (১৮৭৮) ছিল। রাজশাহী মহামেডান এসোসিয়েশন সংস্থাপনের পেছনে এই সভার প্রেরণা ছিল। ১৮৯১ সালে এসোসিয়েশনের সম্পাদক ছিলেন মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। তাঁরই উদ্যোগে এসোসিয়েশনের নিজস্ব ভবন তৈরি হয় ; ডাক্তার সিরাজ উদ্দীন আহমদ গৃহ নির্মাণের ভূমি দান করেন।[৭৬] এটি পরবর্তীকালে 'রাজশাহী বালিকা বিদ্যালয়'কে দান করা হয়।[৭৭]

৮. রংপুর শাখা (১৮৮৭)

'রংপুর মহামেডান এসোসিয়েশনে'র প্রতিষ্ঠাতা–সভাপতি ছিলেন মহীপুরের শিক্ষানুরাগী ও সমাজসেবী জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী। 'মোসলেম ক্রনিকলে' এটিকে 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র শাখা রূপেই উল্লেখ করা হয়েছে। ভারতেশ্বরীব জুবিলী উৎসব (১৮৮৭) উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সমিতির প্রযত্নে 'রংপুর মহামেডান এসোসিয়েশন' স্থাপিত হয়। পত্রিকায় বলা হয় যে, ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত ঐ শাখা–সমিতি দুটি কাজে সফলতা লাভ করেছে, একটি রংপুর মাদ্রাসার ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং অপরটি মাদ্রাসার একটি বৃহৎ দালান নির্মাণ। আবদুল মজিদ চৌধুরী, চৌধুরী ওসমান উদ্দীন (জমিদার) ও সৈয়দ আবদুল হায়াত গোলাম হাফিজের আর্থিক সাহায্যে ঐগুলির নির্মাণ কার্য সম্ভব হয়। ১৮৯০ সালে স্যার স্টুয়ার্ট কলভিন বেইলী মাদ্রাসা গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন।[৭৮]

'১৯২৩ সালের সমিতি–তালিকা'য় রংপুরের শাখা–সমিতির স্থাপনের কাল আছে ১৮৮৭ সাল। ঐ তালিকায় বলা হয়েছে যে, রংপুর ও অন্যান্য অঞ্চলের মুসলমান

৭৫. *The Moslem Chronicle*, 25 August 1900.
৭৬. সৈয়দ মুর্তাজা আলী– *প্রবন্ধ বিচিত্রা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ. ১৩৬–৬৭।
৭৭. কাজী মোহাম্মদ মিছের—*রাজশাহীর ইতিহাস,* ১ খণ্ড, কাজী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৬৫, পৃ. ২১০–১১।
৭৮. *The Moslem Chronicle*. 22 July 1899.

সমাজের ন্যায্য দাবী-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরা এবং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সেগুলি আদায় করা সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল।[৭৯]

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতার মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে যোগদানের জন্য রংপুরের শাখা-সমিতি একটি সভার (৩ নভেম্বর ১৮৯৯) মাধ্যমে প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। তাঁরা হলেন—তসলিমুদ্দীন আহমদ, বিএল, সরকারি উকিল সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ, জমিদার, মোহাম্মদ আশফ খান, বিএল, মোহাম্মদ মোজাম্মল এল. এম. এস., আবদুস সোবহান, ইনকাম-ট্যাক্স এসেসর, তহসীনুদ্দীন আহমদ, মোক্তার, সমিরুদ্দীন আহমদ, জমিদার, মেসেরউদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ জিয়াফত উল্লাহ্ ও মনিরুজ্জামান।[৮০]

ঐ সময় সমিতিব সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ তাহা (জমিদার) ও সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ, সম্পাদক তসলিমুদ্দীন আহমদ, সহকারী সম্পাদক ডাক্তার মোহাম্মদ মোজাম্মল এবং যুগ্ম-সম্পাদক মোহাম্মদ আশফ খান।[৮১]

সমিতির কেন্দ্রীয় শক্তির মূলে ছিলেন আবদুল মজিদ চৌধুরী। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষাপদ্ধতি সমর্থন করতেন, তবে সে শিক্ষাপ্রণালীর সংস্কার চেয়েছিলেন। তিনি বাংলার সরকারকে লেখা এক পত্রে উল্লেখ করেন যে, বাংলা পাঠশালার পুস্তকগুলিতে হিন্দুব দেবদেবতার কথাই বেশি, কোনো মুসলমান পিতামাতা তাঁদের সন্তানকে ঐরূপ বিদ্যা শিক্ষা দিতে চাইবেন না। ইসলাম ধর্মের কথা ফারসি, আরবি ও উর্দু পুস্তকে আছে, ধর্মশিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য ঐসব ভাষা শিক্ষা আবশ্যক বলে তাঁরা মনে করেন। তিনি ছোটলাট উডবার্নের (১৮৯৮-১৯০২) ঘোষিত শিক্ষানীতির সূত্র ধরে মক্তবগুলির জন্য সরকারি সাহায্য ও স্কুল-ইন্সপেক্টর দ্বারা সেগুলি সময়মত পরিদর্শনের দাবী জানান। তাঁর অভিমত, মাদ্রাসার সহিত সম্পর্ক রেখে মক্তবের শিক্ষাপদ্ধতির পরিবর্তন, সরকারি অর্থ সাহায্য-দ্বারা ছাত্রদের বৃত্তি ও অন্যান্য সুযোগ দান এবং ইংরাজি শিক্ষিত মুসলমান সাব-ইন্সপেক্টর দ্বারা মক্তব পরিদর্শনের ব্যবস্থা নিলে মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার সম্ভব হবে।[৮২] ১৯০৩ সালে সরকারের কাছে প্রদত্ত একটি আবেদন পত্রে 'রংপুর ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' ঐ দাবীগুলির কথা পুনরায় তুলে ধরেন।[৮৩]

৭৯. *Revision of the List of Associations*, p. 39.
৮০. *The Moslem Chronicle*, 25 November 1899
৮১. *Muslim Community in Bengal* p. 39.
৮২. Khan Bahadur Abdul Majid Choudhury to Government of Bengal, 30 November 1902, Bengal Education Proceedings, September 1903.
৮৩. *Muslim Community in Bengal*, p. 34.

মুসলমান সম্প্রদায় হিসাবে স্বাতন্ত্র্য-চেতনা এসোসিয়েশনের মাধ্যমে জাগতে শুরু করেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় ছোটলাট এন্ড্রু ফ্রেজারকে (১৯০৩-০৫) প্রদত্ত এক 'অভিনন্দন-বাণী'তে। তিনি ১৯০৪ সালে জুন মাসে রংপুর পরিদর্শনে যান। মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও ঐ জেলায় কোনো মুসলমান স্কুল-ইন্সপেক্টর নেই—এরূপ অভিযোগ করে ঐ শাখা-সমিতি ছোটলাটের কাছে একজন আরবি-ফারসি অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে ঐ পদে নিয়োগ করার দাবী জানায়।[৮৪]

৯. বর্ধমান শাখা (১৮৮৭)

'মোসলেম ক্রনিকলে' 'বর্ধমান মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সম্পাদকের একটি চিঠি (২০ মার্চ ১৮৯৫) প্রকাশিত হয়। এতে উক্ত সমিতির এক সভায় গৃহীত কয়েকটি প্রস্তাবের উল্লেখ আছে। শহরে একটি মাদ্রাসা স্থাপন, একটি মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণ এবং স্থানীয় সরকারি অফিসে মুসলমানদের চাকুরিতে নিয়োগের কথা প্রস্তাবগুলিতে বলা হয়েছে।[৮৫] '১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় 'বর্ধমান মহামেডান এসোসিয়েশনে'র উল্লেখ আছে। ঐ সময় এসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন মৌলভী মোহাম্মদ ইয়াসিন বিএল এবং সম্পাদক ছিলেন মৌলভী নাজিরুদ্দীন আহমদ বিএল। মোট সদস্য সংখ্যা ছিল ২৯০। বেশির ভাগ সদস্য ছিলেন আয়মাদার যাঁরা মুঘল আমল থেকে মালিকানা ভোগ করে আসছেন। সামগ্রিকভাবে জেলার মুসলমান সমাজে আধুনিক ও ধর্ম শিক্ষা বিস্তার করা এবং সমাজের অভাব-অভিযোগ সরকারের কাছে তুলে ধরা ও প্রতিকার করা এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ছিল।[৮৬]

১০. ময়মনসিংহ শাখা

আলিগড়ের সৈয়দ আহমদের নেতৃত্বে উনিশ শতকের আট দশকের দিকে কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন বাংলাদেশেও গড়ে ওঠে। এ ব্যাপারে সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন ও তার শাখাসমূহ এক 'স্বাক্ষর অভিযান' শুরু করে। ময়মনসিংহের শাখা এসোসিয়েশনের অনারেরি সম্পদাক হামিদউদ্দীন আহমদ ঐ আন্দোলনের পরিস্থিতি জানিয়ে সৈয়দ আহমদকে পত্র লেখেন (৩১শে অক্টোবর ১৮৮৮)। ঢাকার 'আঞ্জমনে ইসলামীয়া'র সভাপতি সৈয়দ আবদুল বারি কংগ্রেসে যোগদান করেছেন, সেকথা উল্লেখ করে হামিদউদ্দীন বলেন যে তিনি ও অন্যান্য নেতা ঢাকার মুসলমান সমাজ থেকে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সৈয়দ আবদুল বারির প্রভাব দূর করার চেষ্টা করেছেন।[৮৭]

৮৪. *The Moslem Chronicle*, 2 July 1904.
৮৫. *Ibid*, 4 April 1495 (Supplementary).
৮৬. *Revision of the List of Associations*, p. 20.
৮৭. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, p. 117.

১১. পাবনা শাখা

১৮৯৯ সালের ১১ জানুয়ারি পাবনার 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র উদ্যোগে পাবনা জেলা-স্কুলের মুসলমান বোর্ডিং-এর উদ্বোধনী সভা হয়। পাবনার তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবুল মাহমুদ সভায় বক্তৃতা দেন। উক্ত ছাত্রাবাস নির্মাণে প্রধান আর্থিক সাহায্য দান করেন পাবনার দুলাই-এর জমিদার ভ্রাতৃত্রয়—হোসেন জান চৌধুরী, ফাসিলউদ্দীন আবদুল গণি চৌধুরী ও আবদুল বাসেত চৌধুরী এবং ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ ও ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। ঐ সময় শাখা-সমিতির সহকারী সম্পাদক ছিলেন আলিমুদ্দীন।[৮৮]

জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে পাবনার শাখা-সমিতি ঘোর বিরোধী ছিল। সমিতির সদস্যগণের ধারণা ছিল যে, ভারতের সকল সম্প্রদায়ের বা জাতির সম্মিলিত আশা-আকাঙ্ক্ষা কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিফলিত হতে পারে না। এটি মুখ্যত হিন্দুদেরই প্রতিষ্ঠান, কতিপয় উচ্চাভিলাষী বাঙালি হিন্দু এটি নিয়ন্ত্রণ করেন এবং সরকারি শাসনের বিরোধিতা করেন। তাঁরা মুসলমানদের প্রতি বিরূপ মনোভাব পোষণ করেন, মুসলমানদের উন্নতিও তাঁরা চান না।[৮৯] সুতরাং কংগ্রেসে যোগদান করা মুসলমানদের পক্ষে সংগত হবে না। উল্লেখযোগ্য যে, পাবনার ঐ শাখা-সমিতি সৈয়দ আহমদের 'ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিশনে'র আদর্শ সমর্থন করতে।[৯০]

১২. মালদহ শাখা (১৮৯০)

১৮৯০ সালে 'মালদহ মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠিত হয়। মালদহ জেলার মুসলমানের রাজনৈতিক, সামাজিক ও শিক্ষামূলক অবস্থার উন্নতি বিধান ও মর্যাদা বৃদ্ধি এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ছিল। এসোসিয়েশনের সম্পাদক আবদুল আজিজ খান প্রেরিত একটি পত্র (২০ জুন ১৮৯৬) 'মোসলেম ক্রনিকালে' ছাপা হয়। তিনি লিখেছেন, ১৮৯৫ সালের পূর্ব পর্যন্ত এসোসিয়েশনের প্রধান লক্ষ্য ছিল জেলা শহরে একটি মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা। মালদহের 'বাইশ হাজারী' ওয়াকফ সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক মতওয়াল্লীর কাছ থকে অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা করে এসোসিয়েশন ব্যর্থ হয়। ফলে মাদ্রাসা স্থাপন সম্ভব হয়নি। এসোসিয়েশনকে ঢেলে সাজাবার জন্য ১৮৯৫ সালের ১৫ ডিসেম্বর একটি সভা ডাকা হয়। কলিকাতার 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র আদর্শে এটিকে পুনর্গঠিত করা হয়। জমিদার চৌধুরী মোয়াহেদুর রহমান সর্বসম্মতিক্রমে এসোসিয়েশনের সভাপতি নির্বাচিত হন। জেলা-প্রশাসক মিঃ প্রাইস অনারেরি সভাপতি হন।[৯১] ঐ সভায় গৃহীত

৮৮. *The Moslem Chronicle,* 4 February 1899.
৮৯. *Indian Political Associations and Reform of Lagislature,* p. 229.
৯০. *Ibid*
৯১. *The Moslem Chronicle,* 11 July 1896.

একটি প্রস্তাবে জেলার শিক্ষাবিভাগে যাতে পরিমিত সংখ্যক মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করে, সে-বিষয়ে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের কাছে সুপারিশ করা হয়। সরকারি বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে এসোসিয়েশনের অনুরোধ সত্ত্বেও বোর্ড মুসলমান কর্মপ্রার্থীর বিষয় বিবেচনা করেনি, এ বিষয়ে অভিযোগ তোলা হয়।[৯২] ১৮৯৫ সালের ৮ মার্চে এসোসিয়েশনের 'কার্যনির্বাহক কমিটি'র একটি সভা হয়। তাতে নিম্নের বিষয়গুলি আলোচিত হয় :

১. ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের ১২ জন সদস্যের মধ্যে যাতে ৬ জন মুসলমান সদস্য নেওয়া হয়, সে উদ্দেশ্যে বোর্ডের সভাপতির কাছে অনুরোধ করা হয়।

২. 'বাইশ হাজারী'র মতওয়াল্লী ও 'শাহ হাজারী'র তত্ত্বাবধায়কের কাছে মাদ্রাসা স্থাপনের জন্য অর্থ সাহায্যের আবেদন করা হয়। জেলার জমিদার, ব্যবসায়ী ও ধনী ব্যক্তিরা সমাজের উন্নতির দিকে চরম অমনোযোগী বলে দুঃখ প্রকাশ করা হয়। অবশ্য 'শাহ হাজারী'র তত্ত্বাবধায়ক কিছু মেয়াদী সাহায্য দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে সন্তোষ প্রকাশ করা হয়।

৩. জেলা-স্কুলের মুসলমান ছাত্রদের জন্য কোনো ছাত্রাবাস নেই। শহরের কোর্টের কিছু উকিল ও কর্মচারীর গৃহে 'জায়গীর' থেকে দূর অঞ্চলের ছেলেরা লেখাপড়া করে। মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য একটা স্থায়ী অর্থ-তহবিল গঠনের প্রস্তাব নেওয়া হয়।[৯৩]

স্বসমাজের স্বার্থের প্রতি এসোসিয়েশনের প্রখর দৃষ্টি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ভাগলপুর বিভাগীয় কমিশনার ডব্লিউ. বি. ওলধাম (মালদহ তখন ঐ বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল)-এর কাছে প্রেরিত এক দীর্ঘ আবেদনপত্রে (৮ অক্টোবর ১৮৯৬)। এতে তৎকালীন মালদহ জেলার মুসলমানদের বিবিধ অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। জেলা বোর্ড, জেলা মিউনিসিপ্যালিটি, ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতে মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করা হয়নি—মুখ্যত এই অভিযোগই প্রধান ছিল। অফিসে হিন্দু কর্মচারীর একচেটিয়া প্রাধান্য এবং চাকুরী নিয়োগের ব্যাপারে তাঁদের স্বজনপ্রীতির অভিযোগের কথাও বিবৃত হয়েছে।[৯৪]

১৮৯৯ সালের আগস্ট মাসে ছোটলাট উডবার্ন মালদহ জেলা পরিদর্শনে গেলে তাঁকে এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। তাঁকে প্রদত্ত অভিনন্দন পত্রে সমাজের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরে সরকারি অফিস-আদালতে মুসলমানদের চাকুরি সংস্থান ও মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণের আবেদন জানান হয়। [৯৫]

৯২. ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনসট্রাকশনের ১৮৯৪ সালের ১৫ জুন তারিখের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, লোক-সংখ্যার সমতার ভিত্তিতে শিক্ষাবিভাগের হিন্দু-মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। ঐ সময় নিয়োগের দায়িত্ব ছিল ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের হাতে।

৯৩. *The Moslem Chronicle*, 11 July 1899

৯৪. *Ibid* 7 November 1898.

৯৫. *Ibid.*, 19 August 1899.

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে' অংশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রতিনিধি নির্বাচনের জন্য 'মালদহ মহামেডান এসোসিয়েশনে'র একটি সভা (১১ ডিসেম্বর ১৮৯৯) অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সময় এসোসিয়েশনের অনারেরি সভাপতি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর আবদুস সামাদ। মোক্তার মোহাম্মদ ইসহাক চৌধুরী সহকারী সম্পাদক ছিলেন। এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ নির্বাচিত হন :

> চৌধুরী মোয়াহেদুর রহমান, জমিদার (সভাপতি), আবদুল আজিজ খান, উকিল, (সম্পাদক), আবদুর রহমান খান, শাম মোহাম্মদ চৌধুরী, জমিদার, কাজী আজাহার উদ্দীন আহমদ, ডাক্তার, অনারেরি ম্যাজিস্ট্রেট ও হাজি আলিজান আফজা, মিউনিসিপ্যাল কমিশনার।[৯৬]

'১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় মালদহ মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সদস্য সংখ্যা ছিল ২০০। খান সাহেব আবদুল আজিজ খান তখনও সম্পাদক ছিলেন। [৯৭]

'মহামেডান এসোসিয়েশন' নামে বিভিন্ন জেলায় আরও কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। সেগুলি সেন্ট্রাল এসোসিয়েশনের সহিত জড়িত ছিল, না স্বাধীন প্রতিষ্ঠান ছিল তা বলা যায় না। নদীয়ার কৃষ্ণনগরেব 'মহামেডান এসোসিয়েশন' ছিল এরূপ প্রতিষ্ঠান যার সহকারী সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ জাজুমাল আলী (১৮৮৮)।[৯৮]

জলপাইগুড়ির 'মুসলমান সভা' বা 'মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৯৪) প্রতিষ্ঠা করেন একিনুদ্দীন আহমদ। এটি রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। একিনুদ্দীন ঐ জেলার মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তার ও রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার কবার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২৩ সালেও এসোসিয়েশনটির অস্তিত্ব ছিল ; একিনুদ্দীন আহমদ তখন এর সভাপতি ছিলেন।[৯৯]

'মিহির ও সুধাকরে' (২৮ জুন ১৯০১) বগুড়ার 'ধুপচাঁচিয়া মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সম্পাদকের একটি পত্র প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রে বগুড়ায় মুসলমান স্কুল-পরিদর্শক নিয়োগের দাবী জানান হয়।[১০০]

'কুষ্টিয়া মহামেডান এসোসিয়েশনে'র অস্তিত্ব জানা যায় মোহাম্মদ আবদুল আজিজ প্রণীত 'সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-চরিত' (১৯০১) গ্রন্থ থেকে। উক্ত এসোসিয়েশন কর্তৃক গ্রন্থখানি প্রকাশিত হয়।[১০১]

৯৬. *Ibid.*, 23 December 1899.
৯৭. *Revision of the List of Associations*, p. 42.
৯৮. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, p. 120.
৯৯. *Revision of the List of Associations*, p. 37.
১০০. Report of Native papers in Bengal for the week ending, 6 July 1901, p. 430.
১০১. মোহাম্মদ আবদুল আজিজ—*সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-চরিত*, মথুরানাথ যন্ত্র, কুমারখালী, ১৯০১

সমাজ সম্মিলনী সভা (১৮৭৯)

ঢাকার 'সমাজ সম্মিলনী সভা' ১৩ ডিসেম্বর ১৮৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ঢাকা মাদ্রাসার (১৮৭৪) প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী ছিলেন এর প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। তিনি ঢাকায় আগমনের অব্যবহিত পূর্বে হুগলী কলেজের অধ্যাপক ছিলেন। সেখানে সৈয়দ আমীর আলী তাঁর ছাত্র ছিলেন। আমীর আলীর কেন্দ্রীয় সমিতি প্রতিষ্ঠার পরের বছর ওবায়দুল্লাহ ঢাকায় সমাজ সম্মিলনী সভা স্থাপন করেন। তিনি স্বয়ং ঐ সমিতির সদস্য ছিলেন। সুতরাং তিনি সভা স্থাপনের আদর্শ ও প্রেরণা সেখান থেকেই পেয়েছিলেন। ঢাকার মুসলমানদের মধ্যে এটিই প্রথম প্রতিষ্ঠান। জাতীয় উন্নতি ও হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রীতি সাধন ছিল সমাজ সম্মিলনলী সভার প্রধান উদ্দেশ্য। 'ঢাকা প্রকাশে' (৭ বৈশাখ ১২৮৭) সমাজ সম্মিলনী সম্পর্কে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। তাতে লেখা হয়, "পাঠকবর্গ অবগত আছেন, ইদানীং হিন্দু মুসলমানদিগের ঐক্য সংস্থাপনার্থ স্থানে স্থানে নানারূপ অনুষ্ঠান হইতেছে। কিয়দ্দিবস হইল ঢাকায় 'সমাজ সম্মিলনী' নাম্নী সভা প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে।" নবাব আহসানউল্লাহ খান বাহাদুর সমাজ সম্মিলনী সভার সাহায্যার্থে ৩০০ টাকা দান করেন এবং ভবিষ্যতে ঐ সভার 'অভিভাবক' হওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।[১০২] ঢাকার 'পূর্ববঙ্গ বঙ্গভূমি' গৃহে মাঝে মাঝে এই সভার অধিবেশন হতো। ১৮০০ সালের ২৫ আগস্ট তারিখে অনুষ্ঠিত এরূপ এক সভায় একজন টোলের পণ্ডিত ও জনৈক সুশিক্ষিত মুসলমান 'জাতির সাধারণ সম্মিলনের প্রয়োজনীয়তা' ব্যাখ্যা করে বক্তৃতা করেন।[১০৩]

সমাজ সম্মিলনীর সভা বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৮৩ সালে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' স্থাপিত হলে সম্ভবত এর অস্তিত্ব লোপ পায়।

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৩)

ঢাকা কলেজের কতিপয় ছাত্রের উদ্যোগে ১৮৮৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সম্মিলনী'র 'প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী' (১৮৮৪) থেকে জানা যায়, এর প্রথম বছরের কার্যাবলী মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে সীমাবদ্ধ ছিল। সম্মিলনীর সম্পাদক আবদুল মজিদ ঐ কার্যবিবরণীতে লিখেন, "বঙ্গদেশীয় মুসলমানগণের সর্বপ্রকার উন্নতি সাধন করা এই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকিলেও সেই সময় সম্মিলনটি কেবল শৈশবাবস্থায় থাকায় এবং স্থানীয় লোকসমূহ হইতে যথোপযুক্ত সহানুভূতি না পাওয়াতে বিশেষত এককালে সেই উচ্চতর আশাসম্পন্ন হওয়া কষ্টকর বিধায় সভা গত বৎসর মুসলমান সম্প্রদায়ে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তার করিতে যত্নবতী

১০২. *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ চৈত্র ১২৮৬।
১০৩. *ঢাকা প্রকাশ*, ১২৮৭।

হইয়াছিলেন।"[১০৪] ১৮৮৬-৮৭ সালে সম্মিলনীর বার্ষিক কার্যবিবরণী সম্বলিত একটি অনুষ্ঠানপত্র প্রকাশিত হয়। ঐ বার্ষিক অনুষ্ঠানপত্রে লেখা হয়, "বিদ্যশিক্ষাই মনুষ্যজাতির উন্নতির একমাত্র উপায়। ... দুর্ভাগ্যবশত বঙ্গের নির্জীব মুসলমানবৃন্দের মধ্যে সেই অমূল্য পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব। বর্তমান সময় বঙ্গের মুসলমান অধিবাসীগণের অবস্থা যাহাতে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতে পারে, যাহাতে তাহাদের অসহ্য দারিদ্র্য যন্ত্রণা বিদূরিত এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা অপনীত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহারা বিদ্যশিক্ষায় ব্রতী হইয়া জ্ঞানালঙ্কারে অলংকৃত হইতে পারেন, যাহাতে তাঁহারা বঙ্গের অন্যান্য সম্প্রদায়ের সহিত সমকক্ষতা করিতে পারেন, এই সকল গুরুতর কার্য সম্পাদনের জন্য 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। আমাদিগের সভার কিয়দংশ জাতীয় পুরুষ শিক্ষার নিমিত্ত প্রয়োজিত হইবে। সম্প্রতি স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতিতে আশান্বিত এবং মফস্বল সভ্যদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা এই গুরুতর কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি।"[১০৫] স্ত্রী-শিক্ষা থেকে স্ত্রী-পুরুষ উভয় শ্রেণীর শিক্ষার ক্ষেত্রে সম্মিলনীর কার্যক্রম সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রধানত শিক্ষা-বিস্তার এবং তদ্দ্বারা সমাজ-উন্নয়ন সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। পুরুষদের শিক্ষা গ্রহণে বাধা ছিল না, কিন্তু নারী-শিক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজে ঘোরতার অবজ্ঞার ভাব ছিল। ভদ্র পরিবারে মেয়েদের সামান্য গৃহশিক্ষা ছাড়া অন্য শিক্ষা ছিল না। সমিতি ১ম শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্য তালিকা নির্বাচন করে তদনুসারে মেয়েদের পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করে। বাংলা ও উর্দু ভাষায় পরীক্ষা নেওয়া হতো। প্রথম বছর ঢাকা, বরিশাল, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ ও কলিকাতা থেকে মোট ৩৭ জন পরীক্ষা দেয় তাতে বাংলায় ২৩ জনে ২২ জন এবং উর্দুতে ১৪ জনে ১২ উত্তীর্ণ হয়। পরীক্ষা নেওয়ার পদ্ধতিটি ছিল এরূপ :

১. বঙ্গবাসী যে-কোনো মহিলা নির্বাচিত পুস্তকের পরীক্ষা নিয়মিত দিতে ইচ্ছা করেন, তিনিই পরীক্ষা দিতে পারিবেন।
২. মহিলাগণ আপন আপন অন্তঃপুরে থাকিয়া স্ব-স্ব অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে পরীক্ষা দিতে পারিবেন।
৩. মৌখিক পরীক্ষক অভিভাবকের সম্মতিক্রমে সম্মিলনী কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন।[১০৬]

মুসলমান সমাজে গ্রহণযোগ্য বাংলা পাঠ্য বইয়ের অভাব ছিল। এজন্য মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ঢাকায় এলে সম্মিলনীর কর্মীরা তাঁকে দিয়ে 'তোহফাতুল মোসলেমিন' (১২৯০) গ্রন্থখানি লিখিয়ে নেন। মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী পুস্তক মুদ্রণের

১০৪. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, গিরিশ যন্ত্র, ঢাকা, ১৮৮৩, পৃ. ১
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম—'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', *মাহে-নও*, বৈশাখ ১৩৭৪।
১০৫. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, ১৮৮৬০৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র, ঢাকা, ১৮৮৭, পৃ. ১-২
১০৬. পূর্বোক্ত, *মাহে-নও*, বৈশাখ ১৩৭৪।

আংশিক ব্যয়ভার বহন করে।[১০৭] ঢাকায় অবস্থানকালে সম্মিলনীর 'মেম্বর সংগ্রহ ও চাঁদা আদায়ে'র কাজেও তাঁকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিনি 'আমার সংসার জীবনে' (১৯৩৫) লেখেন, "ঢাকা শহরে কিয়দ্দিবস থাকিয়া তত্রত্য 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র কাজের অনুষ্ঠাতা বন্ধুদিগের অনুরোধে বিশেষত অক্লান্তকর্মী সমাজসেবী বন্ধুবর খান বাহাদুর মৌলবী আবদুল আজিজ বিএ মরহুমের সঙ্গে থাকিয়া সমিতির মেম্বর সংগ্রহ ও চাঁদা আদায় করিতে লাগিলাম। তাঁহারা অনেক দিন আমাকে ঢাকায় আটকাইয়া রাখিলেন।"[১০৮] নারী হোক, পুরুষ হোক, উপযুক্ত শিক্ষা ছাড়া সমাজের উন্নতির অন্য কোনো উপায় নেই, এরূপ বিবেচনায় এবং সমাজের মঙ্গলচিন্তায় বিবেকের তাড়নায় সম্মিলনীর নব্যশিক্ষিত যুবকগণ ঐরূপ দুঃসাধ্যব্রতী কর্মসূচি নিয়েছিলেন। নওশের আলী খান ইউসফজয়ী তাঁর 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১) গ্রন্থে ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর সাফল্যের কথা উল্লেখ করে বলেন, "...পূর্ববঙ্গের কেন্দ্রস্থল ঢাকা নগরীতে তত্রত্য শিক্ষিত মুসলমান যুবকগণ তাঁহাদের মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী সভা হইতে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের যথেষ্ট চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের চেষ্টার ফল নিরতিশয় সন্তোষজনক হইয়াছে, বঙ্গের নানা জেলার মুসলমান বালিকাগণ তাহাদের সভায় গৃহীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছে।"[১০৯] সম্মিলনীর উদ্যোক্তাগণ প্রেরণা ও আদর্শ পেয়েছিলেন ঢাকা মাদ্রাসার তৎকালীন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দীর কাছ থেকে। এ সম্পর্কে আলোকপাত করে হবীবুল্লাহ বাহার লিখেছেন, "আবদুল আজিজ, ফজলুল করিম, ফজলুর রহিম, আবদুল মজিদ প্রমুখ কয়েকজন মুক্ত প্রাণ, মুক্তবুদ্ধি যুবক ঢাকায় অধ্যয়ন করিতেন। একসঙ্গে এক বাড়িতে তাঁহারা থাকিতেন। ... বঙ্গ মুসলিমের অতীত ও ভবিষ্যৎ চিন্তা করিয়া কখন নীরবে অশ্রুপাত করিতেন, কখন বা উৎসাহে দীপ্ত হইয়া উঠিতেন। সুহরাওয়ার্দী বংশের মনীষী ওবায়দুল্লাহ ছিলেন ইহাদের গুরু।"[১১০] তিনি ১৮৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত 'সমাজ সম্মিলনী'র সম্পাদক ছিলেন।[১১১]

প্রথম বার্ষিক অনুষ্ঠানপত্র থেকে সম্মিলনীর নিয়মাবলী সম্বন্ধে জানা যায় — সাধারণ সভ্যের মাসিক চাঁদা ছিল ২ আনা, প্রতিষ্ঠার বছর সভ্যসংখ্যা ছিল ২৩ জন, পরের বছর ছিল ৪৩ জন, তৃতীয় বছর ১০২ জন। 'অধ্যক্ষ (কার্যনির্বাহক) কমিটি'র সদস্যগণ সাধারণ সদস্যের মধ্য থেকে নির্বাচিত হতেন। প্রথম বছর কার্যনির্বাহক কমিটি ছিল এরূপ :

সভাপতি—হিম্মত আলী, বিএ

সম্পাদক—আবদুল মজিদ

১০৭. মোহাম্মদ ইদরিস আলী—'মুন্সী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫

১০৮. পূর্বোক্ত, *মাহে-নও*, বৈশাখ ১৩৭

১০৯. নওশের আলী খান ইউসফজয়ী—*বঙ্গীয় মুসলমান*, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১২৯৭, পৃ. ৪৩–৪৪

১১০ *হবীবুল্লাহ রচনাবলী*, পৃ. ৩৭৩

১১১. পূর্বোক্ত, *মাহে-নও*, বৈশাখ ১৩৭৪

সহকারী সম্পাদক—হেয়ায়েতউদ্দীন আহমদ ও জোহাদর রহিম জহিদ

কোষাধ্যক্ষ—মকবুল আহমদ

মফস্বল প্রতিনিধি—আজাদ আলী, মদস্বের হোসেন, সৈয়দ হজরত আলী মোহাম্মদ ফাজেল, নওয়াজেস আলী ও মোহাম্মদ সাদেক। [১১২]

সম্মিলনীর মাসিক সভার ব্যবস্থা ছিল। প্রথম বছর ৪টি অধিবেশন হয় ; ৪র্থ অধিবেশনে 'স্ত্রীশিক্ষার আবশ্যকতা' সম্পর্কে বরিশালের মনোরঞ্জন গুহ বক্তৃতা দেন। অধিবেশন হত ঢাকা কলেজে অথবা সম্মিলনীর দপ্তরখানায়। ঢাকার মাহুতটুলির মুনশী নূর বক্সের বাসায় ঐ দপ্তর ছিল।[১১৩]

১৮৮৯ সালের ২৯ নভেম্বর ঢাকার মাদ্রাসাগৃহে সম্মিলনীর ৬ষ্ঠ বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কাজী রাজিউদ্দীন আহমদ, তহরিরউদ্দীন আহমদ, চৌধুরী গোলাম কুদ্দুস, হেমায়েতউদ্দীন আহমদ, নেওয়াজ আলী, মোহাম্মদ হাসান, মোহাম্মদ ফাজেল প্রমুখ। মোহাম্মদ হাসান, আবদুল হালিম, হেমায়েতউদ্দীন, মোহাম্মদ-উল-আমিন, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, অলিওর রহমান বক্তৃতা করেন। বক্তাগণ গত বৎসরের কার্য-শৈথিল্য, কর্মচারী ও সভ্যগণের অমনোযোগিতার সমালোচনা করেন এবং সমাজের বিবিধ বিষয় সম্বন্ধে বক্তৃতা প্রদান করেন।[১১৪] হেমায়েতউদ্দীন মাদ্রাসা কলেজ ও বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের মধ্যে সহানুভূতি ও বন্ধুভাব স্থাপন উদ্দেশ্যে একটি 'ডিবেটিং ক্লাব বা আলোচনা সমাজ' গঠনের প্রস্তাব দেন।[১১৫] ১৮৮৮-৮৯ সালে সম্মিলনীর কার্যনির্বাহক কমিটির গঠনটি ছিল এরূপ :

সভাপতি—আবদুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক এমএ, ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট।

সহকারী সভাপতি—কাজী রাজিউদ্দীন, জমিদার ও সৈয়দ আওলাদ হোসেন, স্পেশাল সব-রেজিস্ট্রার।

সম্পাদক—আবদুল মজিদ বিএল, জজকোর্টের উকিল

১১২. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, ১৮৮৩, পৃ. ৯। ঐ বছর হিম্মত আলী ঢাকা কলেজেব বিএল, আবদুল মজিদ বিএ শ্রেণীব এবং হেমায়েতউদ্দীন ও জোহাদর রহিম জহিদ আরও নিচেব শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। যশোহরের হিম্মত আলী ১৮৮১ সালে হুগলী কলেজ থেকে বিএ, ১৮৮৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএল পাশ কবেন। নোয়াখালীর আবদুল মজিদ ১৮৮৪ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। বরিশালের হেমায়েতউদ্দীন ঢাকা কলেজ থেকে ১৮৮৬ সালে বিএ এবং ১৮৯১ সালে বিএল পাশ করেন। মেদীনীপুরের জোহাদর রহিম জহিদ ১৮৮৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ এবং ১৮৯০ সালে রিপন কলেজ থেকে বিএল পাশ করেন। আবদুল আজিজ ১৮৮৬ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। তাঁরা সবাই ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য।

১১৩. পূর্বোক্ত, *মাহে-নও*, বৈশাখ ১৩৭৪

১১৪. *সুধাকর*, ২২ অগ্রহায়ণ ১২৯৬।

১১৫. ঐ

সহকারী সম্পাদক—অলিওর রহমান, ঢাকা মাদ্রাসার শিক্ষক

সদস্য—সৈয়দ আমজাদ আলী (ডেপুটি পোস্টমাস্টার জেনারেল, পার্সনাল এসিস্ট্যান্ট), আবদুস সালাম (ঢাকা মাদ্রাসার অধ্যাপক), অধ্যাপক হাফেজ আবদুল্লাহ, অধ্যাপক আবদুল মুনিম, আবদুল ওয়াজিদ বিএ (মাদ্রাসা শিক্ষক), জহুরুল হক বিএ (মুসলমান রেজিস্ট্রার কাজি) ও মোহাম্মদ হাসান বিএ (রেজিস্ট্রার অফিসের প্রধান কেরানী)।[১১৬]

সম্মিলনীর ১৮৮৬-৮৭ সালের অনুষ্ঠানপত্রে প্রতি জেলায় 'শাখা সমিতি বা সহযোগী সমিতি' স্থাপনের অভিপ্রায় ব্যক্ত করা হয়েছিল। ঐরূপ কোনো শাখা খোলা হয়েছিল কিনা এবং সম্মিলনী আর কত বছর সক্রিয় ছিল—এসব তথ্য জানা যায় না। তবে মোসলেম ক্রনিকলের সম্পাদকের নিকট ঢাকার বলিয়াদীর জমিদার কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর প্রেরিত একপত্রে (২৫ জানুয়ারি ১৯০৪) ঐ সম্মিলনীর সংবাদ পাওয়া যায়। ঐ তারিখে সম্মিলনীর এক সভায় বঙ্গ-বিচ্ছেদের প্রতিবাদে প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১১৭] 'ঢাকা প্রকাশে' কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভার বিবরণ প্রকাশিত হয় সেখানে সভার একটি প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করে লেখা হয়, "মহসীন ফণ্ডের উপকারিতা হইতে বঞ্চিত হইলে মুসলমান সম্প্রদায়ের অনেক অনিষ্ট হইবে মনে করিয়া বিশেষ ব্যাকুলতার সহিত গভর্ণমেণ্টের নিকট বর্তমান প্রস্তাব (বঙ্গ-বিচ্ছেদ) প্রত্যাহার করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন।"[১১৮] ডক্টর আহমদ হাসান দানীর মতে বঙ্গ-বিচ্ছেদের দিনে (১৬ অক্টবর ১৯০৫) ঢাকার নর্থব্রুক হলে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় 'মহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন' নামে একটি নতুন সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে পরে মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর অস্তিত্ব লোপ পায়।[১১৯]

নূর-অল ইমান সমাজ (১৮৮৪)

'নূর-অল ইমান সমাজ' রাজশাহীর একটি 'বিদ্যোৎসাহিনী' প্রতিষ্ঠান।[১২০] মিহির ও সুধাকর মোসলমান ধর্ম, মোসলমান জ্ঞান, মোসলমান বিজ্ঞান প্রচারক' সমিতি বলে অভিহিত করেছে।[১২১] 'সমাজে'র কর্মসূচি যে বহুমুখী ছিল, তা ঐসব মন্তব্য থেকে বুঝা যায়। একে ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বলা যায়।

১১৬. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম—'ঢাকার মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', *সাহিত্যিকী*, বসন্ত সংখ্যা ১৩৮৪, পৃ. ১৮

১১৭. *The Moslem Chronicle*, 30 January 1904.

১১৮. মুনতাসির মামুন—'বঙ্গ বিভাগ প্রস্তাব এবং পূর্ববঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া', *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা* ৩-৪ সংখ্যা ১৩৮১-৮২

১১৯. Ahmad Hasan Dani–*Dacca*, Dacca, 1962, p. 123 (2nd. edition)

১২০. *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৩৪৬

১২১. *মিহির ও সুধাকর*, ২৫ আশ্বিন ১৩০৮

ঠিক কোন সময় 'নূর-অল ইমান সমাজ' স্থাপিত হয়, তা নির্ণয় করা যায় না। মুহম্মদ আবদুল হাই ১৮৯৫ সালকে 'সমাজে'র প্রতিষ্ঠার কাল বলেছেন।[১২২] মুহম্মদ আবু তালিব বলেছেন, ১৮৮৪ সাল।[১২৩] ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান লিখেছেন, "আঞ্জমানে হেমায়েতে এসলাম গঠনের ২/১ বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশীয় কতকগুলি আলেম, ফাজেল ও বিদ্বান লোক লইয়া নূর-অল ইমান সমাজ গঠিত হয়।"[১২৪] আঞ্জমানে হেমায়েতে এসলাম ১৮৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এ হিসাবে নূর-অল ইমান সমাজের প্রতিষ্ঠার কাল দাঁড়ায় ১৮৯২ অথবা ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ। পরবর্তীকালে নূরু-অল ইমান সমাজের মুখপত্র মাসিক 'নূর-অল ইমানে' প্রকাশিত 'ভাষা সম্বন্ধে নূর-অল ইমানের কৈফিয়ৎ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে লেখা হয়, "নূর-অল ইমান প্রথম চেষ্টায় দুগ্ধ-সরোবর নামক একখানি 'কওমী পুস্তিকা' প্রণয়ন ও প্রচার করে। ...অধুনা নূর-অল ইমান এই কাগজখানি বাহির করিতে হাত দিয়াছেন।"[১২৫] যেসব 'বঙ্গ দেশীয় আলেম, ফাজেল ও বিদ্বান লোক' নূর-অল-ইমান সমাজ গঠন করেন, তাঁদের নাম পরিচয় জানা যায় না। 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'তে (১৮৯৫) 'অনুবাদক কমিটি'র সদস্যদের নাম আছে ; তাঁরা যে ঐ সমাজের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। 'অনুবাদক কমিটি'তে ছিলেন মোহাম্মদ আবদুল আজিজ (পরিদর্শক), আবু আলী (ঐ), মোহাম্মদ সাবের উদ্দীন আমীন (ঐ), মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (অনুবাদক), মুনশী মোহাম্মদ আলিম (নকলকারক) ও খয়রুজ্জমান খাঁ (সহকারী সম্পাদক)।[১২৬]

সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের উপর আলোকপাত করে মিহির ও সুধাকরে লেখা হয়, "নূর-অল ইমান সমাজের পরিচালক মেম্বারগণ মোসলমান হৃদয় হইতে জঘন্য দোষগুলি দূর করিয়া তৎপরিবর্তে উজ্জ্বল গুণাবলী মনুষ্যত্ব ধর্ম উদ্ভাসিত করিতে, এসলাম সমাজে দিব্যালোক বিস্তার করিতে, মোসলমান ভ্রাতা-ভগিনীর হৃদয় একটি সাধারণ মিলনসূত্রে গাঁথিয়া লইতে প্রয়াসী হইয়া যে সকল চেষ্টা করিতেছেন তন্মধ্যে পুস্তক পত্রিকার প্রচারকার্যও একটি প্রধান কার্য।"[১২৭] এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে তাঁরা কতকগুলি বাস্তব কর্মসূচি গ্রহণ করেন, যথা—সুশিক্ষিত ধর্মপ্রচারক দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচার, পত্রিকা প্রকাশ ও পুস্তক প্রণয়ন এবং শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নির্মাণ। মির্জা ইউসুফের 'দুগ্ধ-সরোবর' (১৮৯১) সমাজের উদ্যোগে প্রকাশিত হয়। ইমাম গাজ্জালীর 'কিমিয়া-ই-সাদৎ'-এর বঙ্গানুবাদ 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' (৫ খণ্ড ১৮৯৫-১৯১৫) গ্রন্থের প্রকাশ ঐ সমাজের আর এক কৃতিত্ব।

১২২. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১৩১ (৪ সং)।
১২৩. *পূর্বোক্ত, বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭৪
১২৪. *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ. ৩৪০
১২৫. *নূর-অল ইমান*, শ্রাবণ ১৩০৭
১২৬. মীর্জা এম. এ. আজিজ—'সৌভাগ্য স্পর্শমণি ও মুনশী রেয়াজুদ্দীন', *মাসিক মোহাম্মদী*, চৈত্র ১৩৪০।
১২৭. *মিহির ও সুধাকর*, ২৫ আশ্বিন ১৩০৮

মির্জা ইউসুফ সমাজের সাহায্যেই গ্রন্থখানি অনুবাদ ও প্রকাশের উৎসাহ পান। প্রচার কার্যের সুবিধার জন্য নিজস্ব পত্রিকার প্রয়োজনবোধ থেকে পরিচালকগণ সমাজের মুখপত্র মাসিক নূর-অল-ইমান প্রকাশ করেন (১৯০০)। পত্রিকার আখ্যাপত্রে লেখা হতো 'নূর-অল-ইমান সমাজ কর্তৃক সম্পাদিত ও মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী কর্তৃক শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সজ্জীকৃত'। পত্রিকাখানি 'সমাজের সভ্যগণের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ' করা হতো। নূর অল-ইমানে প্রকাশিত 'সমাজের সাংগঠনিক কার্যবিবরণী' থেকে জানা যায়, সমাজের কর্মীরা মুষ্ঠিভিক্ষা ও চাঁদা আদায় করে গরীব ছাত্রদের আহার ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতেন এবং শিক্ষার অন্যান্য ব্যয় নির্বাহ করতেন।[১২৮] মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী বিশেষ আন্দোলন চালিয়ে রাজশাহী ও নওগাঁয় মুসলমান ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠিত করেন।[১২৯]

সাতক্ষীরা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী (১৮৮৮)

'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র নামের অনুরূপ 'সাতক্ষীরা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' ১২৯৫ সনে সাতক্ষীরায় স্থাপিত হয়। ৪ কার্তিক ১২৯৬ সনে অনুষ্ঠিত সম্মিলনীর দ্বিতীয় অধিবেশনের এক বিবরণ 'সুধাকরে' প্রকাশিত হয়। এটি ছিল 'ষান্মাসিক' দ্বিতীয় অধিবেশন : অতএব বছর খানেক আগে এটি জন্ম লাভ করেছিল। বিববণটি সম্মিলনীর সম্পাদক কাজী আবদুল আজিজ ও জনৈক সদস্য মীর নূর আলী সুধাকর'-এ প্রেরণ করেন। সভায় স্থানীয় জমিদার, তালুকদার, মহাজন, দোকানদার ও কৃষক সাধারণ মিলে প্রায় ৫০০ জন উপস্থিত ছিলেন। সম্পাদক কাজী আবদুল আজিজ সভায় 'ষান্মাসিক রিপোর্ট' পাঠ করেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব দেন। সভায় নিম্নরূপ তিনটি প্রস্তাব গৃহীত হয় :

১. সাতক্ষীরা প্রাণনাথ এন্ট্রেন্স স্কুলের মুসলমান ছাত্রগণের ৩য় শ্রেণী হইতে পারসি বা উর্দু শিক্ষা দিবার জন্য একজন মৌলবী আগামী বৈশাখ মাস হইতে যোগ দিবেন।

২. যে সকল মুসলমান ছাত্র বিদ্যাশিক্ষা করিতে অক্ষম, তাহাদিগকে সভা বেতনের সাহায্য করিবেন।

৩. সাতক্ষীরা সবডিভিসনের ফৌজদারী ও দেওয়ানী আদালতের আমলা ও মক্কেলগণের নামাজ পড়িবার জন্য স্থায়ী মিউনিসিপ্যালিটি যে ১২ x ১২ জমি প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে একটি নামাজের স্থান প্রস্তুত হইবে।[১৩০]

এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা (১৮৮৯)

'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা'র প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা। ইসলাম ধর্ম প্রচার তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। মুনশী মেহেরুল্লার নীতি এবং সভার নামকরণ থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম প্রচারই সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'মেহের-

১২৮. *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ. ৩৪২
১২৯. সৈয়দ মর্তুজা আলী—উত্তর বঙ্গের সাহিত্য, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
১৩০. সুধাকর, ১৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৬

চরিতে' (১৯৪১) এর সমর্থন পাওয়া যায়।[১৩১] যখন যশোহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খ্রীস্টান মিশনারীদের প্রভাব-প্রতিপত্তি খুব বেড়ে যায়, তখন মুনশী মেহেরুল্লা কতিপয় সহযোগীকে সঙ্গে নিয়ে ইসলাম ধর্ম প্রচারে অবতীর্ণ হন। তিনি শুধু খ্রীস্টান পাদরীদের বক্তৃতার জবাবে বক্তৃতা প্রদান নয়, খ্রীস্টান মিশনের অনুরূপ মিশন বা সমিতি স্থাপন করে সংগঠিত উপায়ে প্রচার কার্য চালাবার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। 'ইসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' এই উদ্দেশ্যেই স্থাপিত হয়। শেখ জমিরুদ্দীন লিখেছেন, "এই সময়ে তিনি (মেহেরুল্লা) যশোহরে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা' নামক একটা আঞ্জমন স্থাপন করেন। এই আঞ্জমনের একটি বিশেষ অধিবেশন উপলক্ষে তিনি কলিকাতাস্থ মৌলবী মেয়রাজুদ্দীন আহমদ সাহেব, মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাহেব ও মুনশী শেখ আবদুর রহিম সাহেবকে নিমন্ত্রণ করিয়া যশোহরে লইয়া গিয়াছিলেন।"[১৩২] তিনি আরও উল্লেখ করেন, "এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পূর্বেই 'সুধাকর' মোসলেমগগনে উদিত হয়। ... যশোহর-ঘোবাস্থ খ্যাতনামা রইস সৈয়দ আহমদুল্লা সাহেবের বাসবভনে এই সভার বিরাট অধিবেশন হইয়াছিল। এই সভাক্ষেত্রেই বহু সংখ্যক মুসলমান ভ্রাতা সুধাকরের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত হন।"[১৩৩]

কলিকাতার 'সুধাকব' সাপ্তাহিকের জন্ম ২৩ কার্তিক ১২৯৬। ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৬ তারিখেব সুধাকরে (১ বর্ষ, ৬ সংখ্যা) 'যশোহব মুসলমান ধর্মোত্তেজিকা সভা'র উল্লেখ আছে। ঐ সংখ্যার একটি সংবাদে বলা হয, "মৌলবি নৈমুদ্দীন সাহেবের সাহায্য জন্য 'যশোহর মুসলমান ধর্মোত্তেজিকা সভা' চাঁদা আদায় করিতেছেন।" [১৩৪]

উপরের বর্ণিত তথ্য থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সুধাকরের জন্মের কিছুকাল আগে 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' স্থাপিত হয়। খুব সম্ভব, ১৮৮৯ সালের নভেম্বরের আগে কোন এক মাসে এর উদ্ভব হয।

আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলাম (১৮৯১)

বাজশাহীর 'আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলামে'র প্রতিষ্ঠাতা সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। আঞ্জমনের একটি ছাপান 'অনুষ্ঠান-পুস্তিকা'য় বলা হয়েছে, "কি উপায়ে ধর্মের উন্নতি হইবে, কি প্রকারে মুসলমান সম্প্রদায়ের লুপ্ত গৌরব ফিরিয়া

১৩১. শেখ জমিরুদ্দীন মুনশী মেহেরুল্লার ভাবশিষ্য ও সহকর্মী ছিলেন। মেহেরুল্লার মৃত্যুব ২ বছর পবে তাঁর জীবনীগ্রন্থ 'মেহের-চরিত' বচিত হয।

১৩২. শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন—*মেহের চরিত*, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৫, পৃ. ৯

১৩৩. *মেহেব চরিত*, পৃ. ১০

১৩৪. *সুধাকর*, ২৯ অগ্রহায়ণ ১২৯৬
উল্লেখযোগ্য যে 'গো-জীবন' নিয়ে মীর মশাররফ হোসেন ও মোহাম্মদ নইমুদ্দীনেব মধ্যে যে মকদ্দমা হয়, সেই মকদ্দমায় নইমুদ্দীন সাহেবকে আর্থিক সাহায্য দানের জন্য এই চাঁদা সংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। সুধাকর-গোষ্ঠী এ ব্যাপারে নইমুদ্দীন সাহেবকে সমর্থন দিয়েছিলেন। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যাযে 'সমাজ' অংশ দ্রষ্টব্য।

আসিবে, কিসে ন্যায্য জীবিকার (হালাল রুজীর) পথ প্রশস্ত হইবে, কি উপায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে বিদ্যার আলোক প্রবেশ করিবে ও মুসলমান বালকদিগকে বিদ্যা শিক্ষায় সাহায্য করা যাইবে, এই সকল বিষয় পরামর্শ করিয়া গবর্নমেন্টের আইন সঙ্গত উপায় অবধারণ ও তাহা কার্য্যে প্রচলন-ইহাই এই সভার উদ্দেশ্য।"[১৩৫] অর্থাৎ ধর্ম, সমাজ ও শিক্ষার উদ্দেশ্যেই আঞ্জমনের কর্মসূচি নিবেদিত। ইসলাম-প্রচারক (আশ্বিন ১২৯৮) একে 'ধর্মীয় সভা' বলে আখ্যাত করেছে।

পত্রিকায় লেখা হয়, "উত্তরবঙ্গের ধর্মবীর মৌলবী হাসেন আলী সাহেবের উপদেশে উত্তেজিত হইয়া রাজশাহীতে 'হেমায়েতে এসলাম সভা' স্থাপিত হইয়াছে; মালদহ জেলার দক্ষিণ পূর্বাংশের গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত বন্ধুগণ হেমায়েতে এসলামের সহিত কার্যক্ষেত্রে সহায় হইয়াছেন।"[১৩৬]

বোয়ালিয়ার হেতাম খাঁ মসজিদে এর দুদিন ব্যাপী (১১ ও ১২ পৌষ ১২৯৮) যে অধিবেশন হয় তাতে রাজশাহী, মালদহ ও মুর্শিদাবাদ থেকে বহু সংখ্যক সভ্য সমাগত হন।[১৩৭] আবদুল আজিজ প্রণীত 'আরব্য ও পারস্য মধুপাক' নামে একখানি পুস্তক 'রাজশাহী আঞ্জমনে হেমায়েত এসলাম ও রঙ্গপুর নূরল ইমান সমাজদ্বয়ের সাহায্যে প্রকাশিত' হয়।[১৩৮]

একই নামে, বরিশাল, ডায়মণ্ডহারবার ও পুরুলিয়ায় সমিতি ছিল। বরিশালের আঞ্জমনে হেমায়েত এসলাম স্থাপিত হয় ১৮৯৩ সালে। প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বরিশাল জজকোর্টের উকিল হেমায়েতউদ্দীন আহমদ। সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায় লিখেছেন, "বরিশাল জেলাবাসী মুসলমানগণের দুঃখ, দুর্দশা, নিরক্ষরতা ও নিচেষ্টতা দর্শনে যৌবনেই খান বাহাদুর সাহেবের (হেমায়েত উদ্দিনের) মহৎ হৃদয় বিচলিত হয়। তিনি বুঝিলেন যে জেলাব্যাপী শিক্ষাহীনতাই তাহাদের এই শোচনীয় অধঃপতনের কারণ। তাই এই ত্যাগী পুরুষ তাঁহার মনঃপ্রাণ কর্মশক্তি নিয়োজিত করেন — স্বসমাজ স্বদেশ সেবায়, মুসলমানের সর্ববিধ উন্নতি বিধান কল্পে। এই মহৎ উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়াই ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভাগলপুরের খ্যাতনামা মৌলভী হাসান আলী সাহেবকে বরিশালে আমন্ত্রণ করেন। তাঁহার আহ্বানে এই মহাত্মা এ শহরে আসেন — ধর্ম প্রচার ও সমাজ সংস্কার মানসে। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতা ও উৎসাহে উদ্বুদ্ধ হইয়াই শহরস্থ মুসলমান জনসাধারণ ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ মে 'আঞ্জমনে হেমায়েত ইসলাম' নামে এক শক্তিশালী সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য হইল আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক শিক্ষার ব্যাপক

১৩৫. *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ. ৩৪০ (২ সং)।
১৩৬. *ইসলাম-প্রচারক*, বৈশাখ ১২৯৯
মৌলভী হাসান আলী প্রকৃতপক্ষে বিহারের ভাগলপুরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি সুবক্তা হিসাবে বাংলাদেশে সুপরিচিত ছিলেন।
১৩৭. *আধুনিক বাঙলা-সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ. ৩৪০
১৩৮. *ইসলাম-প্রচারক*, আশ্বিন ১২৯৮

প্রচার ও প্রসার দ্বারা এ জেলাবাসী মুসলমানদের সর্ববিধ উন্নতি বিধান। এই সমিতির সর্বপ্রধান উদ্যোক্তা খান বাহাদুর মৌলভী হেমায়েতউদ্দিন আহমদ সাহেব ইহার সম্পাদক ও মৌলভী মোহাম্মদ ওয়াজেদ সাহেব সভাপতি নিযুক্ত হন।"[১৩৯] ১৯২৩ সালে সমিতি-তালিকায় বলা হয়েছে যে, বাকেরগঞ্জের মুসলমান সমাজের উন্নতি সাধন এবং সরকারের কাছে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করা এর উদ্দেশ্য ছিল। ঐ তালিকায় আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে, বরিশাল জেলার হজ যাত্রীদের টীকা দেওয়ার ব্যাপারে আঞ্জমন সক্রিয় উদ্যোগ নিয়েছিল।[১৪০] ১৮৯৫ সালে 'পিলগ্রিমশিপ বিল' অনুসারে হজ যাত্রীদের প্রথম টীকা দানের নিয়ম চালু হয়। টীকা গ্রহণে অনেকের ধর্মগত আপত্তি ছিল।[১৪১] বরিশাল শহরে মুসলমান ছাত্রদের জন্য একটি বোর্ডিং নির্মাণের উদ্দেশ্যে চাঁদা সংগ্রহের জন্য 'আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলাম' (১৮৯৫ সালে ফেব্রুয়ারিতে) একটি জনসভার আয়োজন করে। ঐ সভায় শায়েস্তাবাদের জমিদার সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন খান বাহাদুর ৫০০ টাকা চাঁদা দেন। তিনি ছিলেন ঐ সময় আঞ্জমনের সভাপতি। এই উদ্যোগের ফলে বরিশালের 'বেল ইসলামিয়া হোস্টেল' স্থাপিত হয় (২২ ডিসেম্বর ১৮৯৫)। আঞ্জমনে হেমায়েতে এসলাম সংগঠনটি আজও টিকে আছে।

আঞ্জমানে মঈনাল এসলাম (১৮৯১)

এটি টাঙ্গাইলের আটীয়ায় প্রতিষ্ঠিত একটি ধর্মসভা। এর সম্পাদক ছিলেন সাহিত্যিক ও সাংবাদিক মোহাম্মদ নইমুদ্দীন। তিনি এবং সহযোগী গোলাম সরওয়ার ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করতেন। 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র আসন্ন অধিবেশনে (১৪ ও ১৫ এপ্রিল ১৯০৫) যোগদানের উদ্দেশ্যে আটীয়ার আঞ্জমনের একটি সভা হয় (এপ্রিল ১৯০৫)। ঐ সভায় করটীয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী সভাপতিত্ব করেন। আঞ্জমনের পক্ষ থেকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ প্রতিনিধি নির্বাচিত হন :

নওশেল আলী খান ইউসফজয়ী, জমিদার ও সব-রেজিস্ট্রার
তোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী, জমিদার
সাহেবজাদা মসউদ আলী খান পন্নী
দলিলউদ্দীন আহমদ, বিএ, গৃহশিক্ষক
নইমুদ্দীন আহমদ, সম্পাদক
মোতাহার আলী খান, করটীয়া হাই স্কুলের ইংরাজি শিক্ষক।[১৪২]

১৩৯. সুধীরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—*বরিশাল বেল ইসলামিয়া হোস্টেল,* বরিশাল, ১৯৪০, পৃ. ৫।
১৪০. *Revision of the List of Associations*, p. 32.
১৪১. *The Moslem Chronicle*, 22 August 1895.
১৪২. *মিহির ও সুধাকর,* ২৮ বৈশাখ ১৩১৩

১২৯৭ সনে এটি স্থাপিত হয়।[১৪৩] ১৩০১ সনে প্রকাশিত মোসলেমউদ্দীন খানের 'হিতকাব্য' থেকে জানা যায় যে, ঐ বছর আঞ্জুমনের সভাপতি ছিলেন ওয়াজেদ আলী খান পন্নী।[১৪৪]

রঙ্গপুর নূরল ইমান জামায়ত (১৮৯১)

'রঙ্গপুর নূরল ইমান জামায়াত' ১ শাবান ১৩০৮ হিজরী অনুযায়ী ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দে স্থাপিত হয়। এটি একটি ধর্মবিষয়ক সভা। মুসলমান সমাজের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধি এবং ইসলাম ধর্মের সর্ব প্রকার উন্নতির চেষ্টা এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। উক্ত 'জামায়াতে'র সহকারী সম্পাদক খয়রুজ্জামান খাঁ ২ আগস্ট ১৮৯১ সালে রঙ্গপুর থেকে একটি প্রচারপত্র 'ইসলাম-প্রচারকে' পাঠান। ইসলাম-প্রচারকের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সেটি মুদ্রিত হয়। তাতে 'জামায়াতে'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিম্নের বিষয়গুলি উল্লিখিত হয়েছে :

১. এসলামধর্মের সারমর্ম সর্ব সাধারণ লোকদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইবে। পবিত্র কোরান শরিফ পাঠ করিয়া তাহার অর্থ, তফসির সরল ভাষায় সর্ব সাধারণকে শ্রবণ করান হইবে। বিধর্মীগণের আরোপিত বাক্যে যুবকগণের মনে যে ধোকা বা খটকা উপস্থিত হয়, তাহা সদযুক্তি অবলম্বনে ভঞ্জন করা যাইবে। বালক-বালিকা গণের হৃদয়-ক্ষেত্রে জ্ঞান ও ধর্মবীজ বপন, উপদেশ বাবি সেচন করিয়া যাহাতে সেই বীজ অঙ্কুরিত, বর্ধিত, পুষ্পিত, ফলিত হইয়া উত্তরকালে সুশীতল ছায়া ও ফল দানে বালক-বালিকাগণকে অমৃতময় শান্তিসুখ প্রদান করে তাহার জন্য চেষ্টা করা যাইবে।

২. খোদাতালা তৌফিক দিলে নূরুল ইমান এতদর্থে বেতনভোগী ওয়ায়েজ বা প্রচারক নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারা মফঃস্বলের গ্রামে মসজেদে হাটে বাটে এসলাম ধর্মের ব্যাখ্যা করিবেন।

৩. 'কেতাব চিরস্থায়ী উপদেশক, কেতাব অক্লান্ত প্রচারক' এইজন্য নূরল ইমান বিখ্যাত ধর্মগ্রন্থ সকলের বাঙ্গালা অনুবাদ প্রচার করিবেন। এতদব্যতীত মুসলমান কওমের উপকার ও শিক্ষার্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক বঙ্গভাষায় প্রণয়ন ও সঙ্কলন করিবেন।

৪. অন্যান্য স্থানের প্রচারক সমাজের সহিত নূরুল ইমানের গাঢ় সহানুভূতি থাকিবে। বিলাতে ইংরেজগণের নিকট এসলামধর্ম প্রচার করিতে যে সকল ওয়ায়েজ বা প্রচারক প্রেরিত হইবেন, নূরল ইমান তাহাদিগকেও যথাসাধ্য সাহায্য করিবেন।[১৪৫]

১৪৩. ইসলাম প্রচারকে (অগ্রহায়ণ ১২৯৮) এক সংবাদ-প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে ১৫ চৈত্র ১২৯৮ আটিয়ার 'আঞ্জুমনে মঈনাল এসলামে'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। এ থেকে আঞ্জুমনের প্রতিষ্ঠাকাল নির্ণীত হয়। ১২৯৭ সনের চৈত্র মাসের দিকে যদি এটি স্থাপিত হয়, তবে ইংরেজি সাল দাঁড়াবে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দ।

১৪৪. মোসলেমউদ্দীন খানের 'হিতকাব্য' দ্রষ্টব্য।

১৪৫. *ইসলাম-প্রচারক*, ভাদ্র ১২৯৮

ঐ পত্রে জামায়াতের প্রধান উদ্যোগী হিসাবে যাঁর নাম করা হয়েছে তিনি হলেন আবদুল জলিল (রঙ্গপুর সরকারী ইংরাজি স্কুলের শিক্ষক)। আবু আলী আহমদ আবেদ এবং ফয়েজুল্লাহ ছিলেন পৃষ্ঠপোষক। প্রতি শুক্রবারে জুমা মসজিদে নুরল ইমানের বৈঠক বসতো ; এঁরা কোরান ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের শোনাতেন।[১৪৬] ঐ পত্রে ৫৯ জন চাঁদা দাতার একটি তালিকা আছে। যাঁরা এক টাকা চাঁদা ও অন্য অন্য সাহায্য করেছেন তাঁদের 'হিতৈষী' সদস্যের শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। তসলিমুদ্দীন বিএল, মহম্মদ মজাম্মল (ডাক্তার), মহব্বত উল্লা (মোক্তার) ও রহিম বক্স (দারোগা) এরূপ হিতৈষী-সদস্য ছিলেন।[১৪৭] ১৮৯১ সালের ১৬ ডিসেম্বর নূরল ইমানের একটি বিশেষ অধিবেশন মহীপুরের চৌধুরী আবদুল মজিদের জমিদার বাড়ির মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সভায় নূরল ইমানের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে শ্রোতাদের বুঝান হয়। সুশিক্ষিত ধর্মপ্রচারক দ্বারা ধর্মপ্রচার এবং ধর্মগ্রন্থ অনুবাদ ও সমাজ-হিতকর গ্রন্থ প্রণয়নের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এর একটি শাখা সমিতি গঠন করা হয়। শাখাটির নাম হয় 'মহীপুর দায়রায় জামাত'। এর কর্মকর্তাদের নাম ছিল নিম্নরূপ :

সভাপতি—চৌধুরী আবদুল মজিদ, জমিদার, মহীপুর
সহ-সভাপতি—চৌধুরী মফিজউদ্দীন, জমিদার, মহীপুর ও শাহ লুৎফর রহমান, জমিদার, মহীপুর
সম্পাদক—শাহামতউল্লাহ ও শহর আলী
সহকারী-সম্পাদক-কসিমউদ্দীন ও জহুরউদ্দীন
অডিটর--আমিরউদ্দিন, হেড পণ্ডিত, মহীপুর স্কুল
রাইটার—গোলাম আলী।[১৪৮]

ইসলামধর্মের পুনরুজ্জীবন দ্বারা মুসলমান সমাজের জাগরণ—'নূরল ইমান জামায়াতে'র কর্মকর্তাদের চিন্তাধারায় প্রতিফলিত হয়েছে।

কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন (১৮৯৩)

'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন' ১৮৯৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ছিল নব্যশিক্ষিতদের প্রতিষ্ঠান। ১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হলে এবং ১৮৯৩ সালে নবাব আবদুল লতিফ মৃত্যু-বরণ করলে কলিকাতার 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' ও 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' পূর্বের গৌরব হারিয়ে

১৪৬. ঐ।
১৪৭. *ঐ*, আশ্বিন ১২৯৮
১৪৮ *ইসলাম-প্রচারক*, আশ্বিন ১২৯৮

ফেলে। সমাজে হতাশার সঞ্চার হয়। তখন সমাজহিতৈষী শিক্ষিত যুবকেরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে এটি প্রতিষ্ঠিত করেন। এ সম্পর্কে আলোকসম্পাত করে ইংরাজি সাপ্তাহিক 'মোসলেম ক্রনিকলে' লেখা হয়,

" This Union composed of the flower of our rising generation, consistiing of Moslem graduates and undergradutes. It is an energetic expression of the dissatisfaction with the present torpid state of the two Associations which exist, and which are not of that use, which they used to be in former days."[১৪৯]

'ইউনিয়নে'র কোনো মুখপত্র অথবা বার্ষিক কার্যবিবরণী না থাকায় এর উদ্যোক্তাগণ কে ছিলেন এবং এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি ছিল তা বলা যায় না। মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "আজ ৬/৭ বৎসর হইতে মাননীয় ইসলাম প্রচারক সম্পাদকসহ আমরা একটি জাতীয় মহাসমিতি সংস্থাপনের জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিয়া আসিতেছি এবং কলিকাতায় উহার ভিত্তি স্থাপন পূর্বক ধীর মন্থরগতিতে কয়েকটা অনুষ্ঠান সম্পাদন করিতেও সমর্থ হইয়াছি। বর্তমান সময় 'শিক্ষা সমিতি' নামে যে সমিতির ঘোর আন্দোলন চলিতেছে, তাহাও উক্ত সভারই উদ্যোগের মহান ফল।"[১৫০] এটি যে 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন'কে ইঙ্গিত করছে, তাতে সন্দেহ নেই। তিনি ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ জন্মসূত্রে এর সহিত জড়িত ছিলেন। মোসলেম ক্রনিকলে (২২ আগষ্ট ১৮৯৫) প্রকাশিত একটি পত্র থেকে জানা যায়, ব্যারিস্টার মোহাম্মদ সোলায়মান ছিলেন ইউনিয়নের ঐ সময়ের সভাপতি। দশ বছর পর ইসলাম-প্রচারকে ইউনিয়নের ১১৭ জন সদস্যের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। ঐ তালিকা থেকে প্রধান কর্মকর্তাদের নিম্নরূপ নাম পাওয়া যায় :

সভাপতি–মির্জা শুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর

সহ-সভাপতি–দেলওয়ার হোসেন বিএ, খান বাহাদুর, সৈয়দ শামসুল হোদা, এমএ, বিএল, জেড. আর. জাহিদ, এমএ, বিএল ও হাসিবুদ্দিন আহমদ, বিএল।

সম্পাদক—ওয়াহেদ হোসেন, বিএল

যুগ্ম-সম্পাদক—এ. কে. মোহাম্মদ সঈদ

সহকারী সম্পাদক—আবদুর রশিদ বিএ ও মোহাম্মদ ফাজেল।[১৫১]

১৪৯. *The Moslem Chonicle*, 12 Sept., 1895.

১৫০. মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী—'ইসলাম ও মিশন', *ইসলাম প্রচারক*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০

১৫১. *ইসলাম-প্রচারক*, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০

ইউনিয়নের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের বেগম ফেরদৌস মহল, সি. আই., মহীশূর পরিবারের প্রিন্স মোহাম্মদ বখতিয়ার শাহ, সি. আই. ই. ও করটীয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নীর নাম আছে। তালিকাটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, ইউনিয়নের শহর ও মফস্বলের সদস্যগণ সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে এসেছেন। প্রিন্স, নবাব, জমিদার, ব্যারিস্টার, উকিল, ডাক্তার, শিক্ষক, লেখক, সম্পাদক, পদস্থ কর্মচারী ও অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তি আছেন। তালিকায় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের সংখ্যাই বেশি। বাঙালি অবাঙালি উভয় শ্রেণীর মুসলমান ইউনিয়নের সদস্যভুক্ত ছিলেন। মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা, মর্যাদারক্ষা ও উন্নতিবিধান কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নের লক্ষ্য ছিল। বিশেষত শিক্ষাবিস্তারের দিকে অধিক ঝোঁক ছিল।

হজযাত্রীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা, জাহাজের ভাড়া বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে একটি বিল আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করেন। সেকালের পত্রপত্রিকায় বিলের বিরুদ্ধে বাদ-প্রতিবাদ ওঠে। কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নের এ বিষয়ে দৃষ্টি পড়ে। ১৮৯৫ সালে আগস্ট মাসে একটি সাধারণ সভায় মিলিত হয়ে সদস্যগণ কয়েকটি প্রস্তাব গ্রহণ করেন। জাহাজের ভাড়া বাড়লে গরিব হজযাত্রীর পক্ষে হজব্রত পালন করা কঠিন হয়ে পড়বে এবং পুরুষ ডাক্তার দ্বারা নারীর স্বাস্থ্য-পরীক্ষা করলে পর্দানশীলতার হানি হবে—মুখ্যত এ-দুটি বিষয়ে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একটি 'প্রস্তাবপত্র' কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়। তৎকালীন সভাপতি মোহাম্মদ সোলায়মান ইউনিয়নের পক্ষ থেকে সেটি প্রেরণ করেন।[১৫২]

দ্বিতীয় বার্ষিক সভা হয় ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫ কলিকাতার বি. এন. ইনস্টিটিউশনে (কলেজ)। এতে সভাপতিত্ব করেন এইচ. ই. এ. কটন, ব্যারিস্টার-এট-ল। সৈয়দ শামসুল হোদা 'ইণ্ডিয়ান পলিটিকস এ্যাণ্ড দি মহামেডান' সম্পর্কে একটি চিন্তাশীল জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা দেন। তিনি ঐ বক্তৃতায় ভারতের মুসলমান সমাজের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান মনোভাবটি কি, সে-সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন চিত্র তুলে ধরেন। তিনি বিচার বিভাগে 'জুরিপ্রথা'র উপরও মন্তব্য করেন। ঐ সভায় মুসলমান সমাজ কেন পিছিয়ে আছে, সরকারি চাকুরীতে মুসলমানদের স্থান কিরূপ ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হয়।[১৫৩] স্কুল-ইনস্পেক্টর প্রিয়নাথ ঘোষ এমএ মুসলমানদের সম্পর্কে আপত্তিকর শব্দ ব্যবহার করায় ইউনিয়নের সম্পাদক এর প্রতিবাদ করে মোসলেম ক্রনিকলে (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) পত্র লিখেছিলেন। বাঙালি মুসলমানের একটা স্পর্শকাতর আত্মমর্যাদাবোধ গড়ে উঠেছিল, এ থেকে তা জানা যায়।

১৭ ডিসেম্বর ১৮৯৮ সালের মোসলেম ক্রনিকলে প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তি থেকে জানা যায়, কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন 'উডবার্ন-মেডাল' নামে একটি রৌপ্যপদকের ব্যবস্থা

১৫২. *The Moslem Chronicle*, 22 August 1895.
১৫৩. *Ibid.*, 12 September 1895.

করে নিবন্ধ রচনার প্রতিযোগিতা আহ্বান করে। ঐ বছরের জন্য প্রবন্ধের বিষয় ছিল 'দি কণ্ডিশন অফ দি মহামেডান অব বেঙ্গল, বিহার এ্যাণ্ড উড়িষ্যা'। প্রবন্ধ পরীক্ষার দায়িত্ব ছিল ইউনিয়নের উপর। ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় বিজয়ী পুরস্কার পাবেন।

মক্তব ও মাদ্রাসার শিক্ষা যুগোযোগী নয় ; ঐরূপ শিক্ষায় অর্থ, শক্তি ও সময়ের অপচয় হচ্ছে ; সুতরাং শিক্ষা পদ্ধতি ও পাঠ্যসূচির সংস্কার প্রয়োজন। মাদ্রাসার শিক্ষা-সংস্কার দাবি করে একটি লিখিত প্রস্তাবপত্র সরকারের নিকট ইউনিয়ন প্রদান করে।[১৫৪] ইউনিয়নের প্রতি বছর বার্ষিক সভার ব্যবস্থা ছিল।

১৯০২ সালে ইউনিয়ন ভারত সরকারের কাছে একটি 'প্রয়োজনীয় বিষয়ে দীর্ঘপত্র প্রেরণ' করে।[১৫৫] পত্রটি ছিল 'ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে'র গৃহীত প্রস্তাবের বিরুদ্ধে। ১৯০২ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর ইউনিয়নের সভা হয়। কমিশনের প্রস্তাব কার্যকরী হলে মুসলমান মধ্যবিত্ত ও দুস্থ লোকের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে-- এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।[১৫৬]

১৯০৩ সালে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠিত হয়। কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নকে এ সমিতির প্রসূতি বলা যেতে পারে। ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩ সালে ইউনিয়নের বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয় ; সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আমীর আলী। ঐ সভাতে ইউনিয়নের তৎকালীন সম্পাদক সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন পশ্চাৎপদ মুসলমান সমাজের উন্নতির জন্য আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারের উপর গুরুত্ব আরোপ করে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি সভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ও অনুমোদিত হয়।[১৫৭] ঐ সভায় বিলিকৃত 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' শীর্ষক একটি প্রচারপত্র পরবর্তীকালে কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন কর্তৃক একটি পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত হয়।[১৫৮]

মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব (১৮৯৪)

ক্রীড়াবিষয়ক প্রতিষ্ঠান 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব' ১৮৯৪ সালের ১৯ জানুয়ারি কলিকাতায় স্থাপিত হয়।[১৫৯] দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তি এ ক্লাবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব ও নবাব বেগম ক্লাবের সদস্য ছিলেন। মুর্শিদাবাদের নবাব এবং ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ এককালীন অর্থ সাহায্য দেন। ক্লাবের সভাপতি ছিলেন নবাব সৈয়দ আমীর হোসেন সি. আই. ই. এবং সম্পাদক ছিলেন আবদুল গণি। তিনিই ছিলেন এ ক্লাব প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রশক্তি।

১৫৪. *Ibid.*, 21 January 1899.
১৫৫. *মিহির ও সুধাকর*, ৯ ফালগুন ১৩০৭
১৫৬. *The Moslem Chronicle*, 20 September 1902
১৫৭. মির্জা আবুল ফজল—'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, *নবনূর*, শ্রাবণ ১৩১০
১৫৮. সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন—'*প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি*, কলিকাতা, ১১ নভেম্বর ১৯০৩ ; বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪ ত্রৈ, খ, ১৯০৪
১৫৯. The Moslem Chronicle, 17 January 1895.

১৮৯৫ সালের ৯ জানুয়ারি কলিকাতা মাদ্রাসা হলে এর প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সৈয়দ আমীর আলী সভাপতিত্ব করেন। খান বাহাদুর আবদুস সালাম এমএ 'ফিজিক্যাল এডুকেশন' শীর্ষক একটি ইংরাজি প্রবন্ধ পাঠ করেন।[১৬০] ঐ সময় এনায়েত করিম বিএ ক্লাবকে ১৫০ টাকা মূল্যের একটি 'সিলভার কাপ' দান করেন।[১৬১]

১৮৯৬ সালের মে মাসে ক্লাবের দ্বিতীয় বার্ষিক সভা হয়। এসময় সভার ৩৪ জন অনারেরি ও ৫৬ জন সাধারণ সদস্য ছিলেন। সম্পাদক আবদুল গণির অক্লান্ত উৎসাহ ও তারুণ্যদীপ্ত কর্মদক্ষতার জন্যই মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের এই অগ্রগতি বলে 'মোসলেম ক্রনিকলে' মন্তব্য করা হয়। ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ ৫০ টাকা এবং ব্যারিস্টার এরাদত উল্লাহ ১০ টাকা ক্লাবকে দান করেন।[১৬২] এ বছর আগস্ট মাসে 'দি ক্যালকাটা মান্থলি' শিরোনামে ক্লাবের একটি মুখপত্র প্রকাশিত হয়। ক্লাবের সদস্যবৃন্দের প্রযত্নেই এটি জন্ম লাভ করে। আবদুল গণি স্বয়ং পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এতে সাহিত্য, বিজ্ঞান, সমাজ, খেলাধুলা বিষয়ক লেখা স্থান পায়।[১৬৩]

১৮৯৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব' ও 'ডায়মণ্ড জুবিলী রিডিং রুমে'র যৌথ উদ্যোগে ৬ ওয়ালিউর লেনের বাড়িতে একটি 'ডিবেটিং ক্লাবে'র উদ্বোধনী সভা হয়। সহকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর আবদুল করিম বিএ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। মোহাম্মদ ইয়াসিন বিএ 'পাবলিক স্পিকিং' সম্পর্কে বক্তৃতা দেন। আলিপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল কাদের, জাহেদুর রহিম জাহিদ এমএ, বিএল এবং স্বয়ং সভাপতি সভায় ভাষণ দেন। তাঁরা উক্ত 'বিতর্ক সভা' স্থাপনের পরিকল্পনার প্রশংসা করেন। মোহাম্মদ মদিনউল্লাহ এর সম্পাদক এবং সাদাত আবদুল মাসুদ বিএ সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন।[১৬৪] ঐ সময় হিন্দুগণ পরিচালিত 'ন্যাশনাল স্পোর্টিং ক্লাব' ছিল। 'পলস কাপ' প্রতিযোগিতায় ঐ ক্লাবকে পরপর দুবার পরাজিত করে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব শহরে বেশ নাম করে।[১৬৫] ১৮৯৮ সালে সৈয়দ আহমদের মৃত্যুতে তাঁর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ঐ বছর থেকে 'স্যার সৈয়দ আহমদ লীগ কম্পিটিশন কাপ'-এর প্রচলন করে। এতে প্রতিযোগিতাধর্মী পাশ্চাত্য খেলাগুলিতে ভারতের যে-কোনো দল অংশ গ্রহণ করতে পারত।[১৬৬]

মহামেডান এলগিন স্পোর্টিং ক্লাব (১৮৯৪)

কলিকাতার 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে'র প্রথম বার্ষিক সভায় (৯ জানুয়ারি ১৮৯৫) খান বাহাদুর আবদুস সালাম 'ফিজিক্যাল এডুকেশন' শীর্ষক যে প্রবন্ধটি পাঠ করেন, তাতে এক জায়গায় মন্তব্য করেন, উত্তর প্রদেশের মুসলমানদের সহিত তুলনায় বাঙালি মুসলমানদের

১৬০. ঐ।
১৬১. *The Moslem Chronicle*, 4 January 1896
১৬২. *Ibid.*, 2 May 1896
১৬৩. *Ibid.*, 26 September 1896
১৬৪. *Ibid.*, 21 August 1897
১৬৫. *Ibid.*, 18 September 1897
১৬৬. *Ibid.*, 30 January 1898

দৈহিক শক্তি অপেক্ষাকৃত কম। শারীরিক চর্চার উপযোগিতার উপর গুরুত্ব দিয়ে 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে'র জন্ম হয় (১৮৯৪)। সম্ভবত উক্ত ক্লাব এবং আবদুস সালামের মন্তব্যের কথা স্মরণ করে ঢাকার ছাত্র সমাজ 'মহামেডান এলগিন স্পোর্টিং ক্লাবে'র প্রতিষ্ঠা করে। এক সময় ঢাকা কলেজের ছাত্ররা উৎসাহিত হয়ে 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' স্থাপন করেছিল। উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকা মাদ্রাসা সংশ্লিষ্ট একটি 'স্পোর্টিং ক্লাব' (১৮৯২) পূর্বেই ছিল। বাংলার ছোটলাট চার্লস আলফ্রেড এলিয়ট (১৮৯০-৯৫) ঢাকা পরিদর্শনে এলে ক্লাবের সদস্যরা তাঁর কাছে খেলার মাঠের জন্য লিখিত ভাবে আবেদন জানায়।[১৬৭]

মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন (১৮৯৬)

মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন ১৮৯৬ সালের মে মাসে কলিকাতায় স্থাপিত হয়।[১৬৮] কলিকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট ব্যারিস্টার আবদুর রহিম এবং উকিল মোহাম্মদ ইউসুফের নামাঙ্কিত একটি 'বিলিপত্র' (সারকুলার) 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন' নামে প্রচারিত হয়। তাতে 'এসোসিয়েশনে'র লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে একটি পরিচ্ছন্ন বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছে। বিলিপত্রের প্রথম বাক্যটি ছিল এরূপ : "All educated Muhammadan gentlemen who have applied themselves to the question of the welfare and progress of their community have long felt the use of an organisation whose deliberations and actions will be guided by a sole regard to its true interests unhampered by any other consideration and which by its constitution will be able to faithfully represent the views of the Muhammadans and at the same time command the public in general as well as of the Govt."[১৬৯] এসোসিয়েশন যাতে ব্যক্তিস্বার্থে বা দলীয় স্বার্থে ব্যবহৃত না হয়, এবং সমাজের মানুষের যাতে কর্তৃত্ব থাকে সেজন্য কার্যকরী সংসদের (কাউন্সিল অফ ম্যানেজমেন্ট) সদস্যগণ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন। জাতি-ধর্ম-সম্প্রদায় নির্বিশেষে ভারতের সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণ চিন্তা ও উন্নতি সাধনায় এসোসিয়েশন নিবৃত থাকবে। সরকারের ন্যায়সংগত ও কল্যাণমুখী কাজে সমর্থন ও সহযোগিতা দান করবে,

১৬৭. *The Moslem Chronicle*, 11. July 1895

১৬৮. মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশনের জন্মের ইতিহাস, এক বছর পরে 'মোসলেম ক্রনিকলে' এভাবে লেখা হয়—

".....the Reform Association was formed only that year on account of some differences between some prominent and educated members of the Central National Muhammadan Association and the Secretary Hon'ble Nawab Syed Ameer Hossain who objected to the proposal from a very large and influential section of its members to make the position of the Secretary liable to be vacated and filled by rotation and election and is make some other rules to improve the constitution of the Central National Muhammadan Association." *The Moslem Chronicle*, 26 December, 1897.

১৬৯. *The Moslem Chronicle*, 16 May 1896

তবে সমাজস্বার্থের পরিপন্থী হলে তার সমালোচনা ও বিরোধিতা করবে। কোনো সভা-সমিতির সাথে এসোসিয়েশনের বিরোধ থাকবে না, বরং সমাজের উন্নতিমূলক কাজে কলিকাতা ও বাইরের যেকোনো সভা-সমিতির সাথে সহযোগিতা করে চলবে।[১৭০]

এই 'বিলিপত্রে'র পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৯৬ সালের ১৭ মে খান বাহাদুর নবাব সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ-এর সার্কুলার রোডস্থিত দিলার মঞ্জিলে 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশনে'র উদ্বোধনী সূচক প্রথম সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। নবাব সৈয়দ আসগর আলী এতে সভাপতিত্ব করেন। সভায় গণ্যমান্য ব্যক্তি যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা হলেন, খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইউসুফ, (উকিল হাইকোর্ট), নবাব নাদির জঙ্গ বাহাদুর, ব্যারিস্টার আবদুর রহিম, (এডভোকেট, হাইকোর্ট), আবদুল জোয়াদ বিএল (উকিল,হাইকোর্ট), মোহাম্মদ আবদুল্লাহ (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কলেক্টর,বসিরহাট), ব্যারিস্টার এরাদতুল্লাহ, মোহাম্মদ তাহির বিএল (উকিল, হাইকোর্ট), মোহাম্মদ মোস্তফা খান বিএল (উকিল, হাইকোর্ট), আবদুল হামিদ বিএ (সম্পাদক, মোসলেম ক্রনিকল), আমীরুদ্দীন আহমদ বিএ, খান বাহাদুর সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন (জমিদার, শায়েস্তাবাদ), রফিউদ্দীন আহমদ বিএ, এস. এ. এ. আসগর, মোহাম্মদ ইশফাক বিএল (উকিল, হাইকোর্ট)। এঁদের মধ্যে নবাব সৈয়দ আসগর আলী এসোসিয়েশনের কার্যকরী সংসদের সভাপতি, মোহাম্মদ ইউসুফ সম্পাদক, আবদুর রহিম যুগ্ম-সম্পাদক এবং মোহাম্মদ মোস্তফা খান ও সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন সদস্য ছিলেন।[১৭১] সৈয়দ আসগর আলী সভাপতির দীর্ঘ উদ্বোধনী ভাষণে এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সমূহ ব্যাখ্যা করে শোনান। তিনি বলেন, সমাজের উন্নতিব জন্য যৌথশক্তির প্রয়োজন আছে। বাংলা ও বিহারের মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা করার মত যথার্থ সমিতি নেই। স্বয়ং সরকার ও অমুসলিম জনগণের ধারণা হয়েছে, মুসলমানদের রাজনৈতিক মতামত ব্যক্ত করার প্রতিনিধিমূলক ও আস্থাশীল সমিতির অভাব আছে। ওয়াকফ সম্পত্তি, গো-হত্যা, সরকারি দপ্তরগুলিতে মুসলমান প্রতিনিধি নিয়োগ ইত্যাদি বিষয়ক সমস্যাসমূহ এখনও বিরাজ করছে। 'জাতির ভরসা স্বরূপ' নব্যশিক্ষিত তরুণদের কাজে উৎসাহিত করতে হবে। ব্রিটিশ সরকারের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য থাকবে এবং সরকার বিরোধী কার্যকলাপ থেকে বিরত থাকবে। এসোসিয়েশন সমাজের মানুষের মধ্যে ঐক্য ও সৌহার্দ্যের সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রেখে কাজ করবে।[১৭২]

সম্পাদক মোহাম্মদ ইউসুফ সভাপতির ভাষণের প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করেন। আবদুল রহিমের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সভায় একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বার্মার সরকার বার্মায় গো-হত্যা নিষেধ করে আইন পাশ করেছেন। বার্মার মুসলমানরা ঈদ-উৎসবেও গো-কোরবানি দিতে পারবে না। রেঙ্গুনের মুসলমানগণ যাতে ঈদ-পরবে গো-কোরবানি

১৭০. *Ibid.*.
১৭১. *Ibid.*, 23 may 1896 (Supplementary)
১৭২. Op. cit .

করে তাদের ধর্মীয় আচার যথাবিধি পালন করতে পারে সে বিষয়ে একটি 'স্মারকপত্র' ভারতের বড়লাটকে দেওয়া হবে। ভারতের বড়লাট ঐরূপ আইন রদ করার ব্যাপারে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন—এরূপ অনুরোধ স্মারকপত্রে থাকবে। বার্মার সরকার রেঙ্গুনস্থিত মুসলমানদের প্রথাগত ধর্মীয় আচারপালনে তাদের ন্যায় সংগত অধিকার ক্ষুণ্ন করেছেন এরূপ অভিমত ব্যক্ত করে মোহাম্মদ ইউসুফের প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে সভার দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।[১৭৩]

১৮৯৬ সালের ২৪ মে সমিতির আরও একটি সভা হয়।· শ্রীরামপুরে রিষড়ায় গো–হত্যা নিয়ে যে হাঙ্গামা হয়, সে বিষয়ে আলোচনা হয়। মুসলমানদের আবেদন নাকচ করায় শ্রীরামপুর মহকুমার অফিসারের মনোভাবের বিরোধিতা করে এবং পূর্ণ বিষয়টি তদন্ত করার অনুরোধ জানিয়ে সভায় একটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। হিন্দু–মুসলমান যাতে স্ব স্ব ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান পালন করতে পারে সে বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রীতির ভাব সৃষ্টি করা ও শান্তি বজায় রাখার ব্যাপারে দ্বিতীয় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মসজিদে সশস্ত্র পুলিশ নিয়োগের ফলে মুসলমানরা নামাজ পড়তে পারে নি, এ বিষয়ে দু:খ প্রকাশ করে তৃতীয় প্রস্তাব গৃহীত হয়। চতুর্থ প্রস্তাবে হুগলীর জেলাপ্রশাসক ও বর্ধমান বিভাগের কমিশনারের কাছে একটি 'ডেপুটেশন' পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এতে সদস্য থাকবেন মোহাম্মদ ইউসুফ, আবদুর রহিম, মোহাম্মদ মোস্তফা খান, মোহাম্মদ এরাদতুল্লাহ, মোহাম্মদ ইশফাক, আবদুল হামিদ, সৈয়দ রফিউদ্দীন এবং নবাব সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ। সভার সিদ্ধান্তসমূহ বাংলার ছোটলাটকে জানাবেন এসোসিয়েশনের সম্পাদক। এটি ছিল সভার শেষ প্রস্তাব। ব্যারিস্টার জহিরুদ্দীন এবং মোহাম্মদ হবিবুল্লাহ বিএল (উকিল,.হাইকোর্ট) আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন।[১৭৪]

ওয়াকফ সম্পত্তির মালিকানা নিয়ে প্রচলিত আইনের বিরোধিতা করে আদালত যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার প্রতিবাদ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সিদ্ধান্তসমূহ ভারতের বরলাটকে প্রদানের জন্য ১৮৯৬ সালের আগস্টে 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশনে'র সভা হয়। মুসলমানের আইন ও ধর্ম অক্ষুণ্ন রাখার উপর গুরুত্ব আরোপ করে আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি করে একটি স্মারকপত্র বড়লাটকে দেওয়া হয়।[১৭৫] ওয়াকফ সম্পত্তির প্রশ্নটি শেষ পর্যন্ত প্রিভি কাউন্সিলে যায় এবং লর্ড স্টেনলির ওকালতিতে ইসলাম ধর্ম ও আইনের প্রতি শ্রদ্ধা বলবৎ থাকে। লর্ড স্টেনলিকে অভিনন্দন জানিয়ে একটি প্রস্তাব এসোসিয়েশন গ্রহণ করে আগস্ট মাসে অপর একটি সভায়। এলিয়ট হোস্টেল ও মুসলমান ছাত্রাবাসে ছাত্রদের ভর্তির ব্যাপারে এসোসিয়েশনকে সহযোগিতা করার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষকে অনুরোধ জানিয়ে অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় । সভার সবচেয়ে গুরুত্পূর্ণ সিদ্ধান্তটি ছিল এরূপ :

১৭৩. Ibid..
১৭৪. The Moslem Chronicle, 6 June 1896
১৭৫. *Ibid.*, 1 August 1896

" That a conference be held of the representatives of the Hindu and Muhammadan communities to arrive at an amicable solution of the question of the slaughter of cows during the Bakrid, and that a sub-committee consisting of the President, Secretary and Joint Secretaries, the editor of the Moslem Chronicle and Maulvi Muhammad Mostafa Khan be formed to make the necessary arrangements and to settle the details relating thereto."[১৭৬]

মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারকে[১৭৭] কেন্দ্র করে কলিকাতার প্রধানত আইনজীবীরাই 'মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন' গঠন করেন এবং স্বসমাজের আইন সংক্রান্ত সমস্যাগুলি কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করেন। গো-হত্যা সম্পর্কিত প্রশ্নটিকে তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছেন এজন্য যে, দেশের প্রধান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে এ নিয়ে অসন্তোষ, দ্বন্দ্ব ও দাঙ্গার সৃষ্টি হয়েছে। তাঁরা উভয় সম্প্রদায়ের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি যথাবিহিত সমাধান বের করার চেষ্টা করেছেন। শিক্ষিত ব্যক্তিদের সমন্বয়ে গঠিত এসোসিয়েশনের আলোচনা ছিল যেমন তেমনি সিদ্ধান্তগুলি যুক্তিপূর্ণ, উদারতাসম্পন্ন ও যুগোপযোগী। সেকালের লিটারেরী সোসাইটি ও সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন সামাজিক ও রাজনৈতিক চাহিদা মিটাতে অসমর্থ, এরূপ অসন্তোষ থেকে মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন জন্মলাভ করলেও এটি সমাজে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারে নি। এটি কলিকাতার চৌহদ্দি ছাড়িয়ে অন্যত্র বিস্তার লাভ করে নি।[১৭৮] সমকালীন বাংলা পত্রপত্রিকায় এসোসিয়েশনের কোনো বিবরণ পাওয়া যায় না। বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত এসোসিয়েশন সক্রিয় ছিল বলে ডক্টর সুফিয়া আহমদ উল্লেখ করেছেন।[১৭৯]

আঞ্জুমনে আশ-আতে ইসলাম (১৮৯৬)

১৮৯৬ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখে নোয়াখালীর আমজাদ আলী পেস্কারের বাটীতে 'আঞ্জুমনে আশ-আতে ইসলামে'র প্রথম উদ্বোধনী সভা হয়।[১৮০] তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল কাদের বিএ সভায় সভাপতি ছিলেন। বেতনভোগী ধর্মপ্রচারক দ্বারা ইসলাম ধর্ম প্রচার আঞ্জুমনের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য ঐ সভার প্রথম প্রস্তাব ছিল একটি প্রচার-সমিতি স্থাপন করা। এই প্রচার-সমিতির ধর্মপ্রচারকগণ সমাজের নানাপ্রকার কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষের কাছে ইসলামের উচ্চ আদর্শ ও নৈতিকজ্ঞান প্রচার করে সততা

১৭৬. *Ibid.*, 29 August 1896

১৭৭. নবাব সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ মুর্শিদাবাদের দেওয়ান রেজা খাঁর বংশধর ছিলেন। তিনি ১৮৯৭ সালের ডিসেম্বর মাসে মৃত্যুবরণ করেন। *Ibid.*, 26 December 1897

১৭৮. এসোসিয়েশনের সভাপতি উদ্বোধনী ভাষণে এ সম্বন্ধে স্পষ্টত মন্তব্য করেছিলেন। Op. cit., 23 May 1896 (Supplementary)

১৭৯. *Muslim Community in Bengal*, p. 183

১৮০. আশ-আত অর্থ প্রচার ; আঞ্জুমনে আশ-আতে ইসলাম অর্থ ইসলাম প্রচার সমিতি।

ও উন্নতির পথ দেখাবেন। এমনি কি, যেখানে ইসলামের প্রভাব ক্ষীণ অথবা একেবারেই নেই সেখানে তাঁরা ধর্মপ্রচার করবেন।[১৮১] আঞ্জুমনের দ্বিতীয় অভীষ্ট লক্ষ্য ছিল শিক্ষা বিস্তারে উৎসাহ দান করা : এতোদ্দেশ্যে আঞ্জুমন একটি গ্রন্থাগার স্থাপনের আশা পোষণ করে।

আঞ্জুমনের উদ্বোধনী সভায় একটি কার্যকরী কমিটি গঠন করা হয়। বিভিন্ন দায়িত্বে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম হল এরূপ :

সভাপতি—বজলুর রহিম বিএল
সহ-সভাপতি—মোজাফফর আহমদ
সম্পাদক—আবদুল আজিজ(১)
সহকারী সম্পাদক—আবদুল ওয়াদুদ বিএ
হিসাব-নিরীক্ষক—আশরাফ আলী (১)
কোষাধ্যক্ষ—আশরাফ আলী (২)
সদস্যবৃন্দ—আব্বাস আলী এমএ, আবদুল কাদের বিএ, আবদুল মজিদ বিএল, আবদুল আজিজ বিএ, ওয়াহিদ উদ্দীন আহমদ, আবদুল হালিম ও আবদুল মজিদ।[১৮২]

ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা

'ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা'র সভাপতি ছিলেন খান বাহাদুর সিরাজুল ইসলাম। ১৮৯৬ সালে সরকারের পক্ষ থেকে চট্টগ্রাম বিভাগকে আসাম প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত করার প্রস্তাব উঠলে 'হিতসাধিনী সভা' এর প্রতিবাদ করে। সিরাজুল ইসলাম সভার পক্ষ থেকে বাংলার ছোটলাট ও ভারতের বড়লাটকে স্মারকপত্র প্রেরণ করেন। আসামীদের ভাষা, সাহিত্য ও ঐতিহ্য ভিন্ন; সেখানকার ভূমির রাজস্ব পদ্ধতির সাথে বাংলার ভূমির রাজস্ব পদ্ধতির মিল নেই। এরূপ ক্ষেত্রে আসামের সাথে চট্টগ্রামের সংযুক্তি এতদঞ্চলের অধিবাসীদের পক্ষে অসুবিধাজনক হবে। ঐরূপ বিভাগের সিদ্ধান্ত বাতিল করার জন্য স্মারকপত্রে অনুরোধ হয়।[১৮৩]

১৯১৭ সালেও ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার অস্তিত্ব ছিল। ব্যারিস্টার আবদুর রসুলের মৃত্যুতে (১ আগস্ট ১৯১৭) হিতসাধিনী সভার উদ্যোগে কলিকাতায় একটি শোক-সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি নবাব স্যার শামসুল হোদা এতে

---

১৮১. *The Moslem Chronicle*, 12 December 1896
মোসলেম ক্রনিকলের ১৮৯৭ সালের ৮ মে নোয়াখালীর জনৈক ব্যক্তির (এস.ইউ.এ.) একটি পত্রে অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন, মুসলমানরা কোরানের নির্দেশ ত্যাগ করে জাতীয় চরিত্র হারিয়ে ফেলেছে। সুতরাং কোরানের ধর্মশিক্ষা দ্বারাই তাদের জাগাতে হবে। ধর্ম প্রচারকগণ এ শিক্ষা দিয়ে সমাজকে সহজে জাগাতে পারবেন।

১৮২. *The Moslem Chronicle*, 12 December 1896

১৮৩. *Ibid.*, 11 January 1895

সভাপতিত্ব করেন। তিনি সভাপতির ভাষণে রাজনৈতিক ও অন্যান্য বিষয়ে আবদুর রসুলের সাথে তাঁর মতভেদের কথা স্বীকার করে বলেন, "…..আমি সব সময় তাঁর গুণগ্রাহী ছিলাম আর তাঁর মতামতের মূল্য দিতাম।"[১৮৪]

বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি (১৮৯৯)

১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে'র বার্ষিক সভার অধিবেশন হয়। 'বঙ্গে মাতৃভাষা শিক্ষা' সম্পর্কে একটি লিখিত ইংরাজি ভাষণ পাঠ করেন ময়মনসিংহের ধনবাড়ির জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। ভাষণটির ইংরাজি তরজমা 'ভার্ণাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' শিরোনামে ১৯০০ সালে মুদ্রিত আকারে প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তিকার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে 'দি মহামেডান সোসাইটি ফর ভার্ণাকুলার লিটারেচার' নামক প্রতিষ্ঠানের সভাপতিরূপে উল্লেখ করা হয়েছে। ঐ সঙ্গে তিনি যে 'স্যার সৈয়দ আহমদ মেমোরিয়াল ফাণ্ড কমিটি'র সম্পাদক ছিলেন, সেকথাও উল্লিখিত হয়েছে।[১৮৫] সুতরাং ঐ সময় 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি'র অস্তিত্ব ছিল তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ইসলাম প্রচারকের সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ তাঁর আত্মজীবনীতে ঐরূপ 'সাহিত্য সমিতি'র উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন,. "নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেবের সভাপতিত্বে ও শেখ সাহেবের (শেখ আবদুর রহিম) সম্পাদকতায় কিছু দিন একটি সাহিত্য সমিতির নিয়মিত অধিবেশন হইত।[১৮৬] সাহিত্য সমিতির সম্পাদক হিসাবে শেখ আবদুর রহিমের নাম এখানে পাওয়া যায়। মোহাম্মদ ইদরিস আলী একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, উক্ত সমিতি পরে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'তে (১৯১১) রূপান্তরিত হয়।[১৮৭] ১৩১১ সনের আষাঢ় মাসের 'নবনূরে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে 'বঙ্গীয় সাহিত্য-বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' নামটির উল্লেখ পাওয়া যায়। উল্লেখযোগ্য যে, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর ভাষণটি মূলত 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে' উত্থাপিত একটি প্রস্তাবের ভিত্তিতে রচিত হয়েছিল।[১৮৮] ঐ যুগে হিন্দু লেখকগণকৃত ইতিহাস, কাব্য, উপন্যাসে, নাটক ও অন্যান্য রচনায় কোনো কোনো ঐতিহাসিক চরিত্রকে কলঙ্কিত ও হীনবীর্য করে চিত্রিত করা হচ্ছিল, সেগুলির প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যেই যে 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলাম সমিতি' স্থাপিত হয়েছিল তা সহজেই অনুমিত হয়। পরবর্তীকালে হবীবুল্লাহ বাহার 'সাহিত্য সমিতির ইতিহাস' নামক একটি প্রবন্ধে লিখেছেন, "শান্তিপুরের কবি মরহুম মোজাম্মেল হক

১৮৪. আবুল ফজল (সম্পাদিত)— *সাংবাদিক মজিবর রহমান,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭, পৃ: ১০৭

১৮৫. Syed Nawab Ali Chowdhury--*Vernacular Education in Bengal,* Calcutta, 1900

১৮৬. পূর্বোক্ত, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৭৪

১৮৭. ঐ।

১৮৮. *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,* পৃ: ৩৮৩

সাহেবের একখানি কবিতা পুস্তকে কলিকাতাস্থ 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সভা'র উল্লেখ দেখিতে পাই। ১৩০৬ সালে এই সভা স্থাপিত হয়। এর প্রথম সভাপতি নবাব আলী চৌধুরী সাহেব। ১৩১১ সালের ১৯শে বৈশাখ কলিকাতা কাপালিটোলার নবাব বাটীর বিরাট দালান গৃহের বিশেষ অধিবেশনের যে রিপোর্ট মরহুম মোজাম্মেল হক সাহেব দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, এই অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন নবাব সৈয়দ আমীর আলী সি. আই. ই. সাহেব। সভায় মাননীয় নবাব স্যার সৈয়দ শামসুল হুদা, নবাব বদরুদ্দীন হায়দার, ব্যারিস্টার এম. হোসেন, মওলবী আবদুল হামিদ বিএ, মওলবী আবুল কাসেম বিএ (বর্ধমান) প্রভৃতি বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন।"[১৮৯] তিনি ডাক্তার আবদুল গফুর সিদ্দিকীর মতের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গে আরও বলেন, "যে সভায় এই সমিতির প্রতিষ্ঠা হয় সেই সভা বসিয়াছিল আন্তনি বাগানস্থিত (বর্তমান বলিয়া লজ) মওলবী আবদুর রহমান খাঁ সাহেবের বাড়ীতে। তাঁহার যতদূর মনে পড়ে মুনশী শেখ আবদুর রহিম, মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহম্মদ, কবি দাদ আলী, মুনশী রওশান আলী চৌধুরী, কবি মোজাম্মেল হক কাব্যকণ্ঠ, মওলবী মোহাম্মদ আকরাম খাঁ, মুনশী আবুল হোসেন, মওলবী আবদুর রহমান খাঁ, মওলবী মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলবী মুজিবর রহমান, সুফী আমীন উদ্দীন, মুনশী আসাদ আলী, মওলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, মওলবী ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মুনশী জমিরুদ্দীন বিদ্যাবিনোদ, মুনশী মেহেরুল্লা, মুনশী শেখ রেয়াজউদ্দীন, মওলবী আবদুল কুদ্দুস রুমী প্রভৃতি শতাধিক মুসলিম সাহিত্যিক সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় মুনশী শেখ আবদুর রহিম সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।"[১৯০] হবীবুল্লাহ বাহার মোজাম্মেল হকের যে 'কবিতা পুস্তকে'র কথা বলেছেন, সেটির নাম হল 'জাতীয় ফোয়ারা (১৩১৯)। এই সংকলনের 'উদ্দীপনা' কবিতাটি 'সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি'র সভা উপলক্ষে রচিত হয়। 'উদ্দীপনা সম্পর্কে কবি প্রদত্ত টীকায় লেখা হয়, "কলিকাতাস্থ বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতির প্রথম বর্ষের (১৩০৬ সালের) বিশেষ কোনো অধিবেশনে পাঠের জন্য সমিতির সুযোগ্য শ্রদ্ধাস্পদ সভাপতি অকৃত্রিম সমাজহিতৈষী মাননীয় নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সাহেবের আদেশে লিখিত হয়।"[১৯১] এই উক্তি থেকে এবং

১৮৯. *হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী*, পৃ: ৪৮৯

১৯০. ঐ, পৃ: ৪৯০ (পাদটীকা)।

১৯১. সমিতিব কর্মীদের উদ্দেশ্য কবে কবি বলেছেন,
দিবা নিশি এঁরা প্রিয় স্বজাতির,
পরিণাম ভেবে হইয়া অধীর,
নীরব নিশ্বাসি ফেলে নেত্রনীব,
কাতর হৃদয়ে ব্যাকুল মনে।
কিসে তিরোহিত হবে দুরগতি,
সাধন করিতে কিসে সমুন্নতি,
তাহার চিন্তনে নাহিক বিরতি
দেখনা নিরত যতেক জনে।

হবীবুল্লাহ বাহারের বিবরণ থেকে স্পষ্টতঃই বলা যায় যে, সমিতির প্রতিষ্ঠার সময় ১৩০৬ বঙ্গাব্দ বা ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ। অনেকে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'কে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি বিষয়ক প্রথম মুসলিম প্রতিষ্ঠান বলে উল্লেখ করেন, কিন্তু ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রায় এক যুগ পূর্বে একই বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, তা তাঁরা লক্ষ্য করেন নি। তবে একথা সত্য যে, বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতির মত বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি সুগঠিত ছিল না। সাহিত্য সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান সমিতি সুগঠিত ছিল না। সাহিত্য সমিতির মুখপত্র 'বঙ্গীয় মুসলমান-সাহিত্য-পত্রিকা' (ত্রৈমাসিক ১৯১৮) প্রকাশিত হয়। ১৯১৭-১৮ সালের কার্যনির্বাহক কমিটির যাঁরা সদস্য ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই প্রথমোক্ত সমিতির সহিত যুক্ত ছিলেন।[১৯২] মহামেডান লিটারেরী সোসাইটিতে বাংলা ভাষার চর্চা হত না। উনিশ শতকে নয় দশকের গোড়া থেকেই বাংলা ভাষার চর্চা হত না। উনিশ শতকের নয় দশকের গোড়া থেকেই বাংলা ভাষার প্রতি বাঙালি মুসলমানের মনোভাব পরিবর্তিত হয়। বাংলার মুসলমান সাহিত্যকগণ খুব সম্ভব সোসাইটির কার্যের প্রতিক্রিয়া থেকে আত্মিক প্রেরণাবশেই 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' স্থাপন করেন।

সুবার্বন মহামেডান এসোসিয়েশন (১৮৯৯)

কলিকাতার খিদিরপুরের এই প্রতিষ্ঠানটির পূর্বনাম ছিল 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' ; ১৮৯৭ সালে সেটি স্থাপিত হয়। তখন এর রক্ষণশীল, ইসলামপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি ছিল। যুগের প্রয়োজনে এটির সংস্কার সাধন প্রয়োজন হয় এবং উদ্যোক্তরা উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এর পুনর্গঠন করে নামকরণ করেন 'সুবার্বন মহামেডান এসোসিয়েশন'। প্রিন্স কাদের মির্জা মোহাম্মদ আবেদ আলী, প্রিন্স মির্জা মোহাম্মদ জালাল, আবদুল হামিদ বিএ, আবদুল কাদের (আলিপুরের ভূতপূর্ব পুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট), আব্বাস আলী প্রমুখ এর সাথে প্রথম থেকে জড়িত ছিলেন।

১৯০০ সালের ৪ নভেম্বর খিদিরপুরের আলবার্ট হাউসে এসোসিয়েশনের প্রথম বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুর রহিম (ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট)। সভায় প্রিন্স মির্জা দেলওয়ার জঙ্গ বাহাদুর, মির্জা সুজাত আলী বেগ, শেখ মোহাম্মদ আলী বেগ, শেখ মোহাম্মদ আলী, আবদুল হামিদ (মোসলেম ক্রনিকল সম্পদাক), এস. বি. মিত্র বিএসসি, এমবি (লণ্ডন), বিজয়কৃষ্ণ বসু বিএল, দাউদর রহমান এল. এম. এস. এমবি, আমিরুদ্দীন আহমদ বিএ, আবদুল লতিফ (ডাক্তার), মুসা খান (ডাক্তার), আবদুর রহমান (ডাক্তার) নূর মোহাম্মদ ইসমাইল, মীর সৈয়দ

মোজাম্মেল হক—*জাতীয় ফোয়ারা*, কলিকাতা, ১৯১৩ পৃ: ৬ (পাদটীকা)

১৯২. *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ: ২০৬-০৯

আলী, সৈয়দ ওসমান আলী প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। সভায় অতীত ইতিহাসসহ বার্ষিক রিপোর্ট পাঠ করে শোনান হয়। ঐ রিপোর্টে এসোসিয়েশনের উদ্যোক্তাদের চিন্তাধারা ও কর্মপ্রয়াসের উপর মন্তব্য করে বলা হয় : "The prompters deeply conscious of the failures of pubilc bodies like these in the legitimate discharge of duties, have been ever anxious and solicitous to maintain consistantly with the spirit of progress in the community and the requisite safeguards againt a too free door for democratic fads, a representative character...though primarily to protect the interest of the Moslem community, its aims and objects are none the less catholic, and it will be always ready to co-operate in all movements for the general public weal."[১৯৩] এরূপ আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে বন্যাপীড়িত দুর্গতদের এবং সাধারণ গরীবদের চিকিৎসার জন্য কমদান বাগান লেনে যে অস্থায়ী দাতব্য চিকিৎসালয় ঐ সময় স্থাপিত হয়েছিল সেটিকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার অভিমত ব্যক্ত করা হয় এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয়। প্রস্তাবটি ড. মিত্র উত্থাপন করেন, সৈয়দ ওসমান আলী সমর্থন করেন। মুসলমান গোরস্থানের অবস্থার উন্নতির জন্য আর একটি কমিটি গঠনের প্রস্তাব করা হয় এবং তা গঠিত হয়।[১৯৪]

আঞ্জমনে নূরল ইসলাম (১৮৯৯)

আঞ্জমনে নূরল ইসলাম যশোহরের মনোহরপুর গ্রামের একটি শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান। মহাতাবউদ্দীন (ডাক্তার) এর প্রতিষ্ঠাতা। উক্ত আঞ্জমনের প্রথম নাম ছিল 'শুভকরী' ; পরে 'প্রভাকর' এবং শেষে 'আঞ্জমনে নূরল ইসলাম' নামটি নির্দিষ্ট হয়। 'মিহির ও সুধাকরে' এক প্রতিবেদনে এ সম্পর্কে লেখা হয়, "বর্তমান ১৩০৯ সালের ২৪ শে শ্রাবণ শনিবার তারিখে ইহার আর এক অধিবেশন হয়। তাহাতে আমাদের পরম ভক্তিভাজন মোসলেমকুল শিরোরত্ন যশোহরের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ সৈয়দ নূরল হোদা সাহেবের যশোহর অবস্থানের স্মরণচিহ্নের জন্য উক্ত 'প্রভাকর' সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া 'নূরল ইসলাম রাখা হয়।"[১৯৫] ঐ প্রতিবেদনের শুরুতে আছে, "প্রায় তিন বছর গত হইল যশোহর মনোহরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহাতাবউদ্দীন সাহেবের প্রযত্নে 'শুভকরী' নামে এক সমিতির সৃষ্টি হয়।"[১৯৬] এ থেকে আঞ্জমনের প্রতিষ্ঠার কাল দাঁড়ায় ১৩০৬ বঙ্গাব্দ বা ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

১৯৩. *The Moslem Chronicle*, 10 November 1900
১৯৪. *Ibid.*,
১৯৫. *মিহির ও সুধাকর*, ৫ আগ্রহায়ণ ১৩০৯
১৯৬. ঐ। 'মাদ্রাসায়ে কারামতীয়া বিবরণী সম্বলিত সাময়িকপত্র' 'নূরল ইসলামে' সম্পাদক 'মুনসী মেহেরুল্লাহ অনুরূপ বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর ভাষায়...."এই উদারচেতা, স্বধর্মরত, সর্বজনপ্রিয়, সূক্ষ্মদর্শী ও সুবিচারক জজ বাহাদুর (সৈয়দ নূরল হোদা) যশোহরে থাকাকালীন মাদ্রাসার দরিদ্র

'আঞ্জুমনে নূরল ইসলামে'র প্রথম উল্লেখযোগ্য কাজ মনোহরপুরে একটি নিম্ন প্রাথমিক স্কুল' প্রতিষ্ঠা করা। অতি অল্পকালের ব্যবধানে ঐ স্কুলটিকে 'প্রভাকর' নাম দিয়ে 'মধ্য ইংরাজী স্কুলে' পরিণত করে ; এবং তৎসঙ্গে 'মাদ্রাসা আলিয়ার ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবি ও পারসি ক্লাশ' খোলার ব্যবস্থা করে। ৯ই মাঘ ১৩০৭ সনে আঞ্জুমনের প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয়। সভ্যগণের সর্বসম্মতিক্রমে জৌনপুরের মওলানা কেরামত আলীর নামানুসারে স্কুলের নাম রাখা হয় 'মাদ্রাসা কারামতিয়া'।[১৯৭] বিখ্যাত বাগ্মী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা মাদ্রাসার 'সেক্রেটারী' নির্বাচিত হন। ১৩০৮ সনের কার্তিক মাসে এর দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। খোন্দকার তোফেল উদ্দীন (উকিল) সভাপতির আসন গ্রহণ করেন, মৌলবী আবদুল করিম, মুনশী কাসেম আলী ও গণ্যমান্য অনেক হিন্দু-মুসলমান এ অধিবেশনে যোগদান করেন। উপযুক্ত স্থানে মাদ্রাসার নতুন গৃহ নির্মাণ ও শিক্ষার উন্নতি সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মুনশী মেহেরুল্লা শিক্ষাভাবে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অবনতি তৎসঙ্গে শিক্ষার উপকারিতা বিষয়ে একটি উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দেন। সমিতির ও মাদ্রাসার একজন উদ্যোগী সদস্য জাঁহা বখশ দেড় বিঘা জমি মাদ্রাসার গৃহনির্মাণের জন্য দান করেন।[১৯৮]

১৩০৯ সনের আশ্বিন মাসে আঞ্জুমনের অপর একটি অধিবেশনে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা ও প্রস্তাব নেওয়া হয়। 'মিহির ও সুধাকরে'র প্রতিবেদনের ভাষায় সেটি এরূপ : "যশোহরে গভর্নমেন্ট সার্কুলার অনুসারে পাঁচ জন স্কুল সব-ইনস্পেক্টরের মধ্যে ৩ জন মুসলমান ও ২ জন মাত্র হিন্দু হইয়াছেন। ইতিমধ্যে ইহার আর একটা পদ খালি হয়। কিন্তু স্থানীয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও স্কুলের ডেপুটি ইনস্পেক্টরের ষড়যন্ত্রে ঐ পদে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের জনৈক এন্ট্রাস ফেল কেরানী নিযুক্ত হন। সুতরাং হিন্দু ভ্রাতাদের ঐ কর্মের প্রতিবাদ এবং তাহার প্রতিকার জন্য সদাশয় কশিনের দৃষ্টিগোচর করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়া ঐ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার বাহাদুর ও ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট পৃথক পৃথক দরখাস্ত পাঠান যাউক।"[১৯৯] এ অধিবেশনের

সেক্রেটারীকে (মেহেরুল্লাহকে) সুমধুর ভাষায় 'ইসলাম মিশন স্থাপন' ও মাদ্রাসায়ে কারামতীয়ার উন্নতি বিধান করিতে উৎসাহ প্রদান পূর্বক স্বয়ং সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন।....তাঁহার যশোহরে আগমনের স্মরণচিহ্ন স্বরূপ 'নূরল হোদা'র নামের সংস্পৃষ্টে আমরা 'নূরোল ইসলাম সমিতি', 'নূরোল ইসলাম মিশন', ও 'নূরোল ইসলাম পত্রিকা'র সূত্রপাত করিলাম।" নূরল ইসলাম, ২ বর্ষ, ১৩০৮, যশোহর পৃ.৮

১৯৭. প্রাগুক্ত, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

১৯৮. প্রাগুক্ত, ৬ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

১৯৯. *মিহির ও সুধাকর*, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯
প্রতিবেদনে পরে বলা হয়েছে যে, প্রস্তাবটি শীঘ্রই পাঠানো হয়, বিভাগীয় কমিশনার ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের নিকট এর জন্য কৈফিয়ত তলব করেন। উল্লেখযোগ্য যে ১৮৯৪ সালের ২৫ জুন

অন্যান্য সিদ্ধান্ত ছিল (১) মাদ্রাসা চিরস্থায়ী করার উপায় নির্ধারণ, (২) পার্শ্ববর্তী গ্রামসমূহের রাস্তাঘাটের উন্নয়ন সাধন, এবং (৩) নিকটবর্তী নদী, খাল পারাপারের জন্য সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা গ্রহণ।[২০০] লক্ষণীয় যে, 'আঞ্জমনে নূরল ইসলাম' শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান হলেও স্বসমাজের স্বার্থের দিকে এর সজাগ দৃষ্টি ছিল। এবং সেজন্য আঞ্জমন একটা সাম্প্রদায়িক প্রশ্নও উত্থাপন করেছে। সামাজিক অবিচার এবং সরকারি আইনকে যুক্তি হিসাবে খাড়া করা হয়েছে। আঞ্জমনের সভ্যগণের এরূপ প্রকাশ্য দাবীতে সামাজিক রাজনৈতিক সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়।

মোসলমান শিক্ষা সভা (১৮৯৯)

শিক্ষামূলক এই প্রতিষ্ঠানটি ১৮৯৯ সালে চট্টগ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ইসলাম প্রচারকে' ঐ সভার বর্তমান অগ্রগতি এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা জানিয়ে একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়। এতে সভার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয় : "এই জেলাতে (চট্টগ্রামে) মোসলমানদিগের বিদ্যাশিক্ষার উৎসাহ প্রদানার্থে মোসলমান শিক্ষা সভা স্থাপিত হইয়াছে।"[২০১] মোসলমান শিক্ষাসভা প্রতিষ্ঠার পর তিনটি কাজে সফল হয়েছে। ঐ পত্রের ভাষায় এগুলি হল :

(১) মোসলমান ছাত্রদিগের জন্য একটি ছাত্র নিবাস স্থাপন। স্বর্গীয়া শ্রীশ্রীমতি ভারতেশ্বরীর প্রতি সম্মানচিহ্ন স্বরূপ এই ছাত্র নিবাসের নাম 'চট্টগ্রাম ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোষ্টেল' রাখা হইয়াছে।

(২) একটি পাঠাগার স্থাপন। এই সভার ভূতপূর্ব সভাপতি লী সাহেব বাহাদুরের প্রতি কৃতজ্ঞতাচিহ্ন স্বরূপ এই পাঠাগারের নাম 'লী ইসলামিয়া রিডিং রুম' রাখা হইয়াছে।

(৩) স্থানীয় জমিদার চৌধুরী সোলতান আহমদ খাঁ মরহুম হোষ্টেল ইত্যাদি নির্মাণের জন্য শহরের মধ্যভাগে সুপরিচিত জুমা মসজিদের পার্শ্বস্থ ২,০০০ টাকার অধিক মূল্যের সুন্দর স্বাস্থ্যজনক অনতি উচ্চ পাহাড়টি বিন্যা মূল্যে সভাকে দান করিয়া গিয়াছেন। স্থানীয় চাঁদার দ্বারা প্রায় ৫,০০০ টাকা সংগৃহীত হইয়াছে।[২০২]

তা ছাড়া, শিক্ষা সভার বিভিন্ন খাতে আয়-ব্যয়ের খতিয়ান আছে ; সরকারের অনুদানের উল্লেখ আছে। সভার গৃহীত পরিকল্পনার বাস্তবায়নের জন্য আরও অর্থের প্রয়োজন--

তারিখের ৮০ ধারা মোতাবেক বাংলার 'জনশিক্ষা পর্ষদে'র বিজ্ঞপ্তিতে হিন্দু-মুসলমান সংখ্যানুপাতে শিক্ষা বিভাগে এ শ্রেণী কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা হয়।

The Moslem Chronicle, 11 July 1896

২০০. *মিহির ও সুধাকর*, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

২০১. *ইসলাম-প্রচারক*, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১০

২০২. ঐ

এজন্য জনগণের কাছে আবেদন জানান হয়েছে। "উপযুক্ত পরিমাণ টাকা সংগ্রহ হইলে, সভা উপযুক্ত গরীব মোসলমান ছাত্রদিগকে মাসিক বৃত্তি এবং সাহায্য প্রদান করিয়া, তাহাদের বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে সাহায্য এবং হাদিস তফসির শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি মাদ্রাসা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন। মাদ্রাসা, পুস্তিকালয় এবং অফিস গৃহের জন্য আরও ১০,০০০ টাকার আবশ্যক হইবে। ... মোসলমান ছাত্রেরই সম্মিলিত চেষ্টা এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের অবস্থাপন্ন এবং সহৃদয় মহোদয়গণের সহানুভূতি ও সাহায্যের উপর এই কার্যের সফলতা নির্ভর করে।"[২০৩] আবেদনপত্রটি প্রেরণ করেছেন সভার সম্পাদক আবদুল আজিজ বিএ। সভার সভাপতি হিসাবে চট্টগ্রাম বিভাগের কমিশনার সি. জে. এস. ফগুারের নাম এতে আছে। লী সাহেব ছিলেন ভূতপূর্ব সভাপতি। সরকারের সাথে যোগসূত্র রেখে শিক্ষা বিস্তার ও সমাজ উন্নয়নের নীতি পূর্বের সভাসমিতির মত মোসলমান শিক্ষাসভাও অনুসরণ করেছে। উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল আজিজের এই প্রয়াস মুসলমান সমাজের সেযুগের অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস নির্মাণের আন্দোলনকেই সূচিত করে। আবদুল আজিজ ছিলেন সভার প্রধান প্রাণশক্তি। তিনি ঐ সময় চট্টগ্রামের জজকোর্টের 'মোতজ্জম' (মুতজ্জিম, অর্থ অনুবাদক) ছিলেন।

মহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব (১৮১৯)

ঢাকার নবাব আহসানউল্লাহ এই ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ক্লাবের সভাপতি ছিলেন নবাব পরিবাবের খাজা মাহমুদ ইউসুফ, সম্পাদক আবদুর রহমান মাহমুদ। ক্লাবকে মুসলমান সমাজের দৈহিক, নৈতিক ও বিদ্যাশিক্ষার কেন্দ্ররূপে গড়ে তোলার অভিপ্রায় উদ্যোক্তাদের ছিল। 'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত একটি পত্রে সম্পাদক আবদুর রহমান মাহমুদ বলেছেন যে, খেলাধূলাই ক্লাবের একমাত্র লক্ষ্য নয়,জ্ঞানচর্চার জন্য পাঠকক্ষ স্থাপনের উচ্চ লক্ষ্যও ক্লাবের আছে। কলিকাতার 'মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব' থেকে প্ররণা লাভ করে তারই আদর্শে ঢাকার 'মহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাবে'র পরিকল্পনা ও প্রতিষ্ঠা. তা ঐ পত্রে ব্যক্ত হয়েছে।[২০৪]

কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা

"মি. আবদুর রহিম সাহেব কলিকাতার উত্তর বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেট পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য একটা সভা স্থাপন করিয়াছেন। কয়েকজন উচ্চশিক্ষিত মহোদয় উক্ত সভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য, মুসলমান ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করিতে পারে, তাহার উপায় অবলম্বন করা।"[২০৫] 'কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা' শিরোনামে 'মিহির ও সুধাকরে'র একটি

২০৩. ঐ
২০৪. *The Moslem Chronicle*, 12 August 1899
২০৫. *মিহির ও সুধারকর*, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯

নিবন্ধে সভা সম্পর্কে উক্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ব্যারিস্টার আবদুর রহিম ১৯০০–১৯০৩ সালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। আষাঢ় ১৩০৯ বঙ্গাব্দ অনুযায়ী জুলাই ১৯০২ খ্রীস্টাব্দ হয়। সুতরাং ঐ সভাটি ১৯০০–১৯০২ এর মধ্যে স্থাপিত হয়েছিল।

১৩০৯ সনের আষাঢ় মাসে আবদুর রহিমের গৃহে ঐ শিক্ষা সভার একটি অধিবেশন হয়। অধিবেশনের সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আমীর আলী। প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কলিকাতার মাদ্রাসার অধ্যক্ষ ডক্টর এডওয়ার্ড ডেনিসন রস (১৯০১–১১)। এছাড়া, খান বাহাদুর দেলওয়ার হোসেন, শামসুল হোদা প্রমুখও উপস্থিত ছিলেন। কলিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে একটি 'আদর্শ মক্তব স্থাপন' সভার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শিক্ষাসভা ঐ মক্তবকে মাসিক পঞ্চাশ টাকা সাহায্য দেবে, তা স্থির হয়। ঐ উদ্দেশ্যে উপস্থিত ব্যক্তিগণের নিকট থেকে চাঁদাও সংগৃহীত হয়। অতঃপর মক্তবের শিক্ষাপদ্ধতি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। 'মিহির ও সুধাকর' লিখেছে, "মাননীয় আমীর আলী ... যাহাতে মক্তবে ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পার্থিব অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার অনুকূলে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন, সর্বসম্মতিক্রমে জজ সাহেবের প্রস্তাব গৃহীত হইল। তৎপরে মি. রস সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে, মক্তবে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে, কেননা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিলে মুসলমানের জাতীয়তা অর্ধেক বিনষ্ট হইবে এবং বাঙ্গালা ভাষা মুসলমানদিগকে হীনবীর্য করিয়া ফেলিবে। রস সাহেবের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।"[২০৬] পরের সিদ্ধান্ত ছিল, মক্তবে প্রতিমাসে একটি করে বক্তৃতা হবে ; প্রথম মাসে 'ইসলামনীতি' সম্পর্কে বক্তৃতা করবেন রস সাহেব, দ্বিতীয় মাসে দেলওয়ার হোসেন আহমদ, তৃতীয় মাসে শামসুল হোদা।

রস সাহেব বাংলা ভাষা বিরোধী মন্তব্য করায় এবং ঐরূপ মন্তব্যযুক্ত প্রস্তাব সভায় 'সর্বসম্মতিক্রমে' গৃহীত হওয়ায় তাঁদের মনোভাবের জন্য ঐ নিবন্ধে ঘোর আপত্তি করা হয়। "আবদুর রহিম সাহেব বাঙ্গালা দেশের মুসলমান ; তিনি এখন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ও উচ্চপদে সমাসীন হইয়া তাঁহার বঙ্গদেশীয় ভ্রাতাগণকে ভুলিয়া কতিপয় হিন্দুস্থানী ভ্রাতার শিক্ষার উন্নতিকল্পে যত্নবান হইয়াছেন। আর আমাদের বঙ্গীয় গবর্ণমেন্টের নিকট উহার উন্নতিকল্পে সাহায্য ও সহানুভূতির প্রার্থী হইয়াছেন। ... কলিকাতাস্থ কথিত জননেতাগণ বঙ্গীয় মুসলমানদের পক্ষ হইতে যে-সকল কার্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাঁহাদের স্বার্থ বিজড়িত তাহাতে বঙ্গীয় মুসলমানগণের উপকারের আশা কিছুমাত্রই নাই।"[২০৭] বাঙালি মুসলমান ও অবাঙালি মুসলমানের মধ্যেকার স্বাতন্ত্র্য চেতনাটি এখানে লক্ষণীয়। একশ্রেণীর শিক্ষিত বাঙালি মুসলমানের মধ্যে কারও উর্দুর প্রতি মোহ থাকলেও বাংলার প্রতি অনুরাগী লোকেরও আবির্ভাব হয়েছে। বাংলা ভাষা ও বাঙালির স্বার্থ সম্পর্কে তাঁরা কেবল অভিমানই পোষণ করেন না, তৎসঙ্গে তাঁরা আপোষহীন মনোভাবও

২০৬. মিহির ও সুধাকর, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯
২০৭. ঐ

পোষণ করেন। উল্লেখযোগ্য যে, ভাষাপ্রীতির মধ্য দিয়েই বাঙালী মুসলমানের প্রথম জাতীয়তাবোধের উন্মেষ হয়।

মোসলেম ইনস্টিটিউট (১৯০২)

১৯২২-২৩ সালের মোসলেম ইনস্টিটিউটের বার্ষিক রিপোর্টে ইনস্টিটিউটের উৎপত্তি ও গঠন সম্পর্কে বলা হয় : "The Moslem Institute owes its origin to the intellectual activities of the young members of the Moslem communtiy. As early as the year 1900 the two associations were formed in the immediate vicinity of the Calcutta Madrassah as cultural and educational centres of Moslem students in the various colleges in Calcutta. The two parent institutions were the Moslem Debating Society and the Society for Mutual Improvement of Youngmen Literary and Social work. In the growing interest of its enthusiastic founders in the literary and social work which these institutions, were doing. Mr. H. A. Stark, the then Headmaster of the Calcutta Madrassah saw the possibility of a great institution, which could in time expand into an important centre of intellectual culture, social intercourse and healthy recreations if given right guidance and generous patronage, and consequently he brought about a fusion of both the organisations in 1902."[২০৮]

১৯০০ সালের গোড়ার দিকে গঠিত দুটি প্রতিষ্ঠান—'মোসলেম ডিবেটিং সোসাইটি' এবং 'সোসাইটি ফর মিচুয়াল ইমপ্রুভমেন্ট অব ইয়ংমেন লিটারেরী এণ্ড সোস্যাল ওয়ার্ক'কে কলিকাতা মাদ্রাসার তদানীন্তন প্রধান শিক্ষক এইচ. এ. স্টার্ক ১৯০২ সালে একত্র করে বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা, সামাজিক মেলামেশা ও চিত্তবিনোদনের কেন্দ্র হিসাবে মোসলেম ইনস্টিটিউটের গোড়াপত্তন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত হওয়ার পরপরই মুসলমান সমাজের অভিনন্দন এবং সরকারের স্বীকৃতি ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। মি. স্টার্ক এর প্রথম সভাপতি হন ; ডক্টর ই. ডেনিসন রস প্রথম কোষাধ্যক্ষ এবং শামসুল উলেমা কামাল উদ্দীন আহমদ প্রথম অনারেরী সম্পাদক হন। উদ্যোক্তাগণের মধ্যে ছিলেন এ. এফ. এম. আবদুল আলী, খান বাহাদুর মোহাম্মদ হাশিম, খান বাহাদুর আবদুল মুকতাদির, এম. এম. ওয়াহাব, এ. এম. রশিদ প্রমুখ।[২০৯] এঁদের মধ্যে আবদুল আলী ও ওয়াহাব ছিলেন আবদুল লতিফের পুত্র। ওয়াহাব পরবর্তী দুবছর সম্পাদক হন। ১৯০০-০৬ সালে সম্পাদক ছিলেন আজিজুল হক চৌধুরী। মোসলেম ইনস্টিটিউটের একটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্যচর্চা। এই উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে ইনস্টিটিউটের ইংরাজি মুখপত্র 'জর্নাল অব দি মোসলেম ইনস্টিটিউট' প্রথম প্রকাশিত হয়। এ. এফ. এম. আবদুল আলী পত্রিকার

২০৮. *Report of the Moslem Institute*, Calcutta, 1922-23, p. 17

২০৯. *Report of the Moslem institute*, p. 17

সম্পাদক ছিলেন। এটি চতুর্মাসিক পত্র ছিল। নব্যশিক্ষিত তরুণরা এতে সাহিত্য, সমাজ, শিক্ষা, দর্শন, ইতিহাস ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে মননশীল প্রবন্ধ লিখতেন। আবদুল আলী, হাসান শহিদ সোহরাওয়ার্দী, মোহাম্মদ হেদায়েত হোসেন, সৈয়দ আবদুল লতিফ, মৌলবী আবদুল লতিফ, এম. আবদুল হালিম, সৈয়দ আওলাদ হোসেন প্রমুখ জর্নালের প্রথম দিকের লেখক ছিলেন। পত্রিকাটি পরবর্তীকালে 'মুসলিম রিভিউ' (১৯২৬) নামে প্রকাশিত হয়।

সাহিত্যচর্চা ছাড়া অন্য সাংস্কৃতিক কার্যকলাপের মধ্যে ছিল সাপ্তাহিক বিতর্ক, বক্তৃতা, সামাজিক মিলনসভা, বিশেষ অনুষ্ঠান ইত্যাদি। শরীর-চর্চার জন্য আন্তঃখেলাধূলারও ব্যবস্থা ছিল। কলিকাতার মোসলেম ইনস্টিটিউট এখনও টিকে আছে। ১৯৩১ সালে তালতলাস্থিত ইনস্টিটিউটের বর্তমান গৃহের ভিত্তি স্থাপন করেন তদানীন্তন গবর্নর।

বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি (১৯০৩)

প্রচার ও জনপ্রিয়তার দিক থেকে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' ও 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র পরেই 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র স্থান। 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র উদ্যোগে এটি জন্ম লাভ করে। শিক্ষাবিষয়ক একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্স' (১৮৮৬) নামক সর্বভারতীয় সভানুষ্ঠান। সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮) এর উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৮৯৯ সালে প্রথমবারের মত কলিকাতায় মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে'র অধিবেশন হয়। সৈয়দ আমীর আলী ও কলিকাতার শিক্ষিত ব্যক্তিগণের আগ্রহ, পরিশ্রম ও ঐকান্তিকতায় এটি সম্পূর্ণ সফলতা লাভ করে এবং যথাবিধি প্রচারের মাধ্যমে সারাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করে। সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ শিক্ষানুরাগী এখান থেকে প্রেরণা লাভ করে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' নামক সংগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।[২১০] 'মহামেডান এডুকেশন কনফারেন্সে'র অনুরূপ এক এক বছরে প্রদেশের এক এক স্থানে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়।

'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র যে সভায় (১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯০৩) সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন এ-সমিতি স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, সে সভায় সমিতির উদ্দেশ্য ও কার্যাবলীর দীর্ঘ বিবরণ দিয়ে ইংরাজি ও বাংলা উভয় ভাষায় একটি 'প্রচারপত্র' বিতরণ করেন। সেটি দেশের গণ্যমান্য ব্যক্তির নিকটও প্রেরণ করা হয়। ঐ প্রচারপত্রে শেষের দিকে সমিতির 'তত্ত্বাবধায়ক কমিটি'র সদস্যবৃন্দের নাম দেওয়া হয়েছে ; তাঁরা হলেন :

সভাপতি—মির্জা সুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর

সহ-সভাপতি—দেলওয়ার হোসেন আহমদ, খান বাহাদুর, সৈয়দ শামসুল হোদা এমএ, বিএল (উকিল, হাইকোর্ট)। জোয়াদর রহিম জাহিদ এমএ, বিএল (উকিল, হাইকোর্ট)।

২১০. *ইসলাম-প্রচারক*, আশ্বিন-কার্তিক, ১৩১০

সম্পাদক—সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন বিএ, বিএল (উকিল, জজকোর্ট)।

সদস্য—আবদুল হামিদ, বিএ (সম্পাদক, মোসলেম ক্রনিকল) ও আবদুর রহমান।[২১১]

প্রচারপত্রে বাংলার মুসলমান সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের দুর্গতি ও ভগ্ন মনোভাবের বর্ণনা দিয়ে কি উপায়ে সেগুলি দূর করা যায় তার উপায় স্বরূপ শিক্ষা সমিতি গঠনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় বলে ওয়াহেদ হোসেন উল্লেখ করেছেন। সমাজের আশু ও প্রাথমিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে এবং এগুলি কার্যকরী করার ক্ষমতার বিচারে ঐ সমিতির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলিকে 'প্রত্যক্ষ' ও 'পরোক্ষ' নাম দিয়ে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষ উদ্দেশ্য

(১) মুসলমান সমাজের শোচনীয় অবস্থার কথা আঞ্চলিক ভাষায় তুলে ধরার জন্য জেলায় জেলায় সমিতির অধিবেশন করা।

(২) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষার দ্বারা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থার উন্নতি সাধন করা।

(৩) মুসলমান সমাজে ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, অভিজাত-অনভিজাত লোকের মধ্যে ভেদাভেদ ও দূরত্ব দূর করে পরস্পর সম্প্রীতি ও সহানুভূতির মাধ্যমে জাতীয় ঐক্যবোধ গড়ে তোলা।

(৪) জড়, স্থবির, হীনমন্য, হতবীর্য, হতাশাগ্রস্ত ও দারিদ্র্যলাঞ্ছিত সমাজে আন্দোলনের মাধ্যমে উদ্যমশীল, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ সমাজকর্মী গড়ে তোলা।[২১২]

পরোক্ষ উদ্দেশ্য

(১) মুসলমান ছাত্রের উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি ফার্স্ট গ্রেড রেসিডেন্সিয়াল কলেজ স্থাপন।

(২) অনুবাদ বিভাগ স্থাপন দ্বারা আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরাজি ভাষার বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।

(৪) অর্থকরী বাণিজ্য ও শিল্পবিদ্যার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন।

(৫) নারীশিক্ষার প্রসার ও তজ্জন্য বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।

(৬) সর্বশ্রেণীর মুসলমানের মধ্যে ওয়াজ-নসিহত দ্বারা ধর্মপ্রচারের জন্য জেলায় জেলায় শিক্ষিত ধর্মপরায়ণ ও চরিত্রবান আলেমগণকে প্রেরণ।[২১৩]

২১১. **ঐ, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০**
২১২. *ইসলাম-প্রচারক*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০
২১৩. **ঐ, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০**

১৩১০ সনের ২০ ও ২১ চৈত্র রাজশাহী জেলার রামপুর বোয়ালিয়া শহরে সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতি ছিলেন সৈয়দ শামসুল হোদা। অধিবেশনকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার জন্য পূর্বেই এক সভায় (১৪ ও ১৫ কার্তিক ১৩১০) কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন প্রেরিত প্রতিনিধি (মুনসী মেহেরুল্লা ও মির্জা ইউসুফ) ও রাজশাহীর স্থানীয় নেতৃবন্দের যৌথ উদ্যোগে বিভিন্ন কমিটি গঠন করে দায়িত্বভার বণ্টন করা হয়েছিল। 'কার্য পরিচালক কমিটি'তে ছিলেন নাটোরের জমিদার মোহাম্মদ এরশাদ আলী খান চৌধুরী (সভাপতি), সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেন (সহ-সভাপতি), শেখ আহমদ হোসেন (সম্পাদক), খোন্দকার হাফেজউদ্দীন (সহকারী সম্পাদক), মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (অনারেরী সম্পাদক), মোহাম্মদ মানিক উল্লা (কোষাধ্যক্ষ), নসিমউদ্দীন আহমদ (পর্যবেক্ষক), সেরাজউদ্দীন আহমদ ডাক্তার (সদস্য), বেলালউদ্দীন (মোক্তার), লুৎফর রহমান বিএ, এলাহী বক্স (ইনস্পেক্টর), মোহাম্মদ সোলেমান খান চৌধুরী প্রমুখ।[২১৪]

দুদিনব্যাপী উক্ত অধিবেশনের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে মোট ১৫টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। 'ইসলাম-প্রচারকে'র এক প্রতিবেদনের ভাষায় কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রস্তাব ছিল এরূপ :

- মুসলমান সমাজে শিক্ষাবিস্তার সহজসাধ্য করিবার জন্য, জেলায় জেলায় 'ডিষ্ট্রিক্ট এডুকেশন ফণ্ড' বা 'শিক্ষা তহবিল' স্থাপনের উপযুক্ত অনুষ্ঠান করা কর্তব্য এবং স্থানীয় বিদ্যালয়সমূহের সাহায্য এবং যে সকল উপযুক্ত গরীব ছাত্রকে সাহায্য দানে উৎসাহিত করা উচিত, তাহাদের জন্য প্রত্যেক জেলাস্থ শিক্ষা তহবিলের টাকা সেই জেলায় ব্যয়িত হওয়া উচিত। (প্রথম প্রস্তাব)
- এই শিক্ষা সমিতির মতে সাধারণ বিদ্যার সহিত কৃষি শিল্পাদি শিক্ষার উৎসাহ বর্ধন করা আবশ্যক ও বাঞ্ছনীয়। (দ্বিতীয় প্রস্তাব)
- এই সমিতির বিবেচনায় মুসলমান ছাত্রদিগকে ধর্মশিক্ষা প্রদান করা একান্ত প্রয়োজন, এবং প্রত্যেক এসলামীয়া বিদ্যালয়ে অন্ততঃ প্রতিদিন ১ ঘন্টা সময় ধর্মশিক্ষার নিমিত্ত নির্ধারিত থাকা কর্তব্য। (তৃতীয় প্রস্তাব)
- এই সমিতির বিবেচনায় ছাত্রগণের স্বাস্থ্য রক্ষা ও ব্যায়াম শিক্ষার প্রতি যথোচিত মনোযোগী হওয়া একান্ত আবশ্যক। (চতুর্থ প্রস্তাব)
- অধুনা মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এই সমিতির মতে পরদার সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক। (পঞ্চম প্রস্তাব)
- এই শিক্ষা সমিতির বিবেচনায় সমিতির উদ্দেশ্যাবলী কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উপযুক্ত ও ন্যায়সঙ্গত পন্থা অবলম্বন করা এবং মফঃস্বলবাসী লোকদিগকে বুঝাইয়া প্রত্যেক জেলায় এক একটি সভা স্থাপন করা আবশ্যক। এই সমিতির স্থায়ী সেন্ট্রাল কমিটির পরামর্শ লইয়া জেলায় শিক্ষা-

২১৪. *ইসলাম-প্রচারক*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০

তহবিল ও অন্যান্য বিষয় পরিদর্শন করা উক্ত স্থানীয় সভার কর্তব্য কার্য্য হইবে। (ষষ্ঠ প্রস্তাব)

o বর্তমান সময়ে বহু সংখ্যক মুসলমান বালক স্কুল, পাঠশালা, মক্তব ও মাদ্রাসায় বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদের জন্য পাঠোপযোগী পুস্তক অতি বিরল থাকায় এই সমিতির মতে ঐরূপ পুস্তক সংগ্রহের জন্য সেন্ট্রাল কমিটি কর্তৃক উপযুক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে গ্রন্থাকারদিগকে পুরস্কার অথবা ছাপা খরচ দিয়া উৎসাহিত করা আবশ্যক এবং যাহাতে পাঠোপযোগী পুস্তকগুলি টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক তালিকাভুক্ত হয় এবং মুসলিম বালকদিগের জন্য ও সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত হয়, তজ্জন্য শিক্ষা বিভাগে উক্ত কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হওয়া আবশ্যক। (সপ্তম প্রস্তাব)

o এই সমিতির মতে বঙ্গদেশীয় মক্তব ও মাদ্রাসাসমূহে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী সন্তোষজনক নহে, তজ্জন্য যাহাতে উক্ত প্রণালীর পরিবর্ধন হইতে পারে, তাহার এক পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া শিক্ষা বিভাগের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।[২১৫] (নবম প্রস্তাব)

সভার 'চতুর্দ্দশ প্রস্তাব' অনুসারে একটি 'স্থায়ী সেন্ট্রাল কমিটী' গঠিত হয়। কমিটির গঠনরূপ ছিল নিম্ন প্রকার :

পৃষ্ঠপোষক—মুর্শিদাবাদের নবাব-বেগম সাহেবা ও ঢাকার নবাব বাহাদুর

সভাপতি—সৈয়দ শামসুল হোদা ও মির্জা সুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর

প্রতিনিধি সভাপতি—দেলওয়ার হোসেন খান বাহাদুর, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী জমিদার, করটীয়া, আলী নওয়াব চৌধুরী, খান বাহাদুর, জমিদার, ত্রিপুরা ও আবদুল মজিদ চৌধুরী, জমিদার, রংপুর।

কোষাধ্যক্ষ—সৈয়দ শামসুল হোদা এমএ, বিএল।

সম্পাদক—ওয়াহেদ হোসেন বিএ, বিএল।

সদস্যবৃন্দ—এরশাদ আলী খান চৌধুরী (জমিদার, নাটোর), মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ওবায়দুল হক, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ আবুল ফাত্তাহ (জমিদার, দিনাজপুর), মোহাম্মদ তাহা (মতওয়াল্লি,

২১৫. *ইসলাম-প্রচারক*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১
প্রস্তাবগুলি উত্থাপন, সমর্থন, অনুমোদনে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁরা হলেন, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, আবদুল হামিদ, এরশাদ আলী খান চৌধুরী, অসিমুদ্দীন আহমদ বিএ, মুনসী মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, লুৎফর রহমান বিএ, সৈদয় আবদুল ফাত্তাহ, মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মির্জা সুজাত আলী বেগ, মেসেরউদ্দীন আহমদ (দিনাজপুর), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ রওশন আলী, ইব্রাহিম খান (ময়মনসিংহ), মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, ওবায়দুল হক (চট্টগ্রাম), দেওয়ান নাসিরুদ্দীন ('সোলতান' পত্রিকার ম্যানেজার)।

রংপুর), মুনশী মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, মোজাম্মেল হক, চৌধুরী আবদুর রহমান ও এস. কে. এম. রওশন আলী।[২১৬]

কমিটিতে অবাঙালি কেউ নেই, উর্দুভাষী বাঙালি অবশ্য আছেন। নবাব, জমিদার, সরকারি কর্মচারী, সাহিত্যিক, সম্পাদক ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে এটি গঠিত হয়েছে। এরূপ সমন্বয়ই সম্পাদক ওয়াহেদ হোসেনের স্বপ্ন ছিল।[২১৭]

শিক্ষা সমিতির ২য় বার্ষিকী অধিবেশন হয় ত্রিপুরার পশ্চিমগাঁও-এর জমিদার খান বাহাদুর আলী নওয়াব চৌধুরীর 'খোরশেদ মঞ্জিল' নামক প্রাসাদের সম্মুখভাগে সুসজ্জিত চাঁদোয়া তলায়। তিনি ছিলেন স্থানীয় 'অভ্যর্থনা কমিটি'র সভাপতি। স্থানীয় জমিদার সৈয়দ হোস্‌সাম হায়দার চৌধুরী, সৈয়দ আবদুল জব্বার চৌধুরী, মোহাম্মদ সেকেন্দার আলী চৌধুরী, শাহ সৈয়দ এমদাদ হক প্রমুখেরও দান ছিল অপরিসীম।[২১৮] সভায় সভাপতি ছিলেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট মহমুদন্নবী। প্রবন্ধ পাঠক ও বক্তা ছিলেন মির্জা সুজাত আলী বেগ, হবিব হোসেন, মিসেস আজিজ, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ (সোলতান সম্পাদক), মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী (কোহিনুর সম্পাদক) প্রমুখ। মির্জা সুজাত আলী বেগ ইংরাজিতে প্রবন্ধ পড়েন ; হবিব হোসেন ও মিসেস আজিজ লক্ষ্ণৌ থেকে আগত, তাঁরা যথাক্রমে উর্দু ও ইংরাজিতে বক্তৃতা দেন। সভায় গণ্যমান্য ব্যক্তির মধ্যে মহীপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী, নোয়াখালীর জমিদার বজলোর রহমান খান বাহাদুর, বাবু ব্যোমকেশ মুস্তফি (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রতিনিধি) প্রমুখ এবং স্থানীয় আলেম, মওলানা, মৌলবী, উকিল, মোক্তার, শিক্ষক ও অন্যান্য শ্রেণীর বহু লোক ছিলেন। সভার প্রস্তাবসমূহ বাংলা ভাষায় লিপিবদ্ধ করা হয়।[২১৯]

দুদিনের মোট ৪টি অধিবেশনে প্রায় ১৫টি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ; (১) শিক্ষা তহবিল স্থাপন, (২) মুষ্ঠিভিক্ষা সংগ্রহ রীতি প্রবর্তন, (৩) বঙ্গভাষার অঙ্গচ্ছেদের বিরোধিতা, (৪) মুসলমান বালকের ধর্মশিক্ষা, (৫) মক্তব ও মাদ্রাসায় ট্রান্সফার সার্টিফিকেট দানের প্রথা প্রবর্তন, (৬) মহসিন ফাণ্ডের সদ্ব্যবহার, (৭) মুসলমান সমাজের গ্রহণযোগ্য বিষয় নিয়ে বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করণ (৮) মুসলমান ছাত্রের ইউনানি চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষা (৯) কেন্দ্রীয় কমিটির শক্তি বৃদ্ধি ইত্যাদি। এ ছাড়া সভায় কুমিল্লা শহরে একটি 'মোসলেম বোর্ডিং' স্থাপনের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।[২২০]

২১৬. *ইসলাম-প্রচারক*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

২১৭. সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন—*বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি* (১৯০৩) দ্রষ্টব্য।

২১৮. *কোহিনুর*, বৈশাখ ১৩১২

২১৯. ঐ।

২২০. *কোহিনুর*, বৈশাখ ১৩১২

১৯০৫ সালে বঙ্গবিচ্ছেদ হয়। তখন কলিকাতার শিক্ষা-সমিতির অনুরূপ ঢাকায় 'পূর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলমান শিক্ষা সমিতি' গঠিত হয়। ধনবাড়ির জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী এর নেতৃত্ব দেন। এর প্রথম অধিবেশন ১৪ ও ১৫ এপ্রিল ১৯০৬ তারিখে ঢাকার নবাবের 'শাহবাগ উদ্যানে' অনুষ্ঠিত হয়।[২২১] ধনবাড়ির জমিদার নওয়াব আলী চৌধুরী 'অভ্যর্থনা কমিটি'র সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হন। অভ্যর্থনা কমিটিতে ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা মোহাম্মদ আসগর (সভাপতি), ঢাকার জমিদার কাজি রাজিউদ্দীন আহমদ (সম্পাদক) এবং শহরের অন্যান্য শিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন। সম্মেলন-সভায় সভাপতি ছিলেন নবাব খাজা সলিমুল্লাহ।[২২২] সভায় নবাব মুহসিনুল মূলক (১৮৩৪-১৯০৭), আবদুল করিম (স্কুল সব-ইন্সপেক্টর), এ. কে. এম. ফজলুল হক উপস্থিত ছিলেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবাবলীর মধ্যে 'ঢাকার মুসলিম ছাত্রদের জন্যে একটি ছাত্রাবাস প্রতিষ্ঠা,' 'মাদ্রাসার কারিকুলাম,' 'মুসলমানী বাংলার উন্নতি', 'অতিরিক্ত ভাষা হিসাবে উর্দু শিক্ষা' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য ছিল।[২২৩] এই সমিতির অপর তিনটি অধিবেশন হয় যথাক্রমে ময়মনসিংহ, বগুড়া ও রংপুরে। রংপুরের সম্মেলনটি ১৯১১ সালের ১৫ ও ১৬ এপ্রিল তারিখে নিষ্পন্ন হয়।[২২৪]

১৯০৭ সালের ২৯, ৩০ ও ৩১ মার্চে বরিশাল জেলা স্কুলের হলে শিক্ষাসমিতির বার্ষিক অধিবেশন হয়। 'বাকরগঞ্জ জেলার মুসলমান শিক্ষা-সমিতি' শিরোনামে উক্ত সম্মেলনের একটি রিপোর্ট 'ইসলাম-প্রচারকে' (ফাল্গুন ১৩১৩) প্রকাশিত হয়। সম্ভবত এটি শাখা-সমিতি ছিল। সায়েস্তাবাদের জমিদার সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। সেটেলমেন্টে অফিসার মি. জ্যাক, ভূমি গ্রহণ ও কৃষি বিভাগের ডাইরেক্টর মি. বিটসন বেল, শায়েস্তাবাদ, উলানিয়া, বামনার জমিদারগণ, জজ, উকিল, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, বিভিন্ন আমলা, শিক্ষক, ছাত্র ও অন্যান্য জ্ঞানীগুণীজন বিভিন্ন সভায় উপস্থিত ছিলেন।[২২৫] বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির কৃষ্ণনগর শাখার উল্লেখ আছে তা বুঝা যায় ১৯১৯ সালের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন রিপোর্টে (৭ম খণ্ড) প্রদত্ত শাখাসমিতির যুগ্ম-সম্পাদক এম. আজিজুল হকের (উকিল) সাক্ষ্য দান থেকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাম্প্রতিক অগ্রগতি সম্পর্কে দেশের মানুষ যাতে অবহিত হতে পারে

---

২২১. উক্ত সমিতির জন্ম এবং প্রথম অধিবেশন সম্পর্কে 'ঢাকা প্রকাশে'র (১৫ এপ্রিল ১৯০৬) বক্তব্য :- -"নতুন প্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায়ের চেষ্টায় 'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' নামে এক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থানীয় শাহবাগ উদ্যানে গতকল্য এবং অদ্য (১৪ ০ ১৫ এপ্রিল) এই সমিতির প্রথম অধিবেশন সম্পন্ন হইয়াছে। অধিবেশনের কার্যাদি সম্বন্ধে আমরা কোনো তত্ত্বই অবগত নহি কারণ অনুষ্ঠাতৃবর্গ, কি জানি কি কারণে, সংবাদপত্রেব প্রতিনিধিকে প্রবেশাধিকার প্রদান যুক্তিযুক্ত মনে করেন নাই। মুসলমান সমাজের মধ্যে উচ্চ শিক্ষা বিস্তৃত হউক ইহাই আমরা সর্বান্তকরণে কামনা করিয়া থাকি ; এ অবস্থায় সংবাদপত্রের সহিত সম্পর্করাহিত্যের বিশেষ কোনো কারণ আছে কিনা, কর্তৃপক্ষই বলিতে পারেন।"

২২২. *ইসলাম-প্রচারক*, অগ্রহায়ণ ১৩১২

২২৩. *মাসিক মোহাম্মদী*, ভাদ্র ১৩৪৭

২২৪. Report of the fourth Session of the Provincial Mahomedan Educational Conference held at Rangpur, April 1911, p. 79

২২৫. *ইসলাম-প্রচারক*, ফল্গুন ১৩১৩

সেজন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ধরনের প্রকাশনা সুলভ মূল্য ও সহজলভ্য করার অভিমত ব্যক্ত করেন। ২২৬

১৯১৮ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি সক্রিয় ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায় ঐ সালের 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'য় (মাঘ ১৩২৫)। পত্রিকার 'সমিতি সংবাদে' আমিনুর রহমানের সভাপতিত্বে শিক্ষা সমিতির অধিবেশন (২৮ ও ২৯ ডিসেম্বর ১৯১৮) চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হয় বলে উল্লিখিত হয়েছে। ঐ সম্মেলনে ওয়াহেদ হোসেন উপস্থিত ছিলেন।২২৭

বিদ্যাশিক্ষা ও সমাজ উন্নতির ব্রত নিয়ে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' মুসলমান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর বিপুল সংখ্যক মানুষের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল ; আর অন্য কোনো মাধ্যম দ্বারা সেযুগে এরূপটি হয় নি। শিক্ষাভিমানী নব্য যুবকেরা কলিকাতা ছেড়ে জেলা শহর ও গ্রামে প্রথম নেমে এসেছেন সমাজসেবার আদর্শ ও উদ্দীপনা নিয়ে। মুসলমান সমাজ তাঁদের লক্ষ্য, কেননা এ–সমাজদেহে অধিক পচন ধরেছিল। তাঁদের দৃষ্টি ছিল স্বচ্ছ, বাস্তবমুখী এবং প্রগতিশীল। তাঁরা সাধারণ মানুষের সংস্পর্শে এসেছেন, ধর্মশিক্ষার সংস্কার চেয়েছেন, অর্থকরী বিদ্যার প্রসার চেয়েছেন, নারীশিক্ষার আবশ্যকতার কথা বলেছেন, বাংলা ভাষার মূল্য বুঝেছেন, জমিদার, চাকুরীজীবী, বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ শ্রেণীর মানুষকে একত্র করেছেন। এটাই শিক্ষা সমিতির স্বাতন্ত্র্যের দিক, এখানেই তার সাফল্যের চাবিকাঠি।

সমিতি–প্রতিষ্ঠার শুরুতেই মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর কণ্ঠে আশাবাদের সুর ছিল : "আমরা ব্যক্তিগতভাবে এই পর্যন্ত জাতীয় মহাসমিতির সমর্থনকারী শতাধিক সমাজহিতৈষী শিক্ষিত লোকের নাম ধাম প্রাপ্ত হইয়াছি। মুসলমানগণের সমাজনীতি, ধর্মনীতি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা ও কৃষি প্রভৃতি বিষয় সমূহ সভার আলোচ্য বিষয়ের প্রধান অঙ্গ থাকিবে। ...এসো ভাই। যুক্তশক্তি দ্বারা সমাজের জীবন রক্ষা করিতে আত্মবলিদান করি।"২২৮ মোসারত আলী খান লিখেছেন, "অধঃপতিত বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের দুরবস্থা দর্শন করিয়া দুই চারটি কোমলপ্রাণ কাঁদিয়া উঠিতেছে, ইহা বাস্তবিকই এক শুভ লক্ষণ। ....ভ্রাতৃগণ আসুন, উদ্দেশ্যহীন জীবন লইয়া আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন না করিয়া বস্তুর রাজ্যে প্রবেশ করি এবং সমাজ হিতকর এই গভীর কার্য্যের যতটুকু পারি, সাধন করিতে চেষ্টা করি।"২২৯ মির্জা আবুল ফজলের অভিমত : "এই অধঃপতিত সমাজের মঙ্গলোদ্দেশ্যে তিনি (ওয়াহেদ হোসেন) যেরূপ প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে কতটা কৃতকার্যতার আশা করা যাইতে পারে। ...ইহা নিশ্চিত যে এমন কোনো কারণ নাই যাহাতে কোনো স্বজাতিবৎসল, সমাজহিতৈষী ও কর্তব্যপরায়ণ মুসলমান ভ্রাতা নিজেদের পদগৌরবরূপে

২২৬. *The Calcutta University Commission Report, Vol. VII* (Evidence and Documents), Calcutta, 1919, p. 113

২২৭. *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ: ২২০

২২৮. মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী—'বঙ্গীয় মুসলমানগণের জাতীয় মহাসমিতি,' *মিহির ও সুধাকর* ,৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯

২২৯. মির্জা আবুল ফজল—'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি,' *নবনূর*, শ্রাবণ ১৩১০

লুপ্তরত্নের পুনরুদ্ধারে উক্ত মতের বিরুদ্ধে কোনো মত প্রকাশ করিত সক্ষম হন।"[২৩০] অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন, "মুসলমানের প্রাণের স্পন্দন এখনও তিরোহিত হয় নাই ; এখনও আত্মোৎসর্গে স্বজাতির কল্যাণ সাধন করিবেন বলিয়া অনেকে প্রবল প্রতাপে বক্তৃতা করিয়া বেড়াইতেছেন। এই সকল যদি মায়ামরীচিকা না হইয়া আন্তরিক দৃঢ় সঙ্কল্পের পরিচায়ক হয়, তবে মুসলমান-শিক্ষাসমিতির দ্বারা বাঙালী মুসলমান সমাজের অজ্ঞানান্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে।"[২৩১] আফতাবউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, "সম্প্রতি বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতির আবির্ভাবে অভাব পূর্ণ হইবার প্রত্যাশায় বিশেষ সুখ অনুভব করিতেছি।... ব্যক্তিগত কিম্বা সাম্প্রদায়িক স্বার্থবিসর্জন দিয়া, বাংলার প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমান ইহাতে সরল হৃদয়ে যোগদান করিয়া, ইহাকে, সঞ্জীবিত ও উন্নতি করিতে যত্নবান ও বদ্ধপরিকর হউন।"[২৩২] কোহিনুর পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী উচ্চকিত কণ্ঠে বলেছেন, "প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতির দুন্দুভিনিনাদে সঞ্জীবনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া আমরা পুলকে আত্নহারা হইয়াছি। আশার সম্মোহন মধুর বাণীতে আমরা প্রলুব্ধ হইয়াছি। ....মুসলমান শিক্ষা-সমিতির দ্বারা বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অজ্ঞানান্ধকার কিয়ৎ পরিমাণে বিদূরিত হইতে পারে।"[২৩৩] নবনূর পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছেন, "আমাদের প্রথম উদ্দেশ্যই হইতেছে শিক্ষার বিস্তার করা। এইজন্যই আমরা প্রাদেশিক শিক্ষাসমিতির সর্বপ্রকারে বলসঞ্চয় কামনা করি। কারণ এতদ্বারা আমাদের অনেক সৎকার্য সংসাধিত হওয়ার আশা আছে। ...শিক্ষায়-দীক্ষায় যাঁহারা বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে শীর্ষ স্থানীয় তাঁহারা ভেদনীতির বন্ধন ছিন্ন করিয়া ইহাতে নির্ভয়ে যোগদান করিবেন এবং এই সমিতির প্রাণস্বরূপ হইয়া নিদ্রিত সমাজে এক নবযুগের সঞ্চার করিবেন।"[২৩৪] সমকালীন পত্র-পত্রিকায় সমাজবিদ ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের এসব মন্তব্য থেকেই সমাজের মধ্যে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র প্রভাব ও প্রতিক্রিয়ার স্বরূপ বুঝা যায়।

বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি (১৯০৪)

'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি' ও 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' গঠনের পরিকল্পনা একই কালে প্রায় একই শ্রেণীর নেতৃবর্গের দ্বারা সম্পন্ন হয়। মওলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান 'ইসলাম-প্রচারকে' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০) 'ইসলাম ও মিশন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানেই তিনি 'ইসলাম মিশন' প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব উত্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, তিনি ঐ ধরনের সমিতির উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, গঠনপ্রণালী ও কর্মপন্থা সম্পর্কেও বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। তিনি বলেছেন,

২৩০. মোসারত আলী খান—'বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা-সমিতি সম্বন্ধে দুই একটা কথা,' *মিহির ও সুধাকর*, শ্রাবণ ১৩১০
২৩১. অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়—'মুসলমান-শিক্ষা সমিতি', *সাহিত্য*, চৈত্র ১৩১০
২৩২. আফতাবউদ্দীন আহমদ—'বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা (১),' *ইসলাম-প্রচাক*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১
২৩৩. সম্পাদক—'প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা-সমিতি,' *কোহিনুর*, বৈশাখ ১৩১২
২৩৪. *নবনূর*, শ্রাবণ ১৩১২

যৌথশক্তি ও পরিকল্পিত পদ্ধতি ছাড়া অধঃপতিত মুসলমান সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান ও প্রচারকের মাধ্যমে সমাজের ব্যাধিগুলি প্রথমে দূর করে তবে উন্নতির কথা চিন্তা করতে হবে। এ উদ্দেশ্যে তিনি কতকগুলি বাস্তব কর্মসূচি প্রস্তাব-আকারে উত্থাপন করেছেন। এগুলি হল (১) মিশন তহবিল গঠন করা, (২) চরিত্রবান প্রচারক তৈরি করা, (৩) সমিতির সদস্যগণ নিয়ে একটা কার্যপরিচালক কমিটি গঠন করা, (৪) কার্য পরিচালনার সুবিধার জন্য কলিকাতায় কেন্দ্রীয় দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা, (৫) মিশন-সমিতির নিজস্ব গ্রন্থাগার গড়ে তোলা, (৬) সমিতির মুখপত্র হিসাবে পত্রিকা প্রকাশ করা, (৭) পত্রিকা, প্রচারপত্র, গ্রন্থ অনুবাদ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য মুদ্রণের জন্য মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন করা, (৮) প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাদ্রাসা থেকে শুরু করে 'জাতীয় উচ্চ বিদ্যালয়' এমন কি 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করা।[২৩৫]

প্রবন্ধের শেষে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে : রংপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরীর উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে ইতোমধ্যে একটি 'প্রচার-সমিতি' ও একটি 'প্রচার-ফাণ্ড' স্থাপিত হয়েছে।[২৩৬] আমরা পূর্বে দেখেছি, 'রংপুর নূরল ইমান জমায়াতে'র (১৮৯১) শাখা হিসাবে 'মহীপুর দায়রায় জমাত' নামে একটি ধর্মসভা আবদুল মজিদ চৌধুরীর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেখানেও উপযুক্ত ও আদর্শবান ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে ইসলামধর্ম প্রচারের কথা বলা হয়েছে। মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সম্ভবত উক্ত জমাতের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন।

খ্রিস্টান মিশনের অনুকরণে ইসলাম মিশন তৈরি করে ধর্মপ্রচারের পরিকল্পনা দীর্ঘকাল আগে ছিল বলে মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরীর একটি রচনায় ব্যক্ত হয়েছে। তিনি 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' স্থাপনের সংবাদ পরিবেশন করে বলেছেন, "ইসলাম মিশন সমিতি স্থাপিত হইল। মুসলমানদিগের বহুদিনের একটা সঙ্কল্প অদ্য কার্য্যে পরিণত হইতে চলিল। প্রায় ২০ বৎসর যাবৎ যে বিষয়ের আন্দোলন চলিতেছিল—আল্লাহতালা এতকাল পরে সেই মিশন-কমিটি 'মিশন-ফণ্ডে'র ভিত্তি স্থাপন করিতে মুসলমানদিগকে শক্তি প্রদান করিলেন। মিশন কমিটি দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকার খৃষ্টান জাতিসমূহ পৃথিবী কিরূপ মহামহা কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন তাহা চিন্তা করিলেও বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়—হৃদয় উৎসাহে মাতিয়া উঠে।"[২৩৭] তিনি বলেছেন, রামপুর বোয়ালিয়ায় ২০ চৈত্র, ১৩১০ সনে ওয়াহেদ হোসেনের সভাপতিত্বে 'একটি মহতী সভা' অনুষ্ঠিত হয়। সে-সভায় তিনি নিজেই 'মিশন সম্বন্ধে সমস্ত বিষয়ের আলোচনা পূর্বক নাতিদীর্ঘ একটি বক্তৃতা প্রদান করেন। তারপর তিনি সভার উদ্দেশ্য ও কর্মসূচি সম্বন্ধে কতকগুলি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। সমিতির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি বলেন,

২৩৫. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান—'ইসলাম ও মিশন,' *ইসলাম-প্রচারক*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১১

২৩৬. ঐ।

২৩৭. মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী—'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি,' *ইসলাম-প্রচারক* বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

১. অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানব সমাজের মধ্যে পবিত্রতম সত্য সনাতম ইসলাম ধর্মভাস্করের অত্যুজ্জ্বল স্বর্গীয় রশ্মির বিকীর্ণতা সাধন।

২. ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্মীদিগের অযথা আক্রমণ হইতে ইসলামধর্ম ও মোসলেম সমাজের রক্ষা-বিধান এবং আবশ্যক মতো আক্রমণ গুলির প্রতি উত্তর প্রদান, খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্মীগণের প্রকাশিত ইসলামধর্মের গ্লানিকর ট্রাক্ট বা পুস্তিকাগুলির প্রতিবাদকরণ এবং বিধর্মীদিগের আরোপিত সন্দেহ ভঞ্জন।

৩. হতচেতন মোসলেম সমাজের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধি ও ধর্মবিস্তৃতি।

৪. ইসলামধর্মের সর্বপ্রকার উন্নতি চেষ্টা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দেশ্যে বঙ্গভাষায় নানাবিধ ট্রাক্ট বা পুস্তিকা এবং পত্রিকাদি প্রকাশ করা।

৫. বঙ্গের সর্বত্র ধর্মসভা স্থাপনপূর্বক সমাজস্থ লোকদিগকে স্বধর্মে আস্থাবান করা।

৬. সর্বত্র বিধর্মীদিগের মধ্যে এবং স্বীয় সমাজে সনাতন ইসলাম ধর্মের প্রচার করা।

৭. মফঃস্বলের গ্রামে ... ইসলামধর্মের প্রচার জন্য সাধ্যানুসারে বেতনভোগী বা সমাজের কার্যে প্রাণোৎসর্গকাবী বক্তা বা প্রচারক নিযুক্ত করিয়া তদনুরূপে প্রচারকার্য নির্বাহ করা।

৮. মফঃস্বলের জেলা ও প্রধান স্থানসমূহ মুসলমানদিগের যে সমস্ত সভাসমিতি আছে, সেগুলির সহিত সম্বন্ধ সংস্থাপন এবং আবশ্যকমতে তাহার সাহায্য করা।[২৩৮]

মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরীর প্রস্তাবে নিম্নরূপ সদস্যদের নিয়ে একটি 'কেন্দ্রীয় কমিটি' গঠনের কথা বলা হয় :

পৃষ্ঠপোষক—মির্জা সুজাত আলী বেগ, খান বাহাদুর, সৈয়দ শামসুল হোদা উকিল. কলিকাতা হাইকোর্ট।

সভাপতি—আবদুল মজিদ চৌধুরী, জমিদার, মহীপুর।

সম্পাদক—মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন, ইসলাম-প্রচারক ও কোহিনুর সম্পাদক, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, সমাজসেবক ও সাহিত্যিক।

কার্য-পরিচালক সদস্য—ওয়াহেদ হোসেন, বিএল, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, সব-রেজিস্ট্রার, শেখ জমিরুদ্দীন, শাহ আবদুল্লা, মোহাম্মদ ইবরাহিম, দেওয়ান নসিরুদ্দীন আহমদ বিএ, আবদুল হামিদ, মোসলেম ক্রনিকল সম্পাদক ও নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, সব-রেজিস্ট্রার।[২৩৯]

২৩৮. *ইসলাম-প্রচারক*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১
২৩৯. ঐ।

আঞ্জুমনে মফিদুল ইসলাম

ময়মনসিংহের মোহনগঞ্জ মহকুমার টেঙ্গাপাড়ায় 'আঞ্জুমনে মফিদুল ইসলাম' নামে ধর্মসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন মুনশী ইব্রাহিম খান। রাজশাহীতে 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষাসমিতি'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে তিনি আঞ্জুমনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন ও সভায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।[২৪০] স্বদেশী আন্দোলনের বিপক্ষে ইব্রাহিম খান ঘোর প্রচারণা চালান। এতোদ্দেশ্যে তিনি একটি সাম্প্রদায়িকতা প্রসূত 'লাল ইস্তেহার' বিলি করেন। 'আঞ্জুমনে মফিদুল ইসলাম' সেটি প্রকাশ করে।[২৪১] এরূপ আপত্তিকর প্রচারপত্রের জন্য তিনি আদালতে অভিযুক্ত হন। পত্রগুলি তুলে নিবেন এরূপ শর্তে এবং ১০০০ টাকা ব্যক্তিগত জামিনে তিনি খালাস পান।[২৪২] বঙ্গ-বিচ্ছেদের প্রেক্ষাপটে জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে স্বদেশী আন্দোলন হয়, আঞ্জমানে মফিদুল ইসলাম কংগ্রেসের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিল। আঞ্জুমনের সম্পর্ক ছিল সৈয়দ আহমদের 'ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশনে'র (১৮৮৮) সাথে। এটিও কংগ্রেসের ঘোর বিরোধী ছিল।[২৪৩] ইণ্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশনের সাথে এ-সম্পর্কের জন্যই আঞ্জুমনের রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ হয়।

মেদিনীপুর মোসলেম সোসাইটি

মেদিনীপুরে 'মেদিনীপুর মোসলেম সোসাইটি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান ছিল। শিক্ষিত তরুণদের নিয়ে এটি গঠিত হয়। ওসমান আলী বিএ ও সৈয়দ আবদুল গাফফার আলকাদরি সোসাইটির সম্পাদক ছিলেন। তাঁদের লক্ষ্য ছিল, ঐ জেলার মুসলমানদের সামাজিক মর্যাদা উন্নত করা। ১৮৯৬ সালের মহরম উৎসবে সোসাইটি সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষার কাজে কৃতিত্ব প্রদর্শন করে ; এজন্য জেলার পুলিশ-সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সোসাইটিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে।[২৪৪] 'মেদিনীপুর ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সঙ্গে সোসাইটির সম্পর্ক ভাল ছিল না। মোসলেম ক্রনিকলে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার ও শহরবাসীর মধ্যে সৌহার্দ্য স্থাপনের কথা বলা হয়েছে।[২৪৫]

২৪০. ঐ।

২৪১. *Muslim Community in Bengal,* p 276

২৪২. IBid., p. 276
"The red Pamphlet made its first appearence in December 1906, and was circulating in parts of Rajshahi and in the Kishoregunj Subdivision of Mymensing in april 1907." Home political Proceedures A, July 1907.
হিন্দু-বিদ্বেষ যে লাল ইস্তেহারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল তা নিচের উদ্বৃতি থেকে বুঝা যায় : "একদিনেই হিন্দুকে জাহান্নামে পাঠাইতে পারি। দেখ, বঙ্গদেশে তোমাদের সংখ্যা অধিক, তোমরা কৃষক, কৃষিকার্জেই ধন উৎপত্তির বীজ, হিন্দু ধন কোথা পাইল, হিন্দুর ধন বিন্দুমাত্রে নাই। হিন্দু কৌশলে তোমাদের ধন নিয়া ধনী হইয়াছে। ... আমরা স্বজাতির আন্দোলন করিয়া আত্মোন্নতি করিব।" *The Bengalee,* 5 May 1907.

২৪৩. *Muslim Community in Bengal,* p. 105.

২৪৪. *The Moslem Chronicle,* 18 July, 5 September 1896.

২৪৫. *Ibid.,* 18 July 1896.

মহামেডান লিটারেরী একাডেমী

'মহামেডান লিটারেরী একাডেমী' নামে একটি প্রতিষ্ঠান কলিকাতায় স্থাপিত হয়। নবাব আবদুল লতিফের মৃত্যুতে একাডেমী একটি শোকসভার আয়োজন করে। সভাটি ১৮৯৩ সালের ৩০ জুলাই কলিকাতা মাদ্রাসার হলঘরে অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে প্রায় পাঁচশ লোক উপস্থিত হয়েছিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ শামসুল হোদা এমএ, বিএল। বক্তৃতা করেন একাডেমীর সম্পাদক এ. এইচ. আবদুল হামিদ, মোসলেম ক্রনিকলের সম্পাদক আবদুল হামিদ বিএ, ছোট আদালতের ইন্টারপ্রিরটার মোফাখারুল ইসলাম বিএ, মোহাম্মদ সোলায়মান ব্যারিস্টার, সৈয়দ আজিজুল বারি এবং সভাপতি স্বয়ং। একাডেমীর পক্ষ থকে সভায় আবদুল লতিফের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ, পরিবারের প্রতি সমবেদনা প্রকাশ এবং আবদুল লতিফের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য একটি কমিটি গঠন করে মোট তিনটি প্রস্তাব নেওয়া হয়। সম্পাদক এ. এইচ. আবদুল হামিদ আবদুল লতিফের উদ্দেশ্যে রচিত একাডেমীর 'স্মৃতিলিপি' পাঠ করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতার একস্থানে একাডেমীকে 'একটি ক্ষুদ্র স্থানীয় প্রতিষ্ঠান' বলে উল্লেখ করেছেন। এতথ্য পরিবেশন করে 'ইণ্ডিয়ান ডেলী নিউজ' (৩১ জুলাই ১৮৯৩) পত্রিকা।[২৪৬] 'মহামেডান লিটাররী একাডেমী' ঐ বছর অথবা তার পূর্বে স্থাপিত হয়েছিল, তাতে সন্দেহ নেই।

আঞ্জমনে ইসলামিয়া

'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' নাম দিয়ে বাংলার ও ভারতের নানা প্রদেশে অনেকগুলি সমিতির নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। এক বাংলাদেশে বিভিন্ন জেলায় পনের-ষোলটির হদিস পাওয়া যায়। বছর অনুক্রমিক সাজালে এগুলি এরূপ দাঁড়ায় : ময়মনসিংহ (১৮৭৫), নোয়াখালী (১৮৮৫), কুমিল্লা (১৮৯১), ফরিদপুর (১৮৯২), জলপাইগুড়ি (ঐ), শ্রীহট্ট (১৮৯৪), দিনাজপুর (ঐ), খিদিরপুর (১৮৯৭), সিরাজগঞ্জ (১৮৯৮), পাবনা (১৯০৫)। এছাড়া, বীরভূম, নাটোর, উলুবেড়িয়াতেও (হুগলী) ছিল। বাংলার বাইরে পাটনা, পুনা, অমৃতসর, লাহোর, বেরেলী, ছাপরা, বদাউন, গুজরাট, জব্বলপুর, কানপুর, ওয়াজিরাবাদ, মূলতান, আম্বালা, পেশওয়ার, জলন্ধর, আজমীর, গুরুদাসপুর, লক্ষ্ণৌ, ভিজাগাপত্তম, রুড়কি প্রভৃতি স্থানের নাম পাওয়া যায়।[২৪৭] 'আঞ্জমনে ইসলাম' (১৮৮৬) নামে একটি প্রতিষ্ঠান লন্ডনেও ছিল। [২৪৮]

সংশোধিত 'লিস্ট অব এসোসিয়েশনস' (১৯২৩) থেকে জানা যায় ময়মনসিংহ, নোয়াখালী, কুমিল্লা, ফরিদপুর, জলপাইগুড়ি, দিনাজপুর এবং পাবনার আঞ্জমন

২৪৬. *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Ducoments,* pp. 288-94.

২৪৭. *The Moslem Chronicle,* 25 December 1896.

২৪৮. Jafar-ul-Islam – The Aligarh political Activities, *'The Journal of the Pakistan Historical Society,* January 1964.

পরবর্তীকালে সরকারের স্বীকৃতি লাভ করে।[২৪৯] সমিতিগুলির কোনো কোনোটির কলিকাতার 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। যেমন সিরাজগঞ্জের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' সেন্ট্রাল এসোসিয়েশনের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখত।[২৫০] উত্তর প্রদেশের সৈয়দ আহমদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক এসোসিয়েশনে'র সাথে ময়মনসিংহ ও রংপুরের আঞ্জমনে ইসলামিয়ার সম্পর্ক ছিল।[২৫১] ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা এবং রাজনীতি ছিল এগুলির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। মুসলমান সমাজের অনেক পদস্থ কর্মচারী ও গণ্যমান্য ব্যক্তি এগুলির সাতে জড়িত ছিলেন। তবে মোল্লা-মৌলবী শ্রেণীর প্রভাবও ছিল। নামের সাথে আরবির আলখাল্লা পরে আঞ্জমনগুলি স্বসমাজের স্বার্থকেই বড় করে দেখত। অনেক ক্ষেত্রে অনুভূতি ছিল স্পর্শকাতর, দৃষ্টিভঙ্গিও সাম্প্রদায়িক। এগুলি সমাজ স্বার্থের পরিপন্থী ঘটনাবলী নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সমালোচনা ও বিরোধিতা করেছে। ধর্মীয় শিক্ষার সমর্থনে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠার দিকে ঝোঁক ছিল বেশি। অনেকগুলি আবার দীক্ষিত ধর্মপ্রচারকের মাধ্যমে ইসলাম বিস্তারের চিন্তা করেছে। পুরাতন মূল্যবোধ নিয়ে এগুলি সমাজকে ধর্মহীনতা ও নৈতিক অধঃপতনের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছে সত্য ; কিন্তু আধুনিক জীবনের সাথে স্পর্শ না থাকায় সমাজের উন্নতিতে অধিক অবদান রাখতে পারেনি। এগুলি সমাজের পশ্চাদগামী শক্তি হিসাবেই কাজ করেছে। 'মুসলিম লিগ' (১৯০৬) গঠিত হওয়ার পর তার দেশব্যাপী প্রভাব পড়লে আঞ্জমনগুলি লীগের সাথে ক্রমশ মিশে যায়। সমালোচক লিখেছেন, "...Anjumans were organised which came to represent the small class of English educated Muslims together with a small section of the ecclesiastical and feudal elements. The Anjuman-i-Islamiats (Association of Islam) could be termed as the forerunner of the Muslim League before the latter became a mass organisation in the thirties and forties of the present century."[২৫২]

১. ময়মনসিংহ (১৮৭৫)

সময়ের দিক থেকে ময়মনসিংহের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' বেশ প্রাচীন, অথচ তার ইতিহাস আমাদের কাছে অজ্ঞাত। '১৯২৩ সালের সমিতি তালিকা'য় ময়মনসিংহের আঞ্জমন ইসলামিয়ার নাম পাওয়া যায়। ঐ সময় এর সভ্য সংখ্যা ছিল ৫১৩ ; করটীয়ার জমিদার ওয়াজেদ আলী খান পন্নী সভাপতি, নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, খান বাহাদুর মোহাম্মদ ইসমাইল ও স্যার এ. কে. গজনবী সহ-সভাপতি এবং শাহাবুদ্দীন আহমদ (ময়মনসিংহের উকিল) সম্পাদক ছিলেন। ময়মনসিংহের আঞ্জমান যে সুগঠিত ছিল, এতে

২৪৯. *Revision of the List of Associations*, pp. 30-32.
২৫০. *Muslim Comunity in Bengal*, p. 179.
২৫১. *Ibid.*, p. 205.
২৫২. N. K. Sinha–History of Bengal (1757–1905), p. 305.

তাই প্রমাণিত হয়। এটি ১৮৭৫ সালে স্থাপিত হয়, ঐ তালিকায় তার উল্লেখ আছে।[২৫৩] আবুল মনসুর আহমদ তাঁর আত্মকথায় ময়মনসিংহের আঞ্জমনের কিছু বিবরণ দিয়েছেন। তিনি ঐ সময় আঞ্জমনে ইসলামিয়ার সাথে জড়িত হয়ে পড়েন। এ. কে. গজনবী বাংলার ছোটলাটের এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলর নিযুক্ত হলে তাঁর স্থলে আবুল মনসুর আহমদ সহ-সভাপতি হন। তখনও ওয়াজেদ আলী খান পন্নী সভাপতি ও শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদক ছিলেন। আবুল মনসুর কংগ্রেসকর্মী ছিলেন ; ময়মনসিংহের আঞ্জমন ছিল কংগ্রেসের বিরোধী। তিনি বলেছেন যে, আদর্শগত বিরোধ থাকা সত্ত্বেও স্থানীয় মুসলমান ভ্রাতাগণের অনুরোধে তিনি এ পদ গ্রহণ করেন। বলাবাহুল্য, আঞ্জমনের সাথে তাঁর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। জেলার প্রজা-সমিতির কর্মী সম্মিলনে আঞ্জমন বিরোধী ভূমিকা নিলে তিনি সহ-সভাপতি পদে ইস্তেফা দেন।[২৫৪]

২. চট্টগ্রাম (১৮৮০)

'১৯২৩ সালের সমিতি তালিকা'য় 'দি ইসলাম এসোসিয়েশন' (চট্টগ্রাম ১৮৮০) নামে যে এসোসিয়েশনের উল্লেখ আছে, সেটিই চট্টগ্রামের 'আঞ্জমনে ইসলাম'। জমিদার থেকে কৃষক পর্যন্ত সমাজের সব স্তরের লোক আঞ্জমনের সদস্যভুক্ত ছিলেন।[২৫৫] ১৮৯৬ সালে পরাগলপুরেব জমিদার রৈসুন্নেসা খাতুনের সম্পত্তি ধ্বংসমুখী হলে আঞ্জমন তাঁর পক্ষ নিয়ে ছোটলাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির (১৮৯৫-৯৮) কাছে সুবিচার প্রার্থনা করে আবেদন জানায়। 'বোর্ড অব রেভিনিউ'র উপর বিষয়টি তদারক কবার দায়িত্ব ছিল। আঞ্জমন সেখানেও সুপারিশ করে।[২৫৬]

৩. নোয়াখালী (১৮৮৫)

নোয়াখালীর 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় টাঙ্গাইলের 'আখবারে এসলামীয়া' পত্রিকায়। ঐ পত্রের ২য় ভাগ ৬ সংখ্যায় (আশ্বিন ১২৯২) উক্ত আঞ্জমন সম্পর্কে নিম্নের সংবাদ প্রকাশিত হয় — "নোয়াখালীর গবর্নমেন্টের খাস তহশীলদার জনাব মৌলবি বদিউল আলম, জমীদার জনাব মৌলবি আবদুল আজিজ খাঁ সাহেবানের প্রযত্নে তথায় এসলামীয়া সভা নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে। পূর্ববঙ্গের নিঃস্ব এবং উপায়হীন মুসলমান বালকদিগকে শহরে রাখিয়া শিক্ষা প্রদান এবং আপনার সামাজিক উন্নতির প্রতি সভাটির সম্পূর্ণ লক্ষ্য। পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের শিক্ষা সম্বন্ধে যেরূপ শোচনীয় দুরবস্থা এমত অবস্থায় তাহাদের উন্নতির জন্য চেষ্টা করা হৃদয়বান হিন্দু-মুসলমানের একান্ত কর্তব্য। যাহারা এই সৎকার্যে যোগ দিয়াছেন তাহাদিগকে শত শত

২৫৩. *Revision of the List of Associations*, p. 31.
২৫৪. আবুল মনসুর আহমদ— *আমার দেখা রাজনীতির ত্রিশ বছর*, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৬৫-৬৮
২৫৫. ঐ, পৃ. ৪৯
২৫৬. The Moslem Chronicle, 22 August, 10 October 1895.

ধন্যবাদ দি। জিলার কালেক্টর ম্যাজিষ্ট্রেট এ. বড়ুয়া সাহেব, ইসলামীয়া সভায় ১০ টাকা দানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হইয়াছেন। খাস তহশীলদার জনাব মৌলবী বদিউল আলম সাহেবের পত্নী জনাব জমিলা খাতুন বিবি সাহেবা মুসলমান বালকগণের উপকারার্থে এককালে এক শত টাকা দান করিয়াছেন, বঙ্গীয় রমণী-সমাজ জনাব জমিলা খাতুনের অনুবর্তী হইলে বঙ্গের অনেক শুভ সাধিত হইবে।"

'সুধাকর' পত্রিকায় নোয়াখালীর 'জনৈক মুসলমান' প্রেরিত একটি পত্র (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৯) ছাপা হয়। ঐ পত্রে 'নোয়াখালী এসলামিয়া সভা'র ১ ডিসেম্বর ১৮৮৯ সালে অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। অধিবেশনটি হয় নোয়াখালীর খাস মহলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মোহাম্মদ বদিউল আলমের বাসগৃহে। শহরের শরীফ মুসলমানগণ সভায় উপস্থিত ছিলেন। ভূম্যধিকারী ও জেলাবোর্ডের সদস্য মোজাফফর আহমদ সভাপতি হন। সভায় নিম্নরূপ চারটি প্রস্তাব গৃহীত হয় (বদিউল আলম প্রস্তাবক ও ফজলল করিম সমর্থক ছিলেন) :

ক. বিলাতে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা প্রদানার্থ উপযুক্ত মুসলমান ছাত্র প্রেরণ সম্বন্ধে আন্দোলন ও অর্থ সংগ্রহেব জন্য কলিকাতাস্থ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের নিকট পত্র লিখা হউক।

খ. গোবধ নিবারণ সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইতেছে, তাহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন-পূর্বক শ্রীযুক্ত মুন্সী ওহাজদ্দিন আহমদ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এই সভা তাহার পূর্ণ আনুমোদন করিতেছেন, এবং ইহাও সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, এই সভার ব্যয়ে উক্ত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া তাহার ৪০০০ সংখ্যা বিনামূল্যে দেশমধ্যে বিতরিত হউক।[২৫৭]

গ. মীর মেশাররফ হোসেন 'গোজাতি নির্মূল আশঙ্কা' শীর্ষক যে সকল প্রবন্ধ আহমদীতে প্রকাশ করেন, তাহাতে মুসলমান ধর্ম বিগর্হিত অনেক কথা লিখিত হইয়াছে এবং লেখক ইচ্ছাপূর্বক মুসলমান ধর্মের প্রতি প্রথমে তীব্র কটাক্ষ পরে ভ্রূকুটি এবং অবশেষে অযথা ব্যঙ্গ বিদ্রূপও করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মৌলবী নৈমুদ্দিন সাহেব শাস্ত্রসম্মতরূপে উক্ত প্রবন্ধগুলির প্রতিবাদ করায়, মীর সাহেব তাঁহার নামে মানহানির যে মোকদ্দমা উপস্থিত করিয়াছেন, এই সভা তজ্জন্য মৌলবী সাহেবের প্রতি আন্তরিক ও অকৃত্রিম সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে। এই সভা ইহাও প্রকাশ করিতেছেন যে, মৌলবী সাহেব মোকদ্দমার ব্যয় সম্বন্ধে এই সভার আর্থিক সাহায্য গ্রহণ প্রয়োজনীয় বিবেচনা করিলে, যদি অনুগ্রহ করিয়া তাহা এই সভাকে জানান, তাহা হইলে এই সভা মৌলবী সাহেবের যথাসাধ্য আনুকূল্য করিবেন।

২৫৭. ওহাজুদ্দীন রচিত 'গো-বধে আপত্তি কেন' (১৮৯০) গ্রন্থখানি ঐ প্রবন্ধেরই ফল। তৃতীয় অধ্যায়ের 'সাহিত্য ও সাহিত্যিক' অংশে দ্রষ্টব্য।

ঘ. শ্রীযুক্ত মৌলবী মহম্মদ বদিওল আলম সাহেব বঙ্গবাসী মুসলমানদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে চট্টগ্রামে যে বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা মুদ্রিত হইয়া দেশের শিক্ষিত লোকদিগের মধ্যে প্রচারিত হউক।[২৫৮]

এই 'নোয়াখালী এসলামিয়া সভা' নোয়াখালীর 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' ছাড়া আর কিছুই নয়। সমাজের স্বার্থ সম্পর্কে আঞ্জমান সজাগ ছিল, উপরের প্রস্তাবগুলি থেকে তা বুঝা যায়। '১৯২৩ সালের সমিতি-তালিকা'য় নোয়াখালীর 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র উল্লেখ আছে। সেখানে এটিকে জমিদার, তালুকদার, আইনজীবী ও ব্যবসায়ীদের দ্বারা গঠিত সমাজ ও শিক্ষা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান বলা হয়েছে। [২৫৯]

৪. রংপুর (১৮৮৭)

১২ মাঘ ১২৯৬ সালের 'সুধাকরে' রংপুরের অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট তহমিনউদ্দীন আহমদ প্রেরিত একটি পত্রে রংপুরের 'আঞ্জমনে এসলামিয়া' সম্পর্কে নিম্নরূপ সংবাদ প্রকাশিত হয়। "রঙ্গপুরে কলিকাতার আঞ্জমনে এসলামিয়া সভার শাখা সভা মৌলবী সাহেবের (আবদুল খালেক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) যত্নে প্রায় ৩ বৎসর হইতে স্থাপিত হইয়া ক্রমশ বাক শক্তি পাইয়াছিলেন। উক্ত সভার সম্পাদকীয় ভার তিনি নিজেই গ্রহণ করিয়া যথোচিত পরিশ্রম করত একটি মাদ্রাসার ঘর চাঁদার দ্বারা প্রতিষ্ঠা করাইয়াছেন।"[২৬০] উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়, রংপুরের 'আঞ্জমনে এসলামিয়া' ১৮৮৭ সালে স্থাপিত হয়।

৫. কুমিল্লা (১৮৮৮)

'সুধাকরে' একটি পত্রে কুমিল্লার 'আঞ্জমনে এসলামিয়া'র একটি সভার (৬ পৌষ ১২৯৬) বিবরণ প্রকাশিত হয়। পত্র লেখক মোহাম্মদ ইসমাইল (চরখা, কুমিল্লা) আঞ্জমনের ইতিহাস প্রসঙ্গে লিখেছেন, "প্রায় ২ বৎসর হইতে চলিল অত্রত্য প্রধান বক্তা পীর আসরফউদ্দীন আহমদ ও বজলর রমহানের যত্নে ও উৎসাহে 'আঞ্জমনে এসলামিয়া' স্থাপিত হইয়াছে। প্রথম ২ কয়েক অধিবেশনে দেখিলাম, সভ্যগণের যত্ন অসীম, উৎসাহ অটল ; আশা হইল জাতীয় উন্নতি সাধনে সক্ষম হইবে। প্রস্তাব হইল প্রত্যেক পল্লীতেও ইহার শাখাসমূহ স্থাপিত হইবেক। আমাদের এ সভাও কলিকাতার আঞ্জমনে এসলামিয়া সভার শাখারূপে অবধারিত হইল। তথা হইতে চিঠিপত্র আনিয়া আমাদিগকে সোৎসাহিত করিতে লাগিল। ... দেখিতে দেখিতে আমাদের সেই নবীন আশা, সেই অতুল আনন্দরাশি নিরানন্দ কাল মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।"[২৬১] পত্রলেখকের প্রধান অভিযোগ সভ্যগণ সভায় নিয়মিত উপস্থিত হন না ও চাঁদা প্রদান করেন না।

---

২৫৮. *সুধাকর*, ১৩ পৌষ ১২৯৬

২৫৯. *Revision of the List of Associations*, p. 52.

২৬০. *সুধাকর*, ১২ মাঘ ১২৯৬

২৬১. *সুধাকর*, ২৭ পৌষ ১২৯৬

উপবের তথ্য থেকে আঞ্জমনের স্থাপন কাল যে ১৮৮৮ সাল, তা স্পষ্ট জানা যায়।[২৬২] পীর আশরফ উদ্দীন আহমদ ও বজলর রহমান এবং পত্র-লেখক মোহাম্মদ ইসমাইল ঐ সভার সঙ্গে জড়িত ছিলেন। কলিকাতার 'আঞ্জমনে এসলামিয়া'র সঙ্গে শাখা রূপে এর সম্পর্ক ছিল। উক্ত পত্রে সভায় গৃহীত দুটি প্রস্তাবের উল্লেখ আছে। প্রস্তাব দুটি ছিল এরূপ :

ক. প্রিন্স এলবার্ট ভিক্টর কলিকাতা উপস্থিত হইলে তাঁহাব অভ্যর্থনার্থ তথাকার আঞ্জমনে এসলামিয়া যে সভা আহ্বান করিবেন, তাহাতে কুমিল্লার আঞ্জমনে এসলামিয়ায় যোগদান ও অর্থ সাহায্য উচিত কিনা?

খ. কলিকাতার আঞ্জমনে এসলামিয়া সভায় যোগদান জন্য এখান হইতে কাহাকে প্রেরণ করা উচিত কিনা?[২৬৩]

সভায় কলিকাতার আঞ্জমনেব সভায় যোগদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং আরেফর রহমানকে প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়। ১৮৯০ সালে সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের জজ নিযুক্ত হলে কুমিল্লার আঞ্জমনের সভ্যগণ এক সভায় মিলিত হয়ে সরকাবকে ধন্যবাদ ও আমীব আলীকে অভিনন্দন জানিয়ে পত্র দেওয়াব প্রস্তাব গ্রহণ করেন।[২৬৪]

১৯০৩ সালে আঞ্জমনের সভাপতি ছিলেন কাজী রইজুদ্দীন মহম্মদ (জমিদাব)। ত্রিপুবাব সরাইলের সাব-বেজিস্ট্রার পদে একজন মুসলমান কর্মচারী নিয়োগ করার আবেদন জানিয়ে একটি 'স্মারকপত্র' (৫ মার্চ, ১৯০৩) সরকারের কাছে প্রদান করা হয়। আবেদনকারীদের মতে, তিন জন মুসলমান এ্যাপ্রিন্টিসের দাবি উপেক্ষা করে বাবু অক্ষয়কুমার গুহকে ঐ পদে নিয়োগ করা হয়। এতে মুসলমানদের স্বার্থক্ষুণ্ন হয় বলে তাঁরা অভিযোগ করেন। ঐ পত্রে কাজী রইজুদ্দীন মহম্মদ আঞ্জমনের পক্ষ থেকে স্বাক্ষর করেন।[২৬৫]

৬. ঢাকা

১৮৮৮ সালে ঢাকা 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র সভাপতি ছিলেন সৈয়দ আবদুল বারি এবং সম্পাদক শেখ হেদায়েত বক্স (তালুকদার ও ব্যবসায়ী)। কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগদানের ব্যাপারে উৎসাহিত করার জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৪৮-১৯২৫) ঢাকায় এলে সৈয়দ আবদুল বারির সভাপতিত্বে এক সভা হয়। তিনি কংগ্রেসের আসন্ন সম্মেলনে যোগদানের ব্যাপারে ঢাকার মুসলমান সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন জানান।[২৬৬]

২৬২. ১৯২৩ সালে সমিতি তালিকায উক্ত আঞ্জমনেব স্থাপনেব সময় বলা হয়েছে ১৮৯১ সাল, কিন্তু ঐ তারিখটি যথার্থ নয়।
২৬৩. *সুধাকব*, ২৭ পৌষ ১২৯৬
২৬৪. ঐ, ১২ মাঘ ১২৯৬
২৬৫. *The Moslem Chronicle*, 18 July 1903.
২৬৬. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, p. 117.

শেখ হেদায়েত বক্স আঞ্জমনের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি হিসাবে ১৮৮৯ সালে বোম্বাই-এর কংগ্রেস সম্মেলনে যোগদান করেন।[২৬৭] ঢাকার আঞ্জমন যে কংগ্রেসেব সমর্থক ছিল, এসব তথ্য থেকে তা স্পষ্ট প্রতীত হয়। আঞ্জমনটি ১৮৮৮ সালে অথবা তৎপূর্বে স্থাপিত হয়ে থাকবে। ঢাকার আঞ্জমনের অস্তিত্ব ১৯৩৩ সালেও ছিল ; তা জানা যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্টের সদস্য তালিকা (১০ আগস্ট ১৯৩০-৯ আগস্ট ১৯৩৩) থেকে। আঞ্জমনের পক্ষ থেকে সৈয়দ আবদুল হাফিজ ও কাজী আবদুর বশিদ বিএ ঐ কমিটির সদস্য মনোনীত হন।[২৬৮]

৭. ফরিদপুর (১৮৯২)

১৮৯৫ সালের ৪ এপ্রিল তারিখে 'মোসলেম ক্রনিকলে' 'ফরিদপুরের আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র সম্পাদকের লেখা একটি আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়। 'গোরক্ষিণী সভা'র ফরিদপুর শাখার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ 'কসাই দ্বারা গো-হত্যা' শিরোনামে একটি 'বিলিপত্র' প্রচার করেন। এতে হিন্দু-সম্প্রদায়ের কাছে আবেদন করা হয়েছে যে, তাঁরা যেন মুসলমান কসাই-এর কাছে হাটে-বাজারে গরু বিক্রয় না করে। গো-দেবতার জীবনরক্ষা করা তাঁদের ধর্মীয় কর্তব্য। বিলিপত্রের তারিখ ছিল 'ফরিদপুব ১৫ ফাল্গুন, ১৩০১'। এর প্রতিবাদে 'আঞ্জমনে ইসলামিযা'র সভা হয়। সভার সিদ্ধান্ত ঐ আবেদনপত্রেব মাধ্যমে জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে জানান হয়। আঞ্জমানের সম্পাদক লিখেছেন, "I have been directed by the members of the Anjuman-i-Islam, Faridpore, to bring to your kind notice the fact that cow-killing question has been the source of constant disputes between the Hindus and the Muhammadans of Behar and other provinces of upper India But fortunately the Eastern Bengal was quite free from those riots upto this time. ...Recently placards are being circulated. .. inciting the people to exert their best to stop cow-killing any how they can. The result of the circulation and notification has been that the powerful Hindu Zamindars are combining themselves to prevent the sale of cows to butchers and the killing of them in their Zamindari Mohallas If the Hindus combine to prevent cow-killing, Muhammadans are not likely to yield ; thus the result will be a constant dispute and ill-feeling between two communities so long living in peace and amity in eastern Bengal."[২৬৯]

এরূপ আপত্তিকর বিলিপত্র প্রচার বন্ধ করার আবেদন জানিয়ে পত্র শেষ করা হয়েছে। পত্রে সম্পাদকের নাম নেই। মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯০১ আঞ্জমনের এক শোকসভা অনুষ্ঠিত হয়। এবং দুঃখ প্রকাশ করে শোক প্রস্তাব

২৬৭. *Muslim Community in Bengal*, p. 381.
২৬৮. *The Calendar Vol.* 1, Dacca University, Dacca, p. 14.
২৬৯. *The Moslem Chronicle*, 4 April 1895.

নেওয়া হয়। ঐ সময় আঞ্জুমনের সভাপতি ছিলেন আলিমুজ্জামান চৌধুরী (জমিদার) ও সম্পাদক ছিলেন এসকান্দর আলী (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট)।[২৭০] ফরিদপুরের আঞ্জুমনে ইসলামিয়া খুব সুগঠিত ছিল। '১৯২৩ সালের সমিতি তালিকা'য় দেখা যায়, আঞ্জুমনের সদস্যসংখ্যা ছিল ৭১৫। তাতে বলা হয়েছে, সদস্যদের অধিকাংশ ছিলেন জমিদার, জোতদার, তালুকদার ও কৃষক শ্রেণীর লোক। [২৭১]

৮ জলপাইগুড়ি (১৮৯২)

'ইসলাম প্রচারকে'র এক সংবাদে লেখা হয়, "ব্রিটন সন্তান মৌলবী সেরাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের যত্নে জলপাইগুড়ি সহরে 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' নামক একটি জাতীয় ধর্মসভা স্থাপিত হইয়াছে। স্থানীয় খ্যাতিমান জমীদার শ্রীযুক্ত মুন্সী রহিম বক্স পেস্কার সাহেব উহার সভাপতি পদে বরিত হওয়াতে, সভার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই।"[২৭২] ১৯২৩ সালের সমিতি তালিকায় জলপাইগুড়ির 'আঞ্জুমনে ইসলামিয়া'র নাম আছে। তাতে এর প্রতিষ্ঠার কাল দেওয়া হয়েছে ১৮৯২ সাল। এতে বলা হয়েছে যে, ব্রিটিশ সরকারের আনুগত্যে থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের সমাজ, রাজনীতি ও শিক্ষার উন্নতি সাধন এবং সমাজের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষা করা ঐ আঞ্জুমনের উদ্দেশ্য।[২৭৩]

৯. শ্রীহট্ট (১৮৯৪)

১৮৯৪ সালের ৮ জুন শ্রীহট্টের মৌলভিবাজারে 'আঞ্জুমনে ইসলামিয়া' স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক ছিলেন কাজী মোহাম্মদ আহমদ।[২৭৪] ১৮৯৬ সালের ২৩ মার্চ আঞ্জুমনে ইসলামিয়া 'আঞ্জুমন মাদ্রাসা' স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি সাধারণ সভার আয়োজন করে। সভায় জেলা কমিশনার পি. এইচ. ও ব্রায়েন, জেলা জজ আর. এইচ. গ্রীভস, স্থানীয় মিশনারী রেভারেণ্ড জে. পি. জোনস্, পুলিশ ইনস্পেক্টর ই. এ. এল. কেম্প, জমিদার হাজি মজিদ বখত মজুমদার জজকোর্টের পেস্কার, হাজি জহুর আলী ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। আবদুল হালিম, মাসদের আলী (উকিল) প্রমুখ বক্তৃতা করেন। আঞ্জুমনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের কথা বর্ণনা করে সম্পাদক একটি রিপোর্ট পাঠ করেন। মূল লক্ষ্য হলো, জেলার মুসলমান সমাজের মঙ্গল সাধন ও উন্নতি বিধান। মাদ্রসা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করেন 'মোসলেম ক্রনিকলে' সে সম্পর্কে বলা হয় : "But the immediate object is to give the Musalman youth a preliminary moral and religious training previous to their admission into English Schools with a view to enable them to understand

২৭০. *Ibid.*, 9 February 1901.
২৭১. *Revision of the List of Associations*, p. 31.
২৭২. *ইসলাম-প্রচারক*, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯।
২৭৩. *Revistion of the List of Associations*, p. 39.
২৭৪. সৈয়দ মর্তুজা আলী—*'শ্রীহট্টের ইতিহাস', বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮

the fundamental principles of their own religion and appoint a preacher for the purpose of lecturing on the doctrines of Islam in all districts and to guide and control the action of travelling preachers, who time to time visit the place."[২৭৫] পূর্ববঙ্গে 'তবলিগ প্রথা' প্রচলিত ছিল। তবলিগ পন্থীরা স্থানে স্থানে ভ্রমণ করে ধর্মচর্চা ও প্রচার করে থাকেন। এঁদের খাঁটি ইসলামের ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়ার জন্য ধর্ম প্রচারক নিয়োগের কথা ঐ রিপোর্টে বলা হয়েছে। ইংরাজি বিদ্যালয়ে ভর্তির আগে মুসলমান ছাত্রদের ইসলামের মৌলিক নীতিগুলি শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন আছে বলে তাতে উল্লেখ করা হয়েছে। ধর্মশিক্ষাকে শরীয়ত সম্মত করা এবং ধর্ম শিক্ষার সঙ্গে ইংরাজি শিক্ষার সমন্বয় সাধন করার প্রয়াসেই 'আঞ্জমন মাদ্রাসা'র পরিকল্পনা। ১৯০২ সালে এর সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আবদল মজিদ বিএ, বিএল। তিনি পরে এর সভাপতির পদও অলংকৃত করেন।[২৭৬]

১০. পাবনা

১৯২৩ সালের সমিতি তালিকায় পাবনার 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র স্থাপনের সময় ১৯০৫ সাল বলা হয়েছে।[২৭৭] কিন্তু এটি ঠিক নয়। ১২৯৬ সনের ২৬ মাঘ সংখ্যায় 'সুধাকরে' প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায় সৈয়দ আমীর আলী কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারক নিযুক্ত হলে তাঁকে অভিনন্দন জানাবার জন্য পাবনার 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' এক সভায় মিলিত হয়। সব-রেজিস্ট্রার রসিদন্নবি এবং অনুবাদক আবদুল হাই আঞ্জমনের যথাক্রমে সভাপতি ও সম্পাদক ছিলেন বলে ঐ সংবাদে উল্লেখ আছে।[২৭৮] ১২৯৬ সনে (১৮৮৯) পাবনায় আঞ্জমনের অস্তিত্ব ছিল, তা ঐ সংবাদ থেকে প্রমাণিত হয়।

১১. সিরাজগঞ্জ (১৮৯৮)

পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। স্থানীয় জমিদার ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ মিলে এটি স্থাপন করেন। মুসলমান সমাজের সার্বিক উন্নতিসাধনের লক্ষ্য নিয়ে তাঁরা আঞ্জমনের ছত্রচ্ছায়ায় সমবেত হন। 'মোসলেম ক্রনিকলে' প্রকাশিত মোহাম্মদ বরকতুল্লাহর একটি পত্র থেকে (৬ সেপ্টেম্বর ১৮৯৮) জানা যায়, সেপ্টেম্বর মাসের ৫ তারিখে সিরাজগঞ্জের মাদ্রাসার চত্বরে আঞ্জমনের একটি সভা হয়। সরকারের কাছে স্বসমাজের অভাব-অভিযোগ তুলে ধরাই এর প্রধান লক্ষ্য ছিল। পত্রলেখক জানান যে, কলিকাতার 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সাথে একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবে। ঐ সময় এর সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০। এ পত্র থেকে আঞ্জমনের কার্যকরী কমিটির সদস্যদের নাম পাওয়া যয়। তাঁরা হলেন,

২৭৫. *The Moslem Chronicle*, 16 May 1896
২৭৬. *শ্রীহট্ট-প্রতিভা*, পৃ. ২৭
২৭৭. *Revision of the List of Assocications*, p. 41.
২৭৮. ***সুধাকর*, ২৬ মাঘ ১২৯৬**

সম্পাদক—সৈয়দ হোসেন উদ্দীন আহমদ, জমিদার (রায়পুর)

সহকারী সম্পাদক—সৈয়দ আবদুল গাফফার, জমিদার (ঐ)

যুগ্ম সম্পাদক—মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

সদস্য—মোহাম্মদ খলিল উদ্দীন আহমদ, শাহাবুদ্দীন আহমদ, আফাজুদ্দীন (মোক্তার), মোহাম্মদ আবদুল বাকি, হায়দার আলী আহমদ, মীর জয়নুল আবেদিন, বসিরুদ্দীন খান ও গোলাম আজম (মোক্তার)। [২৭৯]

১৯০০ সালে 'দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে' চাঁদা সংগ্রহের যে প্রচেষ্টা হয়, তাতে আঞ্জমনের সহকারী সম্পাদক সৈয়দ আবদুল গাফফার সিরাজগঞ্জ থেকে চাঁদা আদায় করেন।[২৮০]

১৯০৬ সালের ৩ অক্টোবর আঞ্জমনের উদ্যোগে সিরাজগঞ্জে একটি জনসভা হয়। সভার উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গভঙ্গের প্রথম বর্ষপূর্তি উদযাপন। মুনশী মেহেরুল্লা সেখানে বক্তা ছিলেন। সভায় একটি প্রস্তাব নেওয়া হয় যে আসন্ন ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের প্রথম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে একটি আনন্দ মিছিল বের করবে, কেননা ঐদিন এমন একটি নতুন প্রদেশ তৈরি হয়েছে যেখানে সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলমান সমাজ ইতিমধ্যে অনেক উপকাব পেয়েছে। এ প্রস্তাবটি মুসলমান ম্যারেজ রেজিস্ট্রার মতিয়র রহমান উত্থাপন করেন, মাদ্রাসার মৌলবী এ. এম. মোয়াইজ সমর্থন দেন। অপর প্রস্তাবটি ছিল, ইসমাইল হোসেন (সিরাজী) বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পক্ষে যোগদান করে স্থানীয় লোককে সে আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য প্রচারকার্য চালাচ্ছেন ; সভা তাঁর সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক অস্বীকার করেছে। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সমর্থন করেন মুনশী মেহেরুল্লা। [২৮১]

সিরাজগঞ্জের আঞ্জমন ১৯২৪ সালেও সক্রিয় ছিল। ১৯২৩ সালের এপ্রিলে চিত্তরঞ্জন দাসের উদ্যোগে হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক সৌহার্দ্য রক্ষার জন্য 'বেঙ্গল প্যাক্ট' হয়। কংগ্রেসের প্রকাশ্য সমর্থন পাওয়ার জন্য চিত্তরঞ্জন ১৯২৪ সালের জুন মাসে সিরাজগঞ্জে প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্মিলন আহ্বান করেন। মৌলানা আকরম খাঁ ঐ সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। ইসমাইল হোসেন কংগ্রেসের সমর্থক হয়েও সিরাজগঞ্জের এই অধিবেশনের বিরোধী ছিলেন। আবুল মনসুর আহমদ বলেছেন যে সিরাজগঞ্জের 'আঞ্জমনী মুসলমানরা' কংগ্রেসের উক্ত অধিবেশন পণ্ড করার চেষ্টা করে, কেননা তারা কংগ্রেসের সব কিছুই সন্দেহের চোখে দেখত। শেষ পর্যন্ত ইসমাইল হোসেন সিরাজী নিরপেক্ষ ভূমিকা নেন এবং কংগ্রেস অধিবেশন সফল হয়।[২৮২]

১২. উলুবেড়িয়া (হাওড়া)

২৭৯. *The Moslem Chronicle,* 17 September 1898

২৮০. *ইসলাম প্রাচরক,* চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৬-০৭

২৮১. Public Letters from India, 1906 , *Muslim Community in Bengal,* p. 312

২৮২. আবুল মনসুর আহমদ—*আমার দেখা রাজনীতির পঞ্চাশ বছর,* পৃ. ৫১-৫৭ (৩য় সং)।

উলুবেড়িয়া 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র প্রতিষ্ঠার সময় জানা যায় না। 'মোসলেম ক্রনিকলে' (২৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬) আঞ্জমনের সম্পাদক নুরুল হকের একটি পত্র ছাপা হয়। আমতার তৎকালীন সব-রেজিস্ট্রারের দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে ঐ পত্র লেখা হয়।

১৩. পাণ্ডুয়া (হুগলী)

'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র একটি শাখা হুগলী জেলার পাণ্ডুয়ায ছিল। ২১ মার্চ ১৮৯৫ সালের মোসলেম ক্রনিকলে প্রকাশিত এক সংবাদ থেকে জানা যায়, ঐ সময় সমিতির সম্পাদক ছিলেন মাহমুদুন্নবী। সমিতির এক সাধারণ সভায় স্থির হয় যে, এন্ট্রান্স বা এফএ পরীক্ষায় আরবি বা ফারসিতে যে মুসলমান ছাত্র সর্বোচ্চ নম্বর পাবে, তাকে একটি ২০ টাকা মূল্যের রৌপ্য পদক দেওয়া হবে।

১৪. বীরভূম

বীরভূমের 'আঞ্জমনে ইসলামিয়া'র সম্পাদক ছিলেন বীরভূমের প্রভাবশালী জমিদার সৈয়দ এরফান আলী। ১৯০৫ সালে বঙ্গ বিভাগের সময় ভারত সরকার দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও গণ্যমান্য ব্যক্তির মতামত চেয়ে পত্র লেখেন। বীরভূমের আঞ্জমনের পক্ষ থেকে সৈয়দ এরফান আলী বড়লাটের সচিবকে পত্র দেন (৭ আগস্ট ১৯০৫)। তিনি ঐ বঙ্গবিচ্ছেদের স্বপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন।[২৮৩] 'বীরভূম মাদ্রাসা-ই-ইসলামিয়া' আঞ্জমনেব উদ্যোগে স্থাপিত হয। ১৯০৩ সালের ১০ জুলাই মাদ্রাসাটি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়। সৈয়দ এরফান আলী এ বিষয়ে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। [২৮৪]

বিবিধ

এছাড়া আরও কতকগুলি ধর্মসভা দেশের নানা জায়গায় ছড়িয়েছিল, যেগুলির নামধাম পাওয়া যায় কিন্তু বিশেষ পরিচয জানা যায় না। 'আঞ্জমনে আহম্মদী' (রাজশাহী), 'আঞ্জমনে তাইদে ইসলাম' (নদীয়া ও নাটোর), আঞ্জমনে রেয়ায়েতে ইসলাম' (কুমিল্লা), আঞ্জমনে মোখায়েরুল ইসলাম' (কলিকাতা ও সিরাজগঞ্জ), 'আঞ্জমনে মোজাকারিয়া ইসলামিয়া' (বীরভূম), 'দরিদ্র বান্ধব ইসলাম ধর্মসভা' (যশোহর) 'কুমারখালী আঞ্জমনে এত্তেফাক এসলাম' (কুষ্টিয়া) ইত্যাদি।

'আঞ্জমনে আহমদী' সম্পর্কে 'ইসলাম প্রচারকে' লেখা হয়েছে — "রাজশাহী জেলার অন্তর্গত বিয়াঘাট নামক স্থানে যে মুসলমান সভা স্থাপিত হয়েছে, উহার নাম 'আঞ্জমনে আহম্মদী'। এই সভা নাটোরের 'আঞ্জমনে তাইদে ইসলামীয়া' নামক সভার শাখারূপে বিরাজ করিতেছে। সভার কার্য উত্তমরূপে চলিতেছে।"[২৮৫] আহমদী সমর্থকদের সাথে

২৮৩. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, p. 152.
২৮৪. *The Moslem Chronicle*, 11 July 1903.
২৮৫. ***ইসলাম প্রচারক*, আশ্বিন ১২৯৬**

বাউলপন্থীদের দ্বন্দ্ব ছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বাউলরাই অধিক মারমুখী ছিল। ইসলাম প্রচারকের এক সংবাদ প্রতিবেদনে লেখা হয়, "আঞ্জমনে আহমদী" সভার কার্যপরিচালকগণ আমাদিগকে লিখিয়া জানাইয়াছেন যে, ঐ অঞ্চলের ... সাধুজমাতভুক্ত লোকগুলি নমাজ রোজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধাচারী। ইহারা নমাজ রোজা প্রভৃতি কার্যকে বাহুল্য মনে করে এবং লোকদিগকে ঐরূপ বিপথে লইবার চেষ্টা করে। আমরা দেখিতেছি — এই 'ফকীরমতাবলম্বী' লোকগুলি পবিত্রধর্মের পবিত্র জ্যোতি দিন দিনই বিনষ্ট করিতেছে। সকলেরই ইহাদের হাত হইতে আত্মরক্ষা করা উচিত।"[২৮৬] ১২৯৮ সন অথবা তার কিছুকাল আগে 'আঞ্জমনে আহম্মদী' স্থাপিত হয়েছিল, তা উপরের উদ্ধৃতি থেকে বুঝা যায়। এ সময়ের দিকে রাজশাহীতে 'নূর-অল ইমান সমাজ' ও আঞ্জমনে হেমায়েতে ইসলাম' স্থাপিত হয়। আঞ্জমনের সমর্থকগণ শরীয়তপন্থী। তাঁরা ধর্মীয়ভাবে সচেতন ছিলেন। ঐ অঞ্চলে 'ফকীর মতাবলম্বী' তথা বাউলদের প্রভাবের চিত্রটিও সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ।

নাটোরের 'আঞ্জমনে তাইদে ইসলামিয়া' সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির জুন, ১৯০০ সালের কার্যবিবরণীতে নাটোরের 'আঞ্জমনে ইসলাম' নামের একটি সমিতির উল্লেখ আছে। আঞ্জমনের পক্ষ থেকে এরশাদ আলী খান চৌধুরী (জমিদার) সোসাইটির প্রস্তাব সমর্থন করে আবজর রহমানকে পত্র দেন।[২৮৭] জমিদার চৌধুরী সম্ভবত ঐ সভার সভাপতি ছিলেন। আঞ্জমনে ইসলাম ও আঞ্জমনে তাইদে ইসলামিয়া একই প্রতিষ্ঠান ছিল বলে অনুমিত হয়। নদীয়ার আঞ্জমনে তাইদে ইসলাম সম্পর্কে ইসলাম প্রচারকে লেখা হয়, 'নদীয়ার শান্তিপুরের কতিপয় উৎসাহী যুবক 'আঞ্জমনে তাইদে ইসলাম' নামক এটি সভা স্থাপন করিয়া ধর্ম বিষয়ের উৎকর্ষ সাধনে মনোযোগী হইয়াছে।"[২৮৮] ১২৯৮ বঙ্গাব্দ অথবা তার কাছাকাছি সময়ে এটি স্থাপিত হয়েছিল।

'আঞ্জমনে রেয়ায়েতে ইসলাম' ত্রিপুরা জেলার (বর্তমান কুমিল্লার) অন্তর্গত গোকর্ণ গ্রামে স্থাপিত হয়। সৈয়দ শামসুল হোদা (উকিল, কলকাতা হাইকোর্ট) গোকর্ণে জন্মগ্রহণ করেন। সৈয়দ সাদউল্লা ছিলেন আঞ্জমনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ইসলাম প্রচারক এর কার্যরীতি সম্পর্কে লিখেছে, "...'আঞ্জমনে রেয়ায়েতে ইসলাম' এই অল্প সময়ের মধ্যে অনেক কার্য করিয়াছেন। সভার যত্নে ধর্মের প্রতি লোকের আস্থা দিন দিন বাড়িতেছে। নমাজ রোজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানে সকলেই প্রাণের সহিত যোগদান করিতেছে। সম্পাদক

২৮৬. ঐ।
২৮৭. Abstract of the Proceedings of an Extra-ordinary Meeting of the committee of the Mahomedan Literary Society of Calcutta, 9 June 1900, p. 48.
২৮৮. *ইসলাম প্রচারক*, ভাদ্র ১২৯৮

জনাব মৌলবী সৈয়দ সাদউল্লা সাহেব এই সভার প্রাণ প্রতিষ্ঠাকারক।"[২৮৯] এটিকেও আমরা উনিশ শতকের নব্বই দশকের গোড়ার দিকে স্থাপিত বলে চিহ্নিত করতে পারি।

সিরাজগঞ্জে 'আঞ্জমনে মোখায়েরুল এসলাম' নামে একটি সভার নাম পাওয়া যায় 'প্রচারক' পত্রিকায় (কার্তিক ১৩০৭)। মহামান্য আমির-উল-মোমেনিন, খলিফাতুল মোসলেমিন গাজী আবদুল হামিদ খানের 'রৌপ্য জুবিলী' উপলক্ষে ঐ আঞ্জমনের একটি সভা হয় (৩১ আগস্ট ১৯০০)। এতে ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'রৌপ্য জুবিলী' শীর্ষক একটি দীর্ঘ কবিতা পাঠ করেন।[২৯০] কলিকাতায় 'আঞ্জমনে মোখায়েরুল এসলাম' নামে একটি সভার নাম পাওয়া যায়। সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। আঞ্জমন 'দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে'র চাঁদা সংগ্রহে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। 'ইসলাম প্রচারকে' লেখা হয়, 'আঞ্জমনে মোখায়েরুল ইসলামে'র উদ্যোগে সমগ্র বঙ্গদেশ ব্যাপিয়া চাঁদা আদায়ের প্রবল আন্দোলন উপস্থিত হইতেছে।"[২৯১] পত্রিকায় বলা হয় যে আঞ্জমনের প্রযত্নে মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, মহীপুরের জমিদার খান বাহাদুর আবদুল মজিদ চৌধুরী, ঘোড়াশালের আবদুল কবীর, বিক্রমপুরের সৈফুদ্দীন আহমদ, সিরাজগঞ্জের জমিদার সৈয়দ আবদুল গফফার, রংপুর চিলাহাটির জমিরুদ্দীন আহমদ, শিকারপুরের (বগুড়া) মোহাম্মদ এব্রাহিম, বারঘরিয়ার (মালদহ) জমিদার হাসিফুদ্দীন মিয়া নিজ নিজ এলাকায় সভা সমিতির সাহায্যে চাঁদা সংগ্রহ করেন।[২৯২]

১৯২৩ সালের সমিতি তালিকায় বীরভূমের 'আঞ্জমনে মোজাকারিয়া ইসলামিয়া'র স্থাপনের কাল আছে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দ। তালিকায় বলা হয় যে, মুসলমান সমাজের স্বার্থ ও হিতচিন্তা ছিল আঞ্জমনের উদ্দেশ্য। জমিদার, জোতদার, ডাক্তার, উকিল, মৌলভী ও অন্যান্য ব্যক্তি এর সদস্যভুক্ত ছিলেন।[২৯৩]

'রংপুর ইসলাম মিশন' নামে একটি প্রতিষ্ঠানের কথা মুহম্মদ আবু তালিব উল্লেখ করেছেন। ঐ মিশনের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মহিপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী।[২৯৪] মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী লিখেছেন, "রংপুরের স্বনামখ্যাত জমিদার স্বজাতি বৎসল মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী আবদুল মজিদ চৌধুরী খান বাহাদুর সাহেব একটি প্রচার সমিতি স্থাপন পূর্বক তদধীনে একটি প্রচার ফণ্ডের ভিত্তিও স্থাপন করিয়াছেন। তিনি স্বয়ং দৃষ্টান্ত স্বরূপ সর্বপ্রথম বার্ষিক ৬০০ টাকা আয়ের একটি ভূসম্পত্তি এই মিশন ফণ্ডের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন।"[২৯৫] ইসলাম ধর্ম প্রচার মিশনের লক্ষ্য ছিল।

২৮৯. ঐ।
২৯০. *প্রচারক*, কার্তিক ১৩০৭
২৯১. *ইসলাম প্রচারক*, চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৬-০৭
২৯২. ঐ।
২৯৩. *Revision of the List of Associations*, p. 21.
২৯৪. পূর্বোক্ত, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ১২শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৪, পৃ. ১৪
২৯৫. পূর্বোক্ত, *ইসলাম প্রচারক*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০

১৩১২ সনে 'কুমারখালী আঞ্জুমনে এত্তেফাক এসলামে'র অস্তিত্ব ছিল, তা কবি মোজাম্মেল হকের 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৯১২) গ্রন্থ থেকে জানা যায়। ঐ কাব্যের দুটি কবিতা 'আনন্দবাজার' ও 'উত্থানসঙ্গীত' উক্ত আঞ্জুমনের অধিবেশন উপলক্ষে রচিত হয়। প্রথমটি ১৩১২ সালের অধিবেশনে এবং দ্বিতীয়টি ৪র্থ বার্ষিক সভায় পঠিত হয়।[২৯৬] 'বোলবোলে বাঙ্গলা' ছদ্মনামে মোজাম্মেল হক 'আল্লার শত নাম ও নামের মাহাত্ম্য' (শ্রাবণ ১৩১৭) নামে একখানি ক্ষুদ্র কবিতা-পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পুস্তিকাখানি 'কুমারখালী আঞ্জুমনে এত্তেফাক এসলামের সুযোগ্য সেক্রেটাবি অকৃত্রিম সমাজহিতৈষী, ধর্মভীরু, কর্মবীর ... উদার চরিত সুহৃদয় জনাব মৌলবী সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস রুমী সাহেব'কে উৎসর্গ করা হয়েছে।[২৯৭] শেখ আবদুর রহিমের 'হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি' গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্কবণে (১৯১৩) আবদুল কুদ্দুস রুমীর প্রদত্ত একটি 'প্রশংসাপত্র' (২৫.১.১৩২০) আছে। সেখানে মৌলানা রুমীকে 'নদীয়া আঞ্জুমনে এত্তেফাকে এসলামের সুযোগ্য সেক্রেটারি, নদীয়া ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের মেম্বর ও সুপ্রসিদ্ধ বক্তা' বলা হয়েছে।[২৯৮] সম্প্রতি প্রকাশিত 'কুষ্টিয়া : ইতিহাস-ঐতিহ্য' নামক গ্রন্থে 'কুমারখালী আঞ্জুমন এত্তেফাক ইসলামে'র প্রতিষ্ঠা লাভের সময় ১৯০৪ সাল বলা হয়েছে। খাকসার নিবাসী সৈয়দ আবুল কুদ্দুস রুমী এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। 'সমাজ সংস্কারমূলক সংস্থা'টির প্রধান দপ্তর ছিল দুর্গাপুরে, দুর্গাপুরের আম-বাগানে আঞ্জুমনেব সভা-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হত।[২৯৯]

ময়মনসিংহের শেরপুরে 'আঞ্জুমনে নূরল ইসলাম' (১৮৯০) স্থাপিত হয়। 'সুধাকর' পত্রিকায় একটি সংবাদে লেখা হয় : "চারুবার্তা পাঠে জানা গেল, ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সেরপুব টাউনের মুসলমান অধিবাসীগণের যত্নে বিগত ২৯-এ পৌষ (১২৯৬) রবিবার পূর্বাহ্ন ৮ ঘটিকা হইতে ১২ ঘটিকা পর্যন্ত 'আঞ্জমনের নূরল ইসলাম' নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় সভার অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। এই সভার প্রধান উদ্দেশ্য একটি মসজিদ ও একটি মাদ্রাসা স্থাপন। উক্ত মাদ্রাসায় আরবি, পারসি, উর্দু এবং বাঙ্গালা ভাষা অধীত হইবে।"[৩০০] শেরপুবেব জমিদার হরচন্দ্র চৌধুরী ৫০ টাকা চাঁদা দেন বলে ঐ সংবাদে উল্লেখ আছে।

১৩০৮ সনের ২৬ মাঘ কলিকাতা কড়েয়া মহল্লায় সম্ভ্রান্ত মুসলমানগণ একটি সভা স্থাপন করেন। সভার উদ্দেশ্য 'দুনিয়াবী হিত' সাধন। ১৬২ কড়েয়া রোডে এর অস্থায়ী কার্যালয় স্থাপিত হয়। কার্যকরী কমিটির গঠনটি ছিল এরূপ :

সভাপতি—নসিরুদ্দীন আহমদ
সহ-সভাপতি—মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও আবদুর রাজ্জাক
সম্পাদক—দিদার বক্স

২৯৬. মোজাম্মেল হক—*জাতীয় ফোয়ারা,* কলিকাতা, ১৩১৯ পৃ. ৬০, ১২৯

২৯৭. মোজাম্মেল হক—*আল্লাব শতনাম ও নামের মাহাত্ম্য,* শান্তিপুর, ১৩১৭ ; "উপহার' অংশ দ্রষ্টব্য।

২৯৮. শেখ আবদুর রহিম—*হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি,* কলিকাতা, ১৯২৬ (৬ সং), পৃ. ৯৫৯

২৯৯. আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত— *কুষ্টিয়া : ইতিহাস-ঐতিহ্য,* কুষ্টিয়া ১৯৭৮, পৃ. ১৬১

৩০০. *সুধাকর,* ১২ মাঘ ১২৯৬

ম্যানেজার—আকবর আলী
সহকারী ম্যানেজার—হবিবর রহমান
ট্রেজারার—ডাক্তার শেখ রওশন আলী
সদস্যবৃন্দ—নাদেব হোসেন, ডাক্তার করিম বক্স, হেকিম এমাম আলী, মোহাম্মদ জান ও ডাক্তার আহমদ। [৩০১]

আট আনা মাসিক চাঁদা ধার্য হয়। প্রতি শনিবার সভার নিয়মিত অধিবেশন হবে, স্থির হয়। 'মিহিব ও সুধাকর' নব-প্রতিষ্ঠিত সভার উক্ত সংবাদ পরিবেশন করে মন্তব্য করেছে, "এই সভার অধিকাংশ মেম্বরই প্রবীণ, জ্ঞানী ও বহুদর্শী, এজন্য আশা করা যায় যে, ইহাদের দ্বারা সমাজের অনেক হিতানুষ্ঠান হইতে পারিবে।"[৩০২] মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের নাম সুপরিচিত ; তাঁর নিজস্ব 'রেয়াজ-উল ইসলাম প্রেস'টি ৪ কড়েয়া গোরস্থান রোডে অবস্থিত ছিল। ডাক্তার শেখ রওশন আলী 'মোহাম্মদীয় বিবাহ সমিতি'র সম্পদক ছিলেন। 'উপযুক্ত পাত্র-পাত্রীর মধ্যে বিবাহ সংগঠন এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল।'[৩০৩] হেকিম, ডাক্তার মিলে মোট ৪ জন চিকিৎসাবিদ ঐ কমিটিতে ছিলেন। 'মিহির ও সুধাকরে'র উক্ত বিবরণীতে সভাটির নাম উল্লিখিত হয়নি।

বিভিন্ন বিষয়ক ছোটখাটো সভা-সমিতি আরও অনেক ছিল—যেমন 'দি সিলেট এসোসিয়েশন' (শ্রীহট্ট), 'মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি' (মেদিনীপুর), 'চিলাহাটী মুসলমান সভা' (রংপুর), 'কোহিনুর সাহিত্য সমিতি' (ফরিদপুর)।

শ্রীহট্টে ১৮৯৬ সালে, 'দি সিলেট এসোসিয়েশন' নামে একটি সমিতি স্থাপিত হয় ; যাঁরা ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিতে ইংলন্ডে যাবেন তাঁদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা উক্ত এসোসিয়েশনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। [৩০৪]

'মেদিনীপুর মোসলেম লিটাররী সোসাইটি'র ২৩-তম সভা হয় ১৮৯৬ সালের ১৮ অক্টোবর। তাতে নিম্নলিখিত তিনটি প্রস্তাব নেওয়া হয় :

১. সংবাদপত্র কর্তৃক তুর্কির সুলতানের প্রতি যেসব অসৌজন্যমূলক আপত্তিকর ভাষা ব্যবহার করা হয়, সেসব বন্ধ করার জন্য সকারের কাছে অনুরোধপত্র প্রেরণ করা ;

২. ৬০-তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে ভারত সম্রাজ্ঞীকে অভিনন্দন জানিয়ে তারবার্তা পাঠান ;

৩. খরার দরুন সম্ভাব্য দুর্ভিক্ষের আশঙ্কাহেতু এ জেলা থেকে চাল রপ্তানী যাতে বন্ধ করা হয়, সে সম্পর্কে জেলা-প্রশাসকেব কাছে 'স্মারকপত্র' দান করা। [৩০৫]

---

৩০১. *মিহির ও সুধাকব,* ৯ ফালগুন ১৩০৮
৩০২. ঐ।
৩০৩. ঐ, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯
৩০৪. *The Moslem Chronicle*, 10 october 1896.
৩০৫. *The Moslem Chronicle*, 24 October 1896.

মাসে একটি করে সভার হিসাব ধরলে 'সোসাইটি' ১৮৯৪ সালে স্থাপিত হয়েছিল তা অনুমান করা যায়। 'মোসলেম ক্রনিকলে'র এক সংবাদে দেখা যায়, 'মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি' ঢাকার নবাব আবুল গনির মৃত্যুতে শোকসভা করেছে।[৩০৬] সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে সোসাইটি সচেতন ছিল, এসব দৃষ্টান্ত থেকে তা বুঝা যায়।

'দামেস্কে-হেজাজ রেলওয়ে'র জন্য চাঁদা সংগ্রহের যে আন্দোলন হয় তাতে রংপুরের 'চিলাহাটী মুসলমান সভা'র সহকারী সম্পাদক মুনশী জমিরুদ্দীন সক্রিয় অংশ নিয়েছিলেন। ইসলাম-প্রচারকের ১৩০৬-০৭ সনের চৈত্র-বৈশাখ সংখ্যায় এ তথ্য জানা যায়।

১৯০৩ সালে ফরিদপুরের পাংশায় 'কোহিনুর সাহিত্য সমিতি' নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব ছিল। 'কোহিনুর' নামক মাসিক সাহিত্যপত্রটি 'কোহিনুর সাহিত্য সমিতি' কর্তৃক পাংশা, ফরিদপুর থেকে প্রকাশিত হয়। ঐ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন এস. কে. এম. মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী।[৩০৭]

তখন সভা সমিতি গড়ার জোয়ার এসেছিল। গ্রামের স্কুলের ছাত্ররাও সমিতি স্থাপন করে তাদের অস্তিত্ব ও অধিকার সচেতনতার প্রমাণ দিয়েছে। সিরাজগঞ্জের বনোয়ারীলাল স্কুলের ছাত্রগণ 'সিরাজগঞ্জ ছাত্র সমিতি' গঠন করে। এতে বিতর্ক, আলোচনা, রচনা প্রতিযোগিতা প্রভৃতি সাংস্কৃতিক ক্রিয়াকলাপ অনুষ্ঠিত হতো। মাঝে মাঝে বড় আকারে জলসার (ধর্মসভা) ব্যবস্থাও হতো। ১৩০৭ সনের ৯, ১০ ও ১১ চৈত্র — তিন দিন ব্যাপী একটি বড় জলসার আয়োজন করে তারা। মুনশী মেহেরুল্লাহ, শেখ জমিরুদ্দীন প্রমুখ বক্তা তাতে বক্তৃতা করেন।[৩০৮] 'দি মহামেডান ডায়মণ্ড জুবিলী ভিক্টোরিয়া ক্রীকেট এণ্ড ফুটবল ক্লাব' নামে ছাত্রদের একটি ক্রীড়া সংগঠনও ছিল।[৩০৯] খুলনায় দৌলতপুর স্কুলে 'মহামেডান বয়েজ এসোসিয়েশন' ছিল। আফগানিস্তানের সুলতান আমীর আবদার রহমানের মৃত্যুতে এসোসিয়েশনের ছাত্ররা শোক-সভা করে।[৩১০] কুষ্টিয়া মহকুমার 'ছাত্র সমিতি' ছিল। সমিতির পঞ্চম অধিবেশন উপলক্ষে বিরাট সভার আয়োজন হয় (২৮ বৈশাখ ১৩০৯)। সে সভায় সকাল বিকাল ও রাত্রির অধিবেশনে যাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মীর মশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী, মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রমুখ।[৩১১] 'দি বরিশাল মহামেডান স্টুডেন্টস ইউনিয়ন' নামে একটি ছাত্র সমিতি নবাব আবদুল লতিফের মৃত্যুতে (১৮৯৩) শোক বাণী পাঠিয়েছিল এ. এফ. এম. আবদুর রহমানের কাছে।[৩১২]

৩০৬. *Ibid.*, 12 September 1896.
৩০৭. *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ১১৫
৩০৮. *প্রচারক*, চৈত্র ১৩০৭
৩০৯. *মিহির ও সুধাকর*, ২৭ পৌষ ১৩০৭
৩১০. ঐ, ১ কার্তিক ১৩০৮
৩১১. *ইসলাম-প্রচারক* জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০২।
৩১২. *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, p. 264.

তৃতীয় অধ্যায়

সাহিত্য ও সাহিত্যিক

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে (১৮০০) সিভিলিয়ানদের দেশীয় ভাবা ও আইনকানুন শিক্ষা দেওয়ার জন্য পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন হয়। বাংলা রচনার জন্য হিন্দু পণ্ডিত এবং উর্দু-ফারসি রচনার জন্য মুসলমান মৌলবী নিয়োগ করা হয়। বাংলার অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরী এবং মুনশী রামরাম বসু, গোলোকনাথ শর্মা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, তারিণীচরণ মিত্র, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ মুনশী, হরপ্রসাদ রায় প্রমুখের প্রচেষ্টায় প্রথম দেড় দশকে ১৩ খানি বাংলা গদ্য পুস্তক রচিত হয়। অধিকাংশই সংস্কৃত অথবা ইংরাজি-ফারসির অনুবাদ। বামরাম বসুর 'রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র' (১৮০১) অবশ্য মৌলিক রচনা।

খ্রিষ্টান মিশনারীরা বাইবেলেব অনুবাদ ও ধর্মমূলক অন্যান্য পুস্তক-পুস্তিকা রচনা করেছেন খ্রিস্টধর্ম প্রচারেব জন্য। 'শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিস্ট মিশনে'র সঙ্গে স্বয়ং উইলিয়ম কেরী সংযুক্ত ছিলেন। প্রথম দু'শকে ঐ মিশন প্রায় ৮০ খানা বাংলা পুস্তক-পুস্তিকা প্রকাশ করে।

দেশীয় স্কুল স্থাপন, তদারক ও স্কুলের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের জন্য সরকারের উদ্যোগে 'স্কুল বুক সোসাইটি' (১৮১৭) ও কলিকাতা স্কুল সোসাইটি' (১৮১৮) স্থাপিত হয়। ৯ জন ইউরোপীয়, ৪ জন বাঙালি হিনদু ও ৪ জন মুসলমান মৌলবী নিয়ে স্কুল বুক সোসাইটির 'পরিচালক কমিটি' গঠিত হয়। উভয় প্রতিষ্ঠান বাংলা, ইংরাজি, উর্দু ও ফারসি ভাষায় বহু পাঠ্যপুস্তক মুদ্রিত করে। ১৮১৭-১৮২১ সাল পর্যন্ত এই পাঁচ বছরে স্কুল বুক সোসাইটির প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা (প্রচার পত্রসহ) দাঁড়ায় লক্ষাধিক।[১]

১৮১৮ সালে জন মার্সম্যান সম্পাদিত 'দিগদর্শন' (মাসিক) ও 'সমাচার দর্পণ' (সাপ্তাহিক) প্রকাশিত হয়। খ্রিস্টান ও বাঙালির সম্পাদনায় তিন দশকের মধ্যে ত্রিশের অধিক বাংলা সাময়িকপত্র আত্মপ্রকাশ করে।[২] সাময়িকপত্রের বিবিধ বিষয়ক আলোচনা দ্বারা বাংলা ভাষাচর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয়।

ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রামমোহন রায় ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রথম বাংলা গদ্যচর্চা শুরু করেন। 'বেদান্তসার' (১৮১৫) তাঁর প্রথম গ্রন্থ। রামমোহনের পর ভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, অক্ষয়কুমার দত্ত, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, তারাচাঁদ

১ A.F. Salahuddin Ahmed-- *social Ideas and Social Changes in Bengal* . (1818- 836), Calcutta, 1976 (2nd edition), p.24

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — *বাংলা সাময়িকপত্র,* ১ খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭৯ (৪সং)।

চক্রবর্তী প্রভৃতি আধুনিক বাংলা গদ্য ও পদ্য রচয়িতার আবির্ভাব হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আধুনিক কবিতা ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সাহিত্যিক গদ্যের সার্থক সূচনা করেন। বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' (১৮৫৪) আখ্যানে সাহিত্যধর্মী গদ্য প্রথম পরিস্ফুট হয়। এর অল্পকাল পরেই প্যারিচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, দীনবন্ধু মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধায়, বিহারীলাল চক্রবর্তী প্রমুখ প্রথিতযশা সাহিতিক্যের আবির্ভাব ঘটে।

আধুনিক বাংলা ভাষাচর্চার আর একটি ধারা প্রবাহিত হয় সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা, সংস্কৃতি মূলক বিভিন্ন সভাসমিতির মাধ্যমে। রামমোহনের 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) ছিল এ-ধরণের প্রথম সভা। সভাগুলিতে বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ পাঠ, তর্ক-বিতর্ক ও আলোচনা হত ; সেগুলি মুখপত্র, প্রচারপত্র, অনুষ্ঠানপত্র, স্মারকপত্র বের করত। 'গৌড়ীয় সমাজে'র (১৮২৩) সভার কার্যবিবরণী বাংলায় লেখা বাধ্যতামূলক ছিল। 'ভার্নাকুলার লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৫১) বাংলা ভাষার সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়।[৩]

১৯৬০ সালে খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকীর (১৮০৮-৭০) গদ্য-পদ্য মিশ্রিত গ্রন্থ 'উচিৎ শ্রবণ' প্রকাশিত হয়। মুনশী আজিমদ্দী (১৮৬৩), মুনশী নামদার (ঐ), সেক জমিরুদ্দীন (১৮৬৮) কয়েকটি ক্ষুদ্র নক্সা-প্রহসন রচনা কবেন। ১৮৬৯ সালে মীর মশাররফ হোসেনের প্রথম গদ্য পুস্তক 'রত্নবতী' প্রকাশিত হয়। প্রকৃতপক্ষে তখন থেকেই বাঙালি মুসলমান কর্তৃক আধুনিক বাংলা সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়।

১৮০০ সাল থেকে ১৮৬০ সাল পর্যন্ত আধুনিক বাংলা সাহিত্যাকাশে মুসলমান লেখকের অনুপস্থিতি বিস্ময়কর হলেও ঐতিহাসিক সত্য। শিক্ষিত ও অর্ধ-শিক্ষিত মুসলমান প্রাচীন ধারায় মিশ্রভাষায় পুথিসাহিত্য ও অশিক্ষিত মুসলমান আঞ্চলিক ভাষায় লোকসাহিত্য রচনা করেছেন, কিন্তু আধুনিক ভাবধারায় শুদ্ধ বাংলায় তাঁরা গদ্য বা পদ্য রচনায় অগ্রসর হননি। শেখ আলীমুল্লার দ্বিভাষী 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (১৮৩১) ও রজব আলীর পঞ্চভাষী 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' (১৮৪৬) নামক সংবাদপত্রে বাংলার স্থান ছিল বটে, কিন্তু তা আদর্শ গদ্যের নিদর্শন বহন করে না — অন্যান্য ভাযার পাশাপাশি সংবাদগুলি বাংলায় তরজমা করা হত মাত্র। সুতরাং উনিশ শতকের প্রথম ষাট বছর বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যকর্মে চরম শূন্যতা বিরাজ করেছে। এর পশ্চাতে বহুবিধ ঐতিহাসিক কারণ নিহিত ছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জন্ম হয়েছে নগরকেন্দ্রিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের দ্বারা। কলিকাতা শহর এই নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কেন্দ্র ছিল। প্রথম দিকে কলিকাতায় বাঙালি মুসলমানের ইংরাজি শিক্ষিত কোন নব্য শ্রেণী গড়ে ওঠেনি ; অতি ক্ষুদ্রকায় একটি শিক্ষিত শ্রেণী ছিল বটে, কিন্তু তাঁরা বাংলা ভাষার চর্চা করেননি ; যেটুকু চর্চা করেছেন, সেটুকু ছিল উর্দু-ফারসি ভাষায়। ইংরাজি ভাষায় পাশ্চাত্য বিদ্যাশিক্ষা বাঙালির মানস

৩ **পার্থ চট্টোপাধ্যায় —** ***বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ,*** **সাক্ষরতা প্রকাশন, -কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ৭৮-৭৯।**

জগতের পরিবর্তনের মৌলিক কারণ ছিল। মুসলমান অভিজাত শ্রেণী দীর্ঘকাল অবধি ইংরাজি ভাষাশিক্ষার গরজ করেননি ; তাঁরা আরবি-ফারসি শিক্ষা ও প্রাচ্যবিদ্যার চর্চা করেছেন গতানুগতিক পদ্ধতিতে। আবদুর রহিম ইংরাজি বিজ্ঞানের বই আরবিতে অনুবাদ করেছেন।[৪] ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের মৌলবীরা কেউ কেউ ইংরাজি গ্রন্থের উর্দু ও ফারসি অনুবাদ করেছেন।[৫] সুতরাং যাঁরা ইংরাজি জানতেন, তাঁরা বাংলা ভাষার চর্চা করেননি। গ্রামের দরিদ্র লোকেরা ব্যয়বহুল ইংরাজি শিক্ষার কথা স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। উপরন্তু ওয়াহাবী, ফারায়েজী আন্দোলনের ফলে ইংরাজি ভাষা ও বিদ্যার প্রতি সাধারণ লোকের একটা বিরূপ মনোভাব তৈরি হয়েছিল। সুতরাং যাদের মাতৃভাষা বাংলা, তাঁরা প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এ ভাষার চর্চা করতে অক্ষম হয়। মাঝারি শিক্ষিত লোকেরা মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধের ভিত্তিতে সম্পূর্ণ কৃত্রিম ভাষায় 'দোভাষী পুথি' রচনা করেছেন। দোভাষী পুথি ছিল সমকালীন জীবনের সাথে প্রায় সম্পর্কহীন ; প্রধানতঃ সেগুলি অতীতচারিতা, কাল্পনিকতা ও অলৌকিকতায় ভরপুর ছিল। এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে পুথিগুলি বেশ জনপ্রিয় ছিল। দোভাষী পুথি মুসলমানের সাহিত্যের শূন্যতা পূরণ করেছিল সত্য, কিন্তু সেই সাথে নতুন করে চিন্তাভাবনা, আত্মানুসন্ধান ও আত্মস্ফুরণের পথও রুদ্ধ করে দিয়েছিল।

মধ্যযুগে মুসলমানের বাংলা সাহিত্যচর্চার যে ধারা ছিল তার প্রধান স্রোত ধর্মভাবকে আশ্রয় করে প্রবাহিত হয় ; আর এ ধর্মচেতনা সুফী মরমীয়াবাদকে অবলম্বন করে আবর্তিত হয়। কবিগণ অনেকে ব্যক্তি–জীবনে পীরভক্ত ছিলেন ; তাঁরা কেউ কেউ পীর–গুরুর নির্দেশেই কাব্য–রচনায় ব্রতী হয়েছেন। বৈষ্ণব পদাবলীর ঢঙে রচিত সুফীপদগুলি মরমীয়া অধ্যাত্মবাদেরই বাঙ্ময় প্রকাশ। 'জ্ঞানসাগর', 'জ্ঞান–চৌতিশা', 'সায়াতনামা', নূরনামা', 'তোহফা' প্রভৃতি তাসাউফ বা সুফীতত্ত্বের গ্রন্থ। 'ইউসুফ–জোলেখা', 'লায়লী–মজনু', 'মধুমালতী', 'সতীময়না–লোর–চন্দ্রানী', 'পদ্মাবতী' প্রভৃতি আখ্যানকাব্যে সুফীপ্রেমতত্ত্বের রূপক আছে। এসব বিষয়ের ফারসি ও হিন্দির মূল গ্রন্থগুলি পুরোপুরি অধ্যাত্মপ্রেমের রূপক কাব্য। সুতরাং মুসলমান রচিত বাংলা সাহিত্যের একটা বড় অংশ সুফী অধ্যাত্মবাদকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। শরীয়তী ধর্ম ও শাস্ত্রের অনুবাদ ও মর্সিয়া সাহিত্য নামে অপর ধারা ছিল, কিন্তু এসবের গ্রন্থসংখ্যা বেশি ছিল না। উনিশ শতকের

Azizur Rahman Mallick, --*British Policy and the Muslims in Bengal* (1757-1956), Dacca, 1961, p.178.

মৌলভী আবদুল খায়ের 'মজমুয়ায়ে শামসী' (১৮০৭) শিরোনামে একখানি ফারসি গ্রন্থে কোপারনিকাসের জ্যোতিষী পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। এটি ফোর্টউইলিয়ম কলেজের কর্মচারি ডব্লিউ হান্টারর তত্ত্বাবধানে রচিত হয়।

Thomas Roebuck (edited) --*Annals of the College* of Fort William, Hindustanee Press. Calutta, 1819, p.38. (Appendix III).

প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে ওয়াহাবী আন্দোলন হয় : এই ওয়াহাবী আন্দোলন ছিল শরীয়তপন্থী ; মারিফতপন্থী সুফীবাদের বিরোধী তা। এর ফলে সুফীসাধনার উপর আঘাত আসে। প্রকাশ্যে সামাজিক স্বীকৃতি না পেয়ে এটি ফকিরপন্থী বাউলদের গুহ্যসাধনার দিকে মোড় নেয়। বাউলগানের এরূপ ঐতিহ্য থাকায় এগুলির ভাষা অনেকখানি গ্রাম্যতা ও আঞ্চলিকতা মুক্ত ছিল। লালন ফকিরের গানের ভাষা প্রায়ই আধুনিক ভাষার পর্যায়ভুক্ত ছিল। আমাদের ধারণা, সুফীসাধকদের আশ্রয়-চ্যুত হওয়ায় বাংলা সাহিত্যের একটা গতিভঙ্গ হয়, সেটাই ক্রমে শূন্যতার সৃষ্টি করে। মোঘল নবাব–সুবেদাররা উর্দুর সমর্থক ছিলেন ; মোঘল আমলে বাংলা ভাষা দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা হারায় ; ওয়াহাবী আন্দোলনের ফলে সুফীসাধকদেরও অবলম্বন হারায় তা। সত্যপীর, গাজীপীর, গোরক্ষনাথ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে একটি হিন্দু–মুসলমানের মিশ্রিত ভাবধারার সাহিত্য গড়ে উঠেছিল। মর্সিয়া সাহিত্য ও এই ধারার রচনায় অনৈসলামিক উপাদান থাকায় এগুলির উপরেও ওয়াহাবী আন্দোলনের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। এর সাথে এল যুগের পরিবর্তন। আধুনিক যুগে শিল্প–সাহিত্যে ধর্মের প্রভাব কমে আসে। ওয়াহাবীরা রসধর্মী সাহিত্যের বিরোধী ছিলেন। ফলে ভাবজগতেও শূন্যতার সৃষ্টি হয়। আধুনিক ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নব্য শ্রেণীর আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত মুসলমান সমাজে বাংলা ভাষার এই অচলাবস্থা দূরীভূত হয়নি।

নতুন পরিবর্তনের যুগেও আবার একটা দোলাচল অবস্থা ছিল। আধুনিক বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হিন্দুদের হাতে গড়ে ওঠায় হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির প্রভাব পড়ে।[৬] মুসলমান সমাজপতিদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য ছিল না ; আবদুল লতিফ সংস্কৃতবহুল বাংলার পরিবর্তে কোর্ট–কাচারীতে ব্যবহৃত আরবি–ফারসি শব্দমিশ্রিত বাংলাকে গ্রামের মুসলমান বালকের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার অভিমত জ্ঞাপন করেছিলেন। সাহিত্যের ভাবগত ও বিষয়গত দ্বন্দ্বেও অনেকে বিচলিত ও শঙ্কিত ছিলেন।[৭]

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে যে বাংলা গদ্যচর্চা শুরু হয়, তা ঐতিহাসিক কারণে খ্রিস্টান পাদরী ও হিন্দু পণ্ডিতদের দ্বারা গড়ে ওঠে। তাঁরা বাংলাকে সংস্কৃতের দুহিতা জ্ঞান করে ব্যাকরণরীতি ও শব্দমালার দিক থেকে সংস্কৃতকে বেশি নির্ভর করেন। পণ্ডিতদের হাতে বাংলা ভাষা কিরূপ মূর্তি লাভ করেছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তার বর্ণনা দিয়ে লিখেছেন, "আমি নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকদিগকে যে ভাষায় কথোপকথন করিতে শুনিয়াছি তাহা সংস্কৃত ব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পারিতেনন না। তাঁহারা কদাচ 'খয়ের' বলিতেন না, 'খদির' বলিতেন, কদাচ চিনি বলিতেন না, 'শর্করা' বলিতেন। 'ঘি' বলিলে তাহাদের রসনা অশুদ্ধ হইত 'আজ্যহি' বলিতেন, কদাচিৎ কেহ ঘৃতে নামিতেন। 'চুল' বলা হইবে না, 'কেশ' বলিতে হইবে। 'কলা' বলা হইবে না, 'রম্ভা' বলিতে হইবে। ...পণ্ডিতদের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল, তবে তাঁহাদের লিখিত বাংলাভাষা আরও কি ভয়ঙ্কর ছিল তাহা বলা বাহুল্য।" (উদ্ধৃত : বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালির নবজাগরণ, পৃ. ১৭৬) এরূপ ভাষার প্রতি মুসলমানদের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া স্বাভাবিক ছিল।

বিস্তৃত আলোচনার জন্য চতুর্থ অধ্যায়ের 'ভাষা ও সাহিত্য' অংশ দ্রষ্টব্য।

মোগল আমল থেকে বাংলাদেশে উর্দুর প্রভাব পড়তে থাকে ; অভিজাত শ্রেণীর পারিবারিক ভাষা হয়ে দাঁড়ায় উর্দু। উর্দুর উৎপত্তি ভারতে। ফারসি রাজভাষা হলেও মাতৃভাষা হিসাবে তার স্থান ভারতে ছিল না। যখন উর্দুর উদ্ভব হল, তখন ভারতবর্ষের অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানরা তাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করে। বাংলায় যতদিন উর্দু আসেনি, ততদিন বাংলাই মাতৃভাষার মর্যাদা পেয়েছে। সামাজিক মর্যাদা লাভ করার জন্য দরবারের সঙ্গে সম্পৃক্ত উর্দুকে গ্রহণ করার প্রবণতা দেখা দেয়। আঠার শতকের কবি আবদুল হাকিম (নোয়াখালি) বঙ্গভাষা বিদ্বেষী ব্যক্তিকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন এবং বঙ্গদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে বলেছেন। খুব সম্ভব, এটি উর্দু-বাংলা দ্বন্দ্বেরই ফল। কোম্পানির আমলে উর্দুর প্রভাব কমেনি, বরং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উর্দু স্বীকৃতি লাভ করে। কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু, অনেক কাল পরে সেখানে কেবল প্রাথমিক স্তরে বাংলা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে সব উর্দুভাষী মুসলমান মুনশী নিয়োগ করা হয় ; বাংলাভাষী কোন মুসলমান সেখানে ছিলেন না। ইংরাজি শিক্ষা প্রচলিত হওয়ার পর বাংলা ভাষার প্রতি বিরূপ মনোভাব হিন্দু সমাজের একটি শ্রেণীর মধ্যেও দেখা দেয়, যার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা ও প্রচলনের জন্য আন্দোলন করতে হয়। তাঁদের প্রধান অভিযোগ ছিল, বাংলা ভাষা উচ্চভাব প্রকাশের উপযোগী ছিল না।[৮] উর্দু-প্রীতির কারণে মুসলমানদের মনোভাব এক্ষেত্রে আরও বিরূপ ছিল। উইলিয়ম কেরী কোন বাঙালি মুসলমানকে বাংলা পুস্তক রচনায় নিযুক্ত করেননি, বাংলা ভাষায় শিক্ষিত মুসলমানের অভাবকেই তা সূচিত করে। ভাষাজ্ঞানের ভিত্তিতে উর্দু ও বাংলা লেখকদের নিয়োগ করা হয়েছিল, সম্প্রদায় ভিত্তিতে নয়। অন্তত কলিকাতায় বাংলা শিক্ষিত মুসলমানের অভাব ছিল, প্রতিভা ও পাণ্ডিত্য থাকলে, তাঁরাই সুযোগ পেতেন। মোটামুটি এসব কারণেই বাঙালি মুসলমানের দ্বারা ঐ সময় বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়নি। দৌলত কাজী, সৈয়দ আলাওলের বিশুদ্ধ বাংলা দরবারের সম্মান পেয়েছিল, এখন সে-বাংলা পূর্বের গৌরব ও ঐতিহ্য হারিয়ে 'বটতলা'য় নেমে আসে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে সিক্ষিত মুসলমানেরা যখন বাংলা সাহিত্যচর্চায় এগিয়ে এলেন, তখন তাঁরা একটি তৈরি বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পেলেন, হিন্দু লেখকগণের মত তাঁদের একেবারে প্রাথমিক অবস্থা থেকে শুরু করতে হয়নি। কিন্তু মুসলমান লেখকগণ এত বড় সুবিধাকেও পুরোপুরি ব্যবহার করতে পারেননি। মীর মশাররফ হোসেন ও দু'একজন ছাড়া আধুনিক সাহিত্য রচনায় অন্য কেউ সফলকাম হতে পারেননি। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের যুগে আবির্ভূত এবং তাঁদের ভাষারীতি, রচনারীতি ও সাহিত্যাদর্শের

৮ *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ*, পৃ. ১৭৪–৮০

সহিত পরিচিত হয়েও তাঁরা উচ্চমানের সাহিত্য সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়েছেন, তারও পশ্চাতে নানাবিধ কারণ ছিল। প্রথমত সেই নগরকেন্দ্রিক মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনুপস্থিতি ; এ শ্রেণীর গঠনপর্ব সবেমাত্র শুরু হয়েছে। আমরা প্রথম অধ্যায়ে দেখেছি, এ শ্রেণীর ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতা ছিল না, এটি ছিল আর্থিক-নৈতিক দিক দিয়ে অধঃপতিত সমাজ-আগত একটি মিশ্র শ্রেণী। ইতোমধ্যে ফারসি চর্চা রহিত হওয়ায় এই নব্য শ্রেণীর আবরি-ফারসি ভাষাজ্ঞান হ্রাস পেতে লাগল, আবার ইংরাজি শিক্ষার ফলে তাঁরা ইসলামী সংস্কৃতির সাথেও ঐক্য স্থাপন করতে পারলেন না।[৯] বলতে গেলে, ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁরা কিছুকাল বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত বিরাজ করতে থাকেন। দেলওয়ার হোসেন আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, আবদুস সালাম, আবদুল হামিদ, আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, আবদুর রহিম, আবদুল করিম, আবদুর রসুল, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সৈয়দ শামসুল হোদা, সিরাজুল ইসলাম প্রভৃতি প্রথম দিকের গ্রাজুয়েট যাঁরা সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করেছিলেন, তাঁরা বাংলার চর্চা করেননি। আবদুল লতিফ ও তাঁর উচ্চ শিক্ষিত পুত্র চতুষ্টয় বাংলা বর্জন করেন। তাঁরা বেশির ভাগ ইংরাজিতে এবং অংশত উর্দুতে জ্ঞান ও সংস্কৃতি চর্চা করেছেন। সোহরাওয়ার্দী পরিবারের উচ্চ শিক্ষিত সন্তানেরাও বাংলা চর্চা করেননি। আবদুল লতিফ বাংলার মুসলমানের দুটি পৃথক শ্রেণীব কথা বলেছেন, যাদের রক্তধারা, ভাষা, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি ছিল পৃথক।[১০] এক শ্রেণীর সাথে অপর শ্রেণীর সামাজিক সম্পর্ক ছিল না, বরং প্রথম শ্রেণী (আবদুল লতিফ যাদের মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণী বলেছেন) দ্বিতীয় শ্রেণীকে (তাঁর মতে যারা নিম্নবিত্তের ধর্মান্তরিত মুসলমান) অবজ্ঞাই করতেন। অথচ এই দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরাই ছিল বাংলা-সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। যাঁরা সমাজের পুরোভাগে ছিলেন, তাঁরা হলেন বিমুখ, আর যারা নীচের তলায় ছিল, তারা হল অক্ষম ও অচেতন! এরূপ দ্বিধাবিভক্ত সমাজের কথা উল্লেখ করে কামরুদ্দীন আহমদ বাঙালি মুসলমানের চিত্তশূন্যতা ও সৃজনহীনতা সম্পর্কে বলেছেন, "তাঁরা (উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণী) নিজেদের বাঙালী বলে পরিচয় দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন পাছে লোকে তাঁদের ধর্মান্তরিত মুসলমান বা অনার্য বলে ঘৃণা করে। ... তাঁদের অন্তর আবেগ ও আনুগত্যবিহীন হয়ে পড়েছিল, তাঁরা বাংলাদেশকে জন্মভূমি বলে মেনে নিতেও পারেননি এবং বাংলা ভাষাকেও মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে তাঁরা দেশপ্রেমের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হননি যার ফলে তাঁরা সৃজনশীল হতে পারেননি এবং সক্ষম হননি মৌলিক কিছু দান করতে। সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টির জন্য চাই বলিষ্ঠ পটভূমিকা এবং তাঁদের

৯ "আজকের শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান যেমন একদিকে Mutannabi, Nizami, Amir Khusrau, Mir বা Ghalib-এর আরবি-ফার্সি, উর্দু কাব্যের সাথে মানসিক আত্মীয়তা অনুভব করতে অক্ষম, তেমনি অন্যদিকে ময়নামতির গান বা সোনাভানের পুথিও তার প্রাণে আর সাড়া জাগাতে পারে না।" *সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য,* পৃ. ১৬১

১০ *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents,* p. 225.

প্রেরণার উৎস হবে স্বদেশের মাটি।"[১১] স্বজাতি ও স্বদেশের সাথে এরূপ সম্পর্কহীনতা সাহিত্য সৃষ্টির অন্তরায় হয়েছিল। ভাষা উন্নত হলেও যদি সমাজ উন্নত ও উজ্জীবিত না হয়, তবে তার শিল্প-সাহিত্যের বিকাশ ও উন্নতি ঘটতে পারে না।

এ প্রসঙ্গে আর একটি বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন সেটি হল এই যে, এ সময় যাঁরা ইংরাজি ভাষা, এমন কি, বাংলা ভাষা শিক্ষার পক্ষে ওকালতি করেছেন, তাঁদের অনেকের লক্ষ্য ছিল, কেবল এসব ভাষা শিক্ষা করে বৈষয়িক উন্নতি লাভ করা, কেননা ইংরাজি ও বাংলা যথাক্রমে রাজভাষা রূপে স্বীকৃত হওয়ায় ঐ ভাষাদ্বয়ের মাধ্যমেই চাকুরীতে প্রবেশের ও ব্যবসায়িক লেনদেনের ক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। স্বয়ং আবদুল লতিফ ঐ ধরণের মনোভাব পোষণ করতেন। ইংরাজি শিক্ষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠা এবং পাশ্চাত্যের ভাবাদর্শে জাতিকে উজ্জীবিত করে তোলার বিষয়টি প্রথম দিকের সমাজকর্মীরা ভেবে দেখেননি। দেশীয় শিল্প ধ্বংস হওয়ায় এবং পুঁজি না থাকায় একমাত্র চাকুরীই ছিল আর্থিক উন্নতির উপায়। স্টুয়ার্ট মিল, বার্ক, বেকন, হেগেল, বেনথাম, হিউম প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষীর চিন্তাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে নব্যশিক্ষিত হিন্দুসমাজে যেরূপ 'ইয়ং বেঙ্গল দলে'র উদ্ভব হয়েছিল, সেরূপ কোন প্রগতিশীল ও বন্ধনমুক্ত 'দল' বা গোষ্ঠী মুসলমান সমাজে গড়ে ওঠেনি। অন্তর্লোককে উদ্ভাসিত করা যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য না হয়, তবে সে-শিক্ষার প্রকৃত ফল পাওয়া যায় না। মুসলমান অভিজাত শ্রেণী 'জাতীয় ভাষা' ও 'জাতীয় বিদ্যা'র মোহ ত্যাগ করতে পারেননি, সে-কথা আমরা অন্যত্র বলেছি।[১২] মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যর্থতা সত্ত্বেও নতুন করে আরও মাদ্রাসা স্থাপিত হয় ঐ মোহের কারণেই। বাংলার হিন্দু সমাজ যে অর্থে ইংরাজি শিক্ষাকে গ্রহণ করেছিলেন, মুসলমান সমাজ দীর্ঘদিন সে অর্থে গ্রহণ করেননি। সুতরাং সমাজে তার ফলাফলও সমভাবে ও সমমানে প্রতিফলিত হয়নি।

দ্বিতীয়ত বাংলা সাহিত্যের লেখক হিসাবে আমরা যাঁদের দেখতে পাই, তাঁদের মধ্যে রংপুরের তসলিমুদ্দীন আহমদ, মেদিনীপুরের শেখ ওসমান আলী, খুলনার কাজী ইমদাদুল হক, কুমিল্লার দৌলত আহমদ, ঢাকার মকবুল আলী গ্রাজুয়েট (বিএ/বিএল) ছিলেন — এঁরা কেউ কলিকাতায় অবস্থান করেননি ; চাকুরীস্থলে মফস্বলে ছিলেন। এন্ট্রান্স পাশ করেছেন অথবা এন্ট্রান্স পর্যন্ত পড়েছেন এমন লেখকের সংখ্যাও মুষ্টিমেয়। অনেকের শিক্ষাগত যোগ্যতা 'ছাত্রবৃত্তি' পর্যন্ত ; কেউ কেউ 'নর্মাল' পাশ ; 'মাদ্রাসা' পাশ মৌলবীও ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশেরই সাহিত্য-চর্চার পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল না, আবার অনেকে গ্রামে-গঞ্জের এমন পরিবেশে থেকেছেন, যেখানে সুস্থ ও সুষ্ঠু শিল্পচর্চা, জ্ঞানচর্চার সুযোগ ছিল না। যাঁদের 'প্রধান' লেখক হিসাবে চিহ্নিত করা যায়, তাঁদের কুল-বৃত্তি-শিক্ষা সম্পর্কে একটা ধারণা নীচের তালিকায় পাওয়া যায় :

১১ কামরুদ্দীন আহমদ — *পূর্ব বাংলার সমাজ ও রাজনীতি*, স্টুডেন্টস পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৩৭৪, পৃ. ১৭-১৮

১২ চতুর্থ অধ্যায়ের 'ভাষা ও সাহিত্য' অংশ দ্রষ্টব্য।

নাম	জন্মস্থান	শিক্ষা	কুল	বৃত্তি
মীর মশাররক হোসেন	কুষ্টিয়া	ইংরাজি বিদ্যালয়ে সপ্তম শ্রেণী	বড় জোতদার	জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার (দেলদুয়ার ও পদমদী)
মোহাম্মদ নইমুদ্দীন	টাঙ্গাইল	ছাত্রবৃত্তি, নর্মাল পাশ ও মাদ্রাসায় অধ্যয়ন	জোতদার	শিক্ষক, সাংবাদিক ও ধর্ম প্রচারক (টাঙ্গাইল)
আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী		—	বড় জোতদাব	জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার ও সাংবাদিক (টাঙ্গাইল)
কায়কোবাদ	ঢাকা	এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যায়ন	পিতা ঢাকার উকিল	পোস্ট-মাস্টার (স্বগ্রাম-আগলা)
মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	রাজশাহী	এন্ট্রান্স পাশ ও এফএ পর্যন্ত অধ্যায়ন	পিতা রেশম ব্যবসায়ী	শিক্ষক, সাবরেজিস্ট্রার(রংপুর, নাটোর, রাজশাহী)
রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী	টাঙ্গাইল	—		অধ্যাপক, জমিদারী এস্টেটের ম্যানেজার (কলিকাতা ও দেলদুয়ার)
শেখ আবদুর রহিম	২৪-পরগণা	এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা পাঠ-শালার শিক্ষক	শিক্ষক ও সাংবাদিক (কলিকাতা, নদীয়া)
মোজাম্মেল হক	নদীয়া	এন্ট্রান্স পর্যন্ত অধ্যয়ন	—	শিক্ষক (নদীয়া)
মোহাম্মদ নজিবর রহমান	পাবনা	নর্মাল পাশ	—	শিক্ষক (পাবনা)
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	যশোহর	পাঠশালা পর্যন্ত অধ্যয়ন	সাধারণ গৃহস্থ	দর্জি ও ধর্মপ্রচারক (যশোহর ও বিভিন্ন স্থান)
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	বরিশাল	ছাত্র বৃত্তি পাশ	মাঝারি জোতদার	শিক্ষক, সাংবাদিক (রূপসা, কলিকাতা)
শেখ আবুদস সোবহান	ঢাকা	—	—	মোক্তার (ঢাকা)
নওশের আলী খান ইউসফজয়ী	টাঙ্গাইল	এফএ পাশ ও বিএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	বড় জোতদার	জমিদার, সাবরেজিস্টার (টাঙ্গাইল)
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ	চট্টগ্রাম	এন্ট্রান্স পাশ ও এফ এ পর্যন্ত অধ্যয়ন	—	শিক্ষক ও কেরানী (চট্টগ্রাম)

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন	কুষ্টিয়া	উচ্চ গ্রেড অব রিডার পাশ	মাঝারি গৃহস্থ	শিক্ষক ও ধর্মপ্রচারক (কুষ্টিয়া ও বিভিন্ন স্থান)
মতিয়র রহমান খান	ঢাকা	এন্ট্রান্স পাশ ও বিএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা মুন্সেফ	শিক্ষক, সরকারি কর্মচারী (দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি)
শেখ ওসমান আলী	মেদিনীপুর	বিএ, বিএল পাশ	—	মুন্সেফ (বিভিন্ন স্থান)
আবু মা-আলী মোহম্মদ হামিদ আলী	চট্টগ্রাম	মাদ্রাসা পাশ	—	শিক্ষক (নোয়াখালি)
মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান		মাদ্রাসা পাশ	পিতা পাঠশালার শিক্ষক	শিক্ষক, সাংবাদিক ও ধর্মপ্রচাবক (বিভিন্ন স্থান)
সৈয়দ এমদাদ আলী	পাবনা	এন্ট্রান্স পাশ ও এফএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	—	শিক্ষক, সাংবাদিক, সি, আই, ডি, ইন্‌স্পেক্টর (বিভিন্ন স্থান)
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিবাজী		উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণী পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা হেকেমী চিকিৎসক	বক্তা ও রাজনৈতিক কর্মী
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	রংপুর	গৃহশিক্ষা	পিতা জমিদার, স্বামী ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী (কলিকাতা)
শেখ ফজলল কবিম		ইংরাজি বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন	—	জুটফার্মের ম্যানেজার (কাকিনা)
কাজী ইমদাদুল হক	খুলনা	বিএ পাশ ও এমএ পর্যন্ত অধ্যয়ন	পিতা মোক্তার	শিক্ষক, সহকারী স্কুল ইনস্পেক্টর (বিভিন্ন স্থান)।

তৃতীয়ত, বাংলার লেখকগণ সমকালীন যুগ ও পরিবেশের নানাবিধ ভাবদ্বন্দ্বে আন্দোলিত ছিলেন। ভাষাগত ও ভাবগত দ্বন্দ্ব তো ছিলই, উপরন্তু স্বজাতি-বিজাতির মধ্যে ধর্মগত কলহ, সামাজিক বিরোধ ও সাংস্কৃতিক সংঘাত দেখা দিয়েছিল। খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম, বাউলদের প্রভাবে ও প্রচারে সমাজের মানুষ উদ্‌ভ্রান্ত, কেউ কেউ ধর্মান্তর গ্রহণ করে বিপথগামী হয়েছে। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার নীতিহীনতা সমাজকে অক্টোপাশের মত বেঁধে রেখেছে ; সিয়া-সুন্নি, হানাফি-আহলে হাদিস মতবাদ নিয়ে সমাজের মানুষ পরস্পর কলহে লিপ্ত ; গ্রামের জমিদারগণ বিলাসিতা ও আরাম-আয়াসে মগ্ন ; নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর অনেকে ব্যক্তি-স্বার্থকে বড় করে দেখেন — সামাজের কথা তেমন গুরুত্বের সাথে ভাবেন না। নব্বই দশক পর্যন্ত সমাজের এরূপ অবস্থা বেশ প্রকট ছিল। বাংলার লেখকগণ

সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মধ্যে থেকে সমাজের এই দুর্গতি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাঁরা সমাজকে রক্ষা করাই প্রথম কর্তব্য মনে করেছিলেন। ক্ষয়িষ্ণু ও পতনোন্মুখ সমাজীবনের সর্ববিধ দায়িত্ব তাঁরাই আপন স্কন্ধে তুলে নেন। তাই দেখা যায়, মুক্তবুদ্ধি ও স্বাধীন শিল্পচর্চার কথা না ভেবে খ্রিস্টান-ব্রাহ্ম-বাউলদের অপপ্রচার থেকে সমাজকে রক্ষা করার জন্য তাঁরা ধর্মপুস্তক রচনা, পত্রিকা সম্পাদনা, ধর্মসভায় বক্তৃতা দান, ধর্ম-শিক্ষামূলক সমিতি গঠন ইত্যাদির প্রতি বেশি মনোযোগী হয়েছেন। ইসলামের মহিমা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁরা আরব-ইরানের সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন, কেননা মুসলমানের ধর্ম ও ঐতিহ্যের যা কিছু গৌরব আরবি-ফারসি ভাষায় ঐসব দেশের সংস্কৃতির মধে নিহিত। সুতরাং তাঁদের প্রথম ও প্রধান কাজ হল ধর্ম, নীতি, জ্ঞান ও তত্ত্বমূলক গ্রন্থের অনুবাদ অথবা মুসলিম ইতিহাস, কৃষ্টি ও মহাপুরুষদের মাহাত্ম্যকীর্তন করা। যুগের প্রয়োজন মিটাবার জন্য তাঁরা যতই তত্ত্বধর্মী ও প্রচারধর্মী রচনায় মনোনিবেশ করেছেন, ততই তাঁদের শিল্পকর্ম শিল্পাদর্শ থেকে দূরে সরে গেছে।

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুল রহিম, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, এমন কি, কায়কোবাদ পর্যন্ত রসধর্মী সাহিত্য রচনার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেছেন। সুতরাং তাঁদের অধিকাংশের রচনা শিল্পের বাহন না হয়ে উদ্দেশ্যের বাহন হয়েছে।

চতুর্থত, একজন ভাল শিল্পী হতে হলে মৌলিক প্রতিভার সাতে বুদ্ধিবৃত্তি, বহুদর্শিতা, উদ্ভাবনী শক্তি এবং অনুশীলনের প্রয়োজন হয়, সে যুগের মুসলমান লেখকের মধ্যে এসবের অভাব ছিল। অনেকেই অকারণ আবেগ-উচ্ছ্বাসকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। সাময়িক আবেগ-উদ্দীপনাকে প্রশ্রয় দিয়ে কাব্য উপন্যাস লিখলে সমকালীন উদ্দেশ্য সফল হয়, কিন্তু সে-সাহিত্য সময়কে জয় করতে পারে না। সাহিত্যকে কালজয়ী হতে হলে সাময়িকতাকে অতিক্রম করতে হয়। মুসলমান লেখকদের এই আবেগ-উচ্ছ্বাসের দিকটি লক্ষ্য করে অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় একটি প্রবন্ধে বলেন, "যে সকল মুসলমান লেখক বঙ্গসাহিত্যের সেবায় অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদের বিচার-বুদ্ধির উপর ভবিষ্যতের মঙ্গলামঙ্গল নির্ভর করিতেছে। তাঁহারা কেবল উদ্দীপনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়া সময় ক্ষয় করিলে মুসলমান বালকগণ অন্তঃসারশূন্য ও স্বজাতি-গৌরবান্ধ হইয়াই শিক্ষা সমাপ্ত করিতে বাধ্য হইবে। তাহাদের কোমল অন্তঃকরণে যাহাতে সদ্ভাবের বীজ অঙ্কুরিত হইয়া তাহাদিগকে জ্ঞানপিপাসু করে, তজ্জন্য সর্বদা চেষ্টা করিতে হইবে। তাহার পরিবর্তে নব্যবঙ্গে মুসলমানের বক্তৃতা ও প্রবন্ধের ভিতর আস্ফালনের আড়ম্বর ফুটিয়া উঠিতেছে।"[১৩]

মুসলমান লেখকগণের অনেকের আবার মৌলিক প্রেরণার অভাব ছিল। কোন কোন লেখক কতক বিষয়ে কেবল বাদ-প্রতিবাদ করার জন্য লেখনি ধারণ করেছিলেন, কেবল

১৩ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় — 'মুসলমান শিক্ষা সমিতি', *সাহিত্য*, ভাদ্র ১৩১০

চিন্তাশীল প্রবন্ধ-নিবন্ধের ক্ষেত্রে নয়, গল্প-উপন্যাস-কবিতার ক্ষেত্রেও এ মনোভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। কেউ কেউ হিন্দু লেখকগণের অক্ষম অনুকরণ করেছেন। মশাররফ হোসেন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এড়াতে পারেননি — ভাষারীতি, শিল্পীরিতিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের ও দীনবন্ধুর অনুসরণ করেছেন। কায়কোবাদের মহাকাব্য হয়েছে হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের অনুবর্তন। কতক ক্ষেত্রে নকল আছে — যেমন, আবু মা-আলী মোহাম্মদ হামিদ আলীর 'কাসেমবধ কাব্য' (১৯০৫)। প্রতিবাদধর্মী গল্প-উপন্যাস হয়েছে শুষ্ক বাগবিলাস মাত্র। নকল, অনুকরণ, বাদ-প্রতিবাদের রচনা দ্বারা বড় শিল্পী হওয়া যায় না। দু'একজনের স্বাভাবিক প্রতিভা থাকলেও এসব কারণে তাঁরা উচ্চমানের শিল্প সৃষ্টি করতে পারেননি। নতুন শিল্পরীতি, ভাষারীতি, নব জীবন-জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ তাঁরা কেউ সৃষ্টি করতে পারেননি।

মুসলমান কবি-সাহিত্যিক-নাট্যকার-প্রবন্ধকার ভাল শিল্প বা বড় শিল্প রচনা করতে পারেননি সত্য, তবে তাঁরা যা রচনা করেছেন, তাতে যুগজীবনের আবেগ আশা-আকাঙ্ক্ষা, দ্বন্দ্ব-সংঘাতের চিত্রটি নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে ধরা পড়েছে ; ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁদের সমকালীন চিন্তা ও চেতনার রশ্মিপাত ঘটেছে।

আমরা এ অধ্যায়ের লেখকগণের ব্যক্তি-জীবন, কর্মজীবন, অভিজ্ঞতা ও অন্য ক্রিয়াকলাপের পরিচয় দানের সাথে সাথে তাঁদের রচনার পরিমাণ ও প্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করেছি। তাঁদের রচনার উৎস ও উদ্দেশ্য কি এবং রচনা সম্পর্কে পাঠকের প্রতিক্রিয়া কি — আমরা সে বিষয়েও গুরুত্ব আরোপ করেছি। লেখগণের চিন্তাশক্তি ও প্রকাশশক্তির সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করে রচনাগুলির উৎকর্ষ-অপকর্ষ সম্পর্কে মন্তব্য করেছি। সাহিত্যের মানদণ্ডে অধিকাংশ লেখাই টিকে না, তবু সব লেখকের সব রচনা একত্র করেছি, কেননা জাতীয় জীবনের চিন্তার ফসল এসবের মধ্যেই নিহিত আছে। লেখকদের 'প্রধান' ও 'অপ্রধান' -- এ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে তাঁদের রচনার গুণগত মানের বিচারে।

এ অধ্যায়ে 'পত্রপত্রিকা'র আলোচনাও সন্নিবেশিত হয়েছে। পত্রিকার সাথে অনেক লেখক জড়িত ছিলেন, অনেকে এক ও একাধিক পত্রিকা সম্পাদনাও করেছেন। সাময়িকপত্রে গোষ্ঠিচেতনার প্রতিফলন ঘটে। পত্রিকার আদর্শ ও নীতিমালার দ্বারা অনেক লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি প্রভাবিত হয়। ব্যক্তি-সাহিত্য ও সাময়িক-সাহিত্য একত্রে আলোচনা করায় ব্যক্তি-প্রয়াস ও যৌথপ্রয়াসের সমন্বয়সূত্রটি বুঝবার সহায়ক হয়েছে।

২৪ জন প্রধান ও ১৪৮ জন অপ্রধান লেখকের বিভিন্ন বিষয়ক ৩৪৪ খানি মুদ্রিত পুস্ত-পুস্তিকার সন্ধান নানা সূত্রে পাওয়া গেছে।[১৪] আঙ্গিকের দিক থেকে কাব্য, মহাকাব্য, গল্প,

১৪ দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব' অংশে যাঁরা গ্রন্থ রচনা করেন, এখানে তাঁদের এবং তাঁদের রচনা এ সংখ্যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

উপন্যাস, নাটক, প্রহসন, জীবনচরিত, আত্মচরিত, প্রবন্ধ প্রভৃতি শ্রেণীর রচনা পাওয়া যায় ; আবার বিষয়বস্তুর দিক থেকেও ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা, ইতিহাস, আইন চিকিৎসা ইত্যাদি শ্রেণীর গদ্য ও পদ্য রচনাও পাওয়া যায়। ১৮৬০ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত পুস্তকগুলির একটি পরিসংখ্যান (আঙ্গিক ও বিষয় মিশ্রিত) নিম্নরূপে দেখান যায় :

রচনা	সংখ্যা	হার
ধর্ম ও নীতি	১০৫	৩০.৫
কবিতা, গান ও মহাকাব্য	৯৫	২৭.৬
উপন্যাস ও গল্প	১৬	৪.৭
নাটক, প্রহসন ও নক্সা	৩০	৮.৭
সন্তজীবনী	২২	৬.৪
আত্ম-চরিত	৩	০.৯
ইতিহাস	৮	২.৩
আইন	৮	২.৩
চিকিৎসা	১১	৩.২
বিবিধ	৪৬	১৩.৪

উপন্যাস ও গল্পের মধ্যে এক 'বিষাদ-সিন্ধু' ছাড়া আর কোনটাই সফল হয়নি। 'বিষাদ-সিন্ধু' আবার পুরোপুরি উপন্যাসের আঙ্গিকে পড়ে না। ঐতিহাসিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই উপন্যাসে কাল্পনিকতার ও অলৌকিকতার আশ্রয় আছে। প্রখর সমাজচেতনা ও বাস্তবতাবোধ কোন উপন্যাসেই প্রকাশ পায়নি। 'যমজভগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌলা' উপন্যাসে ইতিহাসের পটভূমি আছে বটে, কিন্তু এত বেশি কল্পনার আশ্রয় আছে যে, ইতিহাসের সত্য চাপা পড়ে যায়। তাঁর ভাষাও উপন্যাসের ভাষা নয়। 'লায়লী-মজনু' 'হাতেমের উপাখান', 'তহমিনা' প্রভৃতি আরব্য পুরাণ এবং 'রত্নবতী', 'মনোহর-তারাবতী' প্রভৃতি দেশীয় রূপকথা জাতীয় গল্প। 'প্রেমদর্পণ', হাফেজ সাহেব', 'আমিনা' প্রভৃতি উপন্যাসে সমকালের জীবন স্থান পেয়েছে বটে, কিন্তু কোনটাই উঁচু মানের রচনা নয়।

খণ্ড কবিতা, গীতিকবিতা, গান-গজলের অনেকগুলি বই পাওয়া যায়। প্রকৃত কবি হিসাবে কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলল করিম, ইসমাইল হোসেন সিরাজীর প্রেরণা ছিল মৌলিক। কাজী ইমদাদুল হক, মোসলেমউদ্দীন খানের কবি-প্রতিভা ছিল, কিন্তু দু'একখানি গ্রন্থ দিয়ে কবি-খ্যাতি স্থাপিত হয় না। খণ্ড কবিতা, গীতিকবিতা ও আখ্যানকাব্যের বিষয়বস্তু হল মানবপ্রেম, প্রকৃতি-প্রীতি, স্বজাতিপ্রীতি ও সমকালীন জীবনের আবেগ-অনুভূতি। কায়কোবাদের 'মহাশ্মান' (১৯০৪) ও হামিদ আলীর 'কাসেমবধ কাব্য' (১৯০৫) মহাকাব্যের আখ্যা পেয়ে থাকে ; কায়কোবাদ হেমচন্দ্র-

নবীনচন্দ্রেকে এবং হামিদ আলী মধুসূদনকে অনুসরণ করেছেন। মহাকাব্য রচনার মত তাঁদের ব্যাপক অভিজ্ঞতা, ভূমাবোধ ও সমুন্নত শিল্পচেতনার অভাব ছিল। উপরন্তু তখন বাংলা সাহিত্য থেকে মহাকাব্যের যুগ অপসারিত হয়েছে। সুতরাং এগুলি অক্ষম অনুকরণ ছাড়া আর কিছুই হয়নি।

নাটক-প্রহসন-নক্সা-ব্যঙ্গ জাতীয় রচনার সংখ্যা ৩০খানি। মীর মশাররফ হোসেন ছাড়া আর কারও অন্তর্দৃষ্টি, আঙ্গিকচেতনা ও সামাজিকবোধ ছিল না। প্রহসনগুলিতে সমসাময়িক কালের সমাজজীবনের ছবি আছে। সেদিক থেকে কোন কোন কবিতা গ্রন্থের মত প্রহসন-নক্সাগুলির মূল্য স্বীকার্য।

প্রবন্ধাদি গদ্যরচনায় মশাররফ হোসেন থেকে রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ উচ্চ খ্যাতির দাবীদার। তাঁরা বিবিধ বিষয় নিয়ে মৌলিক প্রবন্ধ, আলোচনা ও গবেষণা পুস্তক লিখেছেন। অন্যান্য শাখার তুলনায় গদ্যরচনায় মুসলমান লেখকগণ অধিকতর সফল হয়েছেন। 'বিশুদ্ধ বাঙ্গালা'র জন্য তাঁরা অনেক কৃতবিদ্য লেখকের প্রশংসা পেয়েছেন। তাঁরা সমাজ-শিক্ষা সংস্কারের ক্ষেত্রে নভেল-নাটক-কবিতা অপেক্ষা চিন্তাশীল প্রবন্ধকে অধিক উপযোগী মাধ্যম হিসাবে মনে করেছিলেন।

জীবনীগ্রন্থগুলির অধিকাংশ হজরত মহম্মদ, খলিফা ও পীর-আউলিয়াদের সম্বন্ধে রচিত হয়েছে। দেশের কোন ঐতিহাসিক চরিত্র বা সমাজসেবকের জীবনী স্থান পায়নি। উক্ত সময় পর্যন্ত হাজী মোহাম্মদ মহসীনের (১৭৩২-১৮১২) মত দানবীরের জীবনীও লেখা হয়নি। ধর্মভাব ও নৈতিকচেতনার দ্বারা লেখকগণ অধিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, এতে তাই প্রমাণিত হয়। মশাররফ হোসেনের দুখানি এবং আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরীর একখানি আত্মচরিতকথা রচিত হয় ; তিনখানি গ্রন্থেই শিল্পাস্বাদ আছে। তাঁদের রচনায় চলমান সমাজের বাস্তব চিত্র ধরা পড়েছে।

গদ্যে ও পদ্যে রচিত অনেকগুলি অনুবাদ গ্রন্থ আছে। আরবি, ফারসি ও উর্দু ভাষায় ধর্মকথা, নীতিকথা ও সন্তজীবনী অনূদিত হয়েছে। চিকিৎসা ও আইনের ছাত্রপাঠ্য বই ছাড়া পাশ্চাত্যের অন্য কোন ইংরাজি বই-এর অনুবাদ হয়নি। শেখ আবদুর রহিমকৃত ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'দি আলহামরা' ও 'দি পিলগ্রিম অব লাভ' গ্রন্থের অনুবাদ যথাক্রমে 'আলহামরা' ও 'প্রণয়যাত্রী' (১৮৯২) এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।

তালিকায় ধর্ম ও নীতিমূলক গ্রন্থের সংখ্যা সর্বাধিক। মৌলিক রচনা, আলোচনা ও অনুবাদ মিলিয়ে গদ্যে ও পদ্যে শতাধিক পুস্তক-পুস্তিকার নাম পাওয়া যায়।[১৫] মুসলমান লেখকগণের চিন্তায় ধর্মকথা ও নীতিকথা কেন প্রাধান্য লাভ করেছে, আমরা তা পূর্বে

১৫ ধর্ম ও নীতিমূলক গ্রন্থের সাথে সন্তজীবনীগুলি একত্রে ধরলে ধর্মভাবাশ্রিত পুস্তকের হার দাঁড়ায় প্রায় ৩৬.৯%

ব্যাখ্যা করেছি। বলা হয়েছে যে, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হারিয়ে মুসলমান সমাজ হতাশায় ও নিষ্ক্রিয়তায় ভুগছিল ; বাহুবল ও মনোবল হারিয়ে তারা ক্রমশ ধর্মমুখী ও ঐতিহ্যমুখী হয়ে পড়ে। তাঁরা অধার্মিকতা ও নীতিজ্ঞানহীনতাকে সমাজের পতন ও জাতির দুর্গতির কারণ হিসাবে ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং সমাজের মানুষকে ধর্মবোধ ও নৈতিক জ্ঞান দ্বারা উদ্বুদ্ধ না করলে সমাজের জাগরণ ও উন্নতি সম্ভব নয়। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান প্রমুখ লেখক তাঁদের প্রায় সমস্ত শক্তি ব্যয় করেছেন ইসলাম ধর্ম, শরিয়তী আদর্শ ও নীতিজ্ঞান ব্যাখ্যা ও প্রচারের কাজে। ধর্মের স্রোত এসেছে আরবভূমি থেকে ; সেজন্য মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রগুলির ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন ও সংস্কৃতি প্রাধান্য লাভ করেছে। প্যান-ইসলামী মনোভাবের দরুন এরূপ প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়।

কলেজের ছাত্রদের পাঠোপযোগী ৮ খানা আইন ও ১১ খানা চিকিৎসার বই রচিত হয়েছে। এগুলির অধিকাংশ দুর্বল অনুবাদ। আইন ও চিকিৎসার জটিল বিষয়গুলি দেশীয় ছাত্রদের বোধগম্য করে তোলা তাঁদের লক্ষ্য ছিল, তাঁরা প্রকৃত লেখক কেউ ছিলেন না ; তাঁরা অনেকে পরিভাষা ব্যবহার করেননি অর্থাৎ অনুবাদের কোন সুষ্ঠু নীতি সৃষ্টি করতে পারেননি। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্য শাখা নিয়েও গ্রন্থ রচিত হয়নি, এমন কি, পত্রপত্রিকাগুলিতেও বিজ্ঞানচর্চার স্থান খুবই সীমিত। গবেষণাধর্মী রচনায় একমাত্র আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ছাড়া আর কেউ অগ্রসর হননি। পুস্তক-সমালোচনা কেবল সাময়িকপত্রের পাতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সমাজ-সংস্কৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কোন লেখকের জীবন ও রচনার মূল্যায়ন করা হয়নি। পত্রপত্রিকার সমালোচনাও আবার ধর্মানুভূতি ও নৈতিকচেতনার মাপকাঠি দ্বারা নিরূপিত হয়েছে ; রসগ্রাহী সাহিত্য-সমালোচনা একটিও হয়নি। এক্ষেত্রে 'ইসলাম-প্রচারক' ও 'নবনূরে'র ভূমিকা ছিল অগ্রণীয়। মশাররফ হোসেন, কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলল করিম, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন অনৈসলামিকতা, অনৈতিহাসিকতা, অথবা নীতিহীনতার কারণে অভিযোগের পাত্রে পরিণত হয়েছেন। সেযুগের হিন্দু-লেখকরাও ইসলাম ও মুসলমান বিরোধী বক্তব্যের জন্য অভিযুক্ত হয়েছেন।

কবি-সাহিত্যিকগণ সামাজিক মানুষ হিসাবে তাঁদের লেখার মাধ্যমে সমাজের চাহিদা পূর্ণ করে থাকেন। স্পর্শকাতর অনুভূতি ও সৃজনশীল প্রতিভার অধিকারী লেখকগণই অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে সমাজের গূঢ়, গভীর, সূক্ষ্ম বিচিত্র রূপ রহস্যের অনুসন্ধান পান ; তাঁরা তাঁদের লেখায় সেগলি ফুটিয়ে তোলেন। বাংলার মুসলমান লেখকগণ সমসাময়িক যুগ-পটভূমিতে তাঁদের অভিজ্ঞতা, ভাবানুভূতি, দৃষ্টিভঙ্গি ও চিন্তাভাবনা নিয়ে সমাজজীবনকে কিভাবে দেখেছেন এবং কি পরিমাণে সমাজের চাহিদা মিটিয়েছেন, চতুর্থ অধ্যায়ে সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে তাঁদের ব্যক্তিগত পরিচয়, শিল্পসৃষ্টির মূল শিল্পকর্মের প্রধান ধারা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়ায় মীর মশাররফ হোসেনের জন্ম। তাঁর পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেন সম্পন্ন জোতদার ছিলেন। পদমদীর জমিদাররা ছিলেন পিতৃকূলের আত্মীয়। মোয়াজ্জম হোসেন মোটেই বাংলা জানতেন না, স্বাক্ষর করতেন ফারসিতে। তবে তিনি বাংলা বা ইংরাজি শিক্ষার বিরোধী ছিলেন না। মশাররফ হোসেন স্বগৃহে মুনশীর কাছে আরবি-ফারসি এবং পাঠশালায় পণ্ডিতের কাছে বাংলা শিখেন। তাঁর স্কুলজীবন কাটে প্রথমে কুষ্টিয়া, পরে পদমদী এবং শেষে কৃষ্ণনগরে।[১৬] কিন্তু কোথাও বিদ্যাচর্চা অধিক দূর অগ্রসর হয়নি। আলীপুর আদালতের আমীন নাদির হোসেনের আশ্রয়ে কলিকাতার কালীঘাট স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু তাঁর পড়া মোটেই অগ্রসর হয়নি। নাদির হোসেনের প্রথমা কন্যা লতিফন্নেসার স্থলে ঘটনাচক্রে দ্বিতীয়া কন্যা আজিজন্নেসার সাথে তাঁর বিয়ে হয় (১৮৬৫)। আজিজন্নেসা অসুন্দরী ও বিদ্যাহীনা ছিলেন। মশাররফ হোসেন বিদ্যাচর্চা ত্যাগ করে লাহিনীপাড়ায় ফিরে এসে পিতৃসম্পত্তি দেখাশুনা করতে থাকেন। কিছুকাল পরে তিনি সাঁওতার সাধারণ কৃষককন্যা কুলসুমকে বিবাহ করেন (১৮৭৪)। তাঁর দ্বিতীয় দাম্পত্যজীবন সুখের হয়েছিল। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের বিকাশে কুলসুমের দান ছিল বলে মশাররফ হোসেন 'বিবি কুলসুম' (১৯১০) গ্রন্থে স্বীকার করেছেন। হুগলী কলেজের ছাত্রদের সমযোগিতায় মশাররফ হোসেন প্রথমা স্ত্রীর নামে 'আজিজননেহার' (১৮৭৪) পত্রিকা প্রকাশ করেন। তিনি ১৮৮৪ সালে দেলদুয়াব এস্টেটের ম্যানেজার হয়ে টাঙ্গাইলে যান। করিমুন্নেসা খানম চৌধুরানী ছিলেন দেলদুয়ারের জমিদারপত্নী। ১৮৯২ সাল পর্যন্ত তিনি ঐ ম্যানেজারের পদে বৃত ছিলেন। মশাররফের সাহিত্যিক কর্মের শ্রেষ্ঠ ফসল 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) টাঙ্গাইলে অবস্থান কালেই রচিত হয়। জমিদার পরিবারের সহিত মনোমালিন্য ও স্থানীয় লোক ও কর্মচারীর সহিত বিবাদের ফলে তিনি টাঙ্গাইল ত্যাগ করে লাহিনীপাড়ায় ফিরে আসেন। এরপর ভাগ্যান্বেষণে তিনি বগুড়া, কলিকাতা এবং শেষে পদমদীতে যাতায়াত করেন। মশাররফ হোসেন ১৯০৩ সাল থেকে ১৯০৯ সাল পর্যন্ত কলিকাতায় ছিলেন। পরের তিনটি বছর পদমদীতে অবস্থান করেন। ১৯১২ সালে পদমদীতে তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি সেখানেই শেষ শয়ানে শায়িত আছেন।

মীর মশাররফ হোসেনের স্বগৃহে সাহিত্যের পরিবেশ ছিল না। গান-বাজনা-নাচের প্রতি পিতার আসক্তি ছিল। এমন কি, তিনি নর্তকীও রাখতেন। সেযুগে জমিদার-জোতদার ধনী লোক মাত্রই বাইজীর নাচ-গানে আসক্ত হয়ে অজস্র অর্থ ব্যয় করতেন। শৈশবকালে মশাররফ হোসেন পিতৃগৃহে এবং পদমদী, বামনা, ঢাকার আত্মীয়-পরিজন গৃহে এরূপ ভোগ-বিলাসিতা দেখেছেন—বিদ্যাচর্চা, সাহিত্যচর্চা কোথাও দেখেননি। নিজ গৃহে সাহিত্যচর্চা বলতে এক দেখেছেন পুথিপাঠ। 'আমীর হামজা', 'সোনাভান', 'হাতেম

---

১৬ স্বগ্রামের জগমোহন নন্দীর পাঠশালা, কুমারখালির ইংরাজি বিদ্যালয়, পদমদীর নবাব স্কুল ও কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নের কথা আত্মজীবনীতে আছে। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে বছর খানেক পড়েছিলেন।

তাই', 'জয়গুনের কেচ্ছা' প্রভৃতি সেকালের দোভাষী পুথি মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় ছিল। তিনি বাল্যকালে ঐসব কাহিনী আত্মীয়-স্বজনের মুখে শুনেছেন, সুর করে পড়তেও দেখেছেন। গ্রামে-গঞ্জে আর এক শ্রেণীর সংস্কৃতিচর্চা দেখেছেন — তা হল পল্লীগান, বাউলগানের চর্চা। এই বাউলগানের শ্রেষ্ঠ রচয়িতা লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়াতে আস্তানা করে থাকতেন। ছেঁউড়িয়া ও লাহিনীপাড়ার দুরত্ব মাইল খানেক। কুমারখালির কাঙাল হরিনাথ মজুমদারের (১৮৩৩-১৮৯৬) সাথে লালন শাহের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। হরিনাথ মজুমদার চিলেন মশাররফের সাহিত্যিক গুরু। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' এবং রামচন্দ্র গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সংবাদ প্রভাকরে' স্থানীয় সংবাদ লিখে বাংলা রচনায় মশাররফের হাতে খড়ি হয়।[১৭] কাঙাল হরিনাথ বাউলগানের ভক্ত ছিলেন, তিনি বাউলগান রচনাও করতেন। তাঁর প্রভাবে মশাররফ হোসেনও বাউলগান লিখেছিলেন। 'সঙ্গীত লহরী'তে (১ খণ্ড, ১৮৮৭) তার পরিচয় আছে। 'সঙ্গীত লহরী'তে আধুনিক গান-গজলও আছে। স্বজন-পরিজনের সঙ্গীতচর্চার প্রভাব থেকেই তিনি এ বিদ্যা অর্জন করেছিলেন।

মশাররফ হোসেনের মেধা ও প্রতিভা দুই ছিল। বিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত ভাবে বিদ্যাচর্চার অবসরেই তিনি বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি মার্জিত, উন্নত এবং সুশৃঙ্খল বাংলা ভাষার সহিত পরিচিত হয়েছিলেন, আত্মকথা 'আমার জীবনী'তে (১৯০৮-১০) তার উল্লেখ আছে। মশাররফ হোসেন দোভাষী পুথির ও বাউলগানের প্রভাবে পুথিকার বা বাউল সঙ্গীতকার হলেন না, এমন কি তরুণ বয়সের সংবাদ-ফিচারের প্রভাববশে সাংবাদিকও হলেন না ; বরং পুথি-বাউল-সাংবাদিকতার ঈষৎ প্রভাব অঙ্গে মেখে তিনি হলেন আধুনিক গদ্যলেখক — উপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক, নাট্যকার ও রম্যরচয়িতা। বাংলার মুসলমান সমাজের দীর্ঘ অর্ধ-শতাব্দীর শীতল ও স্থবির নীরবতা দূরীভূত হয়ে আধুনিক ধারায় ও রীতিতে সাহিত্যচর্চার দ্বারোদ্‌ঘাটন হল মশাররফ হোসেনের শিল্পকর্মের মাধ্যমেই। একটি সুপ্তিমগ্ন, ভগ্নদশাপ্রাপ্ত, ভ্রান্তপথগামী জাতির জীবনে প্রথম সম্বিৎ এনে দিলেন তিনি। মশাররফ হোসেন আত্মজীবনীতে নিজ পরিবারের ও স্বজন-পরিজনদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাকে সেযুগের বাংলা অবস্থাপন্ন মুসলমান পরিবারের মোটামুটি অভিন্ন ছবি হিসাবেই ধরা যায়। মধ্যযুগীয় চেতনায়, গতানুগতিক জীবন ধারায় পীর-মোল্লার প্রভাব কবলিত নির্বেদ নিস্তরঙ্গ সমাজে পরিবর্তনের আশা বড় একটা ছিল না। শহরে মুষ্টিমেয় সংখ্যক যাঁরা বাস করতেন, তাঁদের কারও কারও কণ্ঠে পরিবর্তনের সুর ধ্বনিতে হয়েছিল বটে, কিন্তু সে-সুর বাংলা ভাষা-সাহিত্যকে স্পর্শ করেনি। বরং অনেকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কণ্ঠরোধ

. "গ্রামবার্তা সম্পাদক বাবু হরিনাথ মজুমদার মহাশয় আমাকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিতেন। ... সপ্তাহে সপ্তাহে গ্রামবার্তায় সংবাদ লিখিতাম। প্রভাকরেও লিখিতাম। ... তিনি (হরিনাথ) কাটিয়া ছাঁটিয়া নিজ কাগজে প্রকাশ করিতেন। এদিকে হরিনাথ বাবু আর কলিকাতার দিকে ভুবন বাবু আমার সামন্য লিখা সংশোধন করিয়া প্রভাকরে প্রকাশ করা আরম্ভ করিলেন।" — আমার জীবনী।

করার চেষ্টায় ছিলেন। প্রথম দিকে কলিকাতার মত আধুনিক শহরের শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের দ্বারা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা হয়নি ; পল্লী-বাংলার সাধারণ মানের অল্প শিক্ষিত ব্যক্তিগণের দ্বারাই সে-চর্চা শুরু হয়। তাঁরা অনেকে মফস্বলে থেকে সাহিত্য-সাধনা করেছেন। নব্বই দশকের দিকে তাঁদের কেউ কেউ কলিকাতায় অবস্থান করলেও তাঁদের অধিকাংশের শিক্ষা গ্রামের পাঠশালা-বিদ্যালয়-মাদ্রাসা পর্যন্ত ; গ্রাম থেকে সদ্য শহরে এসেছেন ভাগ্যের অন্বেষণে। ভাগ্যের সন্ধানেই তাঁরা হিমসিম খান, সাহিত্যচর্চা সেক্ষেত্রে আরও দুরূহ কর্ম ছিল। সুতরাং মুসলমান সমাজের চৈতন্যোদয় হতে হয়তো আরও অর্ধ-শতাব্দী কেটে যেত। কিন্তু মশাররফ নিজ চেষ্টায় সমাজের সেই ঘোর নিশা আগেই দূর করেন। পশ্চাৎমুখী সমাজের বন্ধনদশা, সংস্কারমোহ ও উদ্যমহীনতার স্তূপ ঠেলে তাঁকে বেরিয়ে আসতে হয়েছে।[১৮]

সমাজের জন্য সমাজের কাছে মুখ খুলতে গিয়ে পদে পদে বাধা এসেছে। বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় সাহিত্যচর্চা করে নিন্দার ভাগী হয়েছেন। রসধর্মী সাহিত্য সৃষ্টি আর এক অপযশের কারণ। সর্বোপরি নির্মোহ মতাবাদ ও মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গির জন্য লাঞ্ছিত হয়েছেন — মোল্লারা 'কাফের' ও স্ত্রীহারাম' ফতোয়া দিয়েছেন।[১৯] স্বসমাজের কাছ থেকে নিন্দা পেলেও হিন্দু সমাজের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন। আধুনিক উন্নত ভাষার ব্যবহারের জন্য সেযুগের কমবেশি সকল হিন্দু সমালোচক মশাররফ হোসেনের প্রশংসা করেছেন, বলেছেন এমন বাংলা মুসলমান কেন, অনেক কৃতবিদ্য হিন্দুও লিখতে পারেন না।[২০] মুসলমান সমালোচকেরা ঐরূপ ভাষা ব্যবহারের জন্য তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন।[২১] 'নবনূর' 'মৌলুদ শরীফে'র ভাষার নিন্দা করে।[২২] মশাররফ হোসেন 'হিন্দু সাহিত্যের আদর্শে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ' লিখে সমাজে নিন্দিত হয়েছিলেন বলে শেখ আবদুর

১৮ অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন, "৪০ বৎসর পূর্বে দেশে এত কাগজ ছিল না, এত মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, ছিল গুরু মশায়ের পাঠশালা বা দুই একটি বঙ্গ বিদ্যালয়, দুই চাবিখানি কলেজ এবং দুই দশখানা ভাল পুস্তক। তৎকালে একজন মুসলমানেব পক্ষে ভাল বাঙ্গালা রচনা করিবার বহু বাধাবিঘ্ন বর্তমান ছিল। তাহা অতিক্রম করিয়া মীর মশাররফ হোসেন যে সাহিত্য শক্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা অল্প শ্লাঘাব বিষয় নহে।" *প্রদীপ*, পৌষ ১৩০৮।

১৯ মীর মশাররফ হোসেনকৃত 'গো-জীবন' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। উল্লেখযোগ্য যে, বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কাজী নজরুল ইসলামও মুক্ত সাহিত্য-সংস্কৃতির চর্চা করতে গিয়ে মোল্লাদের কাছ থেকে 'কাফের' ফতোয়া পেয়েছিলেন।

২০ 'গোরাই ব্রিজ 'কাব্যের সমালোচনা করে' 'বঙ্গদর্শন' (পৌষ ১৮৭০) লেখা হয় "— তাঁহার রচনার ন্যায় বিশুদ্ধ বাঙ্গালা অনেক হিন্দুতে লিখিতে পারে না। ইহার দৃষ্টান্ত আদরণীয়।" 'বিষাদ-সিন্ধু'র সমালোচনায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার 'বসুধা'য় (ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৯) মন্তব্য করেন, "...সিন্ধুর ভাষা বাঙ্গালী হিন্দু লিখিতে পারিলে আপনাকে ধন্য মনে করিবে।"

২১ "শাস্ত্রানুসারে পাপভয়ে ও সমাজের দৃঢ় বন্ধনে বাধ্য হইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' মধ্যে কতকগুলি জাতীয় শব্দ ব্যবহার করিতে হইল।" *বিষাদ-সিন্ধু*, ১ম খণ্ড, 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

২২ *নবনূর*, শ্রাবণ ১৩১১

রহিম উল্লেখ করেন।[২৩] মুসলমান সমাজের বাঁধনটি এমন বজ্র-আঁটুনিতে বাঁধা যে কোন দিকে নড়চড় করার উপায় ছিল না। সমাজের গতি পশ্চাৎমুখে আর নিম্নমুখে অন্ধকারের দিকে। এ সময় একটি উজ্জ্বল দীপশিখা হাতে নিয়ে সকল লাঞ্ছনা-অপবাদ শিরোধার্য করে মীর মশাররফ হোসেন বঙ্গ-সাহিত্যের অঙ্গনটি আলোকিত করেছেন। তাঁর সমস্ত সাহিত্যকর্মের তাৎপর্য ও সফলতা এরই আলোকে নির্ণয় করতে হবে।

প্রথম গ্রন্থ 'রত্নবতী' (১৮৬৯) থেকে শেষ গ্রন্থ 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী' (১৯১০) পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ে ও বিভিন্ন আঙ্গিকে তিনি মোট ৩৫ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। গ্রন্থগুলির কালানুক্রমিক নাম এরূপ : ১. রত্নবতী (১৮৬৯), ২. গোরাই ব্রিজ বা গৌরীসেতু (১৮৭৩), ৩. বসন্তকুমারী নাটক (ঐ), ৪. জমীদার দর্পণ (ঐ), ৫. এর উপায় কি? (১৮৭৫), ৬. বিষাদ-সিন্ধু (১৮৮৫-১৮৯১), ৭. সঙ্গীত লহরী (১৯৮৭), ৮. গো-জীবন (১৮৮৯), ৯. বেহুলা গীতাভিনয় (ঐ), ১০. উদাসীন পথিকের মনের কথা (১৮৯০), ১১. তহমিনা (১৮৯৭), ১২. টালা অভিনয় (ঐ), ১৩. নিয়তি কি অবনতি? (১৮৯৮), ১৪. গাজী মিয়াঁর বস্তানী (১৮৯৯), ১৫. ভাই ভাই এতই চাই (ঐ), ১৬. ফাস কাগজ (ঐ), ১৭. এ কি! (ঐ), ১৮. পঞ্চনারী পদ্য (ঐ), ১৯. প্রেম পারিজাত (ঐ), ২০. রাজিয়া খাতুন (ঐ), ২১. বাঁধা খাতা (ঐ),২২. মৌলুদ শরীফ (১৯০৩), ২৩. মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা (১ম ভাগ ১৯০৩, ২য় ভাগ ৯০৮), ২৪. বিবি খোদেজার বিবাহ (১৯০৫), ২৫. হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ (ঐ), ২৬. হজরত বেলালের জীবনী (ঐ), ২৭. হজরত আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ (ঐ), ২৮. মদিনার গৌরব (১৯০৬), ২৯. মোসলেম বীরত্ব (১৯০৭), ৩০. এসলামের জয় (১৯০৮), ৩১. বাজীমাৎ (ঐ), ৩২. আমার জীবনী (১ম খণ্ড, ১৯০৮-১৯১০), ৩৩. হজরত ইউসোফ (১৯০৮), ৩৪. ঈদের খোতবা (১৯০৯), ৩৫. বিবি কুলসুম (১৯১০)।[২৪]

মশাররফ হোসেনের রচনাবলীকে বিষয়ের দিক থেকে ৫টি ধারায় বিভক্ত করা যায় : রূপকথা ও ইতিহাসভিত্তিক গল্প-উপন্যাস, বাস্তব সমাজ সমীক্ষামূলক গল্প-নাটক-নক্সা-প্রহসন, ধর্মমূলক জীবনী ও তত্ত্বকথা, আত্মজীবনী এবং পাঠ্যোপযোগী শিক্ষামূলক রচনা।

মশাররফ হোসেন মূলত গদ্যশিল্পী। 'রত্নবতী'তে রাজপুত্র ও মন্ত্রীপুত্রের গল্পের রূপকে বিত্ত বড় না বিদ্যা বড় তার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এই 'কৌতুকাবহ উপন্যাসে'র দেশ-কাল-পাত্র সবই কাল্পনিক, তবে কোন কোন চরিত্র চিত্রণে লেখকের জীবন জিজ্ঞাসার ছায়াপাত আছে। 'রত্নবতী'র প্রথম সমালোচনা বের হয় 'ঢাকা প্রকাশে'। সেখানে এর ভাষার প্রশংসা করা হয়, কিন্তু বিষয়বস্তুর তুচ্ছতার কথা বলা হয়। পত্রিকার ভাষায় "... ইহার লেখা অতি সরল প্রাঞ্জল ও বিশুদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু উপন্যাসটীতে বিশেষ চাতুর্য কিছু প্রকাশ পায় নাই।"[২৫] 'রত্নবতী'র দ্বিতীয় সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'ক্যালকাটা

---

২৩ *মাসিক মোহাম্মদী,* আশ্বিন ১৩৩৬

২৪ *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ১ খণ্ড, ১৯৭৬, পৃ. আট-এগার।

২৫ *ঢাকা প্রকাশ,* ১২ পৌষ ১২৭৬

রিভিউ'তে "This is a romantic tale designed to show that knowledge is of greater importance than wealth, but as it is founded on the marvallous and the supernatural it is not likely to be of much use. The author's argument is to the effect that knowledge is more valuable than wealth, since the former enabled one Sumanta to turn some women into apes, while the latter is effectual to produce that wonderfull result. But as knowledge that we know of can turn into apes, the superiority of knowledge over wealth may well be doubted But we dare say that writer did not intend either to instruct or to argue, but merely to make his readers laugh. We take it that author has concealed his real name under the *nom de plume* of Musalman "[২৬] কুষ্টিয়ার গৌরী নদীতে রেলওয়ে ব্রিজ নির্মাণ কার্য উপলক্ষ্য করে মশাররফ হোসেনের 'গোবাই ব্রিজ বা গৌরী-সেতু' (১৫ পৌষ ১২৭৯) কবিতার বই বচিত। এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাটি পাঠ কবে অক্ষয়কুমার সরকাব 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনা লিখেছিলেন। "গ্রন্থখানি পদ্য। পদ্য মন্দ নহে। এই গ্রন্থকাব আরও বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। মীর মশাররফ হোসেন সাহেবেব বাঙ্গালা ভাষানুরাগিতা বাঙ্গালীর পক্ষে বড প্রীতিকব। ভরসা কবি, অন্যান্য সুশিক্ষিত মুসলমান তাঁহার দৃষ্টান্তেব অনুরাগী হইবেন।"[২৭] এটি তাঁব দ্বিতীয় গ্রন্থ।

তৃতীয় গ্রন্থ 'বসন্তকুমাবী নাটক' (১৫ মাঘ, ১২৭৯)। মশারবফ হোসেন 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "আমাব অনুবাগ তরুর দ্বিতীয় কুসুম বসন্তকুমারী প্রস্ফুটিত হইল। বাসন্তী সুসৌরভ এ কুসুমে আছে কি না, নিজে আমি সেটি জানি না। ... নাটক রচনায় এই আমাব প্রথম উদ্যম ; ইহাতে নানা দোষ সম্ভাব অবশ্যম্ভাবী।"[২৮] এজন্য লেখক পাঠকের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন। ইন্দ্রপুরের বৃদ্ধ রাজাব তরুণী ভার্যা যুবরাজ নরেন্দ্র সিংহের প্রতি প্রণয়াসক্তা হন, কিন্তু কামানুরাগিতা চরিতার্থ করতে অসমর্থ হয়ে জিঘাংসা প্রবৃত্তি বশে যুবরাজ ও যুবরাজপত্নী বসন্তকুমারীকে দগ্ধ করে হত্যা করেন। অদম্য দেহজকামনার অভিব্যক্তি এবং পরিণাম নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। 'বসন্তকুমারী নাটকে'র আত্ম-প্রকাশের অব্যবহিত পরে 'সোমপ্রকাশে' (১৪ ফাল্গুন, ১২৭৯) এর দীর্ঘ সমালোচনা হয়। তাতে মশাররফের ভাষার ও অভিজ্ঞতার প্রশংসা করা হয়, কিন্তু আঙ্গিকের ত্রুটি ও বিযয়ের তুচ্ছতার কথা বলা হয়। "আমাদের এই আশঙ্কা ছিল, মুসলমান ও ইংরাজ প্রভৃতি অন্য সমাজের লোকেরা আমাদিগের সমাজের বৃত্তান্ত লইযা নাটক রচনা করিয়া কখন কৃতকার্য হইতে পারিবেন না। কিন্তু বসন্তকুমারী নাটকখানি আমাদিগের এ সংস্কারকে বিপর্য্যস্ত করিযা তুলিয়াছে। উহার প্রণয়নকর্তা মুসলমান। নাটকখানি

২৬ *The Calcutta Review*, Vol L No. 99, 1870, p 235

২৭ *বঙ্গদর্শন*, পৌষ ১২৮০
প্রকাশকালেব দিক থেকে বসন্তকুমারী নাটক প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় গ্রন্থ।

২৮ *মশাররফ রচনা-সম্ভার*, পৃ. ১০৫

আদ্যপান্ত পাঠ করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়, গ্রন্থকার আমাদিগের আচার ব্যবহারাদিগত নিগূঢ় বৃত্তান্তগুলি সূক্ষ্মরূপে অবগত হইয়াছেন। ... বসন্তকুমারী নাটককার সাধু বাঙ্গালায় গ্রন্থ না লিখিয়া যদি চলিত ভাষায় লিখিতে যাইতেন, তাঁহার গ্রন্থ অনাদরোপহৃত হইত সন্দেহ নাই। ... গল্প রচনা বিষয়ে গ্রন্থকারের কোন প্রকার চাতুর্য প্রকাশ হইতেছে না। গ্রন্থখানি করুণরস প্রধান, কিন্তু যেরূপে গ্রন্থের উপসংহার করা হইয়াছে, তাহাতে 'ফুললো আর মলো' এই যে প্রবাদ বাক্যটী আছে তাহাই আমাদের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইল। গ্রন্থকার ততব্যস্ত না হইলে উপসংহারটি অধিকতর মনোহর হইত সন্দেহ নাই।"[২৯] মশাররফ হোসেন নাটকখানি 'মহামহিমমিত্র' আবদুল লতিফ খান বাহাদুবকে উৎসর্গ করেন। লাহিনীপাড়ায় মশাররফের বাটিতে 'বসন্তকুমারী নাটকে'র অভিনয় হয়।[৩০]

তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ 'জমিদাব-দর্পণ' নাটক (চৈত্র ১২৭৯)। নাটকখানি উপহার দিয়েছেন পদমদীর জমিদার মীর মোহাম্মদ আলীকে। তিনি 'পাঠক সমীপে নিবেদন' অংশে বলেছেন, "নিরপেক্ষভাবে আপন মুখ দর্পণে দেখিলে যেমন ভাল মন্দ বিচার করা যায়, পরের মুখে তত ভাল হয় না। জমীদার বংশে আমার জন্ম, আত্নীয়-স্বজন সকলেই জমীদার, সুতরাং জমীদারের ছবি অঙ্কিত করিতে বিশেষ আয়াস আবশ্যক করে না। আপন মুখ আপনি দেখিলেই হইতে পারে। সেই বিবেচনায় জমীদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছে, যদি ইচ্ছা হয়, মুখ দেখিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন।"[৩১] 'জমিদার দর্পণে'র আদর্শ দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' (১৮৫৮)। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র নাটকটির সমালোচনা করেন। "জমীদারদিগের অত্যাচারের কথা উদাহরণের দ্বারা বর্ণিত করা উহার উদ্দেশ্য। নীলকরদিগের সম্বন্ধে বিখ্যাত নীলদর্পণের যে উদ্দেশ্য ছিল, সাধারণ জমীদার সম্বন্ধে ইহারও সেই উদ্দেশ্য। ... নাটকখানি অনেকাংশে ভাল হইয়াছে। আমরা প্রজা, জমীদারের কথা বলিতে চাহি না, কিন্তু ইহা বলিতে পারি যে, সেসন আদালতের চিত্রটি অতি পরিপাটি হইয়াছে।"[৩২] মশাররফ হোসেন এই প্রথম স্বসমাজকে স্পর্শ করেছেন এবং সমাকালীন সমস্যার কথা ব্যক্ত করেছেন। শিল্পীর স্বভাবজ সহমর্মিতার বশবর্তী হয়ে তিনি সমশ্রেণীর বিরুদ্ধেও কলম ধরেছেন — অর্থলোলুপ, ইন্দ্রিয়পরায়ণ, প্রজানিপীড়ক জমিদারদের মূর্তি তুলে ধরেছেন এই নাটকে।

পঞ্চম গ্রন্থ 'এর উপায় কি?' প্রহসন। কাহিনীর পটভূমি মধ্যবিত্ত সমাজ। মদ্যাসক্ত ও বেশ্যাসক্ত পুরুষের অনাচার ও উচ্ছৃঙ্খলতার চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের (১২৯৯) ভূমিকায় মশাররফ হোসেন বলেছেন, "... বিষয়টি ভাল নয় — কিন্তু রাধাকান্ত বাবুর মত স্বামী, মুক্তকেশীর ন্যায় স্ত্রী, মদনের মত এয়ার খুঁজিলে যে, না পাওয়া যায়

২৯· বিনয় ঘোষ — সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৬৮৬-৮৭

৩০ *এডুকেশন গেজেট,* ১০ শ্রাবণ ১২৮০

৩১ *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃ.১৯১

৩২ *বঙ্গদর্শন,* ভাদ্র ১২৮০

তাহা নহে। এ যাতনা অনেকেরই ভোগ করিতে হইতেছে। কত পরিবারের চক্ষের জল অবিরত ঝরিতেছে। সম্পূর্ণ নহে, — কোনও সত্য ঘটনার কতক সময়ের চিত্রই 'এর উপায় কি?' বিষয়টী যতই কেন কদর্য্য হউক না, ঘরের কথা যে পরের কানে গিয়াছে, — আর কেন? বাবুদিগের মনে এই কথাটা উদয় হইলেও আমার পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করি।"[৩৩] লেখকের উদ্দেশ্য যে সমাজ-সংস্কার, এখানে তা স্পষ্ট। ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রহসনখানির বিরূপ সমালোচনা হয়। "এদেশের মুসলমান ভদ্র লোকেরা সাধারণত সাহিত্যে বীতস্পৃহ ; বাঙ্গালা সাহিত্যের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং যখন তাঁহাদিগের মধ্যে কেহ কদাপি সখ করিয়া বাঙ্গালা লিখিতে ইচ্ছা করেন, তখন আমরা নিতান্ত সুখী হই, এবং তাঁহাদিগের প্রশংসা করিতে প্রাণপণে যত্ন করি। কিন্তু তাঁহারা যশোলাভের এমন সহজ পথ থাকিতেও, কল্পনায় ও ভাষায় যার পর নাই জঘন্য রুচির পরিচয় দেন,—অশ্লীল পদাবলীর ছড়াছড়িকেই কাব্যরসে রসিকতা মনে করেন, তখন এই গ্রন্থকারের ন্যায় আমরা বিপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করি — এর উপায় কি?"[৩৪] মদ্যপান, বেশ্যালয় গমন প্রভৃতি অসামাজিক আচরণ নিয়ে সেযুগে নাটক-প্রহসন অনেকে লিখেছেন। প্যারিচাঁদ মিত্রের 'মদ খাওয়া বড় দায়, জাত থাকার কি উপায়' (১৮৫৯), মধুসূদনের 'একেই কি বলে সভ্যতা' (১৮৬০), দীনবন্ধুর 'সধবার একাদশী' (১৮৬৬) প্রভৃতি এ শ্রেণীর রচনা। মশাররফ 'সধবার একাদশী'র দ্বারা প্রভাবিত হন। উল্লেখযোগ্য যে, ইন্দ্রিয়চর্চায় মশাররফ হোসেনের ব্যক্তিগত জীবনেও পদস্খলন ঘটেছিল।[৩৫]

মশাররফ হোসেনের পরবর্তী রচনা 'বিষাদ-সিন্ধু'। তিনটি 'পর্বে' এটি সম্পন্ন - মহররম পর্ব (১২৯১), উদ্ধার পর্ব (১২৯৪) ও এজিদ পর্ব (১২৯৭) মশাররফ হোসেনের সমস্ত খ্যাতির মূলে আছে 'বিষাদ-সিন্ধু' উপন্যাস। এটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। কারবালার বিষাদময় কাহিনী নিয়ে উপন্যাসখানি রচিত। কল্পনার যথেষ্ট আশ্রয় থাকলেও এটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের পর্যায়ভুক্ত। মধুসূদন যেমন পৌরাণিক কাহিনীকে আধুনিক চিন্তার বাহন করেছিলেন, মশাররফ তেমনি দোভাষী পুথি প্রভাবিত পৌরাণিক-ঐতিহাসিক কাহিনীকে নতুন চিন্তার বাহন করেছিলেন। তাঁরা উভয়েই ধর্মের বন্ধন স্বীকার করেননি। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে রাবণ ও এজিদ সংগ্রাম করে উভয় লেখকের সহানুভূতি পেয়েছেন। অধার্মিকতা, পাশবিকতা প্রভৃতি দীর্ঘকালের আরোপিত মনুষ্যত্বহীন চরিত্র-ধর্ম থেকে তাঁদের মুক্ত করে মানবোচিত চারিত্রিক দোষ-গুণ আরোপ করেছেন। 'বিষাদ-সিন্ধু'র উৎস ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখক 'মুখবন্ধে' বলেছেন, "পারস্য ও আরব্য গ্রন্থ হইতে মূল ঘটনার সারাংশ লইয়া 'বিষাদ-সিন্ধু' বিরচিত হইল। প্রাচীন কাব্যগ্রন্থের অবিকল অনুবাদ

৩৩ *মশাররফ রচনা-সম্ভার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫ (*'লিখকের কয়েকটী কথা'* দ্রষ্টব্য)।

৩৪ *বান্ধব*, আশ্বিন ১২৮৩

৩৫ আনিসুজ্জামান — 'মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'এর উপায় কি?' *পাণ্ডুলিপি*, ৩ খণ্ড ১২৮০, পৃ. ১৬৩

করিয়া প্রাচীন কবিগণের বচনাকৌশল এবং শাস্ত্রের মর্যাদা রক্ষা করা অত্যন্ত দুরূহ। ... মহরমের মূল ঘটনাটী বঙ্গভাষাপ্রিয় পাঠক পাঠিকাগণের সহজে হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়াই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য।"[৩৬] 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'য় এর সমালোচনা হয়। "প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তান্ত 'বিষাদ-সিন্ধু'ব গর্ভ পূর্ণ হইয়া বিষাদ-সিন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিযাছে। ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণরসে পূর্ণ পাঠকালে চক্ষে জল রাখা যায় না।"[৩৭] পরবর্তীকালে অক্ষযচন্দ্র সরকার বলেন, "... তাঁহার 'বিষাদ-সিন্ধু আমাকে বিচলিত কবিযাছিল। . . মহরমেব আখ্যান-কাব্য বিষাদ-সিন্ধু কিরূপ প্লাবনী করুণরসে টলটল করিতেছে।"[৩৮] লেখকের গদ্যভঙ্গি অত্যন্ত বেগবান, প্রমূর্ত ও স্বচ্ছন্দগামী। 'ভারতী' মন্তব্য করে, "ইতিপূর্বে একজন মুসলমানেব এত পবিপাটি বাঙ্গালা রচনা আব দেখিয়াছি বলিযা মনে হয না।"[৩৯] পাঁচ মাস আগে 'ঢাকা প্রকাশ' মন্তব্য করেছিল, "এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে, কেবল মুসলমান নয়, হিন্দুগণেবও বিলক্ষণ প্রীতি জন্মিতে পারে।"[৪০]

তিনি 'বিষাদ-সিন্ধু'র প্রথম সংস্করণ দেলদুযাবেব জমিদার-পত্নী 'শ্রীমতি করিমন্নেসা খাতুন'কে উৎসর্গ কবেন।[৪১] পরবর্তী সংস্করণগুলিতে সেটি বর্জন করেন। সম্ভবত জমিদাব পবিবারেব সাথে মতবিবোধের কাবণে তিনি সেটি প্রত্যাহাব করেন।

সপ্তম গ্রন্থ 'সঙ্গীত লহবী' (১২৯৪) সঙ্গীতেব বই, অধিকাংশ গানে সুব ও তালেব উল্লেখ আছে। গীতিকবিতা হিসাবেও এগুলি সুখপাঠ্য। মীবপবিবাবে সঙ্গীতের চর্চা ছিল ; মশাররফেব পিতা বাদ্য সঙ্গীত চর্চা কবতেন। বাইজীর নাচ-গান জমিদাব-পবিবারে সংস্কৃতিচর্চার অঙ্গ হিসাবে পবিগণিত হত। সঙ্গীতে রসবোধ তাঁদের আবশ্যক ছিল। মশাররফ হোসেন পারিবাবিক সূত্রে সঙ্গীতে জ্ঞান লাভ করেছিলেন। প্রেমই 'সঙ্গীত লহরী'র মুখ্য বিষয, তবে কোন কোনটিতে সমাজেব চিত্র আছে। 'ললিত রাগিণী' ও 'আড়াটেকা তালে'ব একটি গান এরূপ :

কাতবে ডাকি তোরে, শুন মা ভারতেশ্ববী।
অবিহিত অবিচারে আব বাঁচিনে, মরি মবি॥
থাক মা সাগর পারে,
কভু না হেরি তোমারে,
রক্ষ মা-প্রজা কিংকরে,
বিনয়ে মিনতি করি॥

---

৩৬ মীর মশাববফ হোসেন — *বিযাদ-সিন্ধু,* মহবরম পর্ব, ১৮৮৫, 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

৩৭ *গ্রামবার্তা প্রকাশিকা,* জৈষ্ঠ ১২৯২ ; *'সাহিত্য-সাধক চবিতমালা,* ১ খণ্ড, পৃ ১৬ ('মীব মশাববফ হোসেন' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

৩৮ *বসুধা,* ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৮

৩৯ *ভাবতী,* ফাল্গুলন১২৯৩

৪০ *ঢাকা প্রকাশ,* ৪ আশ্বিণ ১২৯৩

৪১ 'পবিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য

দয়া মমতা পালিনী
প্রজার দুঃখ বিমোচিনী
দীন-দুঃখ নাশিনী
মা, তুমি শুভংকরী।
জননী বলিযে ডাকি, শুন সিন্ধু পাবে থাকি।
করুণা কটাক্ষ বাখি, তর মা ভাবতেশ্বরী॥[৪২]

ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্তের 'নীলকর', 'দুর্ভিক্ষ' ইত্যাদি কবিতায় অনুরূপ ভাব ও সুর আছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ-প্রভাকরে'র সাথে মশাবরফ হোসেনেব প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, আমরা তা ইতিপূর্বে উল্লেখ কবেছি।

মশাবরফ হোসেনেব অষ্টম গ্রন্থ 'গো-জীবন' (২৫ ফাল্গুন ১২৯৫) একখানি প্রবন্ধ পুস্তক। প্রথমে 'কৌতুকাবহ গল্প' পবে কাব্য, তৎপরে তিনখানি নাটক ও প্রহসন, একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস, একখানি সঙ্গীত, অতঃপব প্রবন্ধ পুস্তক — মশাররফ হোসেন ঘনঘন আঙ্গিকের পবিবর্তন কবেছেন ; অবশ্য সময়সীমা অনেক, প্রায ২০ বছবের ব্যবধান। ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে গো-বধ নিয়ে দীর্ঘকালের বিবাদ ছিল; মশাররফ হোসেন গো-হত্যার বিপক্ষে মত প্রকাশ করে 'গো-জীবন' রচনা করেন। মুসলমানদের স্বার্থের পরিপন্থী বলে তাদের মধ্যে থেকে এর প্রতিবাদ ওঠে : বাদ-প্রতিবাদ শেষে আদালত পর্যন্ত গড়ায়।[৪৩] সেদিক থেকে 'গো-জীবন' সমাজে আলোড়ন তুলেছিল। 'গো-জীবনে'র প্রথম সমালোচনা হয় 'ভারতী ও বালক' পত্রিকায়। "কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই যাহাতে গোজীবন রক্ষায় সচেষ্ট হন এই অভিপ্রায়ে এই পুস্তকখানি লিখিত। লেখক মুসলমান হইয়া এ বিষয়ে যেরূপ উদাবতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা পড়িয়া কেবল আনন্দ নহে, আমাদেব আশ্চর্য্যও জন্মিল। ভরসা করি, অন্য মুসলমানগণ তাঁহার অনুসবণ করিবেন।"[৪৪] দ্বিতীয় সমালোচনা হয় 'অনুসন্ধানে'। "মীর মশাররফ হোসেন মহাশয় স্বয়ং মুসলমান হইয়াও গো-হত্যার প্রতিকার বিষয়ে যে এই পুস্তক লিখিতে সাহসী হইয়াছেন, ইহাতে তাঁহাকেই প্রকৃতই হৃদয়বান বলিতে হয়। তিনি তাঁহাদের শাস্ত্র হইতেও দেখাইয়াছেন যে, গো-হত্যা তাঁহাদের শাস্ত্রসিদ্ধও নহে।"[৪৫] তৃতীয় সমালোচনা প্রকাশিত হয় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য়। "তিনি (মশাররফ) মুসলমান হইয়া স্বীয় ভ্রাতা মুসলমানদিগকে গোমাংস সেবনে বিরত করিবাব জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, গোজাতির উপকারিতা ভূয়সী, উহার নিধনে দেশের দুগ্ধ প্রভৃতি সুখাদ্যের ও কৃষিকার্য্যের হানি, গোমাংস সেবনে উৎকট ব্যাধি হইবার সম্ভাবনা—সেহেতু উহা এদেশের উপযোগী নহে। দয়াধর্মের মূল এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তিনি এ কার্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন সন্দেহ নাই।"[৪৬]

৪২ *মশাররফ রচনা-সম্ভার*, ১ম খণ্ড, পৃ. ৬২২
৪৩ চতুর্থ অধ্যায়ের 'ধর্ম' অংশে এ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা আছে।
৪৪ *ভারতী ও বালক*, চৈত্র ১২৯৫
৪৫ *অনুসন্ধান*, ১৫ বৈশাখ ১২৯৬
৪৬ *তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা*, বৈশাখ ১৮১১ শকাব্দ (১২৯৬ বঙ্গাল)

গদ্য-পদ্যে রচিত 'বেহুলা গীতাভিনয়' (৭ আশ্বিন, ১২৯৬) দেশীয় যাত্রার ঢঙে রচিত। তিনি 'অগ্রে পাঠ্য' শীর্ষক ভূমিকায় লিখেছেন, "বেহুলা লখিন্দরের কথা নতুন নহে। বঙ্গের স্ত্রীমহলে বেহুলার কাহিনী বড়ই আদরের। এই ঘটনা লইয়াই যশোহর অঞ্চলে প্রথম ভাসান যাত্রার সৃষ্টি হয়। ভাসানের ভাষাদোষে, রচয়িতার অযথা বর্ণনায় এবং পরিশুদ্ধ সঙ্গীতের অভাব হেতুতেই শিক্ষিত সমাজে ভাসান যাত্রার আদর নাই। ... মনসার ভাসানই 'বেহুলা গীতাভিনয়'। এই গীতাভিনয়ে শিক্ষিত সমাজের কথঞ্চিৎ পরিমাণ চিত্তাকর্ষণ করিতে পারিলেই, আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।"[৪৭] উপকথাশ্রিত গ্রাম্য যাত্রাকে শিক্ষিত শ্রেণীর উপভোগ্য করে তোলার উদ্দেশ্যেই মশাররফ হোসেন এটি রচনা করেছিলেন। 'রত্নবতী' ও 'বসন্তকুমারী'র কাহিনী রূপকথাধর্মী। 'বিষাদ-সিন্ধু'র কাহিনীও আরবের পুরাণ-ইতিহাস মিশ্রিত। 'বেহুলা গীতাভিনয়ে' দেশীয় উপকথা-ব্রতকথার ছায়াপাত আছে। গল্প-উপন্যাস-নাটকের জীবন-কাহিনী অনুসন্ধানে লেখকের এই মানসক্রিয়াটি লক্ষ্যযোগ্য। তিনি সমকালীন জীবনকে বেশি আশ্রয় করেননি। পরবর্তীকালে রচিত 'তহমিনা'র কাহিনীর উৎস ফেরদৌসীর 'শাহনামা'। দু'একটি নাটক-প্রহসন ও আত্মচরিত ছাড়া তিনি সমকালীন সমাজজীবনকে আর অবলম্বন করেননি। শেষ দিকের প্রায় সব রচনা ইসলাম ধর্ম ও ধার্মিক পুরুষের জীবনেতিহাস। অতীতচারিতা ও কল্পনাশ্রয়িতা রোমান্টিক মনোভঙ্গির লক্ষণ ; মশাররফ হোসেনের রোমান্সপ্রিয়তা ছিল সন্দেহ নেই ; তবে মশাররফ হোসেন বর্তমান জীবনের সমস্যাকে সচেতনভাবে এড়িয়ে গেছেন। মুসলমান সমাজের বিষয় নিয়ে কোন কিছু লেখা সহজ ছিল না। এক 'গো-জীবন' লিখে তিনি বিপদাপন্ন হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত কপি তুলে নিয়ে এবং দ্বিতীয় বার প্রকাশ করবেন না এই শর্তে বিরোধী পক্ষের সাথে আপোষ মীমাংসা করতে হয়।

'জমিদার দর্পণে'র উপহারপত্রে তিনি বলেছেন, "অনেক শত্রু দর্পণখানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।"[৪৮] 'বঙ্গদর্শনে' সমালোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র 'জমিদার দর্পণে'র প্রচার বন্ধ রাখতে পরামর্শ দিয়েছেন। "আমরা পরামর্শ দিই যে গ্রন্থকারের এ সময়ে এ গ্রন্থ বিক্রয় ও বিতরণ বন্ধ করা কর্তব্য।"[৪৯] 'এর উপায় কি?' প্রহসনটি সম্পর্কে সমালোচনা করে 'সুলভ' প্রভৃতি পত্রিকা লেখককে 'গালাগালি' দেন এবং 'বিশেষ সম্বোধনে সম্বোধন' করেন। এমন কি, যে 'প্রিয়তম বন্ধু ভ্রাতা'কে পুস্তকখানি উপহার দিয়েছিলেন, তিনি পুস্তকের সাথে নিজের নাম আর জড়িত রাখতে চাননি। এ সমস্ত তথ্য মশাররফ হোসেন দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন।[৫০] 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' তিনি বলেছেন, "মনের কথা অকপটে মুখে প্রকাশ করা বড়ই কঠিন। বিশেষ সংসারীর পক্ষে নানা বিঘ্ন, নানা ভয়, এমন কি জীবনের সংশয়।"[৫১] ধর্মের বিষয় নিয়ে

৪৭ *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৬-২৭
৪৮ *পূর্বোক্ত,* পৃ. ২৯১
৪৯ *বঙ্গদর্শন,* ভাদ্র ১২৮০
৫০ *মশাররফ রচনা-সম্ভার,* ১ম খণ্ড, পৃ. ২৫৫
৫১ ঐ, পৃ. ৩৭৩

লেখাও সহজ ছিল না। শব্দ ব্যবহারেও ছুৎ-মার্গতা ছিল। হজরত মহম্মদকে 'প্রভু', 'মহাপ্রভু' বলা চলবে না। 'মৌলুদ শরীফে'র সমালোচনা করে 'নবনূর' মন্তব্য করে, "হজরত মহম্মদ (দঃ) প্রভু ও মহাপ্রভু শব্দে বিশেষিত হইলে তাহার পবিত্র নামের মর্যাদা কিছু বাড়ে কি? যীশুখৃষ্ট এবং জগদীশ্বরও প্রভু, মহাপ্রভু ; শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যও মহাপ্রভু। আমরা জানি না, তাই কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম।"[৫২] 'বিবি খোদেজার বিবাহ' নামক পুস্তকের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি বলেছেন যে, বাংলার মুসলমান পাঠকশ্রেণীর চৌদ্দ আনা পদ্যাশ্রিত 'মুসলমানী বাঙ্গালা' বা বটতলার পুথির ভক্ত?[৫৩] মুসলমানী বাঙ্গালার গ্রন্থসমূহ ছিল আমীর হামজা, জৈগুন সোনাভান, গোলে বকাঅলী, চাহার দরবেশ, জঙ্গনামা প্রভৃতি আরব্য ও পারস্য উপন্যাসের অলৌকিক ও আজগুবি কাহিনী। তারা এ শ্রেণীর গ্রন্থ পাঠ করেই তৃপ্তি লাভ করে, অন্য কাব্য গ্রন্থ বা নতুন রীতিতে রচিত গদ্য গ্রন্থ পছন্দ করে না। যুগের ধর্ম, সমাজের রীতি এবং পাঠকের মনোভাবকে মশাররফ হোসেন পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারেননি ; সমাজের গতি এমন ছিল না যে তিনি নতুন পাঠক সৃষ্টি করবেন ; রচনায় অসাধারণ সৌকর্য দ্বাবা বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকগণকে তাঁর পুস্তক পড়তে বাধ্য করেছিলেন, মশাররফের সেরকম প্রতিভাও ছিল না। সুতরাং তিনি যুগচাহিদার কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন।

'উদাসীন পথিকের মনের কথা' (১২৯৭) ও 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী' (১৫ আশ্বিন ১৩০৬) গদ্যে আত্মজীবনী। 'উদাসীন পথিক' ও 'গাজী মিয়াঁ' মশাররফ হোসেনের সাহিত্যিক ছদ্মনাম। পারিবারিক ও পারিপার্শ্বিক জীবন-কথা লেখকের বর্ণনার গুণে প্রায় উপন্যাসের ধর্ম লাভ করেছে। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'র 'মুখবন্ধে' তিনি বলেছেন, "জলধির জলের ঘাত প্রতিঘাতেই তরঙ্গের সৃষ্টি। সংসার সাগরেরও ঠিক তাহাই। সেই ভীষণ তরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাতে যে স্তরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাই একে একে ভাঙ্গিয়া দেখাইব। আর মনের কথা শুনাইব।"[৫৪] 'ভাবতী ও বালক' উক্ত গ্রন্থের সমালোচনা করে বলে, "সমালোচ্য পুস্তকখানি ঠিক উপন্যাস নহে, ইহা উপন্যাসাকারে নীল অত্যাচারের কাহিনী পূর্ণ। অত্যাচারের বিবরণ বেশ হইয়াছে — তবে গল্পের ভাগ তেমন পরিপাটি হয় নাই।"[৫৫] ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান মন্তব্য করেন, "মশাররফ হোসেনের যে শিল্পী-সত্তার সমাজ সম্পর্কে ছিল সচেতনতা, দেশের প্রতি ছিল সুগভীর মমতা, পাপের প্রতি শুধু ঘৃণাই নয়, ছিল তীব্র ক্রোধ, ধর্মনির্বিশেষে মানুষের প্রতি ছিল অকৃত্রিম ভালবাসা, যার প্রকাশ দেখি 'জমিদার দর্পণ' নাটকে এবং 'এর উপায় কি' প্রহসনে, তারই একটি উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি ঘটেছে 'উদাসীন পথিকের মনের কথা' গ্রন্থে।"[৫৬] 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'তে আঙ্গিকের দিক দিয়ে মশাররফ হোসেন বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে'র অনুসরণ করেছেন। বস্তানীর চরিত্র ও স্থানের নাম কাল্পনিক যা আত্মজীবনীর আদর্শের

---

৫২ *নবনূর*, শ্রাবণ ১৩১১

৫৩ *বিবি খোদেজার বিবাহ*, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

৫৪ *মশাররফ রচনা-সম্ভার*, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৭৪

৫৫ *ভারতী ও বালক*, বৈশাখ ১২৯৮

৫৬ *মশাররফ রচনা-সম্ভার*, ৩য় খণ্ড, পৃ ৪২

পরিপন্থী। কিন্তু মশাররফের ব্যক্তিগত জীবনীর সহিত পরিচয় থাকলে ছদ্মনামের অন্তরালে কারা কি ভূমিকায় আছেন, তা চিনতে অসুবিধা হয় না। কর্মস্থল দেলদুয়ারের অভিজ্ঞতা বস্তানী রচনার প্রধান উৎস। 'যম দ্বার' হল দেলদুয়ার আর 'পয়জারন্নেসা' হলেন করিমুন্নেসা চৌধুরানী। মশাররফ হোসেন এঁরই অধীনে দেলদুয়ার এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন। লেখক স্বয়ং 'গাজী মিয়াঁ' ও 'ভেড়াকান্ত' নাম নিয়েছেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বিভিন্ন দৃষ্টকোণ থেকে 'গাজী মিয়াঁর বস্তানী'র দীর্ঘ সমালোচনা করেন। "গাজী মিয়াঁর বস্তানী একখানি বিচিত্র সমাজ চিত্র, সুশোভিত সুলিখিত উপন্যাস। ইহাতে নাই এমন রস দুর্লভ। কটু, তিক্ত, কষায়, অম্ল যাহা চাও তাহাই প্রচুর অথচ সকল রসের উপর হৃদয়কাতর করুণ উথলিয়া পড়িতেছে। গ্রন্থকার স্পষ্টবাদী হইলে শ্রুতিকটু দোষ পরিহার করিতে পারেন না ; গাজী মিয়াঁর কথা স্থানে স্থানে বড়ই কড়া হইয়াছে। তিনি দৃঢ় মুষ্টিতে কশা ধারণ করিয়া যেখানে যাহার পৃষ্ঠে আঘাত করিয়াছেন, সেখানেই যেন সপাসপ আঘাত ধ্বনি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কাতর ক্রন্দনের সঙ্গে রক্তধারা ফুটিয়া ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। সে আঘাত কাহার পৃষ্ঠে বা পতিত হয় নাই? পাঠক। হয়ত তুমি আমি আর তাহারা কেহই বাদ পড়ে নাই। বস্তানীর পল্লীচিত্র ইংরাজ রাজ্যের লজ্জার বিষয় ; পড়িতে পড়িতে মনে হয় ইংরাজ রাজ্যের বাহিরে বিলাতি বার্ণিস, ভিতরে টিনের পাতা, দেখিতে খুব জমকাল। আইন আছে, আদালত আছে। আপীলের উপব আপীল আছে, বিচার নাই। রাজা প্রজা সকলের পক্ষেই এরূপ গ্রন্থ সবিশেষ শিক্ষাপ্রদ।"[৫৭]

'তহমিনা', 'রাজিয়া খাতুন', 'প্রেম পারিজাত', 'নিয়তি কি অবনতি' ইত্যাদি গ্রন্থেব কোনটি সাময়িকপত্রে (অংশত) প্রকাশিত হয়, কোনটির নাম কেবল বিজ্ঞাপনে ছাপা হয়। এগুলি এখন দুষ্প্রাপ্য।

'মৌলুদ শরীফ' (১৩১০), 'বিবি খোদেজার বিবাহ' (বৈশাখ ১৩১২), 'হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ' (১ শ্রাবণ ১৩১২), 'হজরত বেলালের জীবনী' (১৩১২), 'আমীর হামজার ধর্মজীবন লাভ' (কার্তিক ১৩১২) ইত্যাদি ধর্মপুস্তক ও সন্তজীবনী। প্রথমখানি গদ্য-পদ্যে রচিত, পরের চারখানি কাব্য। বিবি খোদেজা (মহম্মদের সহধর্মিনী), হজরত ওমর (দ্বিতীয় খলিফা), হজরত বেলাল (ধার্মিক পুরুষ), হজরত আমীর হামজা (বীরপুরুষ) আরবের ইসলামের গৌরবময় যুগের ঐতিহাসিক চরিত্র। মশাররফ হোসেন 'মদিনার গৌরব', 'মোসলেম বীরত্ব', 'এসলামের জয়', 'হজরত ইউসুফ, 'ঈদের খোতবা' প্রভৃতি গ্রন্থও রচনা করেছেন যেগুলির ভিত্তি ধর্মজীবন। জীবনের শেষ দশকে তিনি যে বাস্তব জীবন থেকে সরে এসে ধর্মমূলক রচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন, তা স্বীকার করতে হয়। ধর্মানুরক্তি এর একটি কারণ হতে পারে।[৫৮] বঙ্কিমচন্দ্রও শেষের দিকে ধর্মপুস্তক রচনায়

৫৭. *প্রদীপ*, পৌষ ১৩০৮

৫৮. প্রথম দিকে তিনি ধর্মনিরপেক্ষ একটি উদাব মনোভাবের পরিচয় দিলেও, শেষের দিকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পবিবর্তন হযেছিল, তাব প্রমাণ পাওযা যায়। ১৮৯৯ সালের ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডুকেশন সম্মেলনে' সৈয়দ আমীব আলী সভাপতির ভাষণে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যর্থতার কথা উল্লেখ কবে আলীগড় কলেজের আদর্শে কলিকাতা ও অন্যান্য মাদ্রাসা শিক্ষার

ঝুঁকে পড়েছিলেন। মশাররফ হোসেনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কারণও ছিল। তিনি 'বিবি খোদেজার বিবাহে'র 'বিজ্ঞাপন' শীর্ষক দীর্ঘ ভূমিকায় বলেছেন যে, ইসলামের অতীত গৌরবময় কাহিনী নিয়ে পদ্যে রচিত বটতলার রচনাগুলির পাঠকের সংখ্যা বেশি — প্রায় চৌদ্দ আনা। আধুনিক সাহিত্যের পাঠক দু'আনা মাত্র। প্রথম শ্রেণীর রচনার ব্যবসায় করে কত যে দত্ত, বসাক ধনী হয়েছেন, সেকথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। তাঁর ভাষায়,-- "পদ্যে-পদ সংযোজিত না করিতে পারিলে সে আবার লিখক কিসের? একথার প্রমাণ এই যে, হাজার হাজার মুসলমানি বাঙ্গালা পুস্তক বটতলার বাজার হাট পুরিয়া রহিয়াছে, ইহার মধ্যে একখানি পুস্তকও পদ্যপদ ভিন্ন নহে। সমুদয় পয়ার ত্রিপদী চৌপদীতে লিখিত। অনেক পুস্তকে আবার রাগবাগিণী তালের পরিচয়ে গানও আছে। এই প্রকার নিত্য নূতন প্রকাশ হইতেছে। কত হিন্দু মহাশয় ছাপাখানা করিয়া মুসলমানি বাঙ্গালা পুস্তক ছাপাইতেছেন। ... বেশ দশ টাকা লাভের জন্য কত পাইন, দে, দত্ত, শীল, বসাক মহাশয় মল্লিকা হাজার, কেয়ামতনামা, গো-কোরবাণীর ফজিলাত, হজরত এসমাইলের বিবরণ বিক্রয় করিতেছেন। ... ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে—মুসলমান সমাজে পদ্যের বড়ই আদর।"[৫৯]

দেলদুযাবের ম্যানেজাবীর পদ ত্যাগ কবার পব মশাবরফ হোসেন আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়েছিলেন। বগুড়া, কলিকাতা, পদমদীতে চাকুরীর সন্ধানে ঘুরেছেন। অর্থোপাজনের প্রয়োজনে তিনি চৌদ্দ আনা পাঠকেব মনোভাবেব উপযোগী কাব্য রচনা করেছিলেন বলেই আমাদেব ধারণা। 'মৌলুদ শবীফে'র ভেতর দিয়ে তিনি প্রথম

সংস্কাব কবাব অভিমত ব্যক্ত কবেন। আব্দুব বহমান পরিচালিত 'মহামেডান লিটারেবী সোসাইটি' এক জরুবী সভায় (৯ জুন ১৯০০)-এর প্রতিবাদ কবে এবং সভায় সিদ্ধান্তের সপক্ষে জনমত সংগ্রহ করে। মীব মশাররফ হোসেন লিখিতভাবে সোসাইটিকে তাঁর মত জানিয়েছিলেন। তাঁব পুরো বক্তব্যটি এখানে তুলে দেওয়া হল : Extract from the opinion of Moulvi Meer Mosharraf Hossain, late Honorary Magistrate, Kustia and Tangail Resolution I. The Present system of Education is highly beneficial to the Musalman Students in Bengal and I see no reason why a change should be introduced. A system which time and experience have proved conducive to progress and improvement, should not in my opinion be interfered with Resolution II The Madrashas supported by the Mohsin Fund have done immense good toward diffusing the tenets of Islam among the generality of the Musalmans of Bengal If any charge is at all necessary, I would suggest a thorough education in classical Bengali for Mahomedan youths Resolution III A thorough religious education is indispensible for youths receiving education in Schools and Colleges. If the cultivation of our religious literature and inculcation of the principles of our faith be neglected, very deplorable consequences will be the result" *Abstract of the Proceedings of an Extraordinary Meeting of this Committee of the Mohamedan Literary Society of Calcutta held at No. 16 Taltollah, on 9th June*, 1900, pp. 44-45

৫৯ মীর মশাররফ হোসেন—*বিবি খোদেজার বিবাহ,* কলিকাতা, ২ বৈশাখ ১৩১২; 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

ধর্মভাবজগতে প্রবেশ করেন। গ্রন্থের 'ভূমিকা'য় তাঁর মনোভাবের প্রতিফলন হয়েছে এভাবে : "পবিত্র মিলাদ শরীফের আলোচনা করিলে ধর্মের মূল সুদৃঢ় হয়, ভক্তিরসে ধর্মমূল সর্বদা সজীবভাবে অবস্থান করে। যে স্থানে হজরতের জন্ম-বৃত্তান্ত আবৃত্তি হয়, সেই স্থানে স্বর্গীয় দূত—ফেরেশতাগণের আবির্ভাব হয়, খোদা তাআলার রহমত নাজেল হয়। মিলাদ শরীফের বরকতে শয়তান ভয়ে সহস্র যোজন দূরে পালায়, অসীম পূণ্য সঞ্চয় হয়, পরকালে মুক্তিপথের পাপ-অন্ধকার বিনাশ করে। ভক্তিশ্রদ্ধা ও এক মনে যিনি পবিত্র মিলাদ শরীফের আয়োজন করেন, মজলিসে যোগদান করেন এবং একচিত্তে ঐ সকল বিবরণ শ্রবণ করেন, সহস্র প্রকার পাপে ডুবিয়া থকিলেও তাহার ভাগ্য একবার সুপ্রসন্ন হইবেই হইবে। তিনি নাজাত (মুক্তি) লাভ করিয়া বেহেশতে দাখিল হইবেনই। ইহার অনেক প্রমাণ শাস্ত্রে লিখিত হইয়াছে। এই মজলিসের নাম শুনিবামাত্র উৎসাহের সহিত যোগদান করিতে হয় ; আহ্বানের অপেক্ষা করিতে হয় না। পরিষ্কার পবিত্র পরিচ্ছদ ব্যবহার, সুগন্ধি দ্রব্য দ্বারা শরীর চর্চিত—সংসাবের শোকতাপ যাবতীয় চিন্তা অন্তর হইতে একেবারে বিদূরিত করিয়া, হজরতের জীবন-বৃত্তান্ত ও গুণকীর্তন একাগ্রচিত্তে শুনিতে হয়। মনুষ্য মাত্রেই পাপী। সেই অদ্বিতীয় মহাপুরুষ হজরত নূরনবী রসূলে খোদার (দঃ) দয়া ও অনুগ্রহ ভিন্ন কোন পাপীর মুক্তির অন্য উপায় নাই—পন্থা নাই।... এসলামধর্মের বিধিব্যবস্থা অনুসাবে ধর্মচর্চা, শাস্ত্রালোচনা, আরাধনা, উপাসনা, নামাজ, রোজা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি কার্য ভিন্ন আর কোন প্রকারেই উদ্ধারের উপায় নাই।"[৬০] মশাররফ হোসেনের কণ্ঠে পুরোপুরি মোল্লা-মৌলবীর সুর ধ্বনিত হয়েছে। গ্রন্থের কবিতা অংশ প্রাচীন পুথিকারের ঢঙে রচিত :

শুন শুন আর কথা শুন মন দিয়া।
পাপে ভরা বসুন্ধরা এলাহি দেখিয়া।।
হজরত নূহ প্রতি করেন আদেশ।
এক মনে শুন সবে তার সবিশেষ।।
খোদার মহিমা ভবে কে বুঝিতে পারে।
ইচ্ছাময় ইচ্ছা তার যাহা ইচ্ছা করে।।
আমরা মানব জাতি তাঁর কাছে ছার।
কীট হতে অতি নীচ, নীচ সবাকার।।
প্রশ্ন নাই কথা নাই তাঁহার কার্য্যেতে।
বিজ্ঞান জ্ঞানের সীমা পরাস্ত যাহাতে।।[৬১]

এটা যে কোন মৌলিক শিল্পীর কণ্ঠস্বর নয়, তা সহজেই বুঝা যায়। ভাষাভঙ্গির মধ্যে পরিবর্তন এসেছে, 'রহমত নাজেল', 'নাজাত লাভ', 'বেহেশতে দাখিল' ইত্যাদি শব্দ বা শব্দগুচ্ছের প্রয়োগ মীরের পূর্ব রচনায় নেই। বিষয় অনুসারে ভাষার পরিবর্তন স্বাভাবিক,

৬০. মীর মশাররফ হোসেন—*মৌলুদ শরীফ*, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলিকাতা ১৩২৪ (৫সং), পৃঃ ৩-৪ (ভূমিকা)।
৬১. পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৮

মশাররফ হোসেন হয়ত সেটাই করেছেন, কিন্তু তিনি তা শিল্পসত্তার বিনিময়ে করেছেন বলে আমাদের ধারণা। খুব সম্ভব, 'নবনূরে' সৈয়দ এমদাদ আলীর সমালোচনায় এরই প্রতিধ্বনি আছে। তিনি লিখেছেন, "... ইহার সঙ্গে পবিত্র শবে মেয়রাজ, ওফাত ও হজরত বেলালের আশ্চর্য প্রভুভক্তি ও জীবনের শেষ ঘটনার পদ্যপদ গজল ও গাথা গাঁথা আছে। এই গ্রন্থ সাধারণ সাহিত্য-রাজ্যের সীমার বহির্ভূত ও ধর্মশাস্ত্রের অন্তর্গত। ... মৌলুদ শরীফ প্রত্যেক মুসলমানের অবশ্য পালনীয় ও অনুষ্ঠেয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তবে বাঙ্গালায় অনূদিত এই মৌলুদ শরীফ ফলদায়ক হইবে কিনা, সে বিচার সাধারণ সাহিত্যতন্ত্রে হওয়ার নহে ; দেশের মোল্লা সাহেবেরাই ফতোয়া জারি করিবেন। মৌলুদের বৃত্তান্ত মুসলমানের অবশ্য জ্ঞাতব্য। ... কিন্তু অনুবাদে যে নিয়ম অনুসৃত হইয়াছে, আমরা তাহার সমর্থন করিতে পারিলাম না। ইহার ভাষাও অদ্ভুত খিচুরি বিশেষ। তাঁহারা বলিবেন, সাধারণ মুসলমানের বোধ সৌকর্যানুরোধেই এরূপ করা হইয়াছে; ...ধর্মজ্ঞান লাভে কতকটা সহায়তা হইবে বলিয়া এই গ্রন্থের সুপ্রচার বাঞ্ছনীয়।"[৬২] 'নবনূরে'র এই সমালোচনার কথা স্মরণ রেখে মশাররফ হোসেন 'বিবি খোদেজার বিবাহে'র 'বিজ্ঞাপনে' লেখেন, "... মৌলুদ শরীফ জাতীয় বিবরণ, জাতীয় ধর্মকথা, বাজে গল্প নহে, আখ্যায়িকা, উপন্যাস নহে। ধর্মসংস্রবী, আদবতামিজসংস্রবী শব্দসমূহ বঙ্গভাষায় সম্পূর্ণ ভাবপ্রকাশক প্রতি শব্দ না থাকিলেও কিছু না আছে তাহা নহে, সেইটুকু বাদ দিয়া মুসলমানি শব্দ ব্যবহার করায় কোন কোন নব্য লিখক প্রিয় ভ্রাতা ডালখিচুড়ির সঙ্গে দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সুতরাং নব্যদলে নবীন লিখক ভ্রাতাগণ মধ্যে বিবি খোদেজার বিবাহ আদরণীয় হইবে না ইহা লিখকের মনে ধ্রুব বিশ্বাস। তবে মূল উদ্দেশ্য আশা কথঞ্চিৎ পরিমাণে পূর্ণ হইলেই জীবন সার্থক মনে করিব।"[৬৩] 'বিবি খোদেজার বিবাহে'র বিষয়বস্তুর পরিচয় দিয়ে মশাররফ হোসেন লিখেছেন, "মুসলমান সমাজে বিবি খোদেজার পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। কারণ বিবি খোদেজা সমগ্র মুসলমানের জননী আখ্যায় ভূষিতা হইয়াছেন। বিবি খোদেজাই হজরত মহম্মদ মোস্তফার মাননীয়া প্রিয় সহধর্মিনী। ইঁহারই কন্যারত্ন বিধি ফাতেমা জগতপূজ্য। হজরত বিবি খোদেজা দেবীর বিবাহ ঘটনা লইয়াই এই ক্ষুদ্র পুস্তক লিখিত হইয়াছে। পাঠকগণ ইহার আদি অন্ত পাঠ করিলেই বিবাহ সম্বন্ধের পবিত্রতা, বিচিত্রতা, পবিত্র প্রণয়ের মধুময় জীবন্ত চিত্র, হজরতের সহিষ্ণুতা, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, কর্তব্যজ্ঞান, অবস্থানুযায়ী ব্যবস্থা এবং বিবি খোদেজার পতিভক্তিসহ সর্বস্বত্যাগ, স্বামীগতপ্রাণা অবলা হৃদয়ের বল ও একাগ্রতা বিষয়ের সপ্রমাণ সমুজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাইবেন।"[৬৪] 'ঢাকা প্রকাশ' গ্রন্থখানির সমালোচনা করে বলে, "কবিত্বের কথা ছাড়িয়া দিলে, আখ্যায়িকা অংশে এ গ্রন্থখানি অপ্রীতিকর নহে। পবিত্র প্রণয়ের মধুময় জীবন্তচিত্র, হজরতের সহিষ্ণুতা, সৎকার্য্যে প্রবৃত্তি, কর্তব্যজ্ঞান, বিবি খোদেজার পতিভক্তি প্রভৃতি বিষয়গুলি মীর সাহেব বেশ সরল ভাবে মাধুর্য্যের সহিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।"[৬৫]

৬২. *নবনূর*, শ্রাবণ ১৩১১
৬৩. *বিবি খোদেজার বিবাহ*, 'বিজ্ঞান' দ্রষ্টব্য
৬৪. *বিবি খোদেজার বিবাহ*, 'পাঠকগণেব সমীপে নিবেদন' অংশ দ্রষ্টব্য
৬৫. *ঢাকা প্রকাশ*, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৩১২

'হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ' রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে মশাররফ হোসেন লিখেন, "পরমপূজ্য হজরত মহম্মদ মোস্তফার (দঃ) পবিত্র জীবনের সহিত যে সকল ঘটনার সংস্রব আছে, তৎসমুদয় ক্রমে পাঠকগণকে উপহার দিব মনে করিয়াছি। ... ইহাতে ইসলাম ধর্মের সভ্যতার জীবন্ত ও জলন্ত জ্যোতিঃ নবভাবে উদিত-চালিত, রক্ষিত-পরীক্ষিত, আদৃত-সম্মানিত ও সম্মিলিত হইয়া দিগদিগন্তরব্যাপী ধীশক্তি সম্পন্ন মহাশক্তির আবির্ভাবে বহু অন্তরের বিঘোর অন্ধকার বিশদরূপে বিদূরিত কবিয়া এক উপাদেয় ঘটনার অবতারণা করিয়াছে ; সেই উপাদেয ঘটনাই আজ পাঠকগণ সমীপে উপস্থিত করিতেছি।"[৬৬]

মশাররফ হোসেনের পরবর্তী ৮ খানা গ্রন্থে নতুন আঙ্গিক কিংবা নতুন বিষয় আসেনি--ধর্মকথা ও আত্মকথার অনুবর্তন আছে. 'আমার জীবনী' ও 'আমার জীবনীর জীবনী কুলসুম জীবনী' তথা 'বিবি কুলসম' আত্মজীবনী হয়েও উপন্যাসের বসাস্বাদন লাভ করেছে। 'বিষাদ-সিন্ধু'র বেগবান গদ্যকে তৈরি করতে হয়েছে, 'আমার জীবনী' ও 'বিবি কুলসুমে'র সাবলীল গদ্য জীবনের তলা থেকে উঠে এসেছে ; এজন্য এতে এতটুকু আড়ষ্টতা বা কৃত্রিমতা নেই। বিষয় ও বিষযীর অভিন্নতার কারণে শিল্পীমনের খোলা দরজা দিয়ে আবেগ-স্পন্দন ও প্রকাশ-স্বচ্ছন্দতা এসেছে।

মশাররফ হোসেন সাহিত্য চর্চা শুরু করেন উনিশ শতকের সত্তর দশকে, শেষ কবেন বিশ শতকের প্রথম দশকে। চল্লিশ বছবে যুগ ও পরিবেশের পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে মশাররফের মনোভাব ও চিন্তাজগতের পবিবর্তন হয়। বিশেষত বাংলার মুসলিম সমাজের তখন সংকট ও সংকট-উত্তরণের কাল। 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' ও 'সংবাদ-প্রভাকরে'র মাধ্যমে তিনি সাহিত্যের জগতে প্রবেশ করেন ; কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার ও ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন তাঁর সাহিত্যিক গুরু। আট দশকে 'গো-জীবন' নিয়ে তাঁর তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়। 'ফতুয়া-প্রপীড়িত' সমাজে স্বাধীন ও উদার ভাবে কোন কিছু বলা যে কত কঠিন তা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন।[৬৭] নব্বই দশকে মুসলমানদের সাময়িকপত্রগুলির আবির্ভাব হয় ; সেগুলির অধিকাংশই ছিল ইসলামপন্থী, সৃষ্টিশীল সাহিত্যরচনা দূরের কথা, সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য ধ্বংস করার পক্ষপাতী ছিল অনেক পত্রিকা। কোন কোন পত্রিকায় মশাররফের লেখা ছাপা হয়েছে। এগুলির যৎসামান্য সাহিত্যিক মেজাজ ছিল। ছোট-বড় প্রায় সব লেখকই ইসলামী ভাবধারা আমদানী করে 'জাতীয় সাহিত্য' সৃষ্টির আন্দোলন করেছেন। সমাজপতিদের কণ্ঠেও সেই সুর। মশাররফ হোসেন যুগের এই দাবীকে অস্বীকার করতে পারেননি, যুগধর্ম ও পারিপার্শ্বিকতাকে অস্বীকার করার মত তাঁর মানসিক গঠন, শিক্ষা, প্রতিভা ছিল না। তাঁর অর্থনৈতিক ভিত্তিও দুর্বল ছিল। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চিত্তলোকে যে স্বাভাবিক বিচলন দেখা দেয়, মীরের মধ্যে তার প্রকাশ ঘটে, যৌবনের ভাবনা এবং যৌবনোত্তরকালের ভাবনার মধ্যে আদর্শগত ও

৬৬. *হজরত ওমরের ধর্ম জীবন লাভ*, কলিকাতা, ১ শ্রাবণ ১৩১২, 'পাঠকগণ সমীপে নিবেদন' দ্রষ্টব্য।
৬৭. *উদাসীন পথিকের মনের কথা*, 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য

নীতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। কলিকাতার রক্ষণশীলদের সাথে তাঁর যোগসূত্র ছিল। কোন দৃঢ় মতবাদ বা বড় আদর্শবাদ দ্বারা পবিচালিত হননি। 'গো-জীবন' সম্পর্কিত দ্বন্দ্বে তিনি শেষ পর্যন্ত বক্ষণশীলদের কাছে নতি স্বীকার করেন। জমিদার বংশোদ্ভূত মীর মশাররফ হোসেনের সমস্ত সাহিত্যকর্ম যুগধর্ম ও স্বসমাজের এই বৈশিষ্ট্যেব সঙ্গে জড়িয়ে আছে। মশাররফ হোসেনের সাহিত্যকর্মের সফলতা ও ব্যর্থতার পবিচয় প্রসঙ্গে ত্রিপুরাশঙ্কব সেন লিখেছেন, "তিনি (মশাররফ) সহজাত শিল্পবোধ ও রসানুভূতির অধিকারী ছিলেন প্রতিভার গুণেই। তিনি চিন্তার রাজ্যে বিপ্লবী নহেন, কিন্তু যুগেব ইঙ্গিতকে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়া জাতীয়তা ও মানবতার বাণী প্রচার করিয়াছেন। ... কিন্তু যেখানে তিনি মুসলিম নব-অভ্যুত্থানের প্রতিনিধি, সেখানে তাঁহার সাহিত্যিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।"[৬৮] মশাররফ হোসেন ধর্মভাব নিয়ে দশখানা পুস্তক লিখেন যা তাঁর সমগ্র রচনার প্রায় ত্রিশ শতাংশ। রূপকথা-পুরাকথাধর্মী গল্প এবং ছোট ছোট নক্সা-প্রহসনের সংখ্যাও প্রায় ত্রিশ শতাংশ। এই দুই শ্রেণীর রচনা বাদ দিলে বাকী চল্লিশ শতাংশ রচনা অর্থাৎ চৌদ্দ-পনের খানি গ্রন্থের ভিত্তির উপরে মশাররফের প্রকৃত সাহিত্যকীর্তি দাঁড়িযে আছে। তাঁর মানবপ্রীতি, স্বদেশপ্রীতি, জাতীয়তাবোধ, সমাজের হিতচিন্তা এসব বচনায় সহজ স্ফূর্তি লাভ করেছে।

মোহাম্মদ নইমুদ্দীন (১৮৩২-১৯০৮)

'আমাব প্রথম যৌবনে যখন সাহিত্যের পূণ্যক্ষেত্রে প্রথম পদার্পণ কবি, মুসলমানদের জাতীয় জীবনে তখন এক সূচীভেদ্য ঘোর অমানিশা রাজত্ব করিতেছিল, ... দেখিলাম সেই অন্ধকার যুগেও বাঙ্গালাব সাহিত্য গগনে সমাজের দুইটি ধ্রুবতারা অন্ধকারে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করিতেছে--তাহার একটি পরলোকগত মীব মশারবফ হোসেন সাহেব, এবং অন্যটি মৌলবী নইমুদ্দীন মরহুম মগফুর সাহেব।"[৬৯] 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ' সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শেখ আবদুর রহিম এই উক্তি করেন। মোহাম্মদ নইমুদ্দীন মীব মশাবরফ হোসেনের পনর বছর বড় ; সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন চার বছর পরে। টাঙ্গাইলে উভয়ে একত্র হয়েছিলেন, কিন্তু একত্রে মিলতে পারেননি। গো-রক্ষা-গো-বধ দ্বন্দ্বে উভযের সম্পর্ক অত্যন্ত তিক্ততাব পর্যায়ে দাঁড়ায়। করটীয়ার 'আখবারে এসলামীয়া (১৮৮৪) সাময়িকপত্রটি সম্পাদনা কবতেন মোহাম্মদ নইমুদ্দীন। টাঙ্গাইলের 'আহমদী' (১৮৮৬) পত্রিকায় মশাররফ হোসেন 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রবন্ধ লেখেন। মশাররফ হোসেন গো-বধের বিপক্ষে মত প্রকাশ করলে নইমুদ্দীন নিজ পত্রিকায় (পৌষ ১২৯৫) তীব্র ভাষায় তাঁর প্রতিবাদ করেন এবং প্রবন্ধ-লেখককে 'কাফের' এবং তাঁর 'স্ত্রী হারাম' বলে ফতোয়া দেন। এতে মশাররফ হোসেন মানহানির মামলা করেন। পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ নইমুদ্দীনকে সমর্থন

৬৮ ত্রিপুরাশঙ্কব সেন--*সাহিত্যেব নবজন্ম ও যুগচেতনা,* শ্রীগুরু লাইব্রেবি, কলিকাতা ১৩৫৬, পৃঃ ১০০
৬৯. শেখ আব্দুর রহিম--'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ', *মাসিক মোহাম্মদী,* ভাদ্র ১৩৩৬

দিয়েছিলেন। নইমুদ্দীন ইসলামপন্থী এবং পুরোপুরি রক্ষণশীল। ধর্মীয় বক্তৃতা ও পুস্তকাদির মাধ্যমে ইসলাম প্রচারকে তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। মুসলমান ধর্ম ও সমাজের স্বার্থে তাঁর নীতি ছিল অবিচলিত ও আপোষহীন।

টাঙ্গাইলের শুরুজগ্রামে মোহাম্মদ নইমুদ্দীন জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের মধ্য-বাংলা বিদ্যালয় থেকে 'ছাত্রবৃত্তি' পাশ করে পাবনার দুলাই মাদ্রাসায় ভর্তি হন। কেউ কেউ বলেন, তিনি ঢাকায় বিশিষ্ট আলেমের তত্ত্বাবধানে ইসলামী ধর্মশাস্ত্র পাঠ করেন এবং তৎসম্বন্ধে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর মুর্শিদাবাদ, বিহার, এলাহাবাদ, জৌনপুর, আগ্রা, দিল্লী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করে এবং আলেম-আউলিয়াদের সহিত ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করে 'জাহেরী ও বাতেনী' বিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।[৭০] ইব্রাহীম খাঁ বলেন, তিনি নর্মাল পরীক্ষা পাশ করে প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে পাবনায় ম্যারেজ রেজিস্ট্রার ও কাজীর পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু পরিশেষে এসব কাজ ত্যাগ করেন এবং করটীয়ার জমিদার খান পন্নী পরিবারের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে নিজ গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।[৭১] তিনি হানাফী মজহাবে বিশ্বাসী ছিলেন। পত্রিকা ও পুস্তকে হানাফী মতাদর্শ প্রচার করেন। একজন সুবক্তা হিসাবেও তাঁর সুনাম ছিল। করটীয়ার গোলাম সারওয়ার ছিলেন তাঁর সহযোগী।

মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের প্রথম গ্রন্থ 'জোব্দাতল মাসায়েল' (১ খণ্ড, ১৮৭৩)। এটি অনুবাদধর্মী ধর্মগ্রন্থ। লেখক 'আভাষ' শীর্ষক ভূমিকায় বলেছেন, "শরার সমুদয় বিবরণ আরবী ভাষায় যেরূপ জানা যায়, অদ্য পর্যন্ত কোন ভাষাতেই সেরূপ জানা সম্ভব নহে। কিন্তু মাতৃভাষায় তাহার মূল নিয়মগুলি জানিতে পারিলে অনেক উপকার আসে। বহুদিন যাবত আমার অন্তঃকরণে এই আশা ছিল যে, অতি সরল বঙ্গভাষায় শরার মূল নিয়মগুলি সংগ্রহ করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তক রচনা করি, যাহাতে বালক, বৃদ্ধ, যুবা সকলেরই উপকার হয়। ... এই জোব্দাতল মাসায়েল অর্থাৎ মুসলমানী ব্যবস্থাশাস্ত্রের সার সংগ্রহ কোন পুস্তকের অবিকল অনুবাদ করি নাই, বরঞ্চ শরেহ বেকায়া, কাজীখান, জামেয়ের রজুম, কানজ, আলমগিরী, দোরল মোখতার প্রভৃতি বিখ্যাত গ্রন্থ হইতে আহরণ করিয়া লিখিত হইল।"[৭২] জোব্দাতল মসায়েলের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সালে। এতে ইসলাম ধর্মকর্মের বর্ণনা ও নির্দেশ আছে। 'বালক-শিক্ষকে'র প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধর্মের বিষয়গুলি আলোচিত হয়েছে। উভয় খণ্ড করটীয়ার জমিদার হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর অনুমত্যনুসারে ও অর্থানুকূল্যে রচিত ও মুদ্রিত হয়। তাঁর পরবর্তী গ্রন্থ 'ইনসাফ' (১৮৮৬) 'আহলে হাদিস' সম্প্রদায়ের বিপক্ষে মত প্রচার করে লিখিত।[৭৩] প্রায় একই

৭০. আবদুল কাদির—'মোহাম্মদ নইমুদ্দীন', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৩৬

৭১. *ইব্রাহিম খাঁ—'মোহাম্মদ নইমুদ্দীন', মাহে-নও,* ত্রৈ ১৩৬৫

৭২. মোহাম্মদ নইমুদ্দীন—*জোব্দাতল মসায়েল,* মাহমুদীয়া যন্ত্র, করটীয়া, ১৯০১ (৭ সং),পৃ:-থ. (আভাষ)

৭৩. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ৩ ত্রৈ, খ., ১৮৮৬

বিষয় নিয়ে তিনি 'লা-মজহাবিগণের ধোকাভঞ্জন' (১৮৮৯) লিখেন। হানাফীমতের বিরুদ্ধে প্রচারিত লা-মজহাবীদের পুস্তিকার প্রতিবাদে এটি রচিত হয়।[৭৪] নইমুদ্দীন লা-মজহাবীদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি ঐ মজহাবকে 'মন মজহাব' বলে কটাক্ষ করেন।[৭৫] তিনি মোট ৪ খণ্ডে 'ফতুয়ায়ে আলমগিরী' (১৮৮৪-৯২) প্রণয়ন করেন।[৭৬] আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে সমাজ ও ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক 'ফতুয়া-ই-আলমগিরি' রচিত হয়। এটি তারই বঙ্গানুবাদ। তিনি গ্রন্থের আখ্যাপত্রে বলেছেন যে, 'দেওয়ান হাফেজ মাহমুদালী খাঁ জমিদার সাহেবের অনুমত্যনুসারে' ও 'মৌলবী গোলাম সরওর সাহেবের সাহায্যে সংশোধনে' এটি প্রকাশিত হয়েছে।[৭৭] নইমুদ্দীনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি ৩ খণ্ডে 'বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফ' (১৮৮৭-১৯০৮)।[৭৮] ব্রাহ্ম ধর্মভুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন প্রথম কোরানের বঙ্গানুবাদ করেন (১৮৭৬)। মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফ মুসলমানকৃত প্রথম অনুবাদ। এদেশের মুসলমানের আরবি ভাষা ও কোরান সম্বন্ধে এমন উত্তুঙ্গ ধারণা যে, বাংলায় তার অনুবাদ অল্পনীয় ছিল। বাংলার মাধ্যমে ধর্মশাস্ত্রচর্চা মধ্যযুগ থেকেই মোল্লাদের কাছ থেকে প্রতিবন্ধকতা পেয়ে এসেছে। 'আরবি-লিখন' বাংলায় তরজমা মহাপাপ। সে-সংস্কার নইমুদ্দীনের যুগেও দূরীভূত হয়নি। শেখ আবদুর রহিম এ সম্পর্কে আলোকপাত করে লিখেছেন, "... সমাজেরই বা তখন কি ঘোর অন্ধবিশ্বাস। কি শোচনীয় দুরবস্থা। ইংরাজী ও সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালাও তখন কাফের ভাষা হইয়া গিয়াছে—সুতরাং উক্ত উভয় ভাষাই অস্পৃশ্য ও অব্যবহার্য। বাঙ্গালা ভাষায় কোরআন হাদিস বা ধর্মগ্রন্থ লিখিলে সে স্পষ্ট ধর্মদ্রোহী হইবে। ... বাঙ্গালা ভাষায় হজরতের জীবনী বাহির করিতেও তখন আমাকে মাদ্রাসার মৌলবী সাহেবদিগের সার্টিফিকেট লইতে হইয়াছিল। ... মৌলভী নইমুদ্দীন সমাজের অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে বিদ্রোহপতাকা তুলিয়া কোরআন শরীফের সুবিস্তৃত বাঙ্গালা তফসীর প্রণয়ন ও প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। সমাজে এক হুলস্থূল পড়িযা গেল। তাঁহার উপর কত ফতোয়া-বৃষ্টি হইতে লাগিল। ওদিকে মীব মশাররফ হোসেন সাহেব হিন্দু সাহিত্যের আদর্শে বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া সমাজে নিন্দিত হইতে লাগিলেন।"[৭৯]

---

৭৪. ঐ, ২ ত্রৈচ, খ., ১৮৮৯

৭৫ *জোব্দাতল মসায়েল,* পৃ:-থ. (আভাষ)

৭৬. 'ফতুযাযে আলমগিরী'র ১ খণ্ড ১৮৮৪ সালে, ২ খণ্ড ১৮৮৭ সালে, ৩ খণ্ড ১৮৮৯ সালে এবং ৪ খণ্ড ১৮৯২ সালে মুদ্রিত হয। প্রথম খণ্ড কলিকাতা ও পরবর্তী খণ্ডগুলি করটীয়ার 'মাহমুদীয়া যন্ত্র' থেকে ছাপা হয়।
বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ৪ ত্রৈ. খ., ১৮৮৪ ; ৩ ত্রৈ খ. ১৮৮৭, ৪ ত্রৈ. খ. ১৮৮৯, ৩ ত্রৈ. খ., ১৮৯২

৭৭. মোহাম্মদ নইমুদ্দীন—*ফতুওয়ায মাহমুদীয়া অর্থাৎ ফতওয়ায় আলমগিরী,* ২ খণ্ড, মাহমুদীয়া যন্ত্র, করটীয়া, ১৮৯৪

৭৮. কোবানে মোট ৩০টি অধ্যায় আছে। শেষের অধ্যায়ে ছোট ছোট সুরা (মন্ত্র) আছে যা শিক্ষার্থীদের প্রথম শেখান হয়। নইমুদ্দীন ৩ খণ্ডটি 'আম্মাসিপারা', (শেষ খণ্ড) নাম দিয়ে প্রকাশ করেন।

৭৯. মাসিক মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৩৬

সমাজের নিন্দা, ফতোয়া-বৃষ্টি শিরোধার্য করে নইমুদ্দীন স্বপথে অবিচল থেকেছেন, কারণ তিনি বুঝেছেন, এ পথ সমাজের কল্যাণের পথ, মুক্তির পথ। তিনি নিজে একজন আলেম হয়েও আলেমদের বদ্ধ ধারণার বিরুদ্ধে কাজ করেছেন বৃহত্তর সমাজের জন্যই। এক্ষেত্রে নইমুদ্দীনের চিন্তাধারা তাঁর রক্ষণশীলতাকে ছাড়িয়ে গেছে।

'ইসলাম-প্রচারকে' কোরান শরীফের সমালোচনা কবা হয়। "এই বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফখানি পাঠ কবিয়া আমরা বিশেষ সুখী হইয়াছি। মৌলবী সাহেব আববী অক্ষরে কোবান শরিফেব আয়াতগুলি লিখিয়া অর্থ বাঙ্গালায় লিখিয়াছেন, তৎপরে টীকা সংগ্রহ করিয়া প্রত্যেক আয়াতের নিম্নভাগে সন্নিবেশিত কবিয়াছেন। টীকা না পড়িলে আয়াতের প্রকৃত ধর্ম অবগত হওয়া যায় না, তাই মৌলবী সাহেব বহু যত্ন স্বীকার করিয়া বিশ্বাসযোগ্য টীকাসকল সন্নিবেশিত করিযাছেন, তাহাতে আয়াতগুলির অর্থ সহজবোধ্য হইয়াছে।"[৮০] করটীয়াব জমিদাব ওয়াজেদ আলী খান পন্নী একটি 'প্রশংসাপত্রে' (৩১ শ্রাবণ ১৩০০) লেখেন, "এই বঙ্গানুবাদিত কোবান শরিফ বঙ্গীয় এসলাম সমাজের গৌরবের আদর্শস্থল। ইহার পবিত্র জ্যোতিতে ধর্মান্ধ মুসলমানগণ জ্ঞানচক্ষু প্রাপ্ত হইয়া নির্মল এসলাম ধর্মের পথ দেখিতে সমর্থ হইবে। এবং কোবান শবিফের পবিত্র ভাব, পবিত্র মত, পবিত্র আদেশ যাবতীয় মানবজীবনে প্রতিফলিত হইযা আপনাব অক্ষয় কীর্তি ঘোষণা করিবে এবং মুসলমান সমাজ আজীবন আপনাব কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ থাকিবে।"[৮১]

তাঁর 'কালেমাতল কুফর' (১৮৯১) গ্রন্থে মুসলমানের আদব-কায়দার কথা বলা হয়েছে। কিরূপ কথাবার্তা, আচবণ ও মনোভাব মুসলমানকে কাফেরে পরিণত করে, এতে তারই নির্দেশ আছে।[৮২]

'এসবাতে আখেবজ্জোহর' (১৮৯১) গ্রন্থে শুক্রবারেব জুমা ও জোহরের নামাজ সম্বন্ধীয় বিতর্কের বিষয় আলোচিত হয়েছে। তাঁব মতে, ঐদিন জুমা ও জোহর উভয়ই পড়ার নিয়ম।[৮৩] 'বেতর' (১৮৯৪), 'তারাবিহ' (ঐ), 'মৌলুদ শরীফ' (১৯৯৫) নমাজ সম্পর্কীয় তিনখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকা। 'রফা ইদায়েন' (১৮৯৬) ও 'আদেল্লায় হানিফীয়া বা রদ্দে লা-মজহাবী' (১৮৯৭) গ্রন্থ দুটিও বিতর্কমূলক। 'আদেল্লায় হানিফীয়া'য় লা-

ইব্রাহিম খাঁ তাঁব বাল্যকালেব স্মৃতিচারণা কবে অনুরূপ চিত্র বর্ণনা কবেছেন : "ছোট বেলায় আমপারার উপর 'মিহিব ও সুধাকব' পত্রিকার মলাট দিয়েছিলাম। আমার ওস্তাদ সক্রোধে সে মলাট টেনে ছিঁড়ে ফেলতে হুকুম দিযে বলেছিলেন, 'এত বড় বআদবী। কালামুল্লাব উপর বাংলা হবফ। সে আমলে কোরানেব বাংলা তরজমায় হাত দেওয়া কম হিম্মতের কথা ছিল না।"
ইব্রাহিম খাঁ, পূর্বোক্ত, পৃ ঃ ২৫

৮০. *ইসলাম-প্রচারক*, কার্তিক ১২৯২
৮১. *কোরান শরিফ*, শেষ খণ্ড, 'প্রশংসাপত্র' দ্রষ্টব্য।
৮২. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯১
৮৩. বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯২

মজহাবীদের আক্রমণ করে বলেছেন, "এই কেতাব পাঠ করিলে ... লা-মজহাবীগণের অবস্থায় আক্ষেপ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না ; উহাদের দাগাবাজি, ফেরেববাজি, ঝুটামি সকলি প্রকাশ হইয়া পড়িবে। এবার এই কেতাবের শেষ ভাগে উহাদের অনেক ধোকা ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে।"[৮৪]

'সেবাতল মস্তাকিম' (১৮৯৬) ও 'সিরাজল হেদায়েত' (ঐ) ধর্মনীতি সম্পর্কীয় পুস্তক। 'কোবান শবীফে'র শেষ খণ্ড অর্থাৎ 'আম্মা সিপারা'র 'আভাষে' নইমুদ্দীন লিখেছেন, " ... দোয়া দরূদ ইত্যাদি যাহা নমাজে পড়া আবশ্যক তাহার অর্থ লিখিয়া 'সেরাতল মস্তাকিম' নামক একখানা ক্ষুদ্র গ্রন্থ এই অনুবাদের সঙ্গে প্রকাশ করিলাম।"[৮৫] নইমুদ্দীন ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে কিছুকাল উত্তরবঙ্গে অবস্থান করেন। তাঁর কোরানের অনুবাদ জলপাইগুড়ির জমিদার খান বাহাদুর রহিম বক্সের অর্থানুকূল্যে ও প্রযত্নে মুদ্রিত হয়।[৮৬]

হানাফীমতের বড় ব্যাখ্যাতা ইমাম বোখারির আরবি তত্ত্বশাস্ত্রের অনুবাদ 'সহি বুখারী শরীফ '(১৮৯৮) একটি বৃহৎ গ্রন্থ ; মোহাম্মদ নইমুদ্দীন গোলাম সারওয়ারের সহযোগিতায় এটি প্রণয়ন কবেন।[৮৭]

৮ পৃষ্ঠাব একটি ক্ষুদ্র প্রচার-পুস্তিকা 'গোমস্তা-দর্পণ' (১৮৮৬)। এতে নতুন প্রজাস্বত্ব আইন অনুসারে দাখিলাদি জমিদারী নথিপত্র লেখার উপদেশ-নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।[৮৮]

মশাববফ হোসেনেব 'গো-জীবনে'র (১৮৮৯) প্রতিবাদে নইমুদ্দীন 'গো-কাণ্ড' (১৮৮৯) রচনা করেন। 'আখবাবে এসলামীয়া'য় (শ্রাবণ ১২৯৫) প্রকাশিত নইমুদ্দীনেব একটি প্রতিবাদমূলক প্রবন্ধ মশাররফ 'গো-জীবনে' সংকলিত করেন। তাঁর অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধটি মশাববফ হোসেন বাদ দেন, এরূপ অভিযোগ এনে নইমুদ্দীন 'গো-কাণ্ড' সংকলনটি প্রকাশ করেন।[৮৯] এটি তৎকালীন গো-হত্যা বিষয়ক সামাজিক সমস্যার ফল।

আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী (১৮৪৫-১৯১০)

টাঙ্গাইলের চারান গ্রামনিবাসী আবদুল হামিদখান ইউসফজয়ী সাহিত্যিক ও সাংবাদিক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন। টাঙ্গাইল থেকে প্রকাশিত পাক্ষিক 'আহমদী'র (১৮৮৬) তিনি সম্পাদক ছিলেন। দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী করিমুন্নেসা খানম চৌধুরানীর অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত এই পত্রিকাখানি অসাম্প্রদায়িক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির জন্য খ্যাত

৮৪. ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯৮ ; আবদুল কাদিব, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৬৩
৮৫ মোহাম্মদ নইমুদ্দীন—*কোরান শরীফ*, শেষ খণ্ড, মাহমুদীয়া যন্ত্র, ১৩০০ বঙ্গাব্দ, পৃ:-√ (আভাষ)
৮৬ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃঃ ১৪১ (৪সং)।
৮৭ *বেঙ্গল লাইব্রেবী ক্যাটালগ*, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯৮
৮৮. ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৮৬
৮৯. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৮৯

ছিল। মীর মশারবফ হোসেন এই পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন। গো-হত্যা ও হানাফী-লা-মজহাবী প্রশ্নে 'আখবারে এসলামীয়া'র সাথে 'আহমদী'র অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল।[৯০]

গদ্য-পদ্যে মিশ্রিত 'সারসংগ্রহ' (১ খণ্ড, ১৮৭৮) নামে একখানি নীতি বিষয়ক গ্রন্থ রচনার দ্বারা আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর সাহিত্যিক জীবনের শুরু। পুস্তক রচনার উৎস ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "যতই সদগ্রন্থের প্রচার ও দেশীয় যুবকগণের মন নীতি এবং ধর্মরসে অভিষিক্ত হয়, ততই মঙ্গল বিবেচনা করিয়া এই সামান্য পুস্তকখানি প্রকটন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইহার অধিকাংশ পারসী, ইংরাজী এবং বাঙ্গালা গ্রন্থাবলীর বিশেষ বিশেষ স্থানের ভাব অনুবাদ ও অনুকরণ। পদ্যগুলি আমার স্বকল্পিত।"[৯১] ২০ পৃষ্ঠার এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় চারটি কবিতা ও দুটি প্রবন্ধ আছে। 'নীতিকথা' প্রবন্ধের একটি উক্তি এরূপ ঃ "বিনয়ে ক্রোধীকে, সত্য ও সরলতায় সাধুকে, সেবা ও ভক্তিতে প্রভুকে, ধনে লোভীকে, শান্তি দ্বারা খলকে, বশ্যতায় গুরুজনকে, উদারতা ও উপকারে মিত্রকে এবং মিষ্টকথা ও নম্রতায় জগৎকে বশীভূত কর।"[৯২] ময়মনসিংহের 'ধর্মতত্ত্ব' ও 'বঙ্গবন্ধু' পত্রিকার সম্পাদকদ্বয় ইউসফজয়ীর কাব্যখানি সংশোধন করে দিয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' 'সার-সংগ্রহে'র সমালোচনা হয়। "গ্রন্থখানি অতি ক্ষুদ্র ; ইহার অধিকাংশ ধর্মবিষয়ক বাক্যাবলী। ... নীতিকথাগুলি ভাল, বালকদের জানা উচিত।"[৯৩]

এরপর আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী 'বিরাগ সঙ্গীত' (১৯৮০), 'প্রবোধ সঙ্গীত' (১৮৯১) এবং 'উদাসী' (১৯০০) নামে তিনখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। প্রথম দুখানি কাব্যের বিষয়বস্তু মূলত অধ্যাত্মপ্রেম। সুফীতত্ত্বে আসক্তিবিরহিত যে অধ্যাত্মপ্রেমের কথা আছে, ইউসফজয়ী সেই প্রেমাদর্শের কথা প্রচার করেছেন। 'বিরাগ সঙ্গীতে'র প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থের প্রকাশক 'নিবেদনে' বলেছেন, "হিন্দু ও মোসলমান এই উভয় জাতিই ঐহিক সুখ স্বচ্ছন্দতা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও অনিত্য জানিয়া সাংসারিক জাকজমক বিশিষ্ট উন্নতি সঙ্কল্পে নিতান্ত উদাসীন। পরিণাম শোচনা এবং বীতরাগ ও বৈরাগ্য প্রভৃতি ঔদাসীন্য ভাব সকল তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থ সকলের অস্থিমজ্জা নিয়ত অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই উভয় জাতির মধ্য হইতেই অসংখ্য সংসার বিরাগী উদাসীন তপস্বীগণ আবির্ভূত হইয়া পৃথিবী অলংকৃতা করিয়াছেন। আর অধুনাতন এই উভয় জাতিই ভারতবর্ষের প্রধান অধিবাসী ; বরং, অধিকাংশ বিষয়েই প্রধান। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সাম্প্রতিক তাঁহাদের মধ্যে অনিত্য ও অকিঞ্চিৎকর বাসনাসক্তি এবং অজ্ঞান ও অদূরদর্শিতার প্রাবল্য দিন ২ যতদূর পরিবর্ধিত হইতেছে, তাহাতে অতি সত্বর এদেশের পতন ও দুরবস্থা নিশ্চিতরূপে সম্ভাবনীয় হইয়া উঠিতেছে, সন্দেহ নাই। এই সম্ভাবিত

---

৯০. এ অধ্যায়ের 'পত্র-পত্রিকা' অংশ দ্রষ্টব্য

৯১. *সারসংগ্রহ*, ১ খণ্ড, ভারতমিহির প্রেস, ময়মনসিংহ, ১৮৭৮, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য

৯২. ঐ, পৃঃ ১৮

৯৩. *বঙ্গদর্শন*, শ্রাবণ ১২৮৫

দুর্ঘটনা পরিজ্ঞাত হইয়াই আমাদের বিশ্বপ্রেমিক প্রাজ্ঞ কবির কোমল হৃদয় বিরাগ সঙ্গীতের তান ধরিয়া আজি কয়েক বৎসর হয় দেশকে জাগ্রত করিবার জন্য বংশীধ্বনি করিয়াছেন। কিন্তু সমাজের ভাবগতিক বুঝিয়া তিনি সেই বংশীধ্বনি আরম্ভ মাত্র করিয়াই আবার নিজে ২ ক্ষান্ত হইয়া মৌনাবলম্বনপূর্বক ধীরে ২ অন্য এক দিকে পদার্পণ করিতেছেন। যে হউক আমরা তাঁহার সেই মধুময় বংশীধ্বনি কিছুতেই বিস্মৃত হইতে না পারিয়া এইভাবে এই অবস্থায় সাধারণ্যে তাহার কথঞ্চিৎ প্রচার করিলাম।"[৯৪] 'প্রবোধ সঙ্গীতে'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে কবির নিজস্ব বক্তব্য এরূপ: "আমরা এই সকল কথা দ্বারা সংক্ষেপতঃ সকলকে ইহাই একমাত্র বুঝাইতে চাই যে, যথার্থরূপে সংসারধর্ম প্রতিপালন, জাগতিক প্রত্যেক বিষয়ের উপযুক্ত সাতরত্ত্ব অনুশীলন ও পরিমার্জিত জ্ঞানবুদ্ধি উপার্জন ও মানব জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও প্রকৃত ভাব অনুধাবন, উপযুক্তরূপে দেহপ্রাণ রক্ষা করা এবং উপযুক্তরূপে ন্যায়পথে চিত্তমন পরিচালন ইত্যাদি অনুষ্ঠান ও পরিচেষ্টা করাই মনুষ্যের কর্তব্য। অর্থাৎ সংসারী হইয়া জ্ঞান ধর্মসম্মত ন্যায্য ভোগবাসনা প্রভৃতিও যেমন চরিতার্থ করিতে হইবেক, কিন্তু আবার তেমনি সংসারের মায়ামোহ প্রভৃতি কোন জঞ্জালের মধ্যেও সংবদ্ধ ও ফাসাইতে হইবেক না।"[৯৫] যে নিয়মে পাঠ করিতে হইবেক' শিরোনামে তিনি লিখেছেন, "অন্যান্য সঙ্গীত সকল সাধারণতঃ যে প্রকার লিখিত ও পঠিত হইয়া থাকে এই প্রবোধ সঙ্গীত তদ্রূপ নহে। ইহা তাহা হইতে অনেকাংশে পৃথক প্রণালীর। অন্যান্য সঙ্গীত সকল যে প্রকার উচ্চৈঃস্বরে কালওয়াত সহকারে এবং বিশেষ ২ নামকরণের তাল মান ও রাগবাগিণী ঠিক রাখিয়া গাইতে হয়, ইহা সেরূপ নহে। ইহা সচরাচর কবিতার ন্যায়ই পঠিত হইতে পারে, কিন্তু মিষ্ট শুনাইবার জন্য বিশেষ কোন একটা সুর অবলম্বনপূর্বক কোন ২ স্থানের অক্ষর লঘু উচ্চারণ ও কোন ২ স্থানের অক্ষর গুরু উচ্চারণ করিয়া ধীরে এবং গভীরভাবে পড়িতে হইবেক। অথ প্রকার পাঠ করিলে সুশ্রাব্য শুনায় ও মনের মত্ততা জন্মে সেই প্রণালীতে পড়িলে ভাল হয়। ... কেহ যদি কোন একটা বাঁধা সুরের সহিত না পড়িয়া কেবল সাদা সিধা কবিতার ন্যায়, অর্থাৎ স্কুলের ছেলেদের পাঠ্য কবিতার ন্যায় পাঠ করেন, তবে কোনই লালিত্য অনুভব করিতে পারিবেন না। ... সঙ্গীত দ্বারাই সাধন ভজন এবং চিত্তমন বিনম্র ও বিগলিত করিবার বিশেষ উপায়। সুতরাং ইহা সঙ্গীতাকাবে প্রকাশ করিলাম।"[৯৬] তিনি 'বিরাগ সঙ্গীতে'র ভূমিকায় কাব্যের আঙ্গিক ও পাঠরীতি সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। কবির কণ্ঠে বেদনার সুর : সুফীরা করুণ সুরের মাধ্যমে আশিক–মাশুকের প্রেমার্তি প্রকাশ করেন : ইউসফজয়ীর সঙ্গীতধর্মী কবিতাগুলিতে সেই সুর ধ্বনিত হয়েছে। তিনি যে সুফীপন্থী সাধনার সমর্থক ছিলেন তা এই কাব্য দুটির ভাববস্তু থেকে বুঝা যায়।

৯৪. আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী— *বিরাগ সঙ্গীত*, আহমদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল, ১২৯৭, 'নিবেদন', (প্রকাশক আবদুল মান্নান খান ইউসফজয়ী কর্তৃক লিখিত) অংশ দ্রষ্টব্য।
৯৫. *প্রবোধ সঙ্গীত*, আহমদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল, ১২৯৮, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
৯৬. ঐ।

কেনরে অবোধ মন! বাড়ালে অজ্ঞান রাতি?
আঁধার মন্দিরে তব জ্বালিলে না জ্ঞান-বাতি!
রিপুগণ দস্যুজন
দাগা দিয়ে অনুক্ষণ
সর্বস্ব নিলরে লুটে, করিয়ে বিশ্বাস ঘাতি।
কেনরে অবোধমন। বাড়ালে অজ্ঞান রাতি?[৯৭]
মন হে! ভাব কেন হায় বোঝ না?
কেন এত বাড়াবাড়ি, সহজ জ্ঞানে মজনা
কঠোর বেদ আর কঠোর তন্ত্র
কঠিন বুধ্য পুরাণ মন্ত্র
সরল ভক্তি সরল প্রেমে তারে কেন পূজ না?
মন হে! ভাব কেন হায় বোঝ না?[৯৮]

'উদাসী'তে তিনখানি স্বতন্ত্র কাব্য আছে 'উদাসী' (১-২১২ পৃষ্ঠা), 'কিরণ প্রভা' (২১৩-২৮৮ পৃষ্ঠা) এবং 'অরুণভাতি' (২৮৯-৫০৪ পৃষ্ঠা)। 'উদাসী' খণ্ড কবিতার সংকলন। তিনি, কাব্যের পরিচয় দিয়ে ভূমিকায় লিখেছেন, "ধর্ম, অধর্ম, প্রেম, বৈরাগ্য এবং স্বাধীনতা ইত্যাদি কয়েকটি অত্যুচ্চ বিষয় মূল ভিত্তি করিয়া ভিন্ন ২ ভাবে ও বিভিন্ন প্রকারের বর্ণবৈচিত্র্যে এই উদাসী নামক ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি অনেকদিন হয় বচিত হইয়াছে। ইহার অনেকগুলি কবিতা বিংশতি বৎসরেরও পূর্বের লিখিত।"[৯৯] ধর্মাধর্ম, প্রেম-বৈবাগ্য ভাবাশ্রিত কবিতায় কোন অভিনবত্ব নেই; তবে স্বদেশ ও সমাজমূলক কবিতাগুলিতে যুগ সম্বন্ধে কবির সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বদেশ ও স্বজাতির হিতসাধন এবং হিন্দু-মুসলমানেব সম্মিলন তিনি মনে-প্রাণে কামনা করতেন। 'উদ্বোধন' কবিতায় তিনি বলেছেন,

অসম্মিলন, হিংসাদ্বেষ সে দোষে মজিল দেশ
কে করে আর একতা বন্ধন?
দারিদ্র্য দুর্ভিক্ষ্য ঘোরে ভারত গেলরে পুড়ে
কে নিবারে সে ভীম দাহন?[১০০]

হিন্দু-মুসলমানের সাম্প্রদায়িক বিভেদের উল্লেখ করে লিখেছেন,

জাতিগত হিংসাদ্বেষ দ্বেষেতে মজিল দেশ
মুর্গী পাঠা লয়ে টানাটানি।
গোমাংসের নামে হায়! পালে পালে কুঁদে ধায়
যথাতথা ঘোর কাটাকাটি।[১০১]

৯৭. *বিরাগ সঙ্গীত*, পৃঃ ২৭
৯৮. *প্রবোধ সঙ্গীত*, পৃঃ ২৫
৯৯ আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী—*উদাসী*, টাঙ্গাইল, ২২ শ্রাবণ ১৩০৭, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
১০০ ঐ, পৃঃ ১২০
১০১ ঐ, পৃঃ ১২২

কাব্যের মূল সুর প্রেম। কবি মানবপ্রেম অপেক্ষা ঈশ্বরপ্রেমকেই উত্তম বলেছেন। তাঁর অভিমত,

> তুচ্ছ মানবীর প্রেমে মজিনু বিশেষ।
> তুচ্ছ এক হৃদয়ের ভালবাসা তরে
> ভুলিয়া রহিনু আমি জগত-ঈশ্বরে।[১০২]

'কিরণ প্রভা' ও 'অরুণভাতি' আখ্যানভিত্তিক প্রেমকাব্য। তিনি কিরণ প্রভার 'আভাসে' লিখেছেন, "আধুনিক বঙ্গীয় কবিদিগের শ্রেষ্ঠ গুরু মান্যবর হেমচন্দ্র বনার্জ্জি বিংশতি বৎসর পূর্বে 'মদন পারিজাত' এবং 'চিন্তা তরঙ্গিনী'তে ভাবের ও প্রেমের ভাষাব সঙ্গে যে তরঙ্গ তুলিয়া দিয়া যেরূপ ভাব ও যেরূপ প্রেমের বিচিত্র চিত্র সকল অঙ্কিত করিয়াছেন, আধুনিক পরিমার্জিত সুরুচি-সম্পন্ন শিক্ষিতদিগের নিকট তাহা নিতান্ত উপভোগ্য বটে। ... ঈশান বাবুর 'যোগেশে'র ভাষাও কম মর্মস্পর্শী নহে। বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ প্রেমিক কবিদিগের এইরূপ সহজ উদার ভাষার সুদৃষ্টি রাখা অবশ্য কর্তব্য। 'কিরণ প্রভা' ও 'অরুণভাতি'র ভাষায় যদি তদসম্বন্ধে কাহাকে বিন্দুমাত্রও সাহায্য করিতে পারে তবে এই তুচ্ছ জীবনকে চিরকৃতার্থ জ্ঞান করিব।"[১০৩] আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী কাব্যের ভাব ও ভাষার ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেও মধ্যযুগীয় আখ্যানমূলক কাব্যরীতির প্রভাব এড়াতে পারেননি। হেমচন্দ্রের তুলনায় হামিদের ভাষা অনেক দুর্বল। 'অরুণভাতি' কাব্যেব এক স্থানে তিনি বলেছেন, "সরল গ্রাম্য ভাষা এবং পরিমার্জিত সাধুভাষার সংমিশ্রণে কাব্যাদি লিখিলেই . . উপাদেয় হইতে পারে এমত আমার বিশ্বাস।"[১০৪] তিনি আরও বলেছেন, "দেশীয় সাহিত্য, দেশীয় কবিতা, স্বদেশীয় কবিতা, সঙ্গীতের প্রতি ঘৃণা তাচ্ছিল্য, অনাদর ও অবহেলা প্রদর্শনপূর্বক কর্কশভাবের অনুরাগী হইয়াও বাঙ্গালী জাতি নিজের জাতীয়তা নিজের মাহাত্ম্য স্বচ্ছন্দে হারাইতে বসিয়াছে। বাস্তবিক বাঙ্গালীদের বাঙ্গালীত্ব প্রাণের ভিতরের প্রশংসার্হ ও উল্লেখযোগ্য যে সকল খাঁটি জিনিষ আছে তন্মধ্যে দেশীয় প্রাচীনসঙ্গীতও একটি। প্রকৃত প্রস্তাবে সাদাসিদে সরল ভাবের গ্রাম্য সঙ্গীতগুলিই 'জাতীয় ভাষার প্রাণ' এবং প্রাচীন ধরনের রাগরাগিণীগুলিই এদেশীয় 'জাতীয় ভাবের প্রতিধ্বনি'।"[১০৫] বিদেশী সাহিত্যের ভাবাদর্শ নয়, তিনি সরল গ্রাম্য ভাষা ও পরিমার্জিত সাধু ভাষা সংমিশ্রণে দেশীয় ও জাতীয় ভাবাদর্শকে অনুসরণ করার পক্ষপাতী। গ্রাম্য ভাষা ও পল্লী সঙ্গীতের প্রভাব তাঁর কাব্যে রয়ে গেছে। উপরন্তু গতানুগতিক প্রেমাখ্যান বর্ণনা ছাড়া তিনি নতুন জীবন-জিজ্ঞাসা ও মূল্যবোধ আরোপ করতে পারেননি।

১০২. *উদাসীন*, পৃঃ ৯২
১০৩. ঐ, পৃঃ ২১৫-১৬
১০৪. ঐ, পৃঃ ৩০৭
১০৫. ঐ, পৃঃ ৪৭৮-৭৯ (পাদটীকা)।

আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর গদ্যগ্রন্থ 'বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদিবৃত্তান্ত' (১৮৯৯)। এটি খোন্দকার ফজলে রাব্বির 'দি অরিজিন অব দি মুসলমান্‌স অব বেঙ্গল' (১৮৯৫) গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। লেখক 'অনুবাদকস্য' শীর্ষক ভূমিকায় বলেছেন, "মুর্শিদাবাদের নওয়াব বাহাদুরের দেওয়ান শ্রীযুক্ত খোন্দকার ফজলে রাব্বি খান বাহাদুর সাহেব ১৩০৮ হিজরিতে (১৮৯১) উর্দু ভাষায় (প্রকৃতপক্ষে ফারাসী ভাষায়) 'হাকিকাতে মুসলমানানে বাঙ্গালা' নামক একখণ্ড কেতাব লিখেন। ইহারই এক ইংরেজী অনুবাদ বর্ধিত আকারে অনেক নূতন বিষয় সংযোজিত করিয়া 'দি অরিজিন অব দি মুসলমানস অব বেঙ্গল' নাম দিয়া ১৮৯৫ অব্দে বাহির করেন। সেই ইংরাজি সংস্করণ হইতে গ্রন্থকারের অনুমতি অনুসারে এই বাঙ্গালা অনুবাদ করা হইয়াছে। উক্ত শিক্ষিত মহাত্মা গৌরবান্বিতা রাজরাজেশ্বরী মাতা ভারতেশ্বরীর বঙ্গীয় মুসলমান প্রজাগণের বিরুদ্ধে কতিপয় প্রসিদ্ধ লেখক যে অযথা নিন্দা ও অপবাদ রটনা করিয়াছেন তাহা হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিতে যাইয়া স্বজাতির এবং স্বদেশের এক মহৎ উপকার সাধন করিয়াছেন। এই গুরুতর কার্য্য সমাধা করার জন্য তাঁহাকে অনেক মেহনত করিতে হইয়াছে। ... খান বাহাদুব সাহেব যে বিষয় কথায় প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, ভরসা করি আমরা তাহা কার্য্যে প্রমাণ করিতে সমর্থ হইব। আমাদের পূর্বপুরুষগণের ন্যায় চিত্তে স্থৈর্য্য, কার্য্যে উৎসাহ, জ্ঞান-চর্চায় আগ্রহ, ধর্মে দৃঢ়তা প্রভৃতি আমরাও দেখাইতে সমর্থ হইব। ... এখন আর বিজাতীয় অলসতায় কাটাইবার সময় আমাদের নাই।"[১০৬]

'প্রচারক' পত্রিকার জনৈক লেখক 'টাঙ্গাইল ভ্রমণ' নিবন্ধে বলেছেন যে, আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী 'আরব-কাণ্ড' নামে একখানি ইতিহাস গ্রন্থ প্রণয়নে বত আছেন। তাঁর ভাষায়, "আমরা এতদিন মনে করিতাম, মৌলবী সাহেবের (ইউসফজয়ীর) উৎসাহ নিবিয়া গিয়াছে। আজ আমাদের সে ভ্রম দূবীভূত হইল। মৌলবী সাহেবকে দেখিয়া একটি জ্বলন্ত উৎসাহের অবতার বলিয়া বোধ হইল। তিনি পরম উৎসাহের সহিত 'আরব-কাণ্ড' প্রভৃতি নানাবিধ গ্রন্থ লিখিতেছেন দেখিয়া মুগ্ধ হইলাম।"[১০৭] গ্রন্থাকারে 'আরব-কাণ্ড' মুদ্রিত হয়েছিল কিনা, তা জানা যায় না।

আব্দুল হামিদ খান ইউসফজীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে এযাবৎ কোন তথ্য প্রকাশিত হয়নি। অধ্যক্ষ ইব্রাহিম খাঁ একটি প্রবন্ধে বলেছেন যে, আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী ও নওশের আলী খান ইউসফজয়ী দেলদুয়ারের গজনবী জমিদারদের 'স্ববংশীয় শরীক' ছিলেন। চারানের পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী আবদুল হামিদের বৈবাহিক ছিলেন।[১০৮] তিনি ১৯০১ ও ১৯০৬ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগ দেন। আবদুল হামিদ স্বদেশী আন্দোলনেও যোগদান করেন এবং

১০৬. আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী—*বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদিবৃত্তান্ত*, ভারত মিহির যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৬, পৃঃ (১-৪)

১০৭. প্রচারক, পৌষ, ১৩০৭

১০৮. ইব্রাহিম খাঁ—'টাঙ্গাইলের সাহিত্য সাধনা', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৫, পৃঃ ২৭

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহযোগী হিসাবে কাজ করেন। রাষ্ট্রবিরোধী বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে তিনি একবার ফৌজদারীতে অভিযুক্ত হন। কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল, রামপ্রাণ গুপ্ত প্রমুখের সাথে তাঁর গভীর বন্ধুত্ব ছিল।[১০৯]

কায়কোবাদ (১৮৫৮-১৯৫২)

গদ্যে মীর মশাররফ হোসেন এবং পদ্যে কায়কোবাদ প্রায় সমমর্যাদার অধিকারী। 'বিষাদ-সিন্ধু' (১৮৮৫-৯১) মশাররফের এবং 'মহাশ্মশান' (১৯০৪) কায়কোবাদের শ্রেষ্ঠ রচনা। একজন কারবালার বিষাদময় যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করেছেন, অপরজন তৃতীয় পানিপথের করুণ যুদ্ধকাহিনী বর্ণনা করেছেন। ঐতিহ্য ও ইতিহাসের মধ্যে উভয়ে জাতীয় জাগরণের প্রেরণা অনুসন্ধান করেছেন। অসাম্প্রদায়িক উদার মনোভাব উভয়ের বৈশিষ্ট্য।

কায়কোবাদের প্রকৃত নাম মোহাম্মদ কাজেম আল কোরেশী। তিনি ঢাকা জেলার নবাবগঞ্জের আগলা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা শাহামতল্লাহ ওরফে এমদাদ আলী ঢাকায় ওকালতি করতেন।[১১০] প্রথমে কলিকাতা মাদ্রাসা ও পরে ঢাকায় স্কুলে তিনি শিক্ষা লাভ করেন। এন্ট্রান্স পাশ করার পূর্বেই তিনি স্বগ্রামের পোস্ট-অফিসে পোস্ট মাস্টারের চাকুরি গ্রহণ করেন এবং ঐ পদেই আজীবন বহাল ছিলেন।

অতি অল্প বয়সে কায়কোবাদের কাব্য-প্রতিভার স্ফুরণ হয়। ১২ বছর বয়সে তাঁর প্রথম কাব্য 'বিরহ বিলাপ' (১৮৭০) ছাপা হয়। বিশুদ্ধ বাংলায় আধুনিক গীতিকবিতার বই এটি। তখন থেকে শুরু করে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি বহু সংখ্যক গীতিকাব্য, মহাকাব্য, আখ্যানকাব্য লিখেন। কায়কোবাদের প্রতিভা ছিল অকৃত্রিম, কিন্তু উচ্চ শিক্ষা ও বহুদর্শিতার অভাবের কারণে তিনি কোন বৃহৎ বা মহৎ শিল্প সৃষ্টি করতে পারেননি। তিনি দীর্ঘায়ু লাভ এবং বিপুল সংখ্যক গ্রন্থ প্রণয়ন করেও যথার্থ লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেননি। তিনি প্রধানত পূর্বসূরীদের অনুসরণ করেছেন এবং উনিশ শতকের আবেগ ও চেতনার মধ্যে আবদ্ধ থেকেছেন। তিনি সামাজিক মেলামেশা কম করেছেন এবং নাগরিক ভাবান্দোলন হতে দূরে থেকেছেন। ফলে তাঁর অভিজ্ঞতার বিস্তার ঘটেনি। এটাই তাঁর সৃষ্টির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা ও আবর্তমুখিতার কারণ। তবু পুথি-প্রভাবের অবসান ঘটিয়ে আধুনিক কাব্যাদর্শ প্রচার এবং মুসলমান সমাজের নব্যচিন্তাবিমুখ মনোভাবের পরিবর্তন সাধনে প্রয়াসী হয়েছেন। 'মহাশ্মশানে'র মত বিরাট কাব্য রচনা করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালি মুসলমানের জড়ত্বকে ভেঙে দিয়েছেন। এক্ষেত্রে মশাররফের সাথে কায়কোবাদের কৃতিত্বের মিল আছে।

তাঁর 'বিরহ বিলাপ' (১৮৭০), 'কুসুম কানন' (১৮৭৩), 'অশ্রুমালা' (১৮৯৪) খণ্ড কবিতার বই। কাব্যগুলির প্রধান বিষয়বস্তু মানবপ্রেম, স্বদেশপ্রেম ও অধ্যাত্মপ্রেম। তিনি পরস্পর বিবদমান হিন্দু-মুসলমানকে 'বানর' ও উল্লুক' বলে সম্বোধন করে ভারতের

---

১০৯. *ঐ, পৃঃ ২৭-২৮*

১১০. *বার্ষিক সওগাত,* ১ বর্ষ, ১৩৩৩

পরাধীনতায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন, ভারতের স্বাধীনতার জন্য হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলন ও জাগরণ কামনা করেছেন। মুসলমানদের প্রাচীন গৌরব, সৌভাগ্য ও সমৃদ্ধির কথা স্মরণ করে অনেক কবিতা রচনা করেছেন, যেগুলির প্রধান লক্ষ্য পশ্চাদপদ ও দুর্দশাগ্রস্ত সমাজে আশাবাদ ও মনোবল সঞ্চার করা। ইসলামের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির আবেগ ও আবহ তাঁর কাব্যে স্বাভাবিকভাবে এসেছে।

'অশ্রুমালা' প্রকাশিত হওয়ার পর 'ঢাকা গেজেট' (১৮ চৈত্র ১৩০২) 'বঙ্গবাসী' (২১ ভাদ্র ১৩০৩) 'সারস্বতঃ' (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৪) ও 'নবনূরে' (শ্রাবণ ১৩১১) এর সমালোচনা হয়। 'বঙ্গবাসী'র বক্তব্য ; "মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাংলায় এরূপ সুন্দর কবিতা লিখিতে পারে, দেশে এমন কেহ আছে, আমাদের জানা ছিল না।"[১১১] 'ঢাকা গেজেটে' লেখা হয়, "কবি কায়কোবাদ ভাষা গাঁথতে জানেন, কাব্য সাজাইতে জানেন, ভাব আঁকিতে জানেন, তাঁহার কবিতা কষ্ট কল্পনার জিনিষ নহে, তোতাপাখীর নাম পড়া নহে, তাহা প্রাণের জিনিষ - সহজ, স্বাভাবিক, প্রাণস্পর্শী।"[১১২] 'নবনূরে' প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করে বলা হয়, "তিনি একজন প্রকৃত ভাব ুক কবি। তাঁহার হৃদয় আছে, সে হৃদয় প্রকাশের ক্ষমতাও আছে।"[১১৩] নবীনচন্দ্র সেন কবিকে লেখা একটি ব্যক্তিগত পত্রে (২ এপ্রিল ১৮৯৬) মন্তব্য করেন, "মুসলমান যে বাঙ্গালা ভাষায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, আমি আপনার উপহার না পাইলে বিশ্বাস করিতাম না ; অল্প সুশিক্ষিত হিন্দুরই বাঙ্গালা কবিতার উপর এরূপ অধিকার আছে। যেদিন মুসলমান সমাজ হিন্দুদের সঙ্গে এরূপ সুললিত কবিতায় বঙ্গভাষায় অশ্রু বিসর্জন করিবে, সেদিন প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদেশের সুদিন হইবে। এমন দিন যদি কখনও উপস্থিত হয়, আপনার 'অশ্রুমালা' তাহার প্রভাত শিশিরমালা স্বরূপ বঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাসে স্থান লাভ করিবে।"[১১৪]

মধুসূদনকে নয়, হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রকে অনুসরণ করে কায়কোবাদ 'মহাশ্মশান' রচনা করেন। এতে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে'র (১৮৭৫) প্রভাব পড়েছে বেশি। ঐতিহাসিক পটভূমিতে উভয় কাব্য রচিত। কায়কোবাদ 'মহাশ্মশানে'র ভূমিকায় এটিকে মৌলিক মহাকাব্য বলেই দাবি করেছেন। নানা বিষয়ে কবির দুর্বলতা ও ত্রুটির কথা বলেও এটি যে মহাকাব্য তা, কমবেশী সব সমালোচকই স্বীকার করেছেন। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে (১৭৬১) ভারত-আফগান সম্মিলিত মুসলমান শক্তির সঙ্গে মারাঠাশক্তির পরস্পর রক্তক্ষয়ী ও ধ্বংসমুখী সংগ্রাম মহাশ্মশানের বিষয়বস্তু। কবি একে ইতিহাসনিষ্ঠ করে তুলতে চেয়েছেন সত্য, তবে তিনি সর্বত্র কল্পনামুক্ত হতে পারেন নি। কাব্যের ক্ষেত্রে সেটাই স্বাভাবিক হয়েছে, কেননা ঐতিহাসিক কাব্য কাব্যই, ইতিহাস নয়। 'মহাশ্মশান' কাব্য রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কবি নিজে যা বলেছেন, তা এখানে উল্লেখযোগ্য ঃ "আমি বহু দিন

১১১. *বঙ্গবাসী*, ২১ ভাদ্র ১৩০৩
১১২. *ঢাকা গেজেট*, ১৮ চৈত্র ১৩০২
১১৩. *নবনূর*, শ্রাবণ ১৩১১
১১৪. 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে' উদ্ধৃত, পৃঃ ২৭৬ (৪নং)

যাবৎ মনে মনে এই আশাটি পোষণ করিতেছিলাম যে, ভারতীয় মুসলমানদের শৌর্যবীর্য সংবলিত এমন একটি যুদ্ধ কাব্য লিখিয়া যাইব, যাহা পাঠ করিয়া বঙ্গীয় মুসলমানগণ স্পর্দ্ধা করিয়া বলিতে পারেন যে, এক সময়ে ভারতীয় মুসলমানগণও অদ্বিতীয় মহাবীর ছিলেন, শৌর্যে ও গৌরবে কোন অংশেই তাঁহারা জগতের অন্য কোন জাতি অপেক্ষা হীনবীর্য বা নিকৃষ্ট ছিলেন না, তাই তাঁহাদের অতীত গৌরবের নিদর্শন স্বরূপ যেখানে যে কীর্তিটুকু, যেখানে যে স্মৃতিটুকু পাইয়াছি, তাহাই কবি তুলিকায় অঙ্কিত করিয়া পাঠকদের চক্ষের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছি, এবং তাঁহাদের সেই অতীত গৌরবের ক্ষীণ স্মৃতিটুকু জাগাইয়া দিতে বহু চেষ্টা করিয়াছি। আমার সে আশা পূর্ণ হইয়াছে।"[১১৫] সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যখন বাংলা ও ভারতের জাতীয় জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে, তখন কায়কোবাদ অত্যন্ত সচেতনভাবে সেই তিক্ত, সঙ্কীর্ণ ও অবাঞ্ছিত পথ বর্জন করেছেন। তিনি বলেছেন, যে শক্তিমানের সহিত শক্তিমানের বীরত্ব প্রকাশে গৌরব, অসমশক্তিতে শৌর্যবীর্য প্রকাশে গৌরব নেই। হিন্দু-মুসলমান শক্তিতে, সাহসে, বীর্যে, স্বাধীনচিত্ততায়, স্বাজাত্যপ্রেমে সমান বীর ও মহিয়ান। এখানে আছে বীরের সঙ্গে বীরের যুদ্ধ।[১১৬]

সমকালীন পত্রপত্রিকায় 'মহাশ্মশানে'ব আলোচনা হয়। 'নবনূরে' একটি প্রবন্ধে ফজলুর রহমান খাঁ নিন্দা-প্রশংসা দু-ই করেন। তার ভাষায়, "কবি কায়কোবাদের প্রতিভা আছে, মহাশ্মশান তাহারই বিকাশ মাত্র। ... গ্রন্থকাব যেরূপ উত্তেজনাপূর্ণ ভাষায় নানা বীর-চরিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা পড়িতে পড়িতে শরীব রোমাঞ্চিত হয। ... কবি আসুরিক শক্তি ব্যতীত ভারতীয় মুসলমানের মধ্যে অন্য শক্তির বিকাশ লক্ষ্য করিতে সক্ষম হন নাই, তাঁহার কাব্য এ দুর্দিনে প্রকাশ না হওয়াই ছিল ভাল।"[১১৭] পরবর্তীকালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় (বৈশাখ ১৩২৬) সৈয়দ এমদাদ আলী লেখেন 'মহাশ্মশান কাব্য অনৈসলামিক ও অশ্লীল ভাব' নামে একটি প্রবন্ধ ; 'এসলাম দর্শনে' (ভাদ্র ১৩২৭) মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ লেখেন 'মহাশ্মশান কাব্যের ভূমিকায় ইসলামের অবমাননা' শীর্ষক প্রবন্ধ। প্রবন্ধ দুটিতে কায়কোবাদের কবিধর্ম বা কবিত্বশক্তির বিচার নেই, কাব্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমানের কার গৌরব রক্ষিত হল, কার হল না, হিন্দুয়ানী-মুসলমানী ভাব কি পরিমাণে বজায় থাকল, কি পরিমাণে থাকল না সে সবের বিচার হয়েছে এবং সে-সূত্রে কবিকে অভিযুক্ত করা হয়েছে।[১১৮]

কায়কোবাদের পরবর্তী কাব্য 'শিবমন্দির' (১৯১৭), 'অমিয়ধারা' (১৯২৩), শ্মশানভস্ম' (১৯২৪), 'মহরম শরীফ' (১৯৩২)। অপ্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে 'উপদেশ রত্নাবলী', 'প্রেমের ফুল', 'জোবেদামহল কাব্য' ও 'মন্দাকিনী ধারা' উল্লেখযোগ্য।[১১৯]

১১৫. কায়কোবাদ—*মহাশ্মশান,* ১৯১৭ (২ সং), পৃঃ ১ (ভূমিকা)।
১১৬. *ঐ,* 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য
১১৭. *নবনূর,* মাঘ ১৩১২
১১৮. *বাঙালা-সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা,* পৃঃ ৪৪৫-৪৮ (২ সং)
১১৯. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃঃ ২৭৯ (৪ নং)

মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (১৮৫৮-১৯২০)

মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী রাজশাহী জেলার দুর্গাপুর থানার আলিয়াবাদ গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মুনশী মশীয়তউল্লাহ্ রেশমের কারবার করতেন। পূর্বপুরুষ মির্জা আলী কুলি বেগ শাহ সুজার (১৬৩৯-৫৯) সহিত ইস্পাহান থেকে আগমন করেন এবং আলি-আবাদের জমিদাব কন্যাকে বিবাহ করে স্থায়ী বসতি স্থাপন করেন।[১২০] মির্জা ইউসুফ আলী শ্রীধরপুর গ্রামে মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করেন। পরে রাজশাহী নর্মাল স্কুলে ভর্তি হন এবং ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি শিক্ষকতায় যোগদান করে প্রাইভেটে প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করেন এবং এফএ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন। তিনি প্রথমে রংপুরে নর্মাল স্কুলে শিক্ষকতা করেন (১৮৮১-৯৩), পরে সব-রেজিস্ট্রারের চাকুরী গ্রহণ করেন (১৮৯৩-১৯১৭)। উনিশ শতকেব দ্বিতীয়ার্ধে বাংলাদেশে ইসলামের পুনর্জাগরণের ও সম্প্রচারের কাজে যশোহরের মুনশী মেহেরুল্লা, টাঙ্গাইলের মৌলবী নইমুদ্দীন, চট্টগ্রামের মওলানা মনিরুজ্জামান, বরিশালের মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীনের যে ভূমিকা ও অবদান, রাজশাহীর মির্জা ইউসুফ আলীর সেই ভূমিকা ও অবদান। তিনি ত্রিবিধ কর্মসূচি নিয়েছিলেন — পুস্তক প্রণয়ন, সমিতি স্থাপন ও পত্রিকা সম্পাদনা। রাজশাহীর 'নূর-অল-ইমান সমাজ' (১৮৮৪), 'আঞ্জমনে হেমায়েত এসলাম' (১৮৯১) ও 'রাজশাহী জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র (১৯১৮) তিনি প্রতিষ্ঠতা-সম্পাদক ছিলেন। 'নূর-অল-ইমন সমাজে'র মুখপত্র 'নূর-অল-ইমন পত্রিকা' (১৯০০) এবং 'রাজশাহী জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র মুখপত্র 'মসলমান শিক্ষা-সমবায়' (১৯১৯) সম্পাদনা ও প্রকাশনার প্রধান দায়িত্বে তিনিই ছিলেন। তিনি 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' ও 'বঙ্গীয় ইসলাম সমিতি'র একজন উৎসাহী কর্মী ছিলেন। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মেলনে অভ্যর্থনা কমিটির তিনি অনারেরী সম্পাদক ছিলেন। সম্মেলনকে জনপ্রিয় ও সাফল্য মণ্ডিত করে তোলার জন্য তিনি এবং মুনশী মেহেরুল্লা পূর্ব হতেই বিভিন্ন সভায় বক্তৃতার মাধ্যমে প্রচার-কার্য চালান।[১২১] তিনি 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি'র কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন। ইসলাম মিশনের একজন বড় প্রবক্তা ছিলেন মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী। মির্জা ইউসুফ রংপুর নর্মাল স্কুলে ও মনিরুজ্জামান রংপুর কারামতিয়া মাদ্রাসায় যখন শিক্ষকতা করতেন তখন তাঁদের মধ্যে পরিচয় ও বন্ধুত্ব হয়। মনিরুজ্জামান সম্পাদিত 'সোলতান' (১৯০৪) পত্রিকা প্রকাশে মির্জা ইউসুফ অনেক ত্যাগ স্বীকার করেন।[১২২] রাজশাহী শহর ও নওগাঁয় মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণেও তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রাজশাহীর ফুলার হোস্টেল ১৮৯৯ সালে ও নওগাঁর মুসলিম হোস্টেল ১৯০৩ সালে স্থাপিত হয়। ছাত্রাবাস নির্মাণ সে যুগের শিক্ষান্দোলনের একটি অঙ্গ ছিল।

১২০. *প্রবন্ধ বিচিত্রা*, পৃঃ ১২৯-৩০
১২১. *ইসলাম প্রচারক*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০
১২২. *ইসলাম প্রচারক*, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১ ; *প্রবন্ধ-বিচিত্রা*, পৃঃ ১৩৭

কলিকাতায় মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন সুধাকর-গোষ্ঠীর বন্ধুদের সাহায্যে যৌথভাবে যেরূপ 'এসলামতত্ত্ব' (১৮৮৮-৮৯) অনুবাদ করেন, রাজশাহীতে মির্জা ইউসুফ 'কতিপয় কৃতবদ্য মৌলভী'র সহযোগিতায় যৌথভাবে সেরূপ 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' (১৮৯৫-১৯০৩) অনুবাদ করেন।[১২৩] উভয়ই ধর্মতত্ত্ব ও ব্যবহারবিধি বিষয়ক গ্রন্থ ; ইসলামীকরণ এবং তদ্দ্বারা জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের উদ্দেশ্যে অনুবাদকগণ এ কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন। 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' বৃহৎ গ্রন্থ ; 'দর্শন পুস্তক' (১৮৯৫), 'এবাদত পুস্তক' (১৯০০) 'ব্যবহার পুস্তক' (১ ভাগ, ১৯০১ ও ২ ভাগ, ১৯০৩) এবং 'পরিত্রাণ পুস্তক' নাম দিয়ে ৫ খণ্ডে সমাপ্ত হয়। 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'র অনুবাদ ও প্রকাশ যে যৌথ প্রয়াসের ফল তা গ্রন্থের 'ভূমিকা' থেকে জানা যায়। "ভারত বিখ্যাত কর্মবীর মহাত্মা হাসন আলী ইমাম গাজ্জালী রহমাতুল্লার সুপ্রসিদ্ধ অমূল্য গ্রন্থ কিমিয়ায়ে সাআদৎ বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিবার জন্য 'রাজশাহী আঞ্জমনে হেমায়েত এসলাম সভা'র নির্বাচিত 'নূরল ইমান' নামক অনুবাদক ও প্রকাশক সমাজ নিযুক্ত হইয়াছেন।"[১২৪] গ্রন্থের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখা হয়, "বঙ্গদেশে বঙ্গ ভাষায় অদ্য এক অপূর্ব গ্রন্থ প্রকাশ হইতে চলিল। হাতেম তাই, আমির হামজা, গোলে বকাওলী, সোনাভান, জৈগুন, বিদ্যাসুন্দর ও নানা প্রকার নাটক-নভেল প্লাবিত দেশে ইহার কিরূপ সম্মান হইবে তাহা অনুবাদক সমাজ জানে না। ... বিদ্যা দেখান আমাদের উদ্দেশ্য নহে ; স্বদেশীয় স্বজাতীয় ভ্রাতাভগিনীদিগকে জ্ঞানের একটা নূতন পথ প্রদর্শন করা এবং তাহাদিগকে ধর্মতত্ত্ব ও ধর্মবিজ্ঞান বুঝাইয়া দেওয়াই এই অনুবাদের উদ্দেশ্য।"[১২৫] এটি ছিল প্রথম খণ্ডের প্রথম মুদ্রণের ভূমিকার বক্তব্য ; দ্বিতীয় সংস্করণের (১৩২৫) ভূমিকায় লেখা হয়, "মুসলমানগণ সম্প্রতি আল্লার নেআমৎ (মহাদান) হইতে বঞ্চিত হইয়া নির্গুণ এবং জগতের চক্ষে ঘৃণিত হইয়াছে এবং তজ্জন্য ইহাদের ও প্রতিবেশীর মধ্যে পরস্পর প্রীতির বন্ধন শিথিল হইয়াছে। মুসলমানকে মানবোচিত গুণগ্রামে বিভূষিত করা এবং প্রতিবেশী জাতির মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব স্থাপন করা এই প্রকাশের উদ্দেশ্য।"[১২৬] 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'র ভাষা সরল ও সহজবোধ্য ছিল।

১২৩. *নবনূর,* আশ্বিনব ১৩১৩

১২৪. মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (সম্পাদিত)—*সৌভাগ্য স্পর্শমণি,* ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩ (বুকস এণ্ড বুকসে'ব সংস্করণ), 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
'অনুবাদক কমিটি'র গঠনরূপটি ছিল এরূপ ঃ
পরিদর্শক ১. মৌলবী মোহাম্মদ আবদুল আজিজ (ঢাকা কলেজের ভূতপূর্ব, অধ্যাপক)
২. মৌলবী আবু আলী মোহাম্মদ আবেদ (রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুলের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান মৌলবী)
৩. মৌলবী মোহাম্মদ সাবেবউদ্দীন আমিন (রাজশাহী মাদ্রাসার ভূতপূর্ব মৌলবী)
অনুবাদক—মৌলবী মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (সম্পাদক)
নকলকারক—মুনশী মোহাম্মদ আলিম
সহকারী সম্পাদক—খয়রুজ্জামান খাঁ
মির্জা এম. এ. আজীজ-'সৌভাগ্য স্পর্শমণি ও মুনশী রেয়াজুদ্দীন', মাসিক মোহাম্মদী 'চৈত্র ১৩৪০

১২৫. মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী (সম্পাদিত)—*সৌভাগ্য স্পর্শমণি,* ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩ (বুক্‌স এ্যাণ্ড বুকস'র সংস্করণ), পৃ: 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

১২৬. ঐ।

মির্জা ইউসুফের একক প্রচেষ্টায় রচিত প্রথম মৌলিক গ্রন্থ 'দুগ্ধ-সরোবর' (১৮৯১)। এতে চারটি অংশ আছে ঃ কুসংস্কার বর্জিত যুক্তিমূলক উদার ধর্মমত প্রচাব, হিতকর শিক্ষা বিস্তার, মুদ্রাযন্ত্রের সদ্ব্যবহার ও সমবেত শক্তি-গঠনে বিশ্বাসমূলক ভাবে সওদাগরীর প্রসার।[১২৭] সমকালীন সমাজের উপযোগিতার উপর ভিত্তি করে উক্ত বিষয়গুলি নির্বাচিত ও আলোচিত হয়েছে। লেখকের যে একটা তীব্র সমাজবোধ ও হিতার্তি ছিল তা রচনাগুলির মধ্যে প্রকটিত হয়েছে। 'দুগ্ধ-সরোবরে'র উপর আলোকপাত করে 'ইসলাম-প্রচারকে' লেখা হয় যে, ঐ গ্রন্থে মুসলমান জাতির সেযুগের শোচনীয় দুরবস্থা অতি মনোহর প্রণালীতে (রূপক কাহিনীর মাধ্যমে) ব্যাখ্যা করা হয় এবং সেই দুরবস্থা দূর করার উপায় সকল দেখান হয়।[১২৮] 'দুগ্ধ-সরোবরের'র ভাষায় আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ ছিল। এতে কোন এক সাময়িকপত্রে বিরূপ সমালোচনা হয়। সে কথা স্মরণ করে লেখক 'নূর-অল-ইমানে' বলেন, "বহু শতাব্দী হইতে যে সকল আরবী, পারসী, হিন্দী ইত্যাদি নানা ভাষার শব্দ নানা কারণে বাঙ্গালার গ্রাম্য অধিবাসীর প্রচলিত ভাষার সহিত রক্তমাংসের ন্যায় মিশিয়া গিয়াছে, সেই সকল শব্দের কিছু কিঞ্চিৎ দুগ্ধ-সরোবরে ব্যবহার করা হইয়াছিল ; তজ্জন্য সেই দুগ্ধ-সরোবরের সমালোচনাকালে কোন খবরের কাগজওয়ালা হিন্দু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মুসলমানেব বাবুর্চিখানায পক্ক দুগ্ধ হিন্দুর অস্পৃশ্য, এইজন্য আমরা এ দুগ্ধের আস্বাদ লইতে পারিলাম না।"[১২৯]

মির্জা ইউসুফ আলী 'আন্তিমকালের কর্তব্য' (অপ্রকাশিত) নামে আর একখানি মৌলিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১৩০] 'খোশ খবর' তাঁর অপর গ্রন্থ ; এতে ইসলাম মিশনে'র প্রয়োজনীয়তার ব্যাখ্যা আছে।[১৩১]

মির্জা ইউসুফ আলীর চিন্তা ছিল ভাবাবেগমুক্ত। তিনি বাকসর্বস্ব নীতিবাগীশ ছিলেন না, বাস্তব কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। এজন্য বিভিন্ন কর্মে রত থেকে সমাজের মানুষকে জাগাবার চেষ্টা করেছেন। 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি'র তৃতীয় সংস্করণের (১৩২৭) ভূমিকায় প্রকাশক বলেন, "শিক্ষা বিস্তার প্রয়াসে ও মসজিদ স্থাপনে—অমর সাহিত্য সাধনায় এবং সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনায়—আর্ত দুঃখ মোচনার্থ কো-অপারেটীভ আইনের আশ্রয়ে 'সাধারণ গ্রাম্য তহবিল' স্থাপনের চেষ্টায় তাঁহার বিভিন্নমুখী মানস প্রতিভার বিকাশ, বাংলার সকলকেই বিস্ময়াপন্ন করিয়াছে ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।"[১৩২] মির্জা ইউসুফ আলী নিজ কর্মগুণে ও চরিত্রমাহাত্ম্যে এরূপ প্রশংসা লাভের যোগ্য ছিলেন।

১২৭. মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী— *দুগ্ধ-সবোবর,* বিনোদ প্রেস, বোয়ালিয়া (রাজশাহী), ১৯১৪ (২নং) 'সূচীপত্র' দ্রষ্টব্য।

১২৮. *ইসলাম প্রচারক,* আশ্বিন ১২৯৮

১২৯. *নূর-অল-ইমান,* শ্রাবণ ১৩০৭

১৩০. মোহাম্মদ আবু তালিব—'মির্জা ইউসুফ আলী', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪

১৩১. *প্রবন্ধ-বিচিত্রা,* পৃঃ ১৩৫

১৩২. *সৌভাগ্য স্পর্শমণি,* ১ খণ্ড, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী (১৮৫৯- ১৯১৯)

যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখালরাজ রায় সম্পাদিত '১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা'য় 'মুসলমান লেখকগণের তালিকা' নিবন্ধে রওশন আলী চৌধুরী রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদীর জীবন ও কর্ম সম্পর্কে আলোকপাত করে বলেন, "পণ্ডিত রেয়াজ-অল-দিন আহমদ মাশহাদী। নিবাস চারান গ্রাম। পোঃ রতনগঞ্জ (ময়মনসিংহ)। ইনি মুসলমান সমাজেব একজন প্রবীণ সাহিত্যিক। বঙ্গ ভাষায় একজন প্রতিষ্ঠাপন্ন সুলেখক। ভাষাজ্ঞান অসাধারণ। 'প্রবন্ধ কৌমুদী', 'অগ্নিকুক্কুট' প্রভৃতি পুস্তক ইনি লিখিয়াছেন। 'ফকির আবদুল্লা বিন ইসমাইল আল কোরেশী অলহিন্দী' এই ছদ্মনামে পুস্তকগুলি লিখিত হইয়াছিল। ... 'সমাজ ও সংস্কারক' নামে ১২৯৬ সালে একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। উক্ত পুস্তকখানি প্রকাশিত হইবার পর গভর্ণমেন্ট উহা বাজেয়াপ্ত করিয়াছিলেন। ... ইনি মুসলমান সম্প্রদায়ের হিতের জন্য নানা বিষয়পূর্ণ 'সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' নামক একখানি পঞ্জিকা ১২৯৮ সাল হইতে প্রচার কবিযাছিলেন। ... ইহার আর একখানি গ্রন্থ 'সুরিয়া বিজয়'। এই গ্রন্থখানি সম্প্রতি শেখ আবদুর রহিম সাহেব প্রকাশ করিয়াছেন।"[১৩৩] রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী তখন জীবিত ছিলেন। তাঁব মৃত্যুর অব্যবহিত পরে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'বঙ্গীয মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা'য় 'পণ্ডিত বেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ কবেন। তিনি পণ্ডিত মাশহাদী সম্পর্কে বলেন, "পণ্ডিত রেয়াজ উদ্দীন আহমদ এক সময় কলিকাতা মাদ্রাসা আলিয়ার সংস্কৃত ও বাঙ্গালা ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তাঁহার সুপক্ক লেখনিপ্রসূত 'অগ্নিকুক্কুট', 'সমাজ ও সংস্কারক', 'সুরিয়া বিজয়' 'সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রভৃতি সাহিত্য ভাণ্ডারে অতুলনীয় সামগ্রী ছিল। ... তিনি 'মুসলমান সাম্রাজ্য' নামক একখানি প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিয়াছিলেন ; বিরাট পুস্তক ১০০০ পৃষ্ঠার ১০ খণ্ডে শেষ হইতে পারে বলিয়া তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ... আমরা যখন 'সুধাকর' সংবাদপত্র বাহিব করি, তখন সে বিষয়ে তিনি আমাদিগকে সর্বপ্রকার উৎসাহিত কবিয়াছিলেন এবং উহার অনুষ্ঠাতাদিগের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। ... দেলদুয়ারের জমীদার মিঃ এ, কে, গজনভী সাহেব ইউবোপ হইতে প্রত্যাবর্তন করিযা পণ্ডিত সাহেবকে স্বীয় ইস্টেটের ম্যানেজার নিযুক্ত করেন। তখন তিনি মাদ্রাসার চাকুরী ত্যাগ করিয়া স্বদেশে চলিয়া যান। ... ম্যানেজারী পদ গ্রহণের পর তিনি সাহিত্য সেবা হইতে এক প্রকার চিরদিনের জন্য অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় ইহাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইংরাজী এবং উর্দু ভাষায় মোটামুটি অধিকার ছিল।"[১৩৪] মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন 'আমার সংসার জীবন' (১৯১৪) নামক আত্ম-জীবনীতেও নানা জায়গায় পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীনের নাম উল্লেখ করেছেন। বিশেষ করে, 'এসলামতত্ত্ব' গ্রন্থখানি প্রণয়ন ও প্রকাশে সুধাকর-গোষ্ঠীর যে চার জনের সম্মিলিত অবদান আছে তাঁদের মধ্যে

১৩৩. ১৩২২ *বঙ্গাব্দেব সাহিত্য- পঞ্জিকা*, সমসাময়িক ভারত কার্যালয়, বাঁকীপুর (বিহার) পৌষ ১৩২৩
১৩৪. *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা*, কার্তিক ১৩২৬

রেয়াজুদ্দীনের মাশহাদী ছিলেন অন্যতম।[১৩৫] মাশহাদীর ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্যকর্ম সম্বন্ধে এর অতিরিক্ত তথ্য জানা যায় না।

'সমাজ ও সংস্কারক' (১৮৮৯) রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ। এর উৎস ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে লেখক বলেছেন, "অধঃপতিত মোসলমান সমাজের একমাত্র উদ্ধার-প্রয়াসী মহা পণ্ডিত সৈয়দ জামাল অল-দিন অল-আফগানীর জীবন-চরিত সম্বলিত অখিল মোসলমান সমাজের সাধারণ বিবরণ-মেসর হইতে প্রকাশিত তদীয় আত্মসংশোধিত জীবন-চবিত অবলম্বন করিয়া লিখিত।"[১৩৬] সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী ছিলেন প্যান-ইসলাম মতবাদের উদ্‌গাতা ও প্রচারক। এর একটি রাজনৈতিক ভিত্তি ছিল। ইউবোপবাসী বিজ্ঞানের বলে বলীয়ান হয়ে দ্রুত উন্নতির দিকে এগিয় যায়। বিশ্বের সব মুসলমান জাতির অবস্থা পতনোন্মুখ : ইউরোপীয়দের সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক গ্রাস থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় বিশ্ব-মুসলমানের রাজনৈতিক সংঘবদ্ধতা, ইসলাম এই ঐক্য স্থাপনের সহায়ক হবে। প্যান-ইসলামের এটাই ছিল সারকথা। জামাল উদ্দীন আফগানী ১৮৮০ সালে কলিকাতায় এলে রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এব নয় বছর পর 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থের জন্ম। বাঙালী মুসলমানের সমাজ জীবনে তখন নানা দিক থেকে দুর্যোগ ঘনীভূত ; নিঃসাড়, নিশ্চেতন সমাজদেহে প্রাণস্পন্দন জাগাতে হলে জামালউদ্দীন আফগানীর সংগ্রামী জীবন ও বিপ্লবী ভাবধারা দেশবাসীব কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। এরূপ ভাবনা থেকে তিনি 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তিনি গ্রন্থের সূচনায় এরূপ লক্ষ্যের কথাই বলেছেন। "বর্তমান সমাজে প্রতিপক্ষ সমাজ হইতে সমন্তাৎ তীব্রস্বরে মোসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কলঙ্ক ও অপবাদের ঘোর রোল সমুত্থিত হইয়াছে। এক্ষণে জগতে মুসলমানেরা কাপুরুষ, বিশ্বদ্রোহী, জ্ঞান-বিদ্যাবিরহিত, বর্তমান সাময়িক চিন্তায় অসমর্থ, বিলাসী, জঘন্য-প্রকৃতিক বলিয়া কীর্তিত হইতেছেন। ... আমি বহুকাল চিন্তা ও অনুধ্যানের পর, মোসলমান সমাজকে ঈদৃশ আক্রমণ হইতে বিমুক্ত করিতে, মোসলমানের প্রকৃত অবস্থা জনসমাজে প্রকাশ করিতে এবং তাহাদের ভবিষ্যমান অপায় হইতে সতর্ক করিবার জন্য একজন অতুল প্রতিভাশালী মহাসংস্কারকের জীবনচরিতসহ মোসলমানদের বর্তমান কলামাত্রাবশিষ্ট সাম্রাজ্য ও দুর্দশাগ্রস্ত সমাজের প্রকৃত চিত্র নিতান্ত সংক্ষিপ্ত ভাবে সহৃদয় মহানুভবগণের সমক্ষে স্থাপন করিলাম।"[১৩৭] 'সমাজ ও সংস্কারক' জামালউদ্দীন আফগানীর জীবনালেখ্য মাত্র নয়, তাঁর অভিজ্ঞতার আলোকে ভারতবর্ষ, আফগানিস্তান, মিসর, তুরস্কের সামাজিক, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার একটি বাস্তব সমীক্ষা-চিত্রও বটে। ইংরাজ শাসক জামালউদ্দীনকে সন্দেহের চক্ষে দেখতেন। তিনি ব্রিটিশের শোষণনীতির বিরোধী ছিলেন। মাশহাদীর গ্রন্থে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী লোলুপতার সমালোচনা থাকায় এটি সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।

১৩৫. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, পূর্বোক্ত, পৃঃ ৩৪-৩৫
১৩৬. আবদুল কাদির (সম্পাদিত)—*মাশহাদী রচনাবলী*, ১ খণ্ড, ১৯৭০, পৃঃ ৭
১৩৭. *মাশহাদী রচনাবলী*, ১ খণ্ড, পৃঃ ৫-৬

রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'অগ্নিকুক্কুট' (১৮৯০)। মশাররফ হোসেনের 'গো-জীবনে'র প্রতিবাদ স্বরূপ এটি রচিত হয়। রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী প্রধানত যুক্তিবাদী ও স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গির লেখক ছিলেন। গো-কোরবানী, গো-মাংস ভক্ষণ ইত্যাদিকে তিনি মুসলমানদিগের ধর্মীয় ও সামাজিক অধিকার বলে মনে করেছিলেন। তিনি বলেন, "পৃথিবীর কোন বুদ্ধিমান লোকই সামাজিক ও ধর্মশাস্ত্র সম্মত স্বত্ব, জাতি বা ব্যক্তি বিশেষের সন্তুষ্টির জন্য পরিত্যাগ করিতে পারেন না। 'অগ্নিকুক্কুট' মোসলমানদিগের সেই অধিকাব সংরক্ষণ জন্য সহসা প্রাদুর্ভূত হইল। ইহা উৎপীড়িত মোসলমান সমাজের নিজ পক্ষ ও অধিকার সমর্থন বিষয়ে সর্ব প্রথম পুস্তক।"[১৩৮] যজুর্বেদ, মনু-সংহিতা, চরক সাহিত্য, মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে গো-বধ ও গো-মাংস ভক্ষণের দৃষ্টান্ত আছে। সুতরাং গো-বধে হিন্দুদিগের আপত্তি করার ধর্মীয় কারণ থাকতে পারে না। অপর পক্ষে ভারতের মুসলমানরা ধর্মীয় কারণে গো-কোরবান করে থাকে। গো-হত্যা সম্পর্কিত সমকালীন দ্বন্দ্বে মাশহাদী এরূপ যুক্তি উত্থাপন করে মশাররফ হোসেনের বিরোধিতা কবেছিলেন। তিনি যুক্তিবাদী ছিলেন সত্য, কিন্তু স্বসমাজের স্বার্থ ত্যাগ করে সাম্প্রদায়িক উদারতা প্রকাশ করার মত মুক্তবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন না। বিশেষত: যুগের যেরূপ ধর্ম ছিল, তাতে সামাজিক উদারতা প্রকাশ সহজ সাধ্য ছিল না। 'গো-রক্ষিণী সভা' (১৮৮২) প্রতিষ্ঠা করে এবং পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে তখন হিন্দুগণও গো-হত্যার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিলেন। ফলে মাশহাদী নিজ ভাষাকে সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত রাখতে পারেননি।

রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর তৃতীয় গ্রন্থ 'প্রবন্ধ কৌমুদী' (১ খণ্ড, ১৮৯২)। এতে 'আরব ও ইসলাম', 'মোসলমান বীরাঙ্গনা', 'আত্মসম্মান ও প্রকৃত বীরত্ব', 'এরমুক যুদ্ধের পূর্বাভাস', 'মালেক-আল গাজী' ও 'মহরম'—এই ৬টি প্রবন্ধ আছে। 'অগ্নিকুক্কুটে'র মত 'প্রবন্ধ কৌমুদী'তেও 'ফকির আবদুল্লা বিন ইসমাইল' ছদ্ম নাম গৃহীত হয়েছে। 'মিহির ও সুধাকরে' 'প্রবন্ধ কৌমুদী'র বিষয়ের গভীরতা ও ভাষার পারিপাট্যের প্রশংসা করা হয়।[১৩৯]

তাঁর চতুর্থ গ্রন্থ 'সুরিয়া বিজয়' (১৮৯৫)। এটি প্রথমে 'মিহিরে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এতে হজরত আবুবকর কর্তৃক সিরিয়া অভিযান ও বিজয় কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। ফারসি মূল গ্রন্থ ও বাংলা দোভাষী পুথি থেকে 'সুরিয়া বিজয়ে'র কাহিনী সংগৃহীত। রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী প্রাঞ্জল গদ্যে এটি লিখেছেন।

'প্রচারক' পত্রিকায় মোট তিন সংখ্যায় (আষাঢ়, শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩০৭) তিনি 'বিবাদ' নামে একটি সুচিন্তিত ও যুক্তিপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ছাপান। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'সাধনা' পত্রিকায় কৃষ্ণবিহারী সেনের 'মোগল রাজ পত্নী' ও রজনীকান্ত গুপ্তের 'প্রতিবাদ' প্রবন্ধদ্বয় থেকে প্রেরণা লাভ করে তিনি 'বিবাদ' লিখেছিলেন।[১৪০]

১৩৮. *মাশহাদী র[illegible]নাবলী* ১ খণ্ড, পৃঃ ২৩৭ ; স্মরণযো[illegible] য, মোহাম্মদ নইমুদ্দীনেব 'গো-কাণ্ড' এর আগেব [illegible] প্রকাশিত হয। সুতবাং মাশহাদীর বইটি এ ধারার দ্বিতীয় পুস্তক।

১৩৯. ঐ, পৃঃ ৩১৮

১৪০. *মাশহাদী রচনাবলী*, ১ খণ্ড, পৃঃ ৩৩১-৩২

'সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' নামে দুবছরে দুটি (১৮৯১, ১৮৯২) মহম্মদীয় পঞ্জিকা প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় বর্ষের সিদ্ধান্ত পঞ্জিকার আলোচনা করে 'মিহিরে' লেখা হয় : "এই পঞ্জিকার প্রথমে জ্যোতিষ সম্বন্ধীয় আবশ্যক কতকগুলি কথা আছে। তাহাতে দিন, রাত্র, ঋতু-পরিবর্তন, গ্রহণ প্রভৃতি বুঝান হইয়াছে। তৎপরে ইহাতে মোসলমান ধর্ম সম্বন্ধে যুগপ্রকরণ কর্তব্যকার্য, নামাজ, জুমায়া, আইয়ামে বেজ, মহররম, আখেরি চাহার শোম্বা, ফতেহায়ে দোয়াজ দাহোম, রজব, শাহবান, শবে বরাত, রমজান, সেহর ও এফতার, এহতেফাক, শবে কদব, ঈদঅল ফেতর, শওয়াল, জেলহজ ও ঈদঅলজোহা প্রভৃতির বিবরণ এবং সেই সেই সময়ে কোরান শরিফ ও হাদিস শরিফ অনুসারে কখন কি কাজ করা ফরজ, ওয়াজেব, সোন্নাত, নফল তাহার বিবরণ আছে। প্রকৃতপক্ষে মোসলমান সমাজের ব্যবহার পক্ষে যতদূর সম্ভব ততদূর উপযোগী করিতে ইহার প্রতি চেষ্টার কম হয় নাই।"[১৪১] হিন্দুসমাজে বার, ব্রত, মাস, তিথি, পূজা-অর্চনা, শুভাশুভ, বিবাহ, গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন, বাণিজ্যযাত্রা, পুণ্যাহ, আহার, উপবাস ইত্যাদি বিষয় সংক্রান্ত বর্ষপঞ্জিকা বহু পূর্ব থেকে প্রচলিত ছিল, মুসলমান সমাজে মুসলমানদের ধর্মকর্মে ব্যবহাব-উপযোগী অনুরূপ পঞ্জিকার প্রয়োজনবশে মাশহাদী প্রথম 'সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা' প্রণয়ন করেন। তিনি স্বসমাজের কেবল চাহিদাই পূরণ করেননি, সে-সমাজের অস্তিত্ব আছে এবং স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে—সেটাও তুলে ধরেছেন। আত্ম-বোধের সঙ্গে স্বাতন্ত্র্য চেতনার যে যুগ-লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছিল, এতে তারই স্বাক্ষব রয়েছে। মাশহাদী 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থে 'মুসলমান সাম্রাজ্য' শীর্ষক যে সুবৃহৎ গ্রন্থের প্রস্তুতির কথা বলেছেন, তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি, পাণ্ডুলিপিরও অনুসন্ধান পাওয়া যায়নি।

রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীর উচ্চ শিক্ষার ভিত্তি ও নীতিগত আদর্শ থাকায় সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাতের ক্ষেত্রেও তাঁর মনের উগ্রতা বা চিত্তের সংকীর্ণতা প্রকাশ পায়নি। তাঁর চিন্তার ঐক্য, সংহতি ও সংযম বরাবর বিদ্যমান ছিল। তিনি কুসংস্কার ও রক্ষণশীলতাকে জাতীয় প্রগতির অন্তরায় বলেই মনে করতেন।

শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯—১৯৩১)

শেখ আবদুর রহিম ২৪-পরগণার বসিরহাট মহকুমার মহম্মদপুব গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা শেখ গোলাম এহিয়া পাঠশালার শিক্ষক ছিলেন। শৈশবে মাতৃবিয়োগ হলে তিনি মাতুল গোলাম কিবরিয়ার ('উচিৎ কথা'র লেখক) আশ্রয়ে লেখাপড়া করেন। গোলাম কিবরিয়া টাকীর পাঠশালার শিক্ষক ও জমিদার রাধামাধব বসুর পরিবারের গৃহ-শিক্ষক ছিলেন। রাধামাধব বসু ব্রাহ্ম ছিলেন। আবদুর রহিম এই পরিবারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশা করতেন। তিনি স্থানীয় মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয় থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে কলিকাতায় সিটি স্কুলে ভর্তি হন এবং এন্ট্রান্স শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশুনা করেন (১৮৭৫) ; অসুস্থতার জন্য এন্ট্রান্স পাশ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি।

ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবি-ফারসি অধ্যাপক মৌলভী মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ আবদুর রহিমের আত্মীয় ছিলেন। তাঁর সান্নিধ্যে রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী,

১৪১. ঐ, পৃঃ ৩২৩-২৪

রেয়াজুদ্দীন, মোজাম্মেল হক, শেখ আবদুর রহিম প্রমুখ একত্র হয়েছিলেন। তাঁরাই প্রথম এক সাহিত্য-গোষ্ঠীর সূচনা করেন। 'এসলামতত্ত্ব' গ্রন্থখানি তাঁদেরই যৌথপ্রয়াসের ফল। পরে 'সুধাকর' পত্রিকা প্রকাশিত হলে 'সুধাকর-গোষ্ঠী' হিসাবে তাঁরা পরিচিত হয়ে ওঠেন।

শেখ আবদুর রহিমের সাহিত্যকর্ম ও সাংবাদিকতা পাশাপাশি চলেছিল। তিনি একাদিকক্রমে ৭ খানি সাময়িকপত্রের সম্পাদনা করেন ও ১২ খানি গ্রন্থ রচনা করেন। সাহিত্যচর্চা ও সাংবাদিকতাকে তিনি জীবিকা হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এক্ষেত্রে রেয়াজুদ্দীন আহমদের সহিত তাঁব মিল আছে। উভয়ের লক্ষ্য মোটামুটি এক ছিল—ইসলামেব ভাবধাবাব আলোকে বাংলার মুসলমান সমাজে নব-জাগরণের আন্দোলন। তাঁদের বিশ্বাস যে, ধর্মের আদর্শচ্যুতি ও ইতিহাসের গৌরববিস্মৃতিব জন্য মুসলমানদের অধঃপতন হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা লাভের সাথে ধর্মচেতনা ও ইতিহাসচেতনা না জন্মিলে মুসলমান সমাজের উন্নতি সম্ভব নয়। আবদুল লতিফ, আমীর আলীর মত নেতৃবৃন্দ প্রায় অনুরূপ ধারণা পোষণ করতেন : ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা তাঁরাও চাননি। আমীর আলী মাদ্রাসা তুলে দেওয়াব পরামর্শ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর প্রধান দুটি রচনা 'স্পিরিট অব ইসলাম' (১৮৯১) এবং 'এ শর্ট হিস্টবী অব সারাসিন্‌সে' (১৮৯৮) ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান ইতিহাসের মাহাত্ম্য ও গৌরব ব্যাখ্যা করা হয়েছে। খ্রিস্টানদের অপব্যাখ্যা ও মিথ্যা প্রচারণার হাত থেকে কোরান, মহম্মদ ও ইসলামকে রক্ষা করার জন্য আমীর আলীর মত সৈয়দ আহমদও লেখনি ধারণ কবেছিলেন। 'সুধাকর-গোষ্ঠী'ব লেখকরা এই আদর্শ-সূচি দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত হয়েছিলেন। 'এসলামতত্ত্ব' যৌথভাবে এবং 'হজরত মহম্মদের জীবন-চরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৮) এককভাবে রচনা ও প্রকাশ করে শেখ আবদুব রহিম বাঙালী মুসলমানের কাছে সেই ভাবাদর্শ পৌঁছে দিতে চেয়েছেন। আবদুর রহিমেব মধ্যে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা ছিল না : তাঁর সাহিত্যিকসুলভ একটি মন ও মেজাজ ছিল ; তিনি একটি সুললিত সুঠাম পরিমার্জিত ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন। বাংলা ছাড়াও আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরাজিতে জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তাঁর সারগর্ভ রচনায় ঐসব ভাষার বহু উপাদান আছে।

'সুধাকর' (১৮৮৯), 'মিহির' (১৮৯২), 'হাফেজ' (১৮৯২), 'মিহির ও সুধাকর' (১৮৯৪), 'মোসলেম ভারত' (১৯০০), 'মোসলেম হিতৈষী' (১৯১১) এবং 'ইসলাম-দর্শন' (১৯১৬) সংবাদপত্র ও সাহিত্যপত্র আবদুর রহিমের সম্পাদনায় জন্ম লাভ করে। দেশের বিদ্বৎসমাজ ও বিশিষ্ট নেতৃবর্গের সহিত তাঁর যোগসূত্র স্থাপিত হয়। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, ওয়াজেদ আলী খান পন্নী, আবদুস সোবহান চৌধুরী, নবাব খাজা সলিমুল্লা, সিরাজুল ইসলাম, সৈয়দ শামসুল হোদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, পীর আবু বকর প্রমুখের বিভিন্ন রকম সহযোগিতায় পত্রিকাগুলি প্রকাশিত হয়। এঁদের চিন্তা-চেতনা ও ধ্যানধারণার সাথে আবদুর রহিম পরিচিত হন। নানা দ্বন্দ্ব-দোলায় বিচলিত, আঘাত-সংঘাতে বিক্ষত সমাজের হিতাসাধনে এঁদেরই সম্মিলিত চিন্তাধারা ও কর্মপ্রয়াস ঐসব পত্রিকার মধ্যে প্রচার লাভ করে। আবদুর রহিম সম্পাদনার দায়িত্ব পালনের সাথে সাথে অনেক মূল্যবান লেখা পত্রিকাগুলিতে প্রকাশ করেন। 'আলহামরা' (মিহির), 'পুরাতত্ত্ব' (ঐ) 'বাঙ্গালার মুসলমান' (হাফেজ), ইসলামে পিতামাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্যকর্ম' (ঐ) প্রভৃতি দীর্ঘ রচনা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৮), 'ইসলামতত্ত্ব' (১৮৯৬), 'নামাজতত্ত্ব' (১৮৯৮), 'হজবিধি' (১৯০৩), 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' (১৯১০), 'নামাজশিক্ষা' (১৯১৭), 'প্রণয়-যাত্রী' (১৯২০), 'ইসলামনীতি' (১৯২৫), 'কোরআন হাদিসেব উপদেশাবলী' (১৯২৬), 'রোজাতত্ত্ব' (ঐ) ও খোৎবা' (১৯৩২) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এগুলির মধ্যে 'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। প্রায় সহস্র পৃষ্ঠার সুবৃহৎ গ্রন্থে হজরত মহম্মদের জীবনী ও ধর্মনীতি মুখ্যভাবে এবং সমসাময়িক কালে সমাজেব ধর্মীয় সমস্যাবলী আনুষঙ্গিকভাবে আলোচিত ও ব্যাখ্যাত হয়েছে। তিনি গ্রন্থের উৎস সম্বন্ধে 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "যিনি সত্য ও সনাতন ধর্মপ্রচারের নিমিত্ত অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়া অসাধাবণ অধ্যবসায় ও কঠোর সাধনা বলে শত সহস্র বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করত স্বীয় মহান ব্রত উদযাপন করিয়াছিলেন, যাঁহার প্রচলিত পবিত্র ধর্মের তেজে মানবগণেব ভ্রম ও কুসংস্কার ভস্মীভূত হইয়া ইসলামের ধর্মবিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে, সেই মহাত্মার জীবনচরিত, আমি কলিকাতা ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজদ্বয়েব সুযোগ আরব্য ও পাবস্যাধ্যাপক মৌলভী মেয়ারাজ উদ্দিন আহমদ সাহেবের সাহায্যে তারিখ এবনে-হেশাম, সেফায়ে-কাজী-আয়াজ, মাদাবেজন্নবুয়েত, রওজতল-আহবাব, মায়াবেজন্নবুয়ত, মাগাযিব-বসুল, জাজবল-কলুব্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আববি ও পারসি গ্রন্থাবলম্বনে বিশুদ্ধ বঙ্গভাষার সঙ্কলন পূর্বক জনসমাজে প্রচার করিলাম। হজরত মহম্মদের জীবনী ও ধর্মনীতি সম্বন্ধে প্রধান প্রধান ইউরোপীয় গ্রন্থাকাবগণ যাহা যাহা লিখিয়াছেন, তাঁহাদের সেই সকল গ্রন্থ হইতেও আবশ্যক বোধে নানা অংশ অনুবাদ করিয়া দিলাম। ইহা ব্যতীত স্যার সৈয়দ আহমদ ও মি. সৈয়দ আমীর আলী সাহেব প্রভৃতি মহোদয়গণের গ্রন্থ হইতে জ্ঞাতব্য বিষযগুলির অনুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে হজবত নূহ আলায়হেচ্ছালামের (নোয়ার) সময় হইতে আরবদেশের প্রাচীন ও আধুনিক অবস্থা বিশদরূপে বিবৃত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।"[১৪২] তাঁব গ্রন্থে পাশ্চত্যের বৈজ্ঞানিক যুক্তিশীলতা পুরোপুরি অনুসৃত না হলেও তিনি অলৌকিক ও অনৈতিহাসিক উপাদানগুলি যুক্তি দিয়েই বর্জন করেছেন, ভক্তের অন্ধ দৃষ্টি দিয়ে মহম্মদের চরিত্র মাহাত্ম্য ও ইসলামের গৌরব কীর্তন করেননি। তিনি বলেছেন, হজরত মহম্মদ শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ এবং সকল শ্রেণীর মানুষের ত্রাণকর্তা। ইসলাম তরবারির সাহায্যে প্রচারিত হয়েছে—খ্রিস্টান পাদরীদের এরূপ প্রচারণা তিনি মানেননি। "ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় হজরত মহম্মদের যে কয়খানি জীবনী বাহির হইয়াছে, তৎসমুদয় প্রায় অসম্পূর্ণ এবং ইংরাজি গ্রন্থ অবলম্বনে লিখিত বলিয়া কোন কোন বিষয় মুসলমানদিগের উপযোগী হয় নাই। হজরত মহম্মদ

১৪২. শেখ আব্দুব বহিম— *হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি*, কলিকাতা, ১৯২৬ (৬ সং) পৃ. (।/০) প্রথম বারের বিজ্ঞাপন, ফাল্গুন ১২৯৪)

তরবারি বলে ইসলাম প্রচার করিয়াছেন বলিয়া ভিন্ন ধর্মাবলম্বিগণ যে তাঁহার নামে বৃথা দোষারোপ করিয়া থাকেন, এই পুস্তক পাঠ করিলে সে ভ্রম বিদূরিত হইবে।"[১৪৩]

'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি'র মত একটি বৃহৎ গ্রন্থ রচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি ছিল, তা লেখক পরবর্তীকালে 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' উল্লেখ করেছেন। "আমাদের জাতীয় প্রাচীন ইতিহাসগুলি আরব্য ভাষারূপ সুদৃঢ় দুর্গেব মধ্যে আবদ্ধ। আজকাল আমাদের মধ্যে আরবি ভাষার চর্চা লোপ পাইতেছে বলিয়া আমরা আমাদের জাতীয় ইতিহাসে পূর্ণ অনভিজ্ঞ। জাতীয় ইতিহাসে অভিজ্ঞতা না থাকিলে কোন জাতি স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিতে সক্ষম হয় না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ। আমরা মুসলমান বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকি, কিন্তু আমরা যাঁহারা ওম্মত অর্থাৎ অনুগামী, তাঁহার পবিত্র জীবনচরিত আমাদেব মধ্যে কয়জন অবগত আছেন?...বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণের সেই অভাব দূর করিবাব জন্য কয়েক বৎসর পূর্বে আমি 'হজরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' নাম দিয়া একখানি পুস্তক প্রকাশ করি।"[১৪৪] পাঠকের মনে ও সমাজে গ্রন্থখানির প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করে 'মিহির ও সুধাকরে' লেখা হয় : "পুস্তকখানি প্রকাশিত হওয়ায় আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অশেষ উপকার হইয়াছে, তাহার দ্বারা অন্য ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারিয়াছিলেন এবং খৃষ্টানধর্মাবলম্বীগণ কর্তৃক ইসলামের প্রতি অযথা দোষারোপের অনেক নিরাকরণ করা হইয়াছে।"[১৪৫]

'ইসলামতত্ত্ব' 'নামাজতত্ত্ব' 'হজবিধি' প্রভৃতি গ্রন্থে ধর্মপালনের রীতিনীতি বর্ণিত হয়েছে। তিনি নামাজতত্ত্বের ভূমিকায় বলেছেন, যে ধর্মকর্ম পালন না করার জন্য মুসলমান সমাজের দুরবস্থা হয়েছে ; কোরানের নির্দেশ অনুযায়ী যদি চলে তবে মুসলমানরা প্রাথমিক যুগের ন্যায় পরাক্রমশীল জাতিতে পরিণত হবে। তাঁর ভাষায়, "পূর্বকালীন মুসলমানদিগের ন্যায় মনের ভক্তি ও দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত আমরা এখন নামাজ পড়ি না বলিয়াই আমাদের এই দুরবস্থা।... যদি আমরা পূর্বোল্লিখিত নিয়মে পড়ি এবং সমুদয় কার্য্যে কোরআন শরিফের আদেশ প্রতিপালন এবং পয়গাম্বর (দরুদ) সাহেবের অনুকরণ করি, তাহা হইলে আমাদের এইরূপ দুর্দশা কখনই থাকিবে না ; আমরা আবার সেই প্রাথমিক মুসলমানদিগের ন্যায় পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পরাক্রমশালী জাতি হইয়া দাঁড়াইব।"[১৪৬] 'মিহির ও সুধাকরে' থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় রক্ষণশীল মহল থেকে আপত্তি উঠেছিল। রসধর্মী রচনা তাঁদের মনঃপূত ছিল না। এমন কি, ধর্মগ্রন্থ বাংলা ভাষায় রচনা করতেও মৌলবীদের অনুমতির প্রয়োজন হয়েছিল। এ অবস্থায় সৃষ্টিশীল সাহিত্যরচনা অকল্পনীয় হয়ে পড়ে।

---

১৪৩. শেখ আব্দুর রহিম—হযরত মহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি, কলিকাতা, ১৯২৬ (৬ সং), পৃ. ।/০

১৪৪. *শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী,* ২ খণ্ড, পৃ. ২৯

১৪৫. *মিহির ও সুধাকর,* ২৭ পৌষ ১৩০৭

১৪৬. *শেখ আব্দুর রহিম গ্রন্থাবলী,* ২ খণ্ড, পৃ. ২৬৭

"পারিপার্শ্বিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে আবদুর রহিমের ধারণা হয়েছিল যে, 'কাব্য, কবিতা প্রভৃতি সুখের সাহিত্য' অপেক্ষা 'ধর্মগ্রন্থ ও জাতীয় ইতিহাস' প্রভৃতি জ্ঞানধর্মী রচনার দ্বারা দেশপ্রীতি ও ভাষাপ্রীতি জাগানো সম্ভব হবে। লেখকের ভাষায়, "পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাব মনে এই দৃঢ় প্রতীতি জন্মিয়াছিল যে, ধর্মগ্রন্থ ও জাতীয় ইতিহাস প্রভৃতি দ্বারা বাঙ্গালা ভাষাকে ভূষিত করিতে হইবে। তদ্ভিন্ন কাব্য, কবিতা প্রভৃতি সখের সাহিত্যেব সাধুভাষা কিংবা শুধু সৌন্দর্যকলার আকর্ষণে মুসলমান কিছুতেই বাঙ্গালা ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হইবে না।"[১৪৭] ফলে তাঁব মধ্যে যে সাহিত্যচেতনা সুপ্ত ছিল, তা অচিবেই লুপ্ত হয়ে যায়। ওয়াশিংটন আরভিং-এর 'দি আলহামরা' (১৮৩২) অবলম্বনে 'আলহামরা' (১৮৯১) এবং 'দি পিলগ্রিম অব লাভ' অবলম্বনে 'প্রণয়-যাত্রী' (১৮৯২) শেখ আবদুর রহিমের দুটি অনুবাদ গ্রন্থ। উভয় রচনায় তাঁর রোমান্টিক শিল্পীমনের পবিচয় আছে ; কিন্তু তা এখানেই শেষ হয়, তিনি আর এ পথে অগ্রসর হননি। 'প্রণয়-যাত্রী'র প্রথম সংস্করণে তিনি নাম ব্যবহার করেননি, কেবল 'উৎসর্গ-পত্রে' "আ-র" স্বাক্ষব ছিল। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণে (১৯২০) তাঁর নাম আছে, তবে নামের আগে 'শেখ' নেই।[১৪৮] 'প্রণয়-যাত্রী' নিয়ে এরূপ লুকোচুরি খেলা তাঁর মানসিক দ্বন্দ্ব-সংশয়কে সূচিত করে। তিনি প্রণয়-যাত্রীর দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' এরূপ সংশয় প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "ইহা বর্তমান সময়ের পাঠকগণেব রুচিকর হইবে কিনা, তাহাতেও সন্দেহ। তবে জাতীয় সাহিত্যের অভ্যুদয়-যুগের একটি আদর্শ যাহাতে একেবারে বিলুপ্ত হইয়া না যায় সেই জন্যই পুস্তকখানি পুনরায় প্রকাশ করিলাম।"[১৪৯] শেষের দিকে তিনি ধর্ম ও নীতির দিকে আরও ঝুঁকে পড়েন ও রসধর্মী শিল্পের বিরোধী হয়ে ওঠেন। তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন, "ধর্ম এবং নীতি পরিত্যাগ করিয়া কেবল বিশ্বের সুখসৌন্দর্য ও ভোগবিলাসের ভিখাবী আমি নহি।...আমাদের নিকট ধর্মনীতিহীন সৌন্দর্য্যের মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর।"[১৫০]

'হজবিধি' মোহাম্মদ ইয়াকুব নূবী এবং শেখ আবদুর রহিম যৌথভাবে রচনা করেন। বিত্তশালী প্রত্যেক মুসলমানের পক্ষে হজ বা তীর্থ উদযাপন অবশ্য শাস্ত্রীয় কর্তব্য। এই পুস্তিকায় সেই হজব্রতের নিয়ম-কানুন সম্পর্কে আলোচনা আছে।

ভাষার প্রশ্নে তাঁব মনোভাব ছিল স্বচ্ছ : বাঙালির মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া আর কিছু হতে পারে না, তা তিনি দৃপ্তকণ্ঠে উচ্চারণ করেছেন। তাঁর সাহিত্যসাধনার একটা বড় দিকই ছিল মাতৃভাষার উন্নতি ও ব্যাপক প্রসার সাধন। তিনি নিজ লক্ষ্যের কথা ব্যাখ্যা ক'রে 'বঙ্গভাষা ও মুসলমান সমাজ' প্রবন্ধে বলেছেন, "অন্ধকার যুগে যখন আমি নিজের

১৪৭ ঐ, পৃ ২৩০
১৪৮ *শেখ আবদুব রহিম গ্রন্থাবলী*, পৃ. ১৪৯
১৪৯ ঐ পৃ. ১৪৭
১৫০ ঐ, পৃ ২৪৫-৪৬

ক্ষীণশক্তিটুকু লইয়া সম্পূর্ণ নিরবলম্বন ও নিঃসহায় অবস্থায় বাঙ্গালার সাহিত্য-আসরে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলাম তখন একটি মাত্র চিন্তা আমার সমস্ত দেহমন অধিকাব করিয়া লইয়াছিল। সে চিন্তাটি এই যে—কেমন করিয়া আমার প্রিয়তমা স্বজাতি বাঙ্গালী মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অবাধ প্রচার করিব, কেমন করিয়া তাহাদের ভ্রান্ত কুহেলিকা ও জড়তা মোচন করিয়া তাহাদিগকে মাতৃভাষার পুণ্যমন্দিরে লইয়া আসিব এবং কেমন করিযা তাহাদের মনের মধ্যে মাতৃভাষার সাহায্যে জাতীয সাহিত্য গঠনের প্রেরণা জাগাইয়া দিব?"[১৫১]

আবদুর রহিম তাঁর সমাজ ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত ছিলেন। 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র তিনি সদস্য ছিলেন। 'আঞ্জমনে ওযাজীনে ইসলামে'র (১৯১০) বাংলার প্রথম সম্পাদক পদে তিনি নির্বাচিত হন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র (১৯১১) কার্য্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ও পরে সহ-সভাপতি হন। 'বঙ্গীয সাহিত্য পরিষদে'বও (১৮৯৩) তিনি সদস্যভুক্ত ছিলেন।

মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক (১৮৬০-১৯৩৩)

গদ্যে ও পদ্যে সমান দক্ষতা ছিল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হকের। নদীয়ার শান্তিপুরের অধিবাসী হয়ে তিনি একটি সাবলীল, পরিশীলিত, শ্রুতিসুখকর বাংলা ভাষাভঙ্গি আয়ত্ত করেছিলেন ; এবং তজ্জন্য তিনি সমালোচকের কাছ থেকে প্রশংসাও পেয়েছেন। তিনি শান্তিপুর মিউনিসিপ্যাল স্কুলে প্রবেশ করেন এবং সেখানে প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়ে স্কুল ত্যাগ করেন।[১৫২] তাঁর উচ্চশিক্ষা না হলেও সুশিক্ষা ভালভাবে সম্পন্ন হয়েছিল ; তিনি বাংলার সাথে আরবি, ফারসি, উর্দু ও ইংরাজি শিখেছিলেন। তিনি এসব ভাষার গ্রন্থের অনুসরণে মূলানুবাদ বা ভাবানুবাদ করেছেন। মোজাম্মেল হকের কর্মজীবন সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। 'সুধাকর' পত্রিকায় ১২৯৯ সনের ১৮ ভাদ্র সংখ্যায় আছে যে, তিনি 'শান্তিপুর জুবিলী মাদ্রাসা'য় শিক্ষকতা করতেন ; 'মহারানীর জুবিলী উৎসবে'র (১৮৮৭) বছর এ মাদ্রাসা স্থাপিত হয়।[১৫৩] তিনি কিছুকাল কলিকাতায গৃহশিক্ষকতা করেন। সৈয়দ এমদাদ আলী একটি প্রবন্ধে লিখেন, "তিনি (মোজাম্মেল হক) তখন হাইকোর্টের বিখ্যাত উকিল শ্রীনাথ দাসের পুত্র জ্ঞানেন্দ্রনাথ দাস এমএ. বিএল মহাশয়ের বাড়ীতে প্রাইভেট টিউটরী করিতেন।"[১৫৪] ঐ সময় তিনি মঙ্গলায় থাকতেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে অধ্যাপক মেয়ারজউদ্দীন, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন, মশাররফ হোসেন, শেখ আবদুর রহিম, ডাক্তার হবিবর রহমান প্রমুখ জ্ঞানী ও সাহিত্যিকগণের সহিত মোজাম্মেল হকের পরিচয় হয়। পরবর্তীকালে তিনি কলিকাতা

১৫১. ঐ, ২ খণ্ড, পৃ. ২১৮ (প্রবন্ধটি মাসিক মোহাম্মদী ১৩৩৬ সনের ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয।)
১৫২. *বার্ষিক সওগাত*, ১ বর্ষ, ১৩৩৩
১৫৩. *সুধাকর*, ১৮ ভাদ্র ১২৯৯
১৫৪. সৈয়দ এমদাদ আলী —'মোজাম্মেল হক ও রেয়াজউদ্দীন', *মাসিক মোহম্মদী*, চৈত্র ১৩৪০

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ম্যাট্রিকুলেশনের বাংলা ভাষার পরীক্ষক নিযুক্ত হন। বাংলা ভাষায় পাণ্ডিত্য ও দক্ষতা অর্জনের ফলে তিনি এ সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন।

কবিতা লিখে তিনি সাহিত্য-জগতে অবতীর্ণ হন। তাঁর প্রথম কাব্যসংকলন 'কুসুমাঞ্জলি' (১৮৮১)। এর পর তিনি 'অপূর্ব দর্শন' (১৮৮৫), 'ইসলাম সঙ্গীত', 'প্রেম-হার' (১৮৯৮), 'হজরত মহম্মদ' (১৯০৩), 'জাতীয় ফোয়ারা' (১৯১২) শিরোনামে খণ্ডকাব্য ও আখ্যানকাব্য রচনা করেন। 'কুসুমাঞ্জলি' ও 'প্রেম-হারে'র বিষয়বস্তু মর্ত্যপ্রেম, স্বদেশপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম। 'কুসুমাঞ্জলি' মহারানী স্বর্ণময়ী দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। এতে ১২টি কবিতা আছে। 'বঙ্গবিধবা' কবিতায় পরাধীনা বঙ্গভূমির বিধুর প্রাকৃতিক ছবি এঁকে তিনি প্রকারান্তরে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন।

ভাসিছ নয়ন-নীরে কেন গো নলিনী
তোমার সে মুখ-রবি, পরম প্রেমের ছবি,
ঢাকিয়াছ গাঢ়তর চির অন্ধকারে
তম ভেদি সেকি পুনঃ পারে উঠিবারে?[১৫৫]

'বান্ধব', 'সুরভি', 'সোমপ্রকাশ' প্রভৃতি পত্রিকায় 'কুসুমাঞ্জলি'র সমালোচনা হয়। 'বান্ধবে' লেখা হয়, "বাঙ্গালী মুসলমান ভদ্রলোকেরা এইরূপ সুন্দর বাঙ্গালা লিখিত পারেন, ইহা আমরা কখনও জানিতাম না। এই পুস্তকের 'মহরম' ছাড়াও আর সমস্ত কবিতাই হিন্দুর প্রাণের ও হিন্দুর ভাষায় লিখিত।"[১৫৬] 'সোমপ্রকাশে'ও মোজাম্মেল হকের 'বিশুদ্ধ বাঙ্গালা'র প্রশংসা করা হয় : "আমাদের জানাও ছিল, শুনাও ছিল, মুসলমানেরা ভাল বাঙ্গালা কহিতে পারে না, কুসুমাঞ্জলি আমাদের সে সংস্কার দূর করিয়া দিতেছে, আমরা ইহার দুই তিনটী কবিতা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পাঠক দেখুন, মোজাম্মেল হক কেমন বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়াছেন।"[১৫৭] 'সুরভি' মোজাম্মেল হকের শ্রুতিমধুব বাংলা ভাষার প্রশংসা করে, কিন্তু বিষয়ের গতানুগতিকতার উল্লেখ করে কবিকে নিরুৎসাহিত করে। ". . . লেখক মুসলমান হইয়া এরূপ বিশুদ্ধ বাঙ্গালা লিখিয়াছেন বলিয়া প্রশংসার উপযুক্ত। কিন্তু ঐ সকল বিষয়ক কবিতা বঙ্গভাষায় অনেক লেখা হইয়াছে, অভিনব মনোহর কবিত্বে অনুরঞ্জিত হইয়া সকল বিষয়ে কবিতা না লিখিতে পারিলে লিখিবার আবশ্যক নাই। কুসুমাঞ্জলির কোন কবিতার অভিনবত্ব নাই।"[১৫৮] 'মুসলমান বন্ধু'র (২৫ আগস্ট ১৮৮৪) মন্তব্য : "পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট ও পাঠোপযোগী হইয়াছে। উপমান ও উপমেয়গুলি আরও অধিক সরল হওয়া উচিত ছিল। প্রত্যেক হিন্দু মুসলমানের পাঠ্য।"

১৫৫. মোজাম্মেল হক—*কুসুমাঞ্জলি*, কর প্রেস, কলিকাতা, ফাল্গুন ১২৮৮, পৃ. ১১
১৫৬. *বান্ধব*, অগ্রহায়ণ ১২৮৯
১৫৭. 'অপূর্ব দর্শন' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত।
১৫৮. *সুরভি*, ২৫ ফাল্গুন ১২৮৯

'প্রেমের-হারে' ২১টি কবিতা আছে ; কবিতাগুলির শীর্ষে শেক্সপিয়ার, মিল্টন, স্কট, কীট্স, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, লংফেলো, কালিদাস, ফেরদৌসী প্রমুখের নির্বাচিত চরণগুচ্ছের উদ্ধৃতি আছে। নব-নারীর প্রেম কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। প্রেমের কবিতায় কোন কোন শ্রেণীর পাঠকের প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে প্রকাশক এম. আর. আলী 'প্রকাশকের নিবেদনে' বলেছেন, "সমালোচক হয়ত গ্রন্থের নাম শুনিয়াই চটিবেন ; 'রুচির বিকার' বলিয়া ভ্রূকুঞ্চিত করিবেন। করুন, ক্ষতি নাই। 'ভিন্ন রুচির্হি লোকঃ'। তবে ইহাও বলা কর্তব্য যে, ইহাতে রুচি বিরুদ্ধ একটিও বিষয় নাই যাহাতে সভ্য সমাজের অরুচি জন্মিতে পারে।"[১৫৯]

'অপূর্ব দর্শন' ও 'হজরত মহম্মদ' ঐতিহাসিক আখ্যানকাব্য। বাংলার সুলতান বাখর খানের সহিত দিল্লীর বাদশাহ কায়কোবাদের মিলন-কাহিনী 'অপূর্ব দর্শনে' বিবৃত হয়েছে। উভয়ের মধ্যে পিতা-পুত্রের সম্পর্ক।[১৬০] হজরত মহম্মদ আদর্শ মহামানব সন্দেহ নেই, তবে মোজাম্মেল তাঁকে ঐতিহাসিক চরিত্র হিসাবেই চিত্রিত করেছেন, ভক্তি-আতিশয্যে তাঁকে অতিমানব করেননি। 'হজরত মহম্মদে'র 'বিজ্ঞাপনে' কবি লিখেছেন, "বহু দিন হইতে যে সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম,...আজ তাহা করুণাময় বিশ্ববিধাতার অনুগ্রহে সফল হইতে চলিল।...ইহাতে প্রাচীন প্রথানুযায়ী প্রথমতঃ মঙ্গলাচরণ, তৎপর মক্কানগরী, জমজমকূপ ও কাবাশরীফের উৎপত্তির বিবরণ লিখিত হইয়াছে। তদনন্তর হজরতের জন্মকথা হইতে আরম্ভ করিয়া পয়গম্বরী (প্রেরিতত্ত্ব) লাভ ও ইসলাম প্রচার পর্যন্ত বিবৃত হইয়াছে।"[১৬১] 'নবনূরে' 'হজরত মহম্মদে'র সমালোচনা হয়। "এই গ্রন্থের ভাষা ও রচনাপ্রণালী নূতনে পুরাতনে মিশ্রিত। কবি কেবল আমাদের সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহার রচনা করিয়াছেন বোধ হয়। চেষ্টা করলে তিনি রচনার আরো উৎকর্ষ বিধান করিতে পারিতেন। . . . ইহা পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। একমাত্র কবি মোজাম্মেল হক সাহেব ও মুনশী কায়কোবাদ সাহেবই আমাদের কাব্য-লেখক কবি।...যদি তাঁহাদের সমুচিত সমাদরের ব্যতিক্রম ঘটে, তবে বুঝিব, এ অধঃপতিত সমাজের উদ্ধার হইতে আজও বহু বিলম্ব আছে।"[১৬২] 'বিবিধ সদগুণ বিভূষিত, স্বজাতিহিতৈষী, বিদ্যোৎসাহী, বিচক্ষণ মাননীয় মৌলবী সৈয়দ মহমুদন্নবি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের সুরকমলে' গ্রন্থখানি উৎসর্গ করা হয়।

'জাতীয় ফোয়ারা'য় স্বাজাত্যপ্রীতি ও স্বদেশানুরাগিতার তীব্র অনুভূতি প্রকাশিত হয়েছে। এতে মোট ১৭টি কবিতা আছে। কবিতাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপলক্ষে রচিত

১৫৯. মোজাম্মেল হক—*অপূর্ব দর্শন*, মহম্মদীয়া লাইব্রেরী, শান্তিপুর, (নদীয়া), ১২৯২
১৬০. মোজাম্মেল হক—*প্রেমহার*, কালিকা প্রেস, কলিকাতা, ২৮৯৬, পৃ. ৭
১৬১. মোজাম্মেল হক—*হজরত মহম্মদ*, হেরল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা, ১৩১৭ (২ সং) পৃ. /০ (প্রথম ডংস্করণের বিজ্ঞাপন')
১৬২. *নবনূর*, মাঘ ১৩১০

: 'কোহিনুর' কবিতাটি 'কোহিনুর মাসিকপত্রের অনুষ্ঠান-পত্র দর্শনে লিখিত' হয়। মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী সম্পাদিত 'কোহিনুরে'র প্রথম সংখ্যায় (আষাঢ় ১৩০৫) এটি ছাপা হয়।[১৬৩] 'উদ্দীপনা' কবিতাটি 'সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি'র (১৩০৬) সভা উপলক্ষে রচিত, সভায় সেটি পাঠ করা হয়।[১৬৪] 'উত্থান সঙ্গীত' ও 'আনন্দবাজার' কবিতা দুটি 'কুমারখালী আঞ্জমনে এত্তেফাক এসলামিয়া'র যথাক্রমে 'চতুর্থ বার্ষিক সভা' ও '১৩১২ সালের অধিবেশনে' পঠিত হয়।[১৬৫] 'রজত জুবিলী' কবিতাটি 'মহামান্য তুরস্ক সুলতান আবদুল হামিদের পঞ্চবিংশতি বর্ষ শুভ বাজত্ব উপলক্ষে' রচিত।[১৬৬] 'আফগান রাজকুমার সর্দার এনায়েতুল্লা খানের কলিকাতায় শুভাগমন উপলক্ষে' (১২ পৌষ ১৩১১) রচিত হয় 'অভ্যর্থনা' কবিতা। এতে আফগানিস্তানের স্বাধীনতা ও বীর্যবত্তার গুণকীর্তন করা হয় ; কলিকাতায় আলিগড়ের 'মুসলমান শিক্ষা-সমিতি'র ত্রয়োদশ অধিবেশন উপলক্ষে রচিত হয় 'জাতীয় সঙ্গীত' কবিতা। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সভায় এটি পাঠ করেন।[১৬৭] 'চাঁদের হাট' কবিতাটি ১১ সনের ২ বৈশাখ 'ঢাকার শাহবাগে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির ১ম অধিবেশনে' পঠিত হয়।[১৬৮] কবি মোজাম্মেল এসব কবিতায় সমকালীন জীবনের আবেগ আকাঙ্ক্ষাকে প্রথম স্পর্শ করেছেন। এর আগে তিনি অমৃত ভাবলোকে বিচরণ করেছেন। স্বদেশের ও স্বসমাজের নেতৃবর্গের প্রশস্তি রচনা করে তিনি তাঁদের সমাজসেবার কাজে উৎসাহিত করেছেন। তিনি বিলাসিতা, অলসতা, দীনতা, হীনমন্যতা ত্যাগ করে সকল শ্রেণীর মানুষকে জাগ্রত হওয়ার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। কাব্যের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি স্পষ্টতঃই বলেছেন, "জাতীয় ফোয়ারা কতকগুলি জাতীয় কবিতার সমাবেশ – দুঃস্থ সমাজের দুর্দশার প্রতি লক্ষ্য করিয়া সময়ে সময়ে যে সকল কবিতা সভাসমিতিতে পঠিত ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, উহার অধিকাংশ তৎসমুদয়ের সংগ্রহমাত্র।...এতৎ পাঠে যদিই কোন পাঠকের হৃদয় জাতীয় ভাবে উদ্দীপিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে আমার শ্রম সফল ও বাসনা পূর্ণ হইবে।"[১৬৯] বলা বাহুল্য, সরকার এটিকে সুনজরে দেখেননি ; এর প্রথম সংস্করণ সরকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয়।[১৭০] কাব্যখানি ধনবাড়ির জমিদার নবাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীকে উৎসর্গ করা হয়।

গদ্য লেখক মোজাম্মেল হকের রচনার প্রধান ধারা দুটি : বর্ণনামূলক বিবিধ জীবনচরিত ও সৃষ্টিধর্মী উপন্যাস। 'মহর্ষি মনসুর' (১৮৯৪), 'ফেরদৌসী চরিত' (১৮৯৮), 'তাপসকাহিনী' (১৯০০), শাহনামা' (১৯০৯), 'মওলানা পরিচয়' (১৯১৪), 'খাজা

১৬৩ মোজাম্মেল হক—*জাতীয় ফোয়ারা*, নাথ এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩১৯, পৃ. ৭৬
১৬৪. ঐ, পৃ. ৬-১০
১৬৫. ঐ, পৃ. ৬০, ১২৯
১৬৬. ঐ, পৃ. ৩০
১৬৭. ঐ, পৃ. ৭৮
১৬৮. ঐ. পৃ. ৮৯
১৬৯. ঐ, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।
১৭০. *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ ২৭৬

ময়ীনউদ্দীন চিশতী' (১৯১৮), 'দরাফ খান গাজী' (১৯১৯) প্রভৃতি ঐতিহাসিক ও সন্তজীবনীমূলক রচনা। সুফী সাধকগণের মাহাত্ম্য-প্রচার চরিতাখ্যানগুলির কেন্দ্রীয় লক্ষ্য। তিনি সমাজজীবনে ধর্মীয় ঐতিহ্যবোধ সঞ্চার করতে চেয়েছেন। শেখ আবদুর রহিম, রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মির্জা ইউসুফ আলী প্রভৃতি লেখক ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস ও মহাপুরুষের জীবনী ব্যাখ্যা করে ইসলামীকরণের যে চেষ্টা করেছেন, তার আবেদন ছিল বুদ্ধিলোকে, মোজাম্মেল হক সুফীসাধকদের জীবনচরিত ব্যাখ্যা করে ইসলামের ভাবলোকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। মোজাম্মেল হক ফুরফুরার পীর আবু বকরের ভক্ত ছিলেন। সুফী ভাবধাবায় তিনি দীক্ষিত ছিলেন। তাঁর 'মহর্ষি মনসুর' সবচেয়ে সুখ্যাতি লাভ করে। গ্রন্থের 'নিবেদন' শীর্ষক ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "ইহা কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ নহে। একখানি উর্দু পুস্তিকার মর্মাবলম্বনে অন্যান্য গ্রন্থের সাহায্য লইয়া স্বাধীনভাবে রচিত হইয়াছে।...ইহা রচনাকালে শান্তিপুর জুবিলী মাদ্রাসার পারস্য শিক্ষক জনাব মৌলবী হাজি অবায়েদুল্লা সাহেবের অনেক সাহায্য পাইয়াছি।"[১৭১] 'মহর্ষি মনসুরে'র সমালোচনা করে 'এডুকেশন গেজেটে' লেখা হয়, "এই গ্রন্থখানি আমাদের বড়ই ভাল লাগিল। ভাষা মার্জিত বাঙ্গালা। আলোচ্য বিষয় হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর একটি সাধক বৈদান্তিকের জীবনী। এরূপ মহাত্মার পবিত্র চরিত্র পাঠে সকল জাতীয়েরই উপকার আছে। বোগদাদবাসী সাধক মনসুর 'আনাল হক' বা আমি ব্রহ্ম এই শব্দ উচ্চারণ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।"[১৭২]

'ফেরদৌসী চরিত' 'ফারসি 'শাহনামা' কাব্যের রচয়িতা ফেরদৌসীর জীবনবৃত্তান্ত। কবির জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মোট নয়টি পরিচ্ছেদে এটি সমাপ্ত হয়। প্রথমে এটি 'মিহির' (১৮৯২) পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। 'বসুমতী'তে ফেরদৌসী চরিতের সমালোচনা বের হয়। পত্রিকায় লেখা হয়, 'মহাকবি ফেরদৌসী সুপ্রসিদ্ধ পারস্য মহাকাব্য শাহানামার রচয়িতা, তাঁহার জীবন-বৃত্তান্ত জানিবার জন্য কাহার না আগ্রহ হয়। বর্তমান পুস্তকে তিনি (মোজাম্মেল হক) উৎকৃষ্ট বাঙ্গালা গদ্যের কবির জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। আমরা এই পুস্তক পাঠ করিয়া অতীব পুলকিত হইয়াছি। মুসলমানের লিখিত এমন সুন্দর বাঙ্গালা পাঠ করা আমাদের ভাগ্যে অতি কমই হইয়া থাকে।'[১৭৩] ফেরদৌসী চরিত ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবি ও পারস্য অধ্যাপক মৌলবী মেয়ারাজউদ্দীনকে উৎসর্গ করা হয়।"[১৭৪] 'তাপস কাহিনী'তে হজরত আবদুল কাদের জ্বিলানী, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, ইমাম জাফর সা'দেক, ইব্রাহিম আদহম বলখী প্রমুখের সংক্ষিপ্ত জীবনী ও আধ্যাত্মিক সাধনার কথা বর্ণনা করা হয়েছে।

১৭১. মাজাম্মেল হক — *মহর্ষি মনসুর,* মিলন প্রেস, কলিকাতা, ৯ আষাঢ ১৩০৩
১৭২. 'প্রেস-হার' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃ. ৪
১৭৩. *মহর্ষি মনসুর,* ৯ আষাঢ় ১৩০৩
১৭৪. মোজাম্মেল হক, *ফেবদৌসী চরিত,* রেয়াজ-উল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮

'জোহরা' (১৯২৭) ও 'রঙ্গিলাবাই' দুখানি পারিবারিক উপন্যাস। দোষেগুণে মানুষ চিত্রিত করার চেয়ে আদর্শ-চরিত্র চিত্রণের প্রতি তাঁর মনোযোগ বেশি ছিল।

মোজাম্মেল হকের গদ্য-পদ্য রচনার অপর ধারা প্রবাহিত হয় পাঠ্যপুস্তক রচনায়। শিশু ও বালকদের উপযোগী করে এগুলির অধিকাংশ রচিত — যেমন 'সাহিত্য-শিক্ষা', 'পদ্যশিক্ষা', 'সরল বাঙ্গালা শিক্ষা', 'শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা', 'পত্রদলিল লিখন শিক্ষা', 'সৎ শিক্ষা,' 'কিণ্ডার গার্টেন ধারাপাত' ইত্যাদি। এগুলির কোন কোনটি বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক রূপে নির্বাচিত হয়েছিল। শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর চিন্তার ফল এসব রচনা।' 'বালক বালিকাদিগের শিক্ষার্থে নীতিগর্ভ সরল গদ্য পাঠাবলী'র সংকলন 'পদ্য-শিক্ষা' (প্রথম ভাগ) ৩৬ পৃষ্ঠার বই। এতে ১৭টি ছোট ছোট কবিতা আছে। এগুলির মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের দুটি, রামলাল চক্রবর্তীর একটি, ব্রজনাথের একটি এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদেব একটি কবিতা আছে। বাকীগুলী মোজাম্মেল হকের প্রণীত।[১৭৫] 'পদ্য-শিক্ষা'র সমালোচনা করে 'সুধাকর' পত্রিকায় লেখা হয়, "ইহাতে নীতিপূর্ণ কয়েকটি কবিতা সন্নিবেশিত হইয়াছে। কবিতাগুলি মধুর ও শ্রুতিসুখকর। পুস্তকখানি সুকুমারমতি শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ উপযোগী।"[১৭৬] 'অনুসন্ধান' পত্রিকায় কিছু বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত হয়। "সরল ভাষায় বালিকাদিগের শিক্ষার্থে গ্রন্থাকার এই ক্ষুদ্র পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন এবং যাহাতে ইহা একখানি পাঠ্যপুস্তক রূপে পরিগৃহীত হয় তজ্জন্য তিনি বিজ্ঞাপনে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণের উপরও অনেক অনুরোধ করিয়াছেন। পুস্তকখানি নেহাত মন্দ হয় নাই বটে, কিন্তু পাঠ্য পুস্তক রূপে নির্বাচিত হইবার যোগ্য নহে। আজকাল অনেকেই এইরূপ পুস্তক লিখিয়া পাঠ্য পুস্তক নির্বাচিত হইবে আশা করিয়া থাকেন, কিন্তু পাঠ্য পুস্তকের কি কি গুণ থাকা আবশ্যক, তাহা তাঁহারা বোধ হয় একবারও ভাবিয়া দেখেন না।"[১৭৭] 'অনুসন্ধানে'র ঐরূপ মন্তব্য সত্ত্বেও 'পদ্য-শিক্ষা' (১ম ভাগ) 'টেক্স্ট বুক কমিটির অনুমোদিত ও ডিরেক্টর বাহাদুরের প্রকাশিত পাঠ্যলিস্টে বাংলা মধ্য শ্রেণীর স্কুলসমূহের ৪র্থ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে নির্দিষ্ট' হয়।[১৭৮] 'পদ্য-শিক্ষা' ২য় ভাগের সমালোচনা করে 'বঙ্গবাসী' মন্তব্য করে, "গ্রন্থকার মুসলমান হইলেও হিন্দুর ব্যবহার্য বাঙ্গালায় সুপ্রবিষ্ট। যাঁহারা পাঠ্য পুস্তক রচনা করিয়া প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, তাঁহারা পদ্য-শিক্ষা পাঠ করিলে অনেক বিষয়েই শিক্ষা লাভ করিতে পারিবেন।"[১৭৯]

'নানা বিষয়িনী কবিতাময়ী সমালোচনী মাসিক পত্রিকা' 'লহরী' (১৯০০) মোজাম্মেল হকের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। কেবল কবিতা নিয়ে সাময়িকপত্র মুসলমানের সম্পাদনায় এটিই প্রথম। তিনি 'লহরী' ছাড়া 'মোসলেম-প্রতিভা' (১৯০৭) ও 'মোসলেম ভারত'

১৭৫. মোজাম্মেল হক, *পদ্য -শিক্ষা,* ১ ভাগ, নিউ মুন প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৯
১৭৬. 'প্রেম-হার' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃ. ৫
১৭৭. *অনুসন্ধান,* ১৫ ফাল্গুন ১২৯৬
১৭৮. *প্রেম-হার,* পৃ. ৫
১৭৯. ঐ, পৃ. ৫

(১৯২০) নামে আরও দুটি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শেষোক্তটি শেখ আবদুর রহিম ও মোজাম্মেল হকের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।[১৮০]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের এক অধিবেশনে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেন, "হক সাহেবের কাব্য-প্রসূন শান্তিপুরের মাধবীকুঞ্জে ফুটিলেও ইহার অনিন্দ্য সৌরভ বঙ্গবাণীর সাহিত্যকাননের সকল দিকই একদিন আমোদিত করিবে।"[১৮১]

মোহাম্মদ নজিবর রহমান (১৮০৬-১৯২৩)

মোহাম্মদ নজিরব রহমানের সৃষ্টিশীল সাহিত্যের ফসল ওঠে বিশ শতকের দুই দশকে বেশ পরিণত বয়সে। তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'আনোয়ারা' ১৯১৪ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর পর তিনি 'গরীবের মেয়ে' (১৯২৩) 'হাসানগঙ্গা বাহমনি' (১৯২৪), 'প্রেমের সমাধি' (১৯২৮) প্রভৃতি উপন্যাস লেখেন। আমাদের আলোচ্য যুগে তাঁর দুখানি প্রবন্ধ পুস্তক মুদ্রিত হয় : 'সাহিত্য প্রসঙ্গ' (১৯০৪) ও 'বিলাতী বর্জন রহস্য' (১৯০৪)। এ ছাড়া, 'ইসলাম-প্রচারকে (আষাঢ়-শ্রাবণ ১৩০৮) তাঁর প্রবন্ধ ছাপা হয়।

তিনি পাবনা জেলার বেলতৈল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের বিদ্যালয় হতে 'ছাত্রবৃত্তি' এবং ঢাকা থেকে 'নর্মাল পরীক্ষা' পাশ করেন। তিনি যখন 'বিলাতী বর্জন রহস্য' রচনা করেন তখন তিনি সলঙ্গা মাইনর স্কুলের হেডপণ্ডিত ছিলেন।[১৮২] পরে তিনি সিরাজগঞ্জের একটি মধ্য-বাংলা বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯১০ সালে রাজশাহীর জুনিয়র মাদ্রাসার বাংলা শিক্ষক হন। তিনি নিজ চেষ্টায় স্বগ্রামে একটি মাদ্রাসা স্থাপন করেন (১৮৯২) যা পরবর্তীকালে একটি বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়। তিনি ইংরাজি শিক্ষা ও নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন। তিনি সাহিত্যকর্মে সুনীতি ও আদর্শ প্রচার করেন। এই আদর্শবাদিতা ও নীতিধর্মিতার জন্য তাঁর উপন্যাসগুলির শিল্পগুণ অনেকাংশে ম্লান হয়েছে। কিন্তু সে যুগে সমাজের যে অবস্থা ও গতি ছিল, তাতে ঐরূপ করা ছাড়া উপায় ছিল না। দারিদ্র্য ও অশিক্ষায় মুসলমান সমাজ নৈরাশ্য ও গ্লানিতে ভুগছে, গ্রামের অবস্থা আরও হতাশাব্যঞ্জক ছিল। নজিবর রহমান উপন্যাসে আদর্শ চরিত্র ও কাহিনী চিত্রিত করে সামাজিক উদ্দেশ্য সফল করে তুলতে চেয়েছেন। সমকালের গ্রামের মুসলমান মধ্যবিত্ত সমাজ তাঁর উপন্যাসের পটভূমি। উপন্যাসের আঙ্গিকে বাস্তব জীবনকে তিনিই প্রথম সার্থকভাবে পরিস্ফুট করেন।[১৮৩] নজিবর রহমানের রাজনৈতিক চেতনার ফল 'বিলাতী বর্জন রহস্য' গ্রন্থ। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যখন স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় তখন হিন্দু-মুসলমানের মনে যে প্রতিক্রিয়া হয় এ গ্রন্থে তার স্পষ্ট ছবি আছে। বলা

১৮০. *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র*, পৃ. ১২৬
১৮১. *মাসিক মোহাম্মদী*, চৈত্র ১৩৪০
১৮২. গোলাম সাকলায়েন—*'বিলাতী বর্জন রহস্য'*, *সাহিত্যিকী*, বসন্ত সংখ্যা, ১৩৮৪, পৃ. ১৫৬
১৮৩. *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ, ২০৪ ; *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৪৩২-৩৩ ; গোলাম সাকলায়েন, 'মোহাম্মদ নজিবর রহমান', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, পৌষ-চৈত্র ১৩৬৪

বাহুল্য উভয়ের প্রতিক্রিয়া অভিন্ন ছিল না। মুসলমানরা এই আন্দোলনের বিপক্ষে রায় দেয়। ৭২ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থখানিতে নজিবর রহমান অংশত প্রবন্ধের, অংশত সংলাপের ভঙ্গিতে সমকালের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক চিত্র তুলে ধরেছেন। পুস্তকের 'মুখবন্ধে' আছে : "বিলাতী বর্জন রহস্য প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। ইহাতে গবেষণা, যুক্তি প্রমাণ কিছুই নাই। নিত্য প্রত্যক্ষ সত্য ও দৃষ্টান্তই ইহার মূল ভিত্তি।...এই সামান্য পুস্তকে সমাজের সামান্য টুকু উপকার হইলেও শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।"[১৮৪]

মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (১৮৬১-১৯০৭)

মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লার পৈতৃক নিবাস ছিল যশোহরেব ছাতিয়ানতলা গ্রাম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' পর্যন্ত তাঁব বাল্যশিক্ষা হয়। তাঁর পিতা ওয়ারেসউদ্দীন সামান্য বিত্তের মানুষ ছিলেন। মেহেরুল্লার বাল্যকালে পিতার মৃত্যু হলে পাঠশালা ত্যাগ করে জীবিকার জন্য তিনি দর্জির দোকানে সেলাই-এর কাজ শুরু করেন। খ্রিস্টান মিশনারীরা যশোহরে খ্রিস্টধর্ম প্রচার করতেন। তাঁরা বক্তৃতা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে ইসলামের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করতেন ও অজ্ঞ মুসলমানদের খ্রিস্টানধর্মে দীক্ষিত করতেন। মেহেরুল্লার মনে এর প্রতিক্রিয়া হয়। তিনি নিজ চেষ্টায় আরবি-ফরাসি-উর্দু ভাষা শিক্ষা করেন এবং কোরান হাদিস সম্বন্ধে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি প্রথমে পাদরিদের প্রতিবাদে হাটে-বাজারে ধর্মীয় বক্তৃতা শুরু করেন। তিনি ইসলামের মাহাত্ম্য, বিশুদ্ধতা ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করে সমাজে আলোড়ন তোলেন। ক্রমে সুবক্তা হিসাবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। তিনি মোল্লাদের মত গতানুগতিক বক্তৃতা করতেন না, তিনি আধুনিক পদ্ধতিতে যুগোপযোগী যুক্তিশীল বক্তৃতা দিতেন। ধর্ম ও সমাজ সংস্কার, আধুনিক শিক্ষা বিস্তার, লোকশিক্ষা ও নীতিশিক্ষা সবকিছুই তিনি বক্তৃতার অঙ্গীভূত করেন। উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষকে জাগান ও সুপথ দেখান। একই উদ্দেশ্যে তিনি পুস্তক রচনা, পত্রিকা প্রকাশ, সমিতি গঠন, মাদ্রাসা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

বরিশালের পিরোজপুরে পাদরি স্পার্জন ও পাদবি টিম্মানের সাথে ধর্মীয় বিতর্ক মুনশী মেহেরুল্লার জীবনের একটি বড় ঘটনা। ১২৯৮ সনের ২১, ২২ ও ২৩ আশ্বিন তিন দিন ধরে প্রকাশ্য সভায় ঐ 'তর্কযুদ্ধ' হয়। বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি সভায় উপস্থিত ছিলেন।[১৮৫] তর্কযুদ্ধে কোরান-বাইবেল, যীশু-মহম্মদ, ঈশ্বর-আল্লাহ, খ্রিস্টান ও মুসলমান ধর্ম-সমাজ-সম্প্রদায় সব প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়। এই বিতর্কে মেহেরুল্লার ভূমিকা ছিল প্রধান। তাঁর রচিত 'খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' (১৯০১) গ্রন্থখানি এই বিতর্কের ফল। ১৩০৪ সনে রাণাঘাটে পাদরি মনরোর সঙ্গে অনুরূপ তর্কযুদ্ধ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু মনরোর অনুপস্থিতিতে মেহেরুল্লা ও জমিরুদ্দীন খ্রিস্টধর্মের অসারতা ও ইসলাম ধর্মের মহিমা ও তৎসহ মুসলমান সমাজের উন্নতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন।[১৮৬] এছাড়া, বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলাতে যখন যেখান থেকে ডাক এসেছে, তিনি তখন সেখানে উপস্থিত হয়েছেন এবং

১৮৪. মোহাম্মদ নজিবর রহমান, *বিলাতী বর্জন রহস্য*, ১৩১১, 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য।
১৮৫. *ইসলাম প্রচারক*, আশ্বিন ১২৯৮
১৮৬. *শেখ হবিবর রহমান—কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা*, মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩৪, পৃ. ৩৬

স্থান–কাল–পাত্র উপযোগী বক্তৃতা দিয়েছেন। বক্তৃতাকেই তিনি পেশা হিসাবে গ্রহণ করেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র রাজশাহী ও পশ্চিমগাঁও–এর বার্ষিক অধিবেশনে তিনি একজন উৎসাহী কর্মী হিসাবে যোগদান করেন এবং প্রচারকার্য দ্বারা অধিবেশনকে সফল করে তুলতে সাহায্য করেন।[১৮৭] তিনি জন জমিরুদ্দীনকে প্রবন্ধ–তর্কে পরাভূত ও বশীভূত করে ভাবশিষ্য ও প্রচারক–সঙ্গী করে নেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (সিরাজগঞ্জ), মোহাম্মদ ইব্রাহিম (বরিশাল), গোলাম রব্বানী (যশোহর), শাহ আবদুল্লা প্রমুখও তাঁর ভাবশিষ্য ছিলেন।[১৮৮]

মেহেরুল্লা যে কয়খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন তার সবগুলি ধর্ম ও সমাজমূলক ছিল। তাঁর গ্রন্থগুলির নাম এরূপ : ১. খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা (১৮৮৭), ২. বিধবা–গঞ্জনা ও বিষাদ–ভাণ্ডার (১৮৯৪), ৩. রদ্দে খ্রীস্টীয়ান ও দলিলোল এসলাম (১৮৯৫), ৪. মেহেরুল এসলাম (১ খণ্ড, ১৮৯৭) , ৫. জওয়াবোন্নাসারা (১৮৯৮), ৬. হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা (১৮৯৮, ২ সং), ৭. খ্রীস্টান মুসলামানে তর্কযুদ্ধ (১৯০১), ৮. কারামতিয়া মাদ্রাসা (১৯০১), ইসলামী বক্তৃতামালা (১৯০৮), ৯. পান্দনামা (১৯০৮)।[১৮৯]

খ্রিস্টান পাদবিদেব প্রচাবণার বিরুদ্ধেই মেহেরুল্লার মৌলিক সংগ্রাম। এজন্য খ্রিস্টধর্মকে তিনি আক্রমণেব ক্ষেত্র কবেছেন। 'খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা', 'রদ্দে খ্রীস্টিয়ান', 'জওয়াবোন্নাসারা', 'খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' গ্রন্থগুলি তারই ফলশ্রুতি। তিনি পাদরিদের অপপ্রচারের গতিরোধ করার জন্যই এগুলি প্রণয়ন করেন। 'খ্রীস্টান ধর্মের অসারতা' গ্রন্থের সূচনায় তিনি বলেন, "সম্প্রতি এই পৃথিবীতে প্রায় সর্বত্রই পরিত্রাণ সম্বন্ধীয় বাগযুদ্ধ চলিতেছে, —যথা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টীয়ান, ব্রাহ্ম ইত্যাদি প্রায় সকলেই স্ব স্ব ধর্মের গৌরব ও মাহাত্ম্য প্রচার করিয়া থাকেন ; কিন্তু তন্মধ্যে খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারকগণকে যেরূপ অপর ধর্মের প্রতি নিন্দা ও দ্বেষ প্রকাশ করিতে দেখা যায়, সেরূপ আর কোন সম্প্রদায়কে দেখা যায় না। তাঁহারা অপর ধর্মের সামান্য দোষকে বর্ণনায় পর্বত সমান ও আপন ধর্মের সামান্য গুণকে অলঙ্কারে পর্বত করিয়া তুলেন।...বলেন, এই পৃথিবীতে বাইবেল শাস্ত্র ব্যতীত ঈশ্বরদত্ত অন্য কোন পুস্তক নাই ; আরও বলেন, এ জগতে কোনও মনুষ্য নিষ্পাপ নহে, সকলেই পাপাসক্ত ; কেবল প্রভু যীশুই নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক ; সেও মহাত্মা ব্যতীত পরিত্রাণ দিতে আর কাহারও সাধ্য নাই।...কেবল যাহারা

১৮৭. *ইসলাম প্রচারক*, বৈশাখ-জৈষ্ঠ ১৩১১ ; *কোহিনুব*, বৈশাখ ১৩১২

১৮৮. *কর্মবীব মুনশী মেহেরুল্লা*, পৃ. ৮৬

১৮৯. 'মিহিব ও সুধাকরে' (১৫ আশ্বিন ১৩০৮) এক বিজ্ঞাপনে মুন্শী মেহেরুল্লা প্রণীত 'ঈশানচন্দ্র বাবুর মুসলমান ধর্ম গ্রন্থ', 'শেখ জমিরুদ্দীন সাহেবেব ইসলাম গ্রহণ', 'সাহেব মুসলমান' নামে অপর তিনখানি পুস্তিকাব উল্লেখ আছে। মেহেরুল্লার প্রভাবে ঈশানচন্দ্র মণ্ডল (মোহাম্মদ এহসানউল্লাহ) ও শেখ জমিরুদ্দীন খ্রিস্টধর্ম ত্যাগ কবে ইসলাম গ্রহণ করেন। উভয়ের ধর্মান্তর গ্রহণেব বৃত্তান্ত প্রথম দুখানি পুস্তিকায় লিখিত হযেছে। তৃতীয় পুস্তিকা সম্পর্কে অধ্যাপক আলী আহমদ লিখেছেন, "অস্ট্রেলিয়া নিবাসী একজন সাহেব মোসলমান হইয়া লিভারপুলস্থ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ কুইলিয়ম সাহেবকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা ১৩১৪ হিজরী পাঁচবী মহবম তারিখে মনসূর–ই–মোহাম্মদী গেজেট হইতে মোহাম্মদ মেহেরুল্লা দ্বারা সরল বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত।" আলী আহমদ প্রণীত 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জি' দ্রষ্টব্য।

ঈশ্বরের ত্রিত্বতে বিশ্বাস করিবে তাহারাই পরিত্রাণ পাইবে ; প্রায়ই খ্রীস্টীয় ধর্মপ্রচারক পাদরিগণ এরূপ প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা কিঞ্চিৎ গভীরভাবে বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিবেন যে, খ্রিস্টানগণ যাহা প্রচার করেন ও যাহা শিক্ষা দেন, তাহা নিতান্ত অযৌক্তিক ও নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তিজালে আচ্ছন্ন।"[১৯০] খ্রীস্টধর্মের মূল ভিত্তি যে ত্রিত্ববাদ মেহেরুল্লা বাইবেল থেকে বিভিন্ন উদ্ধৃতি দিয়ে তার অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন। 'রদ্দে খ্রিস্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম' গ্রন্থে তিনি কোরান ও বাইবেল থেকে উদ্ধৃতি সংগ্রহ করে বাইবেলের ভ্রান্তি ও অপকৃষ্টতা এবং কোরানের সত্যতা ও উৎকৃষ্টতার কথা আলোচনা করেছেন।[১৯১] 'খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ' পিরোজপুরের ও 'জওয়াবোন্নসারা' নোয়াখালীর পাদরী-মৌলবীদের বিতর্কের বিষয় নিয়ে রচিত। 'জওয়াবোন্নাসারা' রচনার বিবরণ দিয়ে শেখ জমিরুদ্দীন লিখেছেন, "...নোয়াখালির পাদ্‌সাহেবেরা তথাকার মুসলমানদিগেব নিকট কতকগুলি প্রশ্ন করেন। নোয়াখালির মুসলমানেরা নিরুত্তর হইয়া, প্রশ্নগুলি মুনসী সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দেন। মুনসী সাহেব আমাকে (জমিরুদ্দীনকে) সঙ্গে লইয়া উহার উত্তর লিখিয়া দেন। নোয়াখালির মুনসী মোহাম্মদ আবদুল জাব্বার সাহেব 'জাযাবোন্নাসারা' (১৩০৫) নাম দিয়া পাদ্‌র প্রশ্ন ও আমাদের উত্তরগুলি একত্রিত করিয়া মুদ্রিত করেন।"[১৯২]

খ্রিস্টধর্মের মত হিন্দুধর্মকেও মেহেরুল্লা সমালোচনার ক্ষেত্র করেন। কেননা তখন উভয় সমাজের মানুষের কাছ থেকে মুসলমান সমাজেব উপর আঘাত এসেছিল। 'বিধবা--গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডার' এবং 'হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা' গ্রন্থ দুটিতে তিনি হিন্দু ধর্ম ও সমাজে প্রতি কটাক্ষ করেছেন। কোন কোন অঞ্চলে হিন্দু সামাজের অনুকরণে মুসলমান সমাজের বিধবাবিবাহ দেওয়া হত না। মুনশী মেহেরুল্লা এ-প্রথার নিন্দা করেছেন। বিধবা বিবাহ সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের আন্দোলন এবং সরকারের প্রবর্তিত আইনের তিনি প্রশংসা কবেছেন। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে তিনি 'উপক্রমণিকা'য় বলেন, "কেবল হিন্দু গৃহেই যে বিধবাদিগের প্রতি নিগ্রহ, এমত নহে। এই বিশাল বঙ্গের নদীয়া, হুগলী, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান এবং মুর্শিদাবাদ ইত্যাদি জেলাসমূহের স্থান বিশেষে হিন্দুগত প্রাণ মুসলমান নামধারী বহুতর মিঞা সাহেবদিগের গৃহে, এখনও অসংখ্য তরুণ বয়স্কা বিধবা রমণী অসহ্য বৈধব্যানলে দগ্ধীভূত হইতেছে। বিধবাবিবাহ না হওয়াতে উক্ত স্থানসমূহে কত ব্যভিচার, গর্ভপাত, নরহত্যা এবং পবিত্র মুসলমান নামে কমঙ্ক-কালিমা প্রলেপিত হইতেছে, কে তাহার সংখ্যা নিরূপণ করিবে? ... আমি বিবিধ উপায়ে বিধবা হৃদয়ের বিষাদোক্তি সমূহ যতদূর অবগত হতেই পারিয়াছি, তাহা সরল, সহজ এবং সাধারণ ভাষায় প্রকাশ করিতে যথাশক্তি প্রয়াস পাইলাম। ... যদি ইহার দ্বারা একজন

১৯০. 'মুন্সী মোহাম্মদ' মেহেরুল্লা—*খ্রীষ্টীয় ধর্মের অসারতা,* রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, আষাঢ় ১৩১৬ (৩ সং), পৃ. ১-২

১৯১. রদ্দ (আরবী রদ) শব্দের অর্থ প্রতিবাদ ; দলিল অর্থ প্রমাণ পত্র। 'দলিলোল এসলামে'র অর্থ ইসলামের দলিল বা প্রমাণপত্র।

১৯২ শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন—*মেহের-চরিত,* কলিকাতা, ১৯০৭, পৃ. ৫২

বিধবাবিবাহ বিদ্বেষীও সেই প্রস্তরবৎ নীরস চিত্ত ক্ষণকাল দোলায়মান ও চঞ্চলিত হয়, তাহা হইলেও আমার শ্রম সফল হইবে, সন্দেহ নাই।"[১৯৩]

সমকালীন কোন কোন হিন্দু লেখকের মুসলমান বিদ্বেষের প্রতিবাদে পুরাণোক্ত হিন্দু দেবদেবীর লীলারহস্যের বিবরণ দিয়ে 'হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা' গ্রন্থখানি রচিত। তিনি ধর্মবিষয়ে হিন্দু-মুসলমানের সমকালীন দ্বন্দ্বের উপব আলোকপাত করে বলেছেন, "...বর্তমান ক্ষেত্রে হিন্দু ও মুসলমান — এই দুই সম্প্রদায়ই ভারতের প্রধান অধিবাসী। বাস্তবিক আমাদেব এই দুইয়ের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ হওয়াই সর্বাপেক্ষা অমঙ্গলের কারণ হইয়াছে। আবার ধর্মেব বিভিন্নতাই সেই বিবাদের মূল। হিন্দু যাহাকে পুণ্য, মুসলমান তাহাকে পাপ ও মুসলমান যাহাকে পুণ্য, হিন্দু তাহাকে পাপ জ্ঞানে একজন অন্য জনকে ঘৃণা ও হিংসার চক্ষে দেখিতেছে। অতএব আসুন, আমরা অকপট মনে, বিবাদীয় বিষয়গুলির সূক্ষ্মালোচনা দ্বাবা মীমাংসা এবং কল্পনাব অনুসরণ পরিত্যাগ পূর্বক প্রকৃত সত্যানুবাগী হইয়া পরস্পব বিবাদ নিষ্পন্ন কবি।"[১৯৪] 'হিন্দুধর্মরহস্য ও দেবলীলা'র ভাষা আক্রমণাত্মক ও রুচিহীন। প্রতিবাদধর্মী ও উদ্দেশ্যধর্মী রচনায় তিনি এক তরফাভাবে হিন্দুধর্মেব ত্রুটি দেখাবাব চেষ্টা কবেছেন, যুক্তিবাদী মন নিযে বিশ্লেষণ করেননি। তত্ত্ব ও দর্শনের মধ্যে প্রবেশ না করে কেবল বাইবের রূপটা দেখে বিচার করেছেন। মেহেরুল্লার মৃত্যুর পরপরই তাঁব উভয় গ্রন্থই অশ্লীলতা ও সাম্প্রদায়িকতা দোষে সবকার কর্তৃক বাজেয়াপ্ত হয।[১৯৫]

যশোহরের মনোহরপুর গ্রামে কাবামতিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয। মেহেরুল্লা মাদ্রাসার সেক্রেটারী ছিলেন। 'কারামতিয়া মাদ্রাসা' পুস্তিকায উক্ত মাদ্রাসার বিবরণ আছে। মেহেরুল্লা জৌনপুরের কেরামত আলীর সমর্থক ছিলেন। তিনি ফুরফুরার পীর আবু বকরকেও মান্য করতেন। কেবামত আলী ও আবুবকর ব্রিটিশ শাসনেব পক্ষপাতী ছিলেন। মেহেরুল্লাও শাসকদের বিরুদ্ধে যাননি। তিনি স্বদেশী আন্দোলনে যোগদানের বিপক্ষে মত দেন।[১৯৬] প্রাথমিক পর্যায়ের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "যশোহর জেলায় হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা দ্বিগুণ ; কিন্তু এক শতকের মধ্যে পাঁচজন লোকও লেখাপড়া জানেন কিনা সন্দেহ। বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনার অভাবে মুসলমানদিগের অবস্থা এতই নীচ হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা নীতি ও ধর্ম সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। নীতিহীন অশিক্ষিত ব্যক্তিগণ না করিত এমন কাজ নাই। এই কারণ প্রযুক্তই

১৯৩ মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, --*বিধবা-গঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডাব,* যশোহব, ১৩৭৫ (৭ সং), পৃ. √ -। (উপক্রমণিকা)।

১৯৪. মোহাম্মদ মেহেরুল্লা —*হিন্দু ধর্মরহস্য ও দেবলীলা*, পৃ ১৩

১৯৫. অধ্যাপক আলী আহমদ তাঁব প্রণীত 'বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী'তে বলেছেন যে, বিধবা-গঞ্জনা ও হিন্দুধর্ম বহস্য প্রচারের জন্য মুনসী মেহেরুল্লার পত্র মুনসুর আহমদ ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হয়। মনসুর দণ্ডিত হন এবং মোহাম্মদ রেয়াজজুদ্দীন সর্বস্বান্ত হন।

১৯৬. *কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা,* পৃ. ১০৮

যশোহরে চোর, দস্যু, দাঙ্গাকারী, মামলাবাজ, নাড়ার ফকির সম্প্রদায় অনেক বেশি। বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনা ব্যতীত লোকসমাজ হইতে ঐ সমুদয় পৈশাচিক ভাব বিদূরিত হওয়া অসম্ভব। তাই আমরা কতিপয় দীনহীন দরিদ্র মুসলমান একযোগে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। দরিদ্র এবং অশিক্ষিত কৃষকসমাজগণ যাহাতে বিনা ব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে সহজে বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনা করিতে পারে, মাদ্রাসায় কারামতীয়াতে তাহার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।"[১৯৭] তিনি এটিকে একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার আশা প্রকাশ করেন। এখানে মেধা ও অভিপ্রায় অনুসারে ছাত্ররা ইংরাজিসহ আধুনিক শিক্ষা অথবা আরবিসহ ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে—এই ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।[১৯৮] মেহেরুল্লার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবমুখী এবং গঠনমুখী। বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্ম-প্রচার তাঁর মৌলিক পেশা ছিল। কিন্তু বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়েই তিনি দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হননি, এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, সমিতি গড়েছেন। 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যা ইসলামের প্রচার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়।[১৯৯]

মুনশী মেহেরুল্লা শুধু নিজেই লেখেননি। তরুণ লেখকদের লিখতে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজ ব্যয়ে তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' (১৯০০), শেখ ফজলল করিমের 'পরিত্রাণ' (১৯০৩) এবং শেখ জমিরুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্ত' (১৮৯৮) মুনশী মেহেরুল্লার উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। শেখ ফজলল করিম 'পরিত্রাণে'র অবতরণিকায় লিখেছেন, "বঙ্গ বিখ্যাত মিশনারী, বাগ্মীপ্রবর শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুনশী মেহেরউল্লা সাহেব গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনে যে অকৃত্রিম সদাশয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।"[২০০]

মুনশী মেহেরুল্লার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দানের কথা স্মরণ করে 'মিহির ও সুধাকরে' লেখা হয়, "বাস্তবিক মুনশী সাহেব আদর্শ মুসলমান ছিলেন। তিনি পরম ধার্মিক, দয়ালু, অমায়িক, জনহিতৈষী ও স্বজাতিবৎসল মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে খ্রীস্টিয়ান পাদ্রীগণ কম্পিত হইতেন। ধর্মদ্রোহী নৈড়ার ফকিরগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিত।... তাঁহার চেষ্টায় বহু মাদ্রাসা, স্কুল, মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতার প্রভাবে নির্জীব মুসলমানদিগের মধ্যে এক জীবন্ত ধর্মভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। শত সহস্র মুসলমান অলসতা ছাড়িয়া শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে।...তাঁহার অসাধারণ চেষ্টায় মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন হইয়াছিল।"[২০১]

১৯৭. মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (সংগৃহীত) – নূরুল ইসলাম বা মাদ্রাসায় কারামতীয়া বিবরণী সম্বলিত সময়িকপত্র, ২য় বর্ষ, ১৩০৮, পৃ ১৫

১৯৮ ঐ, পৃ. ১৫

১৯৯ *মেহের-চরিত*, পৃ. ৯–১০ ; দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভা-সমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

২০০ শেখ ফজলল করিম — *পরিত্রাণ*, কলিকাতা ১৩১০ 'অবতরণিকা' দ্রষ্টব্য।

২০১ 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা' থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃ. ১৪৪

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ বরিশাল শহরের উপকণ্ঠে কাউনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই পিতামাতাকে হারিয়ে ফজলুল হকের পিতৃব্যের আশ্রয়ে ও পরে রূপসার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর আশ্রয়ে লোখাপড়া করেন। রূপসার বাজাপ্তি সার্কেল স্কুল থেকে তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন (১৮৭৬)। জমিদারের সহযোগিতায় একটি পাঠশালা খুলে সেখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। পাঠশালার সাথে একটি পাঠাগারও স্থাপন কবেন এবং বিভিন্ন লোকের আর্থিক সাহায্যে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখর জ্ঞানতৃষ্ণা ও সংগঠনশক্তি ছিল, তা শৈশবকালেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগবেব স্কুলপাঠ্য 'বোধোদয়ে'র (১২৮৬ সনের সংস্করণ) কতিপয় ভুল তিনি পত্র মাবফত তাঁকে জানিয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তা কৃতজ্ঞতাসহ সংশোধন করেছিলেন। বোধোদয়ের ১৮৮৯ সালের সংস্করণের (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) 'বিজ্ঞাপনে' বলা হয় : "ত্রিপুরা জেলাব অন্তঃপাতী রূপসা গ্রামে যে রিডিং ক্লাব অর্থাৎ পাঠ-গোষ্ঠী আছে, উহাব কার্যদর্শী শ্রীযুক্ত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মহাশয় বোধোদয়ের কতিপয় স্থান অসংলগ্ন দেখিযা পত্র দ্বারা আমায় জানাইয়াছিলেন।...উহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত এবং সবিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রদর্শিত স্থল সকল সংশোধিত হইয়াছে।"[২০২] রজনীকান্ত গুপ্তের ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান বাদশাদের নাম বিকৃত হওয়ায় জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর সহযোগিতায় ফারসি গ্রন্থ থেকে প্রকৃত নামের শুদ্ধ বানান লিখে পাঠাতেন।[২০৩] রূপসার জমিদারের সাহায্যে ফারসি 'তওজকে জাঁহাগীরি' হতে ঐতিহাসিক বিবরণ অনুবাদ করে হুগলীর 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশ করতেন।[২০৪] রূপসাতে অবস্থানকালেই রেয়াজুদ্দীন আহমদের জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছিল।

আত্মপ্রকাশের উদগ্র বাসনা তাঁর ; পল্লীগ্রামের 'কূপমণ্ডুক' পরিবেশে সেটি সম্ভব নয়। 'শ্রীমন্ত সদাগর' পত্রিকার সম্পাদক চন্দ্রকিশোর রায় তাঁকে উৎসাহ দিতেন। রূপসার একটি নিশ্চিত আশ্রয় ত্যাগ করে তিনি কলিকাতায় গমন করেন। পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী ও মোজাম্মেল হকের সাথে তাঁর পূর্বেই পত্রালাপ ছিল ; এবার সাক্ষাৎ পরিচয় হল। তিনি বিদ্যাসাগরের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। ১৮৯০ সালের দিকে নবাব আবদুল লতিফের সাথে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়। এখানে মীর মশাররফ হোসেন, মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহিমের সাথেও তাঁর পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা জন্মে।[২০৫]

২০২. মোহাম্মদ ইদরিস আলী—*মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ,* ঢাকা, ১৩৬৫. পৃ. ৪
২০৩. ঐ. পৃ. ৪
২০৪. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ—*গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ,* ১ খণ্ড, ১৩১৭ হিজরী (১৮৯৯), কলিকাতা, পৃ. II. (ভূমিকা)
২০৫. মোহাম্মদ ইদরিস আলী, পৃ. ৯

যশোহরে চোর, দস্যু, দাঙ্গাকারী, মামলাবাজ, নাড়ার ফকির সম্প্রদায় অনেক বেশি। বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনা ব্যতীত লোকসমাজ হইতে ঐ সমুদয় পৈশাচিক ভাব বিদূরিত হওয়া অসম্ভব। তাই আমরা কতিপয় দীনহীন দরিদ্র মুসলমান একযোগে এই মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছি। দরিদ্র এবং অশিক্ষিত কৃষকসমাজগণ যাহাতে বিনা ব্যয়ে বা অল্প ব্যয়ে সহজে বিদ্যাশিক্ষা ও ধর্মালোচনা করিতে পারে, মাদ্রাসায় কারামতীয়াতে তাহার উৎকৃষ্ট বন্দোবস্ত করা হইয়াছে।"[১৯৭] তিনি এটিকে একটি আদর্শ শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে তোলার আশা প্রকাশ করেন। এখানে মেধা ও অভিপ্রায় অনুসারে ছাত্ররা ইংরাজিসহ আধুনিক শিক্ষা অথবা আরবিসহ ধর্মশিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে—এই ছিল তাঁর ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।[১৯৮] মেহেরুল্লার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বাস্তবমুখী এবং গঠনমুখী। বক্তৃতার মাধ্যমে ধর্ম-প্রচার তাঁর মৌলিক পেশা ছিল। কিন্তু বক্তৃতা ও উপদেশ দিয়েই তিনি দায়িত্বভার থেকে মুক্ত হননি, এজন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়েছেন, সমিতি গড়েছেন। 'এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা' এরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যা ইসলামের প্রচার উদ্দেশ্যেই গঠিত হয়।[১৯৯]

মুনশী মেহেরুল্লা শুধু নিজেই লেখেননি। তরুণ লেখকদের লিখতে উৎসাহিত করেছেন এবং নিজ ব্যয়ে তাঁদের গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'অনল প্রবাহ' (১৯০০), শেখ ফজ্‌লল করিমের 'পরিত্রাণ' (১৯০৩) এবং শেখ জমিরুদ্দীনের 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণের বৃত্তান্ত' (১৮৯৮) মুনশী মেহেরুল্লার উৎসাহে ও অর্থানুকূল্যে মুদ্রিত হয়। শেখ ফজলল করিম 'পরিত্রাণে'র অবতরণিকায় লিখেছেন, "বঙ্গ বিখ্যাত মিশনারী, বাগ্মীপ্রবর শ্রদ্ধেয় বন্ধু মুনশী মেহেরউল্লা সাহেব গ্রন্থ মুদ্রাঙ্কনে যে অকৃত্রিম সদাশয়তা প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্য চিরদিন তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।"[২০০]

মুনশী মেহেরুল্লার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর দানের কথা স্মরণ করে 'মিহির ও সুধাকরে' লেখা হয়, "বাস্তবিক মুনশী সাহেব আদর্শ মুসলমান ছিলেন। তিনি পরম ধার্মিক, দয়ালু, অমায়িক, জনহিতৈষী ও স্বজাতিবৎসল মহাত্মা ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে খ্রীস্টিয়ান পাদ্রীগণ কম্পিত হইতেন। ধর্মদ্রোহী নেড়ার ফকিরগণ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিত।... তাঁহার চেষ্টায় বহু মাদ্রাসা, স্কুল, মক্তব ও পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতার প্রভাবে নির্জীব মুসলমানদিগের মধ্যে এক জীবন্ত ধর্মভাব প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। শত সহস্র মুসলমান অলসতা ছাড়িয়া শিক্ষা ও ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগ প্রদান করিয়াছে।...তাঁহার অসাধারণ চেষ্টায় মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রচলন হইয়াছিল।"[২০১]

১৯৭. মোহাম্মদ মেহেরুল্লা (সংসৃহীত) – নূরুল ইসলাম বা মাদ্রাসায় কারামতীয়া বিবরণী সম্বলিত সময়িকপত্র, ২য় বর্ষ, ১৩০৮, পৃ ১৫

১৯৮. ঐ, পৃ. ১৫

১৯৯. *মেহের-চরিত*, পৃ. ৯-১০ ; দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভা-সমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

২০০. শেখ ফজলল করিম — *পরিত্রাণ*, কলিকাতা ১৩১০ 'অবতরণিকা' দ্রষ্টব্য।

২০১. 'কর্মবীর মুনশী মেহেরুল্লা' থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃ. ১৪৪

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)

মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ বরিশাল শহরের উপকণ্ঠে কাউনিয়ায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই পিতামাতাকে হারিয়ে ফজলুল হকের পিতৃব্যের আশ্রয়ে ও পরে রূপসার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর আশ্রয়ে লোখাপড়া করেন। রূপসার বাজাপ্তি সার্কেল স্কুল থেকে তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করেন (১৮৭৬)। জমিদারের সহযোগিতায় একটি পাঠশালা খুলে সেখানে শিক্ষকতা আরম্ভ করেন। পাঠশালার সাথে একটি পাঠাগারও স্থাপন করেন এবং বিভিন্ন লোকের আর্থিক সাহায্যে অনেক গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। তাঁর প্রখর জ্ঞানতৃষ্ণা ও সংগঠনশক্তি ছিল, তা শৈশবকালেই প্রস্ফুটিত হয়েছিল ; ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের স্কুলপাঠ্য 'বোধোদয়ে'র (১২৮৬ সনের সংস্করণ) কতিপয় ভুল তিনি পত্র মারফত তাঁকে জানিয়েছিলেন, ঈশ্বরচন্দ্র তা কৃতজ্ঞতাসহ সংশোধন করেছিলেন। বোধোদয়ের ১৮৮৯ সালের সংস্করণের (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত) 'বিজ্ঞাপনে' বলা হয় : "ত্রিপুরা জেলার অন্তঃপাতী রূপসা গ্রামে যে রিডিং ক্লাব অর্থাৎ পাঠ-গোষ্ঠী আছে, উহার কার্যদর্শী শ্রীযুক্ত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মহাশয় বোধোদয়ের কতিপয় স্থান অসংলগ্ন দেখিয়া পত্র দ্বারা আমায় জানাইয়াছিলেন।...উহাতে আমি সাতিশয় উপকৃত এবং সবিশেষ অনুগৃহীত হইয়াছি। তাঁহাদের প্রদর্শিত স্থল সকল সংশোধিত হইয়াছে।"[২০২] রজনীকান্ত গুপ্তের ভারতবর্ষের ইতিহাসে মুসলমান বাদশাদের নাম বিকৃত হওয়ায় জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজীর সহযোগিতায় ফারসি গ্রন্থ থেকে প্রকৃত নামের শুদ্ধ বানান লিখে পাঠাতেন।[২০৩] রূপসার জমিদারের সাহায্যে ফারসি 'তওজকে জাঁহাগীরি' হতে ঐতিহাসিক বিবরণ অনুবাদ করে হুগলীর 'এডুকেশন গেজেটে' প্রকাশ করতেন।[২০৪] রূপসাতে অবস্থানকালেই রেয়াজুদ্দীন আহমদের জ্ঞান ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয়েছিল।

আত্মপ্রকাশের উদগ্র বাসনা তাঁর ; পল্লীগ্রামের 'কূপমণ্ডুক' পরিবেশে সেটি সম্ভব নয়। 'শ্রীমন্ত সদাগর' পত্রিকার সম্পাদক চন্দ্রকিশোর রায় তাঁকে উৎসাহ দিতেন। রূপসার একটি নিশ্চিত আশ্রয় ত্যাগ করে তিনি কলিকাতায় গমন করেন। পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী ও মোজাম্মেল হকের সাথে তাঁর পূর্বেই পত্রালাপ ছিল ; এবার সাক্ষাৎ পরিচয় হল। তিনি বিদ্যাসাগরের সাথেও সাক্ষাৎ করেন। ১৮৯০ সালের দিকে নবাব আবদুল লতিফের সাথে তাঁর আলাপ পরিচয় হয়। এখানে মীর মশাররফ হোসেন, মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহিমের সাথেও তাঁর পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা জন্মে।[২০৫]

২০২. মোহাম্মদ ইদরিস আলী—*মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ,* ঢাকা, ১৩৬৫. পৃ. ৪

২০৩. ঐ. পৃ. ৪

২০৪. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ—*গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ,* ১ খণ্ড, ১৩১৭ হিজরী (১৮৯৯), কলিকাতা, পৃ. II. (ভূমিকা)

২০৫. মোহাম্মদ ইদরিয় আলী, পৃ. ৯

রেয়াজুদ্দীনের প্রতিভার মৌল-প্রকৃতি ছিল সাংবাদিকতা ; সংবাদপত্রকেই তিনি আত্মপ্রকাশের মাধ্যম হিসাবে বেছে নেন। 'ইণ্ডিয়ান ইকো'র সম্পাদক শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় রেয়াজুদ্দীনকে সম্পাদক নিযুক্ত করে 'মুসলমান' (১৮৮৪) নামে একখানি সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। তিনি সম্পূর্ণ ব্যবসায়ের দৃষ্টিকোণ থেকে পত্রিকাখানি বের করেছিলেন, কিন্তু আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় ১০/১২ সপ্তাহের পর তা বন্ধ করে দেন। এর পর রেয়াজুদ্দীন আহমদ বাল্যবন্ধু চন্দ্রকিশোর রায়ের 'শ্রীমন্ত সদাগর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন, কিন্তু মতবিরোধ হওয়ায় অল্পকাল পরেই সেটি ত্যাগ করেন।[২০৬] 'দি ক্রিসেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক আবদুল ময়েজ 'নব-সুধাকর' নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক পরিচালনা করতেন ; রেয়াজুদ্দিন আহমদ ঐ পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন (১৮৮৬), কিন্তু ৫/৬ সপ্তাহের পর ঐ পত্রিকাও বন্ধ হয়ে যায়।[২০৭] রেয়াজুদ্দীন দমবার পাত্র নন। একখানি 'জাতীয় সংবাদপত্র' প্রকাশের বাসনা অন্তরে লালন করে কিছুদিন যৌথভাবে 'এসলামতত্ত্ব' প্রকাশ করেন। মৌলবী মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, শেখ আবদুর রহিম এবং মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ একত্রে ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক ঐ গ্রন্থখানি প্রকাশ করে সফলতা ও জনপ্রিয়তা লাভ করেন। এই উৎসাহ-বীজ থেকে 'সুধাকর' (নভেম্বর ১৮৮৯) সাপ্তাহিক পত্রের জন্ম হয়। এর দু'বছর আয়ু ছিল ; যৌথ সম্পাদনায় কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর রেয়াজুদ্দীন আহমদ এর সম্পাদক হন। ১৮৯১ সালের সেপ্টেম্বরে মাসিক 'ইসলাম-প্রচারক' প্রকাশিত হয়। মাঝে প্রায় সাত বছর বন্ধ থাকার পর এটি নবপর্যায়ে ১৮৯৯ সালের অক্টোবর মাসে পুনঃপ্রকাশিত হয়। সর্বমোট ১৩ বছর 'ইসলাম-প্রচারকে'র আয়ু ছিল ; রেয়াজুদ্দীন আহমদ বরাবর পত্রিকাটি সম্পাদনা করেছেন।[২০৮] তিনি 'সোলতান' (১৯০২) নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রেরও সম্পাদনা করেন। পরে মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী এর সম্পাদক হন।[২০৯] তিনি কিছুকাল 'মিহির ও সুধাকর' পত্রেরও সম্পাদক হন। শেষ জীবনে ফজলুল হক পরিচালিত 'নবযুগ' ও অন্য একটি পত্রিকা 'রায়ত বন্ধু'র (১৯২৬) তিনি সম্পাদনা করেন।[২১০] তিনি কলিকাতায় কড়েয়া গোরস্থান রোডে 'রেয়াজ উল ইসলাম প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। ইসলাম প্রচারক ও সেযুগের অনেক পুস্তক-পুস্তিকা এই প্রেস থেকে মুদ্রিত হয় ; তিনি অনেক গ্রন্থের প্রকাশকও ছিলেন।

'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র (১৮৮৩) সহিত মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের যোগসূত্র ছিল। তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন, "ঢাকা শহরে কিয়দ্দিবস থাকিয়া তত্রত্য মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর কাজের অনুষ্ঠাতা বন্ধুদিগের অনুরোধ বিশেষতঃ অক্লান্তকর্মী

২০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩
২০৭. ঐ, পৃ ১৫
২০৮ পত্র-পত্রিকা অংশ দ্রষ্টব্য।
২০৯. *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ৬৬
২১০ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ৪৩১

সমাজসেবী বন্ধুবর খান বাহাদুর মৌলভী আবদুল আজিজ বিএ মরহুমের সঙ্গে থাকিয়া সমিতির মেম্বার সংগ্রহ ও চাঁদা আদায় করিতে লাগিলাম। তাঁহারা অনেকদিন আমাকে ঢাকায় আটকাইয়া রাখিলেন।"[২১১] সম্মিলনীর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষা। বালিকাদের শিক্ষার উপযোগী পাঠ্য-পুস্তকের অভাব থাকায় সম্মিলনীর অনুরোধে তিনি 'তোহাফাতুল মোসলেমিন' (১৮৮৩) প্রণয়ন করেন।[২১২]

সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের সদস্য তালিকায় তাঁর নাম নেই, কিন্তু 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র সদস্য-তালিকায় তাঁর নাম আছে।[২১৩] ইউনিয়নের আশ্রয়ে গঠিত 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি এর বার্ষিক বিভিন্ন অধিবেশনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি সমিতির 'স্থায়ী সেন্ট্রাল কমিটি'র সদস্য ছিলেন।[২১৪] 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি'র (১৯০৪) কর্যকরী কমিটির তিনি সম্পাদক ছিলেন।[২১৫] এছাড়া, কলিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে স্থাপিত একটি সমিতির তিনি সহ-সভাপতি ছিলেন।[২১৬] 'বঙ্গীয় সাহিত্য বিষয়িনী মুসলমান সমিতি' নামে অপর একটি সাহিত্য সভার সাথে যুক্ত ছিলেন। কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যভুক্ত ছিলেন।[২১৭]

রেয়াজুদ্দীন আহমদ সাংবাদিকতার সাথে সাথে সাহিত্যসেবাও করে গেছেন। তিনি বিবিধ বিষয়ক পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এগুলির অধিকাংশই উদ্দেশ্যমূলক ও প্রচারধর্মী। তিনি রসধর্মী কাব্য সাহিত্যের বিরোধী ছিলেন। শেখ ফজলল করিমের 'পরিত্রাণ কাব্য' ও 'লায়লী-মজনু' উপাখ্যানের বিরূপ সমালোচনা করেন। তাঁর যক্তি ছিল, "ঐ লায়লী মজনুর প্রেমোপাখ্যান পাঠ করিয়া আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বহুদূর পশ্চাদপদ বর্তমান মুসলমান সমাজ কি শিক্ষা পাইবে?"[২১৮] স্বধর্ম ও স্বসমাজের প্রতি তাঁর অকৃত্রিম দরদ ছিল। ধর্ম ও সমাজের দুর্দশা ও দুর্গতির কথা ভেবেই তিনি লেখনি ধারণ করেছিলেন। নিজ ধর্ম ও সমাজের স্বার্থের ব্যাপারে তাঁর নীতি ছিল আপোষহীন। এজন্য তিনি অন্য সমাজকে আক্রমণ করতে ছাড়েননি। স্বসমাজের অনাচার, জড়ত্ব, নির্বুদ্ধিতা ও উম্মার্গগামিতাকেও সমালোচনা করেছেন। অনৈসলামিক ধর্মাচরণের জন্য 'নেড়ার ফকির' বা বাউলদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। ইসলাম বিরোধী প্রচারণার জন্য তিনি খ্রিস্টান মিশনারী ও ব্রাহ্ম প্রচারকদের ঘোর বিরোধিতা করেন। 'ইসলাম-প্রচারকে' এর বিরুদ্ধে একটি সফল আন্দোলন গড়ে তুলতে পেরেছিলেন। ধর্মসভা, সমিতি, ধর্মপ্রচারক ও ইসলাম মিশনাদির কথা ঘটা করে ছাপাতেন।

২১১. মোহাম্মদ ইদবিস আলী, পৃ. ২৬
২১২. মোহাম্মদ আবদুল কাইউম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩
২১৩. *ইসলাম প্রচারক,* অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০
২১৪. ঐ, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১
২১৫. ঐ, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০
২১৬. *মিহির ও সুধাকর,* ৯ ফাল্গুন ১৩০৮
২১৭. *মুসলিম বাংলার সাময়িক পত্র,* পৃ. ২০৭-০৮
২১৮. *ইসলাম প্রচারক,* জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০২

তাঁর আর একটি দৃষ্টি ছিল আরব-তুরস্কের দিকে। তাঁর 'এসলামতত্ত্ব' জামালউদ্দীন আফগানীর *'নেচার ও নেচারিয়া' গ্রন্থের অনুবাদ। প্যান-ইসলামিক চেতনা দ্বারা তিনি* উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। আরব, আফগানিস্তান, ইরান, তুরস্কের অতীত ও বর্তমানের গৌরমময় কাহিনী ও জীবনচিত্র 'ইসলাম-প্রচারকে' অজস্র ছাপা হত। তিনি নিজেও অনেক প্রবন্ধ লিখেছেন ; 'জঙ্গে রুস ও ইউনান' (১৮৯৭) ও 'গ্রিস-তুরস্ক যুদ্ধ' (১ ও ২ ভাগ, ১৮৯৯) নামে দুইখানি ইতিহাস গ্রন্থও প্রণয়ন করেছেন। 'হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন-চরিত', 'হজরত ফাতেমা জোহরার জীবনচরিত' প্রভৃতি গ্রন্থে ইসলামের মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। গ্রিস-তুরস্ক যুদ্ধে আহতদের সেবায় ও দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে নির্মাণে চাঁদা সংগ্রহে তিনি আন্দোলন গড়ে তুলছিলেন। জাতীয় ভাষায় জাতীয় বিদ্যাশিক্ষা এবং জাতীয় ভাবে জাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির কথা সেযুগের অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতো রেয়াজুদ্দীন আহমদও বলেছেন। বাংলার মুসলমানদের জন্য আরবি-ফারসি মিশ্রিত একটি স্বতন্ত্র 'জাতীয় ভাষা' কামনা করেছেন, কিন্তু তিনি যে ভাষায় চর্চা করেছেন তা আধুনিক শুদ্ধ ভাষা। রাজনীতির ক্ষেত্রে ইংরাজদের সমর্থন করেছেন, স্বদেশী আন্দোলনে হিন্দুদের বিরুদ্ধতা করেছেন। সব কিছু মিলিয়ে বলা যায়, রেয়াজুদ্দীন আহমদের পুরোপুরি মুক্ত মন ও স্বচ্ছদৃষ্টি ছিল না। রূপসার 'পাঠকগোষ্ঠী' থেকে শুরু করে কলিকাতার 'ইসলাম প্রচারক-গোষ্ঠী' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তাঁর মধ্যে যে সংগঠনশক্তি প্রকাশ পেয়েছিল, তা মুক্তচিন্তার দ্বারা পরিচালিত হলে সমাজ-উন্নতির একটা নির্দিষ্ট গতিপথ নির্ণীত হত। তাঁর মানসলোকে ধর্মানুরাগ, মুসলমান-প্রীতি, হিন্দু-বিরূপতা, ইংরাজানুগত্য, জাত্যাভিমান, অতীতচারিতা ভাব মিশে একটা আবর্ত সৃষ্টি করেছিল। সেযুগের মুসলিম মানসিকতা এই আবর্তে আচ্ছন্ন ছিল। কোন কোন বিষয়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের (১৮১২-১৮৫৯) সাথে রেয়াজুদ্দীনের মনোভাবের মিল আছে। একাধারে স্বদেশানুরাগ অন্য ধারে ইংরাজপ্রীতি উভয়ের মধ্যেই দেখা যায়। উভয়েই গ্রামের মধ্যবিত্ত পরিবার থেকে কলিকাতায় এসে পত্রিকা, প্রেস, পুস্তক ও প্রতিষ্ঠানকে সর্বস্ব করে বুদ্ধিজীবীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। নিজ নিজ সমাজের গৌরবের কথা বলতে গিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত মুসলমানদের এবং রেয়াজুদ্দীন হিন্দুদের নিন্দা করেছেন।

রচনাবলী :
১. বোধোদয়তত্ত্ব (১৮৭৯)
২. পদ্যপ্রসূন (১৮৮০)
৩. তোহফাতুল মোসলেমিন (১৮৮৫)
৪. এসলামতত্ত্ব (১ খণ্ড ১৮৮৮, ২ খণ্ড ১৮৮৯)
৫. বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা (১৮৯৫)
৬. উপদেশ রত্নাবলী (১৮৯৬)
৭. জঙ্গে রুস ও ইউনান (১৮৯৭)
৮. গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধ (১ ভাগ, ১৮৯৯, ২ ভাগ ১৯০৯)
৯. বিলাতি মুসলমান (১৯০০)

১০. বোতলে মা শুরেশ্বরী (১৯০০)
১১. জোবেদা খাতুনের রোজনামচা (১৯০৭)
১২. হক নসিহত (১৯০৭)
১৩. নামাজশিক্ষা (১৯০৭)
১৪. আমার সংসার জীবন (১৯১৫)
১৫. কৃষক বন্ধু
১৬. জোলেখা
১৭. বৃহৎ হীরকখানি
১৮. আমির জানের ঘরকন্না
১৯. হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার জীবন চরিত (১৯২৭)
২০. হজরত ফাতেমা জোহরার জীবন চরিত
২১. পাক–পাঞ্জাতন (১৯২৮)
২২. মুসলিম সাহিত্যের ইতিহাস।

কোন কোন গ্রন্থ 'এবনে মাজীজ' 'গরীব শায়ের' ছদ্মনামে রচিত। বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তাঁর প্রবন্ধরাশি ছড়িয়ে আছে। প্রথম গ্রন্থ 'বোধোদয়তত্ত্ব' ঈশ্বরচন্দ্রের 'বোধোদয়ে'র অর্থপুস্তক। দ্বিতীয় গ্রন্থ 'পদ্য–প্রসূন' মৌলিক কবিতার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। 'তোহফাতুল মোসলেমিন' ইসলাম–ধর্মের মসলাবিষয়ক গ্রন্থ। তিনখানি গ্রন্থই পাঠশালার ছাত্র–ছাত্রীর উপযোগী পাঠ্যবই। চতুর্থ পুস্তক 'এলামতত্ত্ব বা মোসলমানধর্মের সারসংগ্রহ' (১ম ও ২য় খণ্ড) মূলত অনুবাদ, প্রথম খণ্ড মৌলনা জামালউদ্দীন আফগানীর 'নেচার ও নেচারিয়া' এবং দ্বিতীয় খণ্ড মৌলনা আবদুল হকের 'তফসিরে হক্কানী'র উপক্রমণিকা অংশের অনুবাদ।[২১৯] এসলাম–তত্ত্ব রচনায় পূর্ণ গৌরব রেয়াজুদ্দীনের নয়, তাঁর এবং শেখ আবদুর রহিম, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন ও অধ্যাপক মোয়রাজুদ্দীন আহমদের যৌথ প্রয়াসের ফল এটি।[২২০] গ্রন্থখানি ছিল সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপূর্ণ। খ্রিস্টান পাদ্রি ও ব্রাহ্ম প্রচারকের বিরূপ প্রচারের উত্তর দেওয়ার মত কোন পত্রিকা তাঁদের ছিল না। মুসলমান সমাজ যাতে ভুল পথে না যায়, পাদ্রি ও ব্রাহ্ম প্রচারকের অপপ্রচার বন্ধ হয় এবং ইসলামের মাহাত্ম্যকথা স্বধর্মের লোকেরা জানতে পারে—এই ত্রিবিধ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত হয়ে তাঁরা 'এসলামতত্ত্ব' প্রণয়ন ও প্রচারে মনোনিবেশ করেন। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে 'ভূমিকা'য় লেখা হয়, "বঙ্গদেশে এসলামধর্মের শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া তৎসংশোধন জন্য আমরা এসলামতত্ত্ব

২১৯. 'এসলামতত্ত্বে'র (১ খণ্ড), ভূমিকায় কোন কোন ভাষার কি কি গ্রন্থের সাহায্য নেওয়া হয়েছে তার বিস্তৃত উল্লেখ আছে।
এসলামতত্ত্ব (১ খণ্ড), অরুণ যন্ত্র, কলিকাতা, আশ্বিন ১২৯৫ (ভূমিকা)।

২২০. 'এসলামতত্ত্বে'র (১ কণ্ড) প্রচ্ছদ পটে আছে, "ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক মৌলবী মেয়রাজ উদ্দীন আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত এবং মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ ও শেখ আবদুর রহিম কর্তৃক বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় লিখিত।" ঐ, (প্রচ্ছদপট দ্রষ্টব্য)।

লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। বিশেষত এরূপ একখানি গ্রন্থের আবশ্যকতা মোসলমান মাত্রেই অনুভব করিতেছেন। আজকাল আমাদের মুসলমান ভ্রাতাদিগের মধ্যে 'স্বধর্মে অনাস্থা' একটী উৎকট রোগ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। যাহারা আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার একমাত্র অবলম্বন তাহাদের শোচনীয় অধঃপতন এসলামের অশেষ অমঙ্গলের কারণ। একথা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে এসলাম ধর্মের প্রকৃত মাহাত্ম্য অবগত থাকিলে, তাহারা কদাচ অধঃপাতেব দিকে অগ্রসর হইত না।...এসলাম ধর্মাবলম্বীর অন্য ধর্ম অবলম্বন করা অপেক্ষা আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কারণ আর কিছুই হইতে পারে না। আমরা এই সকল বিপথগামী ও অন্ধবিশ্বাসী লোকদিগের চক্ষে আঙ্গুলি নির্দ্দেশপূর্বক দেখাইব যে, পৃথিবীতে এসলামধর্মই প্রকৃত ধর্ম।...আমাদের নব্য-শিক্ষিত ভ্রাতৃবৃন্দের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে, তাঁহারা যেন পবিত্র এসলামধর্মের 'মূলতত্ত্ব' বিশেষরূপে অবগত হইয়া ধর্ম সম্বন্ধে স্ব স্ব কর্তব্য অনুধাবন করেন।...নিজের ধর্মের কি আছে একবার তাহার তত্ত্বাগ্রহী না হইয়া অন্যধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা ঘোরতর মূর্খের কার্য্য।"[২২১] 'নাস্তিকতা', 'এসলাম' ও 'বিশ্বাস' এই তিনটি বিষয় নিয়ে এসলামতত্ত্বের প্রথম খণ্ড রচিত। গ্রন্থখানি মুসলমান সমাজে খুব জনপ্রিয় হয়েছিল এবং সমাজেব মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল তা দ্বিতীয় খণ্ডের 'ভূমিকা' হতে জানা যায়।[২২২] 'সুধাকরে' এক বিজ্ঞাপনের দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়বস্তু সম্পর্কে বলা হয়, "কোরানের অপূর্ব-সৌন্দর্য, অনুপম মাহাত্ম্য ও অদ্বিতীয় শ্রেষ্ঠত্ব এবং ইহাতে খোদাতালার প্রেরিত শেষ কেতাব, তাহার জাজ্জ্বল্যমান প্রমাণ প্রকাশিত হইয়াছে। খৃস্টানদিগের ভ্রমান্ধতাও দেখান হইয়াছে, আর কোরান শরীফের পাঁচ প্রধান এলেমের যথাযথ বিবরণ, আয়েতসমূহের সক্ষিপ্ত বিবরণ, কোরান মানুষকে যে 'প্রকৃত' মনুষ্যত্বে পরিণত করে তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। এতদ্ভিন্ন কোরান শরীফের উপর বিধর্মীগণ যে সকল দোষারোপ করে তাহার সম্পূর্ণ খণ্ডন আছে।"[২২৩]

রেয়াজুদ্দীন আহমদের ইতিহাসের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। তিনি 'গ্রীক-তুরস্ক যুদ্ধে'র ভূমিকায় লিখেছেন, "রূপসার বর্তমান স্বনামখ্যাত জমিদার চৌধুরী মোহাম্মদ গাজী সাহেব তখন পারসী ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আমি তাঁহার সাহায্যে 'তওজকে জাঁহাগীরি' নামক পারস্য ইতিহাস হইতে অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ অনুবাদ করিয়া হুগলীর প্রসিদ্ধ 'এডকেশন গেজেটে' মুদ্রিতার্থ পাঠাইতাম। উক্ত সংবাদপত্রের সম্পাদক মহাশয়ও অনুগ্রহপূর্বক তাহা মুদ্রিত করিয়া আমাকে উৎসাহিত করিতেন।...রূপসার মধ্য বাঙ্গালা স্কুলে শিক্ষকতা করিবার সময় আমি ছাত্রদিগকে ইতিহাস এবং ভূগোল শিক্ষা দিতাম।"[২২৪] 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ' গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য

২২১. *এসলামতত্ত্ব*, (১ খণ্ড), ভূমিকা' দ্রষ্টব্য
২২২. *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা*, পৃ. ২৩৫-৩৬
২২৩. *সুধাকর*, ৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৬
২২৪. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ—*গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ*, ১২ রবিওল আউওল, ১৩১৭ হিজরী (১৮৯৯) পৃ. II. (ভূমিকা)।

সম্পর্কে তিনি ভূমিকায় বলেছেন, "বিগত ১৮৯৭ খৃ. অব্দে যখন গ্রীক-তুরস্কের যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন ঐ যুদ্ধ বিষয়ক একখানি ইতিহাস লিখিতে আমার একান্ত আগ্রহ জন্মে। তদনুসারে বাঙ্গালা নানা গ্রন্থ এবং সংবাদ পত্রাদির সাহায্যে গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ লিখিতে আরম্ভ করি।...অতঃপর গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ সম্বন্ধীয় কতিপয় উর্দু পুস্তক আনাইয়া তৎসাহায্যে এই গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ পুস্তক ১ম ভাগ ক্রমশঃ লিখিতে ও মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করি।"[২২৫] তিনি গ্রন্থখানি পিতা 'মুনশী মৌজুদ্দীন আহমদ'কে উৎসর্গ করেন। একই ঘটনাকে আশ্রয় করে তিনি পদ্যে ১২৯৯ থেকে ১৩২১ সন পর্যন্ত সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে প্রকাশ করেন। এতে 'মুসলমানদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য ও অবশ্য প্রয়োজনীয় বিষয়' থাকত। এছাড়া, প্রতি সংখ্যায় বিশ্বের মুসলমান রাষ্ট্রের সমকালীন ও অতীত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হত। এখানেও তাঁর লক্ষ্যবস্তু এক—ইতিহাসচর্চার মধ্য দিয়ে স্বজাতির আত্মচেতনা ও মর্যাদাবোধ জাগ্রত কবা।

শেখ আবদুস সোবহান

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বড়গদী নিবাসী শেখ আবদুস সোবহান 'হিন্দু মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থ লিখে সুধীসমাজে পরিচিত হন। স্বসমাজের প্রতি তাঁর অসামান্য দরদ, কিন্তু সে তুলনায় তাঁর সংযমবোধের অভাব ছিল। উগ্র সমাজপ্রীতি সাম্প্রাদাযিকতা মুক্ত হতে পারে না, আবদুস সোবহান নিজ সমাজের দুর্গতির কথা বলতে গিয়ে নিরপেক্ষ মনোভাব রক্ষা করতে পারেননি। মুসলমান জমিদারদের অকর্মণ্যতা, বিলাসিতা, নির্বুদ্ধিতা ও অর্ধমাচরণের প্রতি তীব্র কটাক্ষ করেও হিন্দু আমলাদেব ষড়যন্ত্র, চাতুরী, স্বার্থপরতা ও জমিদারী আত্মসাতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে সব মোসলমান জমিদার বিনাশ হইয়াছে, আমরা যত প্রকার অনুসন্ধান করিয়াছি, মূলে দেখা গিয়াছে, কেবল হিন্দু কর্মচারীদেব ধূর্ততা এবং বিশ্বাসঘাতকতাই ইহার বীজ। মিঞা সাহেবদের অদূরদর্শিতায় ও বিলাসীতায় এই বীজ রোপণ করে।"[২২৬] তাঁর ধারণা হয়েছিল, সরকারী চাকুরীতেও হিন্দু আমলার পক্ষপাতিত্বের জন্য মুসলমানবা বঞ্চিত।[২২৭] মুসলমানদের দুর্গতির প্রকৃত কারণ ইংরেজদের রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তার ও শাসন-শিক্ষানীতির পরিবর্তন। হিন্দু সমাজের একটি শ্রেণী শাসকগোষ্ঠীর সহিত সহযোগিতা করে এবং ইংরাজি ভাষা শিক্ষা করে ব্যবসায়, চাকরী, মহাজনি জমিদারী প্রভৃতি ক্ষেত্রে সুবিধা লাভ করে অগ্রসর হন, মুসলমানরা এর বিপরীত আচরণ করে পিছিয়ে পড়ে। বাংলার হিন্দু-মুসলামনের উন্নতি-অবনতি, অগ্রগতি পশ্চাৎগতির এটাই প্রকৃত ঐতিহাসিক কারণ। সেযুগের সরকারি চাকুরীর তালিকা লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, মোট চাকরীর সিংহভাগ

২২৫. ঐ, পৃ.IIV. (ভূমিকা)।
২২৬. শেখ আবদোস সোবহান—*হিন্দু মোসলমান,* ভিক্টরিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৮, পৃ. ৩-৪
২২৭. সৈয়দ আমীর আলী ১৮৮২ সালের 'সেন্ট্রাল মহামেডাম ন্যাশনাল এসোসিয়েশনে'র 'স্মারকপত্রে' অনুরূপ অভিযোগ তুলেছিলেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভাসমিতি' অংশে দ্রষ্টব্য।

ইউরোপীয়দের দখলে, ভারতীয়দের ভাগ্যে ছিটাফোঁটা অংশ জুটে।[২২৮] অনেক মুসলমান সমাজপতির মত আবদুস সোবাহানও এই সাধারণ সত্যটি অনুধাবন না করে নিজেদের দুর্ভাগ্যের জন্য হিন্দু সমাজকে দোষারোপ করেছেন এবং সেই সূত্রে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জাগিয়ে তুলেছেন। একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে মুসলমান বিদ্বেষী সাব্যস্ত করে তাঁকে আক্রমণ করেছেন (লক্ষণীয় বঙ্কিমচন্দ্র তখন জীবিত) এবং কংগ্রেসী নেতাদের কার্যকলাপের সমালোচনা করে তাতে মুসলমানদের যোগদানে বিরত থাকতে বলেছেন। তিনি মুসলমান জমিদারদের কর্মঠ, স্বাবলম্বী ও শিক্ষাব্রতী হতে এবং সাধারণভাবে মুসলমানদের ইংরাজি ও বাংলা শিক্ষা গ্রহণ, সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব-কলহ দূর করে ঐক্যভাব স্থাপন, সমিতিগঠন ও পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে সমাজ-উন্নতির উদ্যোগ নেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন। 'হিন্দু মোসলামন' গ্রন্থের সার বক্তব্য এটাই।

'হিন্দু মোসলমান' প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক প্রকাশকের সাথে প্রথমে বিবাদ ও পরে মোকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। 'সুধাকর' সম্পাদক রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'বিজ্ঞাপন' ছাপিয়ে তিনিও মানহানির মামলায় জড়ান।[২২৯] লেখক ভূমিকায় বলেছেন যে, তিনি এ সময় আবদুল লতিফের শরণাপণ্ন হন এবং তাঁর সাহায্য লাভ করেন।[২৩০] লেখকের এরূপ তিক্ত অভিজ্ঞতা তাঁর লেখাকে আরও সূচীমুখী করে তোলে। এরূপ বিভ্রাটের জন্য গ্রন্থের ২য় খণ্ড (১৮৮৮) ও ৩য় খণ্ড (১৮৮৯) আগে এবং ১ম খণ্ড (১৮৯১) পরে আত্মপ্রকাশ করে। ১ম খণ্ডে বাংলায় মোসলমান রাজত্বের কারণ ও আনুষঙ্গিক বিষয় আছে ; ২য় খণ্ডের বিষয়বস্তু 'মোসলমান জমিদার', 'হিন্দু আমলা' বৃত্তান্ত ও 'মোসলমান জমিদারদের প্রতি উপদেশ', ৩য় খণ্ডে 'গবর্ণমেন্টের কর্মচারী হিন্দুদের প্রকৃতি এবং কর্মপ্রার্থী মুসলমানদের দুরবস্থা', 'ন্যাশনাল কংগ্রেসের ভাবী ফল এবং কগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দেওয়া উচিত কি না' ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়েছে।[২৩১] 'হিন্দু মোসলমানে'র ভূমিকায় গ্রন্থ-রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে লেখক বলেন, "আমি কাহাকেও গালি দেওয়ার উদ্দেশ্যে লিখনী হাতে লই নাই। কেবল মোসলমানগণ যে ভবিষ্যৎ চিন্তা বিসর্জন দিয়া যথেচ্ছা ভ্রমণ করিতেছেন, কর্তব্য কার্য্যে উদাসীন হইতেছেন তাঁহাদিগকে প্রকৃত পথ প্রদর্শন করাইতে, কর্তব্য পথে অগ্রসর করিতে 'হিন্দু মোসলমান' লিখিলাম, কাজেই কতকগুলি সত্য ঘটনা-উচিত কথা, প্রকাশ করিতে হইয়াছে...ইহাতে অলীক গল্পের কণামাত্রও নাই, —যাহা লিখিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণ সত্য।[২৩২] তিনি গ্রন্থখানি সৈয়দ আমীর আলীকে উৎসর্গ করেন।

২২৮. ১৮৭১ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সরকারের মোট ২১১১ জন কর্মচারীর মধ্যে ইউরোপীয় ১৩৩৮, হিন্দু ৬৮১ ও মুসলমান ৯২ জন। শতকরা হার দাঁড়ায় যথাক্রমে ৬৪, ৩২, ও ৪। বিনয় ঘোষ—*বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা*, ৫ খণ্ড, পৃ. ২১৮

২২৯. *বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা*, কার্তিক ১৩২৬

২৩০. হিন্দু মোসলমান 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

২৩১. *হিন্দু মোসমান* 'সূচীপত্র' দ্রষ্টব্য ; সুধাকর, ২৬ মাঘ ১২৯৬

২৩২. *হিন্দু মোসলমান*, ভূমিকা।

শেখ আবদুস সোবহানের প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'কলির নারী চরিত্র' (১৮৮০)। এটি কবিতার বই, ঢাকার 'নিউজ প্রেসে' ছাপা হয়। কতিপয় দৃষ্টান্তের সাহায্যে সমকালের নারীদের কলঙ্কিত চিত্র তুলে ধরে তিনি বলেছেন যে, পিতামাতাই তাদের কন্যাদের বড় শত্রু। তাদের অসাবধানতার দোষে মেয়েরা অবাধ্য হয় ও বিপথে যায়। লেখক সর্বত্র সুরুচির পরিচয় অক্ষুণ্ন রাখতে পারেননি।[২৩৩]

শেখ আবদুস সোবহানের অপর গ্রন্থের নাম 'আর্যধর্ম' (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৯০৪)। ঢাকার 'বেদব্যাস প্রেসে' এটি ছাপা হয়। 'নবনূরে' 'আর্যধর্মে'র সমালোচনা হয় : "ইহা একখানি ধর্ম-সমালোচনা বিষয়ক গ্রন্থ।...কোনটি প্রকৃত 'আর্যধর্ম' তাহার বিনিশ্চয়ার্থ এই গ্রন্থের প্রচার।...লেখক কেবল হিন্দু, ব্রাহ্ম য়িহুদি, খ্রীস্ট ও ইসলাম—এই ধর্ম-পঞ্চকের আলোচনা করিয়াছেন।...এরূপ গ্রন্থ লিখিতে হইলে যেরূপ পাণ্ডিত্য, যেরূপ গবেষণা, সর্বোপরি যেরূপ নিরপেক্ষ ও সূক্ষ্ম বিচার ক্ষমতার প্রয়োজন, বর্তমান গ্রন্থ-প্রণেতার নিকট তাহার কোন অভাব পরিলক্ষিত হইল না। কিন্তু দুঃখের বিষয়, একমাত্র ধীরতা ও সংযমের অভাবে তিনি প্রচুর শক্তিশালী হইয়াও স্বীয় উদ্দীষ্ট বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।"[২৩৪] লেখক ইসলামকে প্রকৃত 'আর্যধর্ম' (সমুন্নত অর্থে) নামের উপযুক্ত বলে প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

আবদুস সোবহান পবরর্তীকালে 'পোলিশ কহিনী', 'জীবন প্রবাহ', 'বিংশতিবর্ষ', 'আলী নওয়াব জীবনচরিত', 'এলাজল ফোকরো' (১৯২২) নামে আরও কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

'ইসলাম-সুহৃদ' (১৯০৬) নামে মাসিকপত্রের সম্পাদনা শেখ আবদুস সোবহানের আর একটি কীর্তি। এটি অনিয়মিত ভাবে এক বছর চালু ছিল।[২৩৫]

নওশের আলী খান ইউসফজয়ী (১৮৬৪-১৯২৪)

তিনি টাঙ্গাইলের চারান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে পাকুল্লার জমিদার মীর আতাহার আলীর কন্যার পাণিগ্রহণ করে সেখানে বসতি স্থাপন করেন। তিনি গ্রামের পাঠশালা থেকে ছাত্রবৃত্তি (১৮৭৭), ঢাকার পোগোজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স (১৮৮১) পাশ করে ঢাকা কলেজে বিএ পর্যন্ত অধ্যয়ন করেন, গ্রাজুয়েট ডিগ্রিলাভ তাঁর ভাগ্যে ঘটেনি। ১৮৮৯ সালে পাকুল্লায় সব-রেজিস্ট্রারি অফিস স্থাপিত হলে নওশের আলী খান ইউসফজয়ী সেখানে সব-রেজিস্ট্রারি নিযুক্ত হন। ১৯১১ সালে সব-ডেপুটি হন।[২৩৬]

২৩৩. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ৩ চৈত্র, খ. ১৮৮০
২৩৪. *নবনূর,* ফাল্গুন ১৩১২
২৩৫. *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র,* পৃ. ১২৩
২৩৬. ইব্রাহিম খাঁ—'নওশের আলী খান-ইউসফজয়ী', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৬

নওশের আলী খান ইউসফজয়ী স্থানীয় ও অন্যত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের সহিত যুক্ত ছিলেন। স্বমাজে শিক্ষাবিস্তার তাঁর চিন্তা ও কর্মের মূল লক্ষ্য ছিল। ১৯০৩ সালে রাজশাহীতে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের এবং ১৯০৫ সালে ঢাকায় পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনের অধিবেশনে স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান কবেন এবং সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি একজন সুবক্তা ছিলেন।

তিনি ঢাকা কলেজে অধ্যয়ন কালে সমাজসংস্কার মূলক প্রবন্ধ লেখা শুরু করেন। 'ঢাকা প্রকাশে' তাঁর লেখা ছাপা হত। পরে তিনি ইসলাম প্রচারক, নবনূর, মিহির ও সুধাকরে প্রবন্ধ ও কবিতা লিখেন।

নওশের আলী গ্রন্থাকারে প্রবন্ধ, কবিতা ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১), 'শৈশব কুসুম' (১৮৯৫), 'দলিল রেজিস্টাবি শিক্ষা' (১৮৯৭), 'উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি' (১৯০১), 'মোসলমান জাতীয় সঙ্গীত', 'সাহিত্য প্রভা' (১৯১৪), 'সাহিত্য শিক্ষা' (১৯১৫), 'নোটস অন মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০৩) প্রভৃতি তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা। গ্রন্থ-রচনার প্রেরণা ও লক্ষ্যের কথা বলতে গিয়ে তিনি 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, 'বন্ধুবান্ধবের সহিত স্বজাতির ভূত ও ভবিষ্যৎ পর্যালোচনা করিয়া অনেক সময় অস্থির হইয়াছি, গভীর নিশীথে একাকী নির্জন-কক্ষে বসিয়া সমাজের বর্তমান শোচনীয় অবস্থা ভাবিয়া কত অশ্রুবর্ষণ করিয়াছি, কিন্তু দেখিয়াছি, আমার সে অস্থিবতার প্রতি সহানুভূতি এবং আমার সে অশ্রু দর্শনে সকলের চক্ষু হইতে প্রতি অশ্রু বিনির্গত না হইলে কোনই লাভ হইবে না ; তাই আজ পাঠক পাঠিকার নিকটে বঙ্গীয় মুসলমান লইয়া উপস্থিত হইলাম।...যে উদ্দেশ্যে আমি এই বঙ্গীয় মুসলমান লিখিলাম, তাহা শুধু এই গ্রন্থ প্রচারে পূর্ণ হইবে না, তবে যদি অন্যান্য ভ্রাতাগণ সমাজের অবস্থা চিন্তনে প্রবৃত্ত হইয়া স্বজাতির উন্নতির অন্তরায় স্বরূপ যে সমস্ত অভাব রহিয়াছে, তাহা প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে আমার এ গ্রন্থ প্রচাবের উপযুক্ত পুরস্কার পাইলাম, মনে করিব।"[২৩৭] নওশের আলী গ্রন্থ-প্রণয়নে সাহায্যকারী বন্ধুদ্বয়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লিখেছেন, "মুসলমান সমাজের প্রকৃত হিতৈষী নোয়াখালী নিবাসী বর্তমান চট্টগ্রাম মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক বন্ধুবর মৌলবী আবদুল আজিজ বি. এ. সাহেব এবং আমার অকৃত্রিম বন্ধু সুধাকর পত্রিকার সম্পাদক মৌলবী মহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ সাহেবের নিকটে এই গ্রন্থে প্রকাশিত অনেক তত্ত্ব জানিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া তাঁহাদিগকে বিশেষ ধন্যবাদ দিতেছি।"[২৩৮] তিনি সমকালীন বঙ্গীয় মুসলমান সমাজকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করেছেন ; ধর্ম, নীতি, সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি, অর্থনীতি ক্ষেত্রে মুসলমানদের দুর্গতি ও দুরবস্থা বিদ্যমান। এই অবনতির কবল থেকে সমাজকে কিভাবে রক্ষা করা যায়, সে-সম্পর্কে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, ধর্মহীনতা, বিদ্যাহীনতা, দারিদ্র্য এবং কুপ্রথা সমাজ-উন্নতির অন্তরায়। তিনি ধর্মনীতি বহির্ভূত শ্রেণীভেদ প্রথা

২৩৭. ইব্রাহিম খাঁ—নওশের আলী খান ইউসফজয়ী—বঙ্গীয় মুসলমান, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১২৯৭, পৃ,

২৩৮. ঐ. পৃ.

মানতে চাননি। "মুসলমান ধর্ম জাতিভেদ কিংবা সাম্প্রদায়িক কৌলিন্য স্বীকার করে না, মানসিক সাম্যনীতি শিক্ষাদানার্থে জগতে ইসলামের আবির্ভাব।...মুসলমানের জাত্যাভিমান তাহার হৃদয়ের নীচতা প্রাকাশ করে মাত্র। বস্তুতঃ মুসলমানদের মধ্যে শেখ, সৈয়দ, মোগল ও পাঠান এই শ্রেণী বিভাগ তাহাদের বংশানুক্রমিক বিভিন্নতাসূচক, ধর্ম কি সমাজ সম্বন্ধীয় কোন প্রাধান্য নহে।[২৩৯] নওশের আলী বাল্যবিবাহ ও বহু বিবাহের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনি 'নব্য ধরনের স্ত্রীস্বাধীনতা' চাননি তবে স্ত্রী-শিক্ষা কামনা করেছেন। "যদিও আমি আজকালের নব্য ধরনের স্ত্রী-স্বাধীনতার পক্ষপাতী নই, তথাপি স্ত্রীজাতি যাহাতে তাহাদের প্রকৃত অধিকার সকল লাভ করিতে পারেন, তাহা সর্বান্তঃকরণে কামনা করি।"[২৪০] "সমাজে স্ত্রী—শিক্ষার এত প্রয়োজন রহিয়াছে যে, সমাজের মঙ্গলামঙ্গল সম্পূর্ণরূপে না হইলেও স্ত্রীজাতির হৃদয় শিক্ষালোকে আলোকিত, সাংসারিক জ্ঞানে জ্ঞান সম্পন্ন করিতে নাই—ইহা মনে করা বিষম ভ্রান্তি।"[২৪১] ধর্মের অনৈসলামিক আচরণগুলির বিরোধিতা করে সৈযদ আহমদ শহীদের আদর্শে ধর্ম সংস্কারের কথা বলেছেন। "আমাদের ধর্মগ্রন্থ সকল আরবী ও ফারসী ভাষাতে লিখিত, বঙ্গীয় মুসলমানগণের অধিকাংশের উক্ত ভাষাদ্বয় অধিকার না থাকাতে, ইসলামধর্মের মূলতত্ত্ব সমাজে আশানুরূপ পবিজ্ঞাত হইতে পারিতেছে না ; আমাব দৃঢ় বিশ্বাস, ইসলামধর্মের গূঢ়তত্ত্ব সম্যকরূপে প্রচারিত হইলে যে সকল মুসলমান ইসলামতত্ত্ব জানিতে না পারিয়া অজ্ঞানান্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছেন, তাহাদের বিশেষ উপকাব সাধিত হইত এবং তাহাদের ধর্মজীবনও সমুন্নত হইয়া উঠিত।"[২৪২] তিনি রাজনীতিকভাবে সচেতন ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধতা করেননি। "আমরা মুসলমান জাতি ইংরেজ রাজপুরুষদের নিকট অধীনতা স্বীকার করিয়াছি—তরবারি ছাড়িয়াছি ; আমাদের বর্তমান অবনত অবস্থায় তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর আমাদের ভবিষ্যৎ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে।...মুসলমানগণের সহিত যাহাতে ইংরাজদের দিন দিন বন্ধুতা বৃদ্ধি পায়, তাহারা তজ্জন্যে যেন চেষ্টা করে, ইংরেজদের বীরতা, ধীরতা, অধ্যবসায় প্রভৃতি সৎগুণগুলি শিক্ষা করিতে যত্ন করেন।"[২৪৩] নওশের আলীর বাজনৈতিক চিন্তার এটাই মাপকাঠি। তিনি হিন্দু-মুসলমানেব সম্মিলন একান্তভাবে কামনা করেছেন : পরস্পরের প্রতি সরলতা, সহমর্মিতা ও আন্তরিকতাব দ্বারা এই সম্মিলন সম্ভব বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[২৪৪] নওশের আলী খান ইউসফজয়ী

২৩৯. ঐ, পৃ ৪

২৪০. ইব্রাহিম খাঁ—নওশের আলী খান ইউসফজয়ী—বঙ্গীযমুসলমান, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ৪৪ বোকেযা সাখাওযাত হোসেনেব সঙ্গে নওশের আলীব এ ব্যাপারে 'নবনূরে বাদানুবাদ হয়। বেগম বোকেয়ারযো' 'আমাদেব অবনতি' '(ভাদ্র ১৩১১) প্রবন্ধেব প্রত্যুত্তবে নওশেব আলী 'একেই কি বলে অবনতি' (কার্তিক ১৩১১) প্রবন্ধ লিখে বলেছিলেন, "আপনারা স্বাধীন মউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতাব অপব্যবহাব না কবেন, ইহাই প্রার্থনীয়।"

২৪১. ঐ, পৃ. ৪৩

২৪২. ঐ, পৃ. ৬৮

২৪৩. ঐ. পৃ. ৫৮

২৪৪. ঐ. পৃ. ৫৯-৬০

প্রধানত মধ্যপন্থী ছিলেন, সমাজের কোন গুরুতর পরিবর্তন তাঁর কাম্য ছিল না, তবে দু'একটি ক্ষেত্রে তাঁর স্বাধীন চিন্তা ও মুক্তবুদ্ধির স্ফুরণ দেখা যায়।

ইউসফজয়ীকে লেখা এক ব্যক্তিগত পত্রে ১২ মার্চ (১৮৯১) রমেশচন্দ্র দত্ত 'বঙ্গীয় মুসলমান' সম্পর্কে বলেন, "... your appeal to the Bengal Mussalmans to effect their own improvement and progress by social and moral reforms by education and earnest work has ring of true patriotism and enlists my sympathy and admiration."[২৪৫] 'দি ইণ্ডিয়ান মিরর' পত্রিকায় 'বঙ্গীয় মুসলমানে'র সমালোচনা হয়। পত্রিকায় লেখা হয় : "In the treatise before us the writer examines the conditions of his countrymen in Bengal in their social and political and religious aspects and ascribes much of their drawbacks to want of proper education. His suggestion for their amelioration breath a true spirit of patriotism and eminently worthy of being considered by his co-religionists."[২৪৬] পরবর্তী সমালোচনা হয় 'মোসলেম ক্রনিকলে'। "It is a well-written pamphlet on the political and social disintegration of the Mussalmans of Bengal In a very impressive language the author has shown the decaying process of the aristocratic class of Muhammadans and has statistically proved the gradual decline of cultivating classes into ignorance and impoverished circumstances."[২৪৭] 'নবনূরে' বঙ্গীয় মুসলমানে'র সমালোচনা প্রকাশিত হয়। "লেখক আলোচ্য গ্রন্থে যথেষ্ট চিন্তাশীলতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। তিনি আমাদের সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় অবস্থার যে চিত্র আঁকিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক শিক্ষিত মুসলমানেরই একটু বিশেষভাবে সমালোচনা করা উচিত। আমরা লেখকের সঙ্গে একমত হইয়া বলি, 'বঙ্গীয় মুসলমান বলিতে হাজার হাজার কি লক্ষ লক্ষ নয়, কোটী কোটী প্রাণীর কথা মনে পড়ে। বঙ্গদেশে এতগুলি নরনারী বাস করিতেছে কিন্তু তাহাদের মুসলমানোচিত তেজস্বিতা, তাহাদের জাতীয় জীবনের চেতনা বা অস্তিত্ব আছে কিনা সন্দেহের বিষয়।' ... বিগত সেন্সস রিপোর্টে দেখা গিয়াছে বঙ্গীয় মুসলমান সংখ্যায় প্রায় বঙ্গীয় হিন্দুর কাছাকাছি, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে কি তাহারা তাহাদের উন্নত প্রতিবেশীর নিকটবর্তী হইবার উপযুক্ত? বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে বর্তমান সময়ে এসব বিষয়ে গভীর আলোচনা হওয়া উচিত।"[২৪৮]

২৪৫ নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর 'শৈশব-কুসুম' কাব্য গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত। উক্তপত্র ও বঙ্গীয় মুসলমান সম্পর্কে অন্যান্য সমালোচনার সম্পূর্ণ উদ্ধৃতির জন্য 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

২৪৬ *The Indian Mirror*, 3 May 1895

২৪৭. *The Moslem Chronicle*, 7 December 1895

২৪৮ *নবনূর*, ভাদ্র ১৩১০

'শৈশব-কুসুম' ও 'মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত' কাব্যগ্রন্থে নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর স্বদেশপ্রেম ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যানুভূতি ব্যক্ত হয়েছে। 'শৈশব-কুসুমে' ১৭টি কবিতা স্থান পেয়েছে। কবি 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "যখন শৈশবের সুখ সরসে ভাসিতেছিলাম, যখন সংসারের এ দুঃখতাপে আমাকে সন্তপ্ত হইতে হয় নাই মানস-কাননে যে কয়েকটি ভাবকুসুম বিকশিত হইয়াছিল আজ তাহা পাঠক-পাঠিকার করকমলে উপহার দিলাম। গোলাপ ও গন্ধরাজের নিকট পলাশ ও শিমূলও স্থান পায়; তাই বঙ্গীয় সাহিত্যোদ্যানে এই শৈশব-কুসুম লইয়া উপস্থিত হইতে সাহসী হইলাম।"[২৪৯] কবির মত সমর্থন করে 'নবনূরে' লেখা হয়, "লেখকের শৈশবস্মৃতির সহানুভূতি প্রদর্শনার্থে আমরা বলিতে বাধ্য তাঁহার কুসুমে পলাশ ও শিমূলের অন্তর্নিহিত মধুর ন্যায় দু'এক ফোঁটা মধুর স্বাদ পাওয়া যায়।" [২৫০] হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কামনা করে ইউসফজয়ী লিখেছেন,

হিন্দু আর মুসলমান
যেন সবে এক প্রাণ
হেন শুভ দিনে মরি পুলকে পুরিত।
মিলিয়াছে ভ্রাতৃভাবে হয়ে বিমোহিত॥ [২৫১] (শিক্ষা বিস্তার)

১৮৯৯ সালে বাংলা সরকার নিম্নশিক্ষা প্রণালীর পুনর্গঠনের জন্য একটা কমিটি করেন। কমিটি ফ্রোবেলের শিক্ষানীতির অনুসরণে কিণ্ডার গার্টেন শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ করেন। বাংলা সরকার ১৯০১ সালে কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী শিক্ষানীতি গ্রহণ করেন। ইউসফজয়ী 'উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি' (১৯০১) পুস্তকে ফ্রোবেলের শিক্ষানীতির আলোকে শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ বিষয় আলোচনা করেছেন। তাঁর আলোচনার সূচি ছিল 'ফ্রোবেলের শিক্ষানীতি, বিদ্যালয়ের মূল শিক্ষানীতি, ইংলণ্ডের শিক্ষা প্রণালী, হিন্দু-শিক্ষা প্রণালী, মোসলেম শিক্ষা প্রণালী, উচ্চ প্রাইমারী ও মধ্যবঙ্গ বিদ্যালয়ের পাঠ্য তালিকা, শিক্ষা ও অধ্যাপনা, পাঠ্য বিষয়ের শিক্ষা দান প্রণালী, নৈতিক শিক্ষা, বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা বিধান, ছাত্রদের গুণাবলী, শিক্ষকের গুণাবলী ও কর্তব্য।'[২৫২] তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "The new vernacular Education Scheme is about to usher to a new era in the Vernacular Education. To my mind, it is fraught with changes of great moment and will supply a long-felt desideratum of practical education in Vernacular institutions. Loyal to the feelings of sympathy that I have for the Scheme, I have thought it my duty to be of some use for its introduction in Bengal and have thus ventured to present this humble fruit of my labour

২৪৯ নওশের আলী খান ইউসফজয়ী—*শৈশব-কুসুম*, আহমদী প্রেস, টাঙ্গাইল, ১৩০২, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।
২৫০ *নবনূর*, ভাদ্র ১৩১১
২৫১ *শৈশব-কুসুম*
২৫২ নওশের আলী খান ইউসফজয়ী--*উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি*, ভারত মিহির যন্ত্র, কলিকাতা ১৯০১, 'সূচীপত্র' দ্রষ্টব্য। 'উচ্চ বঙ্গ বিদ্যালয়ের অধ্যাপনাবিধি' শীর্ষক এর অপর নাম পাওয়া যায়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে পূর্বোক্ত ও ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে শেষোক্ত গ্রন্থ আমি দেখেছি।

to the public who, I believe, will condone my shortcoming in considerations of the fact that I had to travel on a path of untrodden before. As to the contents of the work, I have only to say that I strictly followed the Hints and Suggestions made in the Government Resolution No. I for 1901 and that I have added exhaustive notes of lessons in Physics and Agricultures and object lessons etc. so that the Vernacular Teachers may profit by them"[২৫৩]

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩)

'পুথির কুবের' আবদুল করিম চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার সুচক্রচণ্ডী গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি মেধাবী ছাত্র ছিলেন; পটিয়া উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতসহ এন্ট্রান্স পাশ করেন (১৮৯৩) এবং চট্টগ্রাম কলেজে এফ. এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন। দীর্ঘকাল রোগভোগে স্বাস্থ্যভঙ্গের কারণে তিনি পরীক্ষা দিতে পারেননি। তিনি জীবিকার সন্ধানে প্রথমে স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে ফৌজদারী আদালতের কেরানী হন। তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট কবি নবীনচন্দ্র সেনের স্নেহদৃষ্টি লাভ করেন, তাঁর সহযোগিতায় চট্টগ্রাম কমিশনার অফিসে তিনি কেরানী রূপে যোগদান করেন (১৮৯৮)। আবদুল করিম বিএ. যখন চট্টগ্রাম বিভাগে স্কুল-ইনস্পেক্টর হন তখন তাঁর আশ্রয়ে আবদুল করিম শিক্ষাবিভাগে কেরানীর চাকুরী গ্রহণ করেন (১৯০৬)। তিনি মাঝখানে সাত বছর (১৮৯৮-১৯০৫) মনোয়ারা স্কুলের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯৩৪ সালে চাকুরী থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

আবদুল করিম সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক ছিলেন না, ছিলেন মননশীল গবেষক। তিনি সুদীর্ঘকাল সাহিত্যের গবেষণা করে কাটিয়েছেন। তাঁর গবেষণার ক্ষেত্র প্রধানত একটি বিশেষ জগতে সীমাবদ্ধ ছিল, সেটি হল 'পুথি সাহিত্য'। প্রাচীন যুগের হস্তলিখিত বাংলা ও সংস্কৃত পুথি সংগ্রহ, পাঠোদ্ধার ও আলোচনা ছিল তাঁর সাধনার ক্ষেত্র। তিনি প্রায় দুহাজার পুথি সংগ্রহ এবং সেগুলির বহুলাংশের আলোচনা প্রকাশ করে অতীতের বিস্মৃতির অন্ধকারে চাপা-পড়া যুগকে আলোকিত করেন। এক্ষেত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেনের সাহিত তাঁর তুলনা দেওয়া চলে। তিনি কলিকাতার 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে'র সদস্য ছিলেন (১৩০৮) ; পরে পরিষদের সহকারী সভাপতি হন। 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় তাঁর বহু মনোজ্ঞ আলোচনা প্রকাশিত হয়। তাঁর সম্পাদিত 'বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ' (১৩২০-২১) দুটি খণ্ডে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশ করে।[২৫৪] 'সত্যনারায়ণের পুথি' (১৩২২), 'মৃগলব্ধ' (১৩২২), 'গোরক্ষবিজয়' (১৩২৪) প্রভৃতি গ্রন্থও পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। আবদুল করিম পুথির জগৎ কেন বেছে নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে তিনি ব্যাখ্যা করে বলেন, "বাঙ্গালার যে যুগে মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক বাঙ্গালা

২৫৩ *উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি,* ১৯০১

২৫৪ মুহম্মদ এনামুল হক ও কবীর চৌধুরী (সম্পাদিত)—*আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারকগ্রন্থ,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

সাহিত্য-চর্চার উন্মেষ হয়, আমরা সেই যুগেরই উদয় এবং সেই যুগেবই অস্ততারা। ... এই যুগে যাঁহারা বাঙ্গালা ভাষার সেবায় বিভিন্ন ভাবে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে আমিই ছিলাম পাল হইতে পলাতক। ... আমার সহকর্মীরা আরবী, ইরানী, তুরানী জাত-ভাইদের কীর্তিকলাপ আলোচনা করিয়াছেন ; কিন্তু আমি করিয়াছি আমার পাশের বাড়ীর মুসলমানের, আমার দেশের জাতভাইদের সাহিত্যের ক্ষেত্রে কীর্তিকলাপ সংগ্রহ। আমি সোজা কথায় ইহাই বুঝি, আমার দেশের জাত-ভাইরা দেশের ভাষাব জন্য কি করিয়াছিলেন, তাহাই যদি জানিতে না পারিলাম, তবে পরের দেশের ও বিদেশীর ভাইদের কথা জানিয়া কি হইবে"?[২৫৫] আবদুর করিম সেযুগের অধিকাংশ মুসলমান লেখকের মত প্যান ইসলামী ভাবধারা দ্বারা প্রভাবিত হননি, এ উক্তির মধ্যে তার স্বাক্ষর আছে। তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী মনোভাব দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তাও এখানে স্পষ্ট। তিনি ঐ সময় আবির্ভূত না হলে মুসলমানদের গবেষণার দিকটি অপূর্ণ থেকে যেত।

হুগলীর 'পূর্ণিমা' (১৩০২) পত্রিকায় আবদুল করিমের লেখা ছাপা হয়। তখন থেকে পরবর্তীকালে তিনি আলো, সাহিত্য, সাহিত্য-সংহিতা, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, বীরভূমি, আশা, ভারত-সুহৃদ, ইসলাম প্রচারক, জ্যোতিঃ, কোহিনূর, নবনূর, প্রদীপ, প্রকৃতি, অবসর, নববিকাশ প্রভৃতি পত্রিকায় শতাধিক প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি প্রাচীন পুথির উপর আলোকপাত করে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত প্রায় আটশত প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।[২৫৬] সমকালীন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কিত চিন্তাশীল মৌলিক প্রবন্ধও তাঁর আছে। বিশেষত 'মাতৃভাষা' ও 'জাতীয় সাহিত্য' নিয়ে যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল, আবদুর করিম দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সে বিষয়ে নিজের অভিমত প্রকাশ করেছেন। বলা বাহুল্য, বাঙালি মুসলমানদের মাতৃভাষা যে বাংলা, এই সিদ্ধান্তে তিনি অবিচল ও অনমনীয় ছিলেন। ইসলাম প্রচারকে 'আমাদের কর্তব্য' প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন, "আমাদের কোন কোন বিজ্ঞ বকধার্মিক স্বজাতি হিতৈষী ভ্রাতৃগণ বঙ্গভাষার পরিবর্তে ভাষান্তরকেই স্বজাতীয় ভাষার স্থানীয় করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, দেখিতেছি। ... কোন অধঃপতিত সমাজের বা জাতির যদি কখনও কিছু হওয়ার আশা থাকে তবে তাহা জাতীয় ভাষার সহায়তাতেই হইবে, অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। বঙ্গভাষা ত্যাগ করিতে গেলে একই ভাগ্যসূত্রে গ্রথিত আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণকেও ত্যাগ করিতে হইবে"।[২৫৭]

প্রাচীন পুথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা কোনটাই সহজ সাধ্য ছিল না। সাপুড়ে যেমন সাপের গন্ধ পায় এবং সেটি না ধরা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয় না, আবদুল করিম তেমনি পুথির গন্ধ পেতেন এবং তা সংগ্রহ না করা পর্যন্ত স্বস্তি পেতেন না। ব্যোমকেশ মুস্তফী লিখেছেন, "তিনি (আবদুল করিম) মুসলমান, কোন কোন হিন্দুর আঙ্গিনায় তাঁহার প্রবেশাধিকার নাই, কিন্তু হিন্দুর ঘরে পুঁথি আছে শুনিয়া তিনি ভিখারীর মত তাহার দ্বারে গিয়া পুঁথি দেখিতে

২৫৫. *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারকগ্রন্থ,* পৃঃ ৪১
২৫৬. ঐ, পৃঃ ১৯৯
২৫৭ *ইসলাম প্রচারক*, শ্রাবণ ১৩১০

চাহিয়াছেন। পুঁথি সরস্বতী পূজার দিন পূজিত হয়; অতএব মুসলমানকে ছুঁইতে দেওয়া হইবে না বলিয়া অনেকে তাঁহাকে দেখিতেও দেন নাই। অনেকে আবার তাঁহার কাকুতি মিনতিতে নরম হইয়া নিজে পুঁথি খুলিয়া উল্টাইয়া দেখাইয়াছেন, মুন্সী সাহেব দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া হস্ত স্পর্শ না করিয়া কেবল চোখে দেখিয়া নোট করিয়া সেই সব পুঁথির বিবরণ লিখিয়া আনিয়াছেন।"[২৫৮] 'যোগ কালন্দর' কাব্যে রাধাকৃষ্ণের রূপকে সুফীতত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আছে। আবদুল করিম সে বিষয়ে ব্যাখ্যা করে একটি প্রবন্ধ 'ইসলাম প্রচারকে' (শ্রাবণ ১৩১০) প্রকাশ করেন। ঐ প্রবন্ধের পাদটীকায় সম্পাদক নিজ মন্তব্য জুড়ে দিয়ে বলেন, "ধর্ম সম্বন্ধীয় মতামত প্রকাশে লেখককে একটু ধীর ভাব অবলম্বন করিতে অনুরোধ করি। কারণ ইহা অতি কঠিন ও গুরুতর বিষয়।"[২৫৯] পুঁথি সম্পাদনার কাজে তাঁর দক্ষতা ছিল অসাধারণ। 'রাধিকার মানভঙ্গ' (১৯০১) নামক প্রাচীন কাব্যের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেন, "... তিনি (আবদুল করিম) এই দুর্লভ গ্রন্থের সম্পাদনকার্যে যেরূপ পরিশ্রম, যেরূপ কৌশল, যেরূপ সহৃদয়তা, যেরূপ সূক্ষ্মদর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সমস্ত বাঙ্গালায় কেন সমস্ত ভারতেও বোধ হয় সচরাচর মিলে না। এক একবার মনে হয় যেন কোন 'জর্মান এডিটর' এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।"[২৬০] 'প্রাচীন পুথির বিবরণে'র কতকাংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় (১৩০৭, ১৩১০ অতিরিক্ত, ১৩১২ অতিরিক্ত, ১৩১৮)। পত্রিকা-সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ভূমিকায় বলেন, "সঙ্কলনকর্তার অধ্যবসায়, পরিশ্রম, বাঙ্গালা-সাহিত্য-অনুরাগ, ধর্মমত সম্বন্ধে উদারতা প্রশংসা করিয়া শেষ করা যায় না। ... হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলনের ততটা পরিচয় আর কোথাও পাওয়া যায় না। বাঙ্গালীর ধর্মেতিহাসের আলোচনায় এই পুথির বিবরণ প্রচুর সাহায্য করিবে।"[২৬১] উল্লেখযোগ্য যে, প্রাচীন পুথি সাহিত্যের সাথে সাথে বাংলা লোক-সাহিত্যের সংগ্রহ ও আলোচনা তিনি করেছেন।[২৬২] এ বিষয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন।

পুথি সম্পাদনাসহ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ও ইতিহাস বিষয়ক তাঁর পনেরখানি গ্রন্থ আছে। 'ইসলাম ইতিবৃত্ত' (১৯০৪) 'ইসলামাবাদ' (১৯১৮) তাঁর একক প্রচেষ্টায় রচিত মৌলিক গ্রন্থ। 'আরাকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য' (১৯৩৫) আবদুল করিম ও মুহম্মদ এনামুল হক যুগ্মভাবে রচনা করেন। 'ইসলাম ইতিবৃত্তে'র পরিচয় দিয়ে 'নবনূর' এটিকে 'উপাদেয় ও মূল্যবান' বলে মন্তব্য করে। [২৬৩]

২৫৮. 'বাঙ্গালী প্রাচীন পুঁথির বিবরণ' গ্রন্থে শ্রীব্যোমকেশ মুস্তফীকৃত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

২৫৯ *ইসলাম প্রচারক*, শ্রাবণ ১৩১০

২৬০ 'রাধিকার মানভঙ্গে'র ভূমিকা' (হরপ্রসাদ শাস্ত্রীকৃত) দ্রষ্টব্য।

২৬১. *বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা,* ১৩১০ (অতিরিক্ত সংখ্যা)

২৬২ 'বাঙ্গালার গ্রাম্যগীত' (আশা, ভাদ্র-আশ্বিন, পৌষ ১৩০৮), 'চট্টগ্রামী ছেলে-ভুলান ছড়া' (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০১), 'ছেলে-ঠকান ধাঁধা' (ঐ, মাঘ-চৈত্র ২৩১২), স্বর্ণরেণু (নবনুর, আষাঢ়, শ্রাবণ ১৩১০, আশ্বিন ১৩১১) ইত্যাদি।

২৬৩ *নবনূর,* জ্যৈষ্ঠ ১৩১১

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০-১৯৩০)

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন কুষ্টিয়ার মেহেরপুর মহকুমার গাঁড়াজোর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি প্রথমে মক্তবে, পরে পাঠশালায় ও ইংরাজি স্কুলে শিক্ষা লাভ করেন। কৃষ্ণনগরে নর্মাল স্কুলে অধ্যয়নকালে তিনি খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা নেন (১৮৮৭)। তখন তাঁর নাম হয় জন জমিরুদ্দীন। উচ্চ শিক্ষার জন্য তিনি প্রথমে কলিকাতায় ও পরে এলাহাবাদে যান। এলাহাবাদে সেন্ট পলস ডিভিনিটি কলেজ থেকে 'হাইয়ার গ্রেড অব রিডার' বা 'পাঠকরত্ন' ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষা শেষে তিনি খ্রিস্টধর্ম প্রচার কাজে নিযুক্ত হন। বাংলাদেশে প্রচারকার্য চালাবার সময় তিনি কোরান ও ইসলামের বিরোধিতা করে 'খ্রীস্টীয় বান্ধব' (জুন ১৮৯২) পত্রিকায় 'আসল কোরান কোথায়' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা 'সুধাকব' পত্রিকায় 'ইসলামী বা খৃষ্টানী ধোঁকাভঞ্জন' নামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখে জন জমিরুদ্দীনের অভিযোগের জবাব দেন।[২৬৪] জমিরুদ্দীনের ক্রমে ভাবান্তর আসে এবং নতুন ও পুরাতন বাইবেলের পরস্পর-বিরোধী তথ্যে খ্রিস্টধর্মে আস্থা হারিয়ে পুনরায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। জন জমিরুদ্দীন শেখ জমিরুদ্দীন নাম গ্রহণ করে গ্রামের স্কুলে শিক্ষকতা শুরু কবেন। মুনশী মেহেরুল্লা তাঁকে ইসলাম ধর্ম প্রচার কাজে উৎসাহিত করেন এবং ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা দানে সঙ্গী করেন। শেখ জমিরুদ্দীন শিক্ষকতা ছেড়ে বাকী জীবন ইসলাম প্রচাবে ব্যয় করেন। ধর্ম-প্রচার ও বক্তৃতাব উদ্দেশ্যে বাংলার প্রায় সব জেলায় ভ্রমণ করেন এবং বিপথগামী মানুষকে 'দীন-ই এলাহি'র পথে ফিরিয়ে আনেন। তিনি বহু সংখ্যক অমুসলমানকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করেন। ধর্মের সঙ্গে শিক্ষা সমাজ ও রাজনীতিকেও তিনি প্রচারের বিষয় করেন। বঙ্গীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে জমিরুদ্দীন শাসক ইংরাজদের সমর্থন করেছেন। পরবর্তীকালে স্বরাজ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলনের তিনি বিরুদ্ধাচরণ করেন। এমন কি, বলকান যুদ্ধে মুসলমানগণ তুরস্কের পক্ষ নিয়ে ইংরাজদের দোষারাপ করলে জমিরুদ্দীন সেটি মানেননি। তাঁর এই অবিচল রাজভক্তি ও তদ্‌গত চিত্ততার জন্য তিনি সরকারের কাছ থেকে একাধিকবার প্রশংসা-পত্র পেয়েছিলেন।[২৬৫] রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ও মিশনারীদের নিন্দা, কিন্তু শাসকদের স্তুতি করেছেন।

ইসলাম ধর্ম প্রচারে শেখ জমিরুদ্দীন দ্বিমুখী অভিযান চালান—বক্তৃতা দান ও পুস্তক প্রবন্ধ প্রণয়ন। অন্যের আঘাত-আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা, ইসলামের মহিমা প্রচার করা, অবিশ্বাসীদের ইসলামে দীক্ষা দেওয়া, ধর্মবোধে মুসলমানদের জাগ্রত করা—এক কথায় ইসলামীকরণ এবং তদ্দ্বারা সমাজের পুনর্জাগরণ—এই ছিল শেখ জমিরুদ্দীনের মুখ্য ব্রত।

২৬৪. *সুধাকর*, ২০ ও ২৭ চৈত্র, ১২৯৯, ২ বৈশাখ ও ২৭ জৈষ্ঠ, ১৩০০

২৬৫ মুস্তফা নূরউল ইসলাম—'মুনশী জমিরুদ্দীন', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা* , মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬

শেখ জমিরুদ্দীনের প্রথম গ্রন্থ 'আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত' (১৮৯৮) মুনশী মেহেরুল্লার প্রেরণায় এটি লেখা হয় এবং তাঁরই অর্থানুকূল্যে ছাপা হয়।[২৬৬] বাল্যজীবন শিক্ষা, খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ ও প্রচার, ইসলামে পুনঃদীক্ষা এবং ইসলাম প্রচারে আত্মনিয়োগ ইত্যাদি বিষয় তাঁর আত্মজীবনীতে স্থান পেয়েছে। মুসলমান রচিত বাংলা আত্মজীবনী হিসাবে এটি দ্বিতীয়, প্রথম গ্রন্থ আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী প্রণীত 'জীবনচরিত' (১৮৮৯)। 'রদ্দে খৃষ্টান' নামে একটি গ্রন্থ-সিরিজে মোট ৯ খানি পুস্তক-পুস্তিকা ছাপা হয়। এগুলির নাম নিম্নরূপ :

হজরত ইসা কে? (১ আশ্বিন, ১৩০৬)
ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য (২০ শ্রাবণ ১৩০৭)
ইসলামী বক্তৃতা (মাঘ ১৩১৪)
রদ্দে সত্যধর্ম নিরূপণ ও হেদায়তুল জমিরিয়া (১৩৩২)
ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও পাদ্রী রাউস সাহেবের সাক্ষ্য (শ্রাবণ ১৩৩২)
পাদ্ মনরো সাহেবের ধোঁকাভঞ্জন (১৩৩৪)
গ্লোরি অব ইসলাম (১৩৩৫)
মাসুম মোস্তফা (দঃ) (পৌষ ১৩৩৫)

এগুলির মধ্যে 'রদ্দে নাসারা ও আখলাকে জমিরিয়া' জমিরুদ্দীনের জীবনকথার ভিত্তিতে মনিরুদ্দীন আহমদ রচনা করেন। 'ইসলামের সত্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য' জমিরুদ্দীনকৃত সংকলন গ্রন্থ—এতে কৃষ্ণকুমার মিত্র, গিরীশচন্দ্র শাস্ত্রী, চন্দ্রশেখর সেন, ধর্মানন্দ মহাভারতী, মহেন্দ্রনাথ বসু, টমাস কার্লাইল, টমাস আর্নল্ড, ম্যাক্সমুলার ও জন ডেভিট পোর্টের প্রবন্ধ আছে। 'গ্লোরি অব ইসলামে'র 'ফ্রম ক্রিশ্চিয়ানিটি টু ইসলাম' প্রবন্ধ জমিরুদ্দীনের লেখা, বাকী চারটি অন্যের রচনা, বিভিন্ন ইংরাজি পত্রিকা থেকে সংগৃহীত হয়েছে।[২৬৭]

'রদ্দে খৃষ্টান' সিরিজের অবশিষ্ট গ্রন্থগুলি শেখ জমিরুদ্দীনের নিজস্ব রচনা। 'হজরত ইসা কে?' গ্রন্থ রচনার উপলক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি 'বিজ্ঞাপনে' লিখেছেন, "জেলা বাঁদা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইউনিটোরিয়ান মিশনারী পাদরী আকবর মসীহ সাহেব প্রণীত 'উলহতে মসীহ' নামক সুবিখ্যাত উর্দু পুস্তক অবলম্বন করিয়া 'হজরত ইসা কে? লিখিত হইল। ইউনিটোরিয়ান খৃষ্টান মণ্ডলী ব্যতীত প্রায় সমস্ত খৃষ্টীয় সমাজ হজরত ইসাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। তিনি খোদা কিনা, এ বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া আমাদের নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে; কারণ যদি তিনি খোদা হন, তাহা হইলে তাঁহাকে উপাসনা করা আমাদের কর্তব্য। আর যদি তিনি খোদা না হন, তাহা হইলে যাঁহারা তাঁহাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহাদিগের উপাসনা না করা কর্তব্য। বড়ই দুঃখের বিষয় এই যে,

২৬৬ শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন—*আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত* , অন্নপূর্ণ প্রেস যশোর, ১৩০৪
২৬৭ বেভাঃ মৌলবী জমিরুদ্দীন— *গ্লোরি অব ইসলাম*, গাঁড়াডোব, নদীয়া, ১৯২৯

অনেকে না জানিয়া হজরত ইসাকে খোদা বলিয়া উপাসনা করিয়া থাকেন। ... হজরত ইসা কে? অর্থাৎ তিনি খোদা কি বান্দা এই বিষয় সম্বন্ধে বঙ্গভাষায় একখানি পুস্তক লিখিতে যশোহর, হাতিয়ান তলা নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব আমাকে অনুরোধ করেন। আমি তাঁহাব অনুরোধের বশবর্তী হইয়া 'হজরত ইসা কে' জনসমাজে প্রকাশ করিলাম। ইহা দ্বারা একটি ইসা-পূজকের মনও একেশ্বরে আইসে, তাহা হইলে আমার যাবতীয় পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক বিবেচনা করিব।"[২৬৮]

'ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলীম্বদের মন্তব্য' গ্রন্থ-সংকলনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "বহুকাল হইতে হিন্দু ও খৃষ্টানেরা মোসলমান ধর্মকে ঘৃণা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু সুখের বিষয় এই যে, কয়েকজন হিন্দু, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান পণ্ডিত মোসলমান ধর্ম আলোচনা করিয়া 'ইসলামের সভ্যতা' সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আজকাল বিধর্মী মোসলমান ধর্মে আস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সেই সকল বহুমূল্য মন্তব্য নানা গ্রন্থে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া রহিয়াছে। আমি আমার সহকর্মী সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম প্রচারক ... মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব ও কতিপয় মোসলমান ধর্মবন্ধুর সেই সকল মন্তব্য নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করিয়া জনসমাজে প্রকাশ ও প্রচার করিলাম।"[২৬৯]

'রদ্দে খৃষ্টান' পুস্তকমালা ছাড়াও তিনি 'শ্রেষ্ঠ নবী হজরত (দঃ) ও পাদ্রীর ধোঁকাভঞ্জন' (১৩১৬), 'হজরত বার্ণাবার ইঞ্জিলে পেশ খবর' (১৯০৯, ২য় সং), 'আসল বাইবেল কোথায়?' (১৩২৭) প্রভৃতি পুস্তক-পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তিনি একই উদ্দেশ্যে 'ইসলাম-প্রচারক', 'সুধাকর', 'মিহির ও সুধাকর', 'নবনূর', 'কোহিনূর' 'ইসলাম দর্শন', 'বঙ্গনূর', 'শরিয়ত' প্রভৃতি পত্রিকায় লেখনি চালনা করেছেন। 'ইসলাম প্রচারকে' (১৮৯৯-১৯০৫) সর্বাধিক সংখ্যক প্রবন্ধ লিখেছেন—যথা 'বাইবেল আপনি আপনার বিরুদ্ধে', 'প্রভু যীশুখৃষ্ট কে', 'বাইবেলে বহুবিবাহ' 'বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা', 'প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে', 'টমাস কার্লাইল ও ইসলাম', 'ফারাক্লিত', 'ইসলাম সম্বন্ধে লিটনার সাহেবের বক্তৃতা', 'হজরত মহম্মদের (দঃ) সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য, 'বার্ণাবার ইঞ্জিল', 'বাইবেলের পরিবর্তন' ইত্যাদি। এগুলির অধিকাংশ 'রদ্দে খ্রিষ্টান' গ্রন্থমালার পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। প্রবন্ধ ও পুস্তকের নাম থেকেই বুঝা যায় যে, ইসলাম, কোরান, মহম্মদ সম্পর্কে খ্রিষ্টান পাদরি ও পণ্ডিতদের সমালোচনার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এগুলি রচিত হয়েছে। এগুলিতে প্রতিবাদ ও প্রতি-আক্রমণ দুই আছে।

মুনশী মেহেরুল্লার মৃত্যুর দু'বছর পরে জমিরুদ্দীন 'মেহের-চরিত' (১৯০৯) প্রকাশ করেন। এতে মেহেরুল্লার ব্যক্তিগত জীবন এবং তৎসঙ্গে তাঁরা দু'জনে ইসলাম প্রচারে কিভাবে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।[২৭০]

২৬৮ শেখ জমিরুদ্দীন— *হজরত ইসা কে?* ১৩০৬

২৬৯ শেখ জমিরুদ্দীন (সংকলিত)--*ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পরধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য* , ১৩০৭

২৭০ শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন—*মেহের চরিত,* কলিকাতা, ১৯০৯

শেখ জমিরুদ্দীন 'পদ-শিক্ষা ব্যাকরণ' (১৮৯৭), 'বিশুদ্ধ খতনামা' (১৯০৩) এবং 'নামাজ পড়া শিক্ষা' নামে তিনখানি শিক্ষামূলক গ্রন্থ লিখেন। প্রথমটি বাক্যগঠন সংক্রান্ত ব্যাকরণ, দ্বিতীয়টি 'মোসলমানী পত্রাদী লিখিবার পাঠ' শিক্ষা এবং তৃতীয়টি ইসলাম ধর্মের আচরণবিধি শিক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত। কারবালার যুদ্ধ নিয়ে লেখেন 'জঙ্গে কারবালা' (১৯০৪)। এটি ২৮ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা।[২৭১]

'কোথা চলে গেলে' (১৯০২) দুটি কবিতার সংকলন : মাতা ও স্ত্রীর মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করে কবিতা দুটি রচিত। এ দুটি কবিতা ও অন্যান্য শোকমূলক কবিতা নিয়ে তাঁর 'শোকানল' (১৯০৮) কাব্য প্রকাশিত হয়। মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, মুনশী মেহেরুল্লা ও তাঁর নিজের লেখা গজলের একটি সংকলন 'আসল বাঙ্গালা গজল' (১৯০৮) তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়।

শেখ জমিরুদ্দীনের ইংরাজি শিক্ষার ভিত্তি ছিল। লেখনিশক্তিকে প্রচারকার্যে ব্যবহার করায় তাঁর দ্বারা উন্নতমানের রচনা লেখা সম্ভব হয়নি। সাহিত্যের মানদণ্ডে এগুলি কোনটাই টিকে না। সম্ভবতঃ তাঁর সৃজনশীল প্রতিভা ছিল না। প্রচার উদ্দেশ্যে রচিত তাঁর লেখাগুলি প্রচার-কার্যে সফলতা লাভ করে। তিনি বিদ্বৎসমাজ থেকে 'বিদ্যাবিনোদ' ও 'কাব্যনিধি' উপাধি পান।[২৭২]

মতীয়র রহমান খান (১৮৭২-১৯৩৭)

মতীয়র রহমান খান ঢাকার মানিকগঞ্জের পারিল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মফিজুর রহমান চট্টগ্রামের মুন্সেফ ছিলেন। মতীয়র রহমান এন্ট্রান্স পাশ করে ঢাকা কলেজে ভর্তি হন। আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী তাঁর সহপাঠী ছিলেন। ছাত্রাবস্থায় সোহরাওয়ার্দী ইংরাজীতে কবিতা লিখতেন, মতীয়র রহমান তার বাংলা অনুবাদ করতেন। বিএ পাশ করার আগেই তিনি দিনাজপুরের শিবগঞ্জ মধ্য-ইংরাজি স্কুলে প্রধান শিক্ষক রূপে যোগদান করেন। এর পর কলিকাতা লায়েক জুবিলী স্কুলে ও কলিকাতা মাদ্রাসায় কিছুকাল শিক্ষকতা করেন। তিনি দিল্লীর মুখলিসিয়া একাডেমীতেও শিক্ষকতা করেন। তিনি ১৯০৭ সালে সেটলমেন্ট কানুনগো নিযুক্ত হন।

মতীয়র রহমানের কবিতা, গল্প-উপন্যাস, প্রবন্ধ ও রম্যরচনা প্রভৃতি বিভিন্ন আঙ্গিকে লেখা আছে। 'মোসলেম বধ', 'সোহরাববধ', 'দিল্লী গাথা' প্রভৃতি কবিতা, 'যমুনা', 'নব-কুমুদ', 'মোক্ষপ্রাপ্তি' প্রভৃতি উপন্যাস, 'প্রবাসের স্মৃতি', 'আগ্রাকাহিনী' ভ্রমণবৃত্তান্ত, 'গূঢ়তত্ত্ব', 'গুপ্তসভা', 'মহাপ্রভু' প্রভৃতি ব্যঙ্গাত্মক রচনা। 'যমুনা' উপন্যাস অংশত 'মিহির ও সুধাকরে' (১৮৯৯) এবং অংশত 'ইসলাম প্রচারকে' (১৯০৪) প্রকাশিত হয়। এটি ঐতিহাসিক উপন্যাস—আহমদ শাহ আবদালীর সহিত মহারাষ্ট্রের বিশ্বাস রাও-এর কন্যা

২৭১ *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ২ চৈত্র, খ., ১৯০৪

২৭২ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃঃ ১১৮ (২সং)

যমুনার প্রণয় কাহিনী এর বিষয়বস্তু। 'নব-কুমুদ' 'প্রচারকে' (১৯০০) প্রকাশিত হয়। 'মোক্ষপ্রাপ্তি' 'মিহির ও সুধাকরে' (১৯০২-০৩) ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। 'নবনূরে' প্রকাশিত হয় 'প্রবাসের স্মৃতি' (১৩১১) এবং 'আগ্রার কাহিনী' (১৩১২)। এগুলিতে লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতার বিবরণ আছে। ব্যঙ্গরচনায় তিনি সমকালীন সমাজ ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থার সমালোচনা করেন।

শিল্পের দিক থেকে মতীয়র রহমানের রচনা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, তবে তাঁর রচনা উদ্দেশ্যহীনও নয়। 'যমুনা' উপন্যাস যে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতিবাদ স্বরূপ রচিত, তাতে সন্দেহ নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে ঐতিহাসিক উপন্যাসে শিল্পধর্ম ও উদ্দেশ্যধর্ম দুই সার্থক ভাবে ফুটেছে, মতীয়র রহমান কোনটাই রক্ষা করতে পারেননি।

মতীয়র রহমান এক পর্যায়ে 'মিহির ও সুধাকর' সম্পাদনা করেন। [২৭৩]

শেখ ওসমান আলী (১৮৭২-১৯৫২)

শেখ ওসমান আলীর পেশা ছিল আইন ব্যবসায়—তিনি মেদিনীপুর জজকোর্টের সরকারি উকিল ছিলেন। তিনি পরে মুন্সেফ ও সব-জজ হন। ওসমান আলী ১৮৯৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিএ এবং ১৮৯৬ সালে সিটি কলেজ থেকে বিএল পাশ করেন। মেদিনীপুর তাঁর জন্মভূমি, তিনি শহরের বড় বাজার এলাকায় থাকতেন।[২৭৪] 'মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি'র তিনি সম্পাদক ছিলেন। তিনি উৎসাহী তরুণ কর্মী হিসাবে সে-সময় খ্যাতি অর্জন করেন।

একজন কবি ও গদ্য-লেখক হিসাবেও তিনি সুখ্যাতি অর্জন করেন। 'হাফেজ সাহেব' (১৯০০), 'দেবলা' (১৯০১), 'অলোক সভা' (১৯০৪) এবং লালচাঁদ (১৯১২) এই চারখানি গ্রন্থ তিনি রচনা করেন। এগুলির মধ্যে 'দেবলা ' সর্বোৎকৃষ্ট। কাব্যকাহিনীর উৎস সম্বন্ধে তিনি গ্রন্থের 'মুখবন্ধে' বলেছেন, "মি. রমেশচন্দ্র দত্ত সি. আই. ই. মহোদয় প্রণীত ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, আলাউদ্দীন বাদশাহের রাজত্বকালের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে, গুজরাটের বাণী কমলা দেবী ও তদীয় দুহিতা দেবলা দেবীর মনোহর আখ্যান অবগত হই। ... ইহাতে ইতিহাসে উল্লিখিত প্রকৃত ঘটনাবলী যথাসাধ্য সন্নিবেশিত করিয়াছি, অনৈতিহাসিক অমূলক ঘটনা বিবৃতি করিবার চেষ্টা করি নাই।"[২৭৫] কাব্য লেখার পাঁচ বছর পর এটি মুদ্রিত হয়। কাব্যের সংশোধনে ও প্রকাশনায় শেখ আবদুর

২৭৩ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃঃ ৪১১-১৩; আবদুল কাদির-'মতীয়র রহমান খানেব সাহিত্য সাধনা', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৪

২৭৪ শেখ ওসমান আলীর 'দেবলা' কাব্যের 'মুখবন্ধে' কবির নামের পাশে 'চুয়াডাঙ্গা নদীয়া' ঠিকানা দেখে ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান অনুমান করেছেন যে, শেখ ওসমান আলী 'সম্ভবতঃ চুয়াডাঙ্গার বাসিন্দা' ছিলেন। (আধুনিক বাঙলা-সাহিত্য ও মুসলিম-সাধনা)। কিন্তু তথ্যটি ভুল। ওসমান আলী সরকারি চাকরী উপলক্ষে সেখানে অবস্থান করতেন (১৯০১)। বিষ্ণুপুর, বগুড়া, নারায়ণগঞ্জ (ঢাকা) প্রভৃতি স্থানেও তিনি বদলী হন।

২৭৫ (শেখ) ওসমান আলী— *দেবলা*, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০১, 'মুখবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

রহিম ও মোজাম্মেল হক তাঁকে সাহায্য করেন। উল্লেখযোগ্য যে, তের শতকের কবি আমীর খসরু ঐ বিষয় নিয়ে 'খিজির খান ও দেবলরাণী' নামে ফারসি কাব্য লেখেন। আমীর খসরুর কাব্য বিয়োগান্তক—খিজির খান ও দেবলাদেবীর প্রণয় কারাগারে বন্দীদশা ও উভয়ের মৃত্যু পর্যন্ত কাহিনী বিস্তৃত। ওসমান আলীর দেবলা কাব্য মিলনাত্মক—খিজির খান ও দেবলাদেবীর প্রণয় ও পরিণয় দেখিয়ে তিনি শেষ করেছেন। ঐতিহাসিক আখ্যানমূলক কাব্য রচনার উদ্দেশ্য স্বজাতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা। তখন মুসলমান সমাজের উন্মেষের কাল। সমাজের মানুষের কাছে আশার সঞ্চার করেই ওসমান আলী ইতিহাস ও ঐতিহ্যের গৌরবময় কাহিনী ও চরিত্র বর্ণনা করেছেন। সেযুগের শিক্ষিত নব্য যুবকদের ভাবানুভূতিকেই তিনি বাণীমূর্তি দিয়েছেন।

'মিহির ও সুধাকরে' দেবলার প্রথম সমালোচনা হয়। "ঐতিহাসিক কাব্য দেবলা পাঠ করিয়া আমরা পবম প্রীত হইয়াছি। ... গ্রন্থখানি ক্ষুদ্র হইলেও উহার রচনা-চাতুর্থে, ভাষার গাম্ভীর্য এবং শব্দবিন্যাসের মাধুর্য বাস্তবিকই অতুলনীয়। ... গ্রন্থকারের স্বভাববর্ণন পাঠ করিলে শত মুখে তাঁহার সর্ববিষয়িনী কল্পনার প্রশংসা করিতে হয়। এমন মনোমুগ্ধকর স্বভাবোক্তি তাঁহার তীক্ষ্ণধী এবং সুপার্জিত মস্তিষ্কের পরিচায়ক।"[২৭৬] দেবলার দ্বিতীয় সমালোচনা হয় 'নব্য ভারতে'। "বাঙ্গালার জনসংখ্যার প্রধানতঃ দুই অংশ—হিন্দু ও মুসলমান। এই দুই অঙ্গের সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইবে না। বড়ই সুখের বিষয়, শিক্ষিত মুসলমান বন্ধুগণ বাঙ্গালা ভাষাব অনুশীলনে মনোযোগী হইতেছেন। লেখকের বিশেষ শক্তির পরিচয় পাইলাম।"[২৭৭] দেবলার অপর সমালোচনা হয় 'সময়' পত্রিকায়। "এই কাব্যের রচনা অতি প্রাঞ্জল ও ওজোগুণ বিশিষ্ট। শিক্ষিত মুসলমান কেন, একজন হিন্দু বাঙ্গালীর পক্ষেও এরূপ রচনা প্রশংসনীয়। লেখা পাঠ করিয়া জানা গেল মৌলবী সাহেব বাঙ্গালা সাহিত্যে বিশেষ শিক্ষিত।"[৩৪]

তাঁর 'অলোক সভা' গীতিকাব্য। সকাল, দুপুর, বিকাল, সন্ধ্যা, রাত্রি এক এক প্রহরের প্রকৃতির দৃশ্যপট বর্ণনা করে প্রকৃতির পরিবর্তনশীল রহস্য এবং প্রকৃতির সহিত মানব-মনের সম্পর্ক সূত্র নির্ণয় করেছেন। তিনি কাব্যের 'পূর্বাভাষে' বলেছেন, "... আমার অজ্ঞাতসারে নিদ্রা ধীরে আসিয়া চক্ষু দুইটি মুদ্রিত করিয়া ফেলিল। অনন্তর আমি যাহা দর্শন করিলাম তাহা অপূর্ব ও অলৌকিক। এই ক্ষুদ্র পুস্তকে তাহারই কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছি।"[৩৫]

স্বপ্নাভিভুত আবেগানুরঞ্জনে রোমান্টিকতার বর্ণসম্পাত ঘটেছে এই কাব্যে। 'নবনূরে' অলোক সভার সমালোচনা হয়। পত্রিকায় লেখা হয়, "মৌলভী সাহেব (ওসমান আলী) গুরুভার রাজকার্য্যের বোঝা মাথায় লইয়াও সাহিত্যচর্চার অবসর পান, ইহা অত্যন্ত

২৭৬ *মিহির ও সুধাকর*, ২৯ কার্তিক ১৩০৮
২৭৭ *নব্য ভারত*, চৈত্র ১৩০৮
৩৪ 'অলোক সভা' থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত। পৃঃ (২)
৩৫ *অলোক সভা*, কালিকা প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৪, পৃ. (পূর্বাভাষ)

আনন্দ ও আশার কথা বটে। ... সমালোচ্য কাব্যের রচনা অতি প্রাঞ্জল। ইহার স্থানে স্থানে লেখকের শক্তিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।"[২৭৮]

শেখ ওসমান আলীর 'হাফেজ সাহেব' পারিবারিক উপন্যাস এবং 'লালচাঁদ' ঐতিহাসিক নাট্যকাব্য।

'ইসলাম-প্রচারক', 'হাফেজ', 'নবনূর', 'মিহির ও সুধাকর', 'কোহিনূর' প্রভৃতি সেযুগের প্রধান পত্রিকাগুলিতে তিনি নিয়মিত কবিতা ও প্রবন্ধ লিখতেন। সমকালীন সামাজিক ও রাজনৈতিক সমস্যার কথা তাঁর প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ছিল। তাঁর আলোচনা স্বচ্ছ ও যুক্তিপূর্ণ ছিল। একজন মননশীল লেখক হিসাবে তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কামনা করেছেন সত্য, কিন্তু মৌলিকভাবে স্বসমাজের স্বার্থকেই বড় করে দেখেছেন।

আবু মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী (১৮৭৪-১৯৫৪)

আবু মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী চট্টগ্রামের রাউজান থানার সুলতানপুর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মৌলবী উজির আলী। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা পাশ করে (১৮৯৪) শিক্ষকতা কাজে নিয়োজিত হন। তিনি এক সময় নোয়াখালী জেলা স্কুলে সহকারী শিক্ষক ছিলেন। তাঁর প্রথম কাব্য 'ভ্রাতৃবিলাপ' (১৯০৩)। ৩২ পৃষ্ঠার এই কাব্যে ভ্রাতার মৃত্যু জনিত শোক ও বেদনা প্রকাশিত হয়েছে। কাব্যের প্রেরণা ও উৎস সম্বন্ধে কবির নিজস্ব বক্তব্য : "কোন সংবাদপত্রে একটি প্রবন্ধ পাঠে জানিতে পারিয়াছি যে, কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে মনে আঘাত প্রাপ্তে বা হৃদয়ের অবস্থা পরিবর্তনে কোন কোন অতীত কবিবৃন্দের কবিত্বশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। ভ্রাতৃবিয়োগে আমারও কাব্যোচ্ছ্বাস। তাই মাতৃভাষার সেবা আমার দ্বারা কিছু হইতে পারে কিনা তাহার পরীক্ষার্থে ভ্রাতৃবিলাপ প্রকাশ।"[২৭৯] তিনি আরও বলেছেন, "মেঘনাদবধে'র কয়েকস্থলের মাধুর্য্যের লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া তাহা অনুকরণ করিয়াছি।"[২৮০] সুতরাং মধুসূদন ছিলেন তাঁর কাব্য-গুরু। ভ্রাতৃবিলাপ প্রকাশের পর পরই পত্রপত্রিকায় বিরূপ সমালোচনা হয়। 'নবনূরে'র আক্রমণ তীব্র ছিল। পত্রিকার ভাষায়, "এখানি কাব্য। মাহাকাব্য কিনা কোথাও লেখা নাই। ইহাতে ভূমিকা ও উৎসর্গপত্র আছে, খণ্ড ও সর্গ আছে। ইহাতে সমালোচকের প্রতি কটাক্ষ আছে, বাঙ্গালা ব্যাকরণের আদ্যশ্রাদ্ধ আছে, স্বর্গীয় মাইকেলের পিণ্ডের যোগাড় আছে। ... ইহাতে কান্না-কুসুম আছে, 'পাঠ্য-সখা' আছে, 'শুভক্ষণে জন্মা' আছে। 'অশ্রুবারি' যে ঢের আছে, তাহা বলাই বাহুল্য। ... এই গ্রন্থখানি পেডান্ট্রির একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। গ্রন্থকারের কতকটা শক্তি আছে কিন্তু তাহার অপব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। সাধনা ও সংযম অভ্যাস করিয়া তিনি দশের একজন হইতে পারিতেন।"[২৮১] 'বঙ্গবাসী'তে নিন্দা-

২৭৮ *নবনূর*, ভাদ্র ১৩১১
২৭৯ 'কাসেমবধ কব্যে'র ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
২৮০ ঐ, ভূমিকা।
২৮১ *নবনূর*, মাঘ ১৩১০

প্রশংসা দুই আছে। "ভ্রাতৃবিয়োগে গ্রন্থকারের এই কাব্যোচ্ছ্বাস। ইহাতে আমাদের সমবেদনা আছে। ... মুসলমান গ্রন্থকার বাঙ্গালা কাব্য লিখিয়াছেন, ইহাতে আমরা খুশী। কিন্তু তাঁহার 'কোলয়', 'পরিনিলে' প্রভৃতি ক্রিয়া প্রয়োগে আমরা খুশী হইতে পারি না।"[২৮২] 'ইসলাম-প্রচারক' কাব্যের ত্রুটির কথা বলেও কবির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদ প্রকাশ করে। "... যাহা হউক আমরা এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি পাঠ করিয়া সুখী হইয়াছি। গ্রন্থকারের ভ্রাতৃবৎসলতা প্রশংসনীয়। স্থানে স্থানে কবিত্বশক্তির বেশ পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক চেষ্টা করিলে কালে একজন সুকবি হইতে পারিবেন।" [২৮৩]

হামিদ আলীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'কাসেমবধ কাব্য' (১৯০৫) কাব্যখানি চট্টগ্রাম বিভাগের তৎকালীন 'স্কুলসমূহের ইনসপেক্টর' আবদুল করিম বিএ সাহেবের নামে উৎসর্গ করা হয়।[২৮৪] তিনি কাব্যের প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'ভূমিকা'য় লিখেছেন, "১৩১০ সালের ৪ঠা অগ্রহায়ণের 'মিহির ও সুধাকরে' বাবু দীনেশচন্দ্র সেনের 'মাতৃভাষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—মুসলমান হিন্দু সাহিত্যপাঠে—হিন্দু আচার-ব্যবহার শিক্ষায় ক্রমেই হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া পড়িবে ; তাই বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে উদাসীন থাকা মুসলমানদের উচিত নহে। ১৩১০ সালের (কার্তিক) 'ভারতী'তে মাননীয় সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মহোদয় 'মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা' নামক প্রবন্ধের সমালোচনায় কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিয়াছেন, 'মুসলমান গ্লানিপূর্ণ বলে আমরা আপন সাহিত্য বর্জন করিতে পারি না ... পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন সময়ে মুসলমান ছাত্রের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখার, মুসলমান গ্রন্থকারদিগকে উৎসাহ দেওয়ার সময় আসিয়াছে। ... প্রকৃতপক্ষে মহানুভব হিন্দুভ্রাতৃবর্গের এরূপ অভিপ্রায় নহে যে, মুসলমান পাঠক, মুসলমান বালক চিরকাল তাহাদের গ্লানিপূর্ণ পুস্তক পাঠে ব্যথিত হউক, আর মনে মনে গ্রন্থকারদিগের আত্মার প্রতি অভিসম্পাত করুক। তাই তাঁহারা আমাদিগকে স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়িতে পরামর্শ দিতেছেন। আমার এই কাব্য প্রকাশের অন্যতম উদ্দেশ্য, মুসলমান গ্রাজুয়েটদিগকে সাহিত্য ক্ষেত্রে আহ্বান-পুস্তক প্রণয়নের দিকে পথ প্রদর্শন ও সে বিষয়ে তাঁহাদের ঔদাসীন্যের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ। নতুবা আমার মত দীনের কাব্য প্রকাশ করা বিড়ম্বনা মাত্র।" [২৮৫]

'কাসেমবধ কাব্যে'র উৎস সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য : "রাম-রাবণের যুদ্ধের অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে যেমন 'মেঘনাদবধ' লিখিত, সেইরূপ এজিদ ও ইমামদিগের মধ্যে যে সকল যুদ্ধাদি হয়, তাহার অনেকগুলি ঘটনা হইতে একটি প্রধান ঘটনা অবলম্বনে এই কাব্য লিখিত। 'মেঘনাদবধ' ও 'বৃত্রসংহারে'র মত এই কাব্যের

---

২৮২ *বঙ্গবাসী*, ১৮ পৌষ ১৩১০

২৮৩ *ইসলাম-প্রচারক*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩

২৮৪ 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

২৮৫ আবুল মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী—*কাসেমবধ কাব্য বা শাহাদতে ইমাম কাসেম*, মেটকাফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১২, পৃঃ ৯-১০ (ভূমিকা)

উপকরণ পূর্ব হইতে সংগৃহীত ছিল না। মহররম-ঘটনা আরও অনেকে লিখিয়াছেন ; কিন্তু আমি স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করিয়াছি। কাব্য রসাস্বাদী সুধীমণ্ডলী ইহার কারণানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন। ইতিহাসের কোন ব্যতিক্রম হইয়াছে কিনা, বলিতে পারি না, কাব্যের পথ নিষ্কন্টক।"[২৮৬]

কারবালার মর্মন্তুদ কাহিনী নিয়ে মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' রচিত, হামিদ আলীর 'কাসেমবধ কাব্য'ও তাই। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আঙ্গিক তাঁর আদর্শ। তবে মধুসূদনের মত মনের গঠন, শিক্ষালব্ধ জ্ঞান, ভূয়োদর্শন, চিন্তাশক্তি হামিদ আলীর ছিল না। সুতরাং তাঁর রচনায় মহাকাব্যের শিল্পাস্বাদন প্রস্ফুটিত হয়নি। আবেগসর্বস্ব রচনায় মহাকাব্যের রসস্ফূর্তি ঘটে না। বিষাদ-করুণ একটি জনপ্রিয় কাহিনীকে নতুন আঙ্গিকে শিল্পরূপ দিয়েছেন, এটাই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব। 'ভ্রাতৃবিলাপে' ভাষার যে দুর্বলতা, এখানে তা অনেকখানি দূরীভূত হয়েছে, চরিত্রচিত্রণেও তাঁর কৃতিত্ব আছে। কোন কোন বর্ণনা মর্মস্পর্শী হয়েছে।

সমকালীন পত্রপত্রিকায় 'কাসেমবধ কাব্যে'র একাধিক সমালোচনা হয়। 'এডুকেশন গেজেট' কবির ভাষার প্রশংসা করে। "ভাষা সম্বন্ধে বিচার করিয়া পাঠকবর্গ দেখিবেন যে বঙ্গীয় মুসলমান কবি প্রকৃতই বাঙ্গালার সুসন্তান।"[২৮৭] 'নবনূর' বিভিন্ন দোষ-গুণের উল্লেখ করে শেষে মন্তব্য করে, "আমরা মুক্তকণ্ঠে এই কথা বলিতে পারি যে, যেখানে যেখানে তিনি সংযতভাবে ও বিনা উল্লম্ফনে স্বাধীনভাবে বিচরণ করিয়াছেন, সেখানেই তাঁহার সহজ বর্ণনা ও সুন্দর কবিত্বশক্তির বিকাশ পরিদৃষ্ট হইয়াছে।"[২৮৮] 'মিহির ও সুধাকরে' মোহাম্মদ মিন্নত আলী 'কাসেমবধ' সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি কাব্যের দোষগুণের উল্লেখ করে এক জায়গায় মন্তব্য করেন, "প্রাচীন কার্বালার সেই বীরত্বের করুণ রসপূর্ণ কাহিনী বঙ্গীয় মুসলমান কবি আজ বিশুদ্ধ বাঙ্গালায় অমিত্রাক্ষর ছন্দে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই পুস্তকখানি বাঙ্গালা ভাষায় অলঙ্কারস্বরূপ হইল, একথা দৃঢ়ভাবেই বলা যায়।"[২৮৯] চট্টগ্রামের 'জ্যোতিঃ' পত্রিকার বক্তব্য : "কাব্যখানি অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত ; গ্রন্থকার ভূমিকায় আভাস দিয়াছেন যে মোসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র সাহিত্য গড়া আবশ্যক। এইজন্য গ্রন্থাকারের চেষ্টা প্রশংসনীয়।"[২৯০] ইংরাজি সাপ্তাহিক 'মোসলেম ক্রনিকলে' দীর্ঘ সমালোচনা বের হয়। পত্রিকায় প্রশংসার ভাগই বেশী আছে।[২৯১] 'সোলতান' ও অনুরূপ প্রশংসা করে—" কবির বর্ণনা প্রণালী মোটের উপর বেশ হইয়াছে। ... তাঁহার যেরূপ কল্পনাও রচনা শক্তির আভাস পাওয়া যাইতেছে, তদ্দ্বারা আশা করা যায়, কবি কালক্রমে একজন সাহিত্য সমাজের বিশেষ সম্মানিত মেম্বর মধ্যে গণ্য হইবেন।" [২৯২]

২৮৬ *কাসেমবধ কাব্য*, পৃঃ ১৯০ (ভূমিকা)
২৮৭ *এডুকেশন গেজেট*, ৯ ভাদ্র ১৩১২
২৮৮ *নবনূর*, অগ্রহায়ণ ১৩১২
২৮৯ *মিহির ও সুধাকর*, ২০ মাঘ ১৩১২
২৯০ *জ্যোতিঃ*, ২৪ ফাল্গুন ১৩১২
২৯১ *দি মোসলেম ক্রনিকল*, ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ , 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য
২৯২ *সোলতান*, এপ্রিল ১৯০৬

কবিকে প্রদত্ত ব্যক্তিগত পত্রে (২০ নভেম্বর ১৯০৮) নবীনচন্দ্র সেন লিখেছেন, "আপনার রচিত কবিতাকুঞ্জ ও কাসেমবধ কাব্য আমি রোগশয্যায় পড়িয়া পরম প্রীতিলাভ করিলাম এবং আমাকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। বঙ্গভাষা উভয় হিন্দু-মুসলমানের মাতৃভাষা। অতএব কতিপয় মুসলমান ভ্রাতারা বঙ্গভাষার অনুশীলন করিয়া বঙ্গসাহিত্যের ও বঙ্গদেশের অশেষ উপকার করিতেছেন। সমস্ত দেশ তাঁহাদের কাছে ঋণী। তাঁহাদের এই নিঃস্বার্থ মাতৃভক্তি আমি অন্ধকার আকাশে শশাঙ্করেখার মত মনে করি। ... আপনার রচনা প্রাঞ্জল ও প্রাণস্পর্শী। নতুন লেখকের যেমন হইয়া থাকে, যদিও স্থানে স্থানে ছন্দপতনে ও শব্দবিন্যাসে কিঞ্চিৎ অসাবধানতা দৃষ্ট হয় তথাপি ভাষা সুন্দর ও সুমধুর। আশা করি, আপনি অনুশীলনের দ্বারা সময়ে বঙ্গদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি হইবেন।" [২৯৩]

'কবিতাকুঞ্জ' (১৯০৫) হামিদ আলীর তৃতীয় কাব্য। এটি খণ্ড কবিতার বই। 'প্রবাসী'তে এর সমালোচনা হয়। "বাঙ্গালী সর্বধর্ম নির্বিশেষেই বাঙ্গালী। হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, জৈন যিনি যে ধর্ম স্বীকার করুন না বাঙ্গালায় যাঁহার বাস, তিনি বাঙ্গালী, তাঁহার ভাষা বাঙ্গালা, তাঁহার স্বার্থ দেশের স্বার্থ এবং দেশের স্বার্থ তাঁহার স্বার্থ। এই সাধারণ সহজ সত্যটি আজকাল অনেকে উপলব্ধি করিতেছেন, ইহা দেশের পক্ষে, জাতির পক্ষে শুভ লক্ষণ। শ্রীযুক্ত মহম্মদ হামিদ আলী এইভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া এই কবিতাকুঞ্জ রচনা করিয়াছেন। তিনি হিন্দু বাল্যবিধবার দুঃখে গলদশ্রু, জাষ্টিস মুখার্জ্জির বিধবা কন্যার বিবাহকে বাঙ্গালী জাতির প্রকৃত উন্নতির সূত্রপাত জানিয়া আনন্দে উৎফুল্ল। ... হৃদয়ের দিক দিয়া দেখিলে এই কবিতাকুঞ্জ বড় সুন্দর ছায়াশীতল।"[২৯৪]

'জয়নালোদ্ধার কাব্য' (১৯০৭) ও 'সোহরাববধ কাব্য' (১৯০৯) দু'খানি জাতীয় আখ্যানমূলক কাব্য। এছাড়া তিনি ছোটদের পাঠোপযোগী 'নীতি ও বিজ্ঞান গাঁথা (১৯০৫) নামে একখানি 'কিণ্ডারগার্টের কবিতাবলী' এবং ইংরাজিতে 'ষ্টুডেন্টস্ হ্যাণ্ডবুক অব পারসিয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ' (১৯০৫) নামে দুখানি পুস্তক রচনা করেন।

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী (১৮৭৫-১৯৫০)

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী চট্টগ্রামের পটিয়া থানার আড়ালিয়া গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।[২৯৫] তাঁর পিতা মুনশী মতিউল্লাহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। তাঁর শিক্ষাজীবনের উপর আলোকপাত করে 'সওগাত' পত্রিকায় লেখা হয়, "তিনি (মনিরুজ্জমান) ১৮৮৮ সালে হুগলী সিনিয়র মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। মোল্লা স্বভাবসুলভ 'খতম', 'জিয়ারত' ও 'মৌলুদখানি' প্রভৃতি কার্য্যে বীতশ্রদ্ধ হইয়া তিনি

২৯৩ 'জয়নালোদ্ধার কাব্যে'র বিজ্ঞাপন থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত, পৃঃ ১-১০

২৯৪ *প্রবাসী*, আশ্বিন ১৩১৫

২৯৫ চট্টগ্রামের অপর নাম 'ইসলামাবাদ'। ইসলামাবাদের অধিবাসী দেখে তিনি নামের শেষে 'ইসলামাবাদী' ব্যবহার করতেন। সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ইসমাইল হোসেনও নামের শেষে 'সিরাজী' ব্যবহার করতেন। এরূপ 'জৌনপুরী' 'দেওবন্দী' প্রভৃতির ব্যবহার আছে

রেভিনিউ আইন অধ্যয়ন করত মোক্তারী আইন পড়িতে উদ্যত হইয়াই প্রথমতঃ মাতৃভাষা বাঙ্গালা শিখিতে শুরু করেন।"[২৯৬] মাদ্রাসায় শিক্ষাকালে তিনি আরবি, ফারসি ও উর্দুভাষা ভালভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। মিসরের 'আল সিনর', 'আল এহরাম' পত্রিকায় তাঁর আরবি প্রবন্ধ ছাপা হত। তিনি পরবর্তীকালে ইংরাজি ভাষাও আয়ত্ত করেন। তিনি টি. ডব্লিউ. আর্নল্ডের 'প্রিচিং অব ইসলাম'-এর অনুবাদ 'ভারতে ইসলাম প্রচার' প্রকাশ করেন।[২৯৭] মনিরুজ্জামান কুমেদপুর মাদ্রাসার হেড মৌলবী, রংপুর কারামতিয়া মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড মাদ্রাসার অধ্যক্ষ প্রভৃতি পদে চাকুরী করেন। পরে তিনি শিক্ষকতা ছেড়ে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। কুমেদপুর মাদ্রাসায় শিক্ষকতা কালে তিনি ধর্মপ্রচারে ব্রতী হন। 'মিহির ও সুধাকর' এক সংবাদে লেখে, "... আমাদের প্রিয় সুহৃদ কুমেদপুর মাদ্রাসার হেড মৌলভী বঙ্গীয় মুসলমানদিগের সুপরিচিত উৎসাহের জ্বলন্ত মূর্তি মাননীয় শ্রীযুক্ত মৌলভী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী সাহেব ধর্মপ্রচারে ব্রতী হইবার জন্য দৃঢ় সংকল্পারূঢ় হইয়াছেন।"[২৯৮] মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মির্জা ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন প্রমুখের সহিত তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল ; তাঁদের সকলেরই লক্ষ্য ছিল ইসলাম ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তার।

মনিরুজ্জমানের প্রথম গ্রন্থ 'তুরস্কের সুলতান' (১৯০১)। এর পরে 'ভারতে মুসলমান সভ্যতা' (১৯১৪), 'খাজা নেজামুদ্দীন আউলিয়া' (১৯১৬), 'ভারতে ইসলাম প্রচার', 'কনষ্টান্টিনোপল', 'খগোলশাস্ত্রে মুসলমান', 'ভূগোলশাস্ত্রে মুসলমান', 'আওরঙ্গজেব', 'মোসলেম বীরাঙ্গনা', 'ইসলামের উপদেশ', 'সুদ-সমস্যা', 'সমাজ-সংস্কার' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন। এগুলি বিংশ শতকে প্রকাশিত হয়। তবে মনিরুজ্জামানের মানসিক গঠনটি উনিশ শতকেই সম্পন্ন হয়েছিল ; এ পর্বে তিনি যেসব কর্মপন্থা অবলম্বন করেছিলেন, পরবর্তী অর্ধশতাব্দীকাল সেগুলিকেই পোষণ ও পূর্ণতা দান করেছেন। তিনি বাগ্মী, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক ও সমাজসেবক হিসাবে সুখ্যাতি অর্জন করেন।

দেশ দেশান্তরে ভ্রমি সমাজ সেবায়
রাজনীতি সমাজনীতি সাহিত্যচর্চায়
ধর্মপ্রচারের কাজে বিস্তারে শিক্ষায়
এসব কাজেতে মোর কেটেছে সময়।[২৯৯]

আত্মকর্মের হিসাব দিয়ে স্বয়ং মনিরুজ্জামানের এই উক্তি। এসব কর্মের ভেতর দিয়ে তাঁর পঁচাত্তর বছরের আয়ুষ্কাল অতিবাহিত হয়।

পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে মনিরুজ্জমানের সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত হয়। 'প্রচারক', 'ইসলাম-প্রচারক', 'নবনূর', 'আল-এসলাম' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁর ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা ও

২৯৬ *বার্ষিক সওগাত*, ১বর্ষ, ১৩৩৩
২৯৭ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃঃ ১২৪ (৩ নং)
২৯৮ *মিহির ও সুধাকর*, ৮ পৌষ ১৩০৬
২৯৯ *মওলানা ইসলামাবাদী স্মৃতিবার্ষিকী*, ঢাকা, ১৯৬৬

ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়। তিনি যুক্তিনিষ্ঠ ও স্পষ্টবাদী ছিলেন। তাঁর গদ্যভঙ্গি প্রাঞ্জল অথচ বলিষ্ঠ ছিল। ইসলামের আদর্শ প্রচার ও মর্যাদা বৃদ্ধি তাঁর জীবনের ব্রত ছিল সত্য, কিন্তু তিনি কখনও ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দেননি।[৩০০] তিনি বৈজ্ঞানিক যুক্তি ও ব্যাখ্যার উপর ইসলামের প্রতিষ্ঠা চেয়েছেন—'ইসলাম ও বিজ্ঞান' (প্রচারক, মাঘ ১৩০৭), 'ধর্ম ও বিজ্ঞান' (নবনূর, ভাদ্র ১৩১২) প্রভৃতি প্রবন্ধে তার প্রমাণ আছে। মনিরুজ্জমান হানাফী মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন, লা-মজহাবীদের প্রতি কঠোর বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন। 'প্রচারকে' (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬) তাঁকে 'লা-মজহাব-অরি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবি শিক্ষিত মৌলবীরা ধর্মপ্রচার অর্থোপার্জনের দিকে বেশী আগ্রহশীল ; নব্যশিক্ষিত ব্যক্তিরা সমাজ-উন্নতি অপেক্ষা আত্ম-উন্নতির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হন—'ইংরাজী ও আরবি শিক্ষার পরিণাম' প্রবন্ধে (ইসলাম-প্রচারক, মে ১৯০৫) তিনি উভয় শ্রেণীর বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ তুলেছেন।

'তুরস্কের সুলতান' পুস্তকে তুরস্কাধিপতি 'মহামান্য আবদুল হামিদ খানের পঞ্চবিংশতি বাৎসরিক রাজ্যশাসন বিষয়ক বিবরণী' সংকলিত হয়েছে। লেখক 'ভূমিকা'য় গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "ইউরোপের খৃষ্টীয়ান শক্তিসমূহের নিকট তুরস্ক এতকাল 'রুগ্ন' নামে অভিহিত হইয়াছিল ; কিন্তু ১৮৭৭ খ্রীঃ অব্দের রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ এবং ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধে তুর্কীজাতির অদ্ভুত বীরত্ব, অসাধারণ শৌর্যবীর্য ও রণপাণ্ডিত্য দর্শনে, ইউরোপীয়গণের সেই ভ্রম বিদূরিত হইয়াছে। ... প্রকৃতপক্ষে দেখিতে গেলে, বর্তমানে এই তুরস্কই মোসলেম জগতের একমাত্র আশা, ভরসা ও গৌরবের স্থল। তুরস্কের সহিত সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণের অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, যেহেতু তুরস্কের সম্রাট পবিত্র স্থান 'মক্কা মাআজ্জমা' ও 'মদিনা মনুওয়ারার' রক্ষক। তিনিই য়িহুদী, খ্রীষ্টান ও মুসলমানগণের তীর্থক্ষেত্র জেরুজালেম বা 'বয়তল মোকাদ্দসে'র তত্ত্বাবধায়ক। তাঁহার নামেই পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলমান 'খোতবা' পাঠ করিয়া থাকেন। তিনি সমগ্র পৃথিবীর মুসলমানগণের অধিনেতা। এইজন্যই তিনি 'আমিরুল মুমেনিন' ও 'খলিফাতুন মোসলেমিন' এই মহা সম্মানিত গৌরবান্বিত উপাধিতে বিভূষিত। ... এহেন সৌভাগ্যবান মহাপুরুষের অতুলনীয় উন্নতি ও অমানুষিক প্রতিভা সমন্বিত অদ্ভুত জীবনবৃত্তান্ত শুনিতে কাহার না হৃদয়ে উৎসাহ স্রোত প্রবাহিত হয়? ... বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতৃবৃন্দের কৌতূহল নিবারণ উদ্দেশ্যে এই অকিঞ্চন সমাজসেবক আপাততঃ তুরস্কের বর্তমান সম্রাট মহামান্য সুলতান দ্বিতীয় আবদুল হামিদ খানের সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশে কৃতসংকল্প হইল।"[৩০১] 'ইসলাম প্রচারকে' 'তুরস্কের সুলতানে'র সমালোচনা হয়। "এই পুস্তকে মৌলবী সাহেব (মনিরুজ্জমান) বর্তমান সুলতানল্ আজমের

---

৩০০ মওলানা সাহেব ছিলেন আলেম কিন্তু অন্ধবিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি ছিলেন যুক্তিবাদী জ্ঞানবিজ্ঞানের পক্ষপাতী। ... নানা অর্থকষ্টের মধ্যেও তিনি সাহিত্যসাধনা ও সমাজসেবা করে গিয়েছেন।" —ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, ঐ, পৃঃ ৬

৩০১ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী—*তুরস্কের সুলতান*, রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০১, পৃ০ (ভূমিকা)।

শাসনকালীয় সর্ববিষয়ক উন্নতির জ্বলন্ত চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা তুরস্কের শিক্ষা ও সামরিক উন্নতি, কৃষি ও বাণিজ্য বিষয়ক উন্নতি, রেল, টেলিগ্রাফ, ডাক, বনবিভাগ, খনিবিভাগ, পূর্তবিভাগ প্রভৃতি সর্ববিষয়ক উন্নতির বিষয় বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তদ্ব্যতীত সুলতান আজমের ধর্মপরায়ণতা, স্বজাতি বৎসলতা, স্বদেশহিতৈষণা, সরলতা, উদারতা, মহানুভবতা, রাজনীতিকুশলতা, দয়া ও সৌজন্য, বিলাস পরিশূন্যতা, আহার-বিহারে আড়ম্বরবিহীনতা, দূরদর্শিতা, সাহস, উদ্যম, কার্যকুশলতা প্রভৃতি যাবতীয় বিষয় প্রত্যক্ষভাবে দেখাইয়াছেন। পুস্তকের ভাষাও সরল ও সতেজ।"[৩০২] 'ভূতপূর্ব সুধাকর সম্পাদক, বর্তমান ইসলাম-প্রচারক সম্পাদক, মহম্মদীয় পঞ্জিকার সংগ্রাহক, গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ প্রভৃতি গ্রন্থ লেখক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত মুনশী মোহাম্মদ রেয়াজ উদ্দীন আহমদ 'গ্রন্থখানি 'আদ্যোপান্ত' সংশোধন করে দিয়েছেন বলে তিনি ভূমিকায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বিশ্বের মুসলমানের কাছে তুরস্কেব সুলতান 'খলিফা' বা ধর্মীয় নেতা হিসাবে পরিগণিত হতেন। প্যান-ইসলামী ভাবধারার প্রভাবে ভারতের মুসলমানদের চক্ষে তাঁর সম্মান সমুন্নত ছিল। ১৮৭৭ সালে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধের সময় আবদুল লতিফ সভা করে আহত সৈন্যদেব সেবা ও নিহত সৈন্যদের পরিবারের সাহায্যেব জন্য চাঁদা তুলেছিলেন।[৩০৩] তখন থেকে শুরু করে ১৯২১ সালে 'খেলাফত আন্দোলন' পর্যন্ত ভারতবর্ষের মুসলমানগণ তুরস্ক সম্পর্কে যথেষ্ট কৌতূহল পোষণ করেছেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদের 'গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ' (১৮৯৯), মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীর 'তুরস্কের সুলতান', সৈয়দ রওশন আলীর 'তুরস্ক বিগ্রহ' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনার মৌলিক প্রেরণা ছিল প্যান-ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ। দামেস্ক-হেজাজ রেলপথ নির্মাণের কাজ শুরু হলে (১৯০০) ঐ একই মনোভাবের বশবর্তী হয়ে মনিরুজ্জামান, রেয়াজুদ্দীন চাঁদা সংগ্রহের কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। হবীবুল্লাহ বাহার বলেছেন যে, মনিরুজ্জমানের উপর শিবলী নোমানীর (১৮৫৭-১৯১৪) বেশী প্রভাব পড়েছিল ; উভয়ে ইসলামের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের মধ্যে জাতীয় জাগরণের উৎস খুঁজেছিলেন।[৩০৪]

মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান 'সোলতান' (১৯০১), 'হাবলুন মতিন' (১৯১২) ও 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা'র সম্পাদক ছিলেন। সোলতানের প্রথম সম্পাদক ছিলেন রেয়াজুদ্দীন আহমদ, মনিরুজ্জামান পরে সম্পাদক হন। রেয়াজুদ্দীন আত্মজীবনীতে লিখেছেন, " ... তদনন্তর নূতন পলিসিতে (কংগ্রেসী মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া) মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান এসলামাবাদী সাহেবের সম্পাদকতায় চলিতে থাকে।"[৩০৫] হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে বিশ্বাসী মনিরুজ্জমান বরাবর কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। তিনি 'আইন অমান্য আন্দোলনে' (১৯১২) যোগদান করে কারাবরণ করেন। তিনি 'খেলাফত আন্দোলনে'ও (১৯২১) অংশ গ্রহণ করেন।

৩০২ *ইসলাম প্রচারক,* ভাদ্র আশ্বিন ১৩০৮
৩০৩ নবাব বাহাদুর আবদুল লতিফ : হিজ রাইটিংস্ এন্ড রিলেটেড ডকুমেন্টস, পৃঃ ১৮৫
৩০৪ *হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী,* পৃঃ ৪৬৬
৩০৫ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র,* পৃঃ ৫৭

তিনি 'কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়নে'র (১৮৯৩) 'মফস্বল সদস্য' ছিলেন। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' (১৯০৩) ও 'বঙ্গীয় মুসলমান ইসলাম মিশন' (১৯০৪) স্থাপনের ক্ষেত্রে যে কয়জন চিন্তাশীল ব্যক্তির উদ্যোগ ছিল, তাঁদের মধ্যে মনিরুজ্জমান ছিলেন প্রধান। শিক্ষা সমিতির প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ওয়াহেদ হোসেনের সাথে মনিরুজ্জমানের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করে 'মিহির ও সুধাকরে' লেখা হয়, "... অধঃপতিত, দারিদ্র্য-নিপীড়িত, কুসংস্কার বিজড়িত ভ্রাতৃগণের উন্নতির জন্য মৌলবী মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান সাহেব দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইতেছেন। এই শিক্ষা সমিতির উদ্দেশ্য জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিবার জন্য উপযুক্ত কর্মশীল ও সক্ষম যুবকের সাহায্য প্রার্থন্য করিয়া এখন পর্যন্ত উহা প্রাপ্ত হয়েন নাই।"[৩০৬] মনিরুজ্জমান 'মিহির ও সুধাকরে' এবং 'ইসলাম-প্রচারকে 'যথাক্রমে 'বঙ্গীয় মুসলমানগণের জাতীয় মহাসমিতি' ও 'ইসলাম ও মিশন' নামে দুটি সারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন। সমাজ উন্নতির কাজে 'যুক্ত-শক্তির' প্রয়োজন উপলব্ধি করেন তিনি এবং তদ-উদ্দেশ্যে 'জাতীয় মহাসমিতি' গঠনের পরামর্শ দেন। "বলিতে গেলে এখন না আছে আমাদের জাতীয় স্কুল কলেজ, না আছে আমাদের ব্যবসা বাণিজ্যের কোম্পানি, না আছে সমাজের দুর্দশা নিবারণ সভাসমিতি, না আছে আমাদের সংবাদপত্রিকা এবং সুলেখক ও সুকবি, আর না আছে অর্থ সম্বল, না আছে রাজদরবারে অধিকার। ... এসো ভাই। যুক্তশক্তি দ্বারা সমাজের জীবন রক্ষা করিতে আত্ম বলিদান করি। ঐ এসো। জাতীয় মহাসমিতি স্থাপনপূর্বক শিক্ষা বিস্তার, যৌথ বাণিজ্য কারবার, সমাজের দোষ সংস্কার, উন্নত স্থান পুনঃঅধিকার কবার প্রতি ধাবিত হই।"[৩০৭] রাজভাষা শিক্ষা, মাতৃভাষা চর্চা, অর্থকরী বিদ্যা অর্জন ইত্যাদি বিষয় সমাজের উন্নতির জন্য আবশ্যক জেনেও লেখক বলেছেন যে, 'মিশন' বা প্রচারনীতির দ্বারাই সর্বাত্মক ফল পাওয়া যায়। তাঁর ধারণা : "সমাজের উন্নতি সাধন করিতে হইলে, সর্বপ্রথম সমাজে যে সকল উন্নতির প্রতিবন্ধকতা মূলক দোষ সমাজে প্রবেশ করিয়াছে, ঐ সকলই দূরীভূত এবং সমাজদেহ হইতে সেই সকলকে বিতাড়িত করিতে হইবে। সমাজের কুসংস্কার দূরীভূত করা, কুরীতিনীতি ও অন্যায় প্রথাপদ্ধতির বিনাশ সাধন ইত্যাদি কার্যাবলী নির্বাহ করার গুরুতর ভার গ্রহণ করিবে কে? ... অমাদের বিবেচনায় 'মিশন' শব্দ ব্যতীত এই সকল প্রশ্নে আর কোন উন্নতির উপযুক্ত উত্তর নাই।[৩০৮] এর পর তিনি ইসলাম মিশনের গঠন পদ্ধতি ও কর্ম পদ্ধতির পরিকল্পনা লিপিবদ্ধ করেছেন। মনিরুজ্জমানের প্রবন্ধ দুটি সমাজে বুদ্ধিজীবী মহলে আলোড়ন তুলেছিল। ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী পত্রিকায় পত্র লিখে মনিরুজ্জামানের প্রস্তাব সমর্থন করেন।[৩০৯] পরবর্তীকালে শিক্ষা সমিতি ও ইসলাম মিশন গঠিত হলে তাঁরই চিন্তাধারা ও প্রস্তাবাদি

৩০৬ *মিহির ও সুধাকর*, ১ শ্রাবণ ১৩১০

৩০৭ ঐ, ৫ অগ্রাহায়ণ ১৩০১

৩০৮ *ইসলাম প্রচারক*, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১১

৩০৯ আবদুল কাদির—'নওশের আলি খাঁ ইউসফজয়ী', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭

অধিকাংশ গৃহীত হয়। তিনি উভয় প্রতিষ্ঠানের কার্যনির্বাহক কমিটির প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য হন। তিনি কলিকাতার 'আঞ্জুমনে ওলামায়ে বাঙ্গালা', 'খাদেমুনল ইসলাম সমিতি' প্রভৃতি ধর্মীয়-সামাজিক সংগঠনের সহিত যুক্ত ছিলেন।[৩১০]

সৈয়দ এমদাদ আলী (১৮৭৬-১৯৫৬)

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের দামপাড়া গ্রাম সৈয়দ এমদাদ আলীর পৈতৃক নিবাস। পিতার নাম সৈয়দ নাজিমউদ্দীন। তিনি মুন্সীগঞ্জে মাতুল আফতাবউদ্দীন আহমদের (মোক্তার, কায়কোবাদের ভগ্নীপতি) আশ্রয়ে থেকে লেখাপড়া করেন। তিনি মুন্সীগঞ্জ হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন (১৮৯৫) এবং ঢাকা কলেজে এফএ পর্যন্ত পড়াশুনা করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে পারেননি। ১৯০০ সালে নেত্রকোণা দত্ত হাই স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন। ১৯০৪ সালে পুলিশ সব-ইনস্পেক্টর হন, পরে সি. আই. ডি. ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হন। তিনি সরকার কর্তৃক 'খান সাহেব' উপাধি পান।

ছাত্রাবস্থায় এমদাদ আলীর সাহিত্যানুরাগ জন্মেছিল। 'সুধাকরে' (১৮৯৪) 'চাঁদবিবি' নামে একটি সনেট প্রকাশিত হয়। 'কোহিনূরে' (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) 'যুবরাজ মুহম্মদ আজমের প্রতি আয়েষা' ও 'ইসলাম-প্রচারকে' (মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩) 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব' প্রবন্ধ ছাপা হয়। শেষোক্ত প্রবন্ধ লিখে তিনি সুধীসমাজে পরিচিত হয় ওঠেন। কলিকাতার 'ইসলামিয়া আর্ট প্রেসে'র মালিক মোহাম্মদ আসাদ আলী এমদাদ আলীর লেখায় মৌলিক চিন্তার ছাপ দেখে তাঁকে 'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করেন।[৩১১] 'নবনূর'-এ প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় এমদাদ আলী ঘোষণা করেন, "ভারতবর্ষের অদৃষ্ট ফলকে হিন্দু-মুসলমানের সুখদুঃখ এখন একই বর্ণে চিত্রিত ; বিজয়দৃপ্ত মুসলমান এখন হিন্দুর ন্যায়ই বিজিত। এই দুই মহাজাতির সম্মিলনের উপরেই ভারতের শুভাশুভ নির্ভর করে। সাহিত্যই এই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র।"[৩১২]

'নবনূর'-এর পৌনে চার বছরের আয়ুতে অনেক সংখ্যায় সৈয়দ এমদাদ আলীর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ মুদ্রিত হয়েছে। মুসলমান যুবক ও হিন্দু যুবতীর প্রণয় দেখিয়ে 'বিমলা' নামে একটি ছোট গল্প 'নবনূরে' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০) প্রকাশ করেন। গল্পটি নিয়ে বাদানুবাদ হয়। সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলার প্রতি অবমাননা করা হয়েছে এরূপ অভিযোগ করে দীনেশচন্দ্র সেন 'মিহির ও সুধাকরে' (৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০) একটি পত্রে আপত্তি করেছিলেন। 'নবনূরে'-এর আকর্ষণীয় বিষয় ছিল সম্পাদককৃত পুস্তকের ও মাসিকপত্রের সমালোচনা। তিনি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই খড়গহস্ত ছিলেন। বিশেষত সমাজ ও ধর্মের স্বার্থে তাঁর একটি ঈগলচক্ষু ছিল। এমদাদ আলীর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ডালি' (১৯১২)। ডালির ভূমিকায় তিনি বলেছেন যে, 'ইসলামী জাতীয়তা' তাঁর কবিতার মূল সুর। তিনি লিখেছেন,

---

৩১০ *বার্ষিক সওগাত*, ১ বর্ষ, ১৩৩৩

৩১১ দেওয়ান আবদুল হামিদ—'কবি সৈয়দ এমদাদ আলী', *লেখক সংঘ পত্রিকা*, (ঢাকা, জৈষ্ঠ ১৩৬৮

৩১২ *নবনূর*, বৈশাখ ১৩১০

"তরুণ বয়সে যে সুরটি আমাকে আচ্ছন্ন অভিভূত করিয়াছিল,আমার নগণ্য শক্তি দ্বারা ডালিতে তাহাই প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি। ... জাতীয় জীবনের সংস্কৃতি বৃদ্ধির জন্য যে কবির রচনা সমৃদ্ধ নয়, তাঁহার রচনার মূল্য দিতে আমি পূর্বে যেরূপ নারাজ ছিলাম, এখনও তাই আমার মতের কোন পরিবর্তন হয় নাই।"[৩১৩] বস্তুত তাঁর রচনা ও সমালোচনা এই জাতীয় চেতনার ফল। 'প্রাদেশিকতা বর্জিত' এই ইসলামী জাতীয়তা প্যান-ইসলামী বা 'নিখিল মুসলিম ভাবনা'কেই দ্যোতিত কবে। তিনি 'তাপসী রাবেয়া' (১৯১৭) 'সাহিত্যকুসুম' (১৯১৯), 'হাফেজা' (১৯২৯) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর 'সেকেন্দ্রা' (প্রবাসী, ১৯০০) কবিতাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশনে বাংলা পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত হয়েছিল।[৩১৪]

সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিরাজী (১৮৮০-১৯৩১)

সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিবাজী পাবনার সিরাজগঞ্জ শহরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা সৈয়দ আবদুল করিম হেকিম বা ইউনানী চিকিৎসক ছিলেন। ইসমাইল হোসেন জ্ঞানদায়িনী মধ্য ইংরাজী বিদ্যালয থেকে ছাত্রবৃত্তি পাশ করে সিবাজগঞ্জ বনোয়াবীলাল উচ্চ বিদ্যালয়ে নবমশ্রেণী পর্যন্ত পড়েছিলেন। তাবপর তাঁব পাঠাভ্যাসে ছেদ পড়ে। ছাত্রাবস্থায় তিনি রেয়াজুদ্দীন মাশহাদীব 'সমাজ ও সংস্কারক' গ্রন্থ পড়ে জামালউদ্দীন আফগানীর স্বাধীনচিত্ততা ও গণতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। তিনি ১৮৯৫ সালে তুরস্কে যাওয়ার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু অর্থাভাবে তাঁর সে চেষ্টা ব্যর্থ হয়। জামালউদ্দীন আফগানী ও তুরস্ক তাঁর বালকচিত্তে একটা স্থায়ী রেখাঙ্কন মুদ্রিত করেছিল। ইসমাইল হোসেন শেষ পর্যন্ত তুবস্কে গিয়েছিলেন ; ১৯১২ সালে বলকান যুদ্ধের সময় তুর্কীর আহত সৈন্যদের সেবা করার জন্য ডাক্তার মোখতার আহমদ আনসারীর নেতৃত্বে গঠিত 'ইণ্ডিয়ান রেড ক্রিসেন্টে'ব অধীনে 'অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল মিশন' প্রেরিত হয়, ইসমাইল হোসেন সে-মিশনে বাংলার প্রতিনিধি ছিলেন। তুরস্কের সুলতানের কাছ থেকে 'গাজী' উপাধি নিয়ে পরের বছর তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন। ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বাল্যের স্বপ্ন ও যৌবনের অভিজ্ঞতা তাঁব সাহিত্যজীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছিল। বিশেষত তাঁর সাহিত্যকর্মের প্রধান যে সুর মুসলিম জাতীয়তাবাদ ও নিখিল মুসলিম ভাবনা—তাঁর বীজ এখানেই নিহিত।

বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় ইসমাইল হোসেনের সাহিত্যপ্রতিভা ও বাগ্মিতাবৃত্তি মুকুলিত হয়েছিল। জ্ঞানদায়িনী স্কুলে বচনা-প্রতিযোগিতা ও বিতর্কে কৃতিত্বের পরিচয় দেন। স্বসমাজের স্বার্থের অথবা আদর্শের বিরুদ্ধে যখন কোন আঘাত এসেছে, ইসমাইল হোসেন তার প্রতিবাদ করেছেন। সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত ব্রাহ্মদের এক সভায় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন কোরানকে শেষ গ্রন্থ ও মহাম্মদকে শেষ নবী বলতে চাননি ; তিনি শ্রীচৈতন্য, নানক,

৩১৩ সৈযদ আলী আহসান (সম্পাদিত)— *ডালি*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮

৩১৪ *পূর্বোক্ত*, *লেখক সংঘ পত্রিকা*, জৈষ্ঠ ১৩৬৮

কবীর, মার্টিন লুথার, রামমোহন রায়কে প্রেরিত পুরুষ বলে উল্লেখ করেন। সিরাজী গিরিশ সেনের এই মতের বিরোধিতা করে প্রকাশ্যে বক্তৃতা দেন। অনুরূপভাবে বনোয়ারীলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সহযোগিতায় ও 'গো-রক্ষিনী সমিতি'র উদ্যোগে আয়োজিত সভায় পণ্ডিত যাদবচন্দ্র তালুকদার গো-হত্যার বিরোধিতা করে বক্তৃতা দিলে ইসমাইল হোসেন হিন্দু শাস্ত্র হতে যুক্তি-প্রমাণ উদ্ধৃত করে বলেন যে, পূর্বকালে আর্যরা গো-হত্যা সমর্থন করতেন।[৩১৫] তাঁর মত একজন তরুণের পক্ষে এসব প্রতিবাদ খুব দুঃসাহসের পরিচায়ক ছিল। বনোয়ারীলাল উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্যোগে একটি সাধারণ জনসভা হয় ; মুনশী মেহেরুল্লাহ ছিলেন বক্তা : ইসমাইল হোসেন সিরাজী সভায় 'অনল-প্রবাহ' কবিতা পাঠ করেন। কবিতাটি স্বদেশানুরাগিতা ও ইসলামী ঐতিহ্যপ্রীতি নিয়ে রচিত। মেহেরুল্লা ইসলামী ভাবে মুগ্ধ হয়ে নিজ ব্যয়ে 'অনল-প্রবাহ' কবিতাটি পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেন (১৮৯৯)। ইসমাইল হোসেন পরের বছর অনল-প্রবাহ, তূর্যধ্বনি, মূর্চ্ছনা, বীরপূজা, অভিভাষণ; ছাত্রগণের প্রতি, মরক্কো সংকটে, আমীর আগমনে, দীপনা ও আমীর অভ্যর্থনা এই ৯টি কবিতা নিয়ে 'অনল-প্রবাহ' বর্ধিত আকারে প্রকাশ করেন। স্বজাতির অধঃপতন ও পরাধীনতার জন্য তীব্র ক্ষোভ ও আক্ষেপ প্রকাশ করে জাতীয় মুক্তি ও উন্নতি সাধনের উদাত্ত আহ্বান ধ্বনি 'অনল-প্রবাহে'র প্রায় প্রতি কবিতায় ব্যক্ত হয়েছে। 'ইসলাম-প্রচারকে' কাব্যখানির সমালোচনা হয়। "... কবিতাগুলি মহাওজস্বিনী ভাষায় লিখিত। মুসলমানদের অতীত গৌরব-কাহিনী জ্বলন্ত ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। কবিতাগুলি বড়ই লালিত্যময়ী, পাঠ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।"[৩১৬] 'ইসলাম-প্রচারকে'র সমালোচক মুগ্ধ' হলেও সরকার কিন্তু সন্তুষ্ট হননি। ১৯০৮ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে সরকার তা বাজেয়াপ্ত করেন ; কবিকেও দু'বছরের জন্য কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। 'অনল-প্রবাহে'র উৎসর্গ-পত্রে নব্যযুবকদের উদ্দেশ্য করে ইসমাইল হোসেন বলেছেন,

> ইসলামের গৌরবের বিজয়-কেতন
> হে মোর আশার দীপ নব্যযুবগণ
> জাগাতে অতীত স্মৃতি
> জাগাতে জাতীয় প্রীতি
> অনলপ্রবাহ খানি করিয়া রচন;
> বহু আশে বহু সাধে
> দিনু তোমাদের হাতে
> হউক অনলময় অলস জীবন।[৩১৭]

৩১৫ মোহাম্মদ সেরাজুল হক— *সিরাজী-চরিত* , হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স, কলিকাতা, ১৯৩৫, পৃ. ৩০-৩৩
৩১৬ *ইসলাম-প্রচারক*, বৈশাখ ১৩০৭
৩১৭ সৈয়দ আবুল মোহাম্মদ এসমাইল হোসেন সিরাজী— *অনল-প্রবাহ* , 'উৎসর্গ-পত্র' দ্রষ্টব্য।

'মহাশিক্ষা' (১৮৯৮–১৯১০) নামে কারবালার কাহিনী অবলম্বনে তিনি একখানি মহাকাব্য রচনা করেছেন। গ্রন্থখানি তাঁর জীবিতাবস্থায় মুদ্রিত হয়নি।[৩১৮] 'ইসলাম-প্রচারকে' (১৯০৪–১৯০৫) 'মহাশিক্ষা'র তিন সর্গ পর্যন্ত প্রকাশিত হয়। 'অনল-প্রবাহে'র বাজেয়াপ্তের সময় কবিকে গ্রেপ্তার করার পরোয়ানা জারি করা হয়। তিনি ফরাসি-শাসিত চন্দননগরে আত্মগোপন করে 'মহাশিক্ষা' রচনা করেন এবং পরে কলিকাতায় ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।[৩১৯] 'এমাম-শহীদ খণ্ড' ও 'এজিদ-বধ খণ্ড' নামে দুই খণ্ডে মোট ৩৬টি সর্গে কাব্যখানি সমাপ্ত হয়েছে। খণ্ড কবিতা রচনা করেই তাঁর কাব্যজগতে আবির্ভাব, তবে খণ্ডকবিতা অপেক্ষা মহাকাব্য রচনার প্রতি তাঁর মোহ ও আকর্ষণ ছিল। তাঁর মতে, "সঙ্গীত গাথা ও কবিতা বসন্তের ফুলের ন্যায়, উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। ... মহাকাব্য হিমাচলেব মত জিনিস, যতদিন মানব-সমাজ থাকিবে, ততদিন উহাও থাকিবে।"[৩২০] তিনি কাহিনী ও ভাবের ক্ষেত্রে মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ সিন্ধু' দ্বারাই বেশি প্রভাবিত হন।

ইসমাইল হোসেন সিরাজীর পরবর্তী কাব্য 'উচ্ছ্বাস' (১৯০৭), 'উদ্বোধন' (ঐ) একই ভাবধারা নিয়ে রচিত—তিনি ইসলামের গৌরবময় কাহিনী বর্ণনা করে ভারতীয় মুসলমানদের নব জাগরণ মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করতে চেযেছেন। তুরস্কের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত হয়েছে 'তুরস্ক ভ্রমণ' (১৯১৩) 'তুর্কী-নারীশিক্ষা' (ঐ) প্রভৃতি গদ্য পুস্তক। এর পর তিনি 'স্পেন-বিজয়' (১৯১৪), 'সঙ্গীত সঞ্জীবনী' (১৯১৬), 'প্রেমাঞ্জলি' (১৯১৬) প্রভৃতি কাব্য এবং 'রায়-নন্দিনী' (১৯১৫), 'তারাবাঈ', 'নূর-উদ্দীন' (১৯২৩) প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করেন। তিনি এসব রচনায় প্রধানত ইসলামী ভাববৃত্তেই বিচরণ করেছেন। উপন্যাসের শিল্পরীতিতে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসরণ করেছেন, কিন্তু ভাবের ক্ষেত্রে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করেছেন।

প্রচারক, ইসলাম-প্রচারক, কোহিনূর, নবনূর, সোলতান প্রভৃতি সাময়িকপত্রে তাঁর প্রবন্ধ ও কবিতা ছাপা হয়েছে। 'ইসলাম-প্রচারকে'র তিনি নিয়মিত লেখক ছিলেন। বাংলার মুসলমান হীনমন্যতায় ভুগছে; অতীতের বীর্যবত্তা ও জ্ঞানবত্তার বাণী প্রচার করে এই নির্জীব জাতির মধ্যে অত্মমর্যাদা ও জাতীয় গরিমা সঞ্চার করতে হবে। 'আত্মশক্তি ও প্রতিষ্ঠা' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন, "উন্নত জাতি অধঃপতিত হইলে একমাত্র প্রাচীন গৌরব কথাই তাহাদিগের কর্ণে অমৃতবাণী উচ্চারণ করে। আজ আমরা বঙ্গের মুসলমান, যদি পূর্বপুরুষদিগের শক্তি-সাধনা ও প্রতিষ্ঠার বিষয় অবগত থাকিতাম তাহা হইলে বোধ হয় আমাদের দুঃখ দুর্দশা-দীনতার দাসত্ব-শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া যাইত।"[৩২১] সমাজের উন্নতি ও

৩১৮ *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা*, পৃঃ ৪১২ (২ সং)
৩১৯ আবদুল কাদির (সম্পাদিত)—*শিরাজী রচনাবলী* (উপন্যাস খণ্ড), কেন্দ্রীয় বাংলা-উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭৬, পৃঃ ৪২২
৩২০ ইসমাইল হোসেন সিরাজী—'মহাকবি কায়কোবাদ', *মাসিক মোহাম্মদী*, শ্রাবণ ১৩২৬
৩২১. *ইসলাম-প্রচারক*, মে-জুন, ১৯০৪

প্রতিষ্ঠা লাভের উপায় আত্মশক্তি ও আত্মনির্ভরতা, ইসমাইল হোসেন সিরাজী সেকথাও জোর দিয়ে বলেছেন। আবেদন-নিবেদন তথা যাচ্ঞাবৃত্তি দ্বারা কার্যোদ্ধার হয় না ; প্রকৃত মুক্তির পথ শ্রম ও সংগ্রাম – যোগ্যের প্রতিষ্ঠা, অযোগ্যের পতন, এ-নীতিতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁর ভাষায়, "তাই বলি, বঙ্গের মুসলমানগণ! আলস্য, ঔদাস্য, অদৃষ্টবাদ, রাজার আশা, পরের আশা পরিত্যাগ করিয়া আত্মবলে আত্মশক্তিতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সচেষ্ট হও। প্রার্থনা, ক্রন্দন,অশ্রুজলে কার্যোদ্ধার হইবে না শক্তিবলে কার্যোদ্ধার করিতে প্রবৃত্ত হও। ... সমাজে শক্তির বিস্ফূরণ কর। শক্তিবলে যোগ্যতা ও উপযুক্ততা লাভ কর। বিশ্বসংসারে সর্বদা যোগ্যের পূজা, উপযুক্তের আদর, শক্তিশালীর প্রতিষ্ঠা।"[৩২২] উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল লতিফ আমীর আলী প্রমুখের আবেদন-নিবেদনের নীতির স্পষ্টতঃ বিরোধিতা করেছেন তিনি, তাঁর উক্তির মধ্যে বলপ্রয়োগের নীতি আভাষিত হয়েছে। স্বসমাজের সমালোচনায় তিনি ছিলেন নির্ভীক ও অকপট। 'মোল্লাচিত্র' কবিতায় 'কাট-মোল্লা' শ্রেণীকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করেছেন। সেই সঙ্গে যে মাদ্রাসা-শিক্ষা এ শ্রেণীর মোল্লার জন্ম দেয়, সে-শিক্ষা পদ্ধতিরও সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "যে পর্যন্ত মাদ্রাসাসমূহের সংস্কার এবং মাদ্রাসায় ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান, হাদিস এবং তফসীর পাঠের উপযুক্ত ব্যবস্থা না হইবে, সে পর্যন্ত মাদ্রাসা দ্বারা অদ্ভুতজ্ঞান বিশিষ্ট 'কাটমোল্লা' ব্যতীত প্রকৃত আলেম প্রস্তুত হইবার কোনই আশা নাই। মাদ্রাসা পাশকারী যে দুই একজন মহাত্মাকে আলেমরূপে দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, তাঁহারা স্বাধীনভাবে জ্ঞানালোচনা করিয়া বাঙ্গালা বা ইংরাজীর সাহায্যে প্রকৃত আলেমপদের উন্নীত হইয়াছেন। নতুবা মাদ্রাসার শিক্ষায় তাঁহাদিগকে আলেম করে নাই।"[৩২৩]

ইসমাইল হোসেন 'নূর' (১৯১৯) নামে একটি মাসিকপত্রের সম্পাদনা করেন। তিনি সোলতান (নবপর্যায়) ১৯২৩ পত্রিকারও সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। একজন সুবক্তা হিসাবে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর সুনাম ছিল। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'র সাথে তিনি যুক্ত ছিলেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি কংগ্রেসের সমর্থক ছিলেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সপক্ষে তিনি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করে তিনি দ্বিতীয় বার কারাবরণ করেছিলেন।[৩২৪] 'অনল-প্রবাহে'র প্রকাশকাল ও নজরুল ইসলামের জন্মকাল একই বছর ; নজরুল ইসলাম যখন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন তখন ইসমাইল হোসেন সিরাজীর বয়স ৪০ বছর। সিরাজীর সাহিত্য সাধনা নজরুলের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। স্বজাতিপ্রীতি, স্বদেশপ্রেম, স্বাধীনতা চিন্তা প্রভৃতি ভাব রচনায় উভয়ে সমধর্মী ছিলেন। অকপট প্রকাশের দুরন্ত সাহসের জন্য তাঁরা উভয়ে কারাবরণ করেন। নজরুল ইসলাম অনল-প্রবাহের প্রভাব

৩২২ ঐ।
৩২৩ *ইসলাম-প্রচারক*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩
৩২৪ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃঃ ৪০২

স্বীকার করে বলেছেন, "সিরাজী ছিলেন আমার পিতৃতুল্য।... তাঁহার সমগ্র জীবনই ছিল 'অনল-প্রবাহ'। আমার রচনায় সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গের প্রকাশ।" [৩২৫]

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২)

বাংলার মুসলমান সমাজে নারীমুক্তির অগ্রদূতী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রংপুরের পায়রাবন্দের জমিদার সাবের পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী করিমুন্নেসা খানম চৌধুরানী তাঁর জ্যৈষ্ঠা ভগ্নী। সাবের পরিবারের মৌখিক ভাষা ছিল উর্দু। দুই ভ্রাতা আবু ইব্রাহিম সাবের ও আবু আসাদ খলীল সাবের উচ্চ ইংরাজি শিক্ষা পান, কিন্তু নারীশিক্ষার প্রচলন না থাকায় করিমন্নেসা খানম ও রোকেয়া খানম আধুনিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁরা নিজ চেষ্টায় ইংরাজি ও বাংলা শিখেছিলেন। রক্ষণশীল পরিবারে পর্দাপ্রথার কড়াকড়ি নিয়ম ছিল। ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বিলাত-ফেরত উর্দু ভাষী সাখাওয়াত হোসেনের সাথে রোকেয়া খানমের বিবাহ হয় (১৮৯৬)। ৯ বছর পর স্বামীর মৃত্যু হলে তাঁর সঞ্চিত অর্থের একাংশ দিয়ে তিনি কলিকাতায় সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল(১৯১১) স্থাপন করেন। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন নিঃসন্তান ছিলেন। স্কুলকে জীবনের সর্বস্ব করে নারীশিক্ষা ও নারীস্বাধীনতার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯১৬ সালে কলিকাতায় 'আঞ্জুমন খাওয়াতীনে ইসলাম' নামে একটি মহিলা সমিতি স্থাপন করেন। উদ্দেশ্য একই—মুসলিম মহিলা, সমাজের দুঃখদুর্দশা ও বন্ধনদশা দূর করা। পুরুষের বহুবিবাহ ও তালাক-প্রথার প্রচলন থাকায় নারীকে লাঞ্ছনা ভোগ করতে হয় ; সমাজে নারীব্যক্তিত্ব ও মর্যাদা প্রকৃতপক্ষে ছিল না। পুরুষগণ অবরোধপ্রথার প্রাচীর তুলে নারীকে অন্ধকার গুহায় আবদ্ধ করে রেখেছেন। অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকার জন্য তাঁদের পরনির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। নারীর এসব দুর্গতির কথা ভেবেই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একাধারে স্কুল-সমিতি স্থাপন করেছেন, অন্যধারে বই-পুস্তক রচনা করেছেন। এর কোনটাই নিষ্কণ্টক ছিল না ; রক্ষণশীল সমাজ বিরুদ্ধাচরণ করেছে, কিন্তু রোকেয়া দমবার পাত্রী নন। তাঁর সংবেদনশীল হৃদয়ে মূঢ় মূক বন্দিনী নারীর জন্য যে আর্তি জেগেছিল, তা কৃত্রিম ছিল না ; তিনি সমাজের রক্তচক্ষুর ভয়ে যাত্রাভঙ্গ করেননি বরং ব্যক্তিসুখ বিসর্জন দিয়ে এবং নিন্দা, অপযশ, কলঙ্কের ভাগী হয়ে তিনি আজীবন সমাজের সেবা করে গেছেন।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গ্রন্থকারে মুদ্রিত প্রথম পুস্তক 'মতিচুর', (১ খণ্ড, ১৯০৪)। এর অধিকাংশ প্রবন্ধ সেকালের পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধের কোন কোন বিষয় নিয়ে বাদ-বিতণ্ডাও হয়েছিল। নারীমুক্তি ও নারী জাগরণের আহ্বান জানিয়ে 'আমাদের অবনতি' প্রবন্ধে লেখিকা বলেন, "প্রথমে জাগিয়া উঠা সহজ নহে, ... ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য 'কখন'-এর বিধান দিবেন এবং হিন্দু চিতানল বা

৩২৫ ইসমাইল হোসেন সিরাজীর 'স্বজাতি প্রেম' (কলিকাতা, ১৯৪৬, পৃঃ ৫) কাব্য থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত।

তুষানলেব ব্যবস্থা দিবেন। ... কিন্তু সমাজের কল্যাণের নিমিত্ত জাগিতেই হইবে।"[৩২৬] নওশের অলী খান ইউসফজয়ী এর প্রতিবাদে 'একেই কি বলে অবনতি?' প্রবন্ধে বলেন, "... অলঙ্কারগুলি যেন ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, কিন্তু পোষাকগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিয়া বিবসনা না সাজিলে কি প্রকৃত উন্নতি হইতে পারিবে না?"[৩২৭] 'কোহিনূর' পত্রিকায় জনৈকা লেখিকা মন্তব্য করেন, "তাঁহার আন্তরিক উদ্দেশ্য মহৎ তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু তদীয় লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধগুলি পাঠে তাঁহার নিরপেক্ষতা ও উদ্দেশ্যের প্রতি ঘোর সন্দেহ হয়। বোধ হয় যেন তিনি ভ্রাতৃনির্যাতন মূলমন্ত্র লইয়াই লেখিকার আসন গ্রহণ করিয়াছেন।"[৩২৮] 'মতিচূর' (১ খণ্ড) গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে 'নবনূরে' এর সমালোচনা বের হয়। "সমাজ-সংস্কার করা এক কথা, আর সমাজকে বেদম চাবুক মারা আর এক কথা। চাবুকের চোটে সমাজ-দেহে ক্ষত হইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা সমাজের কোন ক্ষতি বা অভাব পূরণ হয় না। মতিচূর-রচয়িত্রী কেবল ক্রমাগত সমাজকে চাবকাইতেছেন, ইহাতে যে কোন সুফল ফলিবে আমরা এমত আশা কবিতে পারি না।"[৩২৯] তিনি অবশ্য গ্রন্থের ভাষা ও প্রকাশভঙ্গির প্রশংসা করেছেন। সমালোচকের ভাষায় "এই গ্রন্থের ভাষা সরল ও প্রাঞ্জল এবং রচনাভঙ্গি অতি মনোরম। কোন পুরুষ লেখকের পক্ষেও এইরূপ ভাষায় গ্রন্থ রচনা শ্লাঘার বিষয়। লেখিকা তাঁহার বক্তব্য ভাল করিয়াই বলিতে পারিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে কোন মুসলমান লেখকও এতগুলি সামাজিক বিষয়ের আলোচনা করেন নাই। তাঁহার সকল মতের সহিত আমাদের ঐক্য না থাকিলেও আমরা কর্তব্যানুরোধে এইরূপ আলোচনার জন্য তাঁহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেছি না।"[৩৩০] ১৯২১ সালে 'মতিচূরে'র ২ খণ্ড প্রকাশিত হয়।

'সুলতানার স্বপ্ন' (১৯০৫) একটি রূপক উপন্যাস। তিনি প্রথমে 'সুলতানাস্ ড্রিম' নামে ইংরাজিতে লেখেন, পরে এর বাংলা অনুবাদ করেন। তিনি একটি রূপক কাহিনীর ভেতর দিয়ে নারীশিক্ষা ও স্বাধীনতার আদর্শ তুলে ধরেছেন; নারী উপযুক্ত শিক্ষা পেলে রাজ্য পরিচালনার যোগ্যতাও রাখতে পারেন।[৩৩১] পরবর্তীকালে রচিত 'পদ্মরাগ' (১৯২৪) ও 'অবরোধবাসিনী' (১৯২৮) দুটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যিক মন ও প্রতিভা ছিল। উদ্দেশ্যধর্মী রচনাগুলিকেও তিনি সরস করে তুলেছেন। তাঁর ভাষায় সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সুর মিশ্রিত হয়েছে। তাঁর ব্যঙ্গের পাত্র ব্যক্তি বিশেষ নয়, সমগ্র সমাজ। তাঁর ব্যঙ্গবিদ্রূপ বিদ্বেষহীন ও স্থূলতামুক্ত। তিনি নিজে স্বাধীনচেতা রমণী ছিলেন, সমাজের নারীজাতিকেও মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার মন্ত্র দিয়ে গেছেন।

৩২৬ *নবনূর,* ভাদ্র ১৩১১
৩২৭ *নবনূর,* কার্তিক ১৩১১
৩২৮ *কোহিনূর*, ভাদ্র ১৩১২
৩২৯ *নবনূর,* ভাদ্র ১৩১২
৩৩০ ঐ।
৩৩১ আবদুল কাদির (সম্পাদিত)— *রোকেয়া-রচনাবলী,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩

শেখ ফজলল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)

শেখ ফজলল করিম রংপুর জেলার কাকিনা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর একটি অকৃত্রিম সাহিত্যিক প্রাণ ছিল। তিনি মূলত কবি, তবে তাঁর উত্তম গদ্য রচনাও আছে। শেখ ফজলল করিমের সমস্ত কাব্যভাবনা ও সাহিত্যানুশীলনের মৌল আবেদন হল ধার্মিকতা ও নৈতিকতা। ইসলাম ধর্মই তাঁর নীতিজ্ঞান ও আদর্শবুদ্ধির উৎস। তিনি চিশতীয়া সুফীমতের সমর্থক ছিলেন। সুফীমতের অন্তশীল আবেগ ও শুদ্ধ রসবোধ তাঁর রচনায় সঞ্চারিত হয়েছে। তবে তিনি যুগের আবেদন ও সমাজ-সমস্যার কথাও উপেক্ষা করেননি। 'রংপুর-দিকপ্রকাশে'র সম্পাদক হরশঙ্কর মৈত্রের কাছে তাঁর বাল্যশিক্ষা আরম্ভ হয়। বিদ্যালয়ে ছাত্রাবস্থায় তাঁর কবিতা লেখায় হাতে খড়ি হয়। মাত্র ১২ বছর বয়সে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'সরল পদ্য বিকাশ' ছাপা হয়। তখন তিনি পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র। বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ করার আগে তিনি কাকিনার এক 'জুট ফার্মে' চাকুরী গ্রহণ করেন, সেখানে ম্যানেজার হয়ে সাত বছর অতিবাহিত করেন।[৩৩২]

সাহিত্য সাধনাই তাঁর জীবনের ব্রত ছিল। তিনি আমৃত্যু নিরলসভাবে সাহিত্য সেবা করে গেছেন। তাঁব মোট প্রায় ৪০খানি পুস্তক আছে। সমকালীন পত্র-পত্রিকায় নানা কবিতা, প্রবন্ধ ও অন্য রচনা ছাপা হয়েছে। তিনি 'বাসনা' (১৯০৮) নামে একখানি মাসিকপত্র সম্পাদনা করেন। ১৯০৫ সাল পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের নাম এরূপ :—১. 'সরল পদ্য বিকাশ' (১৮৯৪), ২. 'তৃষ্ণা' (১৯০০), ৩. 'পরিত্রাণ কাব্য' (১৯০৩), ৪. 'মানসিংহ' (ঐ), ৫. 'ছামীতত্ত্ব' (ঐ), ৬. 'ভগ্নবীণা বা ইসলামচিত্র' (১৯০৩), ৭. 'লায়লী-মজনু' (ঐ), ৮. 'হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী (ঐ), ৯. 'প্রেমের স্মৃতি' (১৯০৫), ১০. 'মহর্ষি হজরত এমাম রব্বাণী মোজাদ্দেদ আলফসানী' (ঐ)। পরবর্তীকালের গ্রন্থগুলির মধ্যে 'আফগানিস্তানের ইতিহাস' (১৯০৯), 'পথ ও পাথেয়' (১৯১৩), 'বিবি রহিমা' (১৯১৮) 'গাথা' (১৯২০), 'বিবি ফাতেমা' (১৯২১), 'রাজর্ষি এবরাহিম' (১৯২৪), 'বিবি খাদিজা' (১৯২৭) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

'সরল পদ্য বিকাশ' 'শিশুপাঠ্য কবিতার বই। 'তৃষ্ণা' উর্দু গজলের ভাবালম্বনে রচিত। 'প্রকাশকের নিবেদনে' লেখা হয়, 'তরুণ কবির কয়েকটি ক্ষুদ্র ভক্তি সঙ্গীত প্রকাশিত হইল, তাঁহার দীর্ঘ সাহিত্য সেবার ফল কবিতাগুচ্ছ সময়ান্তরে 'শেফালিকা' নামে প্রকাশিত হইবে; ... বর্তমান পুস্তক তাঁহার প্রথম সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবেশের প্রয়াস মাত্র। লেখকের কোন বিশেষ পরিবর্তনে রচিত রুচির ঐক্যতায় ইহা ভক্ত পাঠকের উদ্দেশ্য পথের প্রদর্শন (রূপে) গৃহীত হইলে শ্রম সফল বোধ করিব।"[৩৩৩] 'তৃষ্ণা'র পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৯, কবিতার সংখ্যা ১৭টি। গীতিধর্মী কবিতাগুলির ভাববস্তু নির্মল প্রেম। কবির আবেগ স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ।

৩৩২ *বার্ষিক সওগাত*, ১ বর্ষ, ১৩৩৩

৩৩৩ শেখ ফজলল করিম—*তৃষ্ণা*, কাকিনা (রংপুর), পৌষ ১৩০৭

প্রেম আমি।
ভাষা মোর নয়নে নয়নে
ভাব মোর প্রাণের মিলনে।
আসিতে চাহিলে আসিতে পারি না
হাসিতে চাহিলে হাসিতে জানি না
কাঁদিলে না আসে জল।[৩৩৪] (প্রেম আমি)

শেখ ফজলল করিম কাব্যখানি 'অশেষ গুণালঙ্কৃত, সমাজ গত প্রাণ, উদার-হৃদয়, মাননীয় মৌলবী ডাক্তার ময়েজ উদ্দীন আহমদ প্রচারক সম্পাদক'কে উপহার দিয়েছেন।

হজরত মহম্মদের জীবনাখ্যান 'পরিত্রাণ কাব্য' লিখে ফজলল করিম সাহিত্যিক মহলে প্রথম পরিচিতি লাভ করেন। তিনি কাব্যরীতিতে নবীনচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন। মহম্মদের চারিত্র্যমাহাত্ম্য ও ধর্মজীবনের বর্ণনা করে তিনি ধর্ম ও সত্যের জয়, অধর্ম ও অসত্যের বিনাশ—এই চিরন্তন নীতিকথা প্রচার করেছেন। 'নবনূরে' 'পরিত্রাণ কাব্যে'র বিরূপ সমালোচনা হয়। অল্পদিনের মধ্যে হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে আমাদের দুইখানি কাব্য হইল,[৩৩৫] ... একখানিও সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার যোগ্য নহে। ... কেবল ব্যবহার বিরল আভিধানিক শব্দ সমষ্টি জুড়িয়া দিলেই যদি কাব্য হইত, তবে এই কাব্যখানিও উৎকৃষ্ট কাব্য মধ্যে পরিগণিত হইত, সন্দেহ নাই। অন্তঃসারশূন্য আড়ম্বরে বর্ণনা প্রাণহীন ও শ্রীভ্রষ্ট না হইলে অন্ততঃ বিষয়-গৌরবেও লেখকের সমস্ত ত্রুটি মার্জিত হইতে পারিত। লেখক সংযমের অভাবেই স্বীয় স্বাভাবিক শক্তির অপব্যয় করিয়াছেন। ... বস্তুতঃ ফজলল করিম সাহেবের একটু শক্তিমত্তায় আমরা আশান্বিত হৃদয়ে এতদিন তদীয় গতি পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলাম ; তিনি আমাদিগকে সে আশায় জলাঞ্জলি দিতে বাধ্য করিতেছেন কেন?"[৩৩৬] 'ভগ্নবীণা' জাতীয় উদ্দীপনামূলক খণ্ড কবিতার বই। এর কয়েকটি কবিতা 'ইসলাম-প্রচারকে' প্রকাশিত হয়। 'ভগ্নীবীণা' কবিতায় তিনি বলেছেন,

সভ্যতা-শিয়রে যে ইসলাম বিরাজে
সে বাদশাজাতি ফকির সাজে
স্মরিলেও কথা বুকে শেল বাজে
গোলামী হয়েছে জীবনে সার।[৩৩৭]

'মানসিংহ' ও 'প্রেমের স্মৃতি' কাব্যে ফজলল করিমের ঐতিহাসিক চেতনার পরিচয় আছে। 'মানসিংহে'র 'নিবেদনে' ফজলল করিম লিখেছেন, "বঙ্গ ভাষায় মানসিংহের

৩৩৪ ঐ, পৃঃ ৩-৪
৩৩৫ অপরখানি মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক রচিত 'হজরত মহম্মদ'।
৩৩৬ *নবনূর*, কার্তিক ১৩১১
৩৩৭ শেখ ফজলল করিম— *ভগ্নবীণা বা ইসলাম চিত্র*, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা ১৯০৪

জীবনচরিত নাই। পার্শী–উর্দু ইতিহাসগুলিতেও যাহা কিছু আছে, তাহা বিশৃঙ্খলাপূর্ণ। মানসিংহ মুসলমান ভক্ত ছিলেন বলিয়া হিন্দুরা ঘৃণা বা ঈর্ষাবশে তাঁহার জীবনী সঙ্কলনে সঙ্কুচিত। যাহা হউক, এজন্য মুসলমান গ্রন্থাকারগণ উপেক্ষা করিতে পারেন না। আমরা কয়েকখানি প্রাচীন ও প্রামাণ্য ইতিহাস অবলম্বনে এই অতি ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সংগ্রহ করিয়াছি।"৩৩৮ এটি ১৪ পৃষ্ঠাব গদ্য পুস্তিাক। 'নবনূরে' মানসিংহের বিরূপ সমালোচনা হয়। "এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় লেখক প্রসিদ্ধ মানসিংহের জীবনী–সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু উপযুক্ত উপকরণাভাবে তিনি সে চেষ্টা সম্পূর্ণ ফলবতী করিতে পারেন নাই। মানসিংহের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টায় ত্রুটি না হইলেও তাঁহার রচনা পদ্ধতি সর্বত্র চরিতাখ্যায়কদিগের অনুসৃত মার্গানুযায়ী হয় নাই। সত্য-নিষ্ঠা যে ঐতিহাসিকের পরম আশ্রয় লেখক তাহা বিস্মৃত হইয়া অনেক স্থানেই কবিজনোচিত কল্পনাস্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছেন। ... ইতিহাসাদির অনুশীলন আমাদের স্বজাতীয় ভ্রাতৃগণ নিতান্ত উদাসীন বা পশ্চাৎপদ। আশা করি অতঃপর মুসলমান লেখকবর্গ ইতিহাসচর্চার সহিত ভাষার বিশুদ্ধতার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে কদাচ ভুলিবেন না।"৩৩৯ 'প্রেমের স্মৃতি' দৃশ্যকাব্য ঃ 'পলাশীর রণাবসানে গভীর নিশীথে সিরাজদ্দৌলা ও লুৎফন্নেসা মুর্শিদাবাদ প্রাসাদ ত্যাগ হইতে শুরু করিয়া মহম্মদী বেগের অসির আঘাতে সিরাজদ্দৌলার নিধন পর্যন্ত ঘটনাবলী' এতে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যনাট্যের আঙ্গিকে মুসলমান লেখকের এটিই প্রথম রচনা। প্রায় সমসাময়িককালে একই আঙ্গিকে দৌলত আহমদ 'বিংশ পট সম্বলিত' 'জীবন মঙ্গল' (১৯০৫) নামক রূপককাব্য লিখেছিলেন। ৩৪০

'আসবার-উস-ছামী বা ছামীতত্ত্ব' অনুবাদ গ্রন্থ। ছামী সুফীমতের 'ভগবৎ প্রেমবিষয়ক সঙ্গীত'। শরীয়তপন্থীর লোকেরা এরূপ ভাবসঙ্গীতের বিরোধী ছিলেন। ছামী সম্পর্কে তাঁদের বিরূপ মনোভাবের অবসান ঘটাবার জন্য ফজলল করিম এটি রচনা করেন। তিনি গ্রন্থের 'অবতরণিকা'য় লিখেছেন "... ধর্মতত্ত্ব জিজ্ঞাসু মুসলমান ভ্রাতা-ভগ্নিগণের সমীপে সবিনয় নিবেদন ; —একথা সর্বজনবিদিত যে, আদিকাল হইতে সঙ্গীত শ্রবণ প্রচলিত ছিল। বিশেষতঃ সাধু সম্প্রদায় ইহাকে স্বীয় হৃদয়ের একমাত্র তৃপ্তি-দায়ক বস্তু বলিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন। ... দুঃখের বিষয়—বর্তমান সময়ে অস্মদ্দেশীয় কতিপয় অশিক্ষিত নিরক্ষর ব্যক্তি (ছামী) ধর্ম সঙ্গীতকে একেবারে অসিদ্ধ বলিয়া ঘোষণা করিয়া দিয়াছে। এমন কি যাহাদের তরিকায় সহস্রবার ইহার সিদ্ধত্ব হইয়াছে, তাহারাও 'বিষকুম্ভ পয়োমুখঃ' সাজিয়াছে। অধিকন্তু কাকিনা-নিবাসী মৌলবী আবদুল লতিফ সাহেব এ সম্বন্ধে যে সকল অলীক কথা প্রচার করিয়া তুমুল তুফান তুলিয়াছেন, আপাততঃ তাহার আলোচনা না

৩৩৮ শেখ ফজলল করিম—*মানসিংহ*, বিকাশ মেসিন প্রিন্টিং ওয়ার্কস, বরিশাল ১৯০৩
৩৩৯ *নবনূর*, ফাল্গুন ১৩১০
৩৪০ *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, পৃঃ ১১২-১৩

করিয়া, তিনি যে ব্যবস্থা খণ্ড (ফতোয়া) প্রকাশ করিয়াছেন, —জেলা মজফরনগর, —পোঃ কেরায়ানা-মহল্লা দরবারনিবাসী জোনাব হজরত মওলানা, হাজি, হাফেজ, কারী মহম্মদ শাহাবুদ্দীন সাবেরী সাহেবের প্রত্যুত্তরসহ তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইল। আশা, —অনভিজ্ঞ দুর্দ্দশাগ্রস্ত ভ্রাতাভগ্নিগণ ইহার সাহায্যে প্রকৃত তথ্য অবগত হইতে পারিবেন। কাবণ দূরদর্শিতাভাবে কতকগুলি ব্যক্তি 'ছামী'কে অসিদ্ধ ও শ্রোতাকে 'কাফের' (বিধর্মী) ও 'বেদাতি' (শাস্ত্র বিগর্হিত নূতন অনুষ্ঠাতা) বলিতেছেন। ... বঙ্গভাষায় 'ছামী' শব্দের ঠিক কোন প্রতিশব্দ নাই ; পাঠকদিগের বোধসৌকার্যে আমরা প্রায়শঃ অধিকাংশ স্থানে 'গান' ও 'সঙ্গীত' শব্দ ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছি। ইহা দ্বারা যাহাতে লোকে যাত্রা, থিয়েটার, খেমটা, বাই প্রভৃতি গানের সহিত ছামী তুলনা না করেন—এজন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি।"৩৪১ বলা বাহুল্য, চিশতীয়া মতের সমর্থক শেখ ফজলল করিম ছামীর সমর্থক ছিলেন। সুফীতত্ত্বে নৃত্যসম্বলিত 'ছামী' বা 'সামা' গানের স্থান আছে।

'হজরত খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী' ও 'মহর্ষী হজরত এমাম রাব্বানী মোজাদ্দেদে আলফসানী' উভয়ই সন্তজীবনী। দ্বিতীয় গ্রন্থের সমালোচনায় 'নবনূর' প্রশংসা করে বলে, "... এই মহাপুরুষের মহনীয় স্বার্থত্যাগ, অপূর্ব দৃঢ়তা ও প্রবল ধর্মানুরাগ মোসলেম জগতের অবশ্য অনুকরণীয় । শেখ সাহেব বঙ্গভাষায় তাঁহার জীবনকথা প্রচারিত করিয়া আমাদিগকে পরম কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিলেন। এই গ্রন্থখানি ... মোটের উপর সুখপাঠ্য ও উপাদেয় হইয়াছে।"৩৪২

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)

কাজী ইমদাদুল হক খুলনা জেলার গদাইপুরে কাজী বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতা কাজী আতাওল হক খুলনার ফোজদারী আদালতের মোক্তার ছিলেন। তিনি ১৮৯৬ সালে খুলনা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স, ১৮৯৮ সালে কলিকাতা মাদ্রাসা থেকে এফএ এবং ১৯০০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। তিনি ইংরাজি নিয়ে এমএ পড়েছিলেন, এমন কি বিএলও পড়েছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনটাই পরীক্ষা দেননি। তবে পরে বিটি পাশ করেছিলেন (১৯১৪)। তিনি প্রথমে কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন, পরে শিক্ষা বিভাগে যোগদান করে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপক ও আরও পরে সহকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর হন। ১৯২১ সালে ঢাকা ইন্টারমিডিয়েট ও সেকেণ্ডারী শিক্ষাবোর্ডের সেক্রেটারী হয়েছিলেন। চাকুরীতে দক্ষতা প্রদর্শনের জন্য তিনি সরকার কর্তৃক 'খান সাহেব' (১৯১৯) ও 'খান বাহাদুর' (১৯২৬) উপাধি পান। ৩৪৩

৩৪১ শেখ ফজলল করিম—*আসবাব-উস-ছামী বা ছামীতত্ত্ব*, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, কার্তিক ১৩১০, পৃঃ ... (অবতরণিকা)।

৩৪২ *নবনূর*, মাঘ ১৩১২

৩৪৩ সৈয়দ এমদাদ আলী—'খান বাহাদুর কাজি ইমদাদুল হক', *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৩

সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছিলেন। তাঁর লেখনির দুটি ধারা—মননশীল প্রবন্ধ রচনা ও শিক্ষোপযোগী শিশুপাঠ্য বই। তাঁর সৃষ্টিশীল রচনাও আছে। প্রথম গ্রন্থ 'আঁখিজল' (১৯০০) কবিতা-সংকলন, আর শেষ গ্রন্থ 'আবদুল্লাহ' (১৯৩৩) সামাজিক উপন্যাস। মাঝে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞানচর্চা' (১৯০৪), 'নবকাহিনী', 'প্রবন্ধমালা' প্রভৃতি। 'আঁখিজল' ৯টি গীতিকবিতার সংকলন। কবিতাগুলির অধিকাংশ প্রকৃতির রূপ-সৌন্দর্য বর্ণনা করে লেখা।[৩৪৪] তরুণ কবির ভাষা সুমার্জিত। চিত্রকল্প রচনায় বিহারীলালের প্রভাব আছে। 'লতিকা' (১৯০৩) নামে একটি কবিতার বই পাণ্ডুলিপি আকারে 'নবনূরে'র স্বত্বাধিকারী মোহাম্মদ আসাদ আলীকে প্রকাশের জন্য দিয়েছিলেন ; কিন্তু সেটি শেষ পর্যন্ত মুদ্রিত হয়নি। লতিকার 'উদ্বোধন', 'মায়া বালিকা' 'খেদ', 'জীবনসংগ্রাম' 'নবনূরে', 'হাসি' 'সমালোচনী'তে এবং 'কথা' 'কোহিনূরে' প্রকাশিত হয়।[৩৪৫]

'মুসলমানগণই আধুনিক সভ্যতার জন্মদাতা'—ইমদাদুল হকের 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা' গ্রন্থের ইহাই সারকথা। উল্লেখযোগ্য যে, ইমদাদুল হক পদার্থবিদ্যা ও রসায়নবিদ্যায় অনার্স নিয়ে বিএ পড়াশুনা করেছিলেন, কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার জন্য অনার্স ত্যাগ করেন।[৩৪৬] সুতরাং বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব বক্তব্য : 'গভীর তত্ত্বানুসন্ধিৎসু বহুদর্শী ও চিন্তাশীল ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ ইসলামের বিজ্ঞানানুশীলনপ্রিয়তার অশেষ প্রশংসা করিয়া অসংখ্য গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন ; ... আধুনিক সভ্যতা ও উন্নতশৈলীর সর্বোচ্চ শিখরবিহারী পাশ্চাত্যজাতিসমূহ কোন কোন বিষয়ে ইসলামের নিকট কতদূর ঋণী, অদ্য আমরা তাহাই বিচার করিয়া দেখিবার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি।"[৩৪৭] 'নবনূরে' প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার ঐ পুস্তিকাখানির আলোচনা করেন। তিনি গ্রন্থখানির প্রশংসা করে লেখেন, "পুরাগীতিখানার উদ্বোধনায় ভবিষ্যতের অনন্ত আশা-আশ্বাস লইয়া যে একখানি দীপ্তি উজ্জ্বল পূত পুস্তিকা আদর্শ চিত্রের সঙ্গে সঙ্গেই আমরা পাইয়াছি, তাহা আমাদের ধীমান উদ্যমী বন্ধুবর শ্রদ্ধেয় মৌলবী ইমদাদুল হক বিএ মহোদয়ের স্বর্ণলেখনী প্রসূত 'মোসলেম জগতে বিজ্ঞান চর্চা'। শিক্ষিত মোসলেম ভ্রাতার নয়ন পথে এবং হৃদয়পটেও বঙ্গভাষার মহাভ্রাতৃত্বপূর্ণ মহিমায় পূর্ণগৌরবে যে

৩৪৪ ইমদাদুল হক— *আঁখিজল*, ভারতমিহির যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৬

৩৪৫ আবদুল কাদির (সম্পাদিত)—*কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী*, কেন্দ্রীয় বাঙলা উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৮, পৃ: ১১০ (সম্পাদকের নিবেদন)।

৩৪৬ পূর্বোক্ত, *সওগাত*, ভাদ্র ১৩৩৩

৩৪৭ *কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী*, পৃঃ ৩৩৪

উদ্ভাসিত হইয়াছে, ইহা আমাদের অল্প আশা বা অল্প ভরসার কথা নহে।"[৩৪৮] সেযুগে শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান বাংলা ভাষার তেমন চর্চা করতেন না ; ইমদাদুল হকের এপথে আগমনকে তিনি শুভ লক্ষণ হিসাবে দেখেছেন, এজন্যই তাঁর এই উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষায় প্রশংসা। তরুণ লেখককে উৎসাহিত করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল। মোসলেম জগতের বিজ্ঞানচর্চা ও আরও পাঁচটি প্রবন্ধ নিয়ে 'প্রবন্ধমালা' প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলির নাম এরূপ : 'আলেকজান্দ্রিয়ার প্রাচীন পুস্তকাগার', 'আবদুর রহমানের কীর্তি', 'ফ্রান্সে মোসলেম অধিকার', 'আলহামরা', 'পাগল খলিফা'। শিশুদের পাঠোপযোগী 'নবিকাহিনী'তে ১২ জন পয়গম্বরের সংক্ষিপ্ত জীবনী আছে। গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে 'প্রস্তাবনা'য় লেখা হয়, "প্রাচীন নবিগণের জীবনের মোটামুটি কথাগুলি কোমলমতি বালক-বালিকাদিগকে গল্পচ্ছলে শিখাইবার উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থখানি রচিত হইল। কাহিনীগুলি হৃদয়গ্রাহী করিবার জন্য যথাসম্ভব সরল ভাষায় ও সরল ভঙ্গিতে বিবৃত করিবার চেষ্টা করা গিয়াছে।"[৩৪৯]

'আবদুল্লাহ' উপন্যাসে মুসলমান সমাজের আশরাফ-আতরাফ সমস্যা, পর্দাপ্রথা, পীরবাদ ও অন্যান্য ধর্মীয় সংস্কারের চিত্র তুলে ধরে ইমদাদুল হক এসবের অবসান কামনা করেছেন, কেননা এগুলি সমাজের প্রগতির অন্তরায়।[৩৫০] আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত, কাজী ইমদাদুল হক খুব স্বাভাবিকভাবেই সংস্কারপন্থী ছিলেন। প্যান-ইসলামী চেতনার বশবর্তী হয়ে তিনি বিশ্ব মুসলমানের অতীত গৌরবের গুণগান করেছেন। সমকালের সমাজের সমস্যাগুলিকে বিচার করেছেন প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির নিরিখে।

শিক্ষাবিষয়ক মাসিকপত্র 'শিক্ষকে'র (মে, ১৯২৩) পুরো ৩ বছর সম্পাদনা ইমদাদুল হকের আর একটি কীর্তি।[৩৫১] এটি তার শিক্ষানুরাগিতারই ফল। তিনি 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র কার্যনির্বাহক কমিটির (১৯১৭-১৮) সদস্য ছিলেন।[৩৫২]

৩৪৮ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার—'দুইখানি নূতন পুস্তক', *নবনূর,* মাঘ ১৩১১
৩৪৯ কাজী ইমদাদুল হক—*নবিকাহিনী (১ ভাগ),* স্টুডেন্টস লাইব্রেরী, ঢাকা, ১৩২৪ (২ সং) 'প্রস্তাবনা' দ্রষ্টব্য।
৩৫০ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত,* পৃঃ ১৮১-৮২ (৪ সং)।
৩৫১ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃঃ ৩১৬
৩৫২ ঐ, পৃঃ ২০৯

অপ্রধান লেখকবৃন্দ

খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী (১৮০৮-১৮৭০)

বর্ধমান সর্বমঙ্গলা গ্রামের অধিবাসী খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী প্রথম মুসলমান গদ্যলেখক হিসাবে ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়ে আসছেন। তিনি আধুনিক গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত 'উচিৎ শ্রবণ অর্থাৎ পারমার্থিক ভাব' (১৮৬০) গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি সুফীতত্ত্বের মোড়কে 'ভাবলাভ' (১৮৫৩) নামে একখানি অখ্যানকাব্য পূর্বেই রচনা করেছিলেন। শামসুদ্দীনের পিতা খোন্দকার গোলাম ফরিদ পীর ছিলেন। পিতার আদেশেই তিনি 'উচিৎ শ্রবণ' লেখেন। গ্রন্থে সুফীতত্ত্বের কথা সে-সূত্রেই এসেছে। 'ভাবলাভ' কাব্যে আত্মপরিচয় দিয়ে তিনি লিখেছেন,

রাজধানী বর্দ্ধমান তদমধ্যে বাসস্থান
বারি সর্ব্বমঙ্গলাতে ঘরো।
ছিদ্দিকী পদ্ধতি ধরি, খোন্দকারি পেশা করি
গোলাম ফরিদ খোন্দকার।
দেসখ্যাতি নাম তাঁর, কি লিখিব গুণ তাঁর,
কেবা নাহি জানে চিনে তাঁরে।
এলেমে আলেম তিনি, ফকিরের চূড়ামণি,
প্রকাশিত বাঙ্গালা ভিতরে।
তত্ত্বজ্ঞ্যানি সাধু যারা, দিবানিসি আসি তারা,
সেবা করে তাঁহার চরণে।
হৃদয়ের রাজ তিনি, তাঁহারে সাধনে চিনি
ফকির হইল কতো জনা।
শুনো সবে সমাচার, আমি মুক্ষ পুত্র তাঁর
আর দুই ভ্রাতা আছে মোর
তারাও মৌলুবি হয়ে, ভাবভাব তেয়াগিয়ে
প্রভুভাবে হইল ফকির।[১]

'উচিৎ শ্রবণে' গদ্য রচনার মাঝে মাঝে পদ্য কবিতা, গান ও গজল আছে। লেখকের গদ্য-ভঙ্গি কোথাও জটিল, কোথাও সরল, কিন্তু পদ্যরীতি সর্বত্র অবাধ ও সচ্ছল। কোন কোন গানে অন্তর্মুখী গীতিকবিতার বৈশিষ্ট্য ফুটেছে। গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য : "... রসনার দ্বারায় ঘোষণা করিলেই বাসনা পূর্ণ হয়, আর যাঁহাকে দৃষ্টি বলা যায় তাঁহাকে বিলক্ষণরূপে নিরক্ষণ করিলেই অত্র পুস্তকের মধ্যে যে সকল বচন রচন

১ সমছদ্দি ছিদ্দিক—*ভাবলাভ*, হানিফি প্রেস, কলিকাতা, ১৮৫৩ (গ্রন্থে তারিখের উল্লেখ নেই), 'গ্রন্থকারের পরিচয় অর্থাৎ সাইরির পরিচয় অংশ দ্রষ্টব্য। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার : মাইক্রোফিলম নং অ ২. ২১৮

হইয়াছে অমূল্য রতন জ্ঞানে যতন করিলেই শারীবিক পত্তন ও পতনের মর্ম্ম ও নিরঞ্জন আরাধন ধর্ম আব যে সকল উচিত কর্ম্ম তাহা সকল হইতে জ্ঞাপন হইবে।"২ তাঁর গদ্য-ভঙ্গির একটি নমুনা এরূপ : "তৃতীয় অহঙ্কার ধনের অহঙ্কার এই অহঙ্কারে ফেরাউন নরপতি আপনাকে পরমেশ্বর বলাইয়া নানা মত দৌরাত্ম উপস্থিত করিবাতে হজরত মূছা ও হারুন দুই ভ্রাতাকে মাজেজা শুদ্ধা প্রভু নিরঞ্জন নৈরাকার উহাদিগকে পয়গম্বরি পদবিতে প্রবত্ত করিয়া ঐ ফেরাউনকে সুধরা শিখাইবার জন্য প্রেরিত করিয়াছিলেন।"৩ শামসুদ্দীনের একটি সাহিত্যিক মন ছিল ; কিন্তু গদ্যরচনায় তা সঞ্চারিত হয়নি। ভক্তগণের মধ্যে অধ্যাত্মতত্ত্বের গুপ্তকথা প্রচার-উদ্দেশ্যে রচিত গ্রন্থে সাহিত্যরস আশা করা যায় না। তবে তাঁর যে কবিত্বশক্তি ছিল তাতে সন্দেহ নেই। তিনি গূঢ় আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা একটি রূপকের মাধ্যমে এভাবে বলেছেন,

ওরে মোর মন ভ্রমরা
কমলের কি মধু পাবি ;
কমলের কি মধু খাবি।
জদি কমলিনি মান করে না দেয় মধু দান ;
সে সে হয়ে অপমান, অলি নাম কি ডুবাবি।
তাই তোরে আমি বলি
কমলেতে হওগা বলী ;
বলী হয়ে অলি হলে, তবে মধু দেখতে পাবি।
আপন দেহে কর বিরাজ,
ছেড়ে দিয়ে লোক লাজ
বানালে জোগির সাজ, তবে মন অলি হবি।৪

'উচিৎ শ্রবণে'র একটি সুবচিত গজলে কবির সহজ ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণোচ্ছলতা প্রকাশ পেয়েছে :

আমার প্রাণ-প্রয়োসী সরদ শশী হাস্যবদনী।
দীর্ঘনাশি কুটিল কেশী মৃগনয়নী॥
জিজ্ঞাসিল কে হে তুমি,
কৈলাস অনুগত আমি
যাবে কোথা জিজ্ঞাসিল আবার কামিনী॥
বল্লেম তারে আদর করে,
যাব আমি তোমার ঘরে
বাঞ্ছা করি তোমার দ্বারে হৈতে দরওয়ানী॥

২ খোন্দকার ছমছদ্দিন মহম্মদ ছিদ্দিকি—*উচিৎ শ্রবণ অর্থাৎ পরমার্থ লাভ*, বিদ্যারত্ন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৭৮১ শকাব্দ (১৮৬০ খ্রীস্টাব্দ)।

৩ *ঐ*, পৃ. ১১

৪ *ভাবলাভ*, পৃঃ ১৯২

জিজ্ঞাসিল কি ধন পেলে
তাতে তুমি গেলে ভুলে
কে তোমায় দংসালে বল, কোথায় সাপিনী॥
বল্লেম তব বদন দেখে
হারাইলাম আপন সুখে
দংসালে চাঁচর তোমার হয়ে নাগিনী॥
রবি শশী কিবা নিশি
কার মূল্য বলো বেশী
বল্লেম বেশী তোমার হাসি ঈষদহাসিনী॥[৫]

মুনশী আজিমুদ্দীন

মুনশী আজিমুদ্দীন বর্ধমানের মেমরির দক্ষিণে খাঁড়ো গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর দুখানা গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গেছে—'জামালনামা' (১৮৫৯) ও 'কি মজার কলের গাড়ী' (১৮৬৩)। জামালনামা পদ্যে রচিত রূপককাব্য। 'কি মজার কলের গাড়ী' গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত নকসা জাতীয় রচনা। এদেশে নতুন রেল গাড়ী চালু হলে সাধারণ মানুষের বহির্জীবন ও ভাবজীবনে তার কি কি প্রভাব পড়ে, মুনশী আজিমুদ্দীন ব্যঙ্গের সুরে সে-চিত্র তুলে ধরেছেন। এতে যেমন লেখকের সমাজচেতনার প্রকাশ ঘটেছে, তেমনি রচনাভঙ্গি ও ভাষারীতিতে সাহিত্যের স্বাদ ফুটেছে। গ্রন্থের সংলাপগুলি সরল, সরস ও প্রাণবন্ত। শাশুড়ী বউ-এর একটি সংলাপ এরূপ :

"শাশুড়ী। বলি ওগো বয়েরা তোরা কি পাঁদাড়ে দাঁড়ায়েই থাকবি গো? ঘরে কি আর কর্ম নেই, বাপের বয়সে কখন গাড়ী দেখিসনি নাকি?

বউ। হেঁ বাবু আমরাই না হয় দেখিনি, তোমার বাপ বড় দেখেছে তা কৈ, আই ঠাকরোনকে জিজ্ঞাসি যাই দেখি কেমন তোমার বাপ কলের গাড়ী দেখেছে।"

মুসলমান রচিত প্রথম নক্সা হিসাবে 'কি মজার কলের গাড়ী'র ঐতিহাসিক মর্যাদা স্বীকার্য। [৬]

মুনশী নামদার

মনুশী নামদার বর্ধমানের বলিয়া পরগণার ভূপতিপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর লেখা মুদ্রাকারে ১১ খানা পুস্তিকা আছে। পুস্তিকাগুলি অধিকাংশই নক্সাজাতীয় গদ্য-পদ্যে রচিত। 'কাশীতে হয় ভূমিকম্প। নারীদের একি দম্ভ' (১৮৬৩), 'দুই সতীনের ঝগড়া' (১৮৬৭), 'ননদ ভাজের ঝগড়া ও বাঞ্ছারামের গল্প' (ঐ), 'বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা' (ঐ), 'নতুন ঝড়' (ঐ), 'খেদের গান' (১৮৬৮), 'কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী' (ঐ), 'নারীর ষোলকলা' (ঐ), 'মনোহর ফেঁসড়া' (ঐ), 'খেলারামের গীত' (ঐ) ও 'কলির বউ হাড় জ্বালানী' (১৮৬৮)। [৭]

৫ *উচিৎ শ্রবণ।*

৬ *আধুনিক বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃঃ ৯৮-১০২

৭ *ঐ*, পৃঃ ১০২-১১৯

প্রখর অন্তর্দৃষ্টি, সমাজিকবোধ ও রসচেতনা থেকে প্রহসনধর্মী রচনার উদ্ভব হয়। মুনশী নামদার সমসাময়িক কালের পারিবারিক ও সামাজিক নীতিহীনতা, অন্তঃসারশূন্যতা ও অসামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণগুলির মুখোশ খুলে দিয়েছেন এসব পুস্তিকায়। তাঁর শ্লীল ও সংযত বাচনভঙ্গীতে ঈষৎ হাস্য-কৌতুকের মাধ্যমে সমাজের বাস্তবচিত্র ফুটে উঠেছে। মুনশী নামদার মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি মধ্যবিত্তের জীবনে যে পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে, দাম্পত্য ও পারিবারিক জীবনের পুরাতন মূল্যবোধগুলি ভেঙে যাচ্ছে তার একটি স্পষ্ট চিত্র তিনি তুলে ধরেছেন। মুখ্যতঃ এখানেই তাঁর নক্সাগুলির সফলতার কারণ নিহিত আছে।

গোলাম হোসেন

গোলাম হোসেন 'হাড় জ্বালানী' (১৮৬৪) নামে ১৬ পৃষ্ঠায় নক্সাজাতীয় পুস্তিকা লেখেন। মুনশী নামদারের নামে প্রচারিত 'কলির বউ হাড় জ্বালানী' (১৮৬৮) পুস্তিকার বিষয়বস্তু, ভাষা ও রচনার সঙ্গে এ পুস্তিকার হুবহু মিল আছে। এজন্য মনে করা হয় অল্প খ্যাত গোলাম হোসেনের বই পরিবর্তীকালে অধিক খ্যাত মুনশী নামদারের নামে প্রকাশক ব্যবসায়ের খাতিরে চালিয়ে দেন। [৮] গোলাম হোসেন বসন্তপুরের আধিবাসী ছিলেন।[৯]

প্রবাসী পুত্রের অবর্তমানে গৃহে বৃদ্ধা শাশুড়ীর সাথে পুত্রবধূর সংসারের কর্তৃত্ব নিয়ে মনোমালিন্য এবং বৃদ্ধার দুঃখভোগের বিষয় এতে বর্ণিত হয়েছে। বৃদ্ধা মাতাকে শেষ পর্যন্ত গৃহত্যাগ করে ভিক্ষাবৃদ্ধি গ্রহণ করতে হয়। পুত্র সব জেনেশুনে স্ত্রীকেই সমর্থন দেয়। বাংলার একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ ভেঙে গেছে, পুত্র ও পুত্রবধূর মনোভাবের পরিবর্তন হয়েছে, গড়ে উঠেছে ব্যক্তিকেন্দ্রিক পরিবার। চাকুরি-নির্ভর আর্থিক পটভূমি মানবিক মূল্যবোধ পর্যন্ত নষ্ট করে দিয়েছে। উক্ত নক্সার মধ্যে বাঙালির মধ্যবিত্ত সমাজের এই পরিবর্তনশীল রূপটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

শেখ আজিমদ্দী

'কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে' (১৮৬৮, ২ সং) নক্সার লেখক আজিমদ্দী 'কড়েয়া'র অধিবাসী ছিলেন। এক ধনবান বৃদ্ধ এক ষোড়শীকে বিয়ে করে টাকার জোরে। অল্পকাল পরে তার মৃত্যু হয। সরল কাহিনী ও সাধারণ চরিত্র নিয়ে নক্সাটি রচিত। তবে টাকার প্রতাপ সমাজের সুস্থতাকে কিভাবে নষ্ট করছিল তার অশুভ সংকেত শেখ আজিমদ্দী এর মধ্যে তুলে ধরেছেন। মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' (১৮৫৯), দীনবন্ধুর 'বিয়ে পাগলা বুড়ো' (১৮৬৬) একই উদ্দেশ্যে রচিত। ১৬ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকায় নাট্যাঙ্গিক পুরোপুরি ব্যবহৃত হয়নি।

সংলাপে নাটকীয়তার গুণ আছে :

৮. *আধুনিক বাঙলা সহিত্যে মুসলিম সাধনা,* পৃ: ১০৬
৯. গোলাম হোসেন—*হাড় জ্বালানী,* এ্যাংলো ইণ্ডিয়া ইউনিয়ন যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৭১

"বুড়ী — মর পোড়ার মুখো, হিত বলতে বিপরীত, ফেল্লে বোঝা পরের ঘাড়ে, কেন? আমার কি স্বামী নাই, তুই এ বয়সে বিবাহ করে বণিতাকে কি আমার স্বামিকে (স্বামীকে) দিয়ে যাবে, তাই বুঝি দুই বেহাই যুক্তিস্থির করিয়াছ। আমার উঠান ঝাট দিবার দীর্ঘ খেঙ্গরা প্রস্তুত আছে।"[১০]

আয়েন আলী শিকদার

বরিশাল জেলার মেহেদিগঞ্জ পরগণার অধিবাসী আয়েন আলী শিকদার 'বিধবা বিলাস' (১৮৬৮) নামে গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত একখানি রোমান্টিক রূপকথা রচনা করেন। এর কাহিনী কৃত্রিম, ভাষাও কৃত্রিম। গদ্যের ক্ষেত্রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুসরণ করেছেন ; "যুবরাজ প্রেয়সীর পীযূষ বাক্য শ্রবণে হাস্যাননে প্রীতবচনে কহিলো ওগো প্রেয়সি : নিশামনি করস্পর্শনে রজনীযোগে কুমুদিনী আহ্লাদিনী প্রস্ফুটিতা, মন্দ মন্দ মলয়জ বহিতেছে।"[১১] নিছক মধ্যযুগীয় গল্প পরিবেশন ছাড়া 'বিধবা বিলাসে'র আর কোন মূল্য নেই। এটি ঢাকার 'বাঙ্গলা যন্ত্রে' মুদ্রিত হয়।

মোহাম্মদ ইসমাইল

'শ্রীযুক্ত মহম্মদ স্মাইল উকিল' হিন্দু এবং মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রে মূলতত্ত্ব (১৮৬৯, ২য় সং) শিরোনামে একখানি আইনের বই অনুবাদ করেন। লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন যে, হিন্দু ও মুসলমান সমাজের ধর্ম ভিত্তিক আইন কানুন 'স্যার উইলিয়ম মেকনাটন সাহেব কর্তৃক ইংরাজী ভাষায় সঙ্কলিত হইলে তাঁহার অনুমতিক্রমে' তিনি তা বাংলায় অনুবাদ করেন। এটি মুসলমানের রচিত আইনবিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ। ছাত্র ও আইন ব্যবসায়ীদের পাঠোপযোগী করে তা লিখিত।[১২] ১৮৬৪ সালে সরকারের আইনে উর্দু তুলে দিয়ে কেবল বাংলা-ইংরাজিতে ওকালতি ও মুন্সেফগিরি পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই অবস্থায় ছাত্রদের জন্য বাংলা আইনের পুস্তকের প্রয়োজন দেখা দেয়। মোহাম্মদ ইসমাইল সে-প্রয়োজন মিটাবার জন্য এটি রচনা করেছিলেন।[১৩]

মোহাম্মদ ইসমাইল রচিত 'জুম্মা ও ঈদের ফতুয়া' (১৯০০) নামে একখানি ধর্মপুস্তিকা পাওয়া যায়। গ্রন্থকারের ঠিকানা বলা হয়েছে 'বাহাদুরপুর, ফরিদপুর'। ১৮ পৃষ্ঠার এই পুস্তিকাখানির পরিচয় প্রসঙ্গে বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে মন্তব্য করা হয়েছে, "The Fatwa says that Juma and Id prayers are not allowable in countries where Muhammadan Law is not in force, and specially in those where the

---

১০. শেখ আজিমদ্দী—*কড়িব মাথায় বুড়োর বিয়ে,* জ্ঞান দীপক যন্ত্র. কলিকাতা. ১২৭৫ (২য় মুদ্রণ) পৃ: ৯

১১. *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,* পৃ: ১৩৫

১২. ঐ, পৃ: ১৬৮

১৩ *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ৩ চৈত্র, খ, ১৮৬৯

Government is Christian and interferes with that Law. The Fatwa is approved by the Ulema of Mecca and Medina,"[১৪] ফরিদপুরের হাজি শরীয়তুল্লা ও দুধু মিঞা প্রবর্তিত ফারায়েজী আন্দোলনের একটি দিক ছিল,—যে দেশে ইসলামী আইন প্রচলিত নেই, সে দেশে জুমা ও ঈদের নামাজ না পড়া। ফারায়েজীদের মতে ঐরূপ নামাজ 'জায়েজ' বা সিদ্ধ নয়।

উকিল মোহাম্মদ ইসমাইল ও বাহাদুরপুর নিবাসী মোহাম্মদ ইসমাইল দুজন পৃথক ব্যক্তি বলে আমাদের বিশ্বাস। উভয়ের গ্রন্থের রচনার ব্যবধান ত্রিশ বছরের উর্ধ্বে।

বগুড়ার মালগ্রাম নিবাসী অপর একজন মোহাম্মদ ইসমাইল 'পরমল' (১৮৮৭) নামে একখানি কবিতার বই প্রকাশ করেন। কবি অল্প বয়সে মারা যান।[১৫]

মীর আশরাফ আলী

মীর আশরাফ আলী প্রণীত চিকিৎসা বিষয়ক তিনখানি পুস্তক আছে— 'ধাত্রীবিদ্যা' (১৮৬৯), 'বাল্যচিকিৎসা' (১৮৭০) ও 'স্ত্রীচিকিৎসা' (১৮৭১)। তিনি 'কলিকাতা শিয়ালদহ কেম্বেল মেডিকেল স্কুলের ধাত্রীবিদ্যা , স্ত্রী-চিকিৎসা ও শিশু চিকিৎসার অধ্যাপক এবং চিকিৎসালয়ের স্ত্রীলোক ও বালকদিগের রোগ পরিদর্শক ছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজের 'এসিসটান্ট সার্জ্জন' হিসাবেও কাজ করেন। তিনি প্রধানত কলেজের ছাত্রদের পাঠ্যোপযোগী করে গ্রন্থগুলি প্রণয়ন করেন। 'ধাত্রীবিদ্যা'র ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "মেডিকেল কলেজের বাঙলা শ্রেণীস্থ ছাত্রগণের অধ্যয়নের নিমিত্ত বিষয় ইংরেজি পুস্তক হইতে অনুবাদিত হইয়াছে "তৎসমুদয় পাঠ করিয়া ছাত্রগণ চিকিৎসা বিদ্যায় নৈপুণ্য লাভ করিতেছে, কিন্তু পুস্তকের অসদ্ভাব প্রযুক্ত উক্ত ছাত্রগণ ধাত্রীবিদ্যা বিষয়ে বহুকালাবধি নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন।" পাঠ্যপুস্তকের এই অভাববোধ থেকে মীর আশরাফ আলী গ্রন্থখানি প্রণয়ন করেছেন। তাঁর 'বাল্যচিকিৎসা' প্রণয়নের উদ্দেশ্যেও তাই। তিনি ভূমিকায় বলেছেন, "অদ্যাবধি অল্প দেশে বঙ্গভাষায় বাল্যচিকিৎসা সম্বন্ধে কোন বিশেষ পুস্তক প্রকাশিত হয় নাই। বিশেষত বয়োবৃদ্ধ ব্যক্তিদের ন্যায় বালকেরা স্বীয় স্বীয় শারীরিক অবস্থান্তর প্রকাশ করিতে পারে না বলিয়াই বাল্যচিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সুকঠিন। সুতরাং উপযুক্ত চিকিৎসাভাবে অধিকাংশ বালক অকালে কাল কবলে নিপতিত হয়। উল্লিখিত দুর্ঘটনার কিয়দংশের প্রতীকার বাসনায় ও কলিকাতাস্থ মেডিকেল কলেজের বাঙ্গালা শ্রেণীস্থ বর্তমান ও পূর্বতন ছাত্রদিগের এবং সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের পাঠ্যার্থে শ্রীযুক্ত ডাক্তার বার্ডস প্রণীত ডিজিজেস অব চিলড্রেন, ডাক্তার স্মিথস ডিজিজেস অফ ইনফ্যান্সি এন্ড চাইল্ডহুড, ডাক্তার ই. স্মিথ ওয়েটিং ডিজিজেস অফ চিলড্রেন, ডাক্তার বেডফোর্ড ক্লিনিকেল লেকচারস এণ্ড ডিজিজেস অফ চিলড্রেন এবং ডাক্তার করবিন্স ম্যানেজমেন্টস এণ্ড ডিজিজেস অফ ইনফ্যান্সি প্রভৃতি সুবিখ্যাত ডাক্তার মহোদয়গণের পুস্তকের সারভাগ

---

১৪. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ৩ চৈত্র, খ. ১৯০০

১৫. হামেদ আলি — 'উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য', *সাধনা,* বৈশাখ, ১৩১৩

নির্বাচন করিয়া এই পুস্তক সঙ্কলিত হইল। ইহা কোন পুস্তক বিশেষের অনুবাদ নহে। বিনা উপদেশে পাঠযোগ করিবার জন্য অতি সরল ভাষার লিখিতে সাধ্যানুসারে যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছি।"[১৬]

মীর আশরাফ আলী চিকিৎসা বিদ্যার দূরূহ বিষয় সরলভাবে প্রকাশ করলেও তাঁর ভাষা মোটেই সুশোভন হয়নি। তিনি কোনরূপ পরিভাষা ব্যবহার না করে ইংরাজি শব্দগুলি বঙ্গাক্ষরে লিখেছেন মাত্র।

সৈয়দ আবদুল রহিম

বরিশাল জেলার মাদারীপুরের গোপালপুর গ্রাম নিবাসী সৈয়দ আবদুর রহিম 'ভারত বর্ষের ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর' (১৮৭০) নামে ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ১০১ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে 'অতি প্রাচীন কাল হইতে মুসলমান রাজত্বের শেষ পর্যন্ত' ইতিহাস শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে। মুসলমান কর্তৃক বাংলায় ইতিহাস লেখার সম্ভবত এটিই প্রথম দৃষ্টান্ত। ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান আবদুল রহিমের গদ্যের ভাষাকে 'সুখপাঠ্য ও প্রাঞ্জল' বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭]

আবদুল রহিমের অপর কীর্তি 'বালাবঞ্জিকা' (১৮৭৩) নামে একখানি পত্রিকার সম্পাদন করা ও প্রকাশ কবা। মশাররফ হোসেনের 'আজীজননেহার' প্রকাশের আগেব বছর 'বালারঞ্জিকা' আত্মপ্রকাশ করে। 'ঢাকা প্রকাশে' (১৬ বৈশাখ ১২৮০) এর সমালোচনা বের হয়। এযাবৎ যতদূর জানা গেছে এটিই মুসলামন সম্পাদিত প্রথম পত্রিকা।[১৮] ডক্টর পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'বালারঞ্জিকা'কে 'সাপ্তাহিক' পত্র বলে উল্লেখ করেছেন। [১৯]

মুনশী মোহাম্মদী

বর্ধমানের মুনসী মোহাম্মদী, গোলাম রব্বানী ও দুর্গানন্দ কবিরত্ন 'হাতেমের উপাখ্যান' (১৮৭৪) নামে গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত একখানি অনুবাদ প্রকাশ করেন।

বর্ধমানের মহারাজা আফতাবচন্দ্র মহতাব বাহাদুরের পৃষ্ঠপোষকতায়ও অর্থানুকূল্যে এটি অনূদিত ও প্রকাশিত হয়। হাতেম তাই পারস্য কাহিনীর একটি জনপ্রিয় উপাখ্যান। সত্যবাদী, নীতিবাগীশ, পরহিতকারী ও দানবীর হিসাবে তাঁর ভাবমূর্তি প্রচারিত হয়ে আসছে। অনুবাদকগণ তাঁদের রচনায় সেই আদর্শই তুলে ধরেছেন। গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে লেখা হয়, "পাঁচটি প্রশ্ন সম্বলিত 'হাতেমের উপাখ্যান' নামক এই গ্রন্থখানি পুনরায় সংশোধিত হইল, প্রকাশিত হইল। এতৎপাঠে মহাসাহসী পরোপকারী

---

১৬ *বাল্যচিকিৎসা*, বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিত যন্ত্র, কলিকাতা, ১৮৭৫ (২ সং) পৃ: (প্রথম সংস্করণেব ভূমিকা)

১৭ *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ: ১৬৯ (২ সং)

১৮ এই অধ্যাযেব 'পত্রপত্রিকা' অংশ দ্রষ্টব্য

১৯ *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙ্গালীব নবজাগরণ*, পৃ: ৩৯৪

বদান্যবর হাতেমের গুণের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়।"[২০] মুনশী মোহাম্মদী ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্নকে 'চাহার দরবেশ' (১৮৮৪) নামে অপর একটি গ্রন্থ অনুবাদে সহযোগিতা দান করেন। ব্রজেন্দ্রকুমার 'বিজ্ঞাপনে' বলেন, 'মুনশী মহম্মদীর সাহায্যে পারস্য অক্ষরে লিখিত পুস্তকযুগলের সহিত মিলন করিয়া লইয়াছি।"[২১] এটিও বর্ধমানের মহারাজার পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থানুকূল্য লাভ করে।

মোহাম্মদ আবদুল করিম (জন্ম ১৮৫৫)

মোহাম্মদ আবদুল করিম 'জগৎমোহিনী' (১৮৭৫) নাটক লিখেছিলেন। তিনি মালদহের শ্যামপুর-বাজিতপুরেব অধিবাসী ছিলেন। তিনি পাঠশালায় 'দীননাথ মিত্র নামক একজন রাঢ় দেশীয় কায়স্থ' শিক্ষকের কাছে বাংলা শিখেছিলেন। তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে শেরশাহাবাদ পরগণার নওয়াদা মহলে জমিদার মি. গ্রের অধীনে নায়েবের চাকুরি গ্রহণ করেন। [২২] মশাররফ হোসেনের 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) ও 'জমিদার দর্পণে'র (১৮৭৩) পরেই আবদুল করিমের 'জগৎমোহিনী' নাটক। এদিক থেকে এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। নাটকের ভূমিকায় তিনি লিখিছেন, "আমি এই জগৎমোহিনী আখ্যায়িকাটি কোন এক সুপ্রসিদ্ধ বহুদর্শী মহাত্মার প্রমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছিলাম। তিনি কোন এক সুবিখ্যাত গ্রন্থ মধ্যে লিখিত আছে বলিয়া উপন্যাস ছলে বর্ণনা করিয়াছিলেন। . . ইহাতে জগৎমোহিনীর রূপ বর্ণনা ও রাজসভা এবং পিতাপুত্রের পুন:দর্শন, বিলাপ, অবকাশ বিহিনে সংক্ষেপে থাকিল আগামীতে পরিশোধ হইবে।"[২৩] তিনি আরও বলেছেন যে, তাঁর আত্মীয় বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধে উক্ত কাহিনীকে নাট্যরূপ দেন। রাজপুত্র-রাজকন্যার রোমান্সসুলভ প্রেমোপাখ্যানকে নাট্যরূপ দিয়ে আবদুল করিম আকর্ষণীয় গল্প ছাড়া কোন নতুন জীবনবোধ বা সামাজিক জিজ্ঞাসা উত্থাপন করতে পারেননি। বৃদ্ধ রাজা নিশিকান্তের চরিত্র চিত্রণে মধুসূদনের 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'র (১৮৬০) ভক্তপ্রসাদের ছায়াপাত আছে। বিশুদ্ধ গদ্যে সংলাপ রচিত হচ্ছে।

আবদুল করিমের অপর গ্রন্থ 'আশাবৃক্ষ' (১৮৯২,) অপ্রকাশিত) ; এর প্রথম খণ্ডের ২০৬ পৃষ্ঠার পাণ্ডুলিপিতে নিজ বংশাবলী ও বাল্যজীবনের স্মৃতিকথার বিবরণ আছে।[২৪] তিনি ভূমিকায় বলেন, "আমার এই আশাবৃক্ষের অনেক আশা। ... প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড ক্রমেই লিখিব। যাহা লিখিলাম বা লিখিব প্রকাশ্য নহে। জ্ঞানী পাঠকগণ

২০. মুন্সী মহম্মদী, গোলাম রব্বানী এবং দুর্গানন্দ কবিরত্ন—*হাতেমের উপাখ্যান,* সত্যপ্রকাশ যন্ত্র. বর্ধমান, ১৮৭৩ (২ সং), 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

২১ ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন তথা মুন্সী মহম্মদী—*চাহার দরবেশ,* অধিরাজ যন্ত্র, বর্ধমান, ফাল্গুন, ১২৯১, পৃ:। (বিজ্ঞাপন)।

২২ আবদুল হক—'মহম্মদ আবদুল করিমের 'আশাবৃক্ষ', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* কার্তিক—পৌষ, ১৩৬৮, পৃ: ১২৪

২৩. *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা,* পৃ: ১৪৮

২৪. পূর্বোক্ত, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা,* কার্তিক, পৌষ ১৩৬৮

আশাবৃক্ষ হইতে বুঝিয়া লইতে পরিবেন যে, আমার আশা কি!"[২৫] তিনি বলেন, তাঁর পূর্বপুরুষ শেরশাহের সেনা বিভাগে সুবেদার ছিলেন। তাঁর পিতা মোহাম্মদ মনিরুদ্দীন আর্থিক স্বচ্ছলতা হারিয়ে সাধারণ গৃহস্থে পরিণত হন। তাঁর সাহিত্যচর্চার কোন পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল না। গ্রামীণ পরিবেশে তাঁর শিল্পসাধনা অধিক দূর অগ্রসর হয়নি। আশাবৃক্ষের গদ্য সরস এবং চিত্রধর্মী। এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত বলে আত্মজীবনী হিসাবে (মুসলমান রচিত)–এর স্থান হত দ্বিতীয় ।

যশোহরের খড়কি গ্রাম নিবাসী অপর একজন মোহাম্মদ আবদুল করিম ছিলেন (মৃত ১৯১৫)। তিনি 'এরশাদে খালেকীয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব' (১৯০৩) নামে মারফতী তত্ত্ববিষয়ক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করে। গ্রন্থে নক্সবন্দিয়া, কাদেরিয়া, চিশতীয়া সুফীমতের আলোচনা আছে। লেখক নিজে নক্সবন্দিয়া মতের সুফীসাধক ছিলেন। গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "স্বদেশীয় ভ্রাতাদিগকে খোদাপ্রাপ্তি পথ প্রদর্শন করা এবং তাহাদিগকে ধর্মে পরিপক্ক করা এই কেতাবের উদ্দেশ্য ; অর্থোপার্জ্জন বা বিদ্যা প্রকাশ করা ইহার উদ্দেশ্যে নহে। অল্প লোকবিদিত কঠিন বাঙ্গালা শব্দসমূহ পরিত্যাগ করিয়া সাধারণ বিদিত আরবী ও পারসী শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে এবং যে শব্দ বঙ্গভাষায় প্রচলিত নাই ও যে শব্দকে বঙ্গভাষায় আনিলে অর্থের সম্পূর্ণ অঙ্গ পরিস্ফুট হয় না, বরং কোন কোন অঙ্গ পরিত্যাগ করিতে হয়, সেই শব্দকে মূল আরবী ভাষায় রাখিয়া টীকা দ্বারা কিম্বা বন্ধনী চিহ্ন মধ্যে তাহার অর্থ ও ভাব প্রকাশ করা হইয়াছে। আর যে সকল বাক্য উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহার অনুবাদ মূল গ্রন্থের ভাবে রাখা হইয়াছে।"[২৬]

মোহাম্মদ আবেদিন

মোহাম্মদ আবেদিনের 'ধর্মপ্রচারিণী' (১৮৭৫) ধর্ম ও নীতিমূলক কবিতা পুস্তক। গ্রন্থের বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন, "এই পুস্তক নানা প্রকার ধর্মশাস্ত্র দৃষ্টে পুস্তক করিলাম, ইহার দ্বারা মানবগণের কিছু উপকার হইলে আমার শ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।"[২৭] ৬৬ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থে ৩৩টি কবিতা আছে। পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে এগুলি রচিত। পীরবাদী মরমী সাধনার তিনি বিরোধী ছিলেন। নাচ–গান, মাজার–দরগাহ, শিরনী ইত্যাদি আচরণকে 'বেদাত' জ্ঞানে বর্জন করতে বলেছেন।

> তবলা বেহালা বিনা (বীণা) করে লয়ে কত জনা,
> নাচে সবে কটির সমান
> এমামের নামে রাজা, কেহ করে ভূতপূজা,
> মাদারের নামে বান্ধে স্থান

২৫. ঐ, পৃ: ১১৭
২৬. মোহাম্মদ আবদুল করিম—*এরশাদে খালেকীয়া বা খোদা প্রাপ্তিতত্ত্ব,* রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৬ (২ সং), পৃ . , (প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)।
২৭. মহম্মদ আবেদিন— *ধর্মপ্রচারিণী,* বাঙ্গালা সাপ্তাহিক রিপোর্ট যন্ত্র, কলিকাতা, ফাল্গুন, ১২৮১

বাপদাদা আদিক্রমে, মুর্দারের নামে নামে
চিনি রুটি দেয় কতজন।
মোরে গেল যেই জন, নাই যার প্রাণধন
সেকি কভু করয়ে ভক্ষণ।[২৮] (বেদাত)

'স্বদেশ' নামক কবিতায় 'বোদা' গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা আছে, সম্ভবত ঐ গ্রাম কবির জন্মভূমি।

ফয়জুন্নেছা চৌধুরানী (১৮৩৪-১৯০৩)

কুমিল্লার হোমনাবাদের জমিদার নবাব ফয়েজুন্নেসা চৌধুরানী মোট চারখানি গ্রন্থ রচনা করেন, সেগুলি হল 'রূপ-জালাল' (১৮৭৬) 'তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত' (১৮৮৭), 'সঙ্গীত সার' ও 'সঙ্গীত লহরী'।[২৯] গদ্যে ও পদ্যে রচিত রূপ-জালাল রূপকধর্ম আখ্যায়িকা। ৪৭৫ পৃষ্ঠার বৃহৎ গ্রন্থের পদ্যাংশ মধ্যযুগের পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে রচিত, গদ্যাংশ বিদ্যাসাগর-বঙ্কিম রীতিতে রচিত। তাঁর ভাষা মার্জিত ও বিশুদ্ধ। এ ভাষা আরবি-ফারসির প্রভাবমুক্ত এবং সংস্কৃতগন্ধী। রূপজালাল আখ্যানের 'বারমাসী'র ঢঙে রচিত একটি অংশ এরূপ :

বৈশাখ আগত পুষ্প বিকশিত
সুগন্ধে আমোদিত অতি।
ঘ্রাণ পেয়ে ভৃঙ্গ করে নানা রঙ্গ
মধু পান করে নিতি॥
কার্তিকে কাতর অবলা অন্তর
চন্দ্রের কিরণ হেরি।
শরদের শশী উজ্জ্বল নিশি
মম বৈরী সে শর্বরী॥[৩০]

গদ্যের দৃষ্টান্ত : "নিম্ববৃক্ষের মূলে ইক্ষুরস সিঞ্চন করিলেও তাহাতে মিষ্ট ফল ফলে না এবং পলাশ তরুতে সতত পরিমল প্রদান করিলেও তাহার পুষ্পে কখনও সুগন্ধ ধারণ করে না।"[৩১]

শিমাইল দেশের রাজপুত্র জালাল ওমর নামক এক সাধু পুরুষের রূপবতী কন্যা রূপবানুর প্রণয় কাহিনী রূপ-জালালের বিষয়বস্তু। এক্ষেত্রে তিনি মধ্যযুগের প্রণয়োপাখ্যানগুলির কাব্যাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। রূপকথার অলৌকিতা দ্বারা কাহিনী আচ্ছন্ন। আধুনিক জীবনজিজ্ঞাসার কোন লক্ষণ গ্রন্থের মধ্যে ফুটেনি। ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকায় সম্পাদক কালীপ্রসন্ন ঘোষের অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন বলে ফয়জুন্নেসা 'অনুক্রমণিকা'য় উল্লেখ করেছেন।

২৮. ঐ, পৃ: ২৯
২৯. *শতবার্ষিকী স্মরণিকা,* কুমিল্লা ফয়জুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, কুমিল্লা, ১৮৭৫, পৃ: ৩৩
৩০. ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী—রূপ-জালাল, গিরিশ যন্ত্র, ঢাকা, ১৮৭৬, পৃ: ৪১১
৩১. ঐ, পৃ: ৩১৩

ফয়জুন্নেসার অন্য গ্রন্থগুলি দুর্লভ। জমিদার পরিবারে বাংলা সাহিত্যচর্চার দৃষ্টান্ত এই প্রথম। ফয়জন্নেসা ব্যক্তিগত চেষ্টায় গ্রন্থাগার থেকে বাংলা পুস্তক পাঠ করে বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেন। ফারসি ও উর্দু চর্চা তাঁর পারিবারিক ঐতিহ্য ছিল। বঙ্গের একপ্রান্তে আধুনিক শিক্ষা বঞ্চিতা এক বিদুষী মহিলার এরূপ সাহিত্য সাধনা বিস্ময়কর। তাঁর প্রেরণা ছিল অকৃত্রিম ও স্বতঃস্ফূর্ত।

শেখ আবদুল লতিফ

'মানব সংস্কারক' (১৮৭৮) গ্রন্থের প্রণেতা শেখ আবুল লতিফ মেদিনীপুরের অধিবাসী ছিলেন। এটি প্রবন্ধের বই। 'মনুষ্যের বর্তমান অবস্থা' ও 'মনুষ্য জীবন' এই দুভাগে ভাগ করে মোট ২১টি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। ধর্মনীতি, অর্থনীতি, রাজনীতি, সমাজ, শিক্ষা, নীতিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রবন্ধগুলি রচিত। 'বিজ্ঞাপন' শীর্ষক ভূমিকায় লেখক পাঠকের উদ্দেশ্যে বলেছেন, "আজকাল আমাদের অবস্থা অতি ভয়ানক হইয়াছে, তোমরা তোমাদের কার্য্যে অত্যন্ত অযত্ন করিতেছ, কর্তব্য প্রায়ই বিস্মৃত হইয়াছে, বিষময় ফল সহ্য করিতেছ। ... তোমাদের নয়ন উম্মীলন নিমিত্তই ইহা প্রকাশিত হইতেছে।"[৩২] তিনি অধিকাংশ প্রবন্ধে সাধারণ মানুষকে নিজেদের অধিকার, দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হতে বলেছেন। দু'একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সাম্যবাদের সুর আছে। 'বঙ্গদর্শনে' 'মানব সংস্কারকে'র সমালোচনা হয়। সেখানে লেখকের ভাষায় প্রশংসা করা হয় বটে, কিন্তু বক্তব্যের গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। "গ্রন্থকারের নাম পড়িয়া ভাষা সম্বন্ধে আমাদের ভয় হইয়াছিল কিন্তু পরে দেখিলাম যে গ্রন্থখানি হিন্দুর বাঙ্গালায় লিখিত, কায়স্থের লিখিত, ব্রাহ্মণের ভাষা বলিলেও ক্ষতি নাই। তদ্ব্যতীত প্রশংসার আর কিছুই নাই।"[৩৩] অবশ্য আবদুল লতিফের বক্তব্য একবারে তুচ্ছ ছিল না। তাঁর চিন্তাশক্তি স্বচ্ছ ও জড়তামুক্ত ছিল। মননশীল রচনা হিসাবে গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে। ।

বাংলা গ্রন্থ-প্রণেতা আরও কয়েকজন আবদুল লতিফের নাম পাওয়া যায়। এক আবদুল লতিফ 'ধর্মপ্রকাশ' (১৮৭৩) নামে একখানি মুসলমান আইন সম্বন্ধীয় পুস্তক প্রণয়ন করেন। এটি আবদুল্লাহ আল ওবায়দীর 'তুহফাতুল-হিন্দী' (উর্দু) গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ। কলিকাতার 'মর্তুজা প্রেস' থেকে এটি মুদ্রিত হয়। ঐ গ্রন্থে লেখকের ঠিকানা দেওয়া আছে : 'মৌজা খরুকা, থানা কুদনা, জেলা পূর্ণিয়া'। [৩৪]

অপর একজন আবদুল লতিফ 'মসলা বিভ্রাট' (১৯০১) নামে ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁর ঠিকানা : 'কাকিনা, রংপুর'। এটি কলিকাতার রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস থেকে মুদ্রিত হয়। [৩৫]

৩২. শেখ আবদুল লতিফ—*মানব সংস্কার*, মেদিনীপুর, ১৮৭৮, 'বিজ্ঞান' দ্রষ্টব্য।
৩৩. *বঙ্গদর্শন*, ফাল্গুন ১২৮৫
৩৪. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ২ ত্রৈ, খ., ১৮৭৪
৩৫. ঐ, ১ ত্রৈ, খ., ১৯০২

আবদুল লতিফ আহমদ 'ধর্মতত্ত্ব' (১ম খণ্ড, ১৮৯৬) শীর্ষক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এটি ঢাকার গোপীনাথ বসাক কর্তৃক 'সামন্তক প্রেসে' মুদ্রিত হয়। গ্রন্থখানি খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে বাইবেলের বিরূপ সমালোচনা করে লেখা হয়।[৩৬]

হাকিম আবদুল লতিফ ইউনানী চিকিৎসক ছিলেন। তিনি কলিকাতায় অবস্থান করতেন। 'ইউনানী হাকিমী চিকিৎসা প্রণালী' (১৮৯২) নামে তাঁর একখানি চিকৎসা বিষয়ক গ্রন্থ আছে। 'খিদিরপুর মহামেডান এসোসিয়েশনে'র সাথে তিনি জড়িত ছিলেন। [৩৭]

কাজিমউদ্দীন আলী খান

তাঁর চারখানি কবিতার পুস্তিকা পাওয়া যায় ; 'ঘর জামাইর দুঃখের কথা' (১৮৭৯), 'নবলীলা' (ঐ), 'বিধবার মনের কথা' (১৮৮৭) ও 'বাউল সঙ্গীত' (ঐ)। প্রথম দুটি ময়মনসিংহের 'আনন্দ প্রেস' থেকে ছাপা ; শেষের দুটি টাঙ্গাইল থেকে ছাপা। কবির ঠিকানা : 'চারান, আটিয়া, ময়মনসিংহ'। এগুলি লঘুরসের ব্যঙ্গাত্মক রচনা। 'বাউল সঙ্গীত' বাউল গানের সংকলন। [৩৮]

কাদের আলী

বালিয়া পালশার অধিবাসী কাদের আলী 'মোহিনী প্রেম-পাশ' (১৮৮০) নাটক রচনা করেন।[৩৯] চার অঙ্কের এই নাটকটি পারিবারিক অন্তর্জীবনের সমস্যা নিয়ে লেখা : জমিদার পুত্র রসিক ও পুত্রবধূ মোহিনীর দাম্পত্যপ্রেম নাটকের বিষয়বস্তু। রূপসী মোহিনী রূপহীন রসিককে অবজ্ঞা করলে রসিক গৃহত্যাগ করে। রূপগর্বিনী মোহিনী পর-পুরুষের প্রতি আকৃষ্টা হয় কিন্তু শীঘ্রই তার চৈতন্যোদয় হয় ও পতিপ্রেম জাগ্রত হয়। স্বামী-স্ত্রীর মিলনে নাটক শেষ হয়েছে। সমাজের প্রচলিত নিয়মের বিরুদ্ধে একটা চাপা অভিযোগ আছে — নরনারীর বৈবাহিক মিলনে ইউরোপীয় সমাজে যে স্বাধীন নির্বাচন আছে, ভারতীয় সমাজে তা নেই। এজন্য দাম্পত্যজীবনে অশান্তির কারণ হয়। অনেক সময় ব্যভিচারও প্রকাশ করে। নাট্যকার এরূপ একটা প্রশ্ন তুলেছেন বটে, কিন্তু সমাধান দিয়েছেন চিরাচরিত পদ্ধতিতে। সমাজের নিয়ম ভাঙবার মত মুক্ত চিন্তার অধিকারী তিনি ছিলেন না। কাহিনী, চরিত্র, সংলাপ, নাট্যদ্বন্দ্ব সৃষ্টিতে কাদের আলীর দুর্বলতা ছিল। নারায়ণ স্কুলের শিক্ষক রজনীকান্ত মুখোপাধ্যায়কে নাটকখানি উৎসর্গ করা হয়। নাটক রচনার প্রেরণা তাঁর কাছ থেকেই পেয়েছিলেন বলে তিনি 'উপহার-পত্রে' উল্লেখ করেছেন।

নাটকের বিজ্ঞাপনে 'প্রণয় কি পদার্থ' নামে কাদের আলীর অপর একখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। [৪০]

৩৬. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ৩ ত্রৈ, খ., ১৮৯৬
৩৭. ঐ, ৩ ত্রৈ. খ., ১৮৯২ ; দি মোসলেম ক্রনিকল ; ১৬ ফেব্রুয়ারি ১৯০১
৩৮. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ২ ত্রৈ. খ., ১৯৭৯ ; ২ ত্রৈ, খ., ১৮৮৭
৩৯. শ্রীকাদের আলী র, স, —*মোহিনী প্রেম-পাশ,* গুপ্ত প্রেস, কলিকাতা, ১২৮৭
৪০. মোহিনী প্রেম-পাশ, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

মোহাম্মদ আবদুল কাদের

ময়মনসিংহের আবদুল কাদের তিনখানি গ্রন্থ লেখেন : 'সাধু সৌরভ' (১৮৮১), 'পুষ্পোদ্যান' (১৯০১) ও 'গোলেস্তার বঙ্গানুবাদ' (১৯০৫)। প্রথমটি কবিতার বই—নিরাসক্ত অমর্ত্য প্রেমের কথা বলা হয়েছে।[৪১] পুষ্পোদ্যান সাদীর ফারসি কবিতার গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত অনুবাদ।[৪২] তৃতীয়টি ফারসি কাব্যের অনুবাদ।[৪৩]

জহিরুদ্দীন আহমদ

জহিরুদ্দীন আহমদ একজন শল্য-চিকিৎসক হিসাবে কলিকাতায় সুনাম অর্জন করেছিলেন। ১৮৭১ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে তিনি এল. এম. এস. পরীক্ষা পাশ করেন। তিনি চাকুরী জীবনে কলিকাতার 'ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুলের অস্ত্র-চিকিৎসা বিদ্যার শিক্ষক ও ক্যাম্বেল হাসপাতালের অস্ত্র চিকিৎসক' ছিলেন। শুধু ডাক্তার হিসাবে নয়, তিনি সমাজ ও সংস্কৃতি সেবক হিসাবেও কলিকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে সুপরিচিত ছিলেন। তিনি ১৮৯৫ সালে কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নির্বাচিত হন। ঐ বছর সিরাজুল ইসলাম ও বদরুদ্দীন হায়দারও নির্বাচিত হন।[৪৪]

জহিরুদ্দীন আহমদ 'ভীষক-দর্পণ' (জুলাই ১৮৯১) নামে একখানি 'চিকিৎসাতত্ত্ব বিষয়ক মাসিকপত্র' সম্পাদনা করেন। পত্রিকাখানি সরকারি অর্থানুকূল্যে চলত। এতে রোগ-ব্যাধি, চিকিৎসাপদ্ধতি, ঔষধপত্র চিকিৎসা জগতের সংবাদ ও নিবন্ধ স্থান পেত। ডা. দেবেন্দ্রনাথ রায় সহকারী সম্পাদক ও ডা. গিরিশচন্দ্র বাগচী তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ১৯০০ সাল পর্যন্ত 'ভীষক-দর্পণ' চালু ছিল। ডাক্তার নীলরতন সরকারের লেখা এতে মুদ্রিত হত। ডাক্তার আবদুল আজেদ খাঁ চৌধুরী এবং স্বয়ং সম্পাদক নিয়মিত প্রবন্ধ লিখতেন।

জহিরুদ্দীন আহমদ 'অস্ত্র-চিকিৎসা' (১৮৮৩) নামে একখানি বৃহৎ চিকিৎসা-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। শল্যচিকিৎসা বিষয়ক গ্রন্থখানি মেডিকেল কলেজের শিক্ষা ও ছাত্রগণের পাঠ্যপুস্তকের অভাব পূর্ণ করেছিল। তিনি প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বলেন, "বঙ্গভাষায় অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় উপযুক্ত পাঠ্য পুস্তকাভাবে শিক্ষার্থীগণকে শিক্ষয়িতব্য বিষয়গুলি স্ব স্ব হস্তে লিখিয়া স্মরণার্থ বহু যত্নপূর্বক সংগ্রহ করিয়া রাখিতে হয় এবং শিক্ষকগণকে স্ব স্ব উপদেষ্টব্য বিষয়গুলি ইংরাজী হইতে অনুবাদ করিয়া বাঙ্গালা শ্রেণীস্থ ছাত্রবৃন্দকে শিক্ষা দিতে হয়, ইহাতে উভয় পক্ষেরই অযথা পরিশ্রম ও অনর্থক কালক্ষেপ হইয়া থাকে। এই সকল অসুবিধা নিবারণ করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। আমি স্বয়ং অস্ত্র-চিকৎসা বিদ্যার শিক্ষকতা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া ছাত্রগণকে অভিলাষানুযায়ী শিক্ষাদানে যারপর নাই অসুবিধা বোধ করিয়াছি। তাহাতেই তিন বৎসরের অধিক হইল

৪১. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ২ ত্রৈ, খ., ১৮৮১
৪২ *ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ২ খণ্ড, পৃ: ১৬৩
৪৩. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ৩ ত্রৈ, খ., ১৯০৫
৪৪. *দি মোসলেম ক্রনিকল,* ১৪ মার্চ, ১৮৯৫

শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েরই যাহাতে উপকার হয়, এরূপ একখানি গ্রন্থ প্রচার করিতে আমার অভিলাষ জন্মে। ... কিছুদিন পরে, গবর্ণমেণ্টের অনুমত্যনুসারে মেডিক্যাল স্কুলের জন্য দেশীয় ভাষায় পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভার সভ্যগণও এ বিষয়ে আমাকে আশ্বাস ও উৎসাহ প্রদান করেন। ... এক্ষণে ঐ কার্য্যে শেষ করিয়া আমার দীর্ঘকালেব যত্নপ্রসূত 'অস্ত্র-চিকিৎসা' সাধারণের হস্তে সাদরে সমর্পণ করিতেছি। অস্ত্র-চিকিৎসা সম্বন্ধীয় বহুবিধ ইংরেজি গ্রন্থ ও সাময়িকপত্র হইতে সংগৃহীত সারাংশের অনুবাদ করিয়া ইহাতে সন্নিবেশিত করিয়াছি। আবশ্যক বোধে বঙ্গদেশস্থ লব্ধপ্রতিষ্ঠ অস্ত্র-চিকিৎসকগণের মতামতও সংকলন করিয়া স্থানে স্থানে উদ্ধৃত করা হইয়াছে।"[৪৫] জহিরুদ্দীনের ভাষা শুদ্ধ, তিনি অনেক ক্ষেত্রে পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, আবার অনেক ক্ষেত্রে তা করেননি। তাঁর রচনার একটি দৃষ্টান্ত এরূপ : "করোটীর উপরিস্থ কোমল গঠনের নাম স্ক্যালপ। উহা অকসিপিটোফ্রন্টালিজ নামক পেশীর এপিনিউরোসিসের সহিত সম্বন্ধ (যুক্ত) এবং তন্মধ্যে বহু সংখ্যক রক্তবহা নাড়ী বিদ্যমান আছে। এজন্য উহাতে ক্ষতাদি উৎপাদিত হইলে স্লাফে পরিণত না হইয়া প্রায়ই শুষ্ক হইয়া যায়।"[৪৬]

আবদুল আলা

ফরিদপুর জেলার গোয়ালন্দের-বেথুলিয়া গ্রামনিবাসী আবদুল আলা 'কবিতা কুসুমমালা' (১ ভাগ, ১৮৮৩) রচনা করেন । এতে সাদী, হাফেজ ও জামীর ফারসি কবিতার ভাবানুবাদ সহ আরও অন্যান্য কবিতা আছে। কাব্যের প্রেরণা ও উৎস সম্বন্ধে তিনি ভূমিকায় বলেছেন, "কবিতা কুসুমমালা প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। ইহার স্থানে মহাকবি সেখ সাদী, মহাত্মা হাফেজ ও মওলানা জামী প্রভৃতি সুবিখ্যাত পারসিক কবিগণ প্রণীত কতিপয় প্রসিদ্ধ ও মনোহর গ্রন্থের অন্তর্গত নানাবিধ সুললিত প্রবন্ধ, গজল ও রেখতা ইত্যাদির অনুবাদ ও মর্ম সন্নিবেশিত হইয়াছে। পারসী ভাষা যে অতিশয় মিষ্ট ও সুশ্রাব্য, ইহা কে না স্বীকার করিবেন। বিশেষত পূর্বোক্ত প্রাতঃস্মরণীয় কবিকুল কাব্যকাননে যে সমস্ত সুরভি কসুম-তরু রোপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহাদের প্রস্ফুটিত প্রসূন-রাজির সুবিমল সৌরভে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই মন প্রফুল্ল হইয়া উঠে। সেই কবিগণের সুললিত শব্দবিন্যাস ও কমনীয় কবিত্বে মুগ্ধ হইয়াই আমি তাঁহাদের কতকগুলি খণ্ড কবিতার অনুবাদে ব্রতী হইয়াছি।...অনুবাদিত খণ্ড কবিতাসমূহের মধ্যে কয়েকটি এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল।"[৪৭] 'চারুবার্তার ভূতপূর্ব সম্পাদক ও রাজস্থান অনুবাদক শ্রীযুক্ত বাবু যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়' আবদুল আলার কাব্যখানি সংশোধন করে দেন বলে তিনি ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন। ৮৪ পৃষ্ঠার এই কাব্যগ্রন্থে মোট ১৪টি কবিতা আছে। কোন কোন কবিতার

৪৫. জহিরুদ্দীন আহমদ—*অস্ত্র-চিকিৎসা বা সার্জারি*, রবার্ট প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৩ (২সং) 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

৪৬. ঐ, পৃ: ১৯৩

৪৭. আবদুল আলা—*কবি কুসুমমালা (১ ভাগ)*, রবার্ট প্রেস, কলিকাতা, কার্তিক, ১২৯০, 'ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

শীর্ষে রাগতালের উল্লেখ আছে। কবির চিত্রধর্মী ভাব ও সঙ্গীতধর্মী ভাষা বেশ উন্নতমানের ছিল।

> গভীর নিশীথ, জগত মোহিত,
> সুখের শয়নে সবে সুশায়িত
> বনপ্রিয় জাগি ধরেছে সঙ্গীত
> মনোমুগ্ধকর মধুর স্বরে।
> প্রকৃতি সুন্দরী মগনা নিদ্রায়
> বোধ হয় যেন জাগাইতে তায় ;
> পিক সুললিত সঙ্গীত শুনায়
> রহিয়ে রহিয়ে ঘুমের ঘোরে।[৪৮] (নিশীথ চিন্তা)

বিশুদ্ধ মানবপ্রেম ও প্রকৃতিপ্রেম আবদুল আলার কব্যের প্রধান বিষয়বস্তু। ফারসি কবিতার ভাবকে তিনি আত্মস্থ করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে প্রকাশ করেছেন।

সলিমুদ্দীন আহমদ

সলিমুদ্দীন আহমদের 'প্রেমাবলী' (১৮৮৩) হাফিজের সুফীমতের ফারসি কবিতার সহজ বঙ্গানুবাদ। সলিমুদ্দীন পটুয়াখালীর মুন্সেফ কোর্টের সেবেস্তাদার ছিলেন। তিনি 'হেতুবাদ' শীর্ষক ভূমিকায় লিখেছেন, "বঙ্গভাষায় সদ্ভাব শতক নামক যে গ্রন্থ আছে, তাহা অতি কঠিন রূপে প্রায় সংস্কৃত শব্দ দ্বারা লিখিত হওয়ায় সর্বসাধারণের বুঝিবার পক্ষে নিতান্ত কষ্টকর বিধায়, আমি অতি কষ্টের সহিত তাহাকে প্রায় রূপান্তরিত করিয়া সহজ বঙ্গ ভাষায় রচনা করিলাম। প্রার্থনা সর্বসাধারণের মনোরম্য এবং আদরণীয় হয় ও তদহেতু আমি সকলের আশীর্বাদ ভাজন হই।"[৪৯] পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে বিশুদ্ধ বাংলায় হাফিজের নীতিমূলক কবিতাগুলি অনূদিত হয়েছে।

আবদুল গণি

মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জের আবদুল গণির ছোট ছোট ৩ খানি বই আছে : 'হেঁয়ালী কৌমুদী' (১৮৮৩), 'মোসলেম সমাজ সমালোচনা' (১৯০৭) ও 'ইসলাম বিলাপ'। প্রথমটি ধাঁধার সংকলন : দ্বিতীয়টিতে বাংলার মুসলমান সমাজ রাজনীতি–শিক্ষা ক্ষেত্রে অবনতির কথা বর্ণিত হয়েছে ; তৃতীয়টি বাংলার মুসলমানের সমাজ–রাজনীত–শিক্ষা ক্ষেত্রে অবনতির কথা বর্ণিত হয়েছে ; তৃতীয়টি কবিতার বই।[৫০]

৪৮ *কবিতা কুসুমমালা*, পৃ. ১
৪৯. ছলিমঅদ্দিন আহমদ—*প্রেমাবলী*, সমান্তক প্রেস, ঢাকা ১৮৮৩
৫০. *মুসলমান–বন্ধু*, ১ বর্ষ ৩ সংখ্যা, ২৫ আগস্ট ১৮৮৪,

আজিজুন্নেসা খাতুন

তেঁতুলিয়ার জমিদার-পত্নী আজিজুন্নেসা 'হারমিট বা উদাসীন' (১৮৮৪) নামে টমাস পার্নেলের বীররসাত্মক 'হারমিট' গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করেন। হামিদুল্লাহ খান তাঁর স্বামী ছিলেন। সম্ভবত তিনিই প্রথম ইংরাজি শিক্ষিত বাঙালি মুসলমান মহিলা। সমকালীন সাপ্তাহিক 'মুসলমান-বন্ধু'তে হারমিটের সমালোচনা হয়। তাতে লেখা হয় : "অধুনা বঙ্গদেশে মুসলামন স্ত্রীগণের মধ্যে কবিত্ব বড় দৃশ্যমান হয় না বোধ হয় প্রণয়িত্রী (লেখিকা) পাঠক-পাঠিকাদিগের নিকট বিশেষ আদৃতা হইবেন।"[৫১]

ফজলর রহমান

ফজলর রহমান পাবনার সিরাজগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮৭৮ সালে কলিকাতা মেডিকেল কলেজ থেকে এল. এম. এস. পাশ করেন। তিনি কলিকাতায় প্র্যাক্‌টিস করতেন। তিনি মহীশূর রাজ পরিবারের গৃহ-চিকিৎসক ছিলেন।[৫২] চিকিৎসা বিষয়ক তাঁর দুখানি পুস্তক আছে : 'যকৃৎ প্লীহা, মূত্রপিণ্ড ও তদনুসঙ্গিক অন্যান্য যন্ত্র সকলের পীড়া' (১৮৮৪) ও 'বক্ষঃপীড়া' অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস, রক্ত সঞ্চালন ও লিম্ফবাহিকা সম্বন্ধীয় যন্ত্র সকলের পীড়া' (১ম ও ২য় খণ্ড, ১৮৮৬)। রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে গ্রন্থকার 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন, "শ্বাস প্রশ্বাস এবং রক্তসঞ্চালন সম্বন্ধীয় যে পীড়া ভেষকের অধীন তৎসমুদয় ইহাতে সুবিস্তৃতরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, অত্র বক্ষঃপীড়াখানি বিশেষতর রবার্টের প্রণালীমতে যথাযথ স্থানে বিন্যস্ত হইয়াছে ; রবার্ট, নিমায়ার, ফদারজিল্ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গ্রন্থ ও নব আবিষ্ক্রেতা ও বর্তমান প্রচলিত সুবিজ্ঞ চিকিৎসকদিগের মত হইতে উদ্ধৃত। বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ পুস্তক খণ্ড অদ্যাপি প্রকাশিত হয নাই। ইহাতে মেডিকেল স্কুলেব ছাত্রদিগের পরীক্ষোপযোগী বিষয় সকল বিস্তারিতরূপে বিবর্ণিত আছে, অথচ চিকিৎসা ব্যবসায়ী এবং তদ্ব্যতীত অন্যান্য যে সকল ব্যক্তিগণ স্কুলে অধ্যয়নও না করিয়াছেন তাঁহারাও ইহা দ্বারা যথেষ্ট উপকারে সমর্থ হইতে পারিবেন।"[৫৩] ফজলর রহমানেব ভাষা সহজবোধ্য ও ব্যাকবণগত শুদ্ধ; তবে তিনি চিকিৎসাবিদ্যার বিশিষ্ট শব্দগুলির বাংলা প্রতিশব্দ প্রায় ব্যবহাব করেননি।

মোহাম্মদ আব্বাস আলী (১৮৫৯-১৯৩২)

২৪-পরগণার বসিবহাট মহকুমার চণ্ডীপুর গ্রামে আব্বাস আলী জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি কলিকাতার 'আলতাফী প্রেসে'র ম্যানেজার হিসাবে বহু গ্রন্থ প্রচাবে সহায়তা করেন। তিনি এক সময় 'মোহাম্মদী' পত্রিকার কার্য্যাধ্যক্ষ হন। 'চণ্ডীপুর ইসলামী মেলা তিনি প্রবর্তন করেন। তিনি বসিরহাটের অনারেরী ম্যাজিস্ট্রেট ও লোকাল বোর্ডের সদস্য ছিলেন। তিনি

৫১. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ২ ত্রৈ, খ., ১৮৮৩; ১ ত্রৈ, খ.,
৫২. ফজলর রহমান—*বক্ষঃপীড়া*, বিধান প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬, আখ্যা পত্র দ্রষ্টব্য।
৫৩. ঐ, বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য।

ধর্মবিষয়ক একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যথা 'মেসবাহুল মসলেমিন' (১৮৭৯), 'গোলজার এসলা' (১৮৮১), 'মরহম উৎসব' (১৮৮৪), 'ফতুহুস সাম' (১৯০৫), 'বঙ্গানুবাদ কোরান শরীফ' (১৯০৭), 'মসায়েলে জহুরিয়া' (ঐ), 'ফতুহল মেসের' (১৯১২), 'জুম্মার খুতবা' ইত্যাদি।

'মহরম উৎসব' বিষপ্রয়োগে ইমাম হাসানের মৃত্যু থেকে কারবালার যুদ্ধে ইমাম হোসেনের মৃত্যু পর্যন্ত বিষাদময় কাহিনী নিয়ে রচিত। গ্রন্থরচনার উৎস ও উদ্দেশ্যের কথা ব্যাখ্যা করে লেখক 'বিজ্ঞাপনে' লিখেছেন, "... মহম্মদ দৌহিত্র হাসেন ও হোসেন প্রাণত্যাগ স্মরণ রাখিবার জন্য ও তাঁহাদিগের জন্য শোকপ্রকাশ করাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য। আরব্য ও পারস্য ভাষায় এই সম্বন্ধে বহু সংখ্যক গ্রন্থ আছে। ... বাঙ্গালা দেশের বঙ্গভাষাজ্ঞ মুসলমানদিগের এই সম্বন্ধে সত্য বিবরণ অবগত হইবার কোন উপায় নাই। এই অভাবপূরণ করিবার জন্য 'সিররুস সাহাদতেন' 'ছাওয়াএকে মহরেকা', 'তহরিরুস সাহাদাতেন', 'জিকরুস সাহাদতেন' ও 'এনাসিরুস সাহাদতেন' প্রভৃতি বিশ্বাসযোগ্য পুস্তক হইতে এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সংগৃহীত হইল। ইহা দ্বারা ধর্মবিরুদ্ধ মহরমের আমোদ যদি কিঞ্চিৎ পরিমাণে দমন হয় তাহা হইলে শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।"[৫৪] তিনি ভারতবর্ষে যেভাবে মহরম উৎসব পালিত হয়, তার বিরোধিতা করেছেন। তাজিয়া নির্মাণ, তাজিয়াদি সহ শোকযাত্রা ও তাজিয়া বিসর্জনকে তিনি হিন্দুদের মূর্তিপূজার ও প্রতিমা বিসর্জনের নকল বলে উল্লেখ করেছেন।[৫৫] তিনি এরূপ শরীয়ত বিরোধী ধর্মানুষ্ঠান বন্ধ করার সপক্ষে মত প্রচার করেছেন।

সৈয়দ আবদুল আগফর

সৈয়দ আবদুল আগফর শ্রীহট্টের লস্করপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দুখানি গ্রন্থের নাম জানা যায় — 'তরফের ইতিহাস' (১৮৮৬) ও 'ইসলাম দর্পণ' (১৯০৩)। 'তরফের ইতিহাসে' তরফের শাসনকর্তা আচক নারায়ণকে পরাভূত করে পাঠান সেনাপতি সৈয়দ শাহ সমিরুদ্দীন কর্তৃক ক্ষমতা বিস্তার ও তাঁর বংশধরগণের শাসনের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।[৫৬] লেখকের মতে 'তরফের প্রসিদ্ধ সাত আনী , -নয় আনীর জমিদারদিগের বিশেষ বিবরণ' এই গ্রন্থখানি। তিনি 'নয় আনী' জমিদারগণের যে বংশ-লতিকা দিয়েছেন, তাতে শেষ অধস্তন পুরুষ হিসাবে তাঁর নাম আছে। ইতিহাস সম্পর্কে লেখকের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি ছিল এবং জাতীয় জীবনে ইতিহাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে স্বচ্ছ ধারণা ছিল। তিনি গ্রন্থের 'উপক্রমণিকা'য় বলেছেন, "ইতিহাস' এই বর্ণ চতুষ্টয় মানবজগতের অতীত

---

৫৪. মোহাম্মদ আব্বাস আলী— *মহরম উৎসব*, পোস্ট-ডেসপ্যাচ প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৪, 'বিজ্ঞাপন'

৫৫. বিবেচনা করিয়া দেখুন আপনারা নিজ হস্তে হাসেন ও হোসেনের 'কবর' প্রস্তুত করিয়া 'জিয়ারৎ' কবেন, আর হিন্দুরা মৃত্তিকা দ্বারা পুত্তলিকা গড়াইয়া পূজা করে, এই দুই কার্য্যে প্রভেদ কি? মহরম সবার নিয়মানুসারে কি শিয়া, কি সুন্নি সকল মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে পাপজনক।" ঐ , পৃ:। (উপক্রমণিকা)।

৫৬. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ৪ ত্রৈ, খ., ১৯৮৬

কালের সাক্ষী, বর্তমানের উপদেষ্টা ও ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক। ইতিহাস জাতীয় উন্নতির এক প্রধান অবলম্বন, পতিত জাতির উন্নতি সাধনে সিদ্ধমন্ত্র, পূর্বপুরুষের শৌর্য্য, বলবীর্য্য, ধৈর্য্য ও জ্ঞান গাম্ভীর্য্যাদির অঙ্গ যখন দৃষ্টিপথে পতিত ও মানসক্ষেত্রে প্রতিভাসিত হয় তখন মানবের হৃদয়াভ্যন্তরে এক প্রকার মহাশক্তি আসিয়া প্রবেশ করে। সেই শক্তিযোগে অতি নির্জীব আত্মাও তেজোবল সম্পন্ন হইয়া উঠে।"[৫৭] তিনি আরও বলেছেন, "কেবল কতকগুলি যুদ্ধবিগ্রহাদি বর্ণনা করিয়া একটা প্রকাণ্ড পুস্তক লিখিলেই যে তাহা প্রকৃত ইতিহাস নামে বাচ্য হইতে পারে, তাহা নহে। ইতিহাসে যে কোন জাতীয় মানুষের রীতিনীতি কার্য্যকলাপ ও আচার ব্যবহার ও অবস্থাদি সম্যকরূপে পরিবর্ণিত হওয়া চাই। যাহাতে এক জাতীয়, এক দেশীয় বা এক ধর্মাক্রান্ত সম্প্রদায় বিশেষের যাবতীয় সত্যপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ হইতে পারে, তাহাই প্রকৃত ইতিহাস।"[৫৮] সৈয়দ আবদুল আগফর বাঙালির ইতিহাসচেতনা সম্পর্কে মন্তব্য করে লিখেছেন, "অধুনা এদেশে যে সমস্ত ইতিহাস প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই ভিন্ন জাতি ও ভিন্ন দেশীয়ের প্রণীত। বাঙ্গালা ভাষায় তাহারই অনুবাদ মাত্র। তদ্ভিন্ন ঐতিহাসিক সত্যোদ্ধারের জন্য কি অনুসন্ধানের জন্য কেহই যে যত্নপব হইয়াছেন তাহার প্রমাণ অতীব বিরল। ... ভিন্ন দেশীয় যতই কেন দূরদর্শী হউন না, তিনি কখনই সেই ভিন্নদেশের ভিন্ন জাতির ভিন্ন ধর্মাবলম্বীর সামাজিক কি নৈতিক আচার ব্যবস্থার রীতিনীতি সম্পূর্ণ অবগত হইতে পারেন না। মাত্র কতকগুলি সাধারণ প্রচলিত আচার ব্যবহাব এবং প্রসিদ্ধ ঘটনার উল্লেখ মাত্র করিয়া থাকেন, আবার তাহাও জাতীয় স্বার্থপরতা দোষে কলঙ্কিত।"[৫৯] লেখক এখানে ইংরাজ কর্তৃক রচিত বাংলা ও ভারতের বিকৃত ইতিহাসের প্রতি কটাক্ষ করেছেন। স্বদেশবাসীর দ্বারাই স্বজাতির প্রকৃত ইতিহাস লেখা সম্ভব বলে তিনি ধারণা করেছেন। ফরিদপুর চাওচা নিবাসী শশিভূষণ গুহ ও ঢাকা বাশরী গ্রাম নিবাসী মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ গ্রন্থ প্রণয়নে লেখককে সাহায্য করেন।[৬০] সৈয়দ আবদুল আগফারের ভাষা মার্জিত, বিশুদ্ধ ও সাবলীল। তিনি তাঁর বিঘোষিত নীতির আলোকে 'তরফের ইতিহাস' লেখার চেষ্টা করেছেন। এটি মুখ্যত পারিবারিক ইতিহাস, তৎসত্ত্বেও লেখক তরফের ভূগোল, প্রকৃতি, জনগণ, সমাজ, ধর্ম, শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করেছেন।

হাফেজ নিয়ামতুল্লা

হাফেজ নিয়ামতুল্লা রচিত 'খৃষ্টধর্মের ভ্রষ্টতা' নামে একখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় শেখ জমিরুদ্দীন রচিত 'মেহের চরিত' (১৯০৯) গ্রন্থে। জমিরুদ্দীন লিখেছেন, "হাফেজ

৫৭. সৈয়দ আবদুল আগফার—*তরফেব ইতিহাস*, জাহ্নবী যন্ত্র কলিকাতা, ১২৯৪, পৃ.।. (উপক্রমণিকা)।

৫৮. ঐ, পৃ:।

৫৯ *তরফের ইতিহাস*।

৬০. ঐ, পৃ. ৩

নিয়ামুতল্লা একজন সুবিখ্যাত তার্কিক ও উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। কলিকাতা গোলতালাব (ওয়েলিংটন স্কোয়ার) তাঁহার কার্যস্থল ছিল। তিনি জীবনে অনেক হিন্দু, নেটীভ খৃষ্টান ও ইংরেজকে ইসলামে দীক্ষিত করিয়া ছিলেন।"[৬১] মুনশী মেহেরুল্লা যশোহরে দর্জির দোকানে যখন কাজ করতেন, তখন পাদরী ব্রজনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পাদরী আনন্দ রায়ের প্রভাবে মেহেরুল্লা খ্রীষ্টধর্মে আকৃষ্ট হন কিন্তু সে-সময় হাফেজ নিয়ামতুল্লার 'খ্রীষ্টধর্মের ভ্রষ্টতা' ও মোহাম্মদ এহসানুল্লার 'ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদের খবর আছে' (১৮৮৫) গ্রন্থ দুখানি পাঠ করে তাঁর স্বধর্মে আস্থা ফিরে আসে।[৬২] হাফেজ নিয়ামতুল্লার গ্রন্থখানি দুষ্প্রাপ্য। এটি যে ১৮৮৫ সালের পূর্বে লেখা হয়েছিল এবং এতে খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছিল, তা উপরের তথ্য থেকে বলা যায়।

মোহাম্মদ এহসানউল্লা

এহসানউল্লাহ পূর্বনাম ছিল ঈশানচন্দ্র মণ্ডল, খ্রীষ্টানধর্মাবলম্বী বাঙালি। নিউ টেস্টামেন্ট ও ওল্ড টেস্টামেন্টের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী উক্তি দেখে তাঁর মনে সন্দেহের উদ্রেক হয়। নিউ টেস্টামেন্টে ইসলাম ধর্ম মহম্মদের আগমনের ভবিষ্যৎ বাণী আছে—সেখানে যিশুখ্রিষ্টের অনুসারীদের মহম্মদের ধর্মে দীক্ষা নিতে বলা হয়েছে। এরূপ যুক্তির ভিত্তিতে ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নেন ও মোহাম্মদ এহসানউল্লা নাম গ্রহণ করেন। তিনি 'ইঞ্জিলে মহম্মদ সাহেবের খবর আছে' (১৮৮৫), 'শ্রীঈশানচন্দ্র মণ্ডল খ্রীষ্টানের মুসলমান হইবার কারণ' (ঐ) নামে দুখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। গ্রন্থ দুটিতে বাইবেলের বিরোধমূলক তত্ত্ব, পাদরিগণের কার্যকলাপ এবং নিজের ধর্মান্তরগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন।[৬৩] এহসানউল্লা পাঁচ বছর পরে আবার খ্রিষ্টান হন।[৬৪]

দৌলত আহমদ এম. এম. দাহার (১৮৭০–১৯৪৪)

দৌলত আহমদ ত্রিপুরা সদরের সোনামুড়ার কুলুবাড়ীর অধিবাসী ছিলেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মোহাম্মদ হাসিম মজুমদার। তিনি কুমিল্লা জেলা স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করেন। তিনি প্রথমে সোনামুড়া স্কুলে শিক্ষকতা করেন, পরে বিএল পাশ করে সেখানে কোর্টের উকিল হন। তিনি ত্রিপুরা রাজ্যে রাজকবির মর্যাদা পান এবং 'কাব্যবিনোদ' ও 'সাহিত্যবত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন।

দৌলত আহমদ কাব্য, কাব্য-নাট্য, ব্যাকরণ, শিশুপাঠ্য প্রভৃতি বিষয়ক বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'কুসুমমঞ্জরী' (১৮৮৬), 'প্রাণ কাঁদে কেন' (১৮৮৮), 'ভূ-পৃষ্ঠ পরিচয়'

৬১ শেখ জমিরুদ্দীন— *মেহের চরিত*, সিরাজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৯, পৃ. ৮ (পাদটীকা)।

৬২ ঐ পৃ ৮

৬৩ *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটলগ*, ২ ত্রৈ. খ., ১৮৮৫

৬৪ "ইনি হাফেজ নেয়ামতুল্লা সাহেবের সঙ্গে তর্কে পরাস্ত হইয়া ১২৯১ সালে প্রকাশ্যে মুসলমান হইয়া ৫ বৎসর পরে আবার খৃষ্টান হইয়াছেন।"
ইসলাম প্রচারক, বৈশাখ ১২৯৯

(১৮৯৫), 'ককবরমা বা ত্রিপুরা ব্যাকরণ' (১৮৯৮), 'নামাজের উপদেশ' (১৯০৪) 'পুরুষ প্রসঙ্গ' (ঐ), 'জীবন-মঙ্গল' (১৯০৫) 'স্বপ্নদৃশ্য' (১৯০৬) 'নববোধ', (১৯০৯), 'সমাজ-সংস্কার' (১৯১৪), 'কুন্দকলি' (১৯১৮), 'বঙ্গভিখারী', 'রাজউৎসব', 'হয়ন্তিক', 'রাজশ্রী', (১৩৩৭ ত্রিপুরাব্দ) ইত্যাদি তাঁর গ্রন্থের নাম। তাঁর কাব্যের বিষয়বস্তু অধ্যাত্ম প্রেম ও নীতিকথা।

'কুসুমমঞ্জরী' ২৪ পৃষ্ঠার কবিতাপুস্তক। এতে শিশুদের পাঠ্যোপযোগী ১৭টি নীতিগর্ভ কবিতা আছে। শিশুবোধ্য বলে কবির ভাষা সরল, বক্তব্য সরল।

দেখিতে সুবুদ্ধিমান গম্ভীর প্রকৃতি,
বিদ্যা শিখিবারে চেষ্টা, শুভকার্য্যে মতি।
কারো সাথে করে না অসৎ ব্যবহার,
সুপথে থাকিয়া করে যশের সঞ্চার।[৬৫] (সুশীল)

'ভূ-পৃষ্ঠ পরিচয় বা ভূচিত্র দেখিবার সহজোপায়' ৩৬ পৃষ্ঠার ভূগোল বিষয়ক শিশুপাঠ্য বই। লেখক ভূমিকায় বলেছেন, "কোন প্রকার ভৌগোলিক বিবরণ অবগত করান, এই পুস্তক সঙ্কলনের উদ্দেশ্য নহে ; কেবল ভূ-পৃষ্ঠের স্থানসমূহ পরিচয় করিবার সহজোপায়ই ইহার শিক্ষণীয় বিষয়। কোমলমতি বালক বালিকার পক্ষে ভূ-চিত্র দর্শন, ভূ-বিবরণ অধ্যয়ন করা অতি সহজ বলিয়া অনুমান হয়। স্থানসমূহের সাধারণ নামবোধ পরিচায়ক স্থানীয় নামের আকার দর্শন এবং কোন্ কোন্ স্থানে ভূ-পৃষ্ঠের কোন খণ্ডে আছে এ সমস্ত বিশেষ রূপে জানিয়া লওয়া, নতুন ভূগোল শিক্ষার্থীগণের প্রথম কর্তব্য। এই কর্তব্য সম্পন্নের জন্য ইহাকে নিম্নশ্রেণীতে ১ম পাঠোপযোগী করার বাসনায় অন্যান্য ভূগোল হইতে পৃথকাকারে প্রকাশ করা হইল।"[৬৬] ত্রিপুরার স্কুলসমূহের সব-ইনস্পেক্টর রমেশচন্দ্র দাস বিএ গ্রন্থখানি সংশোধন করে দিয়েছেন বলে দৌলত আহমদ উল্লেখ করেছেন।

দৌলত আহমদ ও মোহাম্মদ উম্মর যুগ্মভাবে 'ককবরমা অং ত্রিপুরা ব্যাকরণ' রচনা করেন। গ্রন্থের ভূমিকায় দৌলত আহমদ লেখেন, "সাধারণ বাঙ্গালী জাতির ন্যায় ত্রিপুরাগণ নানা শ্রেণীতে বিভক্ত ; তাহাদের প্রত্যেককে দফা বলে যথা—সিযো, কোয়াই তুইযা, দুইসিং বা দৈওসিং ও বাসাল ইত্যাদি। ইহারা যে ভাষার ব্যবহার করিয়া থাকে উহাই ত্রিপুরা ভাষানামে আখ্যাত। ত্রিপুরা অনতিবিস্তৃত এবং এই ভাষাতে কোন লেখাপড়া প্রচলন নাই, অথচ ইহাতে শব্দের চতুরতা, মধুরতা ও কোমলতা প্রভৃতির সুন্দর পারিপাট্য রহিয়াছে। এমতাবস্থায় এই ভাষার লেখাপড়া ও ব্যাকরণ প্রচলন হওয়া সঙ্গত বলিয়া আপাতত এই ভাষার সংক্ষিপ্ত একখানা ব্যাকরণ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইলাম।"[৬৭] ১৩০৭ সনের ২০ পৌষের 'এডুকেশন গেজেটে' ককবরমার সমালোচনা হয়। "ব্যাকরণখানি দেখিয়া প্রীত

৬৫ দৌলত আহমদ- *কুসুমমঞ্জরী*, সিংহযন্ত্র, কুমিল্লা, মাঘ ১২৯২, পৃ. ১
৬৬ দৌলত আহমদ--ভূ-*পৃষ্ঠ পরিচয়,* অমর যন্ত্র, কুমিল্লা, ১৩০২
৬৭ দৌলত আহমদ—*ককবরমা,* অমর যন্ত্র কুমিল্লা, পৌষ ১৩০৭ ত্রিং., 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

হইলাম। ভাষাতত্ত্ব অনুসন্ধানীর বিশেষ উপকার হইবে। গ্রন্থের শেষভাগে অনেকগুলি শব্দার্থ সংগৃহীত হইয়াছে। উহা আরও একটু বিস্তৃত হইয়া প্রকৃত অভিধানের ন্যায় হইলে আরও ভাল হইত।"[৬৮] 'পুরুষ প্রসঙ্গ' ৩২ পৃষ্ঠার কাব্যপুস্তিকা। এতে যোগতত্ত্বের কথা আছে। তিনি যোগধারায় কবি নবীনচন্দ্র সেনের সাথে একাত্মতা অনুভব করেছেন।

অবতার আমি তব
যেন মন প্রাণ,
আর এক ফটোগ্রাফি ;
সম্মুখে দর্শন।
কবিবর নবীনচন্দ্র সেন।. . .
তোমাতে যেমন তুমি, আমাতে তেমন
বাহ্যদৃশ্য এক কিন্তু শরীর গোপন। [৬৯]

দৌলত আহমদের 'জীবন-মঙ্গল' একটি রূপক কাব্যনাট্য। হিন্দু পুরাণাশ্রিত কাহিনী অবলম্বনে 'জীবন, নিবৃত্তি মায়া, প্রবৃত্তি, কাম, ক্রোধ, স্মৃতি, মোহ ইত্যাদি নৈর্ব্যক্তিক চরিত্র কল্পনা' দ্বারা এটি রচিত হয়েছে। 'প্রথমপট' থেকে 'বিংশপট' পর্যন্ত কাহিনী বিস্তৃত হয়েছে। গ্রন্থখানি ত্রিপুরার 'শ্রীল শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কিশোর দেববর্মা যুবরাজ গোস্বামী বাহাদুর'কে উৎসর্গ করা হয়েছে।[৭০]

আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী (জন্ম ১৮৪০)

পুলিশ সব-ইনস্পেক্টর আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী 'জীবনচরিত' (১ম খণ্ড ১৮৮৯) নামে আত্মজীবনী লিখেন। বাঙালি মুসলমানের লেখা প্রথম আত্মকথা হিসাবে গ্রন্থখানির ঐতিহাসিক মর্যাদা আছে। বাল্যকাল থেকে শুরু করে চাকুরীজীবনে প্রতিষ্ঠালাভ পর্যন্ত জীবনকথা গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। লেখক ভূমিকায় বলেছেন, "ইহা (জীবনচরিত) পাঠে কি শ্রবণে অন্যের তত সুখ দুঃখ বোধ হইতে নাও পারে, কেননা ইহাতে রঙ্গরসের কোনও কথা নাই কিন্তু যিনি আমাকে একটুকু ভালবাসেন কি চিনেন অথবা আমার ন্যায় সুখের তরী দুখের তরঙ্গিনীতে নিমগ্ন হইয়া তুঙ্গ তরঙ্গে ভাসিতে ভাসিতে খোদাতালার নাম স্মরণে ও তাঁহার দয়ায় ভেলা অবলম্বনে কূলে উঠিয়াছেন, তাঁহার অবশ্যই পাঠের বা শ্রবণের অযোগ্য হইবে না, সন্দেহ নাই।"[৭১] জীবনচরিত থেকে জানা যায়, আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী পাবনা জেলার বরাট গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতামহ থানার দারোগাগিরি করে জমিদার হন। অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতার দোষে তাঁর পিতা ভূসম্পত্তি হারান। আজিমুদ্দীন বগুড়ায় কিছুকাল লেখাপড়া শিখে প্রথমে পুলিশের থানায় 'বক্সিগিরি

---

৬৮. *এডুকেশন গেজেট,* ২০ পৌষ ১৩০৭ (দৌলত আহমদ কৃত 'জীবন-মঙ্গল' গ্রন্থে উদ্ধৃত)।
৬৯. দৌলত আহমদ—*পুরুষ প্রসঙ্গ,* উপেন প্রেস, কুমিল্লা, ১৯০৪, পৃ. ১৭-১৯
৭০. দৌলত আমদ— *জীবন মঙ্গল,* উপেন প্রেস, কুমিল্লা, ১৯০৫
৭১. আজিমুদ্দিন মোহাম্মদ চৌধুরী— *জীবনচরিত,* সত্য প্রকাশ যন্ত্র, বরিশাল, ১৪ বৈশাখ ১২৯৬

ব্যবসায় (পত্রনবিশী) শুরু করেন। ১৮৬৮ সালে হেড কনস্টেবল হিসাবে পুলিশের চাকুরীতে প্রবেশ করেন এবং পরে সব-ইনস্পেক্টর পদে উন্নীত হন। লেখকের বর্ণনাভঙ্গি সরল ও অকপট। সাধারণত আত্মজীবনীতে ভাষা মুক্ত ও সাবলীল হয়। আজিমুদ্দীন তাঁর গ্রন্থে ভাবের অন্তরঙ্গতা ও ভাষার স্বচ্ছন্দতা রক্ষা করতে পেরেছেন। স্বীয় পারিবারিক জীবনের কথা বলতে গিয়ে তিনি স্বসমাজের ক্ষয়িষ্ণু ছবিটিও তুলে ধরেছেন।

মকবুল আলী (মৃত ১৮৯৯)

মকবুল আলী ত্রিপুরা গুণিয়াউকের জমিদার ছিলেন। তিনি ১৮৯০ সালে ঢাকা কলেজ থেকে বিএ পাশ করেন। তিনি একাধিক সভাসমিতি ও পত্রপত্রিকার সহিত যুক্ত ছিলেন। পত্রিকায় প্রবন্ধ ছাড়াও কয়েকখানি ধর্মবিষয়ক পুস্তিকা রচনা করেন যেমন, 'নামাজ' (১৮৮৯), 'রোজা' (১৮৯১) 'মেনহাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ' (১৮৯৯), 'ইসলাম প্রচারের সহজ উপায়' ইত্যাদি।[৭২] প্রথম গ্রন্থখানি সৈয়দ আবদুল জব্বারের সহযোগিতায় যুগ্মভাবে প্রণীত। ধর্মকর্ম পালন করার জন্য বাংলা গ্রন্থের অভাব ছিল। মকবুল আলী এই অভাব পূরণ করার জন্য লেখনি ধারণা করেছিলেন। ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট আবুল খায়ের মোহাম্মদ সিদ্দিক এমএ এবং পূর্বাঞ্চলীয় মুসলমান শিক্ষার সহকারী ইনস্পেক্টর আবদুল করিম 'নামাজ' পাঠ করে ব্যক্তিগত পত্রে গ্রন্থের উপযোগিতার কথা উল্লেখ করেন এবং লেখকদ্বয়কে উৎসাহিত করেন। মকবুল আলী ও সৈয়দ আবদুল জব্বার তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র ছিলেন। আবুল খায়ের লিখেছেন (২০ জুলাই ১৮৯০), "I read lately, with much pleasure, a brochure in Bengali, named 'Namaz' published by Moqbul Ali Shahib and Sayyid Abdul Jabbar Shahib, both students of the Dacca College. The tract consists of an exposition of the temporal and spiritual virtues of the daily prayers enjoined to the Mahomadan religion. The reasons adduced in proof of the statements from the Quran and the Traditions as well as the logical arguments advanced are all convincing and delightful to the reader...Similar tract on other observances of our religion will greatly benefit our students and generally all Bengali Mussalmans of this Provinces."[৭৩]

আবদুল করিমের বক্তব্য ছিল অধিক তাৎপর্যপূর্ণ। আধুনিক বিজ্ঞান দর্শন শিক্ষার জন্য মুসলমান তরুণরা স্বধর্মের প্রতি অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে। নামাজ, রোজা, জাকাৎ ইত্যাদি ইসলাম ধর্ম সম্পর্কিত গূঢ়তত্ত্বের বিষয়গুলি হেগেল, হিউম, মিল প্রমুখের প্রভাব বিস্তারের আগেই মুসলমান তরুণদের হৃদয়ে সঞ্চার করতে হবে। তাঁর ভাষায় (১৮ জুলাই ১৮৯০), "The publication of the pamphlet is very opportune when the

৭২. *ইসলাম প্রচারক*, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০
৭৩. মকবুল আলী প্রণীত *'রোজা'* গ্রন্থে উদ্ধৃত, পৃ. (১)

materialistic ideas and their concomitant scepticism and godlessness infused into the minds Young Moslems by the study of modern science and philosophy are leading them astray from the right path of their true religion. such pamphlets may be considered as demand of the time. The publication of a few such fundmental principles of Muhammadanism. such as 'Roza', 'Zakat' & c is likely to create a reaction in the minds of Young Moslems and give Islam that fast hold. it once had. upon the minds of its young voteries, before works like those of Hegel. Hume. Mill. Bain and others found their way into the hands of our youngmen"[৭৪] আবদুল করিম ও আবুল খায়েরের এই প্রেরণা থেকে মকবুল আলী পরের বছর 'রোজা' নামক পুস্তক রচনা করেন। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "নামাজের ন্যায় রোজাও ইসলামের একটি প্রধান অঙ্গ। কোন বিশেষ আপত্তির কারণ না থাকিলে, রোজা পালন করা মুসলমান মাত্রেরই অবশ্য কর্তব্য কার্য্য। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয় যে, নব্যশিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতাদের মধ্যে অনেকেই আজ কাল রোজা পালনে অবহেলা করিয়া থাকেন। ইহার কারণ এই যে, বর্তমান সময়ে বঙ্গদেশে অনেক মুসলমান ভ্রাতাই বাঙ্গলা এবং ইংরাজী ভিন্ন কোন ভাষা জানেন না ; তাঁহারা কোন কার্য্যেরই এমন কি ধর্মবিধিরও গূঢ়তত্ত্ব, উপকারিতা ও আবশ্যকতার বিষয় ভালরূপে উপলব্ধি করিতে না পারিলে, তাহা প্রতিপালন করিতে চাহেন না। সুতরাং তাঁহাদিগকে ধর্মকার্য্যেই রত করিতে হইলে সমুদয় ধর্মকার্য্যের গূঢ়তত্ত্ব ও আবশ্যকতা বিষয়ক ছোট ছোট গ্রন্থ বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এ পর্যন্ত বঙ্গভাষাতে অতি অল্প গ্রন্থই প্রকাশিত হইয়াছে ; উক্ত অভাব দূরীকরণার্থে ইতিপূর্বে আমার 'নামাজ' সম্বন্ধে একখানা ছোট বহি জনসাধারণে প্রচারিত করিয়াছি ; এবং এখনও সেই উদ্দেশ্যেই রোজা সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানা প্রচারিত হইল। ইহাতে রোজার আবশ্যকতা, মহাত্ম্য, সৌন্দর্য, উপকারিতা ইত্যাদি বিষয় কোরান এবং হাদিস হইতে বিশদরূপে বর্ণনা করা গিয়াছে ; এবং শেষভাগে রোজার বিরুদ্ধবাদীদের আপত্তি যুক্তি এবং তর্ক দ্বারা খণ্ড করা হইয়াছে।"[৭৫]

মকবুল আলীর তৃতীয় ও শেষ গ্রন্থ 'মেনহাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ'। তিনি ভূমিকায় বলেন, যে পথে চলিলে , মানুষ, মনুষ্য জন্ম ও নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া, ইহ-পরলোকে সুখসম্মানে কালযাপন করিতে পারে, কোন জাতি বা ধর্মবিশেষে তাহাই এই গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে। ইহাতে কোন জাতিগত ভাব বা ঈর্ষা বিদ্বেষের চিহ্ন নাই। সুতরাং ইহা পাঠে সর্ব সাধারণ উপকার লাভ করিতে সক্ষম।[৭৬]নীতি বিষয়ক উক্ত ফারসি গ্রন্থের 'মাতৃভাষার ভাণ্ডারে একটি অপূর্ব রত্ন সঞ্চিত হইবে' এরূপ আশার বশবর্তী হয়ে তিনি এটি প্রণয়ন করেন। 'মেনহাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ' রচনার অনতিকাল মধ্যেই লেখক মৃত্যু বরণ করেন।

---

৭৪. ঐ, পৃ. (২-৩)
৭৫. মকবুল আলী— *রোজা*, হিতৈষিণী যন্ত্র, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৩৩৮ (২ সং) 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
৭৬. মকবুল আলী— *মেনহাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ*, ১৮৯৯, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

অপর এক মকবুল আলী চট্টগ্রামে পটিয়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'বাল্যখেলা' (১ ভাগ ১৮৮৩) নামে একখানি নীতিশিক্ষা মূলক ক্ষুদ্র কবিতার বই প্রকাশ করেন। তিনি এতে মুসলমানদিগকে অলসতা ত্যাগ করে জাগ্রত হওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।[৭৭]

মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ

তিনি খুলনা জেলার সাতক্ষীরার বাঁশদহ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের আরবি ও ফারসি ভাষার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি একাধারে শিক্ষাবিদ, অন্যাধরে সাহিত্যানুরাগী ও সমাজসেবক ছিলেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ তাঁকে 'সমাজহিতৈষী মহাপ্রাণ' বলে উল্লেখ করেছেন।[৭৮] শেখ আবদুর রহিম তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'হজরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১৮৮৭) মেয়ারাজউদ্দীন পরামর্শে ও সাহায্যে প্রণয়ন করেন। 'সুধাকব' পত্রিকার সাথে যুক্ত থেকে মেয়ারাজউদ্দীন উর্দু পত্রিকা থেকে 'মালমসলা' সংগ্রহ করে সেগুলি অনুবাদ করে দিতেন। 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র অনুরোধে তিনি ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ একত্রে বালিকাদের শিক্ষোপযোগী 'তোহফাতুল সোমলেমিন' (১২৯০) প্রণয়ন করেন।[৭৯] 'ধর্ম-যুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার' (১৮৯০) গ্রন্থখানি মেয়ারাজউদ্দীন ও আবদুর রহিম যুগ্মভাবে প্রণয়ন করেন। গ্রন্থের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে 'উপক্রমণিকা'য় বলা হয়, "ইসলাম ধর্ম প্রচারক হজরত মুহম্মদের (দঃ) কার্যকলাপের উপর কতকগুলি, বিধর্মী গ্রন্থকার নানা প্রকার দোষারোপ করিয়া থাকেন, সেই সকল দোষারোপের মধ্যে 'জেহাদ' 'বহুবিবাহ ও 'স্ত্রীবর্জন' (তালাক) এই কয়েকটি প্রধান। এই সকল বিষয় লইয়া আধুনিক খৃষ্টধর্ম যাজকগণ ইসলামের উপর নানা রূপ ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। আমরা ক্রমান্বয়ে এই পুস্তকে এ সকল দোষারোপের দোষখণ্ডণে প্রবৃত্ত হইতেছি। কোন কোন স্থলে কিরূপ অবস্থায় জেহাদ করা আবশ্যক আমরা প্রথমে তাহার উল্লেখ করিয়া পরে হজরত মহম্মদের (দঃ) জেহাদের বিচারে প্রবৃত্ত হইব।[৮০]

সৈযদ আহমদ শহীদের ওয়াহাবী আন্দোলনের মূলে ছিল জেহাদনীতি। ইংরাজগণ এজন্য ওয়াহাবীদের সন্দেহের চোখে দেখতেন : ওয়াহাবীদের চাকুরীতে নিয়োগ করা হত না। হান্টারের 'দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস্' গ্রন্থের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় মুসলমানেরা মহারানীর শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে ধর্মতঃ বাধ্য কিনা তা অনুসন্ধান করা। মেয়ারাজউদ্দীন ও আবদুর রহিমের লক্ষ্য ছিল ইসলামে জেহাদের প্রকৃত তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করো যে, ব্রিটিশের রাজত্বে ধর্ম পালনের যেহেতু কোন বাধা নেই, সেহেতু শাসকের বিরুদ্ধে জেহাদের প্রশ্ন অবান্তর। তাঁরা বলেন, "আজকাল অনেকে জেহাদ সম্বন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া আমাদের ভারতবর্ষীয় অধঃপতিত মুসলমান ভ্রাতাগণের উপর ইংরাজ গভর্নমেন্টের নানা প্রকার সন্দেহ জন্মাইয়া দিতেছে ; কিন্তু ইহারা ইসলাম

৭৭ *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ২ ত্রৈ. খ., ১৮৯৩

৭৮. মুহাম্মদ ইদরিস আলী— *মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ,* পৃ. ৯

৭৯. ঐ, পৃ. ৩৩

৮০. মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ ও আবদুর রহিম—*ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার,* মিলন প্রেস ডিপজিটার, কলিকাতা, ১২৯৭, পৃ: .. (উপক্রমণিকা)।

ধর্মানুমোদিত জেহাদের বিষয় অবগত নহে ; যে কোন রাজার অধীনে, মুসলমানেরা আপন ধর্ম ও ধর্মকর্ম পদ্ধতি নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করিতে পারে, সেই রাজার রাজভক্ত প্রজা হওয়া স্বভাবসিদ্ধ। মুসলমানদিগের আমরা আমাদের উদারনৈতিক ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের আশ্রয়ে থাকিয়া নির্বিঘ্নে ধর্মপ্রচার ধর্মকর্মপদ্ধতি সম্পন্ন করিতেছি, এমন কি স্বয়ং গবর্নমেন্ট আমাদের ধর্মকর্ম পদ্ধতি সম্পন্ন করিবার কোন বিঘ্ন ঘটিলে তাহা দূর করিতে যত্নবান হইতেছেন। অতএব এরূপ সুখ স্বাচ্ছন্দে থাকিয়া মহানুভব ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নিকট আমাদের চিরকৃতজ্ঞ থাকা উচিত।"[৮১]

১৮৭০ সালে ওয়াহাবী বিচারের সাথে সাথে ভারতে ওয়াহাবী আন্দোলনে ভাটা পড়ে। মুইর, সেল, হোপী, স্প্রেনজার প্রমুখ ইংরেজ লেখক মহম্মদ ও ইসলামের উপর গ্রন্থ লিখে মহম্মদের জেহাদী মনোভাবের অপব্যাখ্যা দেন। এতে ভুল বুঝাবুঝির সম্ভাবনা আছে ভেবে মেয়ারাজউদ্দীন ও আবদুর রহিম এরূপ গ্রন্থ প্রণয়নের উপযোগিতা উপলব্ধি করেছিলেন। 'ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কারে'র দুটি অংশ— প্রথম অংশ ধর্মযুদ্ধ : হজরত মহম্মদের যুদ্ধবৃত্তান্ত আলোচনা করে দেখানো হয়েছে তিনি কোথায় কখন কোন প্রকার যুদ্ধ করেছেন ; দ্বিতীয় অংশ সমাজ-সংস্কার : এতে তিনিটি প্রবন্ধ আছে— 'ইসলামে স্ত্রীলোকদিগের অবস্থা', 'ইসলামের বহুবিবাহ' ও 'ইসলামে স্ত্রীবর্জন'। সমসাময়িকালের কোনো কোনো অমুসলমান লেখক উপরি-উক্ত বিষয়ে আলোচনা করে ইসলামের ধর্মনীতি ও সমাজ-নীতির উপর কটাক্ষ করেন। লেখকদ্বয় এসব অভিযোগের প্রত্যুত্তর দিয়েছেন এবং ধর্মনীতির আলোকে ঐসব সামাজিক প্রথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। গ্রন্থখানির ভাষা পরিপাটি, বক্তব্যও পরিচ্ছন্ন ; যুক্তির দ্বারা তাঁরা স্বীয় মত প্রতিশ্রুত করেছেন। করটীয়ার জমিদার 'হাফেজ মহমুদ আলী খান চৌধুরী'কে এটি উৎসর্গ করা হয়েছে।

মেয়ারাজউদ্দীন অগ্রজ ছিলেন। শেখ আবদুর রহিম তাঁকে অত্যন্ত মান্য করতেন। তিনি তাঁকে সাহিত্য-গুরুর মর্যাদা দিয়েছেন। তিনি পরবর্তীকালে লিখেছেন, "মুসলমান বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎসাহদাতা, সমাজগতপ্রাণ, আদর্শ আলেম, জ্বলন্ত উৎসাহী, শ্রদ্ধেয় বন্ধু মৌলবী মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের নাম উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। কেননা তাঁহারই উৎসাহে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়া আমার সাহিত্য সাধনা প্রবৃত্তি দ্বিগুণ বর্ধিত হইয়াছিল।"[৮২] মোজাম্মেল হক 'ফেরদৌস চরিত' (১৮৯৮) গ্রন্থখানি তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। 'উৎসর্গ পত্রে' বলা হয়, "যে মহাত্মার পবিত্র নামে হৃদয় আনন্দ রসে আপ্লুত হয়, যিনি অমায়িক সদালাপী মিষ্টভাষী ও সদগুণসমূহের আধার ছিলেন, সেই বঙ্গীয় মোসলেম সমাজের অন্যতম উজ্জ্বল রত্ন ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের স্বর্গগত সুযোগ্য আরবী ও পারস্য অধ্যাপক ভক্তিভাজন মাননীয় জনাব মৌলবী মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেবের স্মরণোদ্দেশে এই পুস্তকখানি আন্তরিক ভক্তি ও শ্রদ্ধাসহ তদীয় পবিত্র নামে উৎসর্গীকৃত হইল।"[৮৩] উল্লেখযোগ্য যে, মেয়ারাজউদ্দীনের সাথে মোজাম্মেল হকের ব্যক্তিগত পরিচয় ও অন্তরঙ্গতা ছিল।

৮১ *ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার*, 'উপক্রমণিকা' দ্রষ্টব্য।
৮২ শেখ আবদুর রহিম—'বঙ্গ ভাষা ও মুসলমান সমাজ', *মাসিক মোহাম্মদী*, ভাদ্র ১৩৩৬
৮৩ মোজাম্মেল হক—*ফেরদৌস চরিত*, 'উৎসর্গপত্র' দ্রষ্টব্য

গোলাম কিবরিয়া (জন্ম ১৮৪৩)

গোলাম কিবরিয়া কাজী কেরামত উল্লার সহযোগিতায় 'উচিত কথা' (১৮৯০) নামে গদ্যে-পদ্যে বিবিধ বিষয়ক গ্রন্থ লিখেন।[৮৪] উভয়ে বসিরহাটের অধিবাসী ছিলেন। গোলাম কিবরিয়া 'বসিরহাট ইসলামীয়া মাদ্রাসা'য় শিক্ষকতা করতেন। তিনি সাহিত্যিক ও সাংবাদিক শেখ আবদুর রহিমের মাতুল ছিলেন। 'উচিত কথা'র বিষয়বস্তু ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়ে 'সুধাকরে' লেখা হয় : "ইহার (উচিত কথার) ভাষা যদিও সম্পূর্ণ নির্দোষ নহে তবু বেশ সরল : সুতরাং সাধারণের সহজ বোধগম্য। পুস্তকখানির কোনো কোনো স্থান সুন্দর উপন্যাস এবং নাটকের ন্যায় মনোরম। গ্রন্থকার ভণ্ড ফকিরদিগের ভণ্ডামী কারখানার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া যেরূপ কৃতকার্য হইয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না। মুসলমানদিগের মধ্যে নাস্তিকোপম পাষণ্ড কাফেরদিগের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। যদিও এই কাণ্ড লিখিতে যাইয়া গ্রন্থকারকে অনেক স্থলে সুরুচির সীমা অতিক্রম করিতে হইয়াছে, তবু আমরা তাঁহাকে তজ্জন্য দোষী করিতে পারি না। কারণ সয়তানের সয়তানী প্রকাশ করিয়া অপর সাধারণকে সতর্ক করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য কর্ম। এই গ্রন্থে গল্পচ্ছলে যে সকল উপদেশাবলী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তৎপাঠে পাঠক মাত্রেই সবিশেষ উপকৃত হইবেন। ইহাতে খৃষ্টান ও হিন্দু-ধর্মের অসারতা এবং অত্যাচার অতিসুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে।"[৮৫] উচিত কথার পদ্যাংশ মধ্যযুগীয় পয়ারছন্দে রচিত। তাঁর গদ্যভঙ্গিও দুর্বল ও অপরিণত।

চৌধুরী মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী (১৮৫০-১৯০০)

চৌধুরী মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী শ্রীহট্ট জেলার ভাদেশ্বর গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ত্রিপুরার রূপগাঁর খান বাহাদুর আব্দুর রেজা চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করেন এবং সেখানেই বসতি স্থাপন করেন। আর্জুমন্দ আলী বাংলা, ইংরাজি ও ফারসি ভাষায় সুশিক্ষা পান। সঙ্গীতের প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল।[৮৬] তিনি কর্মজীবনে স্কুল সব-ইনস্পেক্টর ছিলেন। শেষ বয়সে তিনি অন্ধ হয়ে যান।

আর্জুমন্দের দুখানি গ্রন্থ আছে—'প্রেম দর্পণ' (১৮৯১) ও 'হৃদয় সঙ্গীত' (১৯০৫)। 'প্রেম দর্পণ' সামাজিক উপন্যাস। মুসলমান যুবক ও হিন্দু যুবতীকে নায়ক-নায়িকা করে প্রেমমূলক এই উপন্যাসখানি রচিত হয়েছে। 'হৃদয় .সঙ্গীত' কবিতা ও গানের বই। কবির কণ্ঠে আধ্যাত্মিকতার সুর বেজেছে।[৮৭]

একিনুদ্দীন আহমদ (১৮৬২-১৯৩৩)

একিনুদ্দীন আহমদ দিনাজপুর জজকোর্টের উকিল ছিলেন। তিনি ১৮৮৪ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বিএ এবং ১৮৮৬ সালে সিটি কলেজ থেকে বিএল পাশ করেন। রংপুরের

৮৪ সুধাকরে গ্রন্থখানির নাম করা হয়েছে 'মনোরঞ্জন উচিত কথা' *সুধাকর*, ২৪ ফাল্গুন ১২৯৬

৮৫ *সুধাকর*, ২৪ ফাল্গুন ১২৯৬

৮৬ *বার্ষিক সওগাত*, ১ বর্ষ, ১৩৩৩

৮৭ আলাউদ্দীন আহমদকৃত 'উপদেশ সংগ্রহে'র (১৩১৯,৩ সং) 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য

সুপ্রসিদ্ধ উকিল তসলিমউদ্দিন আহমদ তাঁর মাতুল ছিলেন। একিনুদ্দীন দিনাজপুর থেকে বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন (১৯২১–২৩)।[৮৮]

একিনুদ্দীন আইন ব্যবসায়ের সাথে সাথে সাহিত্যচর্চাও করে গেছেন। 'ইসলাম' (১৮৮৫) নামে একখানি ক্ষণস্থায়ী মাসিক পত্রিকা তিনি সম্পাদনা করেন।[৮৯] ঐ সময় তিনি আইন পড়তেন। তিনি 'মিহির ও সুধাকর', 'ইসলাম প্রচারক', 'নবনূর' প্রভৃতি বাংলা সাময়িকে ও 'মোসলেম ক্রনিকল' ইংরাজি সাপ্তাহিকে অনেক মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেন। তিনি 'ইসলাম ধর্মনীতি' (১৮৯১) নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এটি লিভারপুলের শেখ আবদুল্লাহ কুইলিয়মের 'দি ফেথ অব ইসলাম' গ্রন্থের অনুবাদ। আব্দুল্লাহ কুইলিয়ম ইসলাম গ্রহণ করে ধর্মপ্রচারে আত্মনিয়োগ করেন।[৯০] 'সুধাকরে'র এক বিজ্ঞাপনে বলা হয়, "ইসলামের যে গুণ দেখিয়া ইংলণ্ডের ৫৫ জন ইংরেজ ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়াছেন, তাহাই এই পুস্তকে (ইসলাম ধর্মনীতি) বিশুদ্ধ বাঙ্গালা ভাষায় একজন কৃতবিদ্য মুসলমান গ্রাজুয়েট দ্বারা বিবৃত হইয়াছে।"[৯১] ইসলামের আদর্শ রক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল ; কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে তিনি উদার মনোভাব পোষণ করতেন। দেলওয়ার হোসেন আহমদ 'মুসলমান উত্তরাধিকার আইনে'র পরিবর্তনের প্রশ্ন উত্থাপন করলে একিনুদ্দীন তার প্রতিবাদ করেন। উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বণ্টন ব্যবস্থার ফলে মুসলমানরা দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে বলে দেলওয়ার হোসেন ঐরূপ প্রশ্ন তুলেছিলেন।[৯২] একিনুদ্দীন বঙ্গ বিভাগ সমর্থন করেননি। তাঁর যুক্তি ছিল, "দেশের যে সামান্য উন্নতি এখন আমরা দেখিতে পাইতেছি, তাহার প্রধান কারণ কলিকাতা মহানগরীর জ্ঞানী লোকগণের সমবেত চেষ্টা। গবর্নমেন্ট নতুন প্রদেশ সংস্থাপিত করিয়া এই উন্নতির মূলে কুঠারাঘাত করিতে যাইতেছেন।"[৯৩] 'শান্তিনিকেতন' নামে তাঁর একখানি উপন্যাস সাময়িক পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হয়। কলিকাতার 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে (বৈশাখ ১৩২৫) একিনুদ্দীন আহমদ সভাপতির পদ অলংকৃত করেন।[৯৪]

আবিদ আলী খান

'মিহির' পত্রিকায় (মার্চ ১৮৯২) 'শ্রী আবেদ খাঁ কর্তৃক প্রণীত' 'মানসাঙ্ক ও শুভঙ্করী সম্বলিত ধারাপাত' শীর্ষক একখানি বই-এর সমালোচনা করা হয়। 'ইসলাম প্রচারকে' (আশ্বিন-কার্তিক ১৩০৮) 'শিবপুর সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পরীক্ষোত্তীর্ণ শ্রী আবিদ

৮৮ *মুজতবা কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, পৃ ৭৮
৮৯ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ ৬
৯০ *মিহির ও সুধাকর*, ১০ কার্তিক ১৩০১
৯১ *সুধাকর*, ৩০ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮
৯২ ২৪ আগস্ট, ১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৬
৯৩ *নবনূর*, আশ্বিন ১৩১২
৯৪ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ ২০৬

আলী খাঁ প্রণীত' 'মৌখিক অঙ্ক' নামে আর একখানি পুস্তকের সমালোচনা হয়। পত্রিকায় লেখা হয়, "ইহাতে অঙ্কবিদ্যা বিষয়ক অনেক নতুন নতুন প্রণালী ও কৌতুক এবং রহস্য সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। নতুন ধরণের সুন্দর সুন্দর প্রশ্নাবলী পাঠ করিয়া আমরা মুগ্ধ হইয়াছি।" 'নবনূরে' (আষাঢ় ১৩১২) 'শ্রী আবিদ আলী খাঁ কর্তৃক প্রণীত সচিত্র বাঙ্গালা শিক্ষা' গ্রন্থেরও সমালোচনা হয়।

উক্ত গ্রন্থত্রযেব প্রণেতা সিভিল ইঞ্জিনিয়ার আবিদ আলী খান ছিলেন মালদহের অধিবাসী। তাঁর আরও কয়েকখানি গ্রন্থ আছে, যথা — 'সচিত্র নামাজ দর্পণ' (১৯০৬), 'মৌলুদ শরীফ ও হজবত চরিত' (ঐ) 'শাহাদতনামা বা মহরম পর্ব' (ঐ), 'গুলশনে হিন্দ' (ঐ)।[৯৫]

আলাউদ্দীন আহমদ (১৮৫১–১৯১৫)

আলাউদ্দীন আহমদ পাবনার শাহজাদপুরের চুহালি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কলিকাতা মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ কবেন। তিনি কর্মজীবনে প্রথমে ফরিদপুর জেলা-স্কুলেব ফারসির শিক্ষক ছিলেন, পরে শাহজাদপুরের ম্যারেজ রেজিস্ট্রার হন। তাঁর প্রথম অনূদিত ধর্মগ্রন্থ 'উপদেশ সংগ্রহ' (১৮৯৪) 'পণ্ডিতকুলতিলক মহাত্মা শেখ শাহাবুদ্দীন এব্নে হজবত মিসবী আস্কোলানী কৃত আরব্য 'মোনাব্বেহাত ও অন্যান্য গ্রন্থ' হতে নীতিসমূহেব সঙ্কলন। গ্রন্থখানি করটীযা মাদ্রাসার শিক্ষক মৌলবী গোলাম সারওয়াবের নামে উৎসর্গ করা হয়। লেখক গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য ও উৎস সম্বন্ধে 'ভূমিকা'য় বলেন, "একদিন বঙ্গীয় সাহিত্য-সমাজে মুসলমান সাহিত্য ও ইসলাম ধর্মজ্যোতিঃ বিকাশের সম্পূর্ণ অভাব ছিল। কেননা মুসলমান সাহিত্য ও ধর্মগ্রন্থ সকল বৈদেশিক পারস্য বা আরব্য ভাষায় লিখিত। অধুনা কতিপয় ধর্মপরায়ণ, ন্যায় অনুসন্ধিৎসু মহাত্মার প্রাণপণ যত্ন এবং অদম্য চেষ্টায ইসলাম সাহিত্য ও ধর্মজ্যোতিঃর পূর্ণ বিকাশ আরম্ভ হইয়াছে। তাহারই ফলস্বরূপ আজকাল পবিত্র কোরান শরিফ, ফতওয়ায়ে আলমগিরী, তাজকেরাতুল আওলিয়া, কিমিয়ায় সাহাদত, গোলেস্তাঁ প্রভৃতি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, ঘরে ঘরে বিরাজমান থাকায় ইসলাম মাহাত্ম্য সর্বত্র ঘোষণা ও প্রচার করিতেছে। এই সকল গ্রন্থ যে কেবলমাত্র মুলসমান সমাজে আদবণীয় এমত নহে, বরং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ন্যায়দর্শী চরিত্রবান ব্রাহ্ম ও হিন্দু ভ্রাতাগণের হৃদয়পটেও ইসলামের সৌন্দর্য প্রতিফলিত করিতেছে। গভীর চিন্তাপূর্ণ উদেশ সংগ্রহ, সংসাব বিরাগী, খোদা-প্রেমিক তপস্বিগণের পবিত্র উক্তিসমূহ, ধর্মগতপ্রাণ পবিত্র মহাপুরুষগণের হৃদয়গ্রাহী বাক্যাবলী এবং পবমার্থ জ্ঞানালঙ্কৃত পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত ও ধর্মপথভ্রষ্ট বিপথগামীর তিমিরাচ্ছান্ন অন্তঃকরণেও সৎপথ ও আলোকের দিকে ধাবিত করে।"[৯৬] আলাউদ্দীন গ্রন্থ প্রণয়নে মুনশী আব্দুল গণি (মোক্তার), শশিভূষণ

৯৫ *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ২ ত্রৈ, খ, ১৯০৬ ; ১৩২২ *বঙ্গাব্দেব সাহিত্য পঞ্জিকা*, প, ৯৭-৯৮

৯৬ আলাউদ্দীন আহমদ—*উপদেশ-সংগ্রহ*, রেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা ১৩২৮, পৃ (প্রথম সংস্কবণের ভূমিকা)

ভট্টাচার্য (ফরিদপুর গভর্নমেন্ট স্কুলের প্রধান সংস্কৃত পণ্ডিত) এবং কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদের (রাজবাড়ী রাজস্কুলের ফারসি শিক্ষক) সাহায্য ও সহযোগিতা পান।

আলাউদ্দীনের দ্বিতীয় অনূদিত ধর্মগ্রন্থ 'তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদ' 'ইসলাম প্রচারক' পত্রিকায় দীর্ঘকাল ধারাবাহিক রূপে ছাপা হয়। এর প্রথম খণ্ড ১৯০০ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তফসীর হাক্কানী কোরানের ব্যাখ্যাসহ বঙ্গানুবাদ। স্যার সৈয়দ আহমদের কোরানের উর্দু অনুবাদে 'নাস্তিকতা ভাব' আছে। এর প্রতিবাদেই আলাউদ্দীন তফসীর হাক্কানীর বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হন। 'প্রচারক' পত্রিকার এক বিজ্ঞাপনে এ সম্পর্কে বলা হয় : "আলিগড়ই এই নব্যদলের কেন্দ্রস্থল, এই দলের দলপতি এবং এই নবধর্মের অবতার ডাক্তার স্যার সৈয়দ পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও শিক্ষার প্রভাবে নাস্তিকতা ভাবে কুরআন মজিদের এক তফসীর লিখিয়াছেন। তদ্দর্শনে তাঁহাদের নাস্তিকতা সম্বন্ধে কোনরূপ সংশয় থাকে না। অত্র তফসীরের যথাস্থানে সৈয়দ সাহেবের নব্য তফসীরের যথোচিত সপ্রমাণ প্রতিবাদ করা হইবেক।"[৯৭]

তাঁর রচিত দুখানি সন্তজীবনী আছে : 'বড়পীর সাহেবের জীবনচরিত' (১৮৯৯) এবং 'ওমর চরিত' (১৯০৩)। সুফীসাধক আবুদল কাদের জিলানীর জীবনকথা নিয়ে প্রথম গ্রন্থ রচিত। দ্বিতীয় গ্রন্থে 'হজরত ওমরের দিগ্বিজয় বৃত্তান্ত জ্বলন্ত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে'।[৯৮] লেখক গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন, "ইসলাম জ্ঞানভাণ্ডারে যে কত অপার্থিব বহুমূল্য রত্ন রহিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না, কিন্তু ঐ রত্নভাণ্ডাবসমূহ আরব্য, পারস্য ভাষারূপে সুদূর প্রাচীরের মধ্যে লুক্কাইত রহিয়াছে বলিয়া বঙ্গবাসীর পক্ষে অতি দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া রহিয়াছে এবং অনেকে ঐ ভাণ্ডারের চতুর্দ্দিকে আগ্রহান্বিত চিত্তে ঘুরিয়া বেড়াইতে থাকেন, কিন্তু দুর্ভেদ্য প্রাচীর উল্লঙ্ঘন বা ভেদ করিতে না পারিয়া হতাশ হইয়া পড়েন।"[৯৯] লেখক আরবি-ফারসি ভাষা প্রাচীর ভেদ করে বাংলা ভাষার মাধ্যমে বাঙালি পাঠকের কাছে ইসলামের 'রত্নভাণ্ডার' তুলে ধরেছেন এই গ্রন্থে। 'আহকামোল এসলাম' (১৯০৯) নামে ইসলামের রীতিনীতি বিষয়ক তিনি আর একখানি ধর্মপুস্তক লেখেন।[১০০] আলাউদ্দীন আহমদ সমাজের মানুষকে অনুপ্রাণিত করার জন্য ইসলামের ধর্মকথা ও ইতিহাসের গৌরবকাহিনীকে বিষয়বস্তু হিসাবে নির্বাচন করেছিলেন।

তজমুল আলী

শ্রীহট্টের হাজিপুর মৌজার কানিহাটীর অধিবাসী তজমুল আলী প্রণীত 'তোওয়ারিখ হেলিমী' (১ খণ্ড, ১৮৯৪) একটি ১৮ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র পুস্তিকা। শ্রীহট্ট জেলার কানিহাটীর শাহ হালিমউদ্দীনের পারিবারিক ইতিহাস এতে বর্ণিত হয়েছে। লেখক ঐ পরিবারের বংশধর

৯৭ *প্রচারক*, আশ্বিন ১৩০৭
৯৮ *উপদেশ-সংগ্রহ*, পৃ. ৭ (পাদটীকা)
৯৯ আলাউদ্দীন আহমদ—*ওমর চরিত*, সঞ্চয় প্রেস, ফরিদপুর, ১৩১০, পৃ. ৯. (ভূমিকা)।
১০০ ১৩২২ *বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা* পৃ. ৯৮

বলে দাবী করেছেন। গ্রন্থের 'পূর্বাভাষে' তিনি লিখেছেন, "আমার এই প্রচারিত পুস্তকখানা নিজবংশাবলী। এবং ইহা প্রকাশের কারণ এই যে, আমাদের পূর্ব পুরুষ শাহ্ হেলীমউদ্দীন নূরল আলী এ দেশীয় লোক নহেন। কোন সময়ে কি জন্য তিনি এদেশে আসিয়াছিলেন এবং কেনই বা তিনি এখানে অবস্থান করিলেন ... তাহার অনেক বিবরণ লোপ পাইয়াছে। সেইজন্য আমি বহু পরিশ্রম স্বীকার করিয়া পরবর্তীদের কষ্টনিবারণার্থে তোয়ারিখে হেলিমী নামে এই পুস্তক প্রচার করিলাম। ... নিজ বংশ-তালিকা সুশৃঙ্খল করার মানস ব্যতীত শ্রেণীমর্যাদা বা জাতীয় গৌরব প্রকাশার্থ এই পুস্তকখানা লিখিত হইল না। ইহা যথাযথ বংশ-তালিকা হইতে লিখিত হইয়াছে।"[১০১]

মোহাম্মদ ইব্রাহিম খাঁ

ময়মনসিংহ জেলার মোহনগঞ্জের টেঙ্গাপাড়া নিবাসী মোহাম্মদ ইব্রাহিম খাঁ 'জ্ঞানবৃক্ষ' (১ ও ২ ভাগ, ১৮৯৪) নামে স্কুলপাঠ্য বর্ণশিক্ষার বই লেখেন। 'জ্ঞানবৃক্ষে'র 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লিখেছেন, "নানা অনুরোধে ও কতকগুলি অপ্রতিহার্য্য কারণেও বাধ্য হইয়া, এই পুস্তক কতকগুলি কঠিন কঠিন শব্দ সন্নিবেশিত করা হইয়াছে। এমন কি আদি গুরু মদনমোহন বাবু হইতে, এ পর্যন্ত কেহই এই দোষ এড়াইতে পারেন নাই। শিশুশিক্ষা প্রভৃতি বর্ণমালার কতকগুলি শব্দ, কেবল অভিধান ব্যতীত অন্য কোন পুস্তকে এ পর্যন্ত তাহার ব্যবহার দেখিনা। ... কঠিন কঠিন শব্দসকলের অর্থ, পুস্তকের শেষভাগে প্রদত্ত হইল।"[১০২] মোহাম্মদ ইব্রাহিম খাঁ টেঙ্গাপাড়ার 'আঞ্জমনে মফিদুল ইসলাম' (১৯০৪) নামক ধর্মীয় রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক ছিলেন।[১০৩] স্বদেশ আন্দোলনের বিরোধিতা করে বিখ্যাত 'লাল ইস্তেহার'টি তিনি প্রণয়ন ও প্রচার করেন।

মোহাম্মদ ইয়াকুব

মোহাম্মদ ইয়াকুব নোয়াখালীর সল্লভরটখাল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ঐ জেলার পেস্কারহাটের 'আহমদীয়া মাদ্রাসা স্কুলে' শিক্ষকতা করতেন। তিনি পবে চট্টগ্রাম মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হন (১৯০১)। তিনি 'উদ্যান' (১৮৯৫) নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি বলেছেন, "উদ্যান' নামক একখানি পদ্য ও গদ্যময় গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। এই গ্রন্থে 'গোলেস্তান' নামক জগদ্বিখ্যাত পারস্য কবি মহাত্মা শেখ সা'দীর গ্রন্থাবলম্বন পূর্বক রচিত হইয়াছে। ... যদি 'উদ্যান' কিঞ্চিত অংশে পাঠকবর্গের প্রীতিপ্রদ হয়, তাহা হইলেই আমি সম্পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করিব।"[১০৪] শেখ আবদুল রহিম 'ইসলাম' (১৮৯৭) ধর্মতত্ত্বমূলক গ্রন্থখানি মোহাম্মদ ইয়াকুব ও মোহাম্মদ আবদুর

১০১ তজমূল আলী— *তোওয়ারিখ হেলিমী*, সামন্তক প্রেস, ঢাকা, ১২৯৯, 'পূর্বাভাষ' দ্রষ্টব্য

১০২ মুহম্মদ ইব্রাহীম খাঁ—*জ্ঞানবৃক্ষ* (২য় ভাগ), মিলন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৮৯৪

১০৩ দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভাসমিতি' দ্রষ্টব্য।

১০৪ মোহাম্মদ ইয়াকুব— *উদ্যান* (গুলিস্তান বঙ্গানুবাদ), গোবিন্দ যন্ত্র, নোয়াখালী, ১৩০২

রহমানের সহযোগিতায় রচনা করেন। 'মোসলেম ক্রনিকলে'র এক বিজ্ঞাপনে 'ইসলাম' গ্রন্থখানিকে মোহাম্মদ ইয়াকুব প্রণীত বলেই উল্লেখ করা হয়েছে।[১০৫] মোহাম্মদ ইয়াকুবের অপর গ্রন্থ 'ঈদ-বক্রীদে' (১৮৯৫) মুসলমান সমাজের দুটি ঈদোৎসবের নিয়ম-কানুন বর্ণিত হয়েছে।[১০৬]

মোসলেমউদ্দীন খান

মোসলেমউদ্দীন খান টাঙ্গাইলের গান্দিনা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৯০১-০৬ সালে করটীয়া হাই স্কুলের দ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনের 'হিতকরী' পত্রিকা কুষ্টিয়া থেকে টাঙ্গাইলে স্থানান্তরিত হলে (১৮৯২) মোসলেমউদ্দীন খান ঐ পত্রিকার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হন। মীর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'আহমদী প্রেসে'র (জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯) তিনি ম্যানেজার ছিলেন। পরে মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইল ত্যাগ করলে (আশ্বিন ১২৯৯) মোসলেমউদ্দীন 'টাঙ্গাইল হিতকরী' নাম দিয়ে নিজ সম্পাদনায় সেটি প্রকাশ করেন। ময়মনসিংহ শহরে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রতিষ্ঠিত 'শিক্ষা প্রচার' পত্রিকার তিনি ১৩১৫ থেকে ১৩১৮ সন পর্যন্ত সম্পাদক ছিলেন।[১০৭] ১৯০৬ সালের ডিসেম্বর মাসে 'অল ইন্ডিয়া মহামেডান এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল এডুকেশন কনফারেন্সে' ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর আমন্ত্রণক্রমে মোসলেমউদ্দীন খান যোগদান করেন।[১০৮] মোসলেমউদ্দীন খানের 'হিতকাব্য' (১৩০১) শিক্ষা ও নীতিমূলক আধুনিক কাব্যগ্রন্থ। তিনি কাব্যের 'বিজ্ঞাপনে' বলেছেন যে, মীর মশাররফ হোসেন, মোহাম্মদ নইমুদ্দীন ও নওশের আলী খান ইউসফজয়ীর 'বিশেষ উত্তেজনাপূর্ণ উপদেশ ও উৎসাহে' 'হিতকাব্য' লিখতে অগ্রসর হন। কাব্যরচনার মূল প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তিনি বলেন, "অধুনা মুসলমান-সমাজের শোচনীয় অবস্থা পরস্পর দর্শনে দয়ালু ও উদার ব্রিটিশ গবর্নমেন্ট তাঁহাদের প্রতি কথঞ্চিৎ প্রসন্ন হইয়াছেন। এমন সুযোগ হারাইলে আর পাওয়া যায় না ; অর্থাৎ মুসলমানদিগকে রাজকার্যে নিয়োগ, তাহাদের শিক্ষাব সুবন্দোবস্ত ও তাহাদের রচিত পুস্তকাদি পাঠ্যলিষ্টভুক্তকরণ প্রভৃতি বিষয়ে গবর্নমেন্টের বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ পাইতেছে। আমাদের সদাশয় উদার ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের অনুগ্রহে শান্তিপুর নিবাসী মাননীয় কবি মোজাম্মেল হক সাহেব কৃত 'পদ্যশিক্ষা' পুস্তক কোনো কোনো বিদ্যালয়ের পাঠ্য বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ; ইহা আমাদের নিতান্তই গৌরবের বিষয়। তবে হিন্দু মহোদয়গণের পুস্তকের সম্মুখে মুসলমানের লিখিত গ্রন্থের আদর নাই। সুতরাং উৎসাহ অভাবে, অনেক লেখকেরও শক্তি বিকাশ পাইবার পক্ষে অন্তরায় ঘটিতেছে—মনের কথা মনেই বিলীন হইয়া যাইতেছে। অতএব মুসলমানের লেখনী পরিচালনায় ক্ষান্ত দিলে, উন্নতির আশা সুদূর পরাহত ; ঈদৃশ

১০৫ *দি মোসলেম ক্রনিকল*, ১১ জুলাই ১৮৯৬
১০৬ *মিহির ও সুধাকর*, ১০ কার্তিক ১৩০২
১০৭ ইব্রাহিম খাঁ—'টাঙ্গাইলের সাহিত্য সাধনা', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
১০৮ *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, পৃ. ২৭-২৮

অবস্থায় আমার ন্যায় মূর্খ অভাজন 'হিতকাব্য' প্রচারে সাহসী হইল।"[১০৯] ১২৯৯ সনের ২৮ শ্রাবণ ছোটলাট স্যার চার্লস এলিয়ট টাঙ্গাইল পরির্দশনে গমন করলে তাঁর অভ্যর্থনা সভায় কবি হিতকাব্যের কতকাংশ আবৃত্তি করেছিলেন বলে ঐ বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করেছেন। পরিশেষে তাঁর কাব্য 'উচ্চ ও নিম্ন বঙ্গবিদ্যালয়সমূহের পাঠ্যলিষ্টভুক্ত' করার জন্য শিক্ষা বিভাগের কর্তৃপক্ষ ও বিদ্যালয়েব শিক্ষক মহোদয়গণেব সমীপে আবেদন জানিয়েছেন।[১১০] কবির আশা পূর্ণ হয় : কাব্যখানি তদানীন্তন শিক্ষাবিভাগ কর্তৃক স্কুলের ৬ষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যরূপে মনোনীত হয়। ১৪টি কবিতার এই পুস্তকখানিতে নীতিজ্ঞান ছাড়াও কবির সমাজ ও অর্থনীতি চেতনাব পরিচয আছে। তিনি দেশের অর্থনৈতিক দুর্গতির কারণ হিসাবে ঔপনিবেশিক শোষণের কথা বলেছেন 'দারিদ্র' কবিতায় :

> দেখ না অতুল্য ভারতের ধন
> শুষে নিযে যায বৈদেশিকগণ
> দারিদ্র-অনলে পুড়িছ এখন
> কব কত দুখ, ভোগ অণুক্ষণ
> আর্যজাতি তুমি, ভস্মপ্রায় পড়ে।[১১১]

মোসলেমউদ্দীন খান পববর্তীকালে ঢাকাব 'শিখাগোষ্ঠী'ব 'মুসলিম সাহিত্য সমাজে'ব (১৯২৬) সাথে জড়িত ছিলেন। ঐ সাহিত্য সমাজের মুখপত্র 'শিখা' (১৯২৯) পত্রিকায 'ময়মনসিংহের গীত' নামে তাঁর একটি বচনা প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালে সাহিত্য সমাজের একটি অধিবেশনে (১২ জানুয়ারি ১৯২৯) তিনি 'একেই কি বলে ইসলাম' নামে একাঙ্ক নাটিকা পাঠ করেন।[১১২]

সৈয়দ আবদুল গাফফার আলকাদরী

তিনি মেদিনীপুবেব অধিবাসী ছিলেন। মেদিনীপুরের 'মোসলেম লিটাবেরী সোসাইটি'র যৌথ সম্পাদক ছিলেন। তাঁর রচিত 'পবিত্র কোরানের সত্যতা' (১৮৯৬) একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা।[১১৩] কোবান যে অপৌরুষেয়, অপরিবর্তনীয় ও অভ্রান্ত ধর্ম বাণী লেখক তাঁব পুস্তিকায় এটাই প্রমাণ করেছেন।

শেখ জোহাদ রহিম

শেখ জোহাদ বহিম উপন্যাসিক শেখ সাজ্জাদ করিমের সহোদর ভ্রাতা। হুগলীর জয়সিংহচক গ্রামে তাঁদেব জন্ম। শেখ জোহাদ রহিম 'বিষাঙ্কুব কাব্য' (১ম খণ্ড, ১৮৯৬)

---

১০৯ মোসলেম উদ্দীন খান—*হিতকাব্য*, টাঙ্গাইল, পৌষ ১৩০১, পৃ. ।. (বিজ্ঞাপন)
১১০ ঐ, পৃ.
১১১ ঐ, পৃ ২১
১১২ *মুসলিম বাংলাব সামযিকপত্র*, পৃ, ৪৯৮–৯০
১১৩ *দি মোসলেম ক্রনিকল*, ১১ জুলাই ১৮৯৬

লেখেন। এটি আখ্যানমূলক কাব্য, কলিকাতার বাবু শ্রেণীর চরিত্রের উপর কটাক্ষপাত করে রচিত।[১১৪]

মোসারত আলী খান

মোসারত আলী খান পাবনার শাহজাদপুরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁর দুখানি কাব্যপুস্তক আছে—'শোকোচ্ছ্বাস' (১৮৯৬) ও 'সাঁঝের আলো' (১৯০০)। প্রথমখানি করটীয়ার জমিদার হাফেজ মোহাম্মদ আলী খান পত্নীর শোকস্মৃতিমূলক ১১ পৃষ্ঠার বই ; দ্বিতীয়খানিতে বিবিধ বিষয়ক কবিতা সংকলিত হয়েছে।[১১৫] 'মিহির ও সুধাকরে' কাব্যখানির সমালোচনা হয়, " ... কবিতাগুলির ভাব ও ভাষা প্রাণস্পর্শী। উৎসর্গ, কে গেল, শুধুই স্বপন, মাদকতা, সাধ, অতৃপ্ত, পিয়াস, বিরহিণী রাধা প্রভৃতি কবিতায় গ্রন্থকারের উদীয়মান প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।"[১১৬] তাঁর একটি সমাজ-সচেতন মন ছিল। 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি' স্থাপিত হলে তিনি আশাবাদী হয়ে ওঠেন এবং উদ্যোক্তাদের প্রশংসা করেন। মুসলমান সমাজের অধঃপতনের কারণ যে শিক্ষাভাব, তা নিশ্চিত জেনে তিনি ধর্মশিক্ষার সাথে ইংরাজি শিক্ষারও প্রসার চেয়েছেন।[১১৭]

মোহাম্মদ অখিলুদ্দীন

মোহাম্মদ অখিলুদ্দীনের 'তারাবতী-মনোহরা' (১৮৯৬) একটি গল্পের বই। লেখক হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজে বিধবা বিবাহের সমর্থনে অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১১৮]

মোহাম্মদ কাজেম আলী

ডায়মণ্ড হারবারের ফৌজদারী আদালতের মোক্তার মোহাম্মদ কাজেম আলী 'মানব-সুহৃদ বা চতুর্দ্দশ নীতিরত্ন' (১ খণ্ড, ১৮৯৮) নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এটি প্রকৃতপক্ষে ফারসিকাব্য 'আনওয়ার সোহেলী'র বঙ্গানুবাদ। তিনি কাব্যের প্রারম্ভে 'গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী' অংশে আত্মপরিচয় দিয়ে বলেছেন, ডায়মণ্ড হারবারের অন্তর্গত মুড়াগাছার বেড়ন্দরি গ্রাম তাঁর জন্মস্থান। তাঁর পূর্বপুরুষ বর্গী আক্রমণের সময় বর্ধমান ত্যাগ করে ঐ গ্রামে প্রথম বসতি স্থাপন করেন। কবি তাঁর বাল্যশিক্ষা, *আইনশিক্ষা, আইন ব্যবসায়, অতঃপর কাব্য রচনার প্রেরণায় কথা বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন,*

১১৪ আবদুল কাদির—'বিষাঙ্কুর কাব্য', *লেখক সংঘ পত্রিকা,* জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
১১৫ *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ* ৩ ত্রৈ, খ., ১৮৯৬, ১ ত্রৈ., খ., ১৯০১
১১৬ *মিহির ও সুধাকর*, ২৭ পৌষ ১৩০৭
১১৭ মোসারত আলী খান —'বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা', *মিহির ও সুধাকর,* ১ শ্রাবণ ১৩১০
১১৮ *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ১৮৯৬

বহুকাল হতে আছে এই অভিলাষ ;
কাব্য এক লিখিবার কবির প্রয়াস। . . .
প্রেমালাপ নাটকাদি আদিরস ভিন্ন ;
আজিকালি সমাজেতে আর সব ঘৃণ্য।
কিন্তু উহা চিরকাল যিনি সুধীজন ;
কখন না সমাদরে করেন গ্রহণ।
এই হেতু উপেক্ষিয়া সেই আদিরস ;
লিখিতে প্রয়াস পা'নু নীতি চতুর্দ্দশ।[১১৯]

কাব্যের 'বিজ্ঞাপনে'ও তিনি আধুনিক আদিরসাত্মক নাটকাদির মধ্যে নীতিহীনতার অভিযোগ করেছেন। সমাজের নরনারীকে নীতিশিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনি উক্ত গ্রন্থ প্রণয়নে প্রয়াসী হয়েছেন। তাঁর ভাষায় "ইদানীন্ত সময়ে অস্মদ দেশনিবাসী অধিকাংশ নরনারীর মনোমন্দিরসমূহ এরূপ বিলাসিতার ঘোর কুহেলিকা সমাচ্ছন্ন হইয়াছে যে তাহাতে কৃতবিদ্য সুবুধ বাবদূকগণের কাকলী সংযুক্তা ও নীতিগর্ভা এবং তেজস্বিনী বক্তৃতা-তপন রশ্মি প্রবেশ করিতে অক্ষম। ... তাঁহাদের অমানুষ অভিলাষ উদ্দীপনার জন্য আধুনিক বহুল অসম্পূর্ণ কৃতবিদ্য মহোদয়গণ আদিরসে সংযুক্ত নানাবিধ অভিনব নাটক আদি পুস্তক আবিষ্কার করিয়া, সংসারে কলুষবীজ বপন করিতেছেন ; উক্ত নরনারীকূল যাহাতে ঐ সকল গরলময় নাটকাদি পুস্তকপাঠে বিরত থাকিয়া, অণুক্ষণ পীযূষপূর্ণিত সকল প্রকার নীতিশিক্ষা করতঃ মনুষ্য নামে গৌরব রক্ষোপযোগী অশেষ কল্যাণকর কার্যকলাপ নির্বাহ করিতে সক্ষম হন আমি সেই মহদুদ্দেশ্য সাধন জন্য নীতিরত্নের আকর স্বরূপ 'আনওয়ার সোহেলী' নামক জগদ্বিখ্যাত পারস্য মহাকাব্য যেরূপ বিস্তৃত, তাহাতে এককালে সমুদয় গ্রন্থ অনুবাদ কবিয়া জনসাধারণ সম্মুখে প্রকাশ করা মাদৃশ জনের পক্ষে অসম্ভব এজন্য সম্প্রতি প্রাগুক্ত অনুবাদিত মহাকাব্যের প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কণ করাইলাম"।[১২০] কাব্যে বিভিন্ন গল্পচ্ছলে নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। গতানুগতিক পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে এটি রচিত, কবির ভাষাভঙ্গি দুর্বল ও উৎকর্ষ বিহীন।

আবদুল করিম বিএ (১৮৬৩-১৯৪৩)

আবদুল করিম শ্রীহট্ট জেলায় পাঠানটোলায় জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৮৬ সালে প্রেসিডেন্ট কলেজ থেকে বিএ (ইংরেজি অনার্স) পাশ করেন। তিনি ঐ বছর স্কুল শিক্ষক হিসাবে চাকুরিতে প্রবেশ করেন ; ১৮৮৯ সালে 'এ্যাসিস্টান্ট ইনস্পেক্টর অব স্কুল ফর মহামেডান এডুকেশন' পদে যোগদান করেন। তিনি এবং মোহাম্মদ ইব্রাহিম প্রথম

১১৯ মোহাম্মদ কাজেম আলী— *মানব সুহৃদ বা চতুর্দ্দশ নীতিরত্ন*, বেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮, পৃ. ২৯

১২০ ঐ, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

মুসলমান এ্যাসিস্ট্যান্ট স্কুল-ইনস্পেক্টর ছিলেন। আবদুল করিম পরে বিভাগীয় স্কুল-ইনস্পেক্টর হন। তিনি ১৮৯৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'আজীবন ফেলো' মনোনীত হন; ১৮৯৬ সালে কলিকাতার এসিয়াটিক সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন; ১৯১৫ সালে 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র সভাপতি নিযুক্ত হন। তিনি এক সময় 'কাউন্সিল অব স্টেটে'র সদস্য পদে বৃত ছিলেন।

মুসলমান শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফসল 'মোহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) নামক ইংরাজি গ্রন্থ। এতে বাংলার তৎকালীন মুসলমান সমাজে শিক্ষাগত অবস্থাব বিবরণ আছে। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার পক্ষে ছিলেন, তবে শিক্ষাপদ্ধতির সংস্কারের জন্য সরকাবের কাছে সুপারিশ করেন। 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' (১৮৯৮) আবদুল করিম প্রণীত প্রথম বাংলা গ্রন্থ। তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছেন, "আজ বিধাতৃবিধানে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদাযই ইংরাজ রাজাশ্রযে শান্তি সুখের অধিকারী। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে অদ্যাপি হিন্দু-মুসলমান পরস্পবকে জানিতে পারেন নাই, অদ্যাপি উভযেব মধ্যে সম্প্রদায়গত বিদ্বেষভাব ও কুসংস্কাব সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয নাই। ইতিহাস জাতীয জীবনচরিত। যেমন জীবনচরিত পাঠ করিলে ব্যক্তি বিশেযেব দোষগুণ জানা যায়, সেইরূপ ইতিহাস পাঠে জাতি বিশেষের দোষগুণ পরিলক্ষিত হয। ভারতের মুসলমান বিজেতাবা অনেকের মতে পরস্বাপহারী ও নরাধম বলিযা পরিগণিত। বোধ হয় এই বিশ্বাসই অধিকাংশ কুসংস্কারের মূলীভূত। এ পর্যন্ত বাঙ্গালা ভাষায যে সকল ইতিহাস প্রণীত হইযাছে তাহার অধিকাংশই বিদ্যালয় পাঠ্য। মুসলমান বাজত্ব প্রকরণ ইবাজী গ্রন্থকারদিগের চর্বিত চর্বণ দ্বাবাই পরিপূর্ণ। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ স্বীয সম্প্রদায়ের যে সকল অক্ষযকীর্তি লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাবা অস্মদেশীয অনেকেরই অপরিজ্ঞাত ও অপবিজ্ঞেয়। এই অভাব দূর করিবাব জন্য আমি মহাম্মদ কাসিম ফেরেস্তা ও অন্যান্য পুরাবৃত্তকারদিগের মূল গ্রন্থ হইতে মুসলমান রাজত্ব প্রকরণ সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি এতদ্দ্বারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে অনুমাত্র প্রীতি বর্ধিত হয় যদি এতদ্দ্বাবা মুসলমানদিগের বীরত্ব, উদারতা ও বিদ্যোৎসাহিতা সম্বন্ধে লোকের অযথা ধাবণার কিঞ্চিৎমাত্রও লাঘব হয়, যদি এতদ্দ্বারা মুসলমান পুরাবৃত্তপাঠে লোকের যৎসামান্য অনুরাগেরও সঞ্চার হয়, তাহা হইলেই আমি পরিশ্রম সার্থক বিবেচনা করিব।"[১২১] রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে পুস্তকখানির সমালোচনা লেখেন। গ্রন্থপাঠের প্রতিক্রিয়াটি তিনি এভাবে ব্যক্ত করেছেন, ' ... এদিকে অনতিপূর্বে ভারতবর্ষের প্রতিবেশে বহুতর খণ্ড বিচ্ছিন্ন জাতি মহাপুরুষ মহম্মদের প্রচণ্ড আকর্ষণ বলে একীভূত হইয়া মুসলমান নামক এক বিরাট কলেবব লইয়া উত্থিত হইয়াছিল। ... আমবা হিন্দুরা বিশেষ করিয়া কিছু চাহি না, অন্যের প্রাচীরের সন্ধি বিদীর্ণ করিয়া দূরের দিকে শিকড়

---

১২১ আবদুল কবিম— *ভাবতবর্ষে মুসলমান বাজত্বেব ইতিহাস*, মেটকাফ প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮, পৃ. (ভূমিকা)।

প্রসারণ করি না — সেইজন্য যাহারা চায় তাহাদের সহিত পারিয়া উঠা আমাদের কার্য নহে। যাহারা চায়, তাহারা যে কেমন করিয়া চায় এই সমালোচ্য গ্রন্থে (ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাসে) তাহার ভুরিভুরি দৃষ্টান্ত আছে। পৃথিবীর জন্য এমন ভয়ংকর কাড়াকাড়ি, রক্তপাত, এত মহাপাতক, একত্র আর কোথাও দেখা যায় না অথচ এই রক্তস্রোতের ভীষণ আবর্তের মধ্য হইতে মাঝে মাঝে দয়াদাক্ষিণ্য ধর্মপরতা রত্নরাজির ন্যায় উৎক্ষিপ্ত হইয়া উঠে।"[১২২] একই সময়ে 'ঢাকা প্রকাশে' গ্রন্থখানি সমালোচনা হয়। পত্রিকায় লেখা হয়, "ইংরাজি বিদ্যালয়ে ইংরাজের লিখিত অথবা তদনুকরণে দেশীয়দিগের লিখিত ভারতবর্ষের যে সকল ইতিহাস পঠিত হইয়া থাকে, তাহাতে মুসলমান রাজত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি অপবাদ পরিলক্ষিত হয় ; তাহা দূরীকৃত করিয়া মুসলমান ঐতিহাসিকদিগের ইতিহাস অবলম্বনে মুসলমান রাজত্বের গৌরব ঘোষণা করা এবং তদ্দ্বারা হিন্দু মুসলমান পরস্পর মধ্যে সম্প্রীতি জন্মান গ্রন্থকারের প্রধান উদ্দেশ্য ভূমিকায় ঘোষিত হইয়াছে দেখিয়া আমরা অতিশয় আহ্লাদিত হইয়াছিলাম। গ্রন্থের প্রথমাংশ মুসলমান ধর্মের ইতিহাস ও মুসলমান রাজ্য স্থাপনের যে ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে গ্রন্থকার যথেষ্ট নিরপক্ষেতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সাধারণতঃ মুসলমানগণ ধর্মবীর মহম্মদ ও তৎসহচরাদির সম্বন্ধে যে সকল অলৌকিক ক্ষমতার প্রচার করেন, গ্রন্থকার সেরূপ কিছু যে করেন নাই, তাঁহাদিগকে সাধারণ ব্যক্তিরূপে দোষগুণ ও ভ্রমপ্রমাদাদি বিশিষ্টরূপে প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা মুসলমান হইয়া করা সহজ কথা নহে। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন সম্বন্ধেও গ্রন্থকার যথেষ্ট সত্যপরায়ণতা প্রর্দশন করিয়াছেন।"[১২৩]

আবদুল করিম প্রথম গ্রন্থখানি সৈয়দ আমীর আলীকে ও দ্বিতীয় গ্রন্থখানি তদানীন্তন জনশিক্ষার ডিরেক্টর সি.এ. মার্টিনকে উৎসর্গ করেন। তিনি 'প্রফেট অব ইসলাম এণ্ড হিজ টিচিং', 'ইসলাম এ ইউনিভারস্যাল রিলিজিয়ন অব পীস্ এণ্ড প্রোগ্রেস' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।[১২৪]

মোহাম্মদ রহিম বক্স

তিনি বগুড়ার অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'শোকার্ণব' (১৮৯৮) নামে একখানি শোককাব্য রচনা করেন। এতে তিনিটি শোকাবহ ঘটনার উল্লেখ আছে : ১. ১৮৯৭ সালে ভূমিকম্পের বিবরণ, ২. নবাব আবদুল লতিফের মৃত্যুতে (১৮৯৩) স্মৃতিচারণা, ৩. বগুড়ার নবাব

১২২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর —'মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস', *ভারতী*, শ্রাবণ ১৩০৫ (প্রবন্ধটি 'আধুনিক সাহিত্যে' সংকলিত হয়)।

১২৩ *ঢাকা প্রকাশ*, ২৩ শ্রাবণ ১৩০৫

১২৪ নরেন্দ্র কুমার গুপ্ত চৌধুরী— *শ্রীহট্ট-প্রতিভা*, ১৯৬১ পৃ. ৯-১২ ; সৈয়দ মর্তুজা আলী— 'শ্রীহট্টের ইতিহাস', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮

আবদুস সোবহান চৌধুরীর একমাত্র কন্যা আলতাফন্নেসার অকাল মৃত্যুতে শোকাতুরতার বর্ণনা। কবির বর্ণনা ঘটনাশ্রিত ও বিবৃতিমূলক : অন্তর্মুখী শোকভাব পবিস্ফুট হয়নি। 'শোকার্ণব' বগুড়ার 'চৌধরী প্রেস' থেকে মুদ্রিত হয়।[১২৫]

কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ

কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ প্রথমে ফরিদপুরের রাজবাড়ী রাজস্কুলের পারস্য অধ্যাপক ছিলেন, পরে খুলনার বাগেরহাটের ম্যারেজ রেজিস্টার হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'মহাত্মা হজরত ইমাম আবু হানিফা সাহেব' (১৮৯৯)। আরবের কুফার অধিবাসী ইমাম আবু হানিফা ছিলেন ইসলাম ধর্ম ও আইনের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যাতা। তিনি 'হানাফী' সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। কাজী নওয়াবউদ্দীনের গ্রন্থে তাঁরই ব্যক্তিগত জীবন ও চারিত্র্য মাহাত্ম্যের বর্ণনা আছে। গ্রন্থের বিষয়বস্তু ও উৎস সম্বন্ধে লেখক 'পূর্বাভাষে' বলেন, "যিনি এই অবনী-মণ্ডলে সামান্য বণিকপুত্র রূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া কঠোব পরিশ্রম, অসাধারণ অধ্যবসায ও গভীর গবেষণা বলে অগাধ বিদ্যা সঞ্চয় করিয়াছিলেন, — যিনি অদম্য উদ্যম ও অপরিসীম শ্রমবলে পবিত্র ফেকা শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়াছিলেন, — যিনি স্বীয় ন্যায়নিষ্ঠা সত্যপরতা ও ধর্মানুরাগ প্রভাবে সমগ্র জগৎ বিমোহিত কবিযাছিলেন-- সেই পণ্ডিত কুলতিলক সত্যসন্ধ সাধকশ্রেষ্ঠ, ক্ষণজন্মা মহাত্মা হজরত এমাম আবু হানীফা (রাঃ) সাহেবের পবিত্র জীবনচরিত প্রসিদ্ধ আরব্য ও পারস্য গ্রন্থাবলম্বনে সরল বঙ্গভাষায় বিরচিত হইল। অত্র রচনায় আলিগড় কলেজের আরব্য প্রফেসর, বিজ্ঞবর মৌলবী শিবলী নোমানী সাহেবের সংকলিত 'সীরাতন নোমান' গ্রন্থই আমাদের প্রধান অবলম্বন।"[১২৬] গ্রন্থখানি প্রণয়নে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ (সুধাকরের ভূতপূর্ব সম্পাদক) ও গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী (সন্তোষ-জাহ্নবী স্কুলের শিক্ষক) লেখককে সাহায্য করেন। বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে বলা হয়, "Abu Hanifa, The great Muhammadan law-giver and founder of the sect known as Swade-Azam (the great sect) was a native of kufa in Arabia. He was born in 80, and poisoned in 150 Higra at the instance of the Emperor Mansur. His compilation of Feka (civil and criminal law of Islam) is the most authoritative and his memory is still cherished by his co-religionists for his extraordinary learning and piety. The book is written in fairly good bengali." 'জানাজা শিক্ষা' (১৯১৪) ও 'পারসী শিক্ষা' (১ ও ২ ভাগ) নামে তাঁর দুখানি শিক্ষামূলক পুস্তক আছে।[১২৭]

১২৫ *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ২ ত্রৈ, খ., ১৮৯৮

১২৬ কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ— *মহাত্মা হজরত এমাম আবু হানীফা (রাঃ) সাহেব*, বাগেরহাট, খুলনা, ১লা পৌষ ১৩০৫, 'পূর্বাভাষ' দ্রষ্টব্য।

১২৭ ১৩২২ *বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা*, পৃ. ১০৪

সমিনউদ্দীন আহমদ

'মেদিনীপুর জেলার, পুলিশ সব-ইনস্পেক্টর' সমিনউদ্দীন আহমদ দুখানি বই লেখেন : 'পঞ্চাইত বিধি' (১৮৯৯) ও 'চৌকিদারী গাইড' (১৯০০)। ১৮৭০ সালের ষষ্ঠ আইনে পঞ্চায়েত প্রথায় চৌকিদার-দফাদারদের দায়িত্ব সম্পর্কে যেসব আইন-কানুন আছে, গ্রন্থকার বই দুটিতে সেসব বিষয় অনুবাদসহ আলোচনা করেছেন। তিনি 'পঞ্চাইত বিধি'র বিজ্ঞাপনে গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, "পুলিশ কর্মচারিগণের সহিত এই পঞ্চাইত ও চৌকিদারগণের বিস্তর সম্বন্ধ রহিয়াছে, এই নিমিত্ত পঞ্চাইতগণকে তাঁহাদের কর্তব্য কার্যগুলি বিশেষভাবে বুঝাইয়া দেওয়া পুলিশ কর্মচারিগণের পক্ষে সর্বতোভাবে বিধেয়। ... পঞ্চাইতগণ যাহাতে অতি সহজে আপন কর্তব্য কার্য্যের বিধি জ্ঞাত হইতে পারেন ও যে উপায়ে হিসাবী কাগজাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের ক্ষুদ্র সেরেস্তাটী দুরস্ত রাখিতে পারেন এবং যাহাতে তাঁহারা কোনো প্রকার পতিত না হয়েন ও সাধারণ অজ্ঞ প্রজাগণ যাহাতে আইনের মর্ম বুঝিতে পারে এবং যাহাতে চৌকিদারগণ সহজে বেতন পায়, তাহার জন্য আমি অল্প বিদ্যাবুদ্ধিবলে যতদূর পর্যন্ত এই কার্যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, তদ্দ্বারা সাধারণের উপকারার্থে অতি সরল বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি উপদেশ দফাওয়ারিতে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে পরিণত করিলাম।"[১২৮] গ্রন্থখানি মেদিনীপুরের ডিস্ট্রিক্ট পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট কে.বি. টমাসকে উৎসর্গ করা হয়। 'গার্হস্থ্যনীতি' সম্পর্কিত 'কওয়ায়েদে-খানাদারী' (১৯০৯) সমিনউদ্দীন আহমদের লেখা অপর একটি গ্রন্থ। এতে ধর্ম, সমাজ ও নীতি বিষয়ে উপদেশ আছে।[১২৯]

মানিকউদ্দীন আহমদ (১৮৬৮-১৯৪৮)

বগুড়া জেলার আদমদিঘী থানার সুদিনগ্রামে মানিকউদ্দীন আহমদ জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি নর্মাল পাশ পণ্ডিত ছিলেন। রংপুর ট্রেনিং স্কুল থেকে স্পেশাল ট্রেনিং সার্টিফিকেট লাভ করেন। তিনি কিছুকাল পোস্ট-মাস্টারি করেন, পরে বগুড়ার ধূপচাঁচিয়া মডেল স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হন। তিনি একাধিক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এগুলি হল :

ক. বিবিধ উপদেশ সম্বলিত প্রাচীন প্রবাদ ও খনার বচন (১৮৯৯)
খ. সন ১৩০৬ সালের বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকা (১৮৯৯)
গ. নবহীরকখনি বা ইসলাম সুহৃদ (১৯০৯)
ঘ. মহম্মদীয় বিবাহ দর্পণ (১৯১১)
ঙ. উপদেশ লহরী (১৯১৩)
চ. বাঙ্গালা শব্দকোষ বা ছাত্র সহচর অভিধান (১৯১৪)
ছ. শোকোচ্ছ্বাস ও বিদায় গীত (১৯১৫)

১২৮ সমিনউদ্দীন আহমদ—*পঞ্চাইত বিধি*, কৃপানন্দ যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৭, পৃ. ।. (বিজ্ঞাপন)
১২৯ *ন্যাশনাল লাইব্রেরি ক্যাটালগ* (বাংলা গ্রন্থ) ৪ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩, পৃ. ২৫

প্রাচীন প্রবাদ ও খনার বচন ২০ পৃষ্ঠার একটি ক্ষুদ্র সংকলন। বৃহৎ মহম্মদীয় পঞ্জিকায় অন্যান্য বিষয়ের সাথে তুরস্কের সুলতানের বর্ণনা আছে।[১৩০]

মোল্লা খোদাদাত

মোল্লা খোদাদাত খান বাহাদুর নদীয়ার বামনপুরের জমিদার ছিলেন। বনেদি জমিদার হিসাবে এই মোল্লা পরিবারের সুখ্যাতি ছিল। মোল্লা খোদাদাত এক সময়ে কৃষ্ণনগরে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অনারেরি ম্যাজিস্ট্রেট, ডিস্ট্রিক্ট এবং লোকাল বোর্ডের মেম্বর ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার ছিলেন।[১৩১] সাহিত্যানুরাগিতা তাঁর অপর একটি গুণ ছিল। তিনি 'মনাজাত' নামে একখানি ভাবমূলক কবিতার বই লেখেন। পুস্তিকাখানির সমালোচনা করে 'ইসলাম-প্রচারকে' লেখা হয়, " ... মনাজাত গ্রন্থকারের হৃদয়ের জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস। ... ইহার প্রত্যেক পংক্তিতে খোদাতালার প্রতি ভক্তির প্রবল ফোয়ারা ছুটিতেছে। ... ইহা সরল ও সুমিষ্ট কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিতেছে। মুসলমান জমীদারদিগের মধ্যে আজ পর্যন্ত কাহাকেও বঙ্গ সাহিত্যের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতে দেখি নাই। মৌলবী খোদাদাত খান বাহাদুর সমাজে যেরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন, রাজপুরুষদিগের নিকট ইহার যেরূপ উচ্চ সম্মান, আজ মনাজাত লিখিয়া ইনি সাহিত্য জগতেও সেইরূপ যশস্বী হইতে চলিলেন।[১৩২] কৃষ্ণনগরের অধিবাসী হিসাবে তিনি বিশুদ্ধ বাংলা ভাষা আয়ত্ত করেছিলেন।

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী (১৮৬৩-১৯২৯)

ধনবাড়ির জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ কেবল পত্র-পত্রিকা প্রকাশ ও বইপুস্তক মুদ্রণে অর্থ সাহায্য দানের মধ্যেই প্রকাশ পায়নি, তিনি স্বয়ং বাংলা পুস্তক রচনা করেছেন। 'ঈদুল আজহা' (১৯০০) ও 'মৌলুদ শরিফ' (১৯০৩) নামক ধর্মবিষয়ক দুখানি গ্রন্থ তাঁরই রচনা। বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্মকথা প্রচার এরূপ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য ছিল। 'ঈদুল আজহা'র ভূমিকায় তিনি বলেন যে, ধর্মই জীবনের প্রধান লক্ষ্য। ধর্মই ইহলোক ও পরলোকের সহায়। এ নশ্বর জগতে ধর্মই সত্য ও অবিনশ্বর। ঈদের নামাজ, আরবি খোতবা দেশের মানুষ বুঝে না। ধর্মকথা তাদের কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্যই তাঁর এ-প্রয়াস।[১৩৩] 'মিহির ও সুধাকরে' এক বিজ্ঞাপনে বলা হয়, "তিনি (নওয়াব আলী চৌধুরী) দুর্বোধ্য ধর্মকথাগুলি বঙ্গভাষায় এমন সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যে, দেখিলে অবাক হইতে হয়। . . . সাধারণকে বুঝাইবার জন্য

১৩০ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৯৯
১৩১ *ইসলাম প্রচারক*, বৈশাখ ১২৯৯
১৩২ ঐ।
১৩৩ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী,-*ঈদুল আজহা*, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯ হিজরি (১৯০০খ্রি.), পৃ. (ভূমিকা)

যেরূপ চেষ্টা করিয়াছেন, উক্ত পুস্তক পাঠ না করিলে তাহা কখনই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারা যায় না।"[১৩৪] গ্রন্থখানি 'সুধাকরে' 'ঈদ কাহিনী' শিরোনামে আংশিক প্রকাশিত হয়। এটি 'স্বর্গীয়া সহধর্মিণী সৈয়দানী আলতাফন্নেসা'র নামে উৎসর্গ করা হয়।

নওয়াব আলী চৌধুরীর দ্বিতীয় গ্রন্থ 'মৌলুদ শরিফ'। গ্রন্থ রচনার প্রেরণা ও উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তিনি 'গ্রন্থকারের কথা' শীর্ষক দীর্ঘ ভূমিকায় বলেন, "ধর্ম সংশ্রববিহীন আনন্দ, আনন্দ পদবাচ্যই নহে। ... আমি বহু দিবস হইতেই মনে মনে আলোচনা করিয়াছিলাম-- সত্যই কি আমাদের সমাজে এমন কোন ধর্মানুষ্ঠান নাই তদুপলক্ষে ধর্মালোচনা ও তৎসঙ্গে আনন্দোৎসবও চলিতে পারে? আমার মনে উদিত হইল—সকল সম্প্রদায়ই নিজ নিজ ধর্মপ্রচারক বা মহাপুরুষের জন্মদিনে আনন্দ উৎসব করিয়া থাকেন। 'খ্রিষ্টমাস', 'হিন্দুর জন্মাষ্টমী' প্রভৃতি উল্লিখিত শ্রেণীর আনন্দোৎসবপর্ব। আমাদের মধ্যেও যে এরূপ নাই তাহা নহে। আমাদের পবিত্র ধর্মপ্রবর্তক হজরত মোস্তফার (দঃ) জন্মদিনের পুরাকাল হইতেই আনন্দোৎসব প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাই পবিত্র মৌলুদোৎসব। মৌলুদ-উৎসব পৃথিবীতে আনন্দদায়ক ও পরকালে মুক্তির সোপান। এমন কি লোকে ব্যাধিগ্রস্ত বা বিপদগ্রস্ত হইলে তাহা হইতে উদ্ধার লাভ কামনায় এই পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। রোগ বা বিপদ মুক্ত হইলে কিম্বা বিবাহাদি কেন প্রকার আনন্দের সময়, মুসলমানদের আনন্দের প্রধান উপকরণ এই পবিত্র মৌলুদ অনুষ্ঠান। ... আমি মনে করিয়াছিলাম, এই সদনুষ্ঠান কিছু দীর্ঘদিন ব্যাপিয়া করিলে পবিত্র আনন্দ ও ধর্মতৃষ্ণা নিবারণ এবং এই উপলক্ষে দূরবর্তী আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবের সহিত দেখা সাক্ষাৎ ও আমোদ-প্রমোদের যথেষ্ট সুযোগ হইবে। এইজন্য বিগত ১২৯৭ বঙ্গাব্দ হইতে আমার আবাসবাটী ধনবাড়ীতে রবিউল আউয়াল চান্দ্রমাসের প্রথম হইতে দ্বাদশ দিন ব্যাপী উৎসব হইয়া আসিতেছে। ... আমাদের এই উৎসব ক্ষেত্রে আরবি, পার্শি ও উর্দুতে ধর্মগ্রন্থের আলোচনা, আবৃত্তি ও বক্তৃতাদি হইত। কিন্তু সাধারণ অশিক্ষিত সম্প্রদায়ের পক্ষে ঐ সমস্ত ভাষা সহজবোধ্য নহে বলিয়া আমি তাহাদের জন্য বাঙ্গালায় প্রতি দিবস এক একটি বিষয়ের আলোচনা করিতাম। বর্তমান গ্রন্থখানি তাহারই সংগ্রহ বিকাশ তবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য, নানাবিধ শাস্ত্রাদির মূল প্রমাণ ও তদনুবাদাদির সাহায্যে টীকা ও বিশ্লেষণাদি দ্বারায় বিষয়টিকে আরও পরিস্ফুট করিতে হইয়াছে। ... আমাদের দেশে চির পদ্ধতি ছিল, স্কুলের ছাত্রগণ সরস্বতী পূজা করিয়া আমোদ-প্রমোদ করিত। ধর্মশিক্ষা ও ধর্মভাব স্ফুরণের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান ছাত্রগণ জানিত না যে তাহাদের ঐরূপ কোনো পবিত্র উৎসব আছে কিনা। কাজেই তাহারা মুসলমান ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিয়া পৌত্তলিকতায় যোগ দিয়া ধর্মভ্রষ্ট হইত। নিতান্ত সুখের বিষয় এই যে এক্ষণে তাহারা স্ব স্ব অজ্ঞতা বুঝিতে পারিয়াছে— তাহাদেরও এরূপ নির্মল আনন্দদায়ক ধর্মোৎসব আছে জানিয়া এই মৌলুদ উৎসব আরম্ভ করিয়াছে।"[১৩৫] এই উক্তি থেকে নওয়াব আলী চৌধুরীর প্রতিক্রিয়াশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি ঐ সময়ে মুসলমানের সামাজিক আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ

১৩৪ *মিহির ও সুধাকর*, ২৭ পৌষ ১৩০৭

১৩৫ সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী— *মৌলুদ শরিফ*, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩২২ হিজরি (১৯০৩ খ্রি.), পৃ.১-৫

ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁর মনোভাব সমাজকে প্রভাবিত করেছিল, যার লক্ষ্য ছিল ধর্ম–সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যকামিতা। মৌলুদ উদ্‌যাপন ধর্মানুষ্ঠান বিশেষ ; নওয়াব আলী চৌধুরী একে সামাজিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেন। তিনি গ্রন্থখানি পিতা জনাব আলী চৌধুরীকে উৎসর্গ করেন।

তাঁর ইংরাজি গ্রন্থ 'ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) মূলে ছিল বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের একটি প্রস্তাব। প্রস্তাবটি ইংরাজিতে অনুবাদ করে এবং পুস্তিকা আকারে মুদ্রিত করে সমালোচনার জন্য বিভিন্ন সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করা হয়। 'মুসলমান ছাত্রের বাঙ্গালা শিক্ষা' শিরোনামে একটি নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'তে নওয়াব আলী চৌধুরীর পুস্তিকার সমালোচনা করেছিলেন। তিনি মুসলমান ছাত্রদের উপযোগী পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে নওয়াব আলী চৌধুরীর অভিমত সমর্থন করেন, তার বাংলা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষ বিষয়ক প্রশ্নে তাঁর সহিত একমত হতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "সৈয়দ সাহেব বাঙ্গালা সাহিত্য হইতে মুসলমান বিদ্বেষের যে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়াছেন সেগুলি আমরা অনাবশ্যক ও অসঙ্গত জ্ঞান করি। বঙ্কিমবাবুর মত লেখকের গ্রন্থে মুসলমান বিদ্বেষের পরিচয় পাইলে দুঃখিত হইতে হয় কিন্তু সাহিত্য হইতে ব্যক্তিগত সংস্কার সম্পূর্ণ দূর করা অসম্ভব। ... মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনোরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।"[১৩৬]

নওয়াব আলী চৌধুরীর শিক্ষা বিষয়ক আর একটি রচনা 'প্রাইমারী এডুকেশন ইন রুরাল এরিয়াজ' (১৯০৬)। এটি ১৯০৬ সালে এপ্রিল মাসে ঢাকায় 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সম্মেলনে' পাঠ করেছিলেন। মোসলেম ইনস্টিটিউট পত্রিকায় পুস্তিকাটির সমালোচনা বের হয়। পত্রিকায় বলা হয় যে, খান বাহাদুর নওয়াব আলী চৌধুরী দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়, তারই উপর ভিত্তি করে তিনি উক্ত পুস্তিকাখানি রচনা করেন। পুস্তিকার সঙ্গে গ্রন্থে প্রদত্ত তৎকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের তালিকাটি মূল্যবান।[১৩৭]

ওহাজুদ্দীন আহমদ

ওহাজুদ্দীন আহমদের একটি মাত্র বই 'গোবধে আপত্তি কেন' (১৯০০) 'নোয়াখালী প্রেস' থেকে প্রকাশিত হয়। 'ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগে' গ্রন্থের পরিচিতি সম্পর্কে বলা হয়েছে : "এই গ্রন্থে গো–বধ প্রথার সপক্ষে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষা এবং এর বিপক্ষে হিন্দুগণের দ্বারা উত্থাপিত অভিযোগের বিরুদ্ধতা করা হয়েছে। তিনি উপসংহারে মুসলমান

১৩৬ *ভারতী*, কার্তিক ১৩০৭

১৩৭ *Journal of the Muslim Institute*, September. 1906

ভ্রাতাগণকে নিজ অধিকার সম্পর্কে মিলিতভাবে সরকারের কাছে আবেদন জানাতে অনুরোধ করেছেন।"[১৩৮] গ্রন্থের ভূমিকাতেও এ-মতের সমর্থন পাওয়া যায়। লেখক বলেছেন, "It is belived that even in certain districts of Eastern Bengal some Zemindars are not allowing their ryots to salughter cows on their estates. This is not a very happy sign. We earnestly hope that the benevolent British Government will appoint a special commission enquring and will save the poor Muslim cultivators from the terrible oppression of the Hindu Zemindars."[১৩৯] ওহাজুদ্দীনের গ্রন্থখানি মীর মোশারফ হোসেনের 'গো-জীবন' নিয়ে যখন আন্দোলন চলছিল তারই পরিপ্রেক্ষিতে লেখা, তা 'নোয়াখালী এসলামিয়া সভা'র এক প্রস্তাব থেকে জানা যায়। ঐ প্রস্তাবে বলা হয় : "গোবধ নিবারণ সম্বন্ধে যে আন্দোলন হইয়াছে, তাহার অযৌক্তিকতা প্রদর্শনপূর্ব শ্রীযুক্ত মুন্সী ওহাজদ্দিন আহমদ যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, এই সভা তাহার পূর্ণ অনুমোদন করিতেছেন, এবং ইহাও সিদ্ধান্ত করিতেছেন যে, এই সভার ব্যয়ে উক্ত প্রবন্ধ পুস্তকাকারে মুদ্রিত করিয়া তাহার ৪০০০ সংখ্যা বিনা মূল্যে দেশমধ্যে বিতরিত হউক।"[১৪০] 'গো-বধে আঁপত্তি কেন' গ্রন্থখানি যে ঐ সময়ে লেখা হয়েছিল তা ঐ সংবাদ থেকে জানা যায়। ওহাজুদ্দীন আহমদের 'ত্রিপুররাজ বিজয়ী মহাবীর নবাব সামসের গাজী' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ 'ইসলাম প্রচারকে' প্রকাশিত হয়।[১৪১]

শেখ সাজ্জাদ করিম

শেখ সাজ্জাদ করিম হুগলী জেলার আড়দি ডাকঘরের অধীনস্থ জয়সিংচক গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ 'আমিনা' (১৯০০) একটি সামাজিক উপন্যাস। তিনি 'ফুলের মালা' (১৯০২) এবং 'সাজ্জাদা' (১৯১২) নামে অপর দু'খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ব্যোমকেশ মুস্তোফী 'ফুলের মালা'কে কবিতা-পুস্তক বলে উল্লেখ করেছেন।[১৪২] 'সাজ্জাদা বা যোগাসন' রুমীর মসনবী কাব্যের ছায়াবলম্বনে রচিত একটি আধ্যাত্মিক সাধনার বই।[১৪৩]

বদরুদ্দোজা চৌধুরী

বদরুদ্দোজা চৌধুরী চট্টগ্রামের রামুর অধিবাসী ছিলেন। বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগে তাঁর রচিত চারখানি পুস্তকের নাম পাওয়া যায়—যথা 'মহর্ষি লোকমানের শত উপদেশ'

---

১৩৮ *ব্রিটিশ মিউজিয়াম লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩১২

১৩৯ ওহাজুদ্দীন আহমদ—*গো-বধে আপত্তি কেন*, নোয়াখালী, ১৯০০ ; *Muslim Community in Bengal*, pp. 363-64

১৪০ *সুধাকর*, পৌষ ১২৯৬

১৪১ ইসলাম প্রচারকের ১৯০৫ সালের মে, জুন, জুলাই, আগস্ট এবং ১৯০৬ সালে ফেব্রুয়ারি এই পাঁচ সংখ্যায় ঐ প্রবন্ধটি সমাপ্ত হয়।

১৪২ ব্যোমকেশ মুস্তোফী—'গত বর্ষের বাঙ্গালা সাহিত্য', *সাহিত্য*, ভাদ্র ১৩১০

১৪৩ ১৩২২ *বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা*, পৃ. ১১১

(১৯০০), 'বদরুল মাআরেক' (১৯০১), 'বদরুল ইসলাম' (১৯০২) এবং 'বদরুল আনোয়ার' (ঐ)।[১৪৪] ধর্ম ও নীতি কথা প্রচার উদ্দেশ্যেই বদরুদ্দোজা এগুলি প্রণয়ন করেন। '১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা'য় তাঁর রচিত 'প্রার্থনা', 'নামাজ', 'দোওয়া' প্রভৃতি বই এর উল্লেখ আছে।[১৪৫]

মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন মণ্ডল

বগুড়ার সারেকান্দি থানার অন্তর্গত সরিলার গ্রামনিবাসী মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন মণ্ডল 'হায়রে সেদিন কোথায় গেল' (১৯০০) নামে ২৭ পৃষ্ঠার একখানি কবিতার বই লেখেন। এতে 'সাবেক কালের সহিত বর্তমান কালের উপমা' আছে ; অর্থাৎ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে পূর্বকালের অবস্থার সহিত কবির সমকালের একটি তুলনামূলক আলোচনা আছে। একে একটি যুগসমীক্ষা বলা যেতে পারে।' পয়ার ছন্দে সরল ভাষায় কবি বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা করেছেন। যুগের পরিবর্তন দেখিয়ে তিনি এক জায়গায় বলেছেন,

> এবে আর নাহি দেখি ছোট বড় জ্ঞান ;
> কুলীনের কুল গেল সম্মানীর মান।
> টাকা যার আছে— মান কুল কেবা পুছে
> এবে আর কুল নাই, সেদিন গিয়াছে।[১৪৬]

পূর্বে রক্তে কৌলিন্যের পরিচয় ছিল, এখন অর্থে আভিজাত্যের পরিচয়। সমাজজীবনের এই পরিবর্তনের ধারাটি কবি খুব সহজ কথায় ইঙ্গিত করেছেন। কবির দৃষ্টিতে অতীতের দিনগুলি ধর্মবোধ, নীতিজ্ঞান, আচার-আচরণ ও আহার-বিহারের দিক দিয়ে উন্নত ও আনন্দদায়ক ছিল, এখন সব ক্ষেত্রেই অবনতি ঘটেছে।

সমিরুদ্দীন সাধারণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি স্থানীয় হাটে ইন্দ্রচাঁদ বাবুর তেজারতি কারবারে মহুরির কাজ করতেন। পরে তিনি নিজেই তেজারতির আড়ত খুলেন। তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা খুব সামান্যই ছিল।[১৪৭] সমিরুদ্দীনের কবিত্বশক্তি ছিল না, তবে একটি সমাজবীক্ষণধর্মী মন ছিল আর সেটাই ছিল তাঁর কাব্য রচনার প্রধান প্রেরণার ক্ষেত্র।

১৪৪ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ,* ১ ও ৩ ত্রৈ., খ. ; ১৯০১ ; ৪ ত্রৈ., খ., ; ১৯০২

১৪৫ ১৩২২ *বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা,* পৃ. ৬৬

১৪৬ মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন মণ্ডল—*হায়রে সেদিন কোথায় গেল,* দাস যন্ত্র, কবিতা, ১৩০৭, পৃ. ১৮

১৪৭ তিনি গ্রন্থের শেষে 'রচকের বিনয়' অংশে বলেছেন,

> মোহে পড়ে রহিলাম জ্ঞান নাহি হৈল ;
> রচনা রচিতে শক্তি কিসে হবে বল।

হায়রে সেদিন কোথায় গেল, পৃ. ২৬

আবদুর রশিদ খান

'১৯০১ সনের নোয়াখালীর মোকদ্দমা। মহাত্মা পেনেলের বিচার। অর্থাৎ রায় ও হাইকোর্টের এবং ভারত ও বঙ্গীয় গভর্নমেন্টের টেলীগ্রাম ও গুপ্তরহস্যপূর্ণ বিধি আদির সম্পূর্ণ বঙ্গানুবাদ। প্রথম খণ্ড। শ্রী আব্দুর রশিদ খাঁ কর্তৃক অনুবাদিত। শ্রী সেরাজুল আহমদ চৌধুরী দ্বারা প্রকাশিত। নোয়াখালী রামেন্দ্রযন্ত্রে শ্রী তারকাচন্দ্র চক্রবর্তী দ্বারা মুদ্রিত'।—এটি হল আবদুর রশিদ খানের গ্রন্থের আখ্যাপত্রের প্রতিলিপি। 'ইসমাইল জাগীরদার' নামে জনৈক ব্যক্তির হত্যাকাণ্ডের মোকদ্দমা নোয়াখালীর সেসন জজ পেনেল সাহেবের এজলাসে সম্পন্ন হয়। হত্যাকাণ্ডের সাথে পুলিশ জড়িত ছিল। কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব না করে পেনেল সাহেব নির্ভীকভাবে রায় দেন। এ রায় কর্তৃপক্ষের মনঃপূত না হওয়ায়, তাঁকে চাকুরি থেকে সাসপেণ্ড করা হয়। পেনেল সাহেবের ইংরাজি রায় ও অন্যান্য তথ্যের বঙ্গানুবাদ উক্ত গ্রন্থখানি। গ্রন্থের শেষে 'উপসংহারে' অনুবাদক লেখেন, "এখন দেশের অবস্থা যেরূপ তাহা চিন্তা করিলে ভয় হয়। পূর্বে বৃটিশ সন্তানগণ জেলার মাজিস্ট্রেট হইয়া আসিয়া কেবল রাজসিংহাসনে বসিয়া বিচার করিতেন না আর চাটুকার ব্যক্তিগণের কথা শুনিয়া সন্তোষ লাভ করিতেন না। অধস্তন কর্মচারীদের হাতেই সমস্ত কাজ ছাড়িয়া দিয়া নিজে আয়াসে আরামে সময় কাটাইতেন না এবং 'অতিভক্তি চোরের লক্ষণ' এই সমস্যা স্মরণ করিয়া তাহাদের সকল কার্যের উপর তীব্র লক্ষ্য রাখিতেন। তখন পুলিশও গোপনীয় অনুসন্ধানের ভয়ে ব্যতিব্যস্ত হইত। আজকালকার 'ধন উপার্জনে সুযোগ ও সুখের নিদ্রা' পুলিশের ভাগ্যে জুটিত না। ভরসা করি দেশীয় মাজিস্ট্রেটগণ পূর্বতন বৃটিশ সন্তানগণের অনুসরণ করিবেন।"[১৪৮] গ্রন্থের প্রকাশক সেরাজুল আহমদ চৌধুরী 'আমাদের নিবেদন' অংশে অনুরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে লিখেছেন, "আমরা ভরসা করি, ভারতের হিতাকাঙ্ক্ষীগণ, সংবাদপত্রের সম্পাদকগণ, দেশীয় শিক্ষিত ও রাজকীয় উচ্চাসনে আসীন ব্যক্তিগণ, তদন্তকারী পুলিশের কর্মচারীগণের দোষ গোপন প্রভৃতি দোষের দণ্ড বিধানের বিধি দণ্ডবিধিতে বিধিবদ্ধ করিতে যত্নবান হইবেন ও পুনঃপুনঃ আন্দোলন করিতে থাকিবেন। তাহা হইলে অবশ্যই গবর্নমেন্ট আমাদের দুঃখে দুঃখিত হইবেন ও প্রতিকারের পথ আবিষ্কার করিতে যত্নবান হইবেন।"[১৪৯]

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ

মোহাম্মদ আবদুল আজিজ 'সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-চরিত' (১৯০১) নামে ২৪ পৃষ্ঠার ক্ষুদ্র জীবনীগ্রন্থ লেখেন। 'কুষ্টিয়া মোহামেডান এসোসিয়েশন' এটি প্রকাশ করে। মোহাম্মদ আবদুল আজিজ নদীয়া জেলার শ্যামপুর থানার দৌলতপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'বিজ্ঞাপনে' বলেন, "আমাদের ধর্মগুরু মহম্মদের

১৪৮ *১৯০১ সানের নোয়াখালীর মোকাদ্দমা*, পৃ. ১।৵.-II.

১৪৯ ঐ, পৃ. II.

জীবনচরিত প্রত্যেক মুসলমানের অবগত হওয়া একান্ত কর্তব্য। আমবা মুখে মুসলমান বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া থাকি অথচ উক্ত ধর্ম সম্বন্ধে অপরে কিছু জিজ্ঞাসা করিলে নির্বাক হইতে হয়। ... মুহম্মদ মুসলমান ধর্মের প্রবর্তক ; সুতরাং তাঁহার জীবনের সহিত উক্ত ধর্মের অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের মধ্যে পনর আনারও অধিক লোক তাঁহার মহিমময় জীবনের কণামাত্রও অবগত নহেন। ইহার কারণ অনুসন্ধানে দেখা যায়, আরবী পারসী ভাষায় লিখিত জীবনী ; ঐ সকল ভাষানভিজ্ঞ বঙ্গীয় মুসলমানগণের অবোধ্য। দুই একখানি জীবনী যদিও বঙ্গভাষায় বাহির হইয়াছে, তথাপি তাহার মূল্য অধিক এবং ভাযা কঠিন বলিয়া সাধারণে তাহা পাঠ করিতে অক্ষম। আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকে মহম্মদের জীবনের স্থূল স্থূল ঘটনাবলী অতি সরল ভাষায় সংক্ষেপে বিবৃত করিলাম। আশা করি, ইহাতে অর্ধ শিক্ষিত মুসলমান ভ্রাতাদিগের অসুবিধা দূর হইতে পারে।”[১৫০] মোহাম্মদ আবদুল আজিজ 'উপদেশমালা' (১৯১৫) নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ লেখেন।

ময়েজউদ্দীন আহমদ (১৮৫৫–১৯২০)

সাংবাদিক ও সাহিত্যিক ময়েজউদ্দীন আহমদ (মধু মিয়া) হাওড়া জেলার ব্যাতোড় ডাকঘরের অধীন বাকসারা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। শেষের দিকে তিনি যশোহর জেলার অমৃতবাজার ডাকঘরের অধীন আজমপুর গ্রামে বসবাস করতেন।[১৫১] ময়েজউদ্দীনের শিক্ষাগত যোগ্যতা কি ছিল, তা জানা যায় না। 'প্রচারক' মাসিকপত্রের কোনো কোনো সংখ্যায় ডাক্তার ময়েজউদ্দীনের নামে 'মধুবটিকা' 'অদ্ভুত মোদক' প্রভৃতি ঔষধের বিজ্ঞাপন ছাপা হত। ঠিকানা মৌখালি, ব্যাতোড়, হাওড়া। সম্ভবত তাঁর পেশা ছিল ডাক্তারি। ঔষধের নাম থেকে অনুমতি হয়, তিনি হেকিম বা আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক ছিলেন।

'প্রচারক' মাসিকপত্র (১৮৯৯) সম্পাদনা করে তিনি বিদ্বৎসমাজে পরিচিত হন। অনিয়মিতভাবে হলেও পত্রিকাখানি কিঞ্চিৎ অধিক ৪ বছর স্থায়ী ছিল। নিজ ধর্ম, সমাজ ও সম্প্রদায়ের মর্যাদা রক্ষা ও গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তিনি 'ইসলাম' (১৩০৭) ও 'মধুমিয়া' (১৩২৬) নামে অপর দুখানি পত্রিকারও সম্পাদনা করেছিলেন। সেগুলির আয়ু ছিল ক্ষণকালীন।

ময়েজউদ্দীন আহমদ ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ক কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ক. ত্রিত্বনাশক ও বাইবেলে মোহাম্মদ (দঃ), ১ম খণ্ড, ১৯০২

খ. মধু–সঙ্গীত, ১৯০৮

গ. জেহাদ বা ক্রুসেড, ১৯০৯

১৫০ মোহাম্দ আবদুল আজিজ— *সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-চরিত*, মথুরানাথ যন্ত্র, কুমারখালী, ১৯০১ 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

১৫১ ময়েজউদ্দীন আহমদ প্রণীত 'শান্তিকর্তা বা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী', ৩য় খণ্ড, (১৩২২) গ্রন্থের আখ্যাপত্রে ঐরূপ ঠিকানা আছে

ঘ. **শান্তিকর্তা বা হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জীবনী, ১ম খণ্ড (১৯১০), ২য় খণ্ড (১৯১৩) ও ৩য় খণ্ড (১৯১৫)**

ঙ. ইসলাম-আলো

চ. তুরস্কের ইতিহাস।[১৫২]

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে ময়েজদ্দীন রচিত 'বঙ্গানুবাদিত তফসীর হাক্কানী' (১৯০১) নামে একখানি কোরান অনুবাদেব উল্লেখ আছে।[১৫৩]

খ্রিস্টান মিশনারি পরিচালিত 'প্রচার' পত্রের সহিত 'প্রচারকে'র ধর্ম সম্বন্ধীয় বির্তক হত। সম্পাদক স্বয়ং কয়েকটি প্রবন্ধে 'প্রচারে' প্রকাশিত মতামতের আলোচনা করেন। 'সত্যের জয়ে দুঃখ কেন,' 'আল্লাহ দাস', 'সেই ভাববাদী বা সত্যের বিভা' প্রবন্ধগুলি তাঁরই লেখা। খ্রিস্টানরা 'বাইবেল নীতিপূর্ণ গ্রন্থ' বলে দাবী করলে ময়েজউদ্দীন বাইবেলের কয়েকটি ব্যভিচারদৃশ্যেব উল্লেখ করে ঐ দাবীর অসারতা প্রমাণ করেন। খ্রিস্টানরা যিশুখ্রিস্টকে ঈশ্বরপুত্র মনে করে পূজা করেন ; তিনি এজন্য তাঁদের 'নরপূজক' শব্দে আখ্যাত করেছেন।[১৫৪] বাইবেলে হজরত মহম্মদের আগমনসূচক পদবার্তা আছে। অতএব খ্রিস্টানদের উচিত মহম্মদ প্রবর্তিত ইসলামধর্মের অনুসরণ করা। পাদরি মনরোর এক প্রবন্ধের জবাবে ময়েজউদ্দীন 'সেই ভাবাবাদী বা সত্যের বিভা' নিবন্ধে ঐরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন।[১৫৫] ১৩০৭ সনের চৈত্র সংখ্যায় 'ভ্রমণ-বৃত্তান্ত' নিবন্ধে ময়েজউদ্দীন লিখেন, "১০ বৎসর ধরিয়া ইসলাম মিশনের চিন্তা করিয়া আসিতেছি। ... মুসলমানদিগের চক্ষে আজ খ্রিষ্টিয়ান মিশনারীরা ত্রিত্ব-ভেলকি লাগাইয়া তাহাদিগকে খ্রিস্টিয়ান করিতেছে।"[১৫৬] 'ত্রিত্বনাশক ও বাইবেলে মোহাম্মদ (দঃ)' গ্রন্থে তিনি এসব প্রসঙ্গই যুক্তিতর্কের মাধ্যমে উত্থাপন করেছেন। সকল প্রকার আক্রমণ, কুপ্রভাব থেকে ইসলামকে রক্ষা করার দুর্দমনীয় অভিপ্রায় নিয়ে তিনি লেখনি ধারণ করেছিলেন ; রসসাহিত্য সৃজন উদ্দেশ্য ছিল না।

আফতাবউদ্দীন আহমদ

বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগে আফতাবউদ্দীন আহমদের নামে দুখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে : 'প্রেম পাগল' (১ম খণ্ড, ১৯০৩) এবং 'অদ্বিতীয় উপদেশ-প্রাণ-প্রিয় তাপস' (১৯০৩)। প্রথমখানিকে 'উপন্যাস' ও দ্বিতীয়খানিকে 'ধর্ম' পুস্তক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'প্রেম পাগল' পূর্ণিয়ার 'দি নিউ সেঞ্চুরী প্রেস' থেকে মুদ্রিত। 'অদ্বিতীয় উপদেশ-প্রাণপ্রিয় তাপস' কলিকাতার 'রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস' থেকে মুদ্রিত।

১৫২ ১৩২২ *বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা।*
১৫৩ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ,* ১ ত্রৈ. খ., ১৯০১
১৫৪ *প্রচারক,* মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬
১৫৫ ঐ, চৈত্র ১৩০৬
১৫৬ ঐ, ১৩০৭

'নবনূর' ও 'ইসলাম-প্রচারক' পত্রিকায় প্রবন্ধ লেখক হিসাবে আফতাবউদ্দীন আহমদের নাম পাওয়া যায়। গ্রন্থ প্রণেতা আফতাবউদ্দীন ও প্রবন্ধ-লেখক আফতাবউদ্দীন একই ব্যক্তি। তিনি সম্ভবত ঢাকার গড়পাড়া নিবাসী বিখ্যাত পুস্তক ব্যবসায়ী মনিরুদ্দীন আহমদের পুত্র ছিলেন। 'ইসলাম মিশন সমিতি' ও 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি'কে সমর্থন দিয়েছেন। তাঁর মতে মুসলমান সমাজের মধ্যে যে আবর্জনারাশি জমা হয়ে আছে, সেগুলি ধর্মপ্রচার ও শিক্ষা বিস্তারের দ্বারাই দূর করা সম্ভব।[১৫৭]

দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ

রাজশাহীর শিকারপুর নিবাসী দেওয়ান নাসিরুদ্দীন 'পুষ্পহার' (১৯০৩) এবং 'হাসির তরঙ্গ' (১৯০৮) নামে দু'খানি কাব্য গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। নাসিরুদ্দীনের কবি-প্রতিভা তেমন ছিল না, তবে জাতীয় চেতনা ছিল প্রখর। 'নূর-অল ইমান' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩০৮) 'আবেদন' নামে সুদীর্ঘ কবিতায় 'এসলাম সমাজ মাঝে যত রোগ বিরাজিছে, তার মাঝে মূর্খতা প্রধান' বলে তিনি এই বলে উপদেশ দিয়েছেন, 'এলেম বিস্তার করি, জেহালৎ পরিহরি, সাধ সবে জাতীয় কল্যাণ।' হিন্দু-মুসলমানের সমবেত প্রচেষ্টা ছাড়া দেশমাতার উন্নতি সম্ভব নয়, বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১৫৮] তাঁর অন্যান্য গ্রন্থ 'পতিভক্তি' (১৯০৭), 'সমাজ-সংস্কার' (১৯০৮), 'পবিত্র রজমান মাহাত্ম্য' (১৯০৯), 'আরবী পড়া শিক্ষা' (১৯১০), 'ইসলামী নামকরণ' (১৯১৪), 'পৃথিবীর ভবিষ্যৎ ও ইমাম মেহেদীর আবির্ভাব' (১৯১৫), 'স্বর্গনরক' (১৯২০), 'ধনের সন্ধান' (১৯২৬) প্রভৃতি।[১৫৯] এগুলির অধিকাংশই ধর্মমূলক রচনা। তিনি ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে মুনশী মেহেরুল্লা ও মনিরুজ্জামান ইস্লামাবাদীর সমকক্ষ ছিলেন।

'পুষ্পহার' কাব্যের উৎস ও বিষয় সম্বন্ধে কবি ভূমিকায় বলেছেন, "মহাত্মা দেওয়ান হাফেজ ও শেখ সাদি প্রভৃতি মহাকবিগণের রচিত কাব্যোদ্যান হইতে কতকগুলি পুষ্প চয়ন করতঃ এই পুষ্পহার গ্রথিত হইয়াছে"।[১৬০] 'নবনূরে' এর সমালোচনা বের হয়। কবির উক্তির সূত্র ধরে সেখানে মন্তব্য করা হয়, "পুষ্পগুলি বেশ মনোহর ও সৌগন্ধবাহী। ইহার মধ্যে কয়েকটি পুষ্প মহাকবি শেখ সাদির কাব্যোদ্যানের গৌরব রক্ষা করিয়াছে। লেখক কবিতা রচনায় নতুন ব্রতী ; চর্চা করিলে আশা করি তিনি একার্যে সফলতা লাভ করিবেন।"[১৬১] কয়েকটি সংবাদ পত্রের সহিত তিনি জড়িত ছিলেন। সোলতান' (১৩১২) পত্রিকার তিনি ম্যানেজার নিযুক্ত হন।[১৬২]

১৫৭ *ইসলাম প্রচারক*, জ্যৈষ্ঠ-আষাঢ়, ১৩১১
১৫৮ *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা*, পৃ, ৩৪৩
১৫৯ মোহাম্মদ মনসুর উদ্দীন—'দেওয়ান নাসির উদ্দীন আহমদ', *পাকিস্তানী খবর*, ২৭ জুলাই, ১৯৬৩
১৬০ দেওয়ান নাসির উদ্দীন আহমদ—*পুষ্পহার*, ১৯০৩, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
১৬১ *নবনূর*, জ্যৈষ্ঠ, ১৩১০
১৬২ *মাহে-নাও*, পৌষ, ১৩৬৪

সমীরুদ্দীন আহমদ

রংপুরের রাধাবল্লবপুর গ্রামনিবাসী সমিরুদ্দীন আহমদ 'মোহম্মদীয় ধর্মসোপান' (১৯০৩-০৪) মোট ৫ খণ্ডে সমাপ্ত করেন।[১৬৩] এটি ইসলাম ধর্মতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ। লেখক 'নমাজ' খণ্ডের 'সূচনা'য় গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেছেন, "মোসলমানধর্মের মূলশাস্ত্র পবিত্র কোরান শরিফ আরবী ভাষায় লিখিত আছে এবং হদিস ও কেয়াস বা ফেকা শাস্ত্র সমস্তই আরবী ভাষায় বিরচিত ও পারসী উর্দু ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে, কিন্তু তাহাতে প্রায় মুসলমানগণের জ্ঞানাভাব, সুতরাং দুর্বলমতি বঙ্গবাসীগণ জাতীয় ভাষার ধর্মপুস্তকসমূহের মর্মাবগতিতে অক্ষম জন্য স্বীয় ধর্মবিশ্বাসে দুর্বল হইয়া যাইতেছে। ধর্মকর্মধর উপদেশদাতা বিদ্বানগণ (মৌলবী সাহেব) সময় ও শিক্ষা দোষে ধর্মভ্রান্তগণকে সরল পথে আনয়ন করিতে পারিতেছেন না। বস্তুতঃ বঙ্গীয় মোসলমানগণের মাতৃভাষায় সরল ভাবাপন্ন ধর্মবহি প্রকাশ না করিলে উক্ত রোগের উপশম হওয়ার সম্ভব (সম্ভাবনা) নাই। বঙ্গভাষায় উপদেশপূর্ণ শিক্ষোপযোগী ধর্মগ্রন্থ অতি বিরল এবং যাহা কিছু আছে তাহা শ্রেণীভেদে ও সুশৃঙ্খলা অভাবে তদ্দ্বারা যথোচিত সুপ্রণালীতে শিক্ষা লাভ করা অসাধ্য। ... ইসলামের আবশ্যক যাবতীয় বিষয় পরিষ্কাররূপে দেখানর মানস ছিল কিন্তু ক্ষুদ্র সোপান ভারাক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। এই ক্ষুদ্র সোপান যোগে আরোহণ করিয়া পঞ্চশাখা বিশিষ্ট (কালেমা, নমাজ, হজ্জ, জকাৎ) অক্ষয় কল্পতরুবরে আরোহণ করতঃ অমৃতময় ফলাস্বাদে চরিতার্থ হইবে এবং ক্রমে উর্ধ্বতর সোপানরাজি অবলম্বনে উন্নত হওতঃ আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক যাবতীয় অমৃত ফলাস্বাদে পরম কারণিক সৃষ্টিকর্তার সান্নিধ্য লাভ করিতে সক্ষম হইতে পারিবে।"[১৬৪] 'ইসলাম ইতিবৃত্ত সোপান' (১৯১৫) ও 'সহজ নামাজ শিক্ষা' নামে তাঁর অপর দুখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়। মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ও সৈয়দ আমানত আলী সমিরুদ্দীনকে গ্রন্থ প্রণয়নে সাহায্য করেন। মহীপুরের জমিদার আবদুল মজিদ চৌধুরী অর্থ সাহায্য দান করেন। গ্রন্থখানি জমিদার চৌধুরীর পিতা 'সেয়েখ জেয়াউল্লাহ চৌধুরী'কে উৎসর্গ করা হয়। প্রথম খণ্ড 'কলেমা' অংশের সমালোচনায় 'নবনূরে' বলা হয়, " ... এই বিকৃত রুচির দিনে ধর্মতত্ত্বের যতই অধিক প্রচার হয় ততই মঙ্গল। ভরসা করি 'মোহম্মদীয় ধর্মসোপান' বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সোপানেরই কাজ করিবে"[১৬৫]

১৬৩ কলেমা, নামাজ, রোজা, হজ্জ ও জাকাত এই পাঁচটি স্তম্ভের উপর ইসলাম-ধর্মের তত্ত্বগত বুনিয়াদ। এগুলি একজন বিশ্বাসীর পক্ষে ফরজ বা অবশ্যপালনীয় কর্তব্য। 'মোহম্মদীয় ধর্মসোপানে'র প্রথম খণ্ডে 'কলেমা', দ্বিতীয় খণ্ডে 'নামাজ' তৃতীয় খণ্ডে 'রোজা', চতুর্থ খণ্ডে 'জাকাত' এবং পঞ্চম খণ্ডে 'হজ' সম্পর্কে আলোচনা আছে।

১৬৪ সমির উদ্দীন আহমদ—*মোহম্মদীয় ধর্মসোপাশন*, নারায়ণ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১১, পৃ . (ভূমিকা)

১৬৫ *নবনুর*, ভাদ্র, ১৩১০

'শিক্ষা-সোপান' নামে তিন খণ্ডে সমাপ্ত বর্ণশিক্ষা বিষয়ক তাঁর একটি পাঠ্যপুস্তকও আছে। তাঁর 'প্রণয় সোপান' কবিতার বই।[১৬৬] সমিরুদ্দীন রংপুরে মোক্তারি করতেন।

শাহ আবদুল্লা

শাহ আবদুল্লা ছিলেন মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লার ভাবশিষ্য। তিনি পূর্বে খ্রিস্টান ছিলেন। শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ এহসানউল্লা ও শাহ আবদুল্লা মুনশী মেহেরুল্লার প্রভাবে ইসলাম গ্রহণ করে ধর্ম-প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। বক্তৃতা দান ও পুস্তক রচনা—বিবিধ উপায়ে তাঁরা প্রচার-কার্য চালাতেন। খ্রিস্টান পাদরিরা ইসলামের প্রতি যে আক্রমণ করতেন ও অপবাদ আরোপ করতেন, তারা তাঁদের লেখায় ও বক্তৃতায় তার আক্রমণের বিরোধিতা করতেন এবং ইসলামের মাহাত্ম্য তুলে ধরতেন। এই উদ্দেশ্যে শাহ আবদুল্লা পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেছেন ও পুস্তক রচনা করেছেন। তাঁর রচিত 'নবী মাছুম অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ বেগুনাহ নবী' (১৯০৪) একখানি জীবনী গ্রন্থ।[১৬৭]

দীন মোহাম্মদ (১৮৫৩-১৯১৬)

দীন মোহাম্মদের পূর্ব নাম মনোরঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বরিশাল জেলার নথুল্লাবাদ গ্রামের গাঙ্গুলী পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। ঢাকার নোয়াগাঁও-এর মোলানা ফৈজুদ্দীন লস্করের কাছে ইসলাম ধর্মে দীক্ষা নিয়ে তিনি দীন মোহম্মদ নামে পরিচিত হন। তিনি সুবক্তা ছিলেন, ইসলাম ধর্ম প্রচার তাঁর প্রধান কাজ ছিল।[১৬৮]

দীন মোহাম্মদের লেখা তিনখানি গ্রন্থের নাম জানা যায় : 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কায় ভারতবাসীর নিকট ফকির দীন মোহাম্মদের আবেদন' (১৯০৪) 'ক্রুসেড ও জেহাদ' (১৯০৮) ও 'কলিকাতায় গো-কোর্বানী হাঙ্গামা' (১৯১১)।[১৬৯] গো-হত্যা নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে বিরোধ অব্যাহত ছিল, দীন মোহম্মদের প্রথম ও দ্বিতীয় গ্রন্থে তারই অনুবৃত্তি আছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে ধর্মের কারণে মুসলমান-খ্রিস্টানের মধ্যেকার ঐতিহাসিক বিরোধের বর্ণনা আছে।

আবদুল বারি (১৮৭২-১৯৪৪)

নোয়াখালী জেলার বেগমগঞ্জ থানার বাবুপুর গ্রামে আবদুল বারি জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি 'বরিশাল সার্ভে স্কুলে'র প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর চারখানি গ্রন্থ আছে : 'জরিপ-শিক্ষা' (১৯০৪), 'কারবালা' (১৯১৩), 'ভারতের যুরাজ' ও 'ইসালে সওয়াব'।[১৭০]

১৬৬ ১৩২২ *বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা*, পৃ. ১০৩
১৬৭ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, ১ ত্রৈ., খ. ; ১৩০৪
১৬৮ *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, পৃ. ১২৫ (৪ সং)।
১৬৯ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, ৩ ত্রৈ., খ. ; ১৯০৪
১৭০ ঐ, ৪ ত্রৈ., খ. ; ১৯০৪

আবদুর রহমান

আবদুর রহমানের 'অশ্রুহার' (১৯০৪) কবিতা পুস্তক। গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' কবি বলেন, "অধুনা আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণ মুসলমানীয় সাহিত্যের আলোচনা ও পাঠ করিতেছেন, ইহাতে সম্প্রদায় বিশেষ আনন্দিত। তাঁহাদের মুসলমানীয় সম্প্রীতি বলবতী করিবার নিমিত্ত এই ক্ষুদ্র পুস্তক 'অশ্রুহারে'র মধ্যে মুসলমানীয় কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে।"[১৭১]

কাব্যখানির প্রথম সমালোচনা হয় 'ধূমকেতু' পত্রিকায়। সেখানে লেখা হয়, "লেখক, মুসলমান হইলেও বঙ্গভাষায় নিতান্ত অনুরাগিনী। তবে যে কবিতাগুলি নিতান্ত অসার হইয়াছে ইহা তাহার দোষ নহে—কালের দোষ।"[১৭২] 'নবনূরে' এর অপর সমালোচনা হয়। পত্রিকায় বলা হয়, ". . .মহর্ষি ইউসফের প্রতি জোলেখার উক্তি, বীরাঙ্গনার বিষাদোক্তি, মহর্ষি ইয়াকুবের প্রতি ফরহাদ প্রভৃতি কবিতাগুলির ভাবনিচয় অতি মনোরম ; কিন্তু লেখক কবিতাগুলি ভালরূপ পরিস্ফুট করিতে পারেন নাই। তবে আমাদের আশা আছে, নবীন লেখক কবিতা লেখার চর্চা রাখিলে সময়ে একজন ভাল কবি হইতে পারিবেন।"[১৭৩]

সৈয়দ আবুল হোসেন (জন্ম ১৮৬৪)

সৈয়দ আবুল হোসেন হুগলী জেলার বামনান গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষা শেষ করে তিনি ১৮৭৪ সালে কলিকাতা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। ১৮৮৭ সালে 'ইণ্ডিয়া-পোতে' তিনি বিলাত যাত্রা করেন। ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ শেষ করে আমেরিকায় যান এবং নিউইয়র্কে ডাক্তার সাণ্ডবার্গের সাহায্যার্থে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন শুরু করেন। ডেনভারে শেষ পরীক্ষা দিয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন। তারপর জাপান ও চীন ভ্রমণ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি কলিকাতার কলিঙ্গা বাজারে চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন এবং সেখানেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।[১৭৪]

সৈয়দ আবুল হোসেনের বাল্যকাল থেকেই কবিতা লেখার অভ্যাস ছিল। তিনি বিলাতে যাওয়ার সময়ে জাহাজে 'ভুবন-ভ্রমণ' (১৯৮৭) কাব্য লেখেন। কলিকাতায় তাঁর চিকিৎসা ব্যবসায় এবং কাব্যচর্চা সমানে চলতে থাকে। 'দরবার প্রেস' নামে তাঁর একটি ছাপাখানা ছিল।[১৭৫] তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন সেগুলির মধ্যে 'যমজ ভগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌলা উপন্যাস' (১৯০৫) উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। যমজ ভগিনীকাব্য 'হোসেনী ছন্দে' লেখা। এটি অমিত্রাক্ষরের প্রকারভেদ : পদ্যের মত চরণস্তবক সজ্জা নেই, গদ্যের

১৭১ আবদুব বহমান-- *অশ্রুহাব*, কলিকাতা, ১৯০৪, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

১৭২ *ধূমকেতু, বৈশাখ*, ১৩১২

১৭৩ *নবনূর*, মাঘ, ১৩১২

১৭৪ *বার্ষিক সওগাত*, ১ বর্ষ, ১৩৩৩

১৭৫ *মাহে-নও*, আষাঢ়, ১৩৬৫

ভঙ্গিতে পরিচ্ছেদ আছে। উদাহরণ (শ্বেতাঙ্গিনী কর্তৃক সিরাজদ্দৌলাকে উপদেশ) : "হিন্দু-মুসলমান, এই সম্প্রদায়দ্বয়ে, রাখিও বিভিন্ন সদা, কুত্রাপি একটি যেন না হইতে পারে।--ইহারা একত্র মাগো হইবে যেদিন, সেদিন তোমার শিরে উড়িবে গো চিল কাক, কহিনু নিশ্চয়।"[১৭৬] যাত্রার সংলাপের ঢঙে এই গদ্য ছন্দ রচিত। ইতিহাসের উপর খেয়ালি কল্পনার রঙ লাগিয়ে উপন্যাসখানি লেখা হয়েছে অনেকক্ষেত্রেই লেখক সুরুচির পরিচয় দেননি বরং সাহিত্যের স্বেচ্ছাচারিতা করেছেন। 'নবনূরে' সৈয়দ এমদাদ আলী এর দীর্ঘ সমালোচনায় আগাগোড়া নিন্দা করেছেন। তাঁর ভাষায়—"এইরূপ অভিনব নামযুক্ত একখানি গ্রন্থ লইয়া ডাক্তার সৈয়দ আবুল হোসেন এম.ডি বিরস চিকিৎসাচর্চা হইতে সরস সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণ করিয়াছেন। ... আমরা কিন্তু সুস্থ অবস্থায় ইহা হইতে একবিন্দুও রস সঞ্চয় করিতে পারিলাম না। ... রচনামাত্রই হয় পদ্য নতুবা গদ্য। ইহা ভাষা ও সাহিত্যরাজ্যের চিরন্তন নিয়ম। যিনি এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন তাঁহার স্থান কোথায় তাহা বোধ হয় এক্ষণে পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারেন। বঙ্গভাষা আপনার পুষ্টিকরকল্পে মুসলমান-সাধনা প্রত্যাশা করে সত্য কিন্তু সেই সাধনার পথে এইরূপ সাহিত্যিক ব্যভিচার সংঘটিত হইলে মুসলমান সমাজকেই মস্তক নত করিতে হয়। ... মনে হয় বাঙ্গালা ভাষায় অচিরেই সৈয়দ আবুল হোসেন রচিত একখানি ব্যাকরণ শাস্ত্রের আবির্ভাব হইবে।"[১৭৭] 'ইসলাম-প্রচারকে'ও এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়। "ডাক্তার সাহেব বহুকাল ইউরোপ ও আমেরিকায় অবস্থানপূর্বক চিকিৎসা বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। আমরা মনে করিতাম মাতৃভাষায় তাঁহার কোনো অধিকার নাই কিন্তু তাঁহার যমজভগিনী কাব্য পাঠে আমাদের সে ধারণা দূর হইয়াছে।"[১৭৮] হাইকোর্টের জজ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঐ কাব্যের সমালোচনা করেন বলে ঐ পত্রিকায় উল্লেখ আছে। শেখ আবদুর রহিম একটি প্রবন্ধে 'হোসেনী ছন্দে'র প্রশংসা করেছেন। তিনি বলেছেন গুণীর সম্যক আদর নেই বলে আবুল হোসেন প্রাপ্য মর্যাদা হতে বঞ্চিত হয়েছেন।[১৭৯] তাঁর 'স্বর্গারোহণ কাব্য' (১৯০৬) বিভিন্ন বিষয়ক কবিতার সংকলন। এরপর তিনি 'জীবন্ত পুতুল' (১৯০৭), 'মোসলেম পতাকা : তারিখুল ইসলাম' (১৯০৮) 'ইংরেজি শিক্ষাসোপান' (১৯১৬), 'সাবিত্রীর সত্যজীবনী' (১৯২৩) 'জ্ঞান-ভাণ্ডার' (১৯২৪), 'স্পেনে মোসলেম পতাকা বা স্পেন বিজয়' (১৯২৫) প্রভৃতি রচনা করেন।[১৮০]

খোন্দকার গোলাম আহমদ

বর্ধমানের অধিবাসী খোন্দকার গোলাম আহমদের তিনখানি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় 'মোসলেম জাতির ইতিহাস', 'এসলামের প্রভাব ও ধর্মনীতি' (১৯০৫) এবং 'আজমীর ভ্রমণ'

১৭৬ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৪১৫
১৭৭ *নবনূর*, কার্তিক, ১৩১৩
১৭৮ *ইসলাম প্রচারক*, মাঘ, ১৩১২
১৭৯ *শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী*, ২ খণ্ড, পৃ. ২৩৭
১৮০ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ৪১৬-১৮

(১৯২৬)।[১৮১] 'এসলামের প্রভাব ও ধর্মনীতি' (১৯০৫) গ্রন্থখানি কাটোয়ার 'এডওয়ার্ড প্রেস' থেকে মুদ্রিত হয়। 'নবনূরে' এর সমালোচনা প্রকাশিত হয় : "প্রধানত মুসলমান বিদ্বেষী হিন্দুদিগকে এসলামের সুমহান কীর্ত্তিগুলি কিছু কিছু দেখাইয়া দিবার জন্য এবং এসলামের পবিত্র সরল নীতিগুলি তাহাদিগকে মোটামুটিভাবে বুঝাইয়া দিবার উদ্দেশ্যেই এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। হিন্দু সমাজ এতৎ গ্রন্থ পাঠে মুসলমান সম্বন্ধে তাঁহাদের চিরপোষিত ভ্রান্ত ধারণার কতকটা পরিহার করতঃ তাঁহাদের অধঃপতিত প্রতিবেশিদিগের প্রতি প্রীতিমান হইবেন এবং পক্ষান্তরে স্বধর্মে অশ্রদ্ধবান মুসলমান ভ্রাতারাও তাঁহাদের ধর্মের মোটামুটি বিষয়গুলি জানিতে পারিয়া স্বধর্মে শ্রদ্ধাশীল হইবেন।"[১৮২] খোন্দার গোলাম আহমদ বর্ধমানের জজ কোর্টে চাকুরি করতেন।[১৮৩]

... ...

খুলনার অধিবাসী ইলাহী বখশের 'সুহেলী য়েমন' (১৮৭১) শ্রীহট্টের হজরত শাহ জালালের জীবনীগ্রন্থ। এটি নসিরুদ্দীন হায়দার রচিত ঐ নামের ফারসি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ।[১৮৪]

আমিনুদ্দীন রচিত 'প্রবোধ সুধাকর' (১৯৭২) কবিতার বই। ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীর প্রতি মোহ অর্থহীন—গ্রন্থে এই নীতিশিক্ষা দেওয়া হয়েছে। ঢাকার 'গিরিশ প্রেসে' এটি ছাপা হয়।[১৮৫]

ভিক্ষাবৃত্তির অপকারিতা বর্ণনা করে শেখ বাবু ওরফে আহমদ 'মনোজ্ঞ কাহিনী' (১৮৭৫) নামে একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা লেখেন।[১৮৬]

ওবায়েদুল হকের 'পদ্যমালা' (১৮৭৬) গীতিধর্মী রচনা।[১৮৭]

মঈনু আহদের 'কবিতা-কুসুমাঙ্কুর' (১৮৭৬) খণ্ড কাব্য। তিনি রামনারায়ণ দাসের সহযোগিতায় এটি প্রণয়ন করেন।[১৮৮]

মোহাম্মদ রইসুদ্দীন 'জয়নন্দ বিবাহ' (১৮৭৭) নামে একখানি কবিতার বই বরিশালের 'সত্য প্রকাশ প্রেস' থেকে প্রকাশ করেন।[১৮৯]

টাঙ্গাইলের আটিয়াব অধিবাসী হামিদউল্লা 'ব্রজবালা' (১৮৭৭) নামে রাধাকৃষ্ণবিষয়ক কাব্য রচনা করেন। এটি ময়মনসিংহের 'ভারত মিহির প্রেসে' ছাপা হয়।[১৯০]

১৮১ *বার্ষিক সওগাত*, ১ বর্ষ, ১৩৩৩
১৮২ *নবনূর*, ভাদ্র ১৩১২
১৮৩ ১৩২২ *বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা*, পৃ. ১০৩
১৮৪ সৈয়দ মর্তুজা আলী—'হজরত শাহ জালালের লেখকগণ', *মালিক মোহাম্মদী*, আশ্বিন, ১৩৪৮
১৮৫ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, ৪ ত্রৈ., খ. ; ১৮৭২
১৮৬ ঐ, ২ ত্রৈ., খ. ; ১৮৭৫
১৮৭ *মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য*, পৃ. ২৯৩
১৮৮ ঐ, পৃ. ২৯৩
১৮৯ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, ১ ত্রৈ., খ. ; ১৮৭৭
১৯০ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, ২ ত্রৈ., খ., ১৮৭৭

হতাশ প্রেমের দুঃখ বর্ণনা করে হামিদুল হক রচনা করেন 'বিরহ দর্পণ' (১৮৭৭) কাব্য। কলিকাতার 'সনাতন প্রেসে' এটি ছাপা হয়।[১৯১]

বরিশালের কোরবানউল্লাহর 'খণ্ড প্রলয়' (১৮৭৭) কবিতার বই। 'সত্যপ্রকাশ প্রেসে' এটি মুদ্রিত হয়।[১৯২]

হালিমউল্লার 'যুবকরঞ্জিনী' (১৮৭৯) কবিতার বই ঢাকার 'ইষ্টার্ণ বেঙ্গল প্রেসে' মুদ্রিত হয়।[১৯৩]

আবদুল গফুর চৌধুরী 'পড়ে দেখ উচিত কথা' (১৮৭৯) ধর্মবিষয়ক গ্রন্থ; উর্দু 'তালিকাতুল হিন্দে'র অনুবাদ এটি।[১৯৪] ঢাকার 'বাঙ্গালা প্রেসে' বইটি ছাপা হয়। 'তকবারে মাকুল' (১৮৯৮) তাঁর অপর গ্রন্থ : সেযুগের ধর্মীয় দ্বন্দ্ব সম্পর্কে অলোকপাত করে লেখা-- গ্রামে ঈদ ও জুমা ধর্মসিদ্ধ নয় বলে লেখক মত প্রকাশ করেছেন।[১৯৫] ওয়াহাবিপন্থীরা অনুরূপ অভিমত পোষণ করতেন।

মোহম্মদ সাসুর 'রাজদর্পণ' (১৮৮০) কবিতার বই ; ময়মনসিংহের রাজা সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরীর 'রাজ বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে তাঁর প্রশস্তি কীর্তন করে এটি রচিত হয়।[১৯৬]

তশহুদোল হোসেনের 'ভগ্না আশা' (১৮৮৪) কবিতার বই; 'ঢাকা প্রকাশে' এর বিরূপ সমালোচনা হয়, 'মিঞা সাহেবের আদিরসে মন বড় খুলিয়া গিয়াছিল, ভাবে গদগদ হইয়া গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন ; অতএব ইহার উপযুক্ত সমালোচনা করিতে আমরা অক্ষম। মিঞা সাহেবের একটুকু লিখিবার ক্ষমতা আছে, তবে ভাবের আবেগটা কিছু না কমাইলে জনসমাজে তাঁহার পরিচয় দিতে আমাদের সাহস হয় না।"[১৯৭] ঢাকার 'গিরিশ প্রেসে' বইটি ছাপা হয়।

রংপুরের আবদুল খাতেকের ১৮৮৬ সালের 'ইনকামটেক্সের ২-আইন' (১৮৮৬) সেকালের আয়কর সম্পর্কিত একটি পুস্তিকা।[১৯৮]

কেরামত আলী মিয়া সংকেলিত 'রহস্যসন্দর্ভ' (১৮৮৭) ধাঁধার বই ; নোয়াখালীর 'সাধারণ প্রেসে' এটি ছাপা হয়।[১৯৯]

এল্যোপ্যাথিক চিকিৎসা সংক্রান্ত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা 'নারী চিকিৎসা' (১৮৮৭) লেখেন মুনশী মিঞা। এটি ঢাকার 'গিরিশ প্রেসে' ছাপা হয়।[২০০]

---

১৯১ ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৮৭৭
১৯২ ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৮৭৭
১৯৩ ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৮০
১৯৪ ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৭৯
১৯৫ ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৯৮
১৯৬ ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৮০
১৯৭ *ঢাকাপ্রকাশ*, ২৭ পৌষ, ১২৯২
১৯৮ অধ্যাপক আলী আহমদের 'গ্রন্থপঞ্জি' দ্রষ্টব্য।
১৯৯ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৮৭
২০০ ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৮৭

শ্রীহট্ট নিবাসী হাসমতউদ্দীন আহমদ আইন বিষয়ক একখানি পুস্তক রচনা করেন ; এর নাম 'মহম্মদীয় ল'য়ের সরল প্রক্রিয়া' (১৮৮৮)। এটি স্যার ইউলিয়ম ম্যাকনটন প্রণীত 'মহামেডান ল' শীর্ষক গ্রন্থের বাংলা ভাষায় সরল অনুবাদ।[২০১]

ব্রহ্মযুদ্ধে নৌ-অভিযানের কাহিনী নিয়ে 'সংক্ষেপে বাহার' (১৮৮৮) নামক ৩৬ পৃষ্ঠার একটি কবিতার বই লেখেন বেলায়েত আলী।[২০২] 'মিলন কুটীর' (১৯২১) নামে তাঁর একখানি সামাজিক উপন্যাস আছে।

'যমুনা পুলিনে কে তুই অনাথিনী' (১৮৮৮) শীর্ষক একখানি উপন্যাস লেখেন বর্ধমানের সৈয়দ আবুল কাসেম।[২০৩]

টাঙ্গাইলের ধল্লা নিবাসী খোন্দকার জোবেদ আলী 'বেহুলা নাটকাভিনয়' (১৮৮৮) রচনা করেন। এটি বহুল প্রচলিত বেহুলা-লক্ষ্মীন্দর কাহিনীর নাট্যরূপায়ণ।[২০৪] জোবেদ আলীর ভাষা যাত্রার প্রভাবমুক্ত নয়। তাঁর সমাজবিষয়ক গ্রন্থ 'পর্দা ও মুসলমান সমাজ' (১৯১৮)।[২০৫]

শেখ গোলাম সোবানী 'হুগলীর পুল বিবরণ' (১৮৮৮) নামে একখানি কবিতার বই লেখেন, এতে হুগলীর জুবিলী ব্রিজের বিবরণ আছে। হুগলীর 'বুধোদয় প্রেস' থেকে এটি মুদ্রিত হয়।[২০৬]

বগুড়ার শেরপুর গ্রামনিবাসী কাজী আশর আলী খান 'রসিক প্রধান' (১৮৮৯) নামে কবিতার বই লেখেন। বগুড়ার 'রায় প্রেসে' এটি ছাপা হয়। তিনি এতে গো-হত্যার বিপক্ষে মত প্রচার করেছেন।[২০৭]

মোহাম্মদ হানিফদ্দীন কোরানের উপদেশ সম্বলিত 'সারকথা' (১৮৯১) 'বগুড়া রায় প্রেস' থেকে মুদ্রিত করেন।[২০৮]

সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেনের 'উপদেশ কাহিনী' (১৮৯৮) ঢাকার 'সামন্ত প্রেস' থেকে ছাপা হয়। এটি ছোট ছোট কবিতার বই।[২০৯]

এ. আহমদের 'সংসার চমৎকার' (১৮৯১) নামক কবিতার বই ঢাকা 'আদর্শ প্রেসে' ছাপা হয়।[২১০]

২০১ ঐ. ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৮৮
২০২ ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৮৮
২০৩ ঐ, ২ ত্রৈ খ. ১৮৮৮
২০৪ ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৮৮৮
২০৫ অধ্যাপক আলী আহমদকৃত 'গ্রন্থপঞ্জি' দ্রষ্টব্য।
২০৬ ঐ।
২০৭ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, ১৮৮৯
২০৮ ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯১
২০৯ ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৯১
২১০ ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৮৯১

আবদুল শাহ্ কালান্দার 'হীন্দু-জ্ঞানপ্রদ' (১৯৯১) শীর্ষক একখানি কবিতা পুস্তক রচনা করেন। ঢাকার 'ওরিয়েন্টাল প্রেসে' তা ছাপা হয়। লেখক ফকির সম্প্রদায়ের লোক। 'হীন-দু' অর্থাৎ দুইএর কম—এরূপ অর্থ করে বলেছেন, হিন্দুগণ প্রথমে এক দেবতার পূজা করতেন কিন্তু পরে ঐ পথ বিস্মৃত হয়ে বহু দেবতার পূজা আরম্ভ করেন।[২১১] বলা বাহুল্য, ব্যাখ্যাটি লেখকের স্বকপোলকল্পিত।

আবদুল হামিদ 'ভক্তি-মঞ্জরী' (১৮৯১) শীর্ষক একখানি পুস্তিকা লেখেন। ঢাকার 'গিরিশ যন্ত্রে' ছাপা হয়। 'ঢাকা প্রকাশে' এর সমালোচনা হয়। "নবীন কবি, বয়সে বালক, গণিজ স্কুলের প্রধান শিক্ষক বাবু মোহনচন্দ্র বসাকের সুযোগ্য ছাত্র, পুস্তকে গুরুভক্তি ও পিতৃ-মাতৃভক্তির উল্লেখ আছে, কিন্তু শৈশব কবিত্বের গন্ধে বড়ই অভক্তি জন্মে।"[২১২]

'শোকোচ্ছ্বাস' (১৮৯৪) নামক শোক কবিতা লেখেন নজিবউদ্দীন আহমদ। মানিকগঞ্জের পারিল গ্রামনিবাসী জহিরুদ্দীন আহমদের স্মরণে এটি রচিত। জহিরুদ্দীন কলিকাতার নামকরা পুস্তক ব্যসায়ী ছিলেন। এটি ঢাকার 'গিরিশ প্রেসে' ছাপা হয়।[২১৩]

ফজল করিম প্রণীত 'ডিহি সম্বন্ধীয় কার্য চালাইবার নিয়মাবলী' (১৮৯২) একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ; এতে হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নীর করটীয়াস্থ জমিদারী পরিচালনার নিয়মাবলী বর্ণিত হয়েছে। 'মাহমুদিয়া প্রেসে' এটি মুদ্রিত হয়।[২১৪]

বগুড়ার মোক্তার মশিওতুল্লা 'প্রমত্ত প্রেমিক হাফেজের উক্তি' (১৮৯২) শিরোনামে পারস্য কবি হাফেজের কবিতার বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করেন। বগুড়ার 'চৌধুরী প্রেসে' এটি মুদ্রিত হয়।[২১৫]

ওহেদুর রহমানের 'মুসলমানের ধর্মবিবরণ' (১৮৯৩) ক্ষুদ্র ধর্মপুস্তক।[২১৬]

ঢাকার অধিবাসী শাহ্ গোলাম রহমানের 'সিদ্ধ দর্পণ' (১৮৯৩) উর্দু গ্রন্থ 'সেরাতুল আসফিয়া'র বঙ্গানুবাদ।[২১৭]

বগুড়ার সারিয়াকান্দির অধিবাসী আকবর হোসেন সরকার 'পদ্য রত্নাকর' (১৮৯৩) নামে ধর্ম ও নীতি বিষয়ক কবিতার বই প্রকাশ করেন। এটি বগুড়ার 'রায় প্রেসে' মুদ্রিত হয়।

আজিজ আহমদের 'প্রণয় কুসুম' (১৮৯৭) 'সচিত্র উপন্যাস', এটি মধ্যযুগীয় রোমান্সধর্মী রচনা ; আধুনিক বিশুদ্ধ গদ্যে রচিত।[২১৮]

---

২১১ ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৯১
২১২ *ঢাকাপ্রকাশ*, ১ আষাঢ় ১২৯৮
২১৩ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, ৪ ত্রৈ. খ. ১৮৯৪
২১৪ ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯৩
২১৫ *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৯২
২১৬ ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৮৯৩
২১৭ ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৯৩
২১৮ অধ্যাপক আলী আহমদ কৃত 'গ্রন্থপঞ্জি' দ্রষ্টব্য।

আবদুল গণি খাঁ 'শিশু ব্যাকরণ' (১৮৯৯) নামে একখানি শিশু পাঠ্য ব্যাকরণ লিখেন। 'ঢাকা প্রকাশে' গ্রন্থখানির সমালোচনায় বলা হয়, "বাঙ্গালা ভাষার শত শত ব্যাকরণ হইয়াছে ; তথাপি এই ক্ষুদ্রতম ব্যাকরণ খানি খাঁ সাহেব বোধ হয় মুসলমান ছাত্রদিগের মধ্যে প্রচার করিতে পারিবেন।"[২১৯]

ডাক্তার এম. এইচ. সৈয়দ আবুল কাসেম 'ওলাউঠা চিকিৎসা' (১৮৯৯) নামে ২৪ পৃষ্ঠার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। 'ঢাকা প্রকাশ' এর বিরূপ সমালোচনা করে মন্তব্য করে, "ইহার মধ্যে ওলাউঠার চিকিৎসা সম্যক হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ইহা প্রচারের আবশ্যকতা বুঝিলাম না।"[২২০]

আবেদ হোসেন সিদ্দিকী 'মেয়রাজল জিন্নাত' (১৮৯৯) নামে একখানি ধর্মপুস্তক লিখেন। 'কোহিনুরে' (১৩০৬) এর বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়।[২২১]

অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির সম্পাদনায় বিভিন্ন কবির কবিতার সংকলন গ্রন্থ 'মুক্তার হার' (১৯০০) প্রকাশিত হয়। মীর মশাররফ হোসেন, মুনশী মেহেরুল্লা ব্যতীত ঢাকা নিবাসী 'কারী হাফেজ আবদুল করিম, ও বালিগাঁও নিবাসী 'চৌধুরী আবদুল গফুরে'র কবিতা সংকলিত হয়েছে। চতুর্থ কবিতাটি মীরের 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০০) থেকে এবং পঞ্চম কবিতাটি মুনশী মেহেরুল্লার 'মেহেরুল ইসলাম' (১৮৯৭) থেকে সংগৃহীত হয়েছে। বাংলা মৌলুদ পাঠের উদ্দেশ্যে হজরত মহম্মদের রূপ-গুণ-মহিমা ভিত্তিক কবিতাগুলি নির্বাচিত হয়েছে। বাংলা ভাষা-ভাষী জনসাধারণেব কাছে মিলাদকে অর্থবহ ও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য যে এরূপ গ্রন্থ-সংকলন, তাতে সন্দেহ নেই।

বোরহানুদ্দীন আহমদ কর্তৃক সংগৃহীত ও খন্দকার আবদুল রহিম কর্তৃক প্রকাশিত 'সহজ পারসী-শিক্ষা' (১৯০০) ছাত্রপাঠ্য ব্যাকরণ পুস্তক : সংগ্রাহক ভূমিকায় বলেন, "বঙ্গীয় মুসলমান ছাত্রগণের পক্ষে পারসী শিক্ষা করা অতীব দুঃসাধ্য ব্যাপার। কেননা, ইংরোজির সঙ্গে পারসী দ্বিতীয় ভাষা লইলে তাহার অর্থ ও ব্যাকরণ উর্দু ভাষায় পড়িতে হয় ; আবাব বাঙ্গালা মাতৃভাষা বলিয়া তাহা কোনক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং মুসলমান ছাত্রবৃন্দকে চারিটী ভাষা শিক্ষা করিতে হয়। ইহা সকলের পক্ষে সহজ সাধ্য নহে। এই জন্যই আমি উর্দুর সাহায্য ব্যতীত পারসী শিক্ষার্থীদিগের সুবিধা ও শিক্ষা সৌকার্যার্থে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকাখানি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে যদি বালকগণের কিঞ্চিন্মাত্রও উপকার দর্শে তবে সকল যত্ন সফল জ্ঞান করিব।"[২২২]

আসগর আলীর 'পণপ্রথা' (১৯০১) পুস্তিকায় সমাজে পণপ্রথার অপকারিতার কথা বর্ণিত হয়েছে।[২২৩]

২১৯ *ঢাকা প্রকাশ*, ১১ বৈশাখ ১৩০৬

২২০ ঐ, ১৮ ভাদ্র, ১৩০৬

২২১ সৈয়দ মুর্তজা আলী—'কোহিনুর', *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৭

২২২ বোরহানুদ্দিন আহমদ— *সহজ পারসী-শিক্ষা,* রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩০৭ 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।

২২৩ *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০১

শেখ চান্দ মোহম্মদ সরকার 'বিলাপ তরঙ্গিণী' (১৯০১) নামে কবিতার বই প্রকাশ করেন।[২২৪]

হেলালউদ্দীন খান কনস্টান্টিনোপল-এর সুলতান সম্পর্কে 'সুলতানে রূম' (১৯০১) কবিতার বই রচনা করেন।[২২৫]

রংপুর জেলার দারোয়ানীর অধিবাসী আমিরুদ্দীন সরকার 'মূল্য প্রকাশিকা' (১৯০১) নামে একখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ লেখেন।[২২৬]

এক অজ্ঞাতনামা লেখক হস্তরেখা বিষয়ক 'ফালনামা' (১৯০১) গ্রন্থ লেখেন। সেরাজল আহমদ চৌধুরী নোয়াখালী থেকে এটি প্রকাশ করেন।[২২৭]

সৈয়দ লুৎফর রহমান চৌধুরী 'ভ্রমণ' (১৯০১) নামে একটি ভ্রমণ কাহিনী লেখেন।[২২৮]

ঢাকার আবদুল গণি সুফিয়ানী 'কবিতা দর্পণ' (১৮৮৭) ও 'শোকাচ্ছ্বাস' (১৯০১) নামে দু'খানি কবিতার বই লেখেন।[২২৯]

রাজশাহীর নাটোর নিবাসী মোহাম্মদ ইয়াসিনের 'মাতা ভিক্টোরিয়া' (১৯০১) কবিতা পুস্তিকায় রাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়েছে।[২৩০]

সৈয়দ মোকাম্মেল হোসেনের দু'খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়—'মোসলেম সমাজ' (১৯০১) ও 'তত্ত্ব দর্পণ' (১৯০৫)।[২৩১]

শের আলী আহমদের 'সুদ প্রসঙ্গ' (১৯০২) গ্রন্থে সুদপ্রথা সম্বন্ধে আলোচনা আছে। এটি ৫৪ পৃষ্ঠার বই।[২৩২]

ইমাম আলী হকের 'বিরহ যাতনা যৌবন বিলাপ' (১৯০২) ক্ষুদ্র কবিতার বই।[২৩৩]

শেখ আবদুল কাদের প্রণীত 'শরেহ্ বেকায়া' (১ ও ২ খণ্ড, ১৯০২) একটি বৃহৎ গ্রন্থ। মহম্মদীয় আইন বিষয়ক ওয়াকায়াত রিওয়ায়াতে'র অনুবাদ এটি। ওবায়দুল্লা আরবী ভাষায় তা প্রণয়ন করেন।[২৩৪]

চট্টগ্রামের অধিবাসী মুখলেসুর রহমান মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু উপলক্ষে একটি ক্ষুদ্র কবিতার পুস্তক লেখেন : এর নাম 'শোকোভারতী' (১৯০২০)।[২৩৫]

২২৪ ঐ, ৪ ত্রৈ, খ. ১৯০১
২২৫ *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ৩ ত্রৈ, খ. ১৯০১
২২৬ ঐ
২২৭ ঐ, ৪ ত্রৈ.খ. ১৯০১
২২৮ ঐ
২২৯ ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৮৮৭ ; ১ ত্রৈ, খ. ১৯০২
২৩০ ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৮৮৭ ; ১ ত্রৈ, খ. ১৯০২
২৩১ ঐ২ ত্রৈ. খ. ১৯০১
২৩২ ঐ, ৪ ত্রৈ, খ. ১৯০২
২৩৩ ঐ
২৩৪ ঐ, , ৩ ত্রৈ. খ. ১৯০২
২৩৫ ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৯০২

টাঙ্গাইলের আটিয়ার অধিবাসী খোন্দকার শাহ মোহাম্মদ বসিরুদ্দীন 'ভাসানযাত্রা ও বেহুলা–লক্ষ্মীন্দরের সংহার জীবনী' (১৯০৩) শিরোনামে নাটক রচনা করেন।[২৩৬]

বগুড়ার গঙ্গানগরের অধিবাসী ডাক্তার আবদুর রহমান 'হোমিওপ্যাথিক সরল সংক্ষিপ্ত মেটেরিয়া মিডিকা' (১৯০৩) নামে একখানি চিকিৎসা বিষয়ক বই লেখেন।[২৩৭]

বেলায়েত হোসেন 'পরমার্থ সঙ্গীত রত্নাকর' (১৯০৩) নামে একখানি বড় বই রচনা করেন। এটি নীতিমূলক কবিতা পুস্তক।[২৩৮]

মোহম্মদ রওশন আলী 'সাধু রহস্য' (১৯০৩) রচনা করেন।[২৩৯]

শেখ রেয়াজুদ্দীন সরকার লেখেন 'বক্তৃতা ও মন্তব্য' (১৯০৩)। লেখক রংপুরের চিকনমাটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।[২৪০]

আবু ওয়ায়েজ মোহম্মদ মওয়ায়েজ 'মহররমাত' (১৯০৩) রচনা করেন। এই পুস্তিকায় মুসলমানের ধর্মমতে যে সকল রমণীকে বিবাহ করা সিদ্ধ নয়, তার বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।[২৪১]

খোন্দকার আবু ফজল আহমদের 'আখেরজ্জোহরের প্রতিবাদ' (১৯০৩) মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের 'আখেরজ্জোহরে'র (১৮৯১) পুস্তিকার প্রতিবাদ। এটি ময়মনসিংহের 'বাসন্তী প্রেসে' ছাপা হয়।[২৪২]

শাহ মোহম্মদ কলিমুদ্দী 'কুলপ্রদীপ' (১৯০৪) নামে ক্ষুদ্র পুস্তিকায় একটি পরিবারের গৌরব বর্ণনা করেছেন।[২৪৩]

সিরাজগঞ্জের জকিউদ্দীন আহমদ 'অবিশ্বাসী ভৃত্য' (১৯০৪) নামে একখানি পুস্তিকা লেখেন।[২৪৪]

হাকিম এ.কে. খান চিকিৎসা বিষয়ক 'ইউনানী হাকিমী শিক্ষা' (১৯০৪) রচনা করেন।[২৪৫]

রংপুরের আবদুর রহমান আহমদ 'পাষণ্ড দলন বা সমাজ রহস্য' (১৯০৪) নামে কবিতার বই লেখেন। এতে ধর্মত্যাগীদের প্রতি কঠোর শাস্তির বিধান দেওয়া হয়েছে।[২৪৬]

---

২৩৬ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ,* ৩ ত্রৈ., খ. ১৯০৩
২৩৭ ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০৩
২৩৮ ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০৪
২৩৯ ঐ, ২ ত্রৈ. খ. ১৯০৩
২৪০ ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৯০৩
২৪১ ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৯০৪
২৪২ ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০৪
২৪৩ ঐ
২৪৪ ঐ
২৪৫ ঐ, ৩ ত্রৈ. খ. ১৯০৪
২৪৬ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ,* ২ ত্রৈ. খ. ১৯০৪

বগুড়ার কাজিখানা নিবাসী আবদুল গণি আলা 'খ্রিস্টীয়ানী ধোকাভঞ্জন' (১৯০৪) নামে পুস্তিকা লেখেন।[২৪৭]

আবদুল জব্বারের 'নামাজ শিক্ষা (১৯০৪) ৩২ পৃষ্ঠার বই।[২৪৮]

মোহাম্মদ আবদুল ওহাব চৌধুরী 'শ্রীহট্টের শাহ জালাল' (১৯০৫) নামে একখানি সন্তজীবনী লেখেন। এটি শ্রীহট্টের 'পরিদর্শক প্রেসে' ছাপা হয়। লেখক ঐ জেলার মারাইগাঁ-এর অধিবাসী ছিলেন।[২৪৯]

মোহাম্মদ আবদুর রহিম লেখেন 'শ্রীহট্ট-নূর' (১৯০৫)।

ইরসাদউদ্দীন আহমদ পারিলীর 'সুদকাহিনী' (১৯০৫) একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা।[২৫০] গ্রন্থকার ঢাকার পারিল গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন।

মোহাম্মদ সোলেমান 'বৃহৎ সোলেমানী পঞ্জিকা' (১৯০৫) প্রকাশ করেন।[২৫১]

রংপুরের মুনশীপাড়া নিবাসী মোহাম্মদ আশরাফুদ্দীন 'তত্ত্বজ্ঞান' (১৯০৫) নামে পীরবাদের মাহাত্ম্য বিষয়ক পুস্তক প্রণয়ন করেন। এটি 'তোহফায়ে বোরজখী' নামে উর্দু-ফারসি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ, রচয়িতা মৌলানা মোহাম্মদ শাহ সাহাবউদ্দীন চিশতী। 'তত্ত্বজ্ঞান' রংপুরের 'জয় প্রেসে' ছাপা হয়।[২৫২]

ত্রিপুরার গণ্ডামারা নিবাসী মোহাম্মদ আখতার জামান 'প্রেম কুসুম' (১৯০৫) ও 'প্রেম খেলা' (ঐ) নামে কবিতা পুস্তিকা-রচনা করেন। বই দুটি কুমিল্লার 'সরস্বতী প্রেসে' ছাপা হয়।[২৫৩]

কাজী আবদুল আজিজ কোরেশীর 'মাসায়েলে এসলাম' (১৯০৫) 'ফেকাহ'র অনুবাদ।[২৫৪] 'ফেকাহ' ইসলামের ব্যবহারশাস্ত্র।

২৪৭ ঐ
২৪৮ ঐ, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০৪
২৪৯ *ইষ্টার্ণ বেঙ্গল এণ্ড আসাম গেজেট*, সাপ্লিমেন্ট, ১৮ মার্চ ১৯০৫
২৫০ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, ৪ ত্রৈ. খ. ১৯০৫
২৫১ ঐ, ১ ত্রৈ. খ. ১৯০৫
২৫২ হামেদ আলী—'উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য', *বাসনা*, বৈশাখ ১৩১৬
২৫৩ অধ্যাপক আলী আহমদ কৃত 'গ্রন্থপঞ্জি' দ্রষ্টব্য।
২৫৪ *বেঙ্গল লাইব্রেরি ক্যাটালগ*, ১ ত্রৈ. খ. ১৯০৬

পত্র-পত্রিকা

১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'দিগদর্শন' প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরের ব্যাপ্টিস্ট মিশনের জন ক্লার্ক মার্সম্যান এটি সম্পাদনা করেন। বাঙালি কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র 'বাঙ্গাল গেজেটি' (জুন ১৮১৮) ; প্রকাশক ছিলেন গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। ১৮২১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণ সেবধি' নামে ইংরাজি-বাংলা দ্বিভাষী পত্রিকা প্রকাশ করেন। তখন থেকে শুরু করে পঞ্চাশ দশক পর্যন্ত হিন্দুগণের সম্পাদনায় মাসিক, পাক্ষিক, সাপ্তাহিক, দৈনিক বহু পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে।

যতদূর জানা যায়, বরিশালের সৈয়দ আবদুল রহিম সম্পাদিত 'বালারঞ্জিকা' (১ বৈশাখ ১২৮০) বাঙালি মুসলমান কর্তৃক প্রকাশিত প্রথম সাময়িক পত্র।[১] এর আগে শেখ আলীমুল্লাহব সম্পাদনায় 'সমাচার সভারাজেন্দ্র' (মার্চ ১৮৩১) নামে ফারসি-বাংলা দ্বিভাষী সাপ্তাহিক এবং রজব আলীর সম্পাদনায় 'জগদুদ্দীপক ভাস্কর' (জুন ১৮৪৬) নামে বাংলা উর্দু-হিন্দি-ফারসি-ইংরেজি পঞ্চভাষী সাপ্তাহিক পত্র কলিকাতা থেকে প্রকাশিত হয়েছিল।[২] উভয় পত্রিকা স্বল্পায়ু ছিল। একই সঙ্গে একাধিক ভাষায় পত্রিকা প্রকাশ সহজ সাধ্য ছিল না ; এর জন্য যে অর্থবল ও লোকবল দরকার, পরিচালকদের তা ছিল না। ১৮৬১ সালে আলাহেদাদ খাঁর সম্পাদনায় 'ফরিদপুর দর্পণ' প্রকাশেব বিজ্ঞাপন পাওয়া যায়, পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল কিনা, জানা যায় না।[৩] ১৮৭৩ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত যেসব বাংলা পত্রিকা মুসলমানদের সম্পাদনায় পাওয়া যায়, তার একটি তালিকা এরূপ[৪] :

১ 'বালাবঞ্জিকা'ব সংবাদ ইতিপূর্বে কেউ দেননি। ব্রজেন বাবুর 'বাংলা সাময়িকপত্র' (২য় খণ্ড), বিনয় ঘোষেব 'বাংলা সাময়িকপত্রে সমাজচিত্র' (৫ খণ্ড), আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' ও মুস্তাফা নূরউল ইসলামের 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' প্রভৃতি গ্রন্থে উক্ত পত্রিকার উল্লেখ নেই। 'ঢাকা প্রকাশে' (১৬ বৈশাখ ১২৮০) মুদ্রিত সমালোচনা থেকে এর নাম-পরিচয় জানা যায়। পত্রিকায় লেখা হয়, 'দুই পয়সা মূল্যের এই সাপ্তাহিক পত্রিকাখানা ১লা বৈশাখ (১২৮০) হইতে বরিশাল, মাদারীপুরান্তর্গত গোপালপুর নিবাসী শ্রীযুক্ত সৈয়দ আবদুল রহিম মহাশয় প্রকাশিত করিতেছেন। মুসলমানগণ পত্রিকা লিখিতে বিশেষতঃ স্ত্রীলোকদিগের উন্নতির জন্য লেখনি ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, অত্যন্ত সন্তোষের বিষয়। সৈয়দ সাহেব এই সৎকার্য্যে কৃতকার্য হন একান্ত প্রার্থনীয়। আমবা সম্পাদক মহাশয়কে অনুরোধ করি, গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক বরিশাল নগরে যাইয়া পত্রিকার মূল্য এক পয়সা করুন, পত্রিকাখানি রেজিষ্টরী করিয়া যাহাতে ১০ টিকিটে চলিতে পারে তাহার চেষ্টা করুন। নগরে ভাল ২ লেখক এবং উৎসাহশীল ধনিগণের আশ্রয় পাওয়া বিচিত্র নহে।" উদ্ধৃতি থেকে পত্রিকার নাম, সম্পাদকের নাম, পত্রিকার প্রকাশের তারিখ দেখে পত্রিকার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের কোনো সন্দেহের অবকাশ থাক না। পত্রিকাখানি এখন সম্পূর্ণ দুষ্প্রাপ্য।

২ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়— *বাংলা সাময়িকপত্র*, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭৯ (৪র্থ সং), পৃ. ৩৯, ৮৮

৩ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ৪

৪ তালিকাটি *মুসিলম বাংলার সামরিকপত্র* ও '*সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*' গ্রন্থদ্বয়ের সাহায্যে প্রণীত।

সময়	পত্রিকা	শ্রেণী	সম্পাদক	স্থান
১৮৭৩	বালারঞ্জিকা	(সাপ্তাহিক)	সৈয়দ আবদুল রহিম	বরিশাল
১৮৭৪	আজীজননেহার	(মাসিক)	মীর মশাররফ হোসেন	চঁচুড়া, হুগলী
১৮৭৪	পারিল বার্তাবহ	(পাক্ষিক)	আনিসউদ্দীন আহমদ	ঢাকা
১৮৭৭	মহাম্মদি আখবার	(অর্ধ-সাপ্তাহিক)	কাজী আবদুল খালেক	কলিকাতা
১৮৮৪	আখবারে এসলামীয়া	(মাসিক)	মোহম্মদ নইমুদ্দীন	করটীয়া
১৮৮৪	মুসলমান	(সাপ্তাহিক)	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৮৮৪	মুসলমান বন্ধু	"	"	"
১৮৮৫	ইসলাম	(মাসিক)	একিনউদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৮৮৬	নব সুধাকর	(সাপ্তাহিক)	মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	"
১৮৮৬	আহমদী	(পাক্ষিক)	আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী	টাঙ্গাইল
১৮৮৭	হিন্দু-মোসলমান সম্মিলনী	(মাসিক)	গোলাম কাদের	কলিকাতা
১৮৮৯	সুধাকর	(সাপ্তাহিক)	শেখ আব্দুব রহিম	কলিকাতা
১৮৮৯	ভারতের ভ্রমনিবারণী	(ত্রৈমাসিক)	মোহাম্মদ আবেদীন	কলিকাতা
১৮৯০	হিতকরী	(পাক্ষিক)	মীর মশরারফ হোসেন	লাহিনীপাড়া
১৮৯১	ভিষক-দর্পণ	(মাসিক)	এম. জহিরুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৮৯১	ইসলাম-প্রচারক	(মাসিক)	মোহাম্মদ রেযাজুদ্দীন আহমদ	কলিকাতা
১৮৯২	মিহির	(মাসিক)	শেখ আবদুর রহিম	কলিকাতা
১৯৯২	হাফেজ	(পাক্ষিক পরে মাসিক)	শেখ আবদুর রহিম	কলিকাতা
১৮৯২	টাঙ্গাইল হিতকরী	(সাপ্তাহিক)	মোসলেমউদ্দীন খাঁ	টাঙ্গাইল
১৮৯৫	মিহির ও সুধাকর	(সাপ্তাহিক)	শেখ আবুদর রহিম	কলিকাতা
১৮৯৮	কোহিনুর	(মাসিক)	মহম্মদ রওশন আলী চৌধুরী	পাংশা
১৮৯৯	প্রচারক	(মাসিক)	মধুমিয়া	কলিকাতা
১৯০০	লহরী	(মাসিক)	মোজাম্মেল হক	শান্তিপুর
১৯০০	নূর-অল ইমান	(মাসিক)	মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	রাজশাহী
১৯০১	মোসলমান পত্রিকা	(মাসিক)	মাহাতাবউদ্দীন	যশোহর
১৯০১	সোলতান	(মাসিক)	এম. নাজিরুদ্দীন আহমদ	কুমারখালি
১৯০১	নূরুল ইসলাম	(বার্ষিক)	মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	যশোহর
১৯০১	বালক	(সাপ্তাহিক)	এ.কে. ফজলুল হক ও নিবারণচন্দ্র	বরিশাল
১৯০৩	নবনূর	(মাসিক)	সৈয়দ এমদাদ আলী	কলিকাতা
১৯০৩	মোহাম্মদী	(মাসিক)	মোহাম্মদ আকরম খাঁ	কলিকাতা
১৯০৩	হানিফি	(মাসিক)	নূরুল হোসেন কাসিমপুরী	ময়মনসিং
১৯০৪	সুহৃদ	(মাসিক)	এ.ডি.খান	কটক

এগুলির অধিকাংশের আয়ু ছিল ক্ষণকালীন ; অনেক পত্রিকার কেবল নামধাম ছাড়া বিশেষ কিছু তথ্য পাওয়া যায় না। দু'একটি সাময়িকপত্রের গুরুত্বও তেমন ছিল না। যেগুলির

গুরুত্ব ছিল, সেগুলিও প্রায় অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত। স্বল্প আয়ু, ক্ষীণ কলেবর, খণ্ডদশা যাই থাক না কেন, উনিশ শতকের দ্বিতীয় পর্বে এসব পত্রপত্রিকার মাধ্যমেই যে বাংলার মুসলমানদের মধ্যে সাংবাদিকতার সূচনা হয়েছিল তা নিঃসন্দেহ। আত্মপ্রকাশ ও আত্মপ্রচারের সবচেয়ে বড় মাধ্যম সংবাদপত্র-সাময়িকপত্র। জনশিক্ষা ও জনমত গঠনেও এগুলির গুরুত্ব ও দায়িত্ব অনেক। গোষ্ঠী, সম্প্রদায়, জাতি ও দেশের শুধু মুখপত্র নয়, অনেক সময় মেরুদণ্ড হিসাবে পত্রপত্রিকা কাজ করে। রাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য-শিল্প, ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের বিচিত্র বিষয় সাময়িকপত্রে স্থান পায়, সমাজের মানুষ সুলভে ও সহজে নিত্য নিয়মিত এসব বিদ্যার সহিত পরিচিত হওয়ার সুযোগ পায়। অন্যায়-অবিচারের প্রতিবাদ, দাবি দাওয়ার প্রতিষ্ঠা, ন্যায়-নীতির প্রচার সাময়িকীর দ্বারাই হয়ে থাকে। বিদেশী ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে দেশী সামন্তরাজের অসির লড়াই শেষ হলে শুরু হয় মসির লড়াই। উদীয়মান মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীরা এ লড়াই শুরু করেন বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে। উনিশ শতকের নবজাগরণের ঊষালগ্ন থেকেই সংগ্রামের সূত্রপাত। বলা যায়, বাংলার নবজাগরণের একটি শক্তিশালী মাধ্যম ছিল সাময়িকপত্র। নব্য শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর যৌথ প্রয়াসের ফলে সংবাদপত্র-শিল্পের উদ্ভব হয়। সভা-সমিতির গোষ্ঠীচেতনার মত পত্র-পত্রিকার গোষ্ঠীভাবনাও সামাজিক বিবর্তনের ফল। বাংলার মুসলিম নবজাগরণের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে হলে সাময়িকপত্রের আলোচনা আবশ্যক। বিশেষত সাময়িকপত্র সমকালীন সমাজজীবনকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। সমাজ মানসের ভাব-আবেগ, চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণার কথা যেসব পত্র-পত্রিকায় স্থান পেয়েছে এখানে সেগুলির সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করা হল।

মোহাম্মদি আখবার (১৮৭৭)

কাজী আবদুল খালেকের সম্পাদনায় '২৪ পরগণা জেলার সিয়ালদহ পল্লী' হতে ১৮৭৭ সালের ৪ জুন 'মহাম্মদি আখবার' অর্ধ-সাপ্তাহিক দ্বিভাষী (উর্দু-বাংলা) পত্রিকাখানি আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকা প্রকাশের ছ'মাস আগে রুশ-তুর্কি যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই যুদ্ধের সংবাদ প্রচার উদ্দেশ্যেই পত্রিকাখানির জন্ম হয়। ১৮৭৮ সালে ২৯ মার্চ থেকে এটি সাপ্তাহিক আকারে প্রকাশিত হয়। ঐ মাসের ৩ তারিখে রুশ-তুর্কির মধ্যে 'সান স্টেফানো চুক্তি' স্বাক্ষরিত হয়। এর অল্পকাল পরে 'মহাম্মদি আখবার' বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধ পত্রিকা-প্রচারের মৌল প্রেরণা ছিল, যুদ্ধ শেষ হলে পত্রিকার আয়ুও শেষ হয়। সেকালের দেশীবিদেশী বিবিধ পত্রিকা থেকে যুদ্ধ সম্পর্কিত খবর, টেলিগ্রামের খবর, হররকমের খবর, বিজ্ঞাপন ইস্তেহার ইত্যাদি দিয়ে পত্রিকার কলেবর পূর্ণ করা হত : সুতরাং এটি সাময়িক সংবাদপত্রের দায়িত্বপালন করেছে, সাহিত্য সংস্কৃতির ধারে-কাছে যায়নি। 'মহাম্মদি ছাপাখানা' নামে সম্পাদকের নিজস্ব প্রেসে এটি মুদ্রিত হত। 'মহাম্মদি আখবারে'র ভাষা আড়ষ্ট আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত। 'সংবাদ প্রভাকর' উক্ত পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করায় উৎসাহ প্রদান করেন, কিন্তু পত্রিকার ভাষার সমালোচনা করে। এর

জবাবে 'মহাম্মদি আখবারে' (২০ জুলাই ১৮৭৭) লেখা হয় : "অত্র আখবারের বাঙ্গালা ভাষা কেবল সাধারণ মোসলমানগণের জ্ঞাপন জন্য। কেননা তাহারা সাধু ভাষা বুঝিতে অক্ষম। সুতরাং সাধারণ মোসলমানি ভাষা যাহাতে বর্ণশুদ্ধি, স-কার, ন-কার ভেদ এবং সন্ধি আদি কিছুমাত্র নাই, তাহা পূর্বে বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে।"[৫] সাহিত্য ও ভাষা সৃষ্টিতে 'মহাম্মদি আখবার' ব্যর্থ হলেও পত্রিকা হিসাবে এর মৌলিক লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি। তুর্কি সম্পর্কে বাঙালি মুসলমানদের চিত্তে আবেগ ও সহানুভূতি সঞ্চার করতে সক্ষম হয়েছিল। আবদুল লতিফ আত্ম-জীবনীতে দাবী করেছেন যে, বাংলা ও ভারতের মুসলমানদের মধ্যে তুর্কিবাসীর জন্য অর্থ সংগ্রহ ও সমর্থন দানের প্রথম কৃতিত্ব তাঁরই।[৬] সার্ভিয়া সরকারের সাথে তুর্কি সুলতানের যখন বিরোধ হয়, তখন আবদুল লতিফ কলিকাতার টাউন হলে একটি সভার আয়োজন করে বক্তৃতা দিয়েছিলেন (৭ অক্টোবর, ১৮৭৬)। রুশ-তুর্কির পূর্ণমাত্রায় যুদ্ধ শুরু হয় ১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসে। কাজী আবদুল খালেক আবদুল লতিফের কাছ থেকেই অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন, তা নিঃসন্দেহ।

আখবারে এসলামীয়া (১৮৮৪)

টাঙ্গাইলের চারান গ্রামনিবাসী মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের সম্পাদনায় ১২৯১ সনের বৈশাখ মাসে (এপ্রিল ১৮৮৪) মাসিক 'আখবারে এসলামীয়া' প্রথম প্রকাশিত হয়। করটীয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান পন্নীর অর্থানুকূল্যে ও পৃষ্ঠপোষকতায় এটি আত্মপ্রকাশ করে। করটীয়ার 'মাহমুদিয়া যন্ত্রে' মীর আতাহার আলী দ্বারা এটি মুদ্রিত হয়। প্রথম দশ বছর চলার পর এটি মাঝে দু'বছর বন্ধ থাকে— ১৮৯৫ সালে এপ্রিল মাসে নবপর্যায়ে এর প্রচার আরম্ভ হয়। কিন্তু অল্পকাল পরে এটি প্রকাশনা চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।[৭]

'আখবারে এলামীয়া'র (নবপর্যায়) নামের নিচে লেখা হতো 'উপদেশ, ধর্ম মসলা, মুসলমানের পুরাবৃত্ত প্রেরিত পত্র, বিবিধ সংবাদ প্রভৃতি সম্মিলিত মাসিক পত্রিকা'। 'নিয়মাবলী'তে পত্রিকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, "এসলাম ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করা এই পত্রিকার উদ্দেশ্য। এতদ্ব্যতীত প্রেরিতপত্র, নতুন সংবাদ ধর্মবিরুদ্ধ না হইলে প্রকাশ হইবে।"[৮] ধর্মতত্ত্ব, মহাপুরুষজীবনী, পুরাকথা, সমাজ ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে দুটি বিষয় পত্রিকায় গুরুত্ব পেয়েছে সে-দুটি হলো : আহলে হাদিস-হানাফী দ্বন্দ্ব এবং গোবধ-গোরক্ষা দ্বন্দ্ব। ঐ সময়ে আহলে হাদিস মতবাদ ও গো-রক্ষা নীতির সমর্থনে 'আহমদী'তে প্রবন্ধ ছাপা হতো। 'আখবারে এলামীয়া'য় তার প্রতিবাদ করা হতো। মতামত প্রকাশে 'আখবারে এসলামীয়া' প্রধানত রক্ষণশীলতা এবং 'আহমদী' উদারতার পরিচয় দিয়েছে।

৫ আব্দুল কাদির—'মহাম্মদি আখবার', *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, পাকিস্তান পাবলিকেশন, ঢাকা ১৯৬৬, পৃ. ২১

৬ Abdul Latif— *My Pubic Life*, Calcutta, 1885. pp. 176-77 , *Nawab Bahadur Abdul Latif : History Wrting and Related Documents*

৭ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ৫, ১৫

৮ *আখবারে এসলামীয়া*, বৈশাখ, ১৩০২

মোহম্মদ নইমুদ্দীন স্বয়ং ইসলাম ধর্মে সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি হানাফি সম্প্রদায়ের পক্ষে ও আহলে হাদিস বা লা-মজহাবিদের বিপক্ষে মতামত ব্যক্ত করে অনেক প্রবন্ধ লিখেন। তিনি ধর্মীয় বক্তৃতাতেও ঐ নীতি অনুসরণ করতেন। খ্রিস্টান, ব্রাহ্ম ও হিন্দুধর্মের যে সব প্রভাব মুসলমান সমাজকে কলুষিত করেছিল, তার বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন তিনি। 'আখবারে এসলামীয়া'র নীতি ব্যাখ্যা করে ডক্টর কাজী আবদুল মান্নান লিখেছেন, "সাহিত্য চর্চা নয়, ধর্মান্দোলনই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। শরা শরীয়ৎ সংক্রান্ত রচনাই ছিল পত্রিকার প্রধান অবলম্বন।"[৯]

মুসলমান বন্ধু (১৮৮৪)

১৮৮৪ সালের ১১ আগস্ট (সোমবার) সাপ্তাহিক 'মুসলমান বন্ধু' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। প্রথমে কলিকাতাস্থ ভবানী প্রেস ও পরে মুসলমান বন্ধু প্রেস থেকে এটি মুদ্রিত হয়। সৈয়দ হাসিবুল হোসেন প্রথমে পত্রিকার ম্যানেজার ছিলেন, তিনি পরে কার্য-সম্পাদক হন। নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী ও আইনবিদ কে. এম. চট্টোপাধ্যায় এর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পত্রিকার দশম সংখ্যায় (৯ ফেব্রুয়ারি ১৮৮৫) লেখা হয়, "ত্রিপুরা জিলান্তর্গত লাকশাম গ্রামে স্বদেশ হিতৈষিণী শ্রীমতি ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী কুমিল্লা হইতে প্রকাশিত পত্রিকার উন্নতিকল্পে ৫০০ (টাকা) এতদ্ভিন্ন আমাদিগের এই পত্রিকাখানির ক্রমোন্নতির জন্য যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন।" এতে রাজনীতি, সমাজনীতি, শিক্ষা ও অন্যান্য সমকালীন সমস্যার কথা স্থান পেতো। মাঝে-মধ্যে কবিতা ও পুস্তক-সমালোচনা প্রকাশিত হত। সংবাদাদি তথ্য সংগ্রহের ব্যাপারে 'মুসলমান বন্ধু'র ভূমিকা ছিল পরজীবীর মতো—সেকালের দেশী-বিদেশী ইংরাজি-বাংলা-ফারসি পত্রিকা থেকে তথ্য সংগৃহীত ও পরিবেশিত হতো সম্ভবত অর্থবল ও জনবল সীমিত থাকার কারণে এ-নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। মুসলমান সমাজের স্বার্থ-সংরক্ষণের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রেখেও 'মুসলমান বন্ধু' সাম্প্রদায়িকতার উর্ধ্বে ছিল। মুসলমান সমাজের অভাব-অভিযোগসহ সামগ্রিকভাবে দেশের দুরবস্থা-দুর্গতির কথা নির্ভীকতার সহিত তুলে ধরত। সরকারের আইনসমূহ ও কার্যাবলীর সমালোচনা যেভাবে করা হতো, তাতে মনে হয় পত্রিকাখানি রাজনৈতিকভাবে সচেতন ছিল। কলিকাতার 'নর্মাল বিদ্যালয়' তুলে দেওয়ার প্রসঙ্গ উঠলে পত্রিকায় লেখা হয়, "বঙ্গীয় গভর্নমেন্ট কলিকাতাস্থ নর্মাল বিদ্যালয়টি তুলিয়া দিবার জন্য মনস্থ করিয়াছেন। ... যেমন হিন্দু হেয়ার ও প্রেসিডেন্সি আছে তেমনি বঙ্গবিদ্যালয়টীকে গভর্নমেন্টের দেখা উচিত। ... রাজা যদি প্রজার ভাষার উপর হস্তক্ষেপ করেন তাহা হইলে সে ভাষা কতক্ষণ তিষ্ঠিতে পারে ... বাঙ্গালা ত একটি ভাষার মধ্যে গণ্য? রাজভাষাই কি ভাষা, প্রজার ভাষা কি ভাষা নয়?" (৯ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৫) আবদুল লতিফ, আমীর আলী প্রভাবিত বঙ্গীয় মুসলিম সমাজে এরূপ কণ্ঠস্বর নতুন। 'মুসলমান-বন্ধু'র বাংলা ভাষা-প্রীতি অকৃত্রিম। দেশীয়গণের অধিকার ক্ষুণ্নকারী 'ইলবার্ট বিলে'র বিরুদ্ধে মুসলমান-বন্ধু মত প্রচার করে। দেশীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে ইউরোপীয়দের বিচার করতে পারবেন—এই ছিল ইলবার্ট বিলের

---

৯ *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ. ২১৬

প্রস্তাব। ইউরোপীয় কর্মচারী ও অন্যান্য ব্যক্তি এর বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করেন। সৈয়দ আমীর আলী আপোষের নীতি গ্রহণ করেন। মুসলমান-বন্ধুর কণ্ঠ ক্ষীণ হলেও নীতি ক্ষুদ্র ছিল না।

আহমদী (১৮৮৬)

পাক্ষিক পত্রিকা 'আহমদী' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১২৯৩ সনের শ্রাবণ মাসে (জুলাই ১৮৮৬)। সম্পাদক ছিলেন আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী। দেলদুয়ারের জমিদার-পত্নী করিমুন্নেসা খানম চৌধুরানী এর সাহায্যদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ১২৯৬ সালে 'আহমদী ও নবরত্ন' নাম গ্রহণ করে এটি প্রকাশিত হতে আরম্ভ করে। এতে, অনুমিত হয় 'নবরত্ন' নামে কোনো পত্রিকা এর সহিত যুক্ত হয়।[১০] ধর্ম ও সমাজের কথা পত্রিকায় প্রাধান্য পেত। মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে 'আখবারে এসলামীয়া'র সাথে 'আহমদী'র বিভেদ ও দ্বন্দ্ব ছিল। এই দ্বন্দ্বে 'গজনবী' ও 'পন্নী' পরিবারের চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটেছে। পন্নী পরিবারের সন্তানেরা আধুনিক উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করেননি। তাঁদের চিন্তাধারায় যে রক্ষণশীলতা প্রশ্রয় পাবে, তা স্বাভাবিক। গজনবী পরিবার মুক্তচিন্তার অধিকারী ছিল। উপরন্তু মীর মশাররফ হোসেন এর সাথে যুক্ত থাকায় এর উদারনৈতিক মনোভাব বৃদ্ধি পায়। এঁদের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা থাকায় 'আহমদী' পত্রিকা দৃষ্টিভঙ্গিতে ভারসাম্য রক্ষা করতে পেরেছিল। বাঙালি মুসলমান কর্তৃক পত্রিকা প্রকাশের আন্দোলন যখন কলিকাতাতেও শুরু হয়নি, তখন টাঙ্গাইলের মতো একটি ক্ষুদ্র মফস্বল শহরে একই সময়ে দুটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিছুকাল পরে মশাররফের 'হিতকরী'-ও সেখান থেকে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাগুলির ভাষা মার্জিত, বিশুদ্ধ ও উন্নতমানের ছিল। কেবল সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ নয়, সাহিত্যিক রচনাও পত্রিকাগুলিতে স্থান পেত।

সুধাকর (১৮৮৯)

'সুধাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রথম প্রকাশিত হয় ১২৯৬ সনের ২৩ কার্তিক (৮ নভেম্বর ১৮৮৯)। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মৌলভী মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, কবি মোজাম্মেল হক ও ডাক্তার হবিবর রহমান এক সময়ে কলিকাতায় একত্র হয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই স্বধর্মানুরাগী, সমাজহিতৈষী ও সাহিত্যামোদী ছিলেন। তখন কলিকাতায় মুসলমান পরিচালিত কোনো পত্রিকা ছিল না, তাঁরা নিজেরা পত্রিকা প্রকাশ করেন, তাঁদের এমন আর্থিক সামর্থ্যও ছিল না। অথচ ধর্ম ও সমাজসেবার জন্য তাঁদের চিত্তে প্রবল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। তাঁরা অর্থ সংগ্রহের জন্য গ্রামাঞ্চলে যান। করটীয়ার জমিদার মাহমুদ আলী খান পন্নী, বর্ধমানের কুসুমগ্রামের জমিদার মোহম্মদ ইব্রাহিম এবং ত্রিপুরার পশ্চিমগাঁও-

১০ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ৬-৭

এর জমিদার মোহাম্মদ আলী নওয়াব চৌধুরী মোটা রকম অর্থ দান করেন। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈয়দ শামসুল হোদা, সিরাজুল ইসলাম, ঢাকার জমিদার সৈয়দ হাসান আলী, হোমনাবাদের জমিদার ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী, পদমদীর জমিদার নবাব মীর মোহাম্মদ আলী প্রমুখ ছিলেন পৃষ্ঠপোষক।[১১] এরূপ যৌথ প্রচেষ্টার ফলে 'সুধাকর' আত্মপ্রকাশ করে। সৈয়দ এমদাদ আলী একে মুসলমানদের 'প্রথম জাতীয় সংবাদপত্র' বলে অভিহিত করেছেন।[১২] 'সুধাকরে'র উদ্দেশ্য সম্পর্কে 'ইসলাম-প্রচারকে' লেখা হয়, "স্বর্গীয় মৌলভী মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেব এবং সুধাকরের অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতাগণ সমাজের দুর্গতি অনুভব করিয়া মুসলমাদিগকে ধর্মপথের পান্থ করণোদ্দেশে, এই কাগজখানি বাহির করেন। যদিও কাগজখানির মালিকি স্বত্ব পুনঃপুনঃ হস্তান্তরিত হয়, তবু উহা কখনও পবিত্র উদ্দেশ্য বিস্মৃত কিম্বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নাই।"[১৩] মেয়ারাজউদ্দীন, রেয়াজুদ্দীন ও আবদুর রহিম ছিলেন পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা স্বত্বাধিকারী ; কিন্তু তাঁরা ছিলেন বিত্তহীন। তাঁদের হাত থেকে প্রথমে সিরাজুল ইসলাম, তারপর সৈয়দ শামসুল হোদা এবং তৎপর 'আর একজন ভদ্রলোকে'র হাত হয়ে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী মালিক হন। নওয়াব আলী চৌধুরীর সময়ে পত্রিকার নাম হয় 'মিহির ও সুধাকর'।[১৪]

সুধাকরের প্রথম সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম, না মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ এই নিয়ে মতদ্বৈত আছে। সুধাকরের প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় পত্রিকার যে 'অনুষ্ঠানপত্র' প্রকাশিত হয়, তাতে একস্থলে বলা হয়, "বঙ্গের প্রধান মোসলমান লেখক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত এবং যাঁহাদের লেখা পাঠ করিয়া হিন্দু মোসলমান সকলেই মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেন, এসলামতত্ত্ব যাঁহাদের সুপক্ক লেখনি-প্রসূত অর্থাৎ জনাব মৌলবি মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেব, মুন্সী মহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ সাহেব ও শেখ আবুদর রহিম সাহেব দ্বারাই এই কাগজখানি সম্পাদিত হইবে।"[১৫] প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকের নাম নেই, ম্যানেজার সৈয়দ শরাফত আলীর উল্লেখ আছে। ৭৯ ওল্ড বৈঠকখানা বাজার রোডে 'সুধাকর অফিস' ছিল।

পত্রিকার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করে উক্ত 'অনুষ্ঠানপত্রে' লেখা হয়, "সংবাদপত্র জাতীয় উন্নতির প্রাণ-স্বরূপ। ইহা সভ্যতার বিস্তারের উৎকৃষ্ট পন্থা ; সুতরাং সংবাদপত্র বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিস। বাঙ্গালাদেশের ভাষা বাঙ্গালা, আমরা বঙ্গীয় মোসলমান ; অতএব আমাদের একখানা উপযুক্ত সংবাদপত্রের নিতান্ত প্রয়োজন। ... ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, প্রকৃতি সমস্তই থাকিবে। ... মোসলমান জাতির বিগত শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম এবং বিদ্যাবুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শনসূচক ইতিহাস সকলকে জ্বলন্তভাবে দেখান যাইবে। এতদভিন্ন এসলামধর্মের

১১ *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ. ২৩৬-৩৭ ; *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ৪২৯

১২ আবদুল কাদিব—'মিহির ও সুধাকর', *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, পৃ. ৪৭

১৩ *ইসলাম প্রচারক*, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬

১৪ *ইসলাম প্রচারক*, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬

১৫ *সুধাকর*, ২৩ কার্তিক ১২৯৬

মাহাত্ম্য বিষয়ক এক একটি প্রবন্ধ প্রতি মাসে এই কাগজে বাহির হইবে। আমাদের যখন যে অভাব হইবে, তখনই তাহা সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের গোচরীভূত করিয়া তৎপ্রতিকারের চেষ্টা করা যাইবে। নতুন নতুন আইন কানুন যখন যাহা বিধিবদ্ধ হয়, তাহার মর্ম সকলকে জানান যাইবে ; এবং যদ্দ্বারা জাতীয় স্বার্থে ব্যাঘাত হয়, তাহার প্রতিকার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা হইবে।"[১৬]

উদ্যোক্তাগণ ছাড়া মুনশী মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন প্রমুখ 'সুধাকরে'র লেখক শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। খ্রিস্টান মিশনারিদের দ্বারা পরিচালিত 'খ্রিস্টীয় বান্ধব' পত্রিকার সাথে 'সুধাকরে'র ধর্মবিষয়ে তর্ক হতো। খ্রিস্টানদের আক্রমণ থেকে ইসলামধর্মকে রক্ষা করা 'সুধাকরে'র একটা প্রধান দায়িত্ব ছিল।

গো-হত্যার ব্যাপারে 'সুধাকর' 'আখবারে এসলামীয়া'কে সমর্থন দিত এবং 'আহমদী'র বিরোধিতা করত। গো-হত্যার পক্ষে মোহাম্মদ নইমুদ্দীনকে সমর্থন দিয়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে যেসব সভা হত, 'সুধাকরে' সেসবের বিবরণ ছাপা হতো।[১৭] টাঙ্গাইলে মুন্সেফ আদালতের মীর মশাররফ হোসেন ও মোহাম্মদ নইনুদ্দীনের মামলার বিষয় নিয়ে 'সুধাকর' একাধিক ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। মামলা সম্পর্কে 'সুধাকরে' এক স্থলে মন্তব্য কবা হয়, "মীর মশাররফ হোসেন সাহেব কুক্ষণেই 'গো-জীবন' লিখিয়াছিলেন। ... সাক্ষীগণ একবাক্যে মীর সাহেবকে 'কাফের' বলিয়া 'ফতোয়া' দিয়েছেন। মীর সাহেবেব এখনও নিরস্ত হওয়া ভাল। গো-জীবন পাঠ করিয়া আমাদের হৃদয়ে বিষম আঘাত লাগিয়াছে। মীর সাহেব ইসলাম ধর্মে অনভিজ্ঞ বলিয়াই বোধ হয় এরূপ কাণ্ড করিয়াছেন। ... মীব সাহেব 'তওবা' করিয়া নিরস্ত হইলে আমরা সুখী হইব, সমগ্র মুসলমান জগত সুখী হইবে।"[১৮] মশাররফ হোসেন স্বীয় পত্রিকা 'হিতকরী'তে গো-হত্যার বিরুদ্ধে প্রচার চালাতেন। 'সুধাকরে'র প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব সম্পর্কে মন্তব্য করে 'হিতকরী'তে লেখা হয়, "সহযোগী মাত্রই বুঝিয়াছেন যে, মুসলমান সমাজের একখানি সংবাদপত্র সুধাকর। হিন্দু-মুসলমানে বিবাদ বাধাইতে সর্বদা প্রস্তুত। খ্রিষ্টধর্মাবলম্বী মধ্যে, হিন্দুসমাজ মধ্যে যে রূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে, মুসলমান মধ্যেও সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় আছে। সুধাকর এক সম্প্রদায়ের কাগজ। আহমদী এক সম্প্রদায়ের কাগজ। পরস্পরের মতভেদে যেরূপ শত্রুভাব, আহমদী সুধাকরের প্রকাশ্য মতেই সেইরূপ শত্রুভাব। সুধাকর যেমন বিবাদ বাধাইতে সর্বদা প্রস্তুত, আবার আহমদী হিন্দু-মুসলমানের সখ্যভাব রক্ষা করিতে সকলের অগ্রগণ্য।"[১৯]

হিতকরী (১৮৯০)

পাক্ষিক পত্র 'হিতকরী'র প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১২৯৭ সন (এপ্রিল ১৮৯০)। পত্রিকা প্রকাশের প্রথম স্থান কুষ্টিয়ার লাহিনীপাড়া ; কুমারখালির 'মথুরানাথ যন্ত্রে' মুদ্রিত হয়। এর প্রকাশের

১৬ ঐ।
১৭ *সুধাকব* ৮, ২২ ও ২৯ অগ্রহায়ণ, ১৩ পৌষ ১২৯৬
১৮ ৬ পৌষ ১২৯৬
১৯ *হিতকরী*, ১৫ কার্তিক ১২৯৭

দ্বিতীয় স্থান টাঙ্গাইলের শান্তিকুঞ্জ ; 'আহমদী যন্ত্রে' মুদ্রিত হয়। পত্রিকায় প্রধান সম্পাদকের নাম নেই, তবে অনেকের ধারণা, মীর মশাররফ হোসেন এটি সম্পাদনা করতেন। ১২৯৯ সনের আশ্বিন-কার্তিক মাসে মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইল ত্যাগ করলে কিছু কালের মধ্যে ঐ পত্রিকা 'টাঙ্গাইল হিতকরী' নাম গ্রহণ করে ; সম্পাদক হন মোসলেম উদ্দীন খান। এর অল্পকাল পরে এটি বন্ধ হয়ে যায়। মীর মশাররফ হোসেন হিতকরীর মুখ্য লেখক ছিলেন। তাঁর 'রাজিয়া খাতুন' উপন্যাস 'হিতকরী'তে (টাঙ্গাইল) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।

হিন্দু-মুসলমানের মিলন কামনা মশাররফ হোসেনের যে লক্ষ্য ছিল, তা 'হিতকরী'তে প্রতিফলিত হয়। আশরাফ সিদ্দিকী লিখেছেন, "এ পত্রিকা তখন অত্যাচারী জমিদারবর্গ, জমিদারী সেরেস্তার ঘুষখোর কর্মচারী, চরিত্রভ্রষ্ট মহকুমা হাকিম, মুনসেফ দারোগা প্রভৃতির প্রতি খড়্গহস্ত ছিল।"[২০] উল্লেখযোগ্য যে মীর মশাররফ হোসেন এ শ্রেণীর আমলার ষড়যন্ত্রে এক মানহানির মামলায় জড়িত হয়ে এক মাস কারাবাস ভোগ করেন (১৮৯২)।[২১] শেষে তাঁর অনুজ ব্যারিস্টার মীর মোহতেশাম হোসেন এসে তাঁকে উদ্ধার করেন।

ইসলাম প্রচারক (১৮৯১)

ভাদ্র ১২৯৮ সনে (সেপ্টেম্বর ১৮৯১) কলিকাতা থেকে 'ইসলাম ধর্মনীতি, সমাজনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক মাসিক পত্রিকা' 'ইসলাম-প্রচারক' আত্মপ্রকাশ করে। সম্পাদক ছিলেন মোহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। বাংলার মুসলমানের সাংবাদিকতায় রেয়াজুদ্দীনের দান ছিল হিন্দু সমাজের সাংবাদিকতায় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সমতুল্য। বরিশালের অজ্ঞাত পল্লীর সাধারণ মধ্যবিত্তের সন্তান ভাগ্যান্বেষণে কলিকাতায় এসে অদম্য বাসনা ও উৎসাহ নিয়ে পুস্তক, পত্রিকা ও প্রেসকে সর্বস্ব করে সংগ্রাম করেছেন। এসব ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজে তখন প্রায় শূন্যতা বিরাজ করছিল। তাঁর প্রধান লক্ষ্য একটি—ইসলাম ধর্মকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা। সমাজের দুরবস্থা ও দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে খ্রিস্টান ও ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারকগণ ইসলাম ও হজরত মোহাম্মদকে আক্রমণ করেন এবং সাধারণ শ্রেণীর অজ্ঞ মুসলমানদের দীক্ষিত করেন। মুসলমান সমাজকে ধর্মভাবে না জাগালে এই ধর্মান্তরীকরণ বন্ধ হবে না। ধর্মজ্ঞানের অভাবে সমাজের মানুষ ভ্রান্তি ও পঙ্কিলতার দিকে এগিয়ে যায়। ধর্মশিক্ষা ও ধর্ম প্রচার দ্বারা মানুষের অজ্ঞতা দূর করা সম্ভব। রেয়াজুদ্দীন আহমদ এরূপ বাসনা ও লক্ষ্যকে সামনে রেখে পুস্তক প্রণয়ন ও পত্রিকা সম্পাদনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। প্রথম বর্ষ সংখ্যার প্রথম সংখ্যার 'সূচনা'য় তিনি যে দশটি লক্ষ্য-মাত্রার কথা বলেছেন সেগুলির কেন্দ্রসূত্রই ছিল উপরি-উক্ত উপায়ে বাংলার মুসলমান সমাজের পুনর্জাগরণ। এরূপ ধর্ম-সংস্কারের অর্থ ছিল কোরান-হাদিস ভিত্তিক ইসলামি আদর্শের প্রতিষ্ঠা করা এবং সমাজের জাগরণ বলতে ধর্ম প্রচারক ও ঐতিহাসিক চরিত্রের

২০ আশরাফ সিদ্দিকী— 'হিতকরী', *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, পৃ. ২৬-৩৩
২১ ঐ, পৃ. ৩১

মাহাত্ম্য বর্ণনা ও গৌরবময় অতীত কাহিনীর মহিমা প্রচার দ্বারা সমাজের মানুষকে উদ্দীপিত করা। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল 'শুদ্ধি-অভিযান' পুরোপরি 'সংস্কার-আন্দোলন' নয়। পথ ও মতের প্রকৃতি যাই হোক, রেয়াজুদ্দীন ও তাঁর সহযোগিগণ এ উদ্দেশ্যে একটি স্বতন্ত্র 'গোষ্ঠী'র জন্ম দিয়েছিলেন, যাকে 'ইসলাম-প্রচারক-গোষ্ঠী' নাম দেওয়া যায়। 'সুধাকর-গোষ্ঠী'র সহিত তুলনায় এর দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য ছিল, তবে লক্ষ্যমাত্রা উভয়েরই এক। 'ইসলাম-প্রচারক' প্রথম দু'বছর চলার পর কিছুকাল বন্ধ থাকে ; শ্রাবণ ১২০৬ সনে এটি নবপর্যায়ে পুনঃ প্রকাশিত হয়। এর আয়ু ছিল বৈশাখ ১৩০৭ সন পর্যন্ত, সর্বমোট ১৩ বছর। যুগ্ম সংখ্যা বেশি হলেও নবপর্যায়ে এটি নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে।

ধর্ম, সমাজ ও ইতিহাসের সাথে সাহিত্যের কথা উল্লেখ থাকলেও 'ইসলাম-প্রচারকে' রসধর্মী গল্প বা উপন্যাস একটিও প্রকাশিত হয়নি। কবিতা আছে বটে, কিন্তু সেগুলিকে উদ্দেশ্য প্রচারের বাহন করা হয়েছে। স্বয়ং সম্পাদক ছিলেন রসসাহিত্যের বিরুদ্ধে : তিনি কবিতাময়ী 'লহরী' পত্রিকার সমালোচনা করে 'ইসলাম-প্রচারকে' (অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩০৬) বলেছিলেন, "আমরা নিখুঁত ইংরাজি ছাঁচে ঢালা কবিতার পক্ষপাতী নহি।" 'মিহির ও সুধাকবে' থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ায় তার প্রতিবাদ করে তিনি 'ইসলাম-প্রচারকে' (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬) লিখেছিলেন, "মিহির সুধাকর থিয়েটারের লম্বাচওড়া সমালোচনা বাহির করিয়া মুসলমান গ্রাহক ও পাঠকদিগকে ভীষণ নরকের দিকে আহ্বান করিতেছে।" পত্রিকায় নিয়মিত ধর্ম ও জাতীয় সংবাদ, সভাসমিতি সংবাদ ও গ্রন্থ সমালোচনা পরিবেশিত হতো। 'ইসলাম-প্রচারকে'র ঘোষিত নীতি স্থির ও অপরিবর্তিত ছিল। 'ইসলাম-প্রচারক' ব্রিটিশ শাসন সমর্থন করেছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ব্রিটিশ শাসনের সমর্থক ছিলেন, কেননা ইংরেজ এসে এদেশকে যবন-পীড়ন থেকে মুক্ত করেছেন।[২২] মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীনের ধারণা, ইংরেজগণ 'মার্হট্টা দস্যু ও শিখ দানবদিগের হস্ত' হতে মুসলমানদের রক্ষা করেছেন।[২৩] উভয়ের কণ্ঠ এক : "আমরা ... পৃথিবীশ্বরী ইংলণ্ডেশ্বরী জননীর নিকটে পুত্রের ন্যায় প্রতিপালিত হইয়া সর্বমতে চরিতার্থ হইতেছি।" —ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।[২৪] "আমাদের মাতৃরূপিণী মহারানী ভারতেরশ্বরীর আধিপত্যকালে ভারতীয় মুসলমানগণ উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন।" — মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ।[২৫] 'ইসলাম প্রচারক' জাতীয় কংগ্রেস ও স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানদের যোগদানের বিরোধিতা করেছে : বক্তব্য একই— এগুলিতে মুসলমানদের স্বার্থ অপেক্ষা হিন্দুদিগের স্বার্থ অধিক জড়িত। 'ইসলাম-প্রচারক' প্যান-ইসলামি মনোভাবও পোষণ করত। তুরস্কের অধিপতি 'আমিরুল মুমেনিনে'র প্রতি এর শ্রদ্ধা ও আনুগত্য ছিল।[২৬]

২২ রমেশচন্দ্র মজুমদার—*বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩ খণ্ড, কলিকাতা, ১৩৭৮, পৃ. ৭২-৭৩
২৩ *ইসলাম প্রচারক*, শ্রাবণ ভাদ্র ১৩১০
২৪ *বাংলাদেশের ইতিহাস*, ৩ খণ্ড, পৃ. ৭৩
২৫ *ইসলাম প্রচারক*, চৈত্র বৈশাখ, ১৩০৬-০৭
২৬ ৩১ আগস্ট তুরস্ক সম্রাট আবদুল হামিদ খানের সিংহাসন আরোহণের দিন। ঐদিন মর্যাদার সঙ্গে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানিয়ে ইসলাম-প্রচারকে লেখা হয় : "মহামান্য আমিরুল মুমেনিন

'দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে' নির্মাণের অর্থ-সাহায্যের ব্যাপারে 'ইসলাম-প্রচারক' প্রচার কার্য চালায়। 'ইসলাম-প্রচারকে'র লেখকগণের অধিকাংশই আধুনিক উচচ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তাঁরা রক্ষণশীল মনোভাব নিয়ে স্বজাতিকে ধর্মভাবে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন; তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ছিল না। কলিকাতার উঠতি মুসলিম জাতীয়তাবাদী শিক্ষিত শ্রেণীর কার্যকলাপকে, বিশেষ করে, তাঁদের শিক্ষা-আন্দোলনকে সমর্থন দিয়ে 'ইসলাম-প্রচারক' মুসলমান পুনর্জাগরণের আদর্শ তুলে ধরেছে। কলিকাতার অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যখন বাংলা বিরোধী মনোভাব বিরাজ করছিল, তখন 'ইসলাম-প্রচারক', 'মিহির ও সুধাকর' প্রভৃতি সাময়িকীগুলি বাংলা ভাষার সপক্ষে আন্দোলন করেছিল, এমন কি কোরান, তফসির ও অন্যান্য ধর্মপুস্তকের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করে সামাজের মানুষের ধর্মীয় ভ্রান্তি ও সংস্কারটিকে ভেঙে দিয়েছিল। হোমনাবাদের জমিদার নবাব ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী এবং কাঁকিনার জমিদার রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী 'ইসলাম-প্রচারক'কে অর্থ সাহায্য দান করেন।

মিহির (১৮৯২)

শেখ আবদুর রহিমের সম্পাদনায় 'মিহির' জানুয়ারি ১৮৯২ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ 'আভাষে' বলা হয়েছে : সাহিত্য, বিজ্ঞান, পুরাবৃত্ত, সমাজতত্ত্ব, সাময়িক প্রসঙ্গ পত্রিকার বিষয় ভুক্ত হবে।[২৭] পত্রিকার আয়ু দু'বছরও পূর্ণ হয়নি। শেষ সংখ্যার তারিখ ছিল জুলাই ১৮৯৩ সাল। এর প্রকাশ খুবই অনিয়মিত ছিল। সাহিত্য ও জ্ঞানবিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকা 'মিহির'কেই প্রথম বলতে হয়। এপ্রিল-মে-জুন-জুলাই ১৮৯৩ সালের 'চতুর্মাস্য' সংখ্যায় মিহির ঘোষণা করেছেন, 'মিহির ধর্মসম্বন্ধীয় পত্রিকা নহে', 'মিহির সাহিত্য ও ইতিহাস সম্বন্ধীয় মাসিকপত্র'। 'ইসলাম-প্রচারক' থেকে 'মিহিরে'র এখানেই মৌলিক পার্থক্য।

'মিহিরে'র লেখকগণের মধ্যে প্রধান ছিলেন শেখ আবদুর রহিম, পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মোজাম্মেল হল মোহাম্মদ হবিবর রহমান, আবদুর আজেদ খাঁ চৌধুরী, একিনুদ্দীন আহমদ প্রমুখ। বিভিন্ন সংখ্যায় গিরিশচন্দ্র বাগচী, মধুসূদন সরকার, জ্ঞানেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী, যতীন্দ্রমোহন বসু ইতিহাস ও বিজ্ঞান বিষয়ক কয়েকটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেন। এঁরা সকলেই সুশিক্ষিত ছিলেন।

মুসলেমিন গাজি সুলতান আব্দুল হামিদ খানের দীর্ঘ জীবন এবং রাজপ্রতাপ ও সম্বন্ধে খোদাতালার দরবারে একাগ্রচিত্তে নিবিষ্ট মনে প্রার্থনা করিবেন।" *ইসলাম প্রচারক*, চৈত্র ১৩১৪

২৭ মিহিরের উদ্দেশ্য, আদর্শ ও কর্মপন্থা সম্পর্কে সুচিন্তিত অভিমত উক্ত 'আভাষে' ব্যক্ত হয়েছে। পত্রিকাকে কেন্দ্র করে সমাজের চিন্তাশক্তি ক্রমশ দানা বাঁধছে এবং মুসলিম মানস অধিক সচেতন ও দায়িত্বশীল হয়ে উঠেছে তার পরিচয় এতে বিধৃত। 'পরিশিষ্ট' দ্রষ্টব্য।

প্রধান রচনার মধ্যে রেয়াজউদ্দীন মাশহাদীর 'সুরিয়া বিজয়' (ধারাবাহিক), শেখ আবদুর রহিমের 'আলহামরা' (ধারাবাহিক), মোজাম্মেল হকের 'শাহনামা (ধারাবাহিক), মোহাম্মদ হবিবর রহমানের 'চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম' (ধারাবাহিক), একিনুদ্দীন আহমদের 'মনোরমা' (ধারাবাহিক) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছিল। সমসাময়িককালে প্রকাশিত পুস্তক ও পত্রিকার সমালোচনা ছাড়াও 'মিহিরে' কলিকাতার নাটক ও রঙ্গমঞ্চের সমালোচনা করা হয়েছে।[২৮]

সমকালীন 'সময়', 'হিতবাদী' প্রভৃতি পত্রিকায় 'মিহির' সম্পর্কে সমালোচনা করা হয়। উভয় পত্রিকা মিহিরের প্রশংসা করে। 'সময়' পত্রের বক্তব্য : "মুসলমান ভ্রাতাগণ বঙ্গভাষায় ক্রমশ : বিশেষ অধিকার লাভ করিতেছেন দেখিয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দিত হইতেছি। অতি অল্পদিন পূর্বে মুসলমানী বাঙ্গালা হিন্দুর অপাঠ্য ছিল ; কিন্তু শিক্ষার উন্নতি সহকারে এখন হিন্দু-মুসলমানের লেখা প্রভেদ করা যায় না। মুসলমানগণ সংস্কৃতজ্ঞ হিন্দুর ন্যায় খাঁটি বাঙ্গালা লিখিতেছেন ইহা বঙ্গদেশের গৌরবের বিষয়। হিন্দু-মুসলমানের সমবেত চেষ্টা ভিন্ন যেমন এদেশে কোনো হিতকর কার্যই সুসম্পন্ন হইবে না, তেমন এই দুই জাতির পূর্ণ চেষ্টা ভিন্ন বঙ্গভাষার শ্রীবৃদ্ধি হওয়াও অসম্ভব। ... মিহিরের লেখা অতি সরল এবং সুমিষ্ট ও সতেজ।"[২৯] "মুসলমান কর্তৃক সম্পাদিত বলিয়া এই পত্রিকা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করিয়াছে। ভাষার লালিত্য ও প্রাঞ্জলতা এই পত্রিকার নতুনত্ব। বাস্তবিক মুসলমান লিখিত অনেক সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকায় আজিকালি এরূপ নতুনত্ব দেখা যায়।"[৩০]

মিহির ও সুধাকর

'মিহির ও সুধাকর' 'রাজনীতি, সমাজনীতি, ধর্মনীতি, ইতিহাস ও সাহিত্য বিষয়ক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র'। ডক্টর আনিসুজ্জামান, উক্টর মুস্তাফা নূরউল ইসলাম প্রমুখ পত্রিকার প্রকাশের সময় বলেছেন ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দ।[৩১] ১০ কার্তিক ১৩০২ সনে (২৬ জানুয়ারি ১৮৯৫) 'মিহির ও সুধাকরে' ৬ষ্ঠ খণ্ড ৩১শ সংখ্যার উল্লেখ আছে। ১৩০৫ সনে ৩০ পৌষের সংখ্যায় 'নববর্ষ' শীর্ষক একটি কবিতায় মিহির ও সুধাকরের নবম বর্ষ পূর্তির ও দশম-বর্ষ পদার্পণের কথা বলা হয়েছে।[৩২] এসব সূত্রানুসারে পত্রিকার প্রকাশ কাল দাঁড়ায় ১২৯৬

---

২৮ ১৮৯৩ সালের চতুর্মাস্য সংখ্যায় কলিকাতার তৎকালীন এমারেল্ড রঙ্গমঞ্চে 'বিষাদ' ও রবীন্দ্র নাথের 'রাজা ও রাণী' রয়েল বেঙ্গল রঙ্গমঞ্চে বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী এবং মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে গিরীশচন্দ্র ঘোষের 'দক্ষযজ্ঞ' ও 'বেজায় আওয়াজ' অভিনয়াদির সমালোচনা আছে। *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, পৃ. ৪৫

২৯ *মিহির*, মার্চ ১৮৯২ (উদ্ধৃতি)

৩০ ঐ।

৩১ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ১২ ; *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ৪৩১

৩২ কবিতার কয়েকটি চরণ এরূপ :

নয়টি বৎসর ধরি'
ছয় ঋতু শিরে করি

সনের পৌষ মাস (জানুয়ারি ১৮৯০)। সমালোচকদের অনেকের ধারণা, সাপ্তাহিক 'সুধাকর' ও মাসিক 'মিহির' একীভূত হয়ে সাপ্তাহিক 'মিহির ও সুধাকর' নামে আত্মপ্রকাশ করে।[৩৩] 'সুধাকর' ১৮৯০ সালে ও 'মিহির' ১৮৯৩ সালে বন্ধ হয়। তর্কের খাতিরে বলা যায়, 'মিহির ও সুধাকরে'র প্রকাশ এর পরেই হওয়া সংগত। তবে পূর্বের দুটি জাজ্জ্বল্য প্রমাণও অস্বীকার করা যায় না। তিনটি সাময়িকপত্রেরই সম্পাদক ছিলেন শেখ আবদুর রহিম। 'মিহির ও সুধাকর' ১৯১০ সাল পর্যন্ত চালু ছিল। ধনবাড়ীর জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ও ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, এতে আর্থিক সাহায্য যোগাতেন। শেষের দিকে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ ওসমান আলী পত্রিকার সম্পাদক হন। এর বিষয় ছিল বিচিত্র। 'সংবাদ সরবরাহের অবসরে উপন্যাস, উদ্ভট কাহিনী, খণ্ডকাব্য, ব্যঙ্গ কবিতা, রসরচনা, জীবন-কথা, ভ্রমণবৃত্ত, ইতিহাস, বিজ্ঞানতত্ত্ব, বাণিজ্য বার্তা, নাট্যালোচনা, পুস্তক ও পুস্তিকা সমালোচনা প্রভৃতি পরিবেশিত' হতো।[৩৪]

'মিহির ও সুধাকরে'র এক সংখ্যায় পত্রিকার ২৯ জন লেখকের নাম প্রকাশিত হয় ; তাঁরা হলেন, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, একিনুদ্দীন আহমদ বিএল, মীর মশারফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, সৈয়দ আবদুল হক সাত্তার, মকবুল আলি বিএ, আবদুল হামিদ খাঁ, নঈমুদ্দীন, তসলিমুদ্দীন আহমদ বিএল, রেয়াজ অল দিন আহমদ, হেমায়েতউদ্দিন আহমদ বিএল, মুহম্মদ বদিয়ল আলম, আতা এলাহি বিএ, মহম্মদ ইসমাইল, উসমান আলি বিএল, গোলাম সারওয়ার, মহম্মদ ইয়াকুব, আমানতুল্লা, আহমদ হোসেন, তহমিদউদ্দীন আহমদ, মহম্মদ হবিবর রহমান, আবদুল অজেদ খাঁ চৌধুরী, হাকিম আবদুল লতিফ, মহম্মদ আবুল হোসেন, শেখ আবদুস সোবহান, মহম্মদ সামসুজ্জোহা বিএ, হাকিম শরিয়তুল্লা, মহম্মদ জিয়াউন্নবি বিএ ও তাইমুর আহম্মদ।[৩৫] আবদুল কাদির লিখেছেন, "বাংলার মুসলমানকে জ্ঞানে ও ত্যাগে, শিক্ষায় ও সাহিত্যে সমৃদ্ধবান ও সংঘবদ্ধ করে তোলার জন্য 'মিহির ও সুধাকরে'র পরিচালক ও লেখকগণ অক্লান্ত সাধনা করে গেছেন। ফলে অচিরকাল মধ্যেই সমাজ-মানস জাগরণের যাদুমন্ত্রে উদ্দীপিত হয়ে ওঠে।"[৩৬]

হাফেজ (১৮৯২)

'হাফেজ' পাক্ষিক পত্রিকা হিসাবে ১৮৯২ সালের নভেম্বর মাসে প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। চার বছর পরে ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে মাসিকপত্র হিসাবে 'হাফেজ' পুনরাবির্ভূত

দশম বৎসর এবে পড়িল সুদিন।
সুধাকর মিহিরের আজি জন্মদিন॥

৩৩ *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ. ৩০১ ; *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ৪৬

৩৪ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ৪৬

৩৫ *মিহির ও সুধাকর*, ১০ কার্তিক ১৩০২

৩৬ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ৫২

হয়। উভয় ক্ষেত্রে শেখ আবদুর রহমান সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৭ সালের জুন পর্যন্ত মোট ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হওয়ার পর হাফেজ বন্ধ হয়ে যায়। চার বছর পর 'মিহির ও সুধাকরে' (১৪ কার্তিক ১৩০৯) শেখ ফজল করিমের একটি লেখায় হাফেজের পুনরাবির্ভাবের কথা বলা হয়। কিন্তু তা আর প্রকাশিত হয়নি।[৩৭]

পত্রিকার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে হাফেজ প্রথম সংখ্যায় 'আভাসে' ঘোষণা করেছে, "হে দয়াময়। আমাদের বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে বিদ্যার চর্চা ও বিদ্যোৎসাহী হইতে বঞ্চিত করিও না। কারণ বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণ ঘোর সমস্যার শয্যায় শায়িত হইয়া যেরূপ ভোগবিলাসে জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, তাহাতে অচিরে তাহারা যে একেবারে ধ্বংস সাগরে নিমজ্জিত হইবেন, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহনেই। ... হাফেজ সেই ভোগবিলাস সুখাভিলাষী নিদ্রিত বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তাহাদের পূর্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্মভক্তি কাহিনী এবং পবিত্র ধর্মের পবিত্র রীতিনীতি শুনাইয়া জাগরিত করিবার জন্য তোমারই আশ্রয় ও অনুগ্রহে আজ বঙ্গের চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে বহির্গত হইল।"[৩৮] লক্ষণীয় 'মিহিরে'র বিষয়-বৈচিত্র্য ও ব্যাপক উদ্দীপনা 'হাফেজে' সঙ্কুচিত হয়েছে। বঙ্গীয় মুসলমান ভ্রাতাগণকে পূর্বপুরুষদিগের অতীত গৌরব ও ধর্মভক্তির কাহিনী এবং পবিত্রধর্মের পবিত্র রীতি-নীতির কথা শুনিয়ে তাদের জাগানোর সঙ্কল্প প্রকাশ করেছে। ফলে পূর্বের সেকুলার মনোভাব আর নেই। মিহিরে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লেখক ছিলেন, হাফেজে কেবল মুসলমান লেখকের লেখা দেখা যায়। চার বছরের ব্যবধানে মিহির ও হাফেজের নীতি ও বিষয়ের দিক থেকে এই পরিবর্তন তৎকালীন মুসলিম মানসের পরিবর্তনকে সূচিত করে।

কোহিনুর (১৮৯৮)

'কোহিনুর' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৩০৫ সনের আষাঢ় মাসে (জুলাই ১৮৯৮)। প্রথমে এটি কিঞ্চিৎ অধিক এক বছর চালু থাকে। ১৩১১ সনের বৈশাখ মাস থেকে এর দ্বিতীয় পর্যায় শুরু হয়, অনিয়মিতভাবে তিন বছর চলার পর বন্ধ হয়ে যায়। ১৩১৮ সনের বৈশাখ মাসে তৃতীয় পর্যায়ে এটি পুনঃ প্রকাশিত হয়। বছর খানেক নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হওয়ার পর আবার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। ১৩২২ সন পর্যন্ত টিকে ছিল বলে জানা যায়। প্রথমে এটি কুষ্টিয়া, পরে পাংশা এবং শেষে কলিকাতা থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। এস. কে. এম. মোহামদ রওশন আলী চৌধুরী তিন পর্যায়েই সম্পাদক ছিলেন।

প্রথম পর্যায়ে 'কোহিনুরে'র আখ্যাপত্রে শিরোনামের পাশে লেখা হত 'বিবিধ বিষয়ক মাসিকপত্র ও সমালোচনা'। দ্বিতীয় পর্যায়ে লেখা হতো 'মাসিকপত্র ও সমালোচনা : হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি উদ্দেশ্যে প্রকাশিত'। পত্রিকার প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের নিবেদন' ও 'আমাদের কথা'—এই দুটি অংশে পত্রিকার উদ্দেশ্য সংগঠন ও কর্মপন্থা

৩৭ ঐ, পৃ. ৬৮
৩৮ *হাফেজ*, জানুয়ারি ১৮৯৭

সম্পর্কে সম্পাদক নানা অভিমত ব্যক্ত করেছেন। "হিন্দু-মুসলমানে সম্প্রীতি, জাতীয় উন্নতি, মাতৃভাষার সেবাকল্পে এবং কলিকাতার অনাথ-আশ্রমের সাহায্যার্থে 'কোহিনুর' প্রচারে ব্রতী হইয়াছি ... কোনো ধর্ম বা জাতি বিশেষের সম্পত্তি করিয়া আমরা কোহিনুর পরিচালনা করিতে ইচ্ছুক নহি। কোহিনুর সর্বশ্রেণীর উপযোগী করিয়াই পরিচালিত হইবে।"[৩৯] 'কোহিনুর' পরিচালনার জন্য 'কোহিনুর পরিচালক সমিতি' নামে একটি কমিটি ছিল। কমিটির সভ্যগণের তালিকায় ৩৫ জনের নাম আছে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ব্যারিস্টার চন্দ্রশেখর সেন, আবদুল করিম বিএ, শেখ ওসমান আলী বিএল, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা, প্রাণকৃষ্ণ দত্ত (অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ), দুর্গাদাস লাহিড়ী, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী, জমিরুদ্দীন আহমদ, রাইচরণ দাস, বসন্তকুমার চক্রবর্তী, নিখিল নাথ রায়, ডাক্তার মোহাম্মদ হবিবর রহমান, কায়কোবাদ, যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।[৪০]

কোহিনুর সূচনায় দাবি করেছিল, 'বঙ্গীয় কৃতবিদ্য হিন্দু-মুসলমান লেখকগণকে একত্রিত ও একসূত্রে গ্রথিত' করার উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো পত্রিকা পূর্বে প্রকাশিত হয়নি। কোহিনুরের এই প্রথম প্রচেষ্টা। হিন্দু ও মুসলমানের বিরোধ ও দ্বন্দ্ব সেযুগে একটা বড় রকমের সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁরা ঐক্যে বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁরা 'কোহিনুর'কে অবলম্বন করে মিলিত হয়েছেন ; তাঁদের বিভিন্ন লেখায় সম্প্রীতির ভাব স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা বার বার উচ্চারিত হয়েছে। গোপালচন্দ্রের 'সংস্কার ও সংস্কারক', মশাররফের 'সৎপ্রসঙ্গ', যদুনাথের 'হিন্দু-মুসলমান', সতীশচন্দ্রের 'হিন্দু ও মুসলমান', দক্ষিণারঞ্জনের 'হিন্দু-মুসলমান', কিশোরী মোহনের 'সম্প্রীতি', ওসমান আলীর 'হিন্দু-মুসলমানে বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়' প্রভৃতি প্রবন্ধ ও কবিতায় এই মিলনমন্ত্র ধ্বনিত হয়েছে। এসব কিছুর প্রাণকেন্দ্র ছিলেন সম্পাদক রওশন আলী চৌধুরী। তিনি একজন অতন্দ্র প্রহরীর মতো পত্রিকার লেখাগুলির উপর দৃষ্টিপাত করতেন। কোনো বিরোধী মতামতের ফলে ভারসাম্যের সামান্যতম বিঘ্ন ঘটলে তিনি টীকায় স্বীয় মন্তব্য জুড়ে দিতেন। শহর নয়, মফস্বল থেকে এরূপ কার্যে ব্রতী হওয়া মহৎ প্রাণেরই লক্ষণ। 'এডুকেশন গেজেট' (৭ শ্রাবণ ১৩০৫) মন্তব্য করেছিল— 'কোহিনূরের' উদ্দেশ্য অপর সাময়িক পত্র হইতে একটু ভিন্ন এবং আমাদের চক্ষে খুবই মহৎ।" 'এডুকেশন গেজেট' ছাড়াও 'মিহির ও সুধাকর' (৩২ আষাঢ় ১৩০৫), 'সাহিত্য' (শ্রাবণ ১৩০৫), 'বসুমতী' (২৭ শ্রাবণ ১৩০৫), 'অনুসন্ধান' (৩০ ভাদ্র ১৩০৫), 'পূর্ণিমা' (অগ্রহায়ণ ১৩০৫) 'হিতবাদী' (১৮ চৈত্র ১৩০৫) প্রভৃতি কোহিনুরের (প্রথম সংখ্যার) উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

সমাজ, শিক্ষা ও রাজনীতি বিষয়ক রচনা 'কোহিনুরে' প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে রওশন আলী চৌধুরী দেশের দুরবস্থা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেছেন, "আমরা আজকাল সমস্ত বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, নিজের বলিতে আমাদের

---

৩৯ *কোহিনুর*, আষাঢ় ১৩০৫

৪০ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ১০৪

কিছুই নাই। আমাদের দেশে যাহা কিছু ছিল, অনাদরে তাহা সমস্তই হারাইয়াছে। খাদ্যের জন্য, পরিধেয়ের জন্য, পথ্যের জন্য, শারীরিক সুস্থাবস্থার বিধানের জন্য যাহা কিছু আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় তাহার সমস্ত বিষয়ের জন্যই আমরা পরের দিকে চাহিয়া থাকি।"[৪১] সম্পাদকের এরূপ আক্ষেপোক্তির মধ্যে আছে রাজনৈতিক চেতনাপ্রসূত মর্মন্তুদ বেদনাবোধ। মীর মশাররফ হোসেনের 'নিয়তি কি অবনতি,' কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান', মোজাম্মেল হকের 'তাপস-কাহিনী' প্রভৃতি প্রকাশিত হয়। সবদিক দিয়ে বিচারে 'কোহিনুর' একটি সাহিত্যপত্রের আখ্যায় ভূষিত ছিল। 'কোহিনুরে'র প্রথম সংখ্যায় 'আমাদের কথা' অংশে সম্পাদক বলেন, "সাহিত্যের সহিত সমাজের অতি নিকট সম্বন্ধ : জাতীয় সাহিত্যের উপর জাতীয় সমাজের অনেক আশা ও ভরসা নির্ভর করে। সুতরাং জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষ সাধনে সমাজের লোকে যতই অগ্রসর হইবে, সমাজ ততই উন্নত হইতে থাকিবে। সাহিত্যের প্রতি হতাদর হইলে, সমাজবন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে।"[৪২] সাহিত্য-উন্নতির সঙ্গে সমাজ-উন্নতির সম্পর্কে আস্থা পোষণ করেন বলেই তিনি স্বসমাজের 'সমাজহিতৈষী মহাত্মাগণের মধ্যে অনেকেই সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ' করেছেন দেখে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। "সুখের বিষয়, মুসলমান ভ্রাতৃগণ এখন বুঝিতে পারিতেছেন যে, সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ না করিলে, জাতীয় উন্নতির আশা সুদূর পরাহত। মুসলমানগণ এখন ভ্রান্তির মোহান্ধকার দূর করিয়া এবং আলস্য-শয্যা পরিত্যাগ করতঃ ধীরে ধীরে সাহিত্যচর্চায় মনোনিবেশ করিতেছেন।"[৪৩] আধুনিক সাহিত্যের প্রতি মুসলমান সমাজের একটি নেতিবাচক মনোভাব বিদ্যমান ছিল। শেখ আবদুর রহিম এই দ্বন্দ্বের মধ্যে আন্দোলিত হয়ে 'সুধাকর' থেকে 'হাফেজে' প্রত্যাবর্তন করেছেন। সমাজমনোভাবকে স্মরণ রেখে রওশন আলী চৌধুরীর চিন্তাধারা ও কর্মপন্থা বিচার করলে এর গুরুত্ব বুঝা যায়। তিনি স্বমতে শেষ পর্যন্ত অবিচল ছিলেন।

আপনি সুন্দর হই
সবারে ডাকিয়া লই,
একাকারে ডুব দেই সুখের সংসার
দৈন্য ঘৃণা, শোক আসি দুর্বল হৃদয়
কভু নাহি করে অধিকার।[৪৪]

এটাই ছিল রওশন আলীর আর্দশ ও চিন্তা-দর্শন।

৪১ *কোহিনুর*, আষাঢ় ১৩০৫
৪২ ঐ।
৪৩ ঐ
৪৪ সৈয়দ মর্তুজা আলী—'কোহিনুর', *বাঙলা একাডেমী পত্রিকা*, ৪ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ-শ্রাবণ, ১৩৬৭, পৃ. ৩

প্রচারক (১৮৯৯)

ময়েজউদ্দীন আহমদ ওরফে মধু মিয়া সম্পাদিত 'প্রচারক' মাসিকপত্র কলিকাতা থেকে মাঘ ১৩০৫ সনে (জানুয়ারি ১৮৯৯) প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। 'প্রচারকে'র আখ্যাপত্রে শিরোনামের পাশে কোরানের একটি 'আয়াতে'র বঙ্গানুবাদ মুদ্রিত হত : 'যাহা অবতীর্ণ হইয়াছে তুমি তাহা প্রচার কর'। ইসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার ও মুসলমান সমাজের হিতসাধন—এই দুটি মূলমন্ত্রকে সর্বস্ব করে 'প্রচারক' কর্মপন্থা গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যেই পত্রিকাখানি খ্রিস্টান পাদরি ও লা-মজহাবি সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মসি চালনা করে। গোপালচন্দ্র সম্পাদিত 'প্রচার' নামে একখানি খ্রিস্টান পাদরি পরিচালিত পত্রিকায় ইসলামধর্মের বিরুদ্ধে প্রচারণা করা হতো। 'প্রচারক' এর প্রতিবাদে প্রবন্ধ লিখতো। ময়েজউদ্দীন আহমদ হানাফি ধর্মমত সমর্থন করতেন। আহলে হাদিস বা লা-মজহাবি, ওয়াহাবী, গায়ের মোকল্লেদ মতবাদীদের সাথে হানাফী মজহাবের দ্বন্দ্ব ছিল। লা-মজহাবীদের মতামত ও আচরণের সমালোচনা করে প্রচারকে একাধিক প্রবন্ধ লেখা হয়। রক্ষণশীল মনোভাবের বশবর্তী হয়ে 'প্রচারক' স্যার সৈয়দ আহমদের যুক্তিশীল বৈজ্ঞানিক ধর্ম ব্যাখ্যারও বিরোধিতা করে। সৈয়দ আহমদের কোরানের ব্যাখ্যা 'নাস্তিকতাভাবে' লিখিত বলে মন্তব্য করা হয়।[৪৫]

প্রচারকের মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬ সনে 'বর্ষ-সমালোচনা' শীর্ষক সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয়, "হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িকত্ব এবং হৃদয়ের বিভিন্নতা যতদূর সাধ্য মোচন করিতে যত্নশীল থাকিব। পবিত্রতার আধার সমাজ-সংস্কারক শিক্ষকগণের বর্তমান আসরে উপস্থিতির প্রয়োজনীয়তা প্রতিপন্ন করিতে অগ্রসর হইব। শিক্ষাই একমাত্র জ্ঞানের ভিত্তি ; জ্ঞানই বিবেকের ভিত্তি ; বিবেকই আত্মোদ্ধারের প্রধান ভিত্তি। সেই স্বর্গীয় ভাব সকলের প্রাণে জাগরিত হউক, ইহাই একান্ত বাসনা।'[৪৬] জ্ঞানসাধনায় বিবেকের মুক্তি, আত্মোদ্ধারের উপায় বলে সম্পাদক মাদ্রাসাসমূহে বাঙ্গালা ভাষার মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসার কামনা করেছেন।[৪৭] ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার সপক্ষেও প্রচারক প্রচার করে। ধর্মচিন্তায় রক্ষনশীলতা ও সমাজচিন্তায় সংস্কারমুক্তির বৈপরীত্য প্রচারকে লক্ষ্য করা যায়। ধর্মমাহাত্ম্য প্রচার ও অতীত গৌরবকীর্তন দ্বারা সমাজকে জাগানোর প্রয়াস এখানেও বিদ্যমান।

ধর্মকথা, সমাজকথা প্রাধান্য পেলেও প্রচারকে সাহিত্যকথাও উপেক্ষিত হয়নি। শেখ ফজলল করিমের 'পরিত্রাণ', 'মানসিংহ' ও 'লায়লী-মজনু', মতিয়র রহমান খানের 'নব-কুমুদ' ধারাবাহিকভাবে এবং ইসমাইল হোসেন সিরাজী, শেখ ওসমান আলী, কাজী ইমদাদুল হক প্রমুখের কয়েকটি কবিতা প্রচারকে প্রকাশিত হয়।

বিশুদ্ধ বঙ্গভাষা ও উন্নতমানের রচনার জন্য সেকালের সাময়িকপত্রের নিকট থেকে উচ্চ প্রশংসা পেয়েছে। কয়েকটি পত্রিকার মত এরূপ :

৪৫ *প্রচারক*, আশ্বিন ১৩০৭ (ক্রোড়পত্র)
৪৬ *প্রচারক*, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬
৪৭ ঐ, কার্তিক ১৩০৭

"মুসলমান ভ্রাতাগণ বঙ্গভাষায় শিক্ষিত হইয়া বিশুদ্ধরূপে প্রবন্ধ রচনা করিতেছেন ও সংবাদপত্র পরিচালনা করিতেছেন, ইহা কম আহ্লাদের বিষয় নহে। ... প্রচারকের ভাষায় আমরা আনন্দিত হইয়াছি।" —সময়, ৮ অগ্রহায়ণ ১৩০৭।

"আমাদের মুসলমান ভ্রাতারা যে বাঙ্গালা ভাষায় আলোচনা করেন, ইহা আমাদের সাহিত্যের সৌভাগ্য ও জাতীয় একতার সোপান বলিতে হইবে। আলোচ্য বিষয়গুলি বেশ সুপাঠ্য।"—বঙ্গভূমি, ৭ ফাল্গুন ১৩০৭।

কখন নিয়মিত, কখন অনিয়মিতভাবে চলে 'প্রচারক' ১৩০৯ সনের চৈত্রের পর বন্ধ হয়ে যায়। মধু মিয়ার সম্পাদনায় 'ইসলাম' (বৈশাখ ১৩০৭) এবং 'মধু-মিয়া' (কার্তিক ১৩০৬) নামে আরও দুখানি মাসিকপত্র প্রকাশিত হয়। দু'খানির আয়ু ছিল ক্ষণস্থায়ী।[৪৮]

লহরী (১৯০০)

বৈশাখী ১৩০৭ সনে (মে ১৯০০) 'লহরী' নদীয়ার শান্তিপুর থেকে প্রকাশিত হয়। সম্পাদক ছিলেন কবি মোজাম্মেল হক। লহরী ছিল 'নানাবিষয়িনী কবিতাময়ী সমালোচনী পত্রিকা'। কেবল কবিতা নিয়ে একটি মাসিকপত্র প্রকাশ করা মুসলমান সম্পাদক কর্তৃক এই প্রথম দেখা যায়। এর আয়ু এক বছর পূর্ণ হয়নি, অনিয়মিতভাবে দশ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়। কবিদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মোজাম্মেল হক, মোহাম্মদ মীর আলী, তোফাজ্জল হোসেন, জীবনকৃষ্ণ দত্ত প্রমুখ। আত্মগত ভাব কল্পনাকে আশ্রয় করে আধুনিক খণ্ড কবিতা লহরীতে প্রকাশিত হয়। সমকালীন সামাজিক সমস্যা এবং তৎসঙ্গে অতীতের গৌরব ও মহিমা কবিতাগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল।

নূর-অল-ইমান (১৯০০)

রাজশাহী থেকে আষাঢ় ১৩০৭ সনে (জুলাই ১৯০০) মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলীর সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ছিল রাজশাহীর 'নূর-অল-ইমান সমাজে'র মুখপত্র। নিতান্ত অনিয়মিতভাবে মোট চারটি সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল। পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে প্রথম সংখ্যায় লেখা হয় : "বঙ্গদেশের মুসলমান সমাজে কতকগুলি হানিকর দোষ প্রবেশ করিয়া মুসলমান কওমকে পাতালে ডুবাইয়া দিয়াছে। পূর্বকালের মুসলমানদিগের কি কি সদগুণ ছিল, কোন কোন গুণের জন্য তাঁহারা জগতের পূজা পাইয়াছেন নূর-অল-ইমান তাহা সকলকে দেখাইয়া দিবেন। ... কি কি দোষে মুসলমান কওমের মধ্যে কিভাবে প্রবেশ করিল, কোন কোন মারাত্মক পীড়া আমাদের সমাজে প্রবেশ করিয়া সমাজের জীবন নষ্ট করিতে লাগিয়াছে তাহাও নূর-অল-ইমান দেখাইবে। কোন দোষ দূর করিবার কি উপায়, কোন রোগ নিবারণের কি ঔষধ, নূর-অল-ইমান তাহারও

৪৮ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র*, পৃ. ৮৪

ব্যবস্থা সকলকে শিখাইবে।” নূর-অল-ইমানে'র লেখকগণের মধ্যে ছিলেন মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী, দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ প্রমুখ। পত্রিকায় ঘোষিত উদ্দেশ্য অনুযায়ী মুসলমান সম্প্রদায়ের ধর্ম, সমাজ, শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাগুলিকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। পত্রিকার সুর ছিল উদ্দীপনামূলক ও আশাব্যঞ্জক।

নবনূর (১৯০৩)

সৈয়দ এমদাদ আলীর সম্পাদনায় বৈশাখ ১৩১০ সনে (এপ্রিল ১৯০৩) 'নবনূর' মাসিকপত্র প্রথম প্রকাশিত হয়। নবনূর প্রকাশে সৈয়দ এমদাদ আলী, কাজী ইমদাদুল হক, মোহম্মদ হেদায়েতুল্লাহ এবং মোহাম্মদ আসাদ আলী এই চারজনের দান ছিল। এঁরা সকলেই তরুণ, আধুনিক শিক্ষার আলোকপ্রাপ্ত। প্রথম তিনজন সাহিত্যিক ছিলেন, আসাদ আলী 'নবনূরে'র স্বত্বাধিকারী ও প্রকাশক ছিলেন, তিনি পরে পত্রিকার সম্পাদক হন। আধুনিক বাংলা ভাষার ও সাহিত্যের চর্চা এবং তার ভেতর দিয়ে সমাজকে জাগাবার ঐকান্তিক প্রেরণায় তাঁরা এই সাহিত্যপত্র প্রকাশ করেছিলেন। এতে প্রবন্ধ, কবিতা, গল্প, উপন্যাস এবং সমালোচনা নিয়মিত স্থান পেত। তাঁরা মাতৃভাষার সেবা ও সাহিত্য সৃষ্টির প্রেরণাকে অঙ্গীকার করে পত্রিকা প্রকাশে উদ্যোগী হয়েছিলেন, সেকথা সূচনায় উল্লেখ করেছেন : “যে সমাজে 'আখবারে ইসলামীয়া', 'ইসলাম', 'মাসিক মিহির', 'হাফেজ', 'কোহিনুর' এবং 'লহরী' জন্মের কিছুকাল পরেই অকালমৃত্যুর অধীন হইয়াছে, সেই সমাজে কেন আবার এই প্রয়াস? ... ইহার উত্তরে আমরা কেবলমাত্র একটি কথা বলিতে পারি, মাতৃভাষার সেবাব্রতে দীক্ষিত হইবার জন্যই আমরা বাহিরের পূর্ণালোকে ছুটিয়া আসিয়াছি। আমাদের অন্য সাধ নাই, অন্য লক্ষ্যও নাই। ... নবনূর যদি বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে সাহিত্যচর্চার আকাঙ্ক্ষা উদ্দীপ্ত করিতে পারে, তবেই তাহার প্রচার সার্থক হইবে এবং ইহার পরিচালকগণ ধন্য হইবেন।”[৪৯] সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সমাজের উন্নতির সম্পর্ক বিষয়ে তাঁদের বদ্ধমূল ধারণা ছিল। এজন্য তাঁরা 'সূচনায়' ঘোষণা করেছিলেন, “মুসলমানগণ সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় জীবনে অবসাদই যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ... পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার, উদ্ধার করিবার একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য। সাহিত্য দ্বারাই জাতীয় জীবনের শক্তি উপচিত হয় এবং যদি কখনও মুসলমান জাতি নিজের পদে ভর করিয়া আবার দণ্ডায়মান হইতে সক্ষম হয়, তবে তাহা সাহিত্য-চর্চালব্ধ শক্তি দ্বারাই হইবে।”[৫০] অধঃপতিত মুসলমান সমাজের দুঃখ দুর্দশা মোচন করে সমাজের উন্নতি বিধান করা 'নবনূরে'র লক্ষ্য ছিল। পত্রিকার লেখকগণ অতীত ইতিহাস, দর্শন, শিল্প-সাহিত্যে প্রেরণার উৎস খুঁজেছেন।

৪৯ *নবনূর*, বৈশাখ ১৩১০
৫০ *ধূমকেতু*, আষাঢ় ১৩১০

কোনো কোনো হিন্দু লেখক মুসলমান চরিত্র, সমাজ ও ইতিহাসকে বিকৃত করে সাহিত্য ও অন্যান্য রচনা লিখে থাকেন, 'নবনূরে' সেগুলি সম্পর্কে প্রতিবাদ করা হয়। এসব রচনা মুসলমান জাতি সম্পর্কে হিন্দু শিক্ষিত সমাজের ঘৃণা ও সন্দেহ সৃষ্টির সহায়ক হয় এবং বঙ্গের হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রতিবন্ধক হয়—সে বিষয়ে পত্রিকায় অভিমত প্রকাশ করা হয়। 'ধূমকেতু'তে 'নবনূরে'র সমালোচনা হয়। এতে প্রশংসা-নিন্দা দু-ই আছে। পত্রিকায় লেখা হয়, "আমরা ইহার প্রথম দুই সংখ্যা উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি। নবনূরের বাঙ্গালা গতমাসের ধূমকেতুতে প্রদর্শিত মুসলমানী বাঙ্গালার ছাঁচে ঢালা নহে। ... দেখিলাম মুসলমান লেখকদিগের লেখাও হিন্দুর লেখা প্রবন্ধের সহিত ভাষা ও ছন্দোবন্ধে অভিন্ন। ইহা খুবই প্রশংসার কথা। ... 'নবনূর' যদি আরবি, পারসি ও উর্দু হইতে রত্নরাজি আহরণ করিয়া মাতৃভাষারূপিণী বাঙ্গালাকে আরবি পারসিক উপাদেয় মোগলাই আভরণে সজ্জিত করিতে পারেন, তাহা হইলেই তাহার জীবনব্রত সিদ্ধ হইল, মনে করিয়া সকলে তাহার সংবর্ধনা করিবে। কিন্তু কোনো কোনো বিকৃতরুচি অদূরদর্শী হিন্দুলোকের মুসলমান দ্বেষ লক্ষ্য করিয়া যদি 'নবনূর' ফুর ফুর জ্বলিতে না জ্বলিতেই অর্থাৎ জন্মমাত্রই, অহি-রাবণের ন্যায়, হিন্দুবিদ্বেষে গর্জিয়া উঠেন, তাহা হইলে তাহা দ্বারা কোনো কর্ম হইবারই প্রত্যাশা নাই। 'নবনূরে'র এ অংশে মতিগতি ভাল দেখিলাম না।"[৫১]

নবনূর ৩ বছর ৯ মাস নিয়মিত চলার পর বন্ধ হয়ে যায় (পৌষ ১৩১৩)।

৫১ *ধূমকেতু*, আষাঢ় ১৩১০

চতুর্থ অধ্যায়

সমাজ

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলার মুসলমান সমাজ নানা ভাবদ্বন্দ্বে ও সমস্যা-সংঘাতে আন্দোলিত হয়েছিল। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করলেও বিচিত্র চিন্তা, মত, বিশ্বাস ও স্বার্থ দ্বারা শ্রেণী, সম্প্রদায়, দল-উপদলে বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং পরস্পর দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ইংরাজদের আগমনের ফলে এদেশে আধুনিক যুগের সূচনা হয়েছিল। এই আধুনিক যুগ যতখানি মনের জগতে ভাববিপ্লব এনেছিল, ততখানি সমাজবিপ্লব আনতে পারেনি। মধ্যযুগের সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামো ভেঙে ঔপনিবেশিক শাসন ও অর্থনীতি ব্যবস্থায় আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজকাঠামো তৈরি হয়। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হয়নি, বরং 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে'র (১৭৯৩) ফলে বংশানুক্রমে জমিদারিস্বত্ব ভোগ করার অধিকার জন্মে। তবে প্রজার উপর জমিদারদের অবাধ কর্তৃত্ব ক্রমশ হ্রাস পায় ; সরকারি আইনের দ্বারা (যেমন ১৮৮৫ সালের বাংলার প্রজাস্বত্ব আইন) ভূমিতে প্রজার অধিকার স্বীকৃত হয়। প্রথম দিকে গ্রামের ভূস্বামী ও শহরের বিত্তবান নিজেরাই সমাজপতি সেজে নেতৃত্ব দিতে থাকেন, কিন্তু কিছুকাল পরে নব্যশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আবির্ভাব হলে সমাজের কর্তৃত্ব তাঁদের হাতে চলে যায়। হিন্দু সমাজের এ ধারাটি খুবই স্পষ্ট ; বনেদি ভূস্বামী, রাজা-মহারাজাদের পর নতুন জমিদার ও পুঁজিপতিরা প্রতিপত্তি লাভ করেন। 'ল্যাণ্ড হোল্ডার্স সোসাইটি' (১৮৩১) গঠন করে তাঁরা সংঘবদ্ধ হন।[১] সরকারের সাথে তাঁদের সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এরই পরিবর্তিত রূপ 'ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশন' (১৮৫১) জনগণের স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয় সরকারের গোচরীভূত করতেন, সরকারও এসোসিয়েশনের পরামর্শ নিতেন। তাঁরা চাঁদা তুলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছেন, প্রেস ও পত্রিকার পরিচালনা, সম্পাদনা অথবা ব্যয়ভার বহন করেছেন। থিয়েটারাদির প্রথম ও প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁরাই। ১৮৮৪ সালে 'ন্যাশনাল কংগ্রেস' স্থাপিত হলে নেতৃত্বের পরিবর্তন ঘটে। সভার বেশীর ভাগ নেতৃবৃন্দ উকিল-ব্যারিস্টার, শিক্ষাবিদ, ডাক্তার শ্রেণীর মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ছিলেন। ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রথম জাতীয় সভার মর্যাদা লাভ করে। তবে জমিদারদের ক্ষমতা একেবারে লুপ্ত হয়নি, সারা ব্রিটিশ আমল জমিদারি প্রথা চালু ছিল, কমবেশী জমিদারদের প্রতিপত্তিও বজায় ছিল। আমরা এটাকেই আধা-সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করেছি। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারাবার পর দীর্ঘদিন মুসলমানদের

১ *বাংলার সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ*, পৃ, ২৪১

সামাজিক নেতৃত্ব দেওয়ার কেউ ছিল না। ব্রিটিশ শাসননীতির ফলে বড় বড় বনেদি পরিবার ও ভূস্বামী ধ্বংস হয়ে যান, নতুন ভূস্বামী বা ব্যবসায়ী বিত্তবান আবির্ভূত হননি ; চাকুরির সুবিধা হারিয়ে মধ্যবিত্ত শ্রেণীও দুর্বল হয়ে পড়ে ; অনেকে বিত্তহীনের শ্রেণীভুক্ত হয়। কলিকাতায় গোটা তিনেক নবাব পরিবার ছিল, সেগুলির প্রধান আর্থিক উৎস ছিল সরকারপ্রদত্ত বার্ষিক বৃত্তি। গার্ডেনরিচের মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবার, টালিগঞ্জের মহীশূরের রাজপরিবার এবং মেটিয়াবুরুজের অযোধ্যার নবাব পরিবার সমাজের নেতৃত্ব দেননি। নবাবেরা বাঙালি ছিলেন না ; বাংলার সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার মনোভাবও তাঁদের ছিল না, সর্বভারতীয় মুসলিম জাতীয়তাবোধও তখন গড়ে ওঠেনি। তাঁরা বৃত্তির টাকায় প্রায় নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ভোগ-বিলাসে জীবনযাপন করেছেন। ঢাকার নবাব পরিবার ছিল উঠতি নব্য জমিদার ; তাঁরা অর্থের জোরে সমাজে প্রভাব বিস্তার করলেও সমাজের হিতের জন্য বেশি কাজ করেননি। অন্যান্য মুসলমান জমিদার ছিলেন ক্ষুদ্র ভূসম্পত্তির মালিক ; তাঁদের সম্পত্তি বাড়ানোর দিকে নজর ছিল না, বরং উড়ানোর দিকেই নজর ছিল। অতিরিক্ত অকর্মণ্যতা ও বিলাসিতার জন্য অনেকের জমিদারি ধ্বংস হয়ে যায়। যাঁরা নিজেরাই দায়িত্বশীল নন, তাঁরা সমাজকে জাগাবার দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। আর্থিক কারণে সাধারণ মানুষ না শিক্ষা লাভ করতে পেরেছে, না ব্যবসায়বৃত্তিতে অংশ নিতে পেরেছে। ফলে মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে ওঠেনি। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ কাল পর্যন্ত মুসলমান সমাজের অবস্থা ছিল এরূপই। তারপর কিছু কিছু লোক লেখাপড়া শিখে চাকুরীতে প্রবেশ করতে থাকেন ; ছোটখাট ব্যবসায়ে কিছু লোক নিয়োজিত ছিলেন ; এঁদের সমন্বয়ে ক্ষীণকায় নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। খুব স্বাভাবিকভাবে সমাজের দায়িত্ব তাঁদের উপর অর্পিত হয়। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৬৩) গঠন করে সেই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। তবে তিনি উঠতি মধ্যবিত্তের সাথে বেশি সংযোগ স্থাপন না করে, সামন্তশ্রেণীর অভিজাত পরিবারগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েন। যাঁদের 'ওল্ড এলিট' বা পুরানো বুদ্ধিজীবী বলে, তিনি তাঁদের সোসাইটির কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যভুক্ত করেন। ফলে সোসাইটির কার্যকলাপে তাঁদের চিন্তা ও স্বার্থের প্রতিফলন হয়। সোসাইটিতে তাঁদেরই ভাষা ও সংস্কৃতির চর্চা হয়। তাঁরা বৃহৎ বাংলার সাধারণ শ্রেণীর মানুষের ভালমন্দের কথা ভাবেননি। সৈয়দ আমীর আলী 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র (১৮৭৮) মাধ্যমে মধ্যবিত্তের 'নিউ এলিট' বা নব্য বুদ্ধিজীবী শ্রেণীকে সংঘবদ্ধ করেন। মফস্বল শহরে শাখা-এসোসিয়েশন খুলে এর কার্যক্ষমতা সম্প্রসারিত করা হয়। এসোসিয়েশনের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল। সম্পূর্ণভাবে ব্রিটিশ আনুগত্য মেনে নিয়ে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সুযোগ-সুবিধা আদায়ের দাবী এসোসিয়েশন প্রথম উত্থাপন করে। 'মুসলিম লীগ' (১৯০৬) আসার আগে পর্যন্ত সোসাইটি ও এসোসিয়েশন সমাজের যেটুকু করার করেছে। বলতে গেলে, উনিশ শতক পর্যন্ত ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত ও উঠতি মধ্যবিত্তের মিশ্র নেতৃত্ব ছিল ; কোন কোন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজকর্মে তাঁদের যৌথ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, যেমন স্কুল-মাদ্রাসা স্থাপন, প্রেস ও

পত্রিকা পরিচালনা, সভা-সমিতি গঠন ইত্যাদি। নতুন যুগের নতুন চেতনা ও উপলব্ধির সংঘাতে পুরাতন চিন্তাধারা ও মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটে। তার ফলে সামাজিক দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয়। সামাজিক সংকট ও দ্বন্দ্বগুলি কি, সে-সব নিরূপণ করা এবং সে-সবের সুষ্ঠু সামাধান দেওয়া নব্যপন্থীদের দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। এই দায়িত্ব পালনের সাফল্যের উপরে সমাজের বিকাশ ও পরিণতি নির্ভর করে। মুসলমান সমাজের কতক রীতিনীতি শাস্ত্র-সম্মত নয়, কতক প্রথা-পদ্ধতি যুগোপযোগী নয়—এই প্রশ্ন উঠেছে, রক্ষণশীল ও প্রগতিশীলদের মধ্যে বাদানুবাদ হয়েছে। সমাজের বর্তমান দুর্গতির কথা এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মনোভাব ও আচরণের কথা আলোচিত হয়েছে। সমাজের অবনতি ও বৈষম্য দূর করে কিভাবে সমাজের উন্নতি সাধন করা যায়, সে সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সমাজ-সংস্কার ও সমাজোন্নয়নের প্রয়াস থেকেই জেগে উঠেছে 'মুসলিম জাতীয়তাবাদ'।

শ্রেণীভেদ

ইসলাম সাম্যবাদ ও সৌভ্রাতৃত্বের নীতি প্রচার করলেও ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ পুরোপুরি সে শাস্ত্রনির্দেশ মেনে চলেনি। সমাজের রীতিনীতিতে কিছু কিছু দেশাচার থেকেই যায়। শুধু তাই নয়, কোন কোন ক্ষেত্রে দেশাচার শাস্ত্রাচার থেকেও প্রাধান্য পায়। সমাজে প্রচলিত 'আশরাফ' ও 'আতরাফ' এই ভেদনীতি দূরীভূত হয়নি। সৈয়দ, শেখ, মোঘল, পাঠান — এই চার শ্রেণীর মানুষ নিজেদের উচ্চ বংশজাত বলে মনে করতেন। তাঁরাই হলেন 'আশরাফ' বা অভিজাত শ্রেণী। এর বাইরে যারা আছে, তারা 'আতরাফ' বা অনভিজাত এবং 'আজলাফ' বা ছোটজাত শ্রেণী। সাধারণত ধর্মান্তরিত নিম্নশ্রেণীর ভারতীয় মুসলমাদের এ-শ্রেণীভুক্ত করা হয়।[২] উভয় শ্রেণীর সম্পর্কে আকাশ-পাতাল তফাৎ ছিল ; সামাজিক লেনদেন দূরের কথা, স্বাভাবিক মেলামেশাও ছিল না। বিদ্যাচর্চা ও সংস্কৃতিচর্চা শরীফ শ্রেণীর মধ্যে ছিল ; আতরাফ শ্রেণীর লোকেরা কায়িকশ্রমে কালাতিপাত করত, তাদের মধ্যে লেখাপড়ার রেওয়াজ ছিল না। সুতরাং ব্যবধান বেড়ে উভয়ের মধ্যে প্রভু-ভৃত্যের সম্পর্ক দাঁড়ায়। আবার আশরাফ শ্রেণীর মধ্যেও কৌলিন্যভেদ ছিল ; তাঁরা সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনে বাছবিচার করতেন এবং মেলামেশায় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতেন। হিন্দু সমাজের বর্ণভেদের যা দোষত্রুটি (অস্পৃশ্যতা, বিদ্বেষ, ঘৃণা, বঞ্চনা ইত্যাদি) তা ঐ শ্রেণীভেদেও প্রকটিত হয়েছে। মানবতার দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ছিল সমাজের ব্যাধি স্বরূপ। নবমূল্যায়নের সময় মুসলমান সমাজে জাতিভেদের নিন্দা করা হয়। সংস্কারকগণ একে শরিয়ত বিরোধী প্রথা বলে চিহ্নিত করেন এবং একটা কৃত্রিম বেড়া রচনা করে সমাজের গতি রুদ্ধ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন। বলা বাহুল্য, তাঁরা এ প্রথার বিলোপ কামনা করেছেন।

ইসলাম-প্রচারকে 'সমাজ কালিমা' নামে একটি প্রতিবেদনে বলা হয়, "কালক্রমে মুসলমানদিগের মধ্যেও জাত্যাভিমান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ...ভারতীয় মুসলমানগণ

২ প্রথম অধ্যায়ে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে।

হিন্দুদের নিকট হইতে অনেক আচার ব্যবহার ও ক্রিয়াকাণ্ড আয়ত্ত করিয়া লইয়াছেন। হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন 'কুলীন' আছেন, মুসলমানদিগের মধ্যেও সেইরূপ 'শরীফ' আছেন। আজকাল বঙ্গদেশের অনেক স্থলে এইরূপ শরীফদিগের অন্যায় ব্যবহার চরমে উঠেয়াছে। ... এই সকল হীনচেতা শরীফ মহোদয়গণ মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্য, নীচ শ্রেণীর মধ্যে কন্যা বিবাহ দিতে বা কৃষক শ্রেণীর লোকের কন্যা গ্রহণ করিবার সময় 'বিবাহের পণ' দাবী করিয়া বসেন। ত্রিশ-চল্লিশ টাকা হইতে দুশ-পাঁচশ বা হাজার টাকা পর্যন্ত একটি মেয়ে বা ছেলের দর হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবসায় মুসলমান ধর্মের সম্পূর্ণ বিরোধী।"[৩] বিশ শতকের দুই দশকে ঐ একই অভিযোগ করেছেন মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী। তিনি আল-এসলামে 'সমাজ-সংস্কার' প্রবন্ধে লিখেছেন, "শরিফ রজিল বা আশরাফ আতরাফের পার্থক্য বঙ্গদেশীয় মোসলমান সমাজে অত্যন্ত প্রবল। পূর্ববঙ্গের মধ্যে চট্টগ্রামে কেবল মাত্র বরাতের মজলিসে শরিফ বেশরিফ বলিয়া পার্থক্য করা হয়, এমন কি আসন গ্রহণের মতভেদ ও উচ্চ নীচ আসনের তারতম্য হেতু সময় সময় ২/১ দিন কেবল তর্ক বিতর্কেই কাটিয়া যায়। স্থান বিশেষে এই আসন গ্রহণের তর্কে আহার করাও হয় না, পরন্তু বিবাহ পর্যন্ত পণ্ড হইয়া যায়। ... পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদের অংশ বিশেষে শরীফতের দাবীদাওয়াটা খুব বেশী। তত্রত্য তথাকথিত শরিফগণ অশরিফগণকে কুকুর, শৃগাল হইতেও অধম বলিয়া জ্ঞান করে। ... উত্তর বঙ্গে 'বাদিয়া' 'নিকারী' ও আসামে 'মাটীয়া' উপাধি বিশিষ্ট মোসলমানগণ এক সঙ্গে অন্য মোসলমানের সহিত আহার করা দূরে থাকুক, এক মসজিদে, এক ঈদগাহ বা মাঠে নমাজ পড়িতেও পারে না। সালাম আদান-প্রদানের অধিকারীও নহে। ... মধ্যবঙ্গে নদীয়া, ২৪ পরগণা অঞ্চলে কোন নীচ জাতীয় হিন্দু মোসলমান হইলে তাহাকে সমাজে নেওয়া হয় না, জুমা জামাতে শরিক করা হয় না।"[৪] মীর মশাররফ হোসেন পিতামহের আমলে সমাজে প্রচলিত শ্রেণীভেদের উল্লেখ করে বলেছেন, " ... সে সময় উঠা বসা খাদ্য খাওয়া সম্বন্ধে বড়ই বাছ-বিচার ছিল। জাতীয় গৌরব, বংশ মর্যাদা ঘরানার গৌরব — বড়ই কঠিনভাবে সমাজে প্রচলিত ছিল।"[৫] মশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়াজ্জাম হোসেন বৃদ্ধ বয়সে জোলা শ্রেণীভুক্ত এক 'মলঙ্গ ফকীরে'র বিধবা কন্যাকে বিবাহ করেন, মেয়ে ছোট জাতের বলে মীর পরিবারে অশান্তি ও মনোমালিন্য দেখা দেয়। জাতবিচার ও অসম বিবাহ সম্পর্কে সেকালের লোকের মনোভাবের পরিচয় দিযে মশাররফ হোসেন লিখেছেন, "স্বসমাজ ভিন্ন অসমাজে বিবাহ হওয়া সে সময় বড়ই দোষের কথা ছিল। যদি এরূপ ঘটনা কার্য্যে দাঁড়াইত, তাহা হইলে সে — যে শ্রেণীর সেই শ্রেণীর সঙ্গে আহার বসা উঠা করিতে হইত। উচ্চ সমাজে কখনই মিশিতেও পারিত না। কেহ মিশিতেও ইচ্ছা করিত না।"[৬] আশরাফ-আতরাফ ভেদজ্ঞান সমাজ জীবনে কিরূপ ক্ষতির কারণ হয়েছে তার উপর আলোকপাত করে জনৈক প্রবন্ধকার লিখেছেন, "বাঙ্গালার মুসলমানের অধঃপতনের যতগুলি কারণ আছে তার মধ্যে 'আশরাফ-আতরাফ'কে একটা প্রধানতম

৩ *ইসলাম-প্রচারক*, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯
৪ *আল-এসলাম*, অগ্রহায়ণ ১৩২৬
৫ *আমার জীবনী*, পৃ. ১৫
৬ ঐ, পৃ. ৪৮

কারণ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই 'আশরাফ-আতরাফ' প্রভেদজ্ঞান ঘূণধরা বাঁশের মতই সমাজকে ভিতরে ভিতরে অসংখ্য ছিদ্র করিয়া চলিয়াছে, আর তার পরিণাম ফলে সমাজ ছত্রভঙ্গ হইয়া নানা শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িতেছে। আমাদের দেশের 'আশরাফ' মনে করে যে, নিজে মেহনত করিয়া উপার্জন করাটাই একটা হেয় কাজ। 'আশরাফ' নামধারী এই সমস্ত জীব এই ভেদনীতির সৃষ্টি করিয়া শুধু ইসলামকেই হেয় করিয়াছে তাহা নহে তাহারা খোদার আদেশকে ও হজরতের আদর্শকেও খর্ব করিতে ছাড়ে নাই।"[৭] এখানে শ্রেণীভেদ প্রথাকে 'সমাজের কালিমা' বলে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং তা প্রতিকারের সুরও উঠেছে। ইসলামে মানুষের সমমর্যাদাব স্বীকৃতি আছে ; এজন্য তাঁরা ধর্মকে সহজেই ব্যবহার করতে পেরেছেন।

পর্দা ও অবরোধ প্রথা

পর্দা ও অবরোধ প্রথা সমাজে নারীমুক্তির ও উন্নতির অন্তরায় এরূপ চেতনা থেকে এর বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়।[৮] আন্দোলনের অগ্রদূতী রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন। তিনি কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা পাননি, কিন্তু ইংরাজি শিক্ষিত ভ্রাতার কাছে আধুনিক শিক্ষার স্বাদ পান। তারপর নিজ চেষ্টায় জ্ঞানার্জন করেন। ভাগলপুর নিবাসী সাখাওয়াত হোসেনের (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) সহধর্মিনী হিসাবে স্বামীর সহায়তায় তাঁর জ্ঞানচর্চা প্রসারিত হয়। বিদ্যালয়ে শিক্ষা দূরের কথা, গৃহশিক্ষকের কাছে বাংলা শিক্ষা করায় জ্যেষ্ঠ ভগ্নী করিমুন্নেসা চৌধুরানী সমাজের পক্ষ থেকে কিরূপ বাধা পেয়েছিলেন, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তিনি বিবাহিত জীবনে অবরোধ প্রথার নিষ্ঠুর রূপটি উপলব্ধি করেন। পুরুষ-শাসিত সমাজে নারী অন্তঃপুরে ধর্মের নামে প্রায় বন্দীদশায় বাস করেন। বেগম রোকেয়া এটাকে সমাজের চাপিয়ে দেওয়া অবিচার বলেছেন। নারী বাইরের মুক্ত আলো-বাতাসে চলাফেরা করতে পারেন না বলে শারীরিক দিক থেকে ভগ্ন স্বাস্থ্যের অধিকারিণী হন, আবার মানসিক দিক থেকে পরিণতি লাভ করতে পারেন না। তাঁরা পরমুখাপেক্ষী ও পরনির্ভরশীল হয়ে জীবনপাত করেন। তিনি দেখলেন, স্বামীর অর্ধাঙ্গিনী হিসাবে সমাজে নারীরও করণীয় আছে। নারী ন্যায্য অধিকার পেলে চিন্তাশক্তি ও কর্মদক্ষতার দ্বারা সমাজের উন্নতিতে অংশগ্রহণ করতে পারেন। সমাজপতিদের এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি সেযুগের পত্র-পত্রিকায় অনেক মননশীল প্রবন্ধ লেখেন। তাঁর 'মতিচূর' (১মখণ্ড ১৯০৪) প্রবন্ধ গ্রন্থে এরই স্বাক্ষর আছে। পর্দা ও অবরোধ প্রথা দূর করে নারীমুক্তি আনতে হলে প্রথম দরকার নারীর আধুনিক শিক্ষা। শিক্ষার মাধ্যমে নারী ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটবে। শিক্ষা এবং তার সঙ্গে বাইরে কাজ করার সুযোগ পেলে নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা আসবে। তিনি 'পদ্মরাগ' উপন্যাসে এই অর্থনৈতিক স্বাধীনতাকে

৭ এ.এম. তোরাব আলী — 'আশরাফ-আতরাফ', *সওগাত*, শ্রবণ ১৩৩৫

৮ পর্দা প্রথা ও অববোধ প্রথা এক শ্রেণীর নয় : যথাবিধি পর্দা বা বোরখা পবিধান করে নাবী বাইবের সমাজে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেন ; অবরোধ প্রথার কঠোর নিয়ম — নারী কোন অবস্থাতে পুরুষ সমাজের মধ্যে বা বহির্জগতে আসতে পারেন না ; অসূর্যম্পশ্যা নারীর মতই তিনি গৃহে আজীবন বন্দিনী থাকেন।

নারীমুক্তির অন্যতম উপায় বলে নির্দেশ করেছেন। কলকাতায় 'সাখাওয়াত হোসেন মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল' (১৯১১) তাঁর উদ্যোগ ও উৎসাহের ফল। নারীশিক্ষা ও মুক্তির কথা বলতে গিয়ে তিনি সমাজের চক্ষে নিন্দার ভাগী হয়েছেন। তাঁর লেখার প্রতিবাদ হয়েছে। তিনি নবনূরে 'আমাদের অবনতি' নামে প্রবন্ধ লিখেন : বর্তমান সমাজে নারীর স্থান 'দাসীতুল্য' বলে অভিযোগ ও অনুশোচনা করেছেন। তিনি নারী সমাজকে জেগে ওঠার আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, "প্রথমে জাগিয়ে উঠা সহজ নহে, সমাজ গোলমাল বাধাইবে, ...ভারতবাসী মুসলমান আমাদের জন্য 'কৎল'-এর বিধান দিবেন, ... কিন্তু সমাজের কল্যাণ নিমিত্ত জাগিতে হইবেই।"[৯] তিনি নবনূরে 'বোরখা' 'অর্ধাঙ্গী' প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন যেখানে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার ছাপ আছে। তিনি বোরখা প্রবন্ধে কৃত্রিম পর্দার নবীকরণ চেয়েছেন। তিনি বলেছেন, "আমরা অন্যায় পর্দা ছাড়িয়া আবশ্যকীয় পর্দা রাখিব। প্রয়োজন হইলে অবগুণ্ঠনসহ মাঠে ময়দানে বেড়াইতে আমাদের আপত্তি নাই।"[১০] তাঁর লেখা নিয়ে সমাজে প্রতিক্রিয়া হয়। এস. এ. আল মুসভী 'অবনতি প্রসঙ্গ' প্রবন্ধে লিখেন, "নারী কখনও সমস্ত বিষয়ে পুরুষের সমতুল্য হইতে পারে না — তাহা হইলে স্বভাবের বিরুদ্ধাচরণ করা হইবে।"[১১] নওশের আলী খান ইউসফজয়ী 'একেই কি বলে অবনতি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে বলেন, "আপনারা স্বাধীন হউন ভাল কথা, কিন্তু স্বাধীনতার অপব্যবহার না করেন, ইহাই প্রার্থনীয়।"[১২] 'মিহির ও সুধাকরে' জনৈক লেখক উক্ত প্রবন্ধের বিরোধিতা করে মন্তব্য করেন, "তিনি উচ্চ শিক্ষার ফলে সনাতন মুসলমান ধর্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে যেরূপ ভ্রান্ত মত প্রকাশ করিয়াছেন তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করিলে ধর্মই একেবারে ভিত্তিশূন্য হইয়া পড়ে। তিনি ধর্মগ্রন্থগুলিকে মনুষ্য রচিত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ... তিনি যদি তাঁহার মত অভ্রান্ত মনে করেন, তবে জানিলাম তাঁহার দ্বারা এ পোড়া সমাজের বিন্দুমাত্র উপকার সাধিত হইবার আশা নাই। ... আমি বলি, যে শিক্ষায় ধর্মের প্রতি অনাস্থা জন্মে ও তাহার বন্ধন শিথিল করে, তাহার প্রচলন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।"[১৩]

ইসলাম-প্রচারকে 'অবরোধ-প্রথা' নিয়ে সম্ভবত প্রথম আলোচনার সূত্রপাত হয়। মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'অতীত কাহিনী' নামে একটি কবিতা ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশ করেন। ঐ কবিতার ৩০ স্তবকের পাদটীকায় কবি মন্তব্য করেন, "ভারতবর্ষে নানা জাতীয় বিধর্মীর বাস এবং স্ত্রীগণ অশিক্ষিতা, পুরুষগণও চরিত্রবিষয়ে মুসলমানোচিত নহে, তদ্ব্যতীত সর্বত্রই পাপদৃশ্য, কুৎসিত বাক্য, অশ্লীল সঙ্গীত, কুলটা লম্পট যুগের সাতিশয় আবির্ভাব। অধিকন্তু পরিচ্ছদ-আদিও মুসলমান সভ্যতানুযায়ী নহে।

৯ *নবনূর*, ভাদ্র ১৩১১
১০ *ঐ*, বৈশাখ ১৩১১, পৃ. ১৯
১১ ঐ , আশ্বিন ১৩১১
১২ ঐ, কার্তিক ১৩১১
১৩ *মিহির ও সুধাকর*, ১৪ আশ্বিন ১৩১১, পৃ. ৪-৫

এজন্য পর্দার একান্ত আবশ্যকতা পরিলক্ষিত হয়।"[১৪] পত্রিকার সম্পাদক কবির সহিত একমত হতে না পেরে 'অবরোধ প্রথা সম্বন্ধে আলোচনার প্রয়োজন' আছে বলে মন্তব্য করেন।[১৫]

শ্যামাসুন্দরী দেবী 'সাবিত্রী প্রবন্ধাবলী'তে 'বাল্যবিবাহ ও অবরোধ প্রথা' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ রচনা করলে ইসলাম-প্রচারকে তার প্রতিবাদে প্রবন্ধ লেখা হয়। শ্যামাসুন্দরী দেবী তাঁর প্রবন্ধে মুসলমান সমাজে প্রচলিত অবরোধ প্রথাকে 'কারাবাসে'র সাথে তুলনা করেন। আলাউদ্দীন আহমদ 'ইসলাম দর্শন' প্রবন্ধে এর প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন, "পরদার ব্যবস্থা কেবল এই অভিপ্রায়ে নহে যে, পবিত্রতা ও শুদ্ধচারিতা স্থাপিত হয়, বরং বংশগত মর্যাদা এবং গৃহকার্যের শৃঙ্খলা ইত্যাদি যাহা কেবল স্ত্রীলোকদের হস্তে ন্যস্ত থাকে ; তাহা তাহাদের গৃহে থাকায়, সাধিত হয়, ইহাও পর্দার অন্যতম উদ্দেশ্য। . . .এমন সুন্দর ও প্রশংসনীয় অবরোধপ্রথাকে কারাবাসের সহিত তুলনা করা সত্য ও ন্যায়ের মস্তকে পদাঘাত করা, . . .স্ত্রী-স্বাধীনতা ও স্ত্রী শিক্ষা বলিয়া যে চীৎকার করা হইতেছে এবং অবরোধ প্রথার বিরুদ্ধে যে নানা কথা প্রকাশ করা হইতেছে, তাহাকে পাগলের প্রলাপোক্তি ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?"[১৬]

১৯০৩ সালে দিল্লিতে 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে' খোজা সম্প্রদায়ের ধর্মীয় নেতা সুলতান মোহাম্মদ আগা খান সভাপতির ভাষণে পর্দাপ্রথা সমাজের পক্ষে 'অতিশয় অনিষ্টজনক' বলে উল্লেখ করেন। তাঁর এই বক্তব্যের প্রতিবাদে মোহাম্মদ করম চাঁদ একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, তাঁর প্রবন্ধের নাম 'হেজাবন্নেসা বা মোসলেম রমণীর পর্দা'। তিনি পর্দার পক্ষে ঐ প্রবন্ধে বলেন, 'হজরত মোহাম্মদের সময়ে, ইসলামানুমোদিত যেরূপ সরল ও তাঁহার উদার ভাবের অবরোধ প্রথা (হেজাবের) প্রচলন ছিল, বর্তমান যুগে তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ কঠিন ধরনের পর্দার যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কারণ এক্ষণে ধর্ম ও নীতিবিবর্জিত নাস্তিক ভাবের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার বিস্তার হওয়ায় সমাজবন্ধনও ক্রমান্বয়ে শিথিল হইয়া যাইতেছে।"[১৭] মোহাম্মদ করম চাঁদের প্রবন্ধের সমর্থনে পত্রিকার সম্পাদক রেয়াজুদ্দীন আহমদ লেখেন, "ভারতীয় মুসলমানদিগের মধ্যে পর্দার যে অতিরিক্ত বাঁধুনীটুকু আছে, যেটুকু না থাকিলে বর্তমান সময়ে এ বিধর্মী প্লাবিত দেশে, নাস্তিকতা ও স্বেচ্ছাচারিতার আমলে, মুসলমানদিগের ধর্ম ও সুনীতি রক্ষা করা কঠিন ব্যাপার . . সকল দেখিয়া শুনিয়া সকল বিষয়ে ভাবিয়া চিন্তিয়া আমরা ভারতীয় মুসলমানদিগের বর্তমান অবরোধ প্রথার সমর্থন করিতেছি।"[১৮] এস. এ. আল মুসভী, নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী, আলাউদ্দীন আহমদ, করম চাঁদ এবং মোহাম্মদ

---

১৪ *ইসলাম-প্রচারক*, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০০, পৃ. ৩৩
১৫ ঐ, পৃ. ৩৩
১৬ ঐ, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩, পৃ. ৮৮
১৭ ঐ, ৮ বর্ষ ১০ সংখ্যা ১৩১৪
১৮ ঐ, ৮ বর্ষ ১০ সংখ্যা ১৩১০

রেয়াজুদ্দীন আহমদ পর্দা প্রথা ও অবরোধ প্রথার সপক্ষে মত দিয়েছেন : যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সমাজবন্ধন অক্ষুণ্ন রাখার জন্য তাঁরা ঐ মত দিয়েছেন। তাঁদের দৃষ্টি ছিল রক্ষণশীল। স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে শ্যামাসুন্দরী দেবীর অভিমত নব্যশিক্ষিত কাজী ইমদাদুল হকও সমর্থন করেননি। তিনি 'হিন্দু নারীর মুসলমান ঘৃণা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে বলেন, "স্ত্রী-স্বাধীনতার কথা বলিতে গেলে শুধু রাস্তায় বাহির হইয়া পাউডার বিলোপিত মুখশ্রী এবং আঁটসাঁট অঙ্গরাখা দ্বারা কঠিনরূপে আবদ্ধ দেহযষ্টির ভঙ্গিমা দেখাইয়া বেড়ানই যে স্বাধীনতা কোন সূক্ষ্মদর্শী জ্ঞানী ব্যক্তি একথা মনেও করিবেন না।"[১৯] অবরোধ প্রথা লোপ তথা স্ত্রী-স্বাধীনতা সম্পর্কে বাদ-প্রতিবাদ বিশ দশক পর্যন্ত চলেছিল। ত্রিশ দশকের কাছাকাছি সময়ে 'মাসিক মোহাম্মদী' ও 'সওগাতে' পুরুষ লেখকগণ প্রথম পর্দাপ্রথা ও অবরোধ প্রথার বিপক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।[২০]

বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, তালাকপ্রথা ও বাঁদী প্রথা

পর্দা ও অবরোধ প্রথার মত বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিধবাবিবাহ, তালাকপ্রথা, বাঁদী প্রথা ইত্যাদি নারীকেন্দ্রিক সমস্যা। সতীদাহ রোধ বা বিধবাবিবাহ প্রচলন, গৌরীদান প্রথা ও কুলীনপ্রথার সংস্কার বিষয়ে হিন্দু সমাজকে বহু সংগ্রাম করতে হয়েছে। রামমোহন, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নেতা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেছেন। মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ কোন ধর্মগত সংস্কারের সঙ্গে জড়িত ছিল না। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে চারটি পর্যন্ত বিবাহ করা যায় বলে ইসলামে বিধান আছে।[২১] ভরণপোষণ ও নিরাপত্তার পূর্ণ নিশ্চয়তা না দিয়ে কোন ব্যক্তি একাধিক বিবাহ করতে পারেন না। সাবালক অর্থাৎ যৌবনপ্রাপ্ত হলে ছেলে-মেয়ে বিবাহের যোগ্য পাত্র-পাত্রী বিবেচিত হয়। বন্ধ্যাত্ব, সৌন্দর্যহীনতা, চরিত্রহীনতা, ভগ্নস্বাস্থ্য, উন্মাদগ্রস্ততা বা অন্য কোন কারণে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনোমালিন্য হলে যে-কোন পক্ষ বিবাহবিচ্ছেদ ঘটাতে পারেন। এটি 'তালাকপ্রথা' নামে পরিচিত। বিবাহের এসব নিয়মকানুন সম্বন্ধে ব্যবহারশাস্ত্রে পরিষ্কার নির্দেশ থাকলেও বাংলা তথা ভারতবর্ষের মুসলমান সমাজে শাস্ত্র বিরোধী কিছু রীতিনীতি পালিত হয়, যেগুলিকে দেশাচার বলা যায়। বহুবিবাহ ও তালাক প্রথার কঠোর নির্দেশ যথাযথ পালন না করে স্বেচ্ছাচারিতার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহ সংস্কার ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রভাব থেকে মুসলমান সমাজে এসেছে। মুসলমান সমাজের পক্ষে এগুলি একান্তভাবে কৃত্রিম সমস্যা ছিল, তথাপি

১৯ *নবনূর*, বৈশাখ ১৩১০

২০ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ ৯১, ৯৩

২১ পবিত্র কোরানে সূরা নেসার ২য় আয়াতে আছে, "তোমাদের যেরূপ অভিরুচি তদনুসারে দুই, তিন ও চারি নারীর পাণিগ্রহণ করিতে পার ; পরন্তু যদি অশঙ্কা কর যে, ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে বিবাহ করিবে।" ঐ সূরায় আরও বলা হয়েছে, "সকলের সহিত সমান ব্যবহার কর এবং কথোপকথনকালে সকলের সহিত সম্মানসূচক শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ।" *ইসলাম-প্রচারক*, জুলাই-আগস্ট ১৯০৩, পৃ. ২৭৭-৭৮

এসব বিধিনিষেধ সমাজ জীবনে কালো ছায়া ফেলেছিল। বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে বক্তব্য তুলে ধরেন মুনশী মেহেরুল্লা। 'বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার' (১৮৯৪) গ্রন্থে তিনি কয়েকজন বিধবা নারীর কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বৈধব্য জীবনের প্রতি ধিক্কার, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার চিত্র বর্ণনা করেছেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান উভয় সমাজের অভিশপ্ত এই রীতির প্রতি কটাক্ষ করেছেন। তাঁর মতে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি জেলার অনেক মুসলমান গৃহে বিধবাবিবাহ দেওয়া হয় না। বিধবাবিবাহ না হওয়ায় সমাজে ব্যভিচার বাড়ছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন ঐ গ্রন্থে।[২২] মোহাম্মদ কফিলউদ্দীন আহমদ 'তারাবতী–মনোহর' (১৮৯৬) উপন্যাসেও হিন্দু-মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহের সমস্যার কথা বলেন। তিনি উভয় সমাজে বিধবাবিবাহ প্রচলনের পক্ষে মত দিয়েছেন। মুনশী মেহেরুল্লাকে অনুসরণ করে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ কোহিনুরে 'মোসলেম সমাজ সংস্কার' নামে একটি প্রবন্ধ লিখেন। এতে তিনি মুসলমান সমাজে বিধবাবিবাহ দৃঢ়ভাবে শিকড় বিস্তার করেছে, সে-বিষয়ে ইঙ্গিত করেন।[২৩] তিনি লিখেছেন, "ইসলাম ধর্মের ব্যবস্থানুসারে 'বিধবাবিবাহ' একটি গুরুতর কর্তব্য কার্য। আমাদের প্রেরিত মহাপুরুষ স্বয়ং বিধবাবিবাহ করিয়া স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীকে এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ... পাঠকদিগের মধ্যে অনেকে শুনিয়া অবাক হইবেন যে, কলিকাতার পশ্চিম প্রান্ত প্রবাহিনী ভাগীরথীর পশ্চিমতট হইতে সুদূর পাঞ্জাব প্রদেশ পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডের অনেক স্থানেই মুসলমানদিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ প্রচলিত নাই। বাংলা দেশের মধ্যে বর্ধমান বিভাগস্থ কয়েকটি জেলাতেই উপরোক্তরূপ শাস্ত্রবিরুদ্ধ ঘৃণিত নিয়ম দৃঢ়রূপে প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। দেশাচার এমন একটি জিনিস যে, সহজে ইহার সুদৃঢ় প্রাকার ভগ্ন করা যায় না। এই হিন্দু প্রথাটি পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদিগের মধ্যে এরূপ বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে যে, অনেকে বিধবাবিবাহ দেওয়া বা বিধবাকে বিবাহ করা নিতান্ত অবজ্ঞাজনক কার্য মনে করেন।"[২৪] তিনি আরও বলেন যে পাঞ্জাব প্রদেশের 'জীবন্ত মুসলমানগণ' সভার আয়োজন করে ঐ প্রথার মূলোৎপাটন করতে সক্ষম হয়েছেন।

শেখ জমিরুদ্দীন ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশিত 'মুসলমান সমাজে স্ত্রী–জাতির প্রতি ভীষণ অত্যাচার' নামে একটি প্রবন্ধে বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, "সুবিশাল বঙ্গদেশে প্রায় তিন কোটি মুসলমানের বাস। এই তিন কোটি মুসলমানের মধ্যে প্রায় দশ পনের লক্ষ মুসলমানের কেহ দুই, কেহ তিন, কেহ বা চার

২২ মোহাম্মদ মেহেরুল্লা — *বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদ ভাণ্ডার*, যশোর, ১৩৭৫ (৭ সং), পৃ

২৩ ১৮৯১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, ঐ সময় বাংলার মুসলিম পরিবারে ৪ থেকে ২৯ বছর পর্যন্ত বিধবার সংখ্যা ছিল ১৭, ২১, ৩৯০।
Census Report of India, 1891, Vol-IV. (The Lower Province of Bengal), p.178

২৪ *কোহিনূর*, আষাঢ় ১৩০৫, পৃ. ২৬–২৭
উল্লেখযোগ্য যে, হজরত মহম্মদের ১৩ জন স্ত্রীর মধ্যে কেবল আয়েষার কুমারী অবস্থায় বিবাহ হয়, অন্যরা সবাই বিধবা ছিলেন।

বিবাহ করিয়া একজনকে বিবি ও অপরকে তাহার বাঁদী করিয়া অসহ্য যাতনা দিতেছে। কত সময়ে কত সরলা, অবলা বালা, কুলমহিলা নির্মম, অত্যাচারী পাষণ্ড স্বামীর অসহনীয় যাতনা ও কুলকলঙ্কিনী নরপিশাচিনী সতীনের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সহ্য করিতে না পারিয়া কেহ হলাহল পান, কেহ গলে রজ্জু, কেহ বা আফিং সেবন, কেহ বা অন্য উপায়ে আত্মহত্যা করিয়া অতি শোচনীয়ভাবে প্রাণ নিসর্জন দিতেছে। ... বর্তমান সময়ে মুসলমানগণ যে বহুবিবাহ করিয়া থাকেন, তাহা কেবল রিপু পূজার জন্য কেবল কামপ্রবৃত্তি পূর্ণ করিবার জন্য। ... বর্তমান বহুবিবাহে রাজনৈতিক উপকার কিছুই নাই ... দিন দিন ব্যয়াধিক্য বশতঃ দীনহীন কাঙ্গাল ও পথের ভিখারী হইতেছে। তাহারা অর্থাভাবে মূর্খ ও অসভ্য হইয়া সমাজের ঘোর পতন সাধন করিতেছে, তাহাদের দ্বারা সমাজ ও ধর্ম কলঙ্কিত হইতেছে।"[২৫]

কাজী ইমদাদুল হক নবনূরে 'বহুবিবাহ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লিখেন। তিনি বহুবিবাহ যে বাঁদীপ্রথার নামান্তর সে বিষয়ে ইঙ্গিত দেন। তিনি লিখেছেন, "সাধারণ (মুসলমান) সমাজে যে অদ্যাপি বহু বিবাহ প্রথা বর্তমান রহিয়াছে, তাহার উৎপত্তি শাস্ত্রবিধান নহে। শাস্ত্রবিধান সমূহের বিকৃত অর্থকারী একদল স্বার্থপর পুরুষানুক্রমিক পুরোহিত ধর্মের নামে সমাজে প্রতিপত্তি স্থাপন করিয়া বহুকালাবধি আপন স্বার্থ সিদ্ধ করিয়া আসিতেছেন। ... আমাদের সমাজে যে বাঁদী প্রথার উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা একমাত্র তাঁহাদেরই সৃষ্টি, এবং যে বহু বিবাহের অযথা প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহাও তাঁহাদের স্বার্থ সমুদ্ভূত। ... ইউরোপের অনুকরণে এক-বিবাহ প্রথা কঠোর অনুশাসনের দ্বারা আমাদের সমাজে বিধিবদ্ধ না করিলে আমাদের আর উদ্ধারের আশা নাই।"[২৬] 'তালাকপ্রথা'র অপব্যবহার করে সমাজে নারীর প্রতি অবিচার করা হয়, সে সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে মোহাম্মদ করম চাঁদ লেখেন, "আধুনিক মুসলমানদিগের মধ্যে স্ত্রী এক প্রকার অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে বলিলেও হয়। ... অধিকাংশ স্থলেই ইন্দ্রিয় সুখ সম্ভোগের নিমিত্ত এইরূপ কুরীতি অবলম্বন করিয়া থাকে অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়। এই সকল ঘৃণিত ঘটনা অধিক পরিমাণে নিম্নশ্রেণী বা মধ্যবিত্ত অশিক্ষিত বা অজ্ঞ মুসলমানদিগের মধ্যে ঘটিয়া থাকে। ... কিন্তু এরূপ কুরীতি যে ইসলাম ধর্ম বিরুদ্ধ বা কোরান, হাদিস ও ফেকা শাস্ত্র বহির্ভূত, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।"[২৭]

'বাল্যবিবাহের' কুফল ছিল অধিক। হিন্দু-মুসলমান উভয় সমাজে এ রীতির প্রচলন ছিল। সমাজে নানা ভাবে এর কুফল ফলত। কলিকাতায় 'হরিমোহন-ফুলমণি' নবদম্পতির একটি ঘটনা ঘটে, অপরিণত বয়সে বিবাহ ও স্বামী সহবাসের ফলে ফুলমণির মৃত্যু হয়। ঘটনাটি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্যার এণ্ড্রু স্কোবল সরকারের পক্ষ থেকে 'এজ .অব কনসেন্ট এ্যাকট' বা 'সহবাস সম্মতি আইন' প্রথমে বিল-আকারে উত্থাপন

২৫ *ইসলাম-প্রচারক*, জুলাই-আগস্ট ১৯০৩, পৃ. ১৮১-৮৫
২৬ *নবনূর*, অগ্রহায়ণ ১৩১২, পৃ. ৩৪২-৪৩
২৭ *মোহাম্মদ কে. চাঁদ — 'তালাক বা মোসলেম স্ত্রী বর্জন'*, *ইসলাম-প্রচারক*, ৮ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ১৩১৪

করেন (জানুয়ারি ১৮৯১), পরে এটি আইনে পরিণত হয় (মার্চ ১৮৯১)। এতে ১২ বছরের পূর্বে স্ত্রীর সঙ্গে স্বামী সহবাস করলে ধর্ষণের অভিযোগে দণ্ডিত হবে। হিন্দু-মুসলমান উভয় ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য ছিল। কলিকাতায় এর প্রতিক্রিয়া কম হয়, কিন্তু ঢাকায় এর বিরুদ্ধে বেশ আন্দোলন হয়। ঢাকার জগন্নাথ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আর 'ঢাকা প্রকাশ' তাঁর মত প্রচারের বাহন হয়। তিনি একাধিক সভা করে সহবাস-সম্মতি আইনের বিপক্ষে বক্তৃতা দিয়ে জনমত সৃষ্টির চেষ্টা করেন। তিনি মৌলভী-মোল্লাদেরও সমর্থন লাভ করেন। তাঁদের প্রধান বক্তব্য ছিল : উক্ত আইনের ফলে নারীর পর্দানশীলতা ও মান-সম্ভ্রমের হানি হবে। শত্রুভাবাপন্ন লোকেরা আইনের আশ্রয় নিয়ে অত্যাচার ও অপদস্থ করার সুযোগ পাবে।[২৮]

সিরাজগঞ্জের মোহাম্মদ মেহেরুল্লা 'বাল্যবিবাহের বিষময় ফল' (১৯০৯) নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তিনি বাল্যবিবাহের বিষময় পরিণতির কথা উল্লেখ করে ঐ প্রথার অবসান কামনা করেছেন।

মশাররফ হোসেন 'আমার জীবনী'তে 'দাসী-বাঁদী'র উল্লেখ করেছেন ; বাল্যকালে তিনি নিজ পরিবারে ত্রিশ-বত্রিশ জন দাসী-বাঁদী দেখেছেন, যাদের অনেককে রংপুর থেকে ক্রয় করে আনা হয়েছিল। 'উদাসীন পথিকের মনের কথা'য় দাসী-বাঁদীর ক্রয়-বিক্রয়ের উল্লেখ আছে। অনেক সময় বাঁদীরা গৃহস্বামীর উপপত্নী রূপে ব্যবহৃত হত। বাঁদী-পুত্র 'গোলাম' বা গৃহভৃত্যের কাজ করত।[২৯] পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে মুসলমান সমাজের 'বান্দীপ্রথা'র নিন্দা করেছেন।[৩০] আফতাবউদ্দীন আহমদ বলেছেন যে, বান্দীপ্রথা শাস্ত্রানুমোদিত কোন রীতি নয়, ধনীরা নিজগৃহে অসংখ্য দাসদাসী রাখেন, এটি তারই ফল।[৩১]

সমাজের অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় চিন্তা

পলাশী যুদ্ধে পরাজয়ের পর মুসলমানরা শাসক শ্রেণী থেকে শাসিত শ্রেণীতে পরিণত হয়। রাজনীতির সহিত যাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন, তাঁদের পতন সঙ্গে সঙ্গেই হয়, যেমন নবাব, উচ্চপদস্থ কর্মচারী, সামরিক বাহিনীর লোক ইত্যাদি। সাধারণ কর্মচারী, জমিদার, নিষ্কর সম্পত্তির মালিকগণ এবং শিক্ষিত শ্রেণীর পতন ক্রমান্বয় সম্পন্ন হয়। সূর্যাস্ত আইন, পাঁচশালা-দশশালা আইন, চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ইত্যাদি রাজস্ব নীতির ফলে বনেদি মুসলমানরা জমিদারি হারাতে থাকেন, নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইনের ফলে ছোটখাট

২৮ পরবর্তীকালে ত্রিশ দশক পর্যন্ত এ নিয়ে বাদবিতণ্ডা চলে। 'ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা' কর্তৃক ১ এপ্রিল ১৯৩০ 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন' পাশ হয়। ছেলের ১৮ বছর ও মেয়ের ১৪ বছরের কমে বিবাহ দিলে আইনত দণ্ডনীয় হবে বলে ঐ আইনে ঘোষণা করা হয়। এটি 'স্যারদার সর্দা আইন ' নামে খ্যাত।

২৯ *মীর মোশারফের গদ্য রচনা*, পৃ. ১৫৭-৫৮

৩০ *ভারতী*, শ্রাবণ ১৩১০

৩১ *নবনূর*, পৌষ ১৩১০

অসংখ্য ধর্মসেবক ও বুদ্ধিজীবীর আয়ের উৎস বন্ধ হয়। রাজভাষা হিসাবে ফারসি রহিত হয়ে ইংরাজি প্রচলন হলে রাজস্ব, বিচার ও শিক্ষা বিভাগে যাঁরা কর্মরত ছিলেন, তাদের ভাগ্যে অন্ধকার নেমে আসে। কলিকাতা শহরের নব্য বিত্তবানরা জমিদারি কিনে ভূস্বামী হন এবং ইংরাজি শিক্ষিত শ্রেণী সরকারি চাকুরিতে প্রবেশ করে আমলাশ্রেণী গড়ে তোলেন। উভয় ক্ষেত্রে বাঙালি হিন্দুগণ সুবিধা করেন। ব্যবসায়-বাণিজ্যেও তাঁদের প্রাধান্য বজায় থেকে। ক্ষেত-খামারে চাষবাস ও অন্যান্য কায়িকশ্রম দ্বারা জীবিকা অর্জন ছাড়া মুসলমানদের আর উপায় ছিল না। অর্থাৎ তারা বিত্তহীন শ্রমিক শ্রেণীতে পরিণত হয়। বণিক শাসনের প্রথম একশো বছরের মধ্যে একাজটি সম্পন্ন হয়। উইলিয়ম উইলসন হানটার এরূপ অবস্থার কথা বিশ্লেষণ করেই 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস' (১৮৭১) গ্রন্থে মন্তব্য করেছিলেন যে, একশো বছর আগে কোন মুসলমান ভদ্র পরিবার দরিদ্র ছিল একথা ভাবা যেত না, এখন তার ধনী হিসাবে টিকে থাকা সম্পূর্ণ দায় হয়ে উঠেছে।

উনিশ শতকের চরম দুর্যোগ ও দুর্ভোগ,[৩২] অজস্র বাধাবিপত্তির স্তূপ ঠেলে, মুসলমান সমাজকে জাগতে হয়েছে। ক্ষমতার শীর্ষে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী ; তাঁরা দণ্ড-মুণ্ডের মালিক, তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর নির্ভর করছে জাতির উন্নতি-অবনতি। বিদেশী শাসকের অধীনে সুখ-দুঃখের সমভাগী হিন্দু সম্প্রদায়ের একাংশ কিছুটা নিজেদের চেষ্টায়, কিছুটা শাসক শ্রেণীর শুভদৃষ্টিতে সুবিধা লাভ করে উপরে উঠে এসেছেন, তারা নবচেতনায়, নব-আদর্শে, নব শিক্ষায়, নব অর্থনীতিতে একটি শক্তিশালী মধ্যবিত্তশ্রেণী গড়ে তুলেছেন ; তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে জীবনে ও জীবিকায় টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়েছে। এর সঙ্গে আছে নিজ সম্প্রদায়ের মধ্যে নানা প্রকার দ্বন্দ্ব-কলহ, ভ্রান্তি-মোহ, জড়তা-জটিলতা, আশঙ্কা-সন্দেহ। অর্থাৎ সমাজের অবস্থা দাঁড়িয়েছে ত্রিশঙ্কুর মুখে। সুতরাং যাঁরা সমাজের কথা ভেবেছেন, তাঁরা সমাজের এই অবনতির ও অধঃপতনের কথাই বলেছেন, তাঁদের প্রথম ও প্রধান দায়িত্ব হয়েছে সমাজ জীবনের পাশ্চাদপদতার দিকগুলি নির্ণয় করা এবং সেগুলি নিরসনের উপায় নির্ধারণ করা। সমাজসেবী, চিন্তাবিদ ও লেখকদের কর্মের ও মননের একটা বড় অংশে সমাজের এই সমস্যা স্থান পেয়েছে। আব্দুল লতিফ চেয়েছেন ইংরাজি শিক্ষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যার প্রসার, আমীর আলী চেয়েছেন ইংরাজি বিদ্যা ও রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার, সৈয়দ শামসুল হোদা, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, মীর্জা সুজাত আলী বেগ চেয়েছেন আধুনিক শিক্ষার সাথে কারিগরি শিক্ষার বিস্তার, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, মীর মশাররফ হোসেন, মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলল করিম চেয়েছেন মাতৃভাষা বাংলার প্রচলন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, শেখ আবদুর রহিম, সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী চেয়েছেন ইসলামী ঐতিহ্যের বিকাশ, মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মুনশী মেহেরুল্লা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান চেয়েছেন ধর্মশিক্ষা ও নৈতিক শিক্ষার উন্নতি, দেলওয়ার হোসেন আহম্মদ, কাজী ইমদাদুল হক, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন চেয়েছেন

৩২ ব্রাডলি বার্ট বলেছেন, এ সময় মুসলমান সমাজ 'অবনতি ও অবক্ষয়ের গভীরতম স্তরে' পৌছেছিল। *Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century*, p.11

প্রচলিত রীতিনীতির সংস্কার সাধন করে সমাজের মুক্তি। তাঁদের সবার লক্ষ্য ছিল দারিদ্র্য, অশিক্ষা, লাঞ্ছনা ও অবমাননার হাত থেকে সমাজকে রক্ষা করা এবং সমাজের মানুষকে মুক্তি ও উন্নতির পথের সন্ধান দেওয়া।

হান্টারের মতে বাংলার মুসলমানদের অবনতির কারণ ছিল নিম্নরূপ :

ক. রাজ্য হারিয়ে মুসলমানরা সকল প্রকার রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে ; এর পিছনে ব্রিটিশ সরকারের নীতি কাজ করেছে।

খ. শাসকশ্রেণী হিসাবে নিষ্ফল অহংকার, যার ফলে পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে খাপ-খাওয়াতে পারেনি।

গ. রাজভাষা ইংরাজি শিক্ষা না করায় তারা সরকারি সওদাগরি চাকরির সুযোগ হারিয়েছে।

ঘ. ধনীদের কাছে থেকে উৎকোচ, ভেট, অত্যধিক কর নিয়ে ইংরাজরা মূলধন আত্মসাৎ করেছেন। ফলে তারা দরিদ্র-দশায় পতিত হয়েছে।

ঙ. প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়ে বাঙালি হিন্দুদের কাছে পরাজিত হয়েছে।

চ. জনশিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মশিক্ষার স্থান না থাকায় তারা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়েছে।[৩৩]

সৈয়দ আমীর আলী 'স্মারকপত্রে' (১৮৮২) বলেছেন, ইংরাজ কোম্পানির দেওয়ানি লাভের পরেও কিছুকাল রাজনৈতিক মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল বটে, কিন্তু লর্ড কর্নওয়ালিশের রাজস্বনীতি ও লড বেন্টিঙ্কের শাসননীতির ফলে ভূসম্পত্তি, রাজস্ববিভাগ ও বিচার বিভাগের চাকুরি থেকে বঞ্চিত হয়ে মুসলমান সম্প্রদায় চরম দারিদ্র্যের মধ্যে পতিত হয়। একাধারে দারিদ্র্য ও অন্যধারে সরকারের শিক্ষানীতির ফলে মুসলমানরা আধুনিক শিক্ষা গ্রহণে ব্যর্থ হয়। ফারসি রহিত করা হয় বটে, কিন্তু ইংরোজি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়নি। ১৮৬৪ সাল পর্যন্ত মুন্সেফগিরি ও উকিলগিরি পরীক্ষা উর্দু অথবা ইংরাজিতে দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ফলে ইংরাজি শিক্ষার তাগিদ কমই ছিল। ইংরাজি ভাষা ও আধুনিক শিক্ষার অভাবে চাকুরির ক্ষেত্রে অন্য সম্প্রদায়ের সহিত প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি তারা ; কোন কোন ক্ষেত্রে যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আমলাদের ষড়যন্ত্রের ফলে চাকুরি লাভে বঞ্চিত হয়।[৩৪]

খোন্দকার ফজলে রাব্বি 'দি অরিজিন অব মহামেডানস অব বেঙ্গল' (১৮৯৫) গ্রন্থে মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন যে, ইংরাজি ভাষার প্রবর্তন ও সেই ভাষার বিরুদ্ধে অন্ধভাবে পোষিত মুসলমানদের কুসংস্কার এবং সরকারি চাকুরির নতুন বিবিধব্যবস্থায় পূর্বের পদমর্যাদা থেকে অপসারণের ফলে তারা দারিদ্র্য ও বিস্মৃতির গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে।[৩৫]

৩৩ *The Indian Mussalmans*, See chapter 4.
৩৪ *Memorial of the National Mahomedan Association*, Calcutta, 1882.
৩৫ *The Origin of Mahomedans of Bengal*, Calcutta, 1895

'মোসলেম ক্রনিকলে' জনৈক প্রবন্ধলেখক মুসলমানদের পতনের কারণ ব্যাখ্যা করেন এভাবে :

ক. মুসলমানরা রাজ্য হারিয়ে 'ভাববাদী' হয়ে ওঠে, তারা অতীতের ঐতিহ্যের দিকে তাকিয়ে থাকত এবং গৌরবের কথা ভেবে দুঃখ প্রকাশ করত ; ইংরাজদের প্রভু বলে স্বীকার করতে পারেনি, ফলে যুগের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে দেরি হয়ে যায়।

খ. চাকুরি-বাকরী হারিয়ে যারা কৃষিকার্য গ্রহণ করেছিল, তারা অদক্ষতার কারণে কৃষিতে উন্নতি করতে পারেনি।

গ. অর্থকরী ব্যবসায়ে তারা অমনোযোগী ছিল। সুদের ব্যবসায় 'হারাম' (নিষিদ্ধ) বলে মহাজনী করতে বিরত হয়।

ঘ. বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার জন্য গরীব হয়ে পড়ে।

ঙ. ইউরোপীয় বিদ্যা ও বিজ্ঞান শিক্ষা সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ছিল, ফলে আধুনিক শিক্ষা থেকে দূরে থেকে দুর্ভাগ্যকে ডেকে আনে।

চ. সুবিধাপ্রাপ্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের কাছ থেকে সহানুভূতি লাভে ব্যর্থ হয়েছে।[৩৬]

দেলওয়ার হোসেন আহমদ 'ল অব সাকসেশন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মুসলমানের উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বণ্টনের ফলে সমাজ দরিদ্রে পরিণত হয় বলে উল্লেখ করেন এবং ঐ আইনের সংশোধনের পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেন। একিনুদ্দীন আহমদ ও কতিপয় লেখক ঐ মতের বিরোধিতা করেন এবং সম্পত্তি বাড়াতে না পারা মানুষেরই অক্ষমতা — এই যুক্তিতে শাস্ত্রীয় আইনের অভ্রান্ততা প্রতিপন্ন করেন।[৩৭]

'হিন্দু মোসলমান' (১৮৮৮) পুস্তকে শেখ আবদোস সোবহান বাংলার মুসলমান জমিদারদের পতনের কারণ হিসেবে তাঁদের বিলাসিতা, ভোগলিপ্সা, দায়িত্বহীনতা ও শিক্ষার প্রতি অমনোযোগিতার কথা বলেছেন। আমলার উপর জমিদারির দায়িত্ব দিয়ে মোসাহেব-চাটুকার পরিবৃত হয়ে বাইজী-বেশ্যা-খেমটা, গাচ-গানে অথবা মোরগ-লড়াই, কবুতর উড়ান ইত্যাদি কুক্রীড়ায় কালাতিপাত করেন। তাঁরা আধুনিক শিক্ষা ও যুগের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন। তাঁদের অযোগ্যতার ও অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে অসৎ আমলারা জমিদারি উৎসন্নে দেয়। তিনি মুসলমান জমিদারদের উপদেশ দিয়ে বলেছেন, "এখনও কি বিলাস করিবার আমিরি করিবার দিবারাত্রি পড়িয়া পড়িয়া নিদ্রা যাইবার সময় আছে? ... মোরগ লড়াই কবুতর উড়ান ইত্যাদি কুক্রীড়া সকল ত্যাগ করুন। জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইবে, বুঝিতে পারিবেন, আপনি এত ঋণী কেন। ... গাঁজা, আফিম, মদ, বেশ্যা যদি কিছু অভ্যাস করিয়া থাকেন, শীঘ্র শীঘ্র ত্যাগ করিয়া, বিষয় কার্য্যে মন দিউন, অশিক্ষিত মূর্খ মদ্যপায়ী, বিলাসী, লম্পট, মোসাহেব ইয়ার, পূর্ণ অসভ্য, পূর্ণ চাষা,

৩৬ *The Moslem Chronicle*, 23 May 1896 (Supplementary).
৩৭ ঐ।

খানসামা, খেদমতগার লাঠিয়াল ত্যাগ করুন। কুলোকের সংসর্গে আলাপে মস্তিষ্ক বিগড়াইয়া যায়। ... পরিশ্রম করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব বাঙ্গালা শিক্ষা করুন এবং পরিবারস্থ ছেলে-পিলেদিগকে জাতীয় বিদ্যা এবং রাজভাষার (ইংরাজির) সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালা শিক্ষা দিউন।"[৩৮] নওশের আলী খান ইউসফজয়ী 'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯০) গ্রন্থে বাংলার মুসলমান জমিদারদের অকর্মণ্যতা, ভোগবিলাসিতা, আভিজাত্যগর্ব ও শিক্ষাবিমুখতার কথা উল্লেখ করে তাঁদের পতনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। এর সঙ্গে জমিদারদের অনুগ্রহভাজন, করুণাপ্রার্থী, ব্যক্তিত্বহীন 'মোসাহেব' শ্রেণীকেও কটাক্ষ করেছেন। এরা কৃষকের শ্রমোপার্জিত অন্নে ভাগ বসায়, কিন্তু প্রতিদানে সমাজকে কিছুই দেয় না।[৩৯]

ইসলাম-প্রচারকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজের বর্তমান অবনতির কথা বলা হয় এবং তৎসঙ্গে উন্নতির উপায় সম্পর্কে মতামত দেওয়া হয়। 'জাতীয় উন্নতি বিধানের উপায়' (সম্পাদক), 'মুসলমান জাতির অবস্থা' (ইসমাইল হোসেন শিরাজী), 'আমাদের কর্তব্য' (আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ), 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব' (সৈয়দ এমদাদ আলী), উন্নতির উপায় কি?' (শেখ ফজলল করিম), 'আমাদের কি করা উচিত?' (এবনে মাআঁজ), 'আমাদের অধঃপতন' (সম্পাদক ও মোজাম্মেল হক) ইত্যাদি রচনায় এ-বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলেছেন, বাঙালি মুসলমান রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাহিত্যিক সকল ক্ষেত্রেই পশ্চাদপদ। ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভেদ, দূরত্ব এবং সহানুভূতিহীনতার জন্য সমাজের দুর্গতি বাড়ছে। তিনি বলেছেন, "আমাদের একজন আত্মীয় দৈববশে দরিদ্রদশা প্রাপ্ত হইলে, তাহাকে নিজ চেষ্টার উপর নির্ভর না করিলে কোন রূপেই চলে না ; কাজে কাজেই তাহাকে কোন হীনবৃত্তি অথবা সর্বশেষ সম্বল ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে হয়।"[৪০] ঐক্য ও সহযোগিতা দ্বারা কার্যোদ্ধার সম্ভব — "আমাদের সকলের ক্ষমতা একক হিসাবে সামান্য হউক না কেন, একত্রীভূত হইলে তদ্দ্বারা মহৎ কার্যের সমাধানও সহজ হইবে।"[৪১]

সৈয়দ এমদাদ আলী আদর্শবান নেতার অভাব, সমাজের মানুষের অজ্ঞানতা ও অশিক্ষা, ধর্মহীনতা, ভোগাসক্তি, অন্তর্বিবাদ ইত্যাদিকে মুসলমান সমাজের অধঃপতনের কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। "বাঙ্গালার জলবায়ু, মুসলমান জাতির হৃদয়ে তেজ হরণ পূর্বক তাহাদের একতার বন্ধন ছিন্ন এবং ধর্মভাব শিথিল করিয়া দিয়াছিল, তাই তাহাদের পতন হইয়াছে।"[৪২] 'বাঙ্গালী মুসলমানগণ পারেন অন্যায় বিবাদ বিসম্বাদে প্রমত্ত হইয়া আদালতের দ্বারে অর্থের অঞ্জলি দিয়া নিঃস্ব হইতে, তাঁহারা পারেন মূর্খতা ও অজ্ঞানতাকে প্রিয় সাথী করিয়া দুর্বহ জীবনকে আরও দুর্বহ করিতে। শিক্ষার অভাবে তাহারা দিন দিন পশুর অধম হইয়া যাইতেছে।"[৪৩] তাঁর মতে, সমাজের অবনতির গতিরোধ করার একমাত্র

৩৮ *হিন্দু মোসলমান*, পৃ. ৭৮-৯৭
৩৯ *বঙ্গীয় মুসলমান*, পৃ. ৬-৮, ২৪-২৫
৪০ *ইসলাম-প্রচারক*, জুলাই-আগস্ট ১৯০৩
৪১ *ইসলাম-প্রচারক*, জুলাই-আগস্ট ১৯০৩
৪২ ঐ, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩
৪৩ ঐ

উপায় যোগ্য ও আদর্শবান নেতার নেতৃত্ব — "প্রকৃত নেতার অভ্যুদয় ব্যতীত কোনও পতিত জাতির বা সমাজের উন্নতি হইতে পারেনা?"[৪৪] সৈয়দ ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'বিলাপ' নামে একটি কবিতায় বিশ্ব মুসলিম সমাজের যে অধঃপতনের চিত্র তুলে ধরেছেন, তা বাংলার মুসলমান সমাজ সম্পর্কে প্রযোজ্য ; তাঁর মতে, দারিদ্র্য, অনৈক্য ও অন্তর্কলহ, রিপুপূজা, মূর্খতা, ধর্মহীনতা, অকর্মণ্যতা, নেতৃত্বের অভাব, পরাধীনতা, নীতিহীনতা ও হীনমন্যতা বোধ সমাজকে ধ্বংসের পথে নিয়ে গেছে। এগুলি দূর করতে না পারলে সমাজের উন্নতি অসম্ভব।[৪৫] 'মোল্লা-চিত্র' নামক একটি কবিতায় ইসমাইল হোসেন শিরাজী বাংলার মোল্লাকুলকে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন। তিনি কবিতার 'পাদটীকা'য় বলেছেন, "মাদ্রাসাসমূহের অপূর্ব শিক্ষাপ্রাপ্ত বর্তমান যুগের অনুপযুক্ত মৌলবীগণ, গ্রাম্য ভুয়া উপাধিধারী নকল মৌলবী ও মোল্লাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই এই চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।"[৪৬] তিনি তাঁদের ধর্মান্ধ, অজ্ঞানী, প্রবঞ্চক, কলহপরায়ণ, পরবিদ্বেষী, প্রতিক্রিয়াশীল বলে উল্লেখ করেছেন। মোল্লাশ্রেণীচরিত্রের প্রতি কটাক্ষ করে কাজী ইমদাদুল হক একটি প্রবন্ধে বলেন, "ইসলামের মূলতত্ত্বগুলির সরল অর্থ আজকাল শিক্ষার অভাবে আর কাহারো বোধগম্য হয় না। তাই 'ফতওয়া' ও মসলাতলবে'র এত ছড়াছড়ি। মূলধর্ম এই সকল মসলার ও দপ্তরবাহী ছাত্র পরিবেষ্টিত বিপথ পরিচালক মসলা প্রদানকারী মুসল্লিগণের গোলক ধাঁধার মধ্যে হারাইয়া গিয়াছে তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়াই দুষ্কর।"[৪৭]

সমাজে যোগ্য ব্যক্তির অভাব কায়কোবাদ অনুভব করেছিলেন। 'মহাশ্মশান (১৯০৪) উৎসর্গ করবেন, এমন বিজ্ঞজন বা শ্রদ্ধার পাত্র তিনি খুঁজে পাননি। তিনি লিখেছেন, "এই সুবিশাল বঙ্গভূমির যেদিকেই চক্ষু সঞ্চালন করি, সেই দিকে সেই একই দৃশ্য। — সকলেই নিজকে নিজে লইয়া ব্যস্ত ; কেহই পরের দিকে — পরের অশ্রুসিক্ত মলিন মুখের দিকে একবার ফিরিয়াও চাহে না, দেখিয়াও দেখে না, সেই হা-হুতাশপূর্ণ কণ্ঠস্বর শুনিয়াও শোনে না। হায়, দেখিয়া আমার এই ক্ষুদ্র হৃদয়খানি নিরাশার তীব্র নিষ্পেষণে শতধা চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গেল, কিন্তু একটি লোকও আমার মনের মত মিলিল না। দুঃখ হইল, ঘৃণা জন্মিল বাঙ্গালী জন্মে ধিক্কার দিয়া আমার এই ভগ্ন হৃদয় শান্তি লাভ করিল।"[৪৮]

"পতিত মুসলমান নামটা আমরা অনেকদিন হইতেই পাইয়াছি। কবির কাব্যে, বক্তার গলাবাজিতে, লেখকের মসীলেপনের আড়ম্বরে ; এবং সমাজের সাধারণ অবস্থা পর্যালোচনা করিতে করিতে ধারণাটাও জমিয়া গিয়াছে। কিন্তু কথা হইতেছে — এ 'পতিত' নামটা আর কতদিন থাকিবে?"[৪৯] শেখ ফজলল করিম-এরূপ প্রশ্ন তুলে সমাজের উন্নতির উপায় অনুসন্ধান করেছেন। তিনি বলেছেন, "শিক্ষার অভাবে লোকের রুচি, সভ্যতা ও

৪৪ ঐ
৪৫ ঐ, জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি ১৯০৩
৪৬ ঐ, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১
৪৭ *নবনূর*, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০
৪৮ কায়কোবাদ রচিত মহাশ্মশান কাব্যের 'উৎসর্গপত্র' দ্রষ্টব্য। উল্লেখযোগ্য যে, তিনি কাব্যখানির ১ম খণ্ড 'ধনবাড়ীর প্রসিদ্ধ জমিদার সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী'কে উৎসর্গ করেন।
৪৯ *ইসলাম-প্রচারক*, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩

অবস্থা এত অধোগামী হইয়াছে যে, আমরা এই দেশের সিংহাসন হইতে নামিয়া এই দেশেই মজুরি খাটিতেছি। যতদূর বুঝা যায়, তাহাতে অশিক্ষা, ধর্মহীনতা ও আদর্শের অভাবে আমাদের এই কুফল ফলিয়াছে।"[৫০] সমাজে যা আছে, তা খল-নেতৃত্ব, তিনি সৎ নেতার নেতৃত্ব চান — "আমবা অকূল সমুদ্রের মধ্যে কর্ণধারহীন জীবন-তরীর অলক্ষ্য পরিচালনা করিতেছি। আমাদের অবলম্বন কিছুই নাই। আমরা চাই সহৃদয়তা সাহায্য উপদেশ, আমরা চাই প্রতিকারের ঔষধ।"[৫১] বলবীর্যহীন মানুষ হীনমন্যতায় ভুগছে ; ঐতিহ্যের মোহে জাতি ডুবে আছে, ঐতিহ্যকে প্রেরণার উৎস রূপে গ্রহণ করতে অক্ষম ; অলসতা, বিলাসিতা ও ধর্মবিগর্হিত কার্যকলাপের দিকে সমাজের মানুষের দৃষ্টি। তিনি বলেছেন, "জাতীয় একতার অভাবে সামাজিক বীর্যে যে তিমিরাবরণ পড়িয়াছে তাহা আমাদের পাণ্ডু কলুষিত নেত্রের পক্ষে কম কুহেলিকাচ্ছন্ন নহে। আমরা যদি প্রতিজ্ঞা করিয়া জাগিয়া উঠি — কর্মসাধনের পথের কঠোর বিপত্তিরাশি অতিক্রমের জন্য সচেষ্ট হই, তবে উন্নতি কত দূরে?"[৫২]

'ধর্মের উষ্ণ রক্তস্রোত' সমাজ দেহে প্রবাহিত করার কথা যেমন শেখ ফজলল করিম বলেছেন, তেমনি মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদও বলেছেন। তাঁর বক্তব্য, "বঙ্গীয় মুসলমানগণ ইসলামের পবিত্রসীমা বেষ্টন পরিত্যাগ করিয়া অনেক দূরে চলিয়া যাওয়াতেই আজ তাহাদের ঈদৃশ্য শোচনীয় দুর্দশা। ... ফলতঃ কোনও জাতির অধঃপতন যতদূর হইতে পাবে, আমাদের তাহাই হইয়াছে। ... আমাদিগকে ধর্মবলে বলীয়ান হইয়া আমাদিগের হৃত সম্পত্তি পুনরায়নের চেষ্টা করিতে হইবে।"[৫৩]

'নবনূর' পত্রিকায় জাতির অবনতি সমস্যাকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পত্রিকার 'সূচনা'তে সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছেন, "আমরা দেখিতেছি, মুসলমানগণ সকল বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের জাতীয় জীবনে অবসাদই যেন একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। ... পতিত মুসলমানকে উন্নত করিবার, উদ্ধার করিবার একমাত্র অবলম্বন সাহিত্য।"[৫৪] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশের সাথে নবজাগরণের যে যোগসূত্র আছে, মুসলমান সমাজ তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। অল্প শিক্ষিত মোল্লাদের ধর্মান্ধতা সমাজের সর্বনাশ সাধন করছে বলে কাজী ইমদাদুল হক মন্তব্য করেন। "ধর্মের মূল সত্য উপেক্ষা করিয়া, ধর্মের মূল উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা হারাইয়া শুধু কতকগুলি বাহ্যিক আড়ম্বরের অন্তঃসারশূন্য ভিত্তির উপর ততোধিক অন্তঃসারশূন্য ধর্মের অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া কি আজ আমরা সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতেছি না?"[৫৫] শিক্ষার অভাবে 'ধর্মজ্ঞান, কর্মজ্ঞান-সর্বজ্ঞান হারা' হয়ে জাতি অদৃষ্টনির্ভর হয়ে পড়েছে। তাঁর মতে, আধুনিক প্রগতিশীল শিক্ষাই মুক্তির পথ — "যে

৫০ ঐ।
৫১ ঐ।
৫২ ঐ।
৫৩ *ইসলাম-প্রচারক*, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৩
৫৪ নবনূর, বৈশাখ ১৩১০
৫৫ ঐ, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

শিক্ষার স্রোতে আজ পৃথিবী প্লাবিত তাহাতে ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া সভ্যতার সমীর হিল্লোলে নাচিয়া ভাসিয়া বেড়াইতে কেন আমাদের প্রবৃত্তি হইতেছে না?'[৫৬] ঐ প্রসঙ্গে 'মুসলমানের সর্বনাশ' নামে একটি প্রবন্ধে মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা রাজনীতি সম্পর্কে মুসলমানদের উদাসীনতার প্রতি দোষারোপ করেছেন।[৫৭]

এসব আলোচনা থেকে বুঝা যায়, লেখকগণ সামাজিকভাবে সচেতন হয়ে উঠেছেন এবং সমাজের খুঁটি-নাটি দোষত্রুটি নির্দ্বিধায় উত্থাপন করেছেন, তাঁহাদের লক্ষ্য স্থির — পতনশীল সমাজের উন্নতি বিধান ; কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ভাবাদর্শকে অবলম্বন করে আন্দোলনের রূপ দিতে পারেননি। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা চেয়েছেন বটে, কিন্তু তার সঙ্গে ধর্ম শিক্ষাও বজায় রাখতে চেয়েছেন। দারিদ্র্য মোচনের উপায় সরকারি চাকরি বলে মনে করেছেন, কেউ কেউ কারিগরি-কৃষি-শিল্প শিক্ষার কথাও বলেছেন। পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করেছেন, আবার কেউ রাজনৈতিকভাবে সচেতন হতে বলেছেন ; কিন্তু সে রাজনীতির কোন ব্যাখ্যা আরোপ করেননি। ভোগমত্ত জমিদার, ভণ্ড মোল্লা, এমন কি আত্মসুখসর্বস্ব নব্যশিক্ষিতদের সমালোচনা করা হয়েছে, অর্থাৎ আত্মসমালোচনা করেছেন তাঁরা। কিন্তু এতসব প্রয়াস আশানুরূপ ফল আনতে পারেনি। যে কঠিন দারিদ্র্য সমাজের বুকে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসেছিল, সেটাকে নড়াবার ও সরাবার উপায় তাঁদের জানা ছিল না। সরকারের কাছে আবেদন করে এবং কিছু সুবিধালাভ করে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে এবং সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে সমাজের মানুষের মনে আধুনিক শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে পেরেছেন, তাতেই তাঁদের আংশিক সাফল্য। সমাজে রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মত অসাধারণ মেধাশক্তি সম্পন্ন নেতার অভাব ছিল ; আবার 'ইয়াং-বেঙ্গলে'র মত ধর্ম ও সমাজের অচলায়তন বন্ধনগুলি ভেঙে দেওয়ার মত কোন নব্যদলেরও আবির্ভাব হয়নি। সুতরাং পাশ্চাত্য প্রভাবের অগ্নিস্ফূলিঙ্গে দগ্ধ হিন্দু সমাজের একটি অংশ যেভাবে নিকষিত হেম রূপ লাভ করেছিল, মুসলমান সমাজের বিশুদ্ধীকরণ ঐভাবে সম্পন্ন হয়নি। সমাজের নব্য চেতনার বীজ অতি মন্থরগতিতে সঞ্চারিত হয়েছে। সমাজের ত্রিশঙ্কু অবস্থা কাটিয়ে ওঠার জন্য যেরূপ ত্রিমুখী সাঁড়াশি আক্রমণের প্রয়োজন ছিল, মুসলিম নেতৃবৃন্দ সেরূপ শক্তির অধিকারী হতে পারেন নি।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক

হিন্দুস্থানের বিভিন্ন ভাষাভাষী বিচিত্র মতাবলম্বী, বহুদেবতাবাদে বিশ্বাসী, মূর্তি পূজারী হিন্দুগণের হাত থেকে রাজক্ষমতা কেড়ে নিয়ে অপৌত্তলিক একেশ্বরবাদী তুরস্ক-ইরান-আফগানিস্তানের মুসলমানগণ এদেশের শাসকশ্রেণীতে পরিণত হন। বিশাল ভারতবর্ষে এই ক্ষমতার রদবদল যেমন একদিনে হয়নি, তেমনি বিনা রক্তপাতেও সম্পন্ন হয়নি। শক্তির

৫৬ নবনূর জ্যৈষ্ঠ ১৩১০
৫৭ ঐ, অগ্রহায়ণ ১৩১২

দ্বন্দ্বে পরাভূত হয়ে হিন্দুগণ মুসলমানের বশ্যতা স্বীকার করলেও উভয়ের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত তিরোহিত হতে পারে না। রাজনৈতিক ক্ষমতা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান সমাজ গঠনেরও গোড়াপত্তন হয়। রাষ্ট্রীয় শক্তির ছত্রচ্ছায়ায় নবোত্থিত সমাজ, বিজিত সমাজ অপেক্ষা বেশি সুযোগ সুবিধা ভোগ করবে, সেটাই স্বাভাবিক নিয়ম। কেবল রাজ্য জয়ে সব কিছুর শেষ হয়নি। ক্ষমতামদমত্ত রাজতন্ত্রের যা কিছু কুফল তা ভারতবাসীর সমাজজীবনেও বর্ষিত হয়। তাঁদের শোষণ-শাসন, দমন-দলন, গর্জন-তর্জন, অবিচার-অত্যাচার যা সে যুগের রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্রের ধর্ম ছিল, তা পূর্ণ মাত্রায় বহাল থাকে। কোন কোন খামখেয়ালি, অত্যাচারী ধর্মদ্বেষী রাজার আচরণ সীমা অতিক্রম করে যায়। সুতরাং যাঁরা ক্ষমতাচ্যুত হয়ে অত্যাচার নিপীড়নের ভাগীদার হলেন, তাঁরা শাসক শ্রেণীর নামে তাঁদের অন্ধ স্তাবক এবং বশংবদ অনুগামী হবেন না। স্বার্থ যাঁদের ক্ষুণ্ণ হল, তাঁরা বিষপান করে 'নীলকণ্ঠ' হলেন। এর প্রতিক্রিয়া হবেই। তাই যুদ্ধ-বিগ্রহের বিষবহ্নি নির্বাপিত হয়নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্ব সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকেও কলুষিত করেছে। সোমনাথ মন্দির লুণ্ঠন ও ধ্বংস মুসলমান শাসক দ্বারাই সম্পন্ন হয়। আওরঙ্গজেব মথুরার মন্দির ভেঙে মসজিদ নির্মাণ করেন। আলাউদ্দীন পদ্মিনীকে লাভের চেষ্টা করে হিন্দু পারিবারিক জীবনে হস্তক্ষেপ করেন। একটি জাতির ইতিহাসের এরূপ অভিজ্ঞতা কোন দিন মধুর হতে পারে না। ঐতিহ্য সচেতন জাতির কাছে তা মর্মদাহের কারণ হতে বাধ্য।

ধর্মের আদর্শ ও আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে হিন্দু-ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য আছে। বিশেষ করে পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করে হজরত মুহম্মদ নিরাকার একেশ্বরের উপাসনা প্রচলন করেছিলেন। হিন্দুগণ মৃন্ময়-মূর্তির পশ্চাতে চিন্ময় পরমেশ্বরকে দেখেন — তত্ত্বের এই গূঢ় রহস্যে প্রবেশ করলে অবশ্য সে-ভেদ থাকে না। ঈশ্বর আল্লাহ, মন্দির মসজিদ, ব্রত-উপবাস, রোজা-নামাজ, পূজা-পার্বণ ঈদ-পরব, বলি-কোরবান ইত্যাদিতে তত্ত্বগত প্রভেদ কোথায়। প্রভেদটা এসেছে বাইরের আনুষ্ঠানিকতার দিক থেকে। হিন্দুগণ ঢাক-ঢোল বাজিয়ে পূজা করেন, মুসলমানগণের ধর্মকর্মে বাদ্য নিষিদ্ধ। হিন্দুর বলির পশু ও মুসলমানের কোরবানির পশু এক নয়। উভয়ের মধ্যে কতক খাদ্যদ্রব্যের বাছবিচার আছে। সুতরাং এসব নিয়েই হিন্দু-মুসলমানের মতভেদ এবং তা থেকে মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ধর্মপ্রভাবিত মধ্যযুগে ধর্মসংঘাত ছিল না, এরূপ ভাবা যায় না। প্রচারশীল ইসলামধর্মের সাথে সনাতন হিন্দুধর্মের দ্বন্দ্ব ছিল বলেই বারবার আপোস বা ধর্ম সমন্বয়ের চেষ্টা ভারতভূমিতে হয়েছে। স্বয়ং বাদশাহ আকবর 'দীন-ই-এলাহি' (১৫৮২) প্রচার করেছিলেন।[৫৮] কবীর, নানক, দাদু, রজব, চৈতন্যদেব, লালন এই ধর্ম সমন্বয়ের সাধক ছিলেন। দ্বন্দ্ব-সমন্বয়ের এসব ঐতিহ্য নিয়েই এদেশের হিন্দু-মুসলমান ব্রিটিশ-শাসিত ভারতের আধুনিক যুগে প্রবেশ করে। তখন বিজয়ী ইংরাজ শাসক হন, হিন্দু-মুসলমান শাসিত শ্রেণীতে পরিণত হন। মুসলমানগণ ভারতে সমাজপত্তন করে এদেশের নাগরিক

---

৫৮ "ইসলাম, খ্রীস্ট ও ইহুদী ধর্মের একেশ্বরবাদ হিন্দুধর্মের পুনর্জন্ম, জরথুস্ত্র ধর্মের অগ্নি উপাসনা, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের অহিংসা ও সুফীবাদের মানবাত্মার সহিত পরমাত্মার মিলন ইত্যাদি দীন-ই-ইলাহির প্রধান প্রধান উপাদান। বিবিধ ধর্মের সংশ্লেষ ও সমন্বয় ছিল আকবরের উদ্দেশ্য।" *ভারতকোষ*, ১ খণ্ড, পৃ. ২০৩

হয়ে গিয়েছিলেন, তাঁরা আরব-ইরান-তুরস্ককে 'হোম' মনে করেননি। ইরাজগণ ভারতকে পুরোপুরি উপনিবেশ হিসেবে গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁদের শাসন ও শোষণনীতিতে ঔপনিবেশিক ছাপ পড়েছিল। হিন্দু-মুসলমান দুই বিবদমান শক্তিকে তাঁরা রাজ্যজয়ের কাজে ব্যবহার করেছিলেন, রাজ্য শাসন ও শোষণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করবেন না এরূপ হতে পারে না। হিন্দুর প্রভুর বদল হয়, মুসলমানের প্রভুত্ব যায়। প্রভুত্ব ও ক্ষমতা হারানর বেদনা তাঁহাদের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ইংরাজদের সাথে সহযোগিতার প্রশ্নে হিন্দুগণ অগ্রগামী ও মুসলমানগণ পশ্চাদবর্তী হলেন। তাঁরা বিক্ষুব্ধ মুসলমান অপেক্ষা প্রলুব্ধ হিন্দু সম্প্রদায়কে অধিক নির্বিষ, বিশ্বস্ত ও অনুগত মনে করলেন। ইংরাজদের শাসন ও শোষণ নীতির চক্রান্তে পরাভূত ও নিঃস্ব হয়ে মুসলমানরা পশ্চাদনুসরণ করে যে শূন্যতা সৃষ্টি করেন, খুব স্বাভাবিকভাবে হিন্দুগণ নবোত্থিত শ্রেণী হিসাবে সে স্থান দখল করে বসেন। উপরন্তু নতুন শাসননীতি ও অর্থনীতিতে, নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন ব্যবস্থায় যে সুযোগ-সুবিধা এসেছিল হিন্দুগণই সে সবের সিংহভাগের অধিকারী হলেন। শাসন ও বাণিজ্য কেন্দ্র কলিকাতার উঠতি মধ্যবিত্তের মধ্যে তারাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেন। ভূমি, ব্যবসায়, রাজস্ব, প্রশাসন, বিচার, শিক্ষা প্রভৃতি ক্ষেত্রে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আমূল পরিবর্তন সাধিত হল, অর্থাৎ দুই সম্প্রদায়ের মতি ও গতি হল — একটির উন্নতি, অপরটির ধ্বংস ; একটির বিকাশ, অপরটির বিনাশ ; এব নবজীবন, অপরটির অবক্ষয়। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত একশ' বছর হিন্দুগণ নিরঙ্কুশ প্রাধান্য বিস্তার করে উপরে উঠে এসেছেন, মুসলমানগণ হতাশা ও ব্যর্থতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছেন। আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক অবস্থার পরিবর্তনের সাথে সামাজিক সম্পর্কেরও পরিবর্তন হয়। শহরের নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে মুসলমানের সংখ্যা খুবই নগণ্য, অতি মুষ্টিমেয় মুসলমান অভিজাত শ্রেণী নিষ্ক্রিয় অবস্থায় ছিলেন ; নীচের তলার বৃহত্তর জনগণ আধুনিক শিক্ষা ও আর্থিক সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুঃখ দুর্দশা, কুসংস্কার, অনাচার অসদাচারের মধ্যে পতিত হয়। নিম্নশ্রেণীভুক্ত হিন্দু সমাজেরও ঐ একই অবস্থা। দেশের আলোকপ্রাপ্ত নব্যগঠিত মধ্য ও উচ্চবিত্তের সাথে এ শ্রেণীর যোগসম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। সামাজিক মর্যাদা হারিয়ে তারা শহরের 'ভদ্রলোকে'র কাছে 'ম্লেচ্ছ', 'চাষা', 'অভদ্র', 'নীচ', 'ছোটলোক' শ্রেণীতে পরিণত হয়। সেযুগে ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক আন্দোলনে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাঁরা সবাই ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত, মুসলমান কেউ ছিলেন না। গ্রামে থেকে মজনু শাহ, তিতুমীর, শরীয়তুল্লা, দুধুমিয়া ফকির বিদ্রোহ, ওয়াহাবী আন্দোলন ও ফারায়েজী আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত, মধ্যবিত্ত শ্রেণী তা সমর্থন করেনি। 'বাঁশের কেল্লা' তৈরি করে মধ্যযুগীয় ভঙ্গিতে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে যে সাফল্য আসতে পারে না, তা তাঁরা জানতেন। তাঁরা সিপাহী বিদ্রোহকেও সমর্থন দেননি, কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন যে, সিপাহী বিদ্রোহের মূলে যে সামন্তচেতনা কাজ করেছিল, তার লক্ষ্য ছিল মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া। সুতরাং সিপাহী বিদ্রোহকে সমর্থন দেওয়ার অর্থ হবে মুসলমান যুগের অত্যাচার-নির্যাতনের ভাগী হওয়া। সুতরাং চেতনা ও মনোভাবের দিক থেকেও দুটি সম্প্রদায় দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। সমাজের অসম বিকাশের ফলেই এরূপটি হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

এ সময় হিন্দু নেতাগণ ব্রিটিশ শাসন ও ইংরাজ সংস্রবকে দেখলেন উন্নতির সোপান, মুক্তির দিশারী রূপে। ইংরাজ সুসভ্যজাতি, তাঁদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি উন্নত। অতএব সমাজের পরিবর্তন ও উন্নতির জন্য ব্রিটিশ শাসনকে টিকেয়ে রাখা দরকার। এজন্য তাঁরা ব্রিটিশ বিরোধী কোন আন্দোলনে যোগদান করেননি, বরং সভা করে ও চাঁদা তুলে সরকারকে সমর্থন ও সাহায্য দান করেছেন। ইয়ং বেঙ্গলরা ইউরোপ বলতে অজ্ঞান ছিল, পাশ্চাত্যের যা কিছু, তাই উত্তম, প্রাচ্যের সবকিছু নিকৃষ্ট এরূপ মনোভাবের বশবর্তী হয়ে তারা আহারে, বিহারে, পোশাকে-পরিচ্ছদে, কথা-বার্তায়, আদব-কায়দায় ইংরাজদের অনুসরণ ও নকল করত। সমাজের অজস্র গ্লানি, মানুষের বদ্ধদশা হতে মুক্তি লাভের উপায় পাশ্চাত্য জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা। এজন্য রামমোহন রায়, দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কেশবচন্দ্র সেন কেউই ব্রিটিশ শাসনের অবসান চান নি। ব্যক্তিত্বের বিকাশ, চিন্তার মুক্তি, বুদ্ধিবৃত্তির স্ফুরণ দ্বারা অধিকার সচেতনতা না জন্মালে রাজনৈতিক মুক্তিতে ফল হবে না বলে তাঁরা বিশ্বাস করতেন। ব্রিটিশ শাসনের সুফল তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন আইন শৃঙ্খলার উন্নতিতে, সমাজজীবনে ধর্মে কর্মে স্বাধীনতায়, জানমালের নিরাপত্তায়, শ্রেণী বিশেষের অর্থাগম ও বিত্ত সঞ্চয়ের অভূতপূর্ব সুযোগ লাভে আর পাশ্চাত্য বিদ্যায় মানসিক জগতের পরিবর্তনে। তাঁদের ধারণা, পূর্বের রাষ্ট্রশক্তির হস্তান্তরে স্বৈরাচার শাসনের অবসানের ফলেই এটা সম্ভব হয়েছিল।

ব্রিটিশ রাজের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য রেখে নব্যচেতনায় উদ্বুদ্ধ হিন্দু নেতৃবৃন্দ ধর্ম ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন করেন। তাঁরা প্রথমে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদ, মানবতাবাদ, জাতীয়তাবাদের আদর্শে ভারতের ইতিহাস রচনা শুরু করেন। এই সময় ইংরাজ পণ্ডিত ও গবেষকগণ মধ্যযুগের মুসলিম শাসনের উপর আলোকপাত করে মুসলমানদের বিদেশী আক্রমণকারী ধনসম্পদ লুণ্ঠনকারী অত্যাচারী শাসকরূপে চিত্রিত করেন। এটা তাঁদের স্বার্থেই করেছিলেন ; স্বৈরাচারী শাসকগোষ্ঠীর কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিয়ে তাঁরা দেশে সুশাসন, শান্তি-শৃঙ্খলা, সমৃদ্ধি এনেছেন, এটাই প্রমাণিত করতে চেয়েছেন। দেশীয় লেখক-গবেষক তাঁদের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন এবং তাঁদের অনুসরণে ইতিহাস, উপন্যাস, কাব্য রচনা করেন। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র (১৮৫৮) উপাদান সংগ্রহ করেন টডের রাজস্থানের পুরাকাহিনী থেকে। সিরাজদ্দৌলাকে দুশ্চরিত্র, লম্পট, অত্যাচারী রূপে ইংরাজরাই প্রথম চিত্রিত করেন। নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' (১৮৭৫) ইংরাজদের সংগৃহীত তথ্যের ভিত্তিতে রচিত। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি ইংরাজদের পরিবেশিত তথ্যকে অনসুরণ করে রচনা করেন। এজন্য কোন কোন মুসলমান চরিত্রে কলঙ্ক আরোপিত হয়েছে এবং মুসলমানদের হীন করে দেখান হয়েছে। আলোর মহিমা দেখাতে হলে অন্ধকারের কালিমাকে আনতে হয়, সেরূপ একের গৌরব দেখাতে গিয়ে অপরের অগৌরবকে বর্ণনা করতে হয়েছে — প্রধানত এরূপ নীতির বশেই হিন্দুর পুনরুভ্যুত্থানের যুগে প্রতিপক্ষ মুসলমানদের জীবনে ও চরিত্রে মসীলেপন করা হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে অত্যাচারী ইংরাজকে সমালোচনা করা সম্ভব ছিল না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের

'স্বপ্নময়ী' (১৮৭৮) নাটকে শুভসিংহের উক্তিরূপে রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতা ব্যবহৃত হয় : "ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা, যে গায় গাক, আমরা গাব না।" নাটকে কবিতাটি ব্যবহারের সময় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ 'ব্রিটিশে'র স্থলে 'মোগল' শব্দ বসিয়েছিলেন, ইংরাজদের কোপানল থেকে বাঁচবার জন্য। তাঁরা বিদেশী শাসকের কোপানল থেকে বাঁচলেন সত্য। কিন্তু প্রতিবেশী মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দিলেন, এটাই ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভুল হয়ে গেল। ঐতিহাসিক কারণ যাই থাক, মুসলমানদের মনে এর প্রতিক্রিয়া হয়েছে। আধুনিক শিক্ষালাভের পর যখনই তাঁরা নিজেদের কথা ভাবতে শিখেছেন, তখনই হিন্দু সমাজের এরূপ মনোভাবের প্রতিবাদ করেছেন। তাঁদের প্রতিবাদের মাধ্যম সভাসমিতি, সংবাদপত্র ও পুস্তক-পুস্তিকা। কোন কোন ক্ষেত্রে শুধু প্রতিবাদ, প্রতিরোধ নয় ; বিপরীত ভাবের কাব্য, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি রচনার দ্বারা প্রতি-আক্রমণ করেছেন তাঁরা। দেশের ও জাতির সাধারণ শত্রু যে ইংরাজ শাসক সেটি চিহ্নিত না করে বরং তাঁদেরই পক্ষপুটে থেকে হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের বিরুদ্ধে মসী ধারণ করেন। তাঁরা গো-হত্যা, মসজিদ, মন্দির নিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামায় অসি ধারণও করেছিলেন।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক নিয়ে সাময়িকপত্রে কিরূপ বাদ-প্রতিবাদ হয়েছিল, তার আলোচনা করলে উভয়ের দ্বন্দ্ব-কলহের স্বরূপ জানা যাবে। মিহির ও সুধাকর,ইসলাম-প্রচারক, কোহিনুর, নবনূর, হাফেজ প্রভৃতি পত্রিকা মুসলমানদের প্রতি হিন্দু লেখক ও রাজনীতিবিদের বিরূপ মনোভাবের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে প্রতিবাদী সুর তুলেছে। পত্রিকাগুলিতে কেবল বাদ-প্রতিবাদ প্রকাশিত হয়নি, হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায় সম্বন্ধেও মতামত প্রকাশ করা হয়েছে। নবনূর পত্রের সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী 'মাসিক সাহিত্য' সমালোচনা প্রসঙ্গে একাধিক রচনার প্রতিবাদ করেছেন। 'ভারতী'তে (চৈত্র ১৩০১) ভূতনাথ ভাদুড়ী 'শক্তিসাধনা ও তাহার পরিণাম' প্রবন্ধে এক জায়গায় মন্তব্য করেন যে, ইসলাম ধর্ম শক্তিস্বরূপিনী রমণিগণকে বিলাসের উপাদান মাত্রে পরিণত করেছিল। এমদাদ আলী এর সমালোচনা করে বলেন, 'ইহা তো প্রকৃত জ্ঞানের অনুসন্ধান নহে, ইহা মুসলমানের দেহে ইচ্ছাকৃত অস্ত্রাঘাত। লেখক তাঁহার সমস্ত শক্তি মুসলমান ধর্মের শ্লেষপূর্ণ সমালোচনায় অপব্যয় করিয়াছেন। ... ইসলাম রমণীদিগকে যেসব অধিকার প্রদান করিয়াছে, অন্য কোন ধর্ম তাহা করিয়াছে কি? আমাদের পরিতাপের বিষয় এই যে, লেখক কিছু না জানিয়াও সব জানিবার ভান করিয়াছেন।"[৫৯] ইসলাম ধর্মে 'কাফের নাশকে এবং কাফেরের প্রতি অত্যাচারকে পূর্ণকর্ম বলিয়া পরিগণিত এবং স্বর্গপ্রাপ্তির উপায়ভূত করিতে হইয়াছিল' ভূতনাথ ভাদুড়ীর এরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে তিনি বলেন কোরানের অথবা মহম্মদের এরূপ নির্দেশ কোথাও নেই।[৬০] 'ভারতী'তে (আশ্বিন ১৩১০) প্রকাশিত 'রাজসেবায় হিন্দু ও মুসলমান' প্রবন্ধে পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন যে, মুসলমানগণ সরকারি চাকুরি পান না শিক্ষাগত অযোগ্যতার কারণে, যাঁরা

৫৯ *নবনূর*, বৈশাখ ১৩১০, পৃ. ৩৮
৬০ ঐ, পৃ. ৩৯

কর্মরত আছেন, তাঁরা রাজানুগ্রহেই আছেন। নবনূর সম্পাদক এর উত্তরে বলেন যে, মুসলমানদের মধ্যে অযোগ্যতা আছে বটে, কিন্তু সে সঙ্গে হিন্দু-আমলারও বঞ্চনা আছে। তিনি লিখেন, "আজকাল বহু কার্য্যেই হিন্দু সমান শিক্ষিত মুসলমান কর্মপ্রাথী উপস্থিত হন, কিন্তু এসব বিষয়ে লক্ষ্মী হিন্দুর প্রতি প্রসন্না। রেড ট্যাপিজম-এর প্রতাপ যথায় অক্ষুণ্ন আছে, সেরূপ স্থলে সাদা মানুষ কর্মদাতা হইলেও মুসলমানের দাবী শূন্যে পর্যবসিত হয়। ... আত্মীয় বাৎসল্যরূপ অন্যায়টা হিন্দু রাজপুরুষগণই বেশী করিয়া থাকেন।"[৬১] তিনি আরও বলেছেন যে, মুসলমান জমিদারদের বিষয়কর্মে অযোগ্যতা ও ভোগবিলাস মত্ততার সুযোগ নিয়ে হিন্দু আমলাগণ ষড়যন্ত্র করে জমিদারি হস্তগত করছেন, মামলা-মোকদ্দমা অথবা ঋণজালে জড়িত হয়ে জমিদারগণ অল্পদিনের মধ্যে পথের ভিখারিতে পরিণত হন।[৬২] শেখ আবদোস সোবহান 'হিদু-মোসলমান' (১৮৮৮) গ্রন্থে একই অভিযোগ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "বঙ্গদেশে যে কতক ঘর মোসলমান জমিদার আছেন সকল ঘরই হিন্দু আমলায় আবৃত। প্যাদা, খানসামা, হুকা বরদার, ছাতি বরদার, বাবুর্চি এসব পদের চাকুরিগুলি বরং মোসলমানগণই পাইয়া থাকে। কিন্তু মুহুরি, নায়েব, দেওয়ান, খাজাঞ্চি, সেরেস্তাদার, পেস্কার, পরিদর্শক, ম্যানেজার এসবই হিন্দু। ইহারা জমিদারীতে এত আধিপত্য স্থাপন করিয়া বসিয়াছে যে প্রকৃত কথা বলিতে গেলে ইহারাই জমিদার। মোসলমান জমিদারগণ পেন্সনভোগী সাক্ষীগোপাল মাত্র।"[৬৩]

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত 'বিশ্বকোষে' (১৫শ ভাগ) 'মুসলমান' ও 'মুসলমান ধর্ম' শিরোনামে মুসলমান সম্প্রদায় ও ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে আলোচনা আছে। এই আলোচনা তথ্যের দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ এবং বক্তব্যের কি থেকে আপত্তিকর বিবেচনায় মোহাম্মদ ইসহাক এর প্রতিবাদ স্বরূপ 'বিশ্বকোষে বসুজ' প্রবন্ধ লেখেন। তিনি প্রথমেই অভিযোগ করে বলেন, "তিনি (নগেন্দ্রনাথ) কতক ইসলামদ্বেষী খৃষ্টান ইতিহাসবেত্তাদের, কতক অজ্ঞ

৬১ *নবনূর*, অগ্রাহাণ ১৩১০, পৃ. ৩১০
উল্লেখযোগ্য যে সৈয়দ আমীর আলী লর্ড রিপনকে প্রদত্ত 'স্মারকলিপি'তে (১৮৮২) অনুরূপ অভিযোগ করেছেন।

৬২ ঐ, পৃ. ৩১১

৬৩ *হিন্দু মোসলমান*, পৃ. ৪৩-৪৪
মীর মশাররফ হোসেনের পিতামহ মীর এব্রাহিম হোসেন কুষ্টিয়ার দূর সম্পর্কীয় আত্মীয়া আনার খাতুনের যে জমিদারীর মালিক হন তার 'প্রধান কার্যকারক' ছিলেন শীতলচন্দ্র দত্ত (আমার জীবনী, পৃ. ২৬)। মশাররফ হোসেনের পিতা মীর মোয়াজ্জম হোসেনের জমিদারীর প্রধান কার্যকারক ছিলেন দেবীপ্রসাদ। তাঁর সহযোগিতায় মীরের 'ভাইজি জামাতা' শাহ গোলাম জান 'অসিয়তনামা' (দলিল) তৈরি করে বিষয়সম্পত্তি হস্তগত করেন। (উদাসীন পথিকের মনের কথা, 'পঞ্চবিংশতি তরঙ্গ' দ্রষ্টব্য)।
'নবনূরে' প্রেরিত একটি পত্রে জ্ঞানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লেখেন, "হিন্দু কর্মচারীগণ যে মুসলমান জমিদারের সম্পত্তি কৌশলে আত্মসাৎ করিয়াছেন, এরূপ দু'একটি ঘটনা আমি জানি এবং দুঃখের সহিত স্বীকার করি। তবে যে সকল জমিদারের সম্পত্তি এরূপে হস্তচ্যুত হইয়াছে, তাঁহাদের বিলাসলিপ্সা এবং বিষয়কার্য্যে অমনোযোগও তজ্জন্য কিয়ৎ পরিমাণে দায়ী।" — *নবনূর*, ফাল্গুন ১৩১০০, পৃ. ৪১৭

গ্রাম্য কাটমোল্লাদের, কতক লা-মাজহাবীদের ও কতক সিয়াদের মত সংগ্রহ করিয়া তৎসহ স্বকপোলকল্পিত ঘৃণিত মত মিশাইয়া ইসলাম ধর্মকে একটি কদর্য পদার্থে পরিণত করিয়া জনসমাজে প্রচার করিতে প্রয়াসী হইয়াছেন।"[৬৪] মোহাম্মদ ইসহাক বিশ্বকোষের যেসব উক্তিকে ত্রুটিপূর্ণ ও আপত্তিজনক মনে করেছেন, সেগুলি এরূপ :

"ভারতীয় মুসলমান সম্প্রদায় হাবসী, খাণ্ডার, নেড়ে, পাঠান, মোগল, তাতার, পারসী, আরবী ও তুর্কী ইত্যাদি নামে কথিত হয়।" (পৃষ্ঠা ২৪২)

"সিয়া ও সুন্নি ব্যতীত এখানে হানিফী, সাফাই, সিদ্দিকি ও হম্বলী নামে আরও চা নতুন ধর্মমত দেখা যায়।" (পৃষ্ঠা ২৬০)

"সুন্নিগণ বলেন যে তাঁহারাই মহম্মদের প্রকৃত উপাসক। ইঁহারা আবুবকর, ওমর এবং ওসমানকে প্যাগম্বর স্বীকার করেন।" (পৃষ্ঠা ২৬০)

মোহাম্মদ ইসহাক বলেছেন, 'নেড়ে' জাতিবাচক শব্দ নয়, এটি হিন্দুদের গালিবাচক শব্দ। মুসলমান সম্প্রদায় সিয়া-সুন্নিতে বিভক্ত ; সুন্নিদের চারটি মজহব — হানাফি, সাফি, মালেকি ও হাম্বেলি। সুতরাং চারটি মজহব কোন 'নতুন ধর্মমত' নয়। সুন্নিগণ কখনই মহম্মদকে 'উপাসক' মনে করেন না। 'এক ঈশ্বর ব্যতীত মুসলমানের দ্বিতীয় উপাস্য নাই।' আবুবকর, ওমর, ওসমান খলিফা বা প্রতিনিধি মাত্র তাঁরা 'পয়গম্বর' (প্রেরিত পুরুষ) নন।[৬৫]

মুসলমানের পতন সম্পর্কে বিশ্বকোষে লক্ষ্যভ্রষ্টতা, ডদ্যমশূন্যতা, পরকালে সুখ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা, ইহকালে নারী ও মদ্য ভোগাসক্তি, কাফের দলন ও ধর্মান্তরিকরণ ইত্যাদি কারণের কথা বলা হয়। প্রবন্ধকার এগুলির প্রতিবাদ করেন। তিনি বলেন যে, তরবারির সাহায্যে ইসলাম প্রচারিত হয়নি, ধর্মের অন্তর্নিহিত মাহাত্ম্যরাশিই ইসলামের সাফল্যের কারণ।[৬৬] নগেন্দ্রনাথ বসু একটি পত্রে তথ্যগত ত্রুটির কারণে দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন যে, ইরাজি বই-এর অনুসরণ এই ভুলের কারণ, তিনি তা সংশোধন করবেন। তিনি বলেন, "হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে কোন বিদ্বেষ বিদ্যমান আছে বলিয়া আমার জানা নাই, সাহিত্যের যে অংশ জাতিগত বিদ্বেষের সৃষ্টি বা পোষণ করে, তাহা আমার ঘৃণ্যই। মুসলমান সম্প্রদায়কে আমি সম্মান ও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখি। তাহাদের অপ্রীতিভাজন হওয়া আমার পক্ষে প্রীতিকর নহে।"[৬৭]

শিবনাথ শাস্ত্রী 'ভারতী'র ১৩১১ সনে কার্তিক সংখ্যায় 'অনুকরণ ও অনুসরণ' প্রবন্ধ লিখেন। সেখানে তিনি ইসলাম ও মুসলমান সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করেন। তাঁর একটি উক্তি এরূপ : "তাঁহার (মহম্মদের) শিষ্যগণ যখন দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিয়াছেন, তখন এই বলিয়া বাহির হইয়াছেন যে জগতের সকল জাতিকে এক ছাঁচে ঢালিব। অপরের যাহা কিছু, তাহা বিনষ্ট করিতে হইবে, কোরানে যাহা আছে, তাহাই প্রবর্তিত করিতে হইবে। এই

৬৪ *নবনূর,* আষাঢ় ১৩১০, পৃ. ১১০
৬৫ *নবনূর,* আষাঢ় ১৩১০, পৃ. ১১১-১২
৬৬ ঐ, পৃ. ১১৩-১৪
৬৭ ঐ, শ্রাবণ ১৩১১, পৃ. ১৭৯

আধ্যাত্মিক সংকীর্ণতা বশতঃই মহম্মদীয় শাসনশক্তি জগতে দাঁড়াইল না।"[৬৮] ইমদাদুল হক "ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ' নামে একটি প্রবন্ধে ইসলামের 'আধ্যাত্মিক সংকীর্ণতা'র অভিযোগটি মানতে পারেননি। তিনি ইসলামের আধ্যাত্মিক নীতিসমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে উক্ত অভিযোগের অসারতা প্রতিপন্ন করেন। ধর্ম প্রচার সম্পর্কে কোরানের উক্তি উদ্ধৃত করে তিনি বলেন যে, বলপ্রয়োগ দ্বারা ইসলাম প্রচারের নির্দেশ কোরানে নেই।[৬৯]

হিন্দু প্রণীত গল্প, উপন্যাস, নাটক, কাব্য ইত্যাদি রচনায় যেসব ক্ষেত্রে মুসলমানদের প্রতি দোষারোপ করা হয়েছে, সেসব ক্ষেত্রে প্রতিবাদ করেছেন মুসলমান লেখকগণ। মুসলমান চরিত্রকে কলুষিত ও মুসলমান সমাজকে অপমানিত করে লিখিত এসব রচনার দ্বারা হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল সৃষ্টি করেছে বলে তাঁরা উল্লেখ করেন, তাঁদের মতে মিলনের উপায়, এরূপ অপপ্রচার থেকে বিরত হওয়া। ১৮৯৯ সালে মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী 'বাংলার মাতৃভাষা শিক্ষা' বিষয়ক প্রবন্ধে বাংলার ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকদের রচনা থেকে দৃষ্টান্ত আহরণ করে তিনি হিন্দুগণের মুসলিম বিদ্বেষের একটি চিত্র তুলে ধরেন। শুধু তাই নয়, ঐ সভায় 'বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমান বিদ্বেষের বিরুদ্ধে' একটি প্রস্তাবও পাশ করেন। তিনি তাঁর লেখায় রামগতি ন্যায়রত্ন, ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রমুখ ঐতিহাসিক এবং বঙ্কিমচন্দ্র, হারানচন্দ্র রক্ষিত, নবীনচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকের মুসলমান বিদ্বেষমূলক রচনাংশ উদ্ধৃত করেছেন।[৭০] উল্লেখযোগ্য যে, এগুলির অধিকাংশ বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তক ছিল। তিনি বলেন, এসব রচনা পাঠ করে মুসলমান সমাজ সম্পর্কে হিন্দু ছাত্রদের বিরূপ ধারণা জন্মে, আবার মুসলমান ছাত্রদেরও স্বসমাজের প্রতি অশ্রদ্ধার ভাব জাগে।[৭১] সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর এই চেতনা সমকালীন পত্র-পত্রিকায়

৬৮ *নবনূর,* মাঘ ১৩১১, পৃ. ৪৬৪
ইসলামের প্রতি সংকীর্ণতার অভিযোগ 'সোম প্রকাশে'ও (১৬ জ্যৈষ্ঠ ১২৭৮) তোলা হয়। পত্রিকায় লেখা হয়, "এক হস্তে কোরান অপর হস্তে তলয়ার এটী মুসলমান ধর্ম প্রচাবের মূল নিয়ম। গোঁড়াদিগের ইহাতে সম্পূর্ণ আস্থা আছে। এ ধর্মে ঔদার্য্য ও নিরপক্ষেতা নাই।" — *সাময়িকপত্রে বাংলার সামাজচিত্র (১৮৪০-১৯০৫),* পৃ. ২৩৫

৬৯ "বল 'তুমি ইসলাম গ্রহণ করিবে?" ইহাতে যদি সে গ্রহণ করে, সে সুপথ প্রাপ্ত হইবে ; কিন্তু যদি প্রত্যাখান করে, তবে তোমার কর্তব্য শুধুই প্রচার করা। সকলের প্রতি ঈশ্বরের সমদৃষ্টি।" — ৩ সুরা ১৯ আয়াত। *নবনূর*, মাঘ ১৩১১, পৃ. ৪৬৭

৭০ *Vernacular Education in Bengal*, pp, 3-4, 46-47

৭১ পরে লেখাটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রনাথ ভারতীতে (কার্তিক ১৩০৭) তার সমালোচনা করেন। তিনি একস্থলে বলেন, "স্বধর্মের সদুপদেশ এবং স্বজাতীয়ের সাধু দৃষ্টান্ত মুসলমান বালকের পক্ষে একান্ত আবশ্যক একথা কেহই অস্বীকার করিবেন না। আমরা আরও বলি মুসলমান শাস্ত্র ও সাধু দৃষ্টান্তের সহিত পরিচয় হিন্দু বালকদের শিক্ষার অবশ্য ধার্য অঙ্গ হওয়া উচিত। ... বাঙালি হিন্দু ছেলে যদি তাহার প্রতিবেশী মুসলমানের শাস্ত্র ও ইতিহাস এবং মুসলমানের ছেলে তাহার প্রতিবেশী হিন্দুর শাস্ত্র ও ইতিহাস অবিকৃতভাবে না জানে তবে সেই অসম্পূর্ণ শিক্ষার দ্বারা কেহই আপন জীবনের কর্তব্য ভাল করিয়া পালন করিতে পারিবে না।" (পৃ. ৬২৪) বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকের গলদ থেকে হিন্দু-মুসলমান ছাত্রদের মধ্যে বিদ্বেষভাবের উদয় হয় বলে অভিযোগ

সম্প্রচারিত হয়। এ ব্যাপারে নবনূর নেতৃত্ব দেয়। 'মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান' প্রবন্ধে সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন, "বঙ্কিমবাবু সর্বপ্রথম মুসলমান সমাজের দেহে অস্ত্রাঘাত করেন, তাহা সত্য। অনেক কংগ্রেস ভক্ত লেখককে যখন আমরা মুসলমান সমাজের আদর্শ খর্ব করিয়া গল্প ও গাথা রচনা করিতে দেখি, তখন কি আমাদের মুসলমানীয় গর্বে একটুও আঘাত অনুভব করি না?"[৭২] তিনি আরও বলেন, "কেবল এক রিজিয়া নাটক কেন, আজকাল নাট্যমঞ্চে অভিনীয় বহুনাটকের মধ্যেই মুসলমানের প্রতি অজস্র বিষদগ্ধ বাক্য বর্ষিত হইতে দেখা যায়। যে শিক্ষিত হিন্দু সমাজ কংগ্রেস করেন, কনফারেন্স করেন এবং বক্তৃতামঞ্চে মুসলমানকে ভাই বলিয়া সম্বোধন করিয়া স্বীয় দলভুক্ত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারাই আবার গৃহে আসিয়া শান্ত সমাহিত চিত্তে মুসলমানের বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করেন।"[৭৩] সৈয়দ এমদাদ আলীর মতে, এরূপ ক্রিয়াকলাপ হিন্দু-মুসলমানের মিলনের পথে অন্তরায়। তিনি বলেছেন, "যদি তাহা (পরস্পরের মিলন) অসম্ভব হয় তবে কংগ্রেস, কনফারেন্স সবই বৃথা, সবই বালকের ক্রীড়ামাত্র — তাহা দেশের দুই বিভিন্ন জাতির পুরাতন সংখ্যভাব সংহার করিয়া শত্রুতা বৃদ্ধি করিবার যন্ত্র বিশেষ মাত্র।"[৭৪]

'মুসলমানের প্রতি হিন্দু লেখকের অত্যাচার' প্রবন্ধে 'কেনচিৎ মর্মাহতেন হিতকামনা' ছদ্মনামে জনৈক লেখক বলেন যে, হিন্দু লেখকগণ সাহিত্য ও ইতিহাসে মুসলমান-চরিত্রের প্রতি কলঙ্ক আরোপ করে মুসলমানদের হৃদয়ে আঘাত দিয়েছেন। তিনি মনে করেন, 'বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া পুরাতন বৈরী নির্যাতনের বাসনায়' হিন্দুগণ এরূপ করেছেন। তিনি লিখেছেন, "সাহিত্যরথী বঙ্কিমবাবু হইতে আরম্ভ করিয়া অতি নগণ্য পুঁটিরাম পর্যন্ত মুসলমান সমাজের অযথা নিন্দাবাদ করিয়া জগতের চক্ষে তৎ সমাজকে চির কলঙ্কিত করিয়া রাখিবার প্রয়াসী হইয়াছে এবং হইতেছেন, ইহা কি ভাল কথা?... মুসলমানের নামে কুৎসা রটনা করিতে না পারিলে কি ঐতিহাসিক, কবি বা নাট্যকার হওয়া যায় না?"[৭৫] তিনি হিন্দু লেখকগণের এরূপ মনোভাবকে 'বিষকুম্ভম' বলে চিহ্নিত

করেছেন হাতেমউল্লা। চতুর্থ শ্রেণীর পাঠ্য 'বাংলা ইতিহাস' গ্রন্থে ইসলাম ধর্ম প্রচার সম্পর্কে বলা হয়েছে, "মোহাম্মদ মুসলমান ধর্মের সংস্থাপক। একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা বল দ্বারা প্রচার করাও বিধেয়, এইরূপ উপদেশ দিয়া স্বদেশীয়দিগকে ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন।" হাতেমউল্লা বলেছেন, "বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য ও স্কুলপাঠ্য পুস্তকগুলি মুসলমান ছাত্রের একরূপ কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ... হিন্দু ছাত্রগণ তাহাদের স্বজাতীয় লোকদিগের লিখিত গ্রন্থাবলী হইতে নানাবিধ জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান জাতিকে একান্ত অবজ্ঞা ও ঘৃণা করিতে শিখিয়া থাকে।' — *কোহিনুর, জ্যৈষ্ঠ* ১৩১৩, পৃ. ৪৩

৭২ *নবনূর, পৌষ* ১২১০, পৃ. ৩৫০

৭৩ *ঐ*, পৃ. ৩৫০

৭৪ *নবনূর*, পৌষ ১৩১০ পৃ. ৩৫৩

৭৫ *ঐ*, ভাদ্র ১৩১০, পৃ. ১৬৮

করেছেন। লেখকের বিক্ষুব্ধ মনে প্রতিকার কল্পনা জেগেছে এভাবে : "সাহিত্য রাজ্যে ঘুসির বদলে ঘুসি যদি আমরাও দিতে পারিতাম, তাহা হইলে ভারত ইতিহাসে ইসলাম-মস্তকের এমন শোচনীয় চর্বন কদাচ দেখিতে হইত না।"[৭৬] অবশ্য লেখক হিন্দু-মুসলমানের মিলনই কামনা করেন। তাঁর বক্তব্য, "বস্তুত আমরা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত একতারই আকাঙ্ক্ষা করি, কারণ তদ্ভিন্ন বর্তমান অবস্থায় ভারতের মঙ্গল নাই।"[৭৭] মনোমোহন গোস্বামী 'শিবজী বা সাজাদী রোশিনারা' নাটকের ভূমিকায় লিখেছেন, "ন্যায় পরায়ণ সর্বধর্ম প্রতিপাল্য সুসভ্য ইংরেজ রাজত্বে যাঁহারা পুত্রকলত্রবেষ্টিত হইয়া পরমানন্দে শান্তিসুখ অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদের সম্মুখে মুসলমান অত্যাচারের চিত্র স্থাপন করাও পুস্তকখানির অন্যতম উদ্দেশ্য। ... এই গ্রন্থ হিন্দুর মনে মুসলমান বিদ্বেষ জ্বালাইয়া তুলিবার জন্যই লিখিত হইয়াছে।" আওরঙ্গজেব দুহিতা রোশিনারার সঙ্গে শিবাজীর প্রণয় কাহিনী নাটকের বিষয়বস্তু। ইমদাদুল হক এরূপ উদ্দেশ্যপূর্ণ নাটকটির বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ করেন এবং নাট্যকারের মনোভাবের নিন্দা করেন। তিনি বলেন, 'নাটক রচনা স্থলে সাক্ষাৎ ইতিহাসের উপর ক্রিমিনাল এ্যাসালট করিয়া এবং কমনসেন্স মাথাটি চিবাইয়া খাইয়া' 'আপন প্রতিবেশীর হৃদয়ে শেলবিদ্ধ' করা হয়েছে। নাটকটি অভিনীত হতে দেখে তিনি মন্তব্য করেন, "আমাদিগেরই সম সুখদুঃখভোগী হিন্দুগণ আজ ঘরের পয়সা খরচ করিয়া সানন্দে প্রতিবেশী ঘৃণাবিদ্বেষ ক্রয় করিতেছেন।"[৭৮] গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে ক্ষীরোদ প্রসাদ রচিত 'প্রতাপাদিত্য' (১৯০৩) অভিনয় দেখেও ইমদাদুল হকের মনে প্রতিক্রিয়া হয়। নাটকে মৌলভী তোরাপ ও সুবেদার শের খাঁর চরিত্রকে হীন করে আঁকা হয়েছে এবং তৎসঙ্গে মুসলমান সমাজকে হেয় করা হয়েছে বলে তিনি অভিযোগ করেছেন। তিনি বলেন যে, হীন বা খল চরিত্র মুসলমান সমাজে থাকতে পারে এবং তাতে মুসলমানের ক্ষোভের কারণ থাকা উচিত নয়, ক্ষোভের কারণ তখনই দাঁড়ায় যখন ব্যক্তি বিশেষকে অবলম্বন করে সমাজের আদর্শকে ছোট করা হয়। তাঁর বক্তব্য, 'একের হীন আদর্শ শুধু অন্যের আদর্শের উচ্চতা প্রদর্শন করিবার জন্যই অঙ্কিত' হলে সেখানে বিদ্বেষের উৎপত্তি হয়। তিনি উভয়ের মধ্যে মিলনের আশা কামনা করে বলেছেন, "যখন এত বড় বড় রাজনৈতিক বজ্র আমাদের উভয়ের মাথার উপর পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া

এরূপ প্রতিক্রিয়াজাত আক্রমণাত্মক মনোভাব আরও অনেকের কণ্ঠে শোনা যায় : মোহাম্মদ ইসহাক বলেন, "যেরূপ গতি দেখা যাইতেছে, তাহাতে মুসলমানেরাও পাল্টা গীত গাহিতে আরম্ভ না করিলে আর সমাজের মঙ্গল নাই, দেখিতেছি।" — *নবনূর*, আষাঢ় ১২১০, পৃ. ১১১
ওসমান আলী লিখেছেন, "মানবের হস্তে তুলিকা থাকিলে সিংহের চিত্র এইরূপেই অঙ্কিত হয়। কিন্তু সিংহও লেখনী ধরিতে শিখিয়াছে, একথা যেন স্মরণ থাকে।" *নবনূর*, ফাল্গুন ১৩১০, পৃ. ১২৫

৭৬ *নবনূর*, ভাদ্র ১৩১০, পৃ. ১৭৪
৭৭ *ঐ*, প ১৭৩
৭৮ *নবনূর*, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ. ৭২

রহিয়াছে, তখন আমাদের যাহাতে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি বর্ধিত হয়, তজ্জন্য অতীত ইতিহাসের ভাল অংশের যথাসাধ্য আলোচনা করা এবং উভয়ের জাতীয় ও সামাজিক আদর্শ যাহাতে উভয়ের নিকট যথারীতি সম্মান লাভ করিতে পারে তাহার উপর বিধান করা কি কর্তব্য নহে?"[৭৯] ওসমান আলী কোহিনুরে 'হিন্দু মুসলমানের বিরোধের কারণ ও তন্নিবারণের উপায়' শিরোনামে মোট চার সংখ্যায় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এখানে তিনি হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মগত ও জাতিগত পার্থক্য ছাড়াও 'ইংরেজ জাতির ভেদনীতি' ও 'হিন্দুর জাতীয়তার পুনরুত্থান'কে বিরোধ সৃষ্টির কারণ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, গ্রামের সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরোধ নেই, বিরোধের জন্মদাতা শহরের শিক্ষিত মানুষেরা। তিনি বলেন যে, হিন্দু ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিকগণ ইংরাজের লিখিত পুস্তক থেকে তথ্য নিয়ে গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেন, তাঁরা তথ্যের সত্যাসত্য বিচার করে দেখেন না। ফলে তাঁদের হাতে মুসলমানরা "দুর্দান্ত, নৃশংস অত্যাচারী, জাতিধর্মনাশকারী, দুরন্ত যবন ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইতে লাগিল। ইহাতে হিন্দু মুসলমান বিরোধ প্রথমে ধূমায়িত হইয়া পরে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠে।"[৮০]

সাহিত্যের রাজ্যে মুসলমানদের প্রতি অবিচার করা হয়েছে, তা কোন কোন উদারচেতা ও সমন্বয়বাদী হিন্দু লেখকও স্বীকার করেছেন। কেবল সাহিত্যের রাজ্যে নয়, অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁরা বিভেদের কারণ অনুসন্ধান করেছেন এবং বিরোধ নিষ্পত্তির উপায় নির্ধারণ করেছেন। দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার মনে করেন 'প্রভুশক্তির অপব্যবহার' ও 'প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব' হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ফাটল ধরিয়েছে। হিন্দু রচিত সাহিত্যে কেন মুসলমান চরিত্রকে কলুষিত করা হয়েছে, তার জবাবে তিনি ঐরূপ যুক্তি দেখান।[৮১] তিনি ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি কামনা করেন না, তিনি সমন্বয় কামনা করেন। তিনি বলেন, "আজ আমরা নিরীহ প্রতিবেশী গলায় গলায় ধরিয়া পরস্পরের দুঃখ-সুখ বাঁটিয়া লইবার অবস্থায় আসিয়াছি, হিন্দু মুসলমান পুরাতন আগুন উস্কাইয়া তুলিতে গেলে নিজেরাই জ্বলিয়া মরিব। আমাদের যে সময়, তাহাতে কেহ কাহারও তীব্র আক্রমণ করা নিতান্ত অন্যায়। কেবল বন্ধুর মত, সংযত আলোচনায় পরস্পরের ভুল বুঝাইয়া দেওয়াই কর্তব্য।"[৮২] যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মনে করেন, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ 'প্রীতির অভাব'। এর জন্য তিনি স্বসমাজকে দোষারোপ করেছেন। তাঁর ভাষায়, "হিন্দু

৭৯ ঐ, আশ্বিন ১৩১২, পৃ. ২৬৮

৮০ *কোহিনুর*, মাস ১৩১০, পৃ. ২৩১

৮১ অতীতের তিক্ত স্মৃতির প্রতিক্রিয়া থেকে হিন্দু লেখকগণ গল্প-উপন্যাস-নাটকে মুসলমানকে আক্রমণ করেন বলে মোহাম্মদ হেদায়েতুল্লা 'বঙ্গ সাহিত্যে হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়, "গত সময় হিন্দু ললনাগণ মুসলমানের অঙ্কলক্ষ্মী হইয়াছিলেন বলিয়া বর্তমান সময়ে শিক্ষানবিশ হিন্দু লেখকগণ আপনাকে অপমানিত বিবেচনা করিতেন এবং তাহারই প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে এইরূপ নায়ক-নায়িকার সৃষ্টি।" *নবনূর*, কার্তিক ১৩১১, পৃ. ৩১১। মজুমদার বাবু কথিত, 'প্রভুশক্তির অপব্যবহারে'র এটি একটি নমুনা ছিল।

৮২ *নবনূর*, আষাঢ়, আষাঢ় ১৩১০, পৃ. ৮৮-৮৯

সম্প্রদায় মুসলমানদিগের প্রতি এখনও প্রাণমন খুলিয়া ভালবাসা জানাইতে শিখে নাই ; মুসলমান সমাজও কাজে কাজেই ততটা মিশামিশি করেন না। ভালবাসার বদলে ভালবাসা মিলে।"[৮৩] তিনি ধর্মভেদকে 'একতার অসম্ভব' ঘটাবার কারণ বলে মনে করেন না ; তিনি হিন্দু-মুসলমানের ধর্মবিদ্বেষকে অহেতুক বলেই উল্লেখ করেছেন। তিনি উভয়ের সম্প্রীতি কামনা করে বলেছেন, "অতীত কাহিনীর পুরুল্লেখ দ্বারা ঈর্ষা ও দ্বেষের সৃষ্টি করিতে যাঁহারা প্রয়াসী তাঁহারা প্রকৃত পক্ষেই সমাজের বিপ্লবকারী ও দেশের শত্রু। . . .উভয়ের মধ্যে হইতে মনোমালিন্যের কালো মেঘটুকু দূরীভূত হইয়া গেলেই স্বদেশ হিতৈষী ইউনিটেড ইণ্ডিয়ার সুখ ফলিবে।"[৮৪] রামপ্রাণ গুপ্ত বলেছেন, "বর্তমান সময়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মতদ্বৈধই আমাদের মধ্যে অসদ্ভাবের মধ্যে প্রধান কারণ বলিয়া বোধ হয়।"[৮৫] কংগ্রেস ছিল রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ; কংগ্রেসে যোগদান নিয়ে মুসলমান সমাজে মতদ্বৈত ছিল, মুসলমানরা কংগ্রেসকে হিন্দুদের প্রতিষ্ঠান বলে মনে করতেন, এজন্য এই মত-দ্বৈততা। রামপ্রাণ গুপ্ত বলেছেন, "হিন্দু লেখকগণ অনেক সময় মুসলমানের অযথা নিন্দা করিয়া লেখনির অপব্যবহার করিয়াছেন, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। চারিদিকে বিদ্বেষের আগুন আপনাদিগকে উত্তাপিত করিতেছে, ইহা প্রেমের বারিসিঞ্চনে নির্বাপিত করিতে হইবে। হিন্দু মুসলমান পরস্পরের হাত ধরিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হয়, ইহা আমার 'জীবন-স্বপ্ন।"[৮৬] নির্মলচন্দ্র ঘোষের ধারণা হল, হিন্দু মুসলমানের বিরোধ সৃষ্টির মূল কারণের মধ্যে 'প্রধান কারণ অস্মদ্দেশীয় এক শ্রেণীর গ্রন্থকার।' তিনি বলেছেন, "সাহিত্যগুরু বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য ক্ষেত্রে মধু ধারার সহিত এমন এক বিষধারা ঢালিয়া দিয়াছেন, যাহাতে কতিপয় বিষগ্রাহী শিষ্য মুসলমানদ্বেষে অন্ধ হইয়া নির্ভয়ে ইতিহাসের সোনার অঙ্গে পদাঘাত করিতেছেন। ... গুরুদেব কেবল উপন্যাস রচনা করিয়া উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিলেন, শিষ্যসমাজের উপন্যাস ত আছেই আছে, তাহা ছাড়া তাঁহারা 'ঐতিহাসিকতত্ত্ব', 'ঐতিহাসিক আবিষ্কার', 'ঐতিহাসিক চিত্রোদ্ধার' প্রভৃতি পাণ্ডিত্যপূর্ণ নাম দিয়া কল্পিত উপন্যাসে মাসিক পত্রিকার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছেন। ... এ সময় সুফলপ্রসূ তরুর অঙ্কুরকালে ঐ সকল লেখকের বিদ্বেষবহ্নি বিবেকবারিতে সুশীতল হওয়াই একান্ত বাঞ্ছনীয়।"[৮৭] ধর্মগত, প্রকৃতিগত ও ভাবগত পার্থক্যের জন্যই হিন্দু-মুসলমানের মিলন ব্যাহত হচ্ছে বলে জীবেন্দ্রকুমার দত্ত অভিমত ব্যক্ত করেন। তিনি মনে করেন, আকাঙ্ক্ষিত মিলনের জন্য পরস্পরকে কিছু স্বার্থ ত্যাগ ও ক্ষতি স্বীকার করতে হবে। উভয়ের রাজনৈতিক স্বার্থ এক — স্বাধিকার অর্জন ও ঔপনিবেশিক শোষণ রোধ। এক্ষেত্রে উভয়ের দায়িত্ব সমান, এ দায়িত্ব সম্পাদন মিলনেই সম্ভব, সংঘর্ষে নয়।[৮৮]

৮৩ ঐ, পৃ. ১৭৮
৮৪ ঐ, পৃ. ১৭৮
৮৫ ঐ, আশ্বিন ১৩১০, পৃ. ২৩৬
৮৬ ঐ, পৃ. ৩৫-৩৭
৮৭ ঐ, মাঘ ১৩২০, পৃ. ৩৬৯
৮৮ *নবনূর*, অগ্রহায়ণ ১৩১১, পৃ. ৭৪-৭৫

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরীর গ্রন্থের সমালোচনা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ এক স্থানে মন্তব্য করেন, "বঙ্কিমবাবুর গ্রন্থে যাহা নিন্দাই তাহা সমালোচক কর্তৃক লাঞ্ছিত হউক, কিন্তু নিন্দার বিষয় হইতে কোন সাহিত্যকে রক্ষা করা অসাধ্য। মুসলমান সুলেখকগণ যখন বঙ্গ সাহিত্য রচনায় অধিক পরিমাণে প্রবৃত্ত হইবেন তখন তাঁহারা কেহই যে হিন্দু পাঠকদিগকে কোনরূপ ক্ষোভ দিবেন না এমন আমরা আশা করিতে পারি না।"[৮৯] অনুমান ফলতে দেরি হয়নি। 'সাহিত্যরাজ্যে ঘুসির বদলে ঘুসি' শুরু হয়। খুব সম্ভব, আর্জুমন্দ আলীর 'প্রেমদর্পণে' (১৮৯৯) সর্বপ্রথম মুসলমান যুবককে নায়ক ও হিন্দু-বালিকাকে নায়িকা করে সামাজিক উপন্যাস লেখা হয়। বেঙ্গল লাইব্রেরির বার্ষিক রিপোর্টে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মন্তব্য করেন, "হিন্দু যোদ্ধাগণের সঙ্গে মুসলমান যুবতীর প্রেম নিয়ে হিন্দু লেখকগণ দীর্ঘ দিন যাবৎ উপন্যাস লেখার সুবিধা পেয়ে আসছেন। এখন মুসলমান লেখকগণ মুসলমান ভদ্র সন্তানের সহিত হিন্দু যুবতীর প্রেম ও ইসলাম গ্রহণ বিষয়ে উপন্যাস লিখেছেন। আর্জুমন্দ আলীর 'প্রেমদর্পণ' এরূপ একটি দৃষ্টান্ত।"[৯০] হিন্দু লেখকের বিভিন্ন রচনা নিয়ে 'নবনূরে' যখন বাদানুবাদ চলছিল তখন ঐ পত্রিকায় সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী 'বিমলা' নামে ছোটগল্প লেখেন ; এতে হিন্দু বালিকা ও মুসলমান যুবকের প্রণয় চিত্র আছে। দীনেশচন্দ্র সেন 'মিহির ও সুধাকরে' একটি চিঠির মাধ্যমে 'বিমলা' গল্প সম্পর্কে আপত্তি তোলেন এই বলে যে, এতে সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলাকে অপমান করা হয়েছে।[৯১] বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রতিবাদে ইসমাইল হোসেন শিরাজী 'রায়নন্দিনী' (১৯১৫) ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেন। তিনি উপক্রমণিকায় স্বীকার করেছেন, "বাঙ্গালী লেখকগণ তাঁহাদের মোসলেম কুৎসাপূর্ণ উপন্যাসগুলির পরিবর্তন করিয়া সুমতির পরিচয় দিবেন এবং ভবিষ্যতে মুসলমানের বীর্যপুষ্ট গৌরব বিমণ্ডিত আর্দশ-চরিত্র অঙ্কিত করিতে চেষ্টিত হইবেন।"[৯২] তাঁর 'তারাবাঈ'(১৯১৮), 'নূরউদ্দীন' (১৯১৯) উপন্যাসেও একই মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে।

গো-হত্যা

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে দ্বন্দ্ব-বিভেদের কতগুলি কারণ আছে, সেগুলির মধ্যে গো-হত্যার ও গো-রক্ষার সমস্যাটি ছিল সবচেয়ে স্পর্শকাতর এবং সব চেয়ে মারাত্মক। গোহত্যা নিয়ে দাঙ্গা, খুন, মোকদ্দমা সবই সংঘটিত হয়েছে। মুসলমানরা গো-হত্যা করে ও গো-মাংস ভক্ষণ করে। তারা 'ঈদুল আজহা' বা কোরবানি উৎসবে ছাগ, মেষ, মহিষ, উট, দুম্বার সঙ্গে গরুও কোরবান করে।[৯৩] এটি ধর্মপালনের অঙ্গ ; তবে ধর্মোৎসব ছাড়াও বিবাহাদি

৮৯ *ভারতী*, কার্তিক ১৩০৭, পৃ. ৬২৩-২৪

৯০ মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত — *প্রেমদর্পণ*, ঢাকা, ১৯৬৫, পৃ. (ভূমিকা)।

৯১ *মিহির ও সুধাকর*, ৪ অগ্রহায়ণ ১৩১০

৯২ *শিরাজী রচনাবলী* (উপন্যাস খণ্ড), পৃ. ৫

৯৩ 'কোরবান' (আরবি কুর্বান) শব্দের অর্থ উৎসর্গ ; হজরত ইব্রাহিম ঈশ্বরের নিকট স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে নিজ পুত্র ইসমাইলকে উপাস্যের নামে কোরবান করতে উদ্যত হলে ঈশ্বরের মহিমায় তার প্রাণ

সামাজিক উৎসবে এবং উৎসব ব্যতিরেকে গো-মাংস ভক্ষণ উদ্দেশ্যে মুসলমানেরা গরু হত্যা করে থাকে। এদিকে হিন্দুগণ গরুকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে, সেই সূত্রে তাদের কাছে গো-হত্যা মহাপাপ।[৯৪] দুই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধধর্মী ধর্মনীতির কারণে গো-হত্যা ও গো-রক্ষা নিয়ে সহজেই কলহ-বিবাদ বেধেছে। এ সমস্যাটি ভারতব্যাপী ছড়িয়ে ছিল। ১৮৮২ সালে দয়ানন্দ সরস্বতী 'গো-হত্যা নিবারণী সভা' স্থাপন করে গো-রক্ষা আন্দোলনের সূচনা করেন। সভার সদস্য ভ্রাম্যমাণ সাধুগণ বক্তৃতা, পত্রিকা, প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র প্রভৃতির সাহায্যে গো-রক্ষার আর্দশ প্রচার করতেন। এক সময় ভারতীয় কংগ্রেসকে এই আন্দোলনের সঙ্গে জড়ান হয়। ১৮৮৭ সালে মাদ্রাজের বার্ষিক অধিবেশনে রাজশাহীর তাহিরপুরের জমিদার শশিশেখর রায় গো-হত্যা বন্ধের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১৮৯১ সালে নাগপুরের অধিবেশনে গো-রক্ষিণী সভার সদস্যগণ কংগ্রেসের প্যাণ্ডেলে সভা করার ও চাঁদা তোলার অনুমতি পান।[৯৫] গো-রক্ষিণী সভার ফরিদপুর শাখার সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ গো-হত্যা বন্ধ করার জন্য 'কসাই-এর গো-হত্যা' শিরোনামে প্রচারপত্র বিলি করে জনমত তৈরি করেন। প্রচারপত্রে হিন্দু জনসাধারণকে হাটে-বাজারে মুসলমান কসাই-এর কাছে গরু বিক্রয় করতে নিষেধ করা হয়, ঐ সঙ্গে হিন্দু জমিদারদের নিজ নিজ জমিদারীতে গো-হত্যা বন্ধ করার আবেদন জানান হয়। ফরিদপুরের 'আঞ্জুমনে ইসলাম' মুসলমান সমাজের পক্ষ থেকে এর প্রতিবাদ করে জেলা-প্রশাসকের কাছে আবেদন পত্র প্রেরণ করে। ঐ আবেদনপত্রে বলা হয় যে, গো-হত্যার প্রশ্নে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে নিত্য সংঘর্ষ বাধে ; বিহার ও উত্তর প্রদেশে এ নিয়ে দাঙ্গা হয়ে গেছে ; পূর্ববঙ্গে পূর্বে কোন বিবাদ ছিল না, কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের প্রচারণার ফলে হিন্দুগণ গো-হত্যা বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়। মুসলমানেরা এটি মেনে নিতে পারে না, ফলে শান্তি বিঘ্ন হওয়ার খুবই সম্ভাবনা আছে। জেলা-প্রশাসক যাতে ঐরূপ প্রচারণা বন্ধ করার ব্যবস্থা নেন, ঐ পত্রে তার আবেদন জানান হয়েছে।[৯৬]

গোরক্ষিণী সভার পরেই জমিদারদের স্থান। অনেক জমিদার মুসলমান প্রজাদের ঈদ উপলক্ষে গো-কোরবানি অথবা বিবাহ উপলক্ষে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করে দেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ আত্মকথায় ('আমার সংসার জীবন)' লিখেছেন, "গোবিন্দপুর,

রক্ষা পায়, ইসমাইলের পরিবর্তে দুম্বা জবেহ হয়। সেই ঘটনার পর থেকে কোরবানির রীতি চলে আসছে : হজরত মহম্মদ একে ইসলাম ধর্মের অঙ্গীভূত করেন।

৯৪ বেদে বা উপনিষদে গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণ নিষিদ্ধ নয়। প্রাচীন আর্য সমাজে গোমাংস দ্বারা অতিথি আপ্যায়নের রীতি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে হিন্দু সমাজে গোহত্যা ও গোমাংস নিষিদ্ধ নয়। পুরাণে আছে, পৃথু বা বিশ্বপতির নির্দেশে পৃথিবীর ছদ্মরূপ ধারিণী গাভী নিজ দুগ্ধে পৃথিবীকে শস্যশ্যামলা করেন, এজন্য বিশ্বমাতা ও গোমাতা অভিন্ন। ঐরূপ বিশ্বাস থেকে গরু দেবতারূপে পূজ্য হয়ে আসছে।

৯৫ *Muslim Community in Bengal*, p 199

৯৬ *The Moslem Chronicle*, 4 April 1895, p. 138

হরিশঙ্করপুর, সনাতনী, গোপীনগর, আমলা, গোসাঞী পুকুর প্রভৃতি কতকগুলি গ্রাম একজন প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত বড় হিন্দু -জমিদারের জমিদারীভুক্ত ; সেখানকার মুসলমানগণ বহুকাল অবধি গরু কোরবানি করিতে বা গরু জবে ও উহার মাংস ভক্ষণ করিতে পারিত না। কেহ করিলে তাহার আর রক্ষা ছিল না। জমিদার কাছারীর দুর্দান্ত হিন্দু নায়েবগণ কোরবানিদাতা ও গরুহত্যাকারীকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার ও নানা প্রকার অপমান করিত এবং তাহাদের নিকট হইতে জরিমানা আদায় করিত। সুতরাং তাহাদের অত্যাচারে ঐ অঞ্চল হইতে গো-কোরবানী প্রথা উঠিয়া গিয়াছিল।"[৯৭] তিনি আরও বলেছেন, হিন্দু প্রজাগণ এ ব্যাপারে জমিদারকে সমর্থন দিত। তিনি বলেন, সভা-সমিতির মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়ে মুসলমানগণ পরিশেষে সাবধানতা ও গোপনীয়তা রক্ষা করে গো-কোরবানের সুবিধা পায়। 'মোসলেম ক্রনিকলে' একাধিক সংখ্যায় গো-হত্যা সমস্যার সংবাদ প্রকাশ করা হয়। ১৭ মার্চ ১৮৯৫ সালে লেখা হয়, রাজশাহী বিভাগের খোকসার অন্তর্ভুক্ত পানানগর ও অন্যান্য গ্রামের মুসলমানদের প্রতি গো-হত্যার জন্য দুর্ব্যবহার করা হয়। কমিশনারের রিপোর্টে ঐরূপ গো-হত্যা ও গোমাংস ভক্ষণে জমিদারের হস্তক্ষেপের উল্লেখ আছে।[৯৮] ময়মনসিংহের অম্বরিয়া, মুক্তাগাছা ও সন্তোষের জমিদারগণ কয়েকজন গ্রামবাসীকে গো-কোরবানির জন্য জরিমানা করেছিলেন।[৯৯] ১৩১২ সনের ৫ জ্যৈষ্ঠ মিহির ও সুধাকর 'গরুজবাই' শিরোনামে একটি সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদে বলা হয় যে, চাঁদপুরের কতিপয় মুসলমান ঈদ উপলক্ষে গরু কোরবান দিলে গোপালচন্দ্র মজুমদার নামে জনৈক ধনী ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে ফোজদারি নালিশ করেন ; প্রকাশ্য রাস্তায় গরু জবাই করেছে এবং বদ্ধ জলে মাংস ধৌত করে জল অপবিত্র করেছে, তাদের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ আনা হয়। জেলা-হাকিম জগদীশচন্দ্র সেন সরজমিনে তদন্ত না করে একজনকে এক মাস কারাদণ্ড, একজনকে ৫০ টাকা ও অপরজনকে ১৫ টাকা অর্থদণ্ড করেন।[১০০] সাহিত্যের ক্ষেত্রে গো-হত্যা সমস্যা সবচেয়ে গুরুত্ব পায় টাঙ্গাইলের 'আহমদী'তে (১ শ্রবণ ১২৯৫) প্রকাশিত মীর মশাররফ হোসেনের 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রবন্ধকে কেন্দ্র করে। মশাররফ হোসেন ছিলেন উদারপন্থী এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কে সমন্বয়বাদী। তিনি প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলেন, "ভারতের অনেক স্থানে গো-বধ লইয়া বিশেষ আন্দোলন হইতেছে। সভাসমিতি বসিতেছে, বক্তৃতার স্রোত বহিতেছে, ইংরেজি, বাঙ্গালা সংবাদ পত্রিকায় হৃদয়গ্রাহী প্রবন্ধে সকল প্রকাশ হইতেছে, কোন কোন স্থানে হিন্দু মুসলমান একত্রে এক প্রাণে এক যোগে গোবংশ রক্ষার উপায় উদ্ভাবন করিতেছেন। কোন কোন ইংরেজি পত্রিকায় আবার প্রতিবাদও চলিতেছে। এসময় আর নীরব থাকা উচিত মনে করিলাম না।"[১০১] গো-হত্যা উভয়ের সম্পর্কে ফাটল ধরায়

৯৭ *ইসলাম-প্রচারক*, ৮ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ১৩১৪, পৃ.২৭৫
৯৮ *The Moslem Chronicle*, 17 March 1895, p.16
৯৯ *Ibid*, 20 May 1895, p.235
১০০ *Ibid*, 16 May 1896, p. 224
১০১ *মশাররফ রচনা-সম্ভার*, পৃ. ৩১৫

বলে তিনি মুসলমানদের গো-কোরবানি বন্ধ ও গোমাংস ভক্ষণ ত্যাগ করতে বলেন। তিনি বলেছেন, "এই বঙ্গরাজ্যে হিন্দু-মুলসমান উভয় জাতিই প্রধান। পরস্পর এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যে, ধর্মে ভিন্ন, কিন্তু মর্মে এবং কর্মে এক — সংসার কার্য্যে ভাই না বলিয়া আর থাকিতে পারি না। আপদে বিপদে সুখে দুঃখে, সম্পদে পরস্পরের সাহায্য ভিন্ন উদ্ধার নাই। সুখ নাই, শেষ নাই, রক্ষার উপায় নাই। এমন ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ যাহাদের সঙ্গে, এমন চিরসঙ্গী যাহারা, তাহাদের মনে ব্যথা দিয়া লাভ কি?"[১০২] টাঙ্গাইলের অপর পত্রিকা 'আখবারে এসলামীয়া' মশাররফ হোসেনের বক্তব্যের প্রথম প্রতিবাদ করে ; পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন ছিলেন গোঁড়াপন্থী। তিনি ধর্ম সভায় বক্তৃতার ও পত্রিকায় লেখার মাধ্যমে মশাররফের প্রতিবাদ করে আন্দোলন গড়ে তোলেন। 'আখবারে এসলামীয়া'য় (শ্রাবণ ১২৯৫) প্রথম প্রতিবাদ হয় জনৈক ব্যক্তির প্রেরিত একটি পত্রে।[১০৩] পত্রে ২১টি পরিচ্ছেদে মশাররফের যুক্তি খণ্ডন করা হয়। পত্র শেষে উপদেশ দিয়ে বলা হয়, "সমাজের গ্রন্থি অতিশয় দৃঢ়, একটুক সাবধান হইয়া লিখনি ধরিবেন ; সমাজকে চটাইলে বড় প্রমাদ ঘটিবার সম্ভাবনা। উপসংহারকালে একটি হিতোপদেশ না দিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারিলাম না। আপনি তওবা করিয়া পুনরায় মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হউন। তাহা না হইলে আপনার মুক্তিলাভের কোনই উপায় নাই।"[১০৪] দ্বিতীয় প্রস্তাব 'গোধন কি সামান্য ধন'-এ (শ্রাবণ ১২৯৫) মশাররফ হোসেন বলেন, "মোসলমান শাস্ত্রে গোজাতির গুণের ব্যাখ্যা নাই — সুতরাং সাধারণ পশুর মধ্যে পরিগণিত। ... অত্রস্থ কোন মৌলবী মহামতির কথার আভাষে বুঝিয়াছি যে, ঐ কথা ভিন্ন আর তাঁহাদের কোন কথা নাই। ঐ কথাটুকু আশ্রয় করিয়াই গোধনের জীবন সংহার করিতে বাধ্য। ... কিন্তু ঐরূপ প্রতিবাদ, কি সভাসমিতির ভয়ে, এ অত্যাচার, অন্যায়াচার, হৃদয় বিদারক, মর্মাহত ভীষণ ব্যাপার স্বরূপ গো-হত্যা নিবারণ বিষয়, প্রস্তাব লিখিতে অধমের লিখনি ক্ষান্ত হইবে না।"[১০৫] 'আহমদী'র সম্পাদক আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী মশাররফের সমর্থনে সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন। ২ ভাদ্র, ১২৯৫ তারিখে টাঙ্গাইলে ধর্মসভা হয়, সেখানে টাঙ্গাইলের অবৈতনিক কাজী ও নইমুদ্দীনের সহযোগী মৌলবী সুলতান আহমদ "মোসলমান ধর্মসভার সভ্যগণের সম্মুখে গোকুল নির্মূল প্রস্তাব বিষয়ে উল্লেখ করিয়া লিখককে (মশাররফকে) 'কাফের' এবং 'স্ত্রী হারাম' হওয়া সাব্যস্ত করিয়া উপস্থিত সভ্যগণকে বুঝাইয়া সমস্ত ব্যক্ত করেন।"[১০৬] মোহাম্মদ নইমুদ্দীন 'ভারতে গোবধ' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে মশাররফ হোসেন ও আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ীর লেখার কঠোর সমালোচনা করেন। তিনি

১০২ *মশাররফরচনা-সম্ভার*, পৃ. ৩১৯

১০৩ সম্পাদক মন্তব্য করেন, "আহমদীতে গোকুল নির্মূল সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পড়িয়া নীরব থাকিতে পারিলাম না। আল্লা চাহে এ সম্বন্ধে পৃথকরূপে লিখিব, এবার এসলামীযার একটি প্রিয় বন্ধুর প্রেরিত প্রবন্ধটা প্রকাশ করিলাম।" — *মশাররফ রচনা-সম্ভাব*, পৃ. ৩৩০-৪০

১০৪ ঐ, পৃ. ৩৪৯-৫০

১০৫ ঐ, পৃ. ৩২৮

১০৬ *মশাররফ রচনা-সম্ভার*, পৃ. ৩৬৭

গো-হত্যা আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে মন্তব্য করেন, "হিন্দু ধর্মাবলম্বীগণ আইন দ্বারা গোবধ নিবারণ করিতে গবর্নমেন্টকে উপদেশ দিতেছেন। সরল মনে বন্ধুভাবে একথা বলিলেও কতকটা ভাল শুনায়, আইন কানুন ও জোরজবরদস্তির কথা শুনিলে আমাদের মনে বিজাতীয় ঘৃণা ও রোষের সঞ্চার হয়। ওরূপ কথা শুনিলে আমরা স্পষ্টই অনুভব করিব, ইহা মুসলমানদিগের সহিত বিবাদ বিসম্বাদের কারণই — আর কিছুই নহে।"[১০৭] তিনি ধর্মসভার প্রস্তাব সমর্থন করে বলেন, "এরূপ প্রবন্ধ লিখিয়া তিনি (মশাররফ) খোদাতালার সত্য-ধর্ম প্রচারকের আদেশ অমান্য করতঃ নিশ্চয়ই কাফের হইয়াছেন।"[১০৮] তাঁর অপর বক্তব্যে প্রাণনাশের হুমকি আছে, "এসলামী ধর্ম বিগর্হিত অন্যায় কথা শুনিয়া কোন মুসলমান সহ্য করিতে পারিবে? . . .অধিক কি বলিব ধর্ম সম্বন্ধে মুসলমানগণ প্রাণকে তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া থাকে ইহা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ, যদি মুসলমানের রাজ্য হইত তাহা হইলে আহমদী সম্পাদকের ও আপনার জীবন তিন দিবসের ছিল।"[১০৯] 'কাফের' এবং 'স্ত্রী হারাম' এরূপ ফতোয়ার বিরুদ্ধে মীর মশাররফ হোসেন টাঙ্গাইলের মুন্সেফ আদালতে মানহানির মামলা দায়ের করেন। 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা', 'গোধন কি সামান্য ধন', ' গোমাংস', 'গোদুগ্ধ' প্রবন্ধ চতুষ্টয় এবং 'আখবারে এসলামীয়া'য় প্রকাশিত একটি প্রতিবাদপত্র ও একটি প্রবন্ধ একত্র করে মশাররফ হোসেন 'গোজীবন' (১৫ ফাল্গুন ১২৯৫) প্রকাশ করেন। তিনি এলাহাবাদের 'গোরক্ষিণী সভা' হতে লিখিত শ্রী শ্রীমান স্বামীর একটি পত্র (১০ জানুয়ারি ১৮৮৯) 'সাধারণের বিদিতার্থে গো-জীবনের মুখবন্ধ স্বরূপ' গ্রন্থের পুরোভাগে প্রকাশ করেন। শ্রীমান স্বামী এলাহাবাদস্থিত 'কাও মেমোরিয়াল ফান্ডে'র কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক ছিলেন। পত্রটি এরূপ : "মহাশয়। আপনার ২১শে পৌষ তারিখের পত্র যথাসময়ে প্রাপ্ত হইয়া বিশেষ সুখলাভ করিলাম। আপনার প্রস্তাবগুলি পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইলে আমার নিকট পাঠাইয়া কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ করিবেন। ইতিমধ্যে আপনার 'গো-মাংস' বিষয়ক প্রস্তাবটি যাহা শীঘ্রই প্রেরণ করিবেন লিখিয়াছেন পাঠ করিয়া বিশেষ সুখী হইব। মহাশয়ের ন্যায় সজ্জান লোকের দ্বারা দেশে যথেষ্ট উপকার হইতেছে, তাহা আমার মত ক্ষুদ্রজনের বলা বাহুল্য মাত্র। ভরসা করি আপনি মধ্যে মধ্যে গো-হত্যা সম্বন্ধে লিখিয়া আমার উপদেশকের পদ গ্রহণ করিবেন।"[১১০] গ্রন্থের শেষে মোশাররফ হোসেন বলেন, "দায়াময় ভগবানের অনুগ্রহ হইলে এই গো জীবন শীঘ্রই আরবী, ফারসী, উর্দু এবং হিন্দি ভাষায় অনুবাদিত হইয়া পবিত্র ধাম মক্কা মোয়াজ্জামায়, পুণ্যক্ষেত্র বাগদাদে, মোসলমান রাজ-প্রধান প্রদেশ তুরস্কে, হায়দারাবাদে, ঢোকে, দিল্লীতে এবং আজমীর শরিফে প্রেরণ করিয়া তথাকার প্রধান প্রধান মৌলবী, মৌলানা, মহামতীগণের

১০৭ ঐ, পৃ, ৩৫২
১০৮ ঐ, পৃ. ৩৫৫
১০৯ ঐ, পৃ. ৩৫৬
১১০ ঐ, পৃ. ৩০৯

মতামত সংগ্রহ করিয়া যত সত্বর হয় পুনঃ প্রকাশ হইবে।"[১১১] গো-জীবনের 'দুই হাজার কাপী বিনামূল্যে বিতরিত হইবে' বলে ঘোষণা করা হয়।

সম্ভবত 'গো-জীবনে'র এসব বক্তব্য গো-হত্যার সমর্থকগণের শিরঃপীড়া আরও বৃদ্ধি করে। টাঙ্গাইলের সীমানা ছাড়িয়ে এ দ্বন্দ্ব ঢাকা, কলিকাতা ও অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে। কলিকাতার 'সুধাকর' সাপ্তাহিক (১৮৮৯) 'আখবারে এসলামীয়া'কে সমর্থন দিয়ে প্রচার আরম্ভ করে। সুধাকরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন শেখ আবদুল রহিম ও মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ। রেয়াজুদ্দীনের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল রক্ষণশীল ও সাম্প্রদায়িক। তিনি অল্পকথায় লিখেছেন, "যখন প্রধান সাহিত্যিক মীর মশাররফ হোসেন সাহেব 'গো-জীবন' নামক পুস্তক লিখিয়া মুসলমানদিগের গো-মাংস ভক্ষণ ও গো-কোরবাণীর বিরুদ্ধে অন্যায় দোষারোপপূর্বক তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং তদুত্তরে অন্যতম সাহিত্যিক ধর্মগ্রন্থপ্রণেতা 'আখবারে এসলামীয়া'র সম্পদক মৌলবী নইমুদ্দীন সাহেব এরূপ গ্রন্থ লেখক মুসলমানের উপর কাফেরী ফৎওয়া দিয়া 'আখবারে এসলামীয়া'য় উহা প্রকাশ করেন এবং মীর সাহেব মৌলবী সাহেবের নামে মানহানির মামলা দায়ের করেন, তখন আমরা 'সুধাকরে' অবশ্যই মৌলবী সাহেবের পক্ষ সমর্থন করিতেছিলাম। কিন্তু পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী সাহেবও এবিষয়ে আমাদিগকে বিশেষভাবে উত্তেজিত করিয়া ধর্মের পবিত্র মর্যাদা রক্ষা করিতে সনির্বন্ধ অনুরোধ করিয়াছিলেন।"[১১২] 'সুধাকরে' বিভিন্ন স্থানের সভাসমিতির বক্তব্য ও প্রেরিতপত্র ছাপা হত। টাঙ্গাইলের মামলার বিবরণ নিয়মিত প্রকাশ করা হয়, এমন কি 'অতিরিক্ত পত্রে' কলিকাতা-হুগলী মাদ্রাসার মৌলবীদিগের সাক্ষ্য ও মতামত ছাপা হয়।[১১৩]

ঢাকার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে ঢাকা মাদ্রাসা স্কুলের শিক্ষক ওয়ারেস আলী সুধাকরে একটি পত্র (৯ নভেম্বর ১৮৮৯) প্রেরণ করেন। তিনি ঐ পত্রে ঢাকায় অনুষ্ঠিত স্থানীয় মুসলমান ছাত্রদের একটি বিরাট সভা এবং সভায় গৃহীত প্রস্তাবের বিবরণ দেন। তাঁর মতে সভাটি হয় মৌলবী নইমুদ্দীনের প্রতি সভানুভূতি জানাবার উদ্দেশ্যে। নইমুদ্দীন তখন টাঙ্গাইলের মুন্সেফ কোর্টে মানহানির মামালায় জড়িত ছিলেন। ঢাকা কলেজ, মাদ্রাসা, পোগোজ, জুবিলী, জগন্নাথ ইনস্টিটিউশন, সার্ভে, মেডিকেল ও নর্মাল স্কুল এবং মক্তব ও পাঠশালার ছাত্রগণ সভায় যোগদান করে। মাদ্রাসার অধ্যাপক আবুল ওফা, শিক্ষক হেমায়েতউদ্দীন আহমদ বিএ, অলিওর রহমান বিএ, জহিরুল হক, কলেজিয়েট স্কুলের শিক্ষক আহমদ বিএ সভায় উপস্থিত ছিলেন। মাদ্রাসার আরবি অধ্যাপক মৌলবী হাফেজ আবদুল্লা সভাপতিত্ব করেন। পত্রলেখকের ভাষায় সভাপতির একটি বক্তব্য ছিল এরূপ : "কোন মুসলমান নামধারী যদি ছলচক্রে বিধর্মীর মনস্তুষ্টি ও বন্ধুতাপ্রার্থী হইয়া এসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে কূট অসি সঞ্চালন করে, তদবস্থায় স্বধর্মানুরাগী প্রকৃত বিশ্বাসী কোন

১১১ ঐ, পৃ. ৩৬৯
১১২ আবদুল কাদির — 'মোহাম্মদ নইমুদ্দীন', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬, পৃ. ৪৫
১১৩ *সুধাকর*, ৬ ও ১৩ পৌষ ১২৯৬

মহোদয় যদি এসলামধর্ম রক্ষার্থী হইয়া বিপদগ্রস্ত হন, তবে সে বিপদ যে জাতীয় এবং ঐ বিপদমুক্তির জন্য সাহায্য করা যে সমস্ত মুসলমানের কর্তব্য, ইহা বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন।"[১১৪] "গো-জীবনের প্রতি মৌলবী নইমউদ্দীন সাহেব সরাসঙ্গতরূপে যে সকল প্রতিবাদ করিয়াছেন অত্রসভা সেই প্রতিবাদ যথার্থ ও শাস্ত্রীয় বলিয়া সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করিতেছে।" — এটি ছিল সভায় সর্বসম্মতিকমে গৃহীত প্রস্তাব।[১১৫]

'সুধাকরে'র ১২৯৬ সনের ২২ অগ্রহায়ণ সংখ্যায় কুমিল্লার প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পরিবেশন করে বলা হয় যে, কুমিল্লার জমিদার মুন্সী আলি করিমের গৃহে একটি সভা হয়, আশরফউদ্দীন আহমদ সভাপতি হন। নইমুদ্দীন সাহেবের সাহায্যার্থে চাঁদা সংগ্রহ সভার মূল উদ্দেশ্য ছিল। সভার প্রস্তাবে নইমুদ্দীন সাহেবকে সহানুভূতি ও সমর্থন জানান হয়।[১১৬] নোয়াখালীর মুসলমান প্রেরিত একটি পত্রে (১৫ ডিসেম্বর ১৮৮৯) 'নোয়াখালী এসলামীয়া সভা'র ১ ডিসেম্বর (১৮৮৯) অনুষ্ঠিত একটি অধিবেশনের বিবরণ সুধাকরে প্রকাশিত হয়। সভায় মৌলবী নইমুদ্দীনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং তাঁর সাহায্যার্থে প্রয়োজনবোধে চাঁদা প্রদানের প্রস্তাব নেয়া হয়। গোবধ নিবারণ আন্দোলনের অযৌক্তিকতা দেখিয়ে মুন্সী ওহাজুদ্দীন আহমদ যে প্রবন্ধ রচনা করেছেন সেটি সভার ব্যয়ে পুস্তাকাকারে ছাপিয়ে চার হাজার কপি বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা সম্পর্কে অপর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।[১১৭] কেশবচন্দ্র সেনের 'সুলভ সমাচার' মীর মশাররফ হোসেনকে সমর্থন দিয়ে প্রবন্ধ প্রকাশ করে। ২০ পৌষ ১২৯৬ সন সুলভ সমাচার এরূপ একটি লেখায় মীরের উদারতা ও সুযুক্তির প্রশংসা করে। 'সুধাকর' সমাচারের 'অনধিকারচর্চা'র প্রতিবাদ করে।[১১৮]

মশাররফ হোসেন ও মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের মামলায় পরস্পরের অভিযোগগুলি যাচাই করার জন্য আদালত একটি কমিশনের মাধ্যমে মোট ৩১ টি প্রশ্নমালা তৈরি করে ৫জন বিশেষজ্ঞের মতামত সংগ্রহ করেন। "সুধাকর' ১২৯৬ সনের ৬ ও ১৩ পৌষ অতিরিক্ত পত্রে ঐ মতামত প্রকাশ করে। ঢাকা মাদ্রাসার সুপরিন্টেণ্ডেন্টে মৌলবী আবদুল খায়ের, হুগলী মাদ্রাসার প্রধান মদাররস গোলাম সলমানী, ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের আরবি ও ফারসির অধ্যাপক পণ্ডিত রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, ঢাকা কলেজের আরবি ও ফারসির অধ্যাপক আবদুল মনায়েম এবং মাদ্রাসা আলিয়ার তৃতীয় অধ্যাপক মোহাম্মদ এসমাইল লিখিত ভাবে তাঁদের মতামত জানিয়ে ঐ প্রশ্নাবলীর উত্তর দেন। পত্রিকার ভাষায় কয়েকটি প্রশ্ন ছিল এরূপ : [১১৯]

১১৪ ঐ, ৮ অগ্রহায়ণ ১২৯৬, পৃ. ১৯
১১৫ ঐ, ২২ অগ্রহায়ণ ১২৯৬, পৃ. ৩৫
১১৬ ঐ, ১৩ পৌষ ১২৯৬, পৃ. ৬৩
১১৭ *সুধাকর*, ১৩ পৌষ ১২৯৬, পৃ. ৩৫
১১৮ ঐ, ২৭ পৌষ ১২০৬, পৃ. ৭৯
১১৯ গোজীবনের শেষ দিকে মশাররফ হোসেন লিখেন, "এইক্ষণে লিখক এসলামীয়া সম্পাদক মৌলবী নইমুদ্দীন ও তাঁহার বহুরূপী বন্ধু এবং অবৈতনিক কাজী সুলতান আহমদ খাঁ সাহেবকে এতদ্দ্বরা জ্ঞাপন করিতেছে যে, তাঁহারা গো-জীবনের কোন ২ প্রস্তাবের কোন ২ শব্দে লিখককে কাফের ও

* 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রস্তাব যাহা বিগত ১২৯৫ সনে টাঙ্গাইলে 'আহমদী' পত্রিকায় তৎপর আখবাবে এসলামীয়ায়, তৎপর 'গো-জীবনে', তৎপর 'গো-কাণ্ডে' প্রকাশ হইয়াছে উহা আপনি দেখিয়াছেন কিনা, যদি না দেখিয়া থাকেন তবে অত্রসহ যে গো-জীবন পাঠান হইল তাহা পাঠ করুন। (১)

* ঐ 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রস্তাব সকল মুসলমানী ধর্ম বিরুদ্ধ ও মুসলমান সমাজেব অহিত অনিষ্টকর হইয়াছে কিনা? (২)

* ঐ প্রবন্ধ সকলের স্থানে স্থানে মুসলমানী ধর্মকে এস্তেহজা (বিদ্রূপ ও নিন্দা) এবং কোরানের হুকুমকে রদ্দ করা হইয়াছে কিনা? (৩)

* ঐ 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রস্তাবে মুসলমান সমাজের মনে আঘাত লাগিয়াছে কিনা? (৪)

* উক্ত 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রবন্ধের প্রতিবাদে মুসলমানী ধর্মের প্রকৃত ভাব প্রকাশ করা ও মুসলমান সমাজের হিতার্থে উহা প্রচার করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য কার্য্য কিনা?(৭)

* মুসলমানী ধর্ম বিরুদ্ধ প্রস্তাব শুনিয়া ধর্মের ও সমাজের হিতার্থে উহার প্রকৃত ভাব প্রকাশ না করিয়া নীরব থাকিলে মুসলমান আলেমগণ পাপী হইবেন কিনা? (৮)

* উক্ত 'গোকুল নির্মূল আশঙ্কা' প্রস্তাবে বরাহ খাইলে নরক জাহান্নাম, তাহাতেই চিরবাস করিতে হইবে একথা আছে কিনা? না থাকিলে কোরানের প্রতি এফতেরা (অপবাদ) কবা হইয়াছে কিনা? (১১)

টাঙ্গাইলের উক্ত মামলা শেষ পর্যন্ত আপোষে নিষ্পত্তি হয়। মশাররফ হোসেন গো-জীবনের আর মুদ্রণ করবেন না এবং মুদ্রিত সংখ্যাগুলি প্রচারে বিরত হবেন, এরূপ শর্তে নিষ্পত্তি হয়।

মোশাররফ-নইমুদ্দীনের মামলার নিষ্পত্তি হলেও গো-হত্যা সমস্যা দূরীভূত হয়নি ; বাদ-প্রতিবাদমূলক বই-পুস্তক রচনাধারা অব্যাহত থাকে। 'গো-জীবনে'র পর গো-হত্যা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে রচিত নিম্নের বইগুলি উল্লেখযোগ্য :

গো-কাণ্ড (১৮৮৯) — মোহাম্মদ নইমুদ্দীন

অগ্নি-কুক্কুট (১৮৯০) — মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী

তাঁহার স্ত্রী হারাম হওয়া স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছেন সেই ২ স্থানে সেই শব্দ বা উক্তি বিশেষ রূপে নির্দিষ্ট কবিযা অদ্য হইতে (১৫ ফাল্গুন ১২৯৫) ত্রিশ দিনের মধ্যে লিখকের প্রতিনিধি টাঙ্গাইল মুন্সেফী আদালতেব উকিল শ্রীযুক্ত বাবু হবচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয় নিকট প্রেরণ করুন এবং এসলামীযা পত্রিকায় প্রকাশ করুন।" সম্ভবত ঐ প্রশ্নমালা মশাররফের উক্তি ও নইমুদ্দীন প্রমুখের আনীত অভিযোগের ভিত্তিতে রচিত হয়।

গোবধে আপত্তি কেন (১৯০০) — ওহাজুদ্দীন আহমদ

গোকুল নির্মূল আশঙ্কায় ভারতবাসীর নিকট ফকীর দীন মোহাম্মদের আবেদন (১৯০৪) — দীন মোহাম্মদ

কলিকাতার গো-কোরবানী হাঙ্গামা (১৯১১) — ঐ।

এগুলির মধ্যে 'অগ্নিকুক্কুটে'র লেখক রেয়াজুদ্দীন মাশহাদী সুধাকরের সঙ্গে জড়িত ছিলেন ; কমিশনের প্রশ্নমালার উত্তরদাতাদের মধ্যেও তিনি ছিলেন একজন। অগ্নিকুক্কুটের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে সুধাকরে লেখা হয় "গরু কোরবানী ও গো-মাংসভক্ষণ মোসলমানের সামাজিক কার্য, উহা লইয়া হিন্দুগণ মোসলমানদের প্রতি অত্যাচার করেন, তাহার কারণ কি এবং সে অত্যাচার নিবারণের উপায় কি, তৎসমুদয় এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। ইহার প্রথম অংশে যুক্তি ও বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ, দ্বিতীয় অংশে শাস্ত্রসম্মত প্রমাণ ও তৃতীয় ভাগে হিন্দুদিগের বেদ-সংহিতার ভুরিভুরি প্রমাণে পরিপূর্ণ।"[১২০] পূর্ববঙ্গের কোন কোন জমিদার মুসলমান প্রজাদের গো-হত্যায় বাধা দেন এরূপ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করে তিনি সরকারের কাছে একটি 'তদন্ত কমিশনে'র দাবী করেছেন যাতে কৃষকেরা এরূপ বাধা ও অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই পায়।[১২১] মশাররফের 'গো-জীবন'কে লক্ষ্য করেই দীন মোহাম্মদ প্রথম গ্রন্থ লেখেন ; দ্বিতীয় গ্রন্থটি কলিকাতার ১৯১১ সালের গো-কোরবানী উপলক্ষে হাঙ্গামার ঘটনা নিয়ে রচিত। সিরাজগঞ্জের মোহাম্মদ মেহেরুল্লার 'শ্লোকমালা', ফজলুর রহমানের 'গো-কোরবানী' (১৯১৪), মোহাম্মদ মোহসেনুল্লাহর 'বুধির সুতা', আইনুল ইসলাম খোন্দকারের 'গরু ও হিন্দু-মুসলমান' (১৯১১) প্রভৃতি গ্রন্থেও উক্ত সমস্যা স্থান পেয়েছে।

হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক একটি বহুমাত্রিক সমস্যায় আন্দোলিত হয়েছিল। 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের সঙ্গে ভাব বিনিময়ের মাধ্যমে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের, 'কেন্দ্রীয় ন্যাশানাল মহামেডান এসোসিয়েশন' প্রতিবেশী জনগণের স্বার্থ রক্ষার এবং 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস' হিন্দু-মুসলমানের সৌহার্দ্য সম্পর্ক উন্নয়নের কথা প্রচার করেছে। সভ্য হওয়ার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানগুলিতে হিন্দু-মুলসমান বিভেদ ছিল না, কিন্তু সমিতির উদ্যোক্তা ও সভ্য সংখ্যার প্রাধান্য অনুযায়ী সেগুলির কর্মসূচি নিয়ন্ত্রিত হত। 'মহামেডান লিটারেরি সোসাইটি' এবং 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭) নামেই যেমন, তেমনি কামেও আপন আপন সমাজের স্বার্থকে বড় করে দেখতো। ফলে হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের পৃথক অস্তিত্ব, পৃথক মতিগতি ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। যুগ, সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা সমকালীন

১২০ সুধাকর, ৩ ফাল্গুন ১২৯৬, পৃ. ১১৩
১২১ Muslim Community in Bengal. p 363

সাহিত্যকেও প্রভাবিত করেছে। মুসলমানের জাত্যাভিমান, হিন্দুর আর্যাভিমান, মুসলমানের প্রভুশক্তির অপব্যবহার, নব্যহিন্দুর ধনগর্ব ও শিক্ষা-অহংকার, মুসলমানের পশ্চাদবর্তিতা, হিন্দুর অগ্রগামিতা, মুসলমানের বঞ্চনা, হিন্দুর সুবিধাভোগ, ইংরাজদের 'সুয়োরানী-দুয়োরানী ভেদনীতি, হিন্দু ও মুসলমানের পৃথক ধর্মনীতি ইত্যাদি বিষয়কে উভয়ের মধ্যে বিভেদ ও বিরোধ সৃষ্টির জন্য দায়ী করা হয়। গ্রামের হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ কোন সময় বড় আকারে দেখা দেয়নি, বরং নানাভাবে পরস্পরের স্বার্থে তারা মিলেমিশে বসবাস করেছে। গ্রামে সীমিত গণ্ডীর মধ্যে পুরুষানুক্রমে যারা একত্রে বাস করেছেন, তারা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পারে না। সাম্প্রদায়িক বিভেদের উৎস আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীল শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণী। কোম্পানির রাজত্বে দ্রুত প্রসার ও উন্নয়নের ফলে বিপুলকায় নব্য মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এরা গ্রাম থেকে এলেও ক্রমে পেশায়, শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ও সম্পদে গ্রাম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। স্বাধীন আর্থিক বুনিয়াদ না থাকায় এদের একটি আলাদা শ্রেণী-স্বার্থ দাঁড়িয়ে যায়। দেশের ব্যবসায় বাণিজ্য ও শিল্পোৎপাদন ধ্বংসে হওয়ায় এদেরকে শাসকশ্রেণীর অনুগ্রহভাজন হয়ে চাকুরিকেই জীবিকার প্রধান উৎস মনে করতে হয়েছে। ক্ষমতালিপ্সু ও উপনিবেশবাদী ইংরাজগণ কখনই নিজ স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে এদেশের মানুষের উন্নতি দেখবেন না। ঐতিহাসিক কারণে আধুনিক নগরী কলিকাতার মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুখ্য রূপকার হলেন হিন্দু সম্প্রদায়। মুসলমান সম্প্রদায় বিত্ত ও বিদ্যা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সর্বহারার শ্রেণীভুক্ত হয়। উভয় সমাজের এই অসম বিকাশই প্রকৃতপক্ষে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে দূরত্ব রচনা করেছে। এর সঙ্গে নবোত্থিত মধ্যবিত্তের অন্তর্নিহিত শ্রেণীচরিত্র ও শ্রেণী-স্বার্থ কাজ করেছে। হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-উৎপত্তির কাল ও পাত্র বিচার করলে দেখা যায় যে, শহরে আধুনিক শিক্ষিত মুসলমান মধ্যবিত্তের কণ্ঠ উচ্চারিত হওয়ার আগে পর্যন্ত তেমন বিরোধ ছিল না। যখন মুসলমানরা লেখাপড়া শিখে নিজেদের দাবী-দাওয়া ও অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে, তখনই স্বার্থের দ্বন্দ্ব বেঁধেছে। শ্রেণী-চরিত্রের সাধারণ ধর্ম হল এই যে, তা স্থানচ্যুত ও ক্ষমতাচ্যুত হতে চায় না। স্বার্থরক্ষা ও স্বার্থ-বৃদ্ধির প্রয়াস থেকেই হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ-মূলের উৎপত্তি হয় বলে আমাদের বিশ্বাস। এই কায়েমি স্বার্থ থেকে জাতিভেদ, ধর্মভেদ, সংস্কৃতিভেদ ইত্যাদি বোধ ও বুদ্ধির উদয় হয়। উপর তলার শ্রেণী নীচ তলার শ্রেণীকে ব্যবহার করে। শাসক ইংরাজ ব্যবহার করেছে শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে, মধ্যবিত্ত শ্রেণী গ্রামের কৃষক-শ্রমিককে। বিরোধের গতি এ পথেই অগ্রসর হয়েছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাঙালি হিন্দু-মুসলমান বুদ্ধিজীবীরা এই দ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়েছেন এবং পরস্পর পরস্পরকে দোষারোপ করেছেন। তাঁরা অনেকেই মিলন কামনা করেছেন, কিন্তু বিরোধের মূল কারণ ধরে অগ্রসর হননি বলে সফল হতে পারেননি।

ধর্ম

খ্রিস্টীয় সাত শতকে হজরত মহম্মদ (৫৭০-৬৩২) আরব ভূমিতে ইসলাম ধর্মের প্রবর্তন করেন। তাঁর পূর্বপুরুষগণ মূর্তিপূজক ছিলেন। বহুদেবতাবাদী পৌত্তলিকতার বিরোধিতা করেই একেশ্বরবাদী ইসলামধর্মের উদ্ভব। এই ধর্ম কালক্রমে আরব থেকে ইরান, তুরস্ক, মিসর, স্পেন, আফগানিস্তান, ভারতবর্ষ ও দূর প্রাচ্যদেশসমূহে বিস্তার লাভ করে। অষ্টম শতকে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ইসলামধর্মের আবির্ভাব ঘটে। ঐ সময় ও তারপর থেকে বাংলায় ইসলামধর্ম আরব বণিক ও ধর্ম প্রচারকগণের মাধ্যমে প্রচারিত হতে থাকে। ত্রয়োদশ শতকে রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের পর ধর্ম প্রচারের পথ সুগম ও প্রশস্ত হয়। বাংলাদেশে ইসলামধর্ম প্রচার ও বিস্তারের সাথে সাথে মুসলমান সমাজের পত্তন ও বিকাশ কিভাবে হয়েছে, তা প্রথম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

মুখ্যভাবে 'সুন্নি' ও 'শিয়া' এই দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়ে মুসলমান সমাজ বিভক্ত। সুন্নিগণ হজরত মহম্মদকে আল্লাহর প্রেরিত 'নবী' বলে মনে করেন এবং তাঁর প্রচারিত কোরান-হাদিসের অনুসরণ করে ধর্মকর্ম ও সামাজিক রীতিনীতি পালন করেন। শিয়া সম্প্রদায় হজরত মহম্মদকে নবী হিসাবে স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা 'খলিফায়ে রাশেদিন' বা খলিফা চতুষ্টয়ের (হজরত আবু বকর, ওমর ফারুক, ওসমান ও মোয়াবিয়া) কর্তৃত্ব স্বীকার করেন না ; হজরত মহম্মদের জামাতা কোরেশ বংশীয় আলীকে (৬৫৬-৬১) একমাত্র খলিফা বলে স্বীকার করেন। হজরত ওসমানের (৬৪৪-৫৬) মৃত্যুর পর চতুর্থ খলিফা নির্বাচন নিয়ে আলী ও মোয়াবিয়ার সমর্থকগণের মধ্যে মতভেদ ও দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়। উক্ত দ্বন্দ্বের ফলে আলী আততায়ীর হাতে নিহত হন। মোয়াবিয়ার পুত্র এজিদ রাজনৈতিক ক্ষমতালাভের জন্য আলীর জ্যেষ্ঠপুত্র ইমাম হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করেন এবং কনিষ্ঠ পুত্র ইমাম হোসেনকে কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধে নিহত করেন। এই কারবালার নির্মম শোকাবহ ঘটনাকে স্মরণ করে শিয়ারা মহরম উৎসব পালন করেন। সুন্নিগণ মহরম উৎসবের আতিশয্য পছন্দ করেন না, বরং কতক আচরণ, যথা জারি বা মার্সিয়া গাওয়া, তাজিয়া, দুলদুল, দরগাহ বানান, শোকমিছিল বের করা, ঢোলবাদ্য সহকারে লাঠিখেলা ও নর্তনকুর্দন করা ইত্যাদি বেদাত কার্য বলে মনে করেন। তাঁরা মহরম উপলক্ষে দোয়াদরূদ পড়া, রোজা রাখা ও সুন্নত নামাজ পড়া এবং কাঙালিভোজন করান সমর্থন করেন। ইসলাম শরীয়ত মতে নামাজ, রোজা, হজ, জাকাত ও কলেমা — এই পাঁচটি হল ফরজ বা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। প্রত্যেক সাবালক, সক্ষম ও সমর্থ নারী-পুরুষ এগুলি পালন করবেন, পালন না করলে তাঁদের মুসলমানিত্ব থাকে না ; 'কাফের' বা বিধর্মীতে পরিণত হন। শিয়ারা নামাজ পাঠের ক্ষেত্রে কোরান হাদিসের নির্দেশ পুরোপুরি পালন করেন না, তাঁরা দৈনিক পাঁচবার নামাজের স্থলে দু'বার নামাজ জায়েজ

বলে মনে করেন এবং তদনুযায়ী নামাজ পড়েন। শিয়া–সুন্নির এরূপ মতপার্থক্য নিয়ে মুসলিম বিশ্বের সর্বত্র দ্বন্দ্ব–সংঘর্ষ হয়েছে। আরবে সুন্নি সম্প্রদায় ও পারস্যে শিয়া সম্প্রদায়ের সংখ্যা বেশি। বাংলাদেশে প্রথমাবধি আরব বণিক ও পীর–দরবেশ কর্তৃক ধর্ম প্রচারিত এবং তুর্কি–আফগান শাসকগণ কর্তৃক দেশশাসিত হওয়ায় সুন্নি মতাবলম্বীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। মোঘল বাদশাহ হুমায়ুনের আমলে ভারতবর্ষে প্রথম শিয়াদের প্রভাব পড়ে। তিনি পারস্য সম্রাটেব সাহায্যে দিল্লীর সিংহাসন পুনরুদ্ধার করেছিলেন। সতের শতকে ঢাকার শাসনকর্তা মুকরম খানের (১৬২৬–২৭) সময় বাংলাদেশে শিয়াদের আগমন ঘটে ; তিনি ঘটা করে খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে 'বেরা ভাসান উৎসব' পালন করেন। মহরম উৎসবের প্রচলনও ঐ সময় থেকে আরম্ভ হয়। ১৮৮১ সালের আদমশুমারিতে মূল বাংলার বিভাগ ভিত্তিক শিযা–সুন্নির সংখ্যা ছিল এরূপ[১] :

বিভাগ	সুন্নি	শিয়া
বর্ধমান	৯,২১,০০৬	২৮,২৭২
প্রেসিডেন্সি	৩৯,৬৪,৪৬৯	৪৭,৮৬৩
বাজশাহি	৪৭,৩৯,২৯৩	৮৫,২৫৯
ঢাকা	৫৫,০২,২৩২	২০,৭৭৯
চট্টগ্রাম	২৪,০৭,৭১২	৯, ৯৬৬
	১,৭৫,৩৪,৭১২	১,৯২,১৩৯

ধর্মমত ও তত্ত্বের দিক থেকে সুন্নিদের মধ্যে শরিয়ত ও মারিফত এ–দুটি ধারা আছে। শরিয়তপন্থীরা পিউরিটান মনোভাবাপন্ন, তাঁরা কোরান–হাদিসকে একমাত্র দিগদর্শন মনে করেন এবং তদনুসারে ধর্মীয় আচার–আচরণ পালন করেন। তাঁরা শুদ্ধ জ্ঞানাচারী। মারিফতপন্থীরা অধ্যাত্মবাদী, তাঁরা প্রেম–ভক্তির মাধ্যমে আল্লার জিকির বা ভজন করেন।[২] হজরত মহম্মদেব মৃত্যুর পর আরব ভূমিতেই ইসলামেব এই মবমিয়া ভক্তিবাদ বা সুফিদের উদ্ভব হয়, তবে পারস্য ভূমিতে এর বিকাশ ও প্রসার ঘটে।[৩] সুফিরা বিশ্বাস করেন, হজরত মহম্মদ আলীকে তত্ত্ব বা গুপ্তজ্ঞান দিয়ে যান। সেই তত্ত্বজ্ঞানকে আশ্রয় করে সুফিমতের উদ্ভব হয়।[৪] সুফিরা স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য দেখেন না, এ অর্থে তাঁরা

১ *Report on the Census of Bengal*, 1881, Vol-12, p.44
এ রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, রংপুরে শিয়াদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক — ৩৯, ৫৪০ জন দিনাজপুরে ছিল ২৬,৪৪৮ জন, মুর্শিদাবাদে ছিল ১৪,৫৪০ জন, হুগলিতে ছিল ১০,১৪৬ জন, পাবনায় শিয়ার সংখ্যা সর্বনিম্ন ছিল — ২৪ জন মাত্র।

২ কোরআনের ৮৮ সুরাব ২২ আযাতে আছে, "অতএব (আল্লাহকে) স্মরণ কর, কেননা তুমি একজন স্মারক মাত্র। সুফিরা এরূপ ইঙ্গিত থেকে জিকির বা জবা করার নির্দেশ পায়। আহমদ শরীফ, 'বাংলায় সুফি প্রভাব', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক–পৌষ ১৩৭৬, পৃ. ৭৯

৩ মুহম্মদ এনামুল হক, *বঙ্গে সুফি প্রভাব।*

৪ পূর্বোক্ত, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, কার্তিক–পৌষ, ১৩৭৬, পৃ. ৭৯

অদ্বৈতবাদী।[৫] শরিয়তপন্থীরা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে অভিন্ন মনে করেন না। সুফিমত ও শরিয়তমতের এটাই মৌলিক পার্থক্য। পীর-মুর্শিদকে মধ্যস্থ হিসাবে মেনে সুফিরা মওলা তথা পরমেশ্বরের সাধনা করেন। "সুফিরা আল্লাহর ধ্যানের প্রাথমিক অনুশীলন হিসাবে পীরের চেহারা ধ্যান শুরু করেন। গুরুতে বিলীন হওয়ার অবস্থায় উন্নীত হলেই শিষ্য আল্লাতে বিলীন হওয়ার সাধনার যোগ্য হয়। প্রথম অবস্থা 'ফানাফিশ শেখ,' দ্বিতীয় অবস্থা 'ফানাফিল্লাহ'। প্রথমটি রাবিতা বা গুরু সংযোগ, দ্বিতীয়টি মুরাকিবাহ বা আল্লার ধ্যান।"[৬] বৌদ্ধ থেরবাদ ও তান্ত্রিক গুরুবাদের সঙ্গে সুফির পীরবাদের মিল আছে। ভারতবর্ষে প্রথম থেকে পীরদরবেশ, অলি-আউলিয়া দ্বারা ধর্ম প্রচারিত হয়, এজন্য এদেশে সুফীমতের যথেষ্ট প্রভাব আছে। এক একজন সুফি দরবেশের 'তরিকা' (পথ) অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন শিষ্য সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে। এগুলির মধ্যে চিশতীয়া, নকস্‌বন্দিয়া, কাদেরিয়া, সোহরাওয়ার্দীয়া, মাদারিয়া, পাঁচ পীরিয়া প্রভৃতি প্রধান। বাংলাদেশেও এসব মতবাদের অনুসারীরা আছেন ; বাংলাদেশকে 'পীর-আউলিয়া'রই দেশ বলা হয়, চট্টগ্রামকে 'বার আউলিয়া'র অঞ্চল বলা হয়। চট্টগ্রাম, শ্রীহট্ট, ঢাকা, বরিশাল, খুলনা, রাজশাহী, বগুড়া, রংপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, হুগলী, ২৪-পরগণা প্রভৃতি জেলায় বিভিন্ন পীরের নামে অসংখ্য মাজার, আস্তানা, খানকাহ, দরগাহ ও মকবরা আছে। পীরের মাজার দর্শন, কবর পূজা, মানত মানা, বাতি দেওয়া ইত্যাদি আচার ভক্তরা পালন করে। কোথাও কোথাও সামা-হল্‌কা (নাচ-গান), দারা-জিকির, সাকি-ইশক প্রভৃতির রেওয়াজ আছে। শরিয়তপন্থীরা এগুলিকে অনৈসলামিক আচার বলে মনে করেন ; এসব নিয়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাত বাধে। মনসুর হল্লাজ 'আনাল হক' তত্ত্ব প্রচার করেছিলেন বলে পারস্য সম্রাট কর্তৃক মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন।

সুন্নি মজহাব বা সম্প্রদায়ের 'হানাফি' ও 'মহম্মদি' নামে দুটি মুখ্য বিভাগ আছে। হানাফিরা চার ইমামের নির্দেশাবলী অনুসরণ করেন — তাঁরা হলেন হানাফী, শাফী, মালেকি ও হাম্বেলি। ইমাম বা ধর্মীয় ব্যবস্থাকার হিসাবে তাঁরা ইসলাম ধর্ম পালনের নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁদের নির্দেশাবলী 'ফিকাহ', 'তফসির' প্রভৃতি ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। চারজনের যে-কোন একজনকে অনুসরণ করে হানাফি সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়া যায় ; কারণ তাঁদের শাস্ত্র ব্যাখ্যার মৌলিক কোন পার্থক্য ছিল না। মহম্মদীরা কোরান ও হাদিসের নির্দেশকে সর্বস্ব জ্ঞান করে । কোরন অপৌরুষেয় তথা আল্লাহর বাণী, হাদিস হজরত মহম্মদের উপদেশ সম্বলিত বাণী। কোরান ও হাদিসকে একান্তভাবে অনুসরণ করার পক্ষপাতী বলে তাঁদের অপর নাম 'আহলে হাদিস'। সুফি মতের সাথে হানাফি মতের তেমন বিরোধ নেই ; পীরভক্তরা নিজেদের হানাফি বলেই পরিচয় দেন, কিন্তু আহলে হাদিস সম্প্রদায়ের সাথে হানাফি সম্প্রদায়ের যথেষ্ট মত-বিরোধ আছে।

৫ আল্লাহ মানুষের ঘাড়ের শিরা থেকেও কাছে আছেন — কোরআনের (সুরা ৫০ আয়াত ১৬) এরূপ ইঙ্গিত থেকে সুফিরা অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব গ্রহণ করেন। ঐ, পৃ. ৭৯

৬ ঐ, পৃ. ৮১

বাংলাদেশে এ নিয়ে অনেক 'বাহাস' বা বিতর্ক, বাদানুবাদ ও সংঘর্ষ হয়েছে, দ্বন্দ্ব-কলহের এক পর্যায়ে হানাফিরা আহলে হাদিস সম্প্রদায়কে 'লা-মজহাব' বা ধর্মহীন সম্প্রদায় বলে অভিহিত করেন।[৭] আরবে মোহম্মদ বিন আবদুল ওহাব (১৭০৩-৮৭) অনৈসলামিক রীতিনীতির বিরুদ্ধে প্রথম আন্দোলন করেছিলেন। কোরান ও হাদিসের আক্ষরিক অর্থ ধরে যে ধর্মাদর্শ ও সমাজনীতি পাওয়া যায়, তিনি সেরূপ বিধি প্রচার করেন। তিনি গুহ্যতত্ত্ব বা অধ্যাত্মতত্ত্ব অস্বীকার করেন। তাঁর আন্দোলন 'ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে পরিচিত। গোঁড়া ওয়াহাবিরা মদিনায় হজরত মহম্মদের কবর পর্যন্ত ভেঙে দিয়েছিলেন।[৮] দিল্লীর শাহ ওয়ালিউল্লাহর (১৭০৩-৬৩) মাধ্যমে ওয়াহাবি আদর্শে ভারতবর্ষে ধর্মসংস্কার আন্দোলন শুরু হয়, ওয়ালিউল্লাহর পুত্র আব্দুল আজিজ (১৭৪৬-১৮২৩)এবং তৎশিষ্য সৈয়দ অহমদ শহীদের (১৭৮৬-১৮৩১) দ্বারা এ ধারার আন্দোলন পূর্ণতা লাভ করে। বাংলার হাজী শরীয়তুল্লাহ (১৭৮৩-১৮৪০) এবং তৎপুত্র দুধু মিঞা (১৮১৯-৬০) এই একই আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 'ফারায়েজি আন্দোলন' করেছিলেন। ফারায়েজী আন্দোলন মূলত অর্থনৈতিক আন্দোলন হলেও, ধর্মপ্রভাব মুক্ত ছিল না। এটি শেষ পর্যন্ত ধর্ম, অর্থনীতি, রাজনীতি ত্রিমুখী আন্দোলনের রূপ গ্রহণ করে।

শিয়া-সুন্নি, হানাফি-মোহাম্মদি প্রভৃতি ধর্মীয় অন্তর্বিরোধের পাশাপাশি অন্য ধর্মাবলম্বীদের মতাদর্শ ও আচরণের সাথে ইসলামের বহির্দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। আলোচ্য যুগে খ্রিস্টধর্মের সাথে বিরোধ তীব্র হয়। 'গো-হত্যা' নিয়ে হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে মুসলমানদের মনোমালিন্য তীব্রতর হয়। হিন্দু-ধর্মের নানা রকম আচার-আচরণ মুসলমান সমাজে প্রভাব বিস্তার করেছে, ধর্ম প্রচারকগণ সেগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করেন। ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রভাবের বিরুদ্ধেও তাঁদের সোচ্চার হতে দেখা যায়। স্বধর্মের নীতি, আর্দশ ও আচরণবিধি নিয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং অন্যধর্মের প্রভাব, প্রচার ও আক্রমণ নিয়ে যে বহির্দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল, এখন সে বিষয়ে আলোচনা করা যায়।

বহির্দ্বন্দ্ব : ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম

ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্ম উভয়ই প্রচারশীল। মিশনারির মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা সারা বিশ্বে আছে। ইসলাম প্রচারের জন্য এরূপ সুশৃঙ্খল মিশন পদ্ধতি বিশ্বের কোন মুসলিম রাষ্ট্রে ছিল না। খ্রিষ্টান মিশনারিগণ রীতিমত দীক্ষা নিয়ে ধর্মপ্রচারে নামতেন। তাঁরা শহর-গ্রাম-গঞ্জে মিশন খুলে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করে ধর্মপ্রচার করতেন। মিশনের সঙ্গে থাকত দাতব্য-চিকিৎসালয়, বিদ্যালয়, অনাথাশ্রম, সেবাশ্রম ইত্যাদি। তাঁরা স্থানীয় ভাষায় পুস্তক-পুস্তিকা ও পত্র-পত্রিকা মুদ্রিত করে বিনা মূল্যে বিতরণ করতেন। এগুলিতে

৭ প্রচারকে (চৈত্র ১৩০৭) লেখা হয় — "মুসলমানদিগের মধ্যে কতক লোক এমন আছেন যাঁরা চারি মজহাবের কোন কোন মজহাবই মানেন না, অবস্থাভেদে ইহারা আহলে হাদিস, গায়র মোকল্লেদ, লা-মজাহাব ও অহাবি নামে অভিহিত।"

৮ *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, পৃ. ১১৮

খ্রিষ্টধর্মের মহিমা ও পর ধর্মের নিন্দার কথা থাকত। তাছাড়া, হাট-বাজার জনবহুল স্থানে তাঁরা বক্তৃতা দিয়েও খ্রিষ্টধর্মের মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। মিশন-তহবিল থেকে দীন-দরিদ্রদের অর্থ সাহায্য দানেরও ব্যবস্থা করতেন। সাধারণ মানুষ সহজে তাঁদের শিকারে পরিণত হত।[৯] বাংলাদেশে ইংরাজ, ফরাসি, দিনেমার প্রভৃতি ইউরোপীয় জাতির বিভিন্ন মিশনারি ছিল। ১৮৫০ সালে কলিকাতা ও আশাপাশের জেলাগুলিতে খ্রিষ্টান মিশনারির সংখ্যা ছিল ৭১টি ; ব্যাপটিস্ট মিশনারি সোসাইটি, প্রটেস্ট্যান্ট মিশনারি, লণ্ডন মিশনারি সোসাইটি, চার্চ মিশনারি সোসাইটি, ফ্রি চার্চ অব স্কটল্যাণ্ড, সেন্ট পল ক্যাথলিক মিশন প্রভৃতি নামের মিশনগুলি কর্মরত ছিল।[১০] কলিকাতায় মিশনের সংখ্যা ছিল ৩০টি। কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলায় হিন্দুর বসবাস বেশি ছিল, এজন্য মিশনারিদের দৃষ্টি হিন্দু সম্প্রদায়ের উপর পড়ে। হিন্দুদের মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রথা ছাড়াও আরও কতকগুলি ধর্মীয় সামাজিক প্রথা ছিল যা মিশনারিদের ধর্মীয় চিন্তাদর্শনের সম্পূর্ণ প্রতিকূল ছিল ; গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন দেওয়া, সতীদাহ প্রথা, অন্তর্জলি প্রথা, বাণফোঁড় প্রথা প্রভৃতি। ইউলিয়ম কেরি, উইলিয়ম এ্যাডাম প্রমুখের ধারণা হয়েছিল, হিন্দুদের ইউরোপীয় বিদ্যায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে তাদের মধ্য থেকে ধর্মসংস্কারগুলি তিরোহিত হবে এবং সেই সূত্রে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারও সুবিধা হবে। চাকুরি, শিক্ষা, অর্থের লোভ দেখিয়ে তাঁরা কিছু লোককে ধর্মান্তরিত করতে সফল হয়েছিলেন। হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে ইয়ং বেঙ্গলদের উদ্বোধিত করা অংশত মিশনারিদের চিন্তাধারার ফল। শুধু নিম্নবর্ণের নয়, উচ্চবর্ণের সন্তানেরা খ্রিষ্টধর্মে আকৃষ্ট হন। মহেশচন্দ্র ঘোষ (১৮৩২), গোপীনাথ নন্দী (ঐ), লালবিহারী দে (১৮৪৩), জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর (১৮৫১) খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৩৮ সালের মধ্যে দশ জন হিন্দু কলেজের ছাত্র দীক্ষা নেন। মধুসূদন দত্ত হিন্দু কলেজে পড়ার সময় খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষা নেন (১৮৪৩)।[১১] হিন্দু সমাজের পক্ষ থেকে এর প্রতিক্রিয়া হয়। রাধাকান্ত দেবের মত গোঁড়াপন্থী এবং রামমোহনের মত উদারপন্থী যাঁরা ইংরেজি শিক্ষার সমর্থন দিয়েছিলেন, তাঁরা ধর্মান্তরীকরণের বিষয়টিকে সুনজরে দেখেননি। রামমোহনের একেশ্বরবাদী ব্রাহ্মধর্মের

৯ রামমোহন রায় 'ব্রাহ্মণ সেবধি'তে (সেপ্টেম্বর ১৮২১) লিখেছেন, "ইদানিন্তন বিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাহারা মিশনারী নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোসলমানকে ব্যক্তরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত খ্রিস্টান করিবার যত্ন নানা প্রকারে করিতেছেন। প্রথম প্রকার এই যে নানাবিধ ক্ষুদ্র ও বৃহৎ পুস্তক সকল রচনা ও ছাপা করিয়া যথেষ্ট প্রদান করেন যাহা হিন্দু ও মোসলমানের ধর্মের নিন্দা ও হিন্দু দেবতার ও ঋষির জুগুপ্সা ও কুৎসাতে পরিপূর্ণ হয়, দ্বিতীয় প্রকার এই যে লোকের দ্বারের নিকট অথবা রাজপথে দাঁড়াইয়া আপনার ধর্মের উৎকর্ষ ও অন্য ধর্মের অপকৃষ্টতা সূচক উপদেশ করেন, তৃতীয় প্রকার এই যে কোনো নীচলোক ধনাশয়ে কিম্বা অন্য কোনো কারণে খ্রীস্টান হয় তাহাদেগকে কর্ম দেন ও প্রতিপালন করেন যাহাতে তাহা দেখিয়া অন্যের ঔৎসুক জন্মে।" ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় — *বাংলা সাময়িক পত্র*, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৭৯, পৃ. ১৬ (৪র্থ সং)।

১০ Muhammad Mohar Ali — *The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities*, The Mehrub Publications, Chittagong, 1965,pp.206-09 (Appendix A).

১১ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ*, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ২০২

প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এদেশীয় হিন্দু সন্তানদের মধ্য হতে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রবণতা দূর করা।

মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্মান্তর গ্রহণের সংখ্যা বেশি ছিল না। দু'একটি পুস্তকে মহম্মদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কথা লিখলে মুসলমানদের পক্ষ থেকে তীব্র প্রতিবাদ ওঠে। ১৮০৭ সালে শ্রীরামপুর মিশনের প্রেস থেকে মুদ্রিত একটি পুস্তিকায় মহম্মদের নিন্দা করা হয়, পুস্তিকাটি জোয়াদ সবত নামে একজন ধর্মান্তরিত মুসলমান যুবক লেখেন। লর্ড মিন্টোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। কেরি ক্ষমা চেয়ে পুস্তিকার কপি তুলে নেন।[১২] ১৮৩৯ সালে রেভারেণ্ড সি.জি. ফাণ্ডারের লেখা পুস্তিকার বিরুদ্ধেও আন্দোলন হয়। তিনি আগ্রার চার্চ মিশনারি সোসাইটির ধর্মপ্রচারক ছিলেন। ইসলামের বিরুদ্ধে আক্রমণ করে তিনি ফারসি ভাষায় 'মিজানুল হক' 'তরিকুল হায়াত' 'মিফতাহুল ইসরার' ও 'দসারাত-ই-সিরাজুল হায়াত' পুস্তিকা লেখেন। মুসলমান সম্প্রদায় থেকে এগুলির বিরুদ্ধে কেবল প্রতিবাদই হয়নি, মৌলবীগণ বির্তক সভায় উপস্থিত হয়ে এগুলির জবাব দিয়েছেন এবং প্রতি আক্রমণ করে পুস্তক ও প্রচারপত্র লিখেছেন।[১৩]

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রথম দিকে মিশনারিদের প্রশ্রয় দেননি, কিন্তু ১৯১৩ সালে সনদ লাভের সময় তাঁদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয় এবং ১৮৩৩ সালে সনদের সময় তাঁদের ধর্ম প্রচারের কাজে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। ১৮৫০ সালের ২১তম বিধিতে ধর্মান্তরিত ব্যক্তি পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবেন না, এরূপ আইন করে কোম্পানি পরোক্ষভাবে মিশনারিদের সহায়তা করেন। সুতরাং হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায় থেকে প্রতিবাদ উঠলেও খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রচার কার্য অব্যাহত থাকে। তাঁরা ধর্মপ্রচারের কৌশল ও মাধ্যমগুলি সমান ব্যবহার করতে থাকেন। তাঁরা বিদ্যালয়, চিকিৎসালয়, অনাথশ্রম, সেবাশ্রম, অর্থদান ইত্যাদির সাহায্যে বস্তুগতভাবে এবং বই পুস্তক, প্রচারপত্র, পত্রিকা, বক্তৃতাদির মাধ্যমে আধ্যাত্মিকভাবে জনসাধারণকে প্রভাবিত করতে থাকেন। বাংলা ভাষার প্রথম দুটি সংবাদপত্র 'দিগদর্শন' (এপ্রিল ১৮১৮) এবং 'সমাচার দর্পণ' (মে ১৮১৮) 'শ্রীরামপুর ব্যাপ্টিষ্ট মিশন' থেকে জন ক্লার্ক মার্শম্যানের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের মাধ্যম হিসাবে পত্রিকা দুটি ব্যবহৃত হয়নি সত্য, তবে হিন্দুধর্মের হীনতা ও অসারতা দেখিয়ে কিছু পত্র ছাপা হত।[১৪] কিন্তু এর অল্পকাল পরেই দেখা যায়, সাময়িক পত্রকে প্রচারযন্ত্র হিসাবে মিশনারিগণ ব্যবহার করেছেন। ১৮১৮–১৮৬৮ সাল পর্যন্ত এই পঞ্চাশ বছর সময় সীমায় খ্রিষ্টধর্ম প্রচারোদ্দেশ্যে যেসব বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল : [১৫]

১২ *The Bengli Reaction to Christian Missionary Activities*, pp 3.4.

১৩ *Ibid*, pp.203-04.

১৪ *বাংলা সাময়িকপত্র*, পৃ. ৪–৫, ১৭ (৪র্থ সং)। ইংরাজি ভাষায় অনেক পত্র ছিল, সেগুলির মধ্যে 'ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া' (১৯১৮) 'দি ক্যালকাটা ক্রিশ্চিয়ান অবজার্ভার' প্রধান ছিল।

১৫ তালিকাটি 'বাংলা সাময়িকপত্রে'র সাহায্যে প্রণীত।

পত্রিকা	সম্পাদক/প্রকাশক	কাল
গসপেল ম্যাগাজিন (মাসিক)	ব্যাপ্টিস্ট অগজিলিয়ারি মিশনারী সোসাইটি	ডিসেম্বর ১৮১৮
খ্রিষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি (মাসিক)	—	মে ১৮২২
মঙ্গলোপাখ্যান পত্র (মাসিক)	জন রবিনসন	জানুয়ারি ১৮৪৩
উপদেশক (মাসিক)	জন ওয়েঙ্গার	জানুয়ারি ১৮৪৭
সত্যপ্রদীপ (সাপ্তাহিক)	মেরিডিথ টৌন্সেণ্ড	মে ১৮৫০
সত্যার্ণব (মাসিক)	জেমস লঙ	জুলাই ১৮৫০
সংবাদ সুধাংশু (সাপ্তাহিক)	কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়	সেপ্টেম্বর ১৮৫০
অরুণোদয় (মাসিক)	লালবিহারী দে	আগস্ট ১৮৫৬
তত্ত্ববিকাশিনী (মাসিক)	—	জানুয়ারি ১৮৬৭

'খ্রিষ্টের রাজ্যবৃদ্ধি' পত্রিকার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লেখা হয় "অন্য দেশে খ্রীষ্টিয়ান লোকেরা কিরূপ পাপিদিগের পরিত্রাণার্থে প্রার্থনা করে ও মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে ও লোকেরদিগকে শিক্ষা করিতে কিরূপ পরিশ্রম করে ও অন্য লোক দ্বারা মঙ্গল সমাচার ঘোষণা করিতে আপনারা কত টাকা ব্যয় করে ও ঈশ্বর তাহারদিগের প্রার্থনা কিরূপ শ্রবণ করেন ও তাহাদের ক্রিয়ার ফল দেন। এই সকল তোমারদিগের জ্ঞাত করার কারণ মাসে ২ এই মত পুস্তক ছাপা হইবে। তাহাতে নানাদেশীয় ভাল সমাচার দেওয়া যাইবেক এই পুস্তক বিষয়েতে যে লাভ হইবে তাহা ভাল ২ পুস্তক ছাপাইয়া ধর্মজ্ঞানার্থে হিন্দুরদিগকে দিতে এবং তাহারদিগকে পরিত্রাণের পথ শিক্ষা করাইতে ব্যয় করা যাইবেক। আমরা এই ভরোসা করি যে তোমরা এ বিষয়ে আমারদিগের সহায়তা করিবা ... ও প্রভু যিশু খ্রীষ্টের মঙ্গলসমাচার ঘোষণা করণার্থে বাঙ্গালি খ্রীষ্টিয়ানের মধ্যে একদল কর।"[১৬] 'মঙ্গলোপ্যাখ্যান' পত্রের প্রচারোদ্দেশ্য ছিল, "এইক্ষণে আমরা যে পত্র ইউরোপীয় ও এতদ্দেশীয় বন্ধু ও ভ্রাতৃগণের সম্মুখে অর্পণ করি তাহা বর্তমান বৎসরের আরম্ভে শ্রীরামপুর বঙ্গদেশস্থ ডুবক (ব্যাপটিষ্ট) মণ্ডলীর প্রথম মিলিত সভার ফল। আমাদের চতুর্দিকস্থ দেব পূজকেরদের পারমার্থিক ও সাধারণ মঙ্গলচেষ্টক ধর্মোপদেশক ও ঈশ্বরপরায়ণ বন্ধুবর্গের সভা তাঁহারদের নানা স্থান হইতে আগমনের দ্বারা আমাদের পরমানন্দ জন্মিল এবং অনেক লোক প্রভুর প্রতি ফিরিয়াছে এবং অনেকে আপনাদের পরিত্রাণের পথ অন্বেষণ করিতেছে এই যে সম্বাদ তাঁহারা প্রকাশ করিলেন তদ্বারা আমাদের অন্তকরণ আরো আনন্দিত হইল।"[১৭]

উদ্ধৃতিগুলি থেকে বুঝা যায় যে, মিশনারিদের লক্ষ্য ছিল হিন্দু সমাজ। হিন্দু অপেক্ষা মুসলমান সমাজে তুলনামূলকভাবে ধর্মান্তরীকরণ কম হয়েছে তার প্রধান দুটি কারণ : মিশনারীদের ক্রিয়াকলাপ প্রথম দিকে হিন্দু অধ্যুষিত কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে

১৬ *বাংলা সাময়িক পত্র*, পৃ. ২৫
১৭ ঐ, পৃ. ৮১

হয়েছে ; মুসলমান অধ্যুষিত উত্তর ও পূর্ববঙ্গে তাঁদের মিশনকার্য বেশি সম্প্রসারিত হয়নি। দ্বিতীয়ত মিশনারি পরিচালিত বিদ্যালয় ও কলেজগুলি ধর্মান্তরিত করার উত্তম কেন্দ্র ছিল। শহরাঞ্চলে কেন্দ্রীভূত এসব স্কুল-কলেজে হিন্দু ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি ছিল। কলিকাতায় জেনেরাল এ্যাসেম্বলিজ ইনস্টিটিউশন, ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন, ইংলিশ সেমিনারি, বিশপস কলেজ ইত্যাদি ত্রিশ-চল্লিশ দশকে স্থাপিত হয়। শক্তিশালী পাদরি আলেকজাণ্ডার ডফ কয়েকটি স্কুল পরিচালনা করতেন। তাঁরা ক্রমান্বয়ে মুসলমান সমাজের দিকেও হস্ত প্রসারিত করেন। খ্রিষ্টান মিশনারিদের সাথে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ মিলিত হয়ে সামগ্রিকভাবে ইসলাম, হজরত মহম্মদ ও কোরানের বিরুদ্ধে অপপ্রচার আরম্ভ করেন। রেজাউল করিম লিখেছেন, "মুইর, সেল, স্প্রেঞ্জার, জুয়েমার, মারগালুইথ প্রভৃতি খ্রিষ্টান লেখক ইসলামধর্মকে হেয় করিবার জন্য, ইসলামের মতসমূহকে নিন্দা করিবার জন্য বহু গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই সব গ্রন্থ বিদ্বেষপূর্ণ ভাবধারায় পরিপূর্ণ। বহু মুসলমান লেখক ঐ সকল খ্রিষ্টান লেখকের বিদ্বেষপূর্ণ গ্রন্থের প্রত্যুত্তর সেইরূপ ভাষায় দিয়াছেন।"[১৮] স্যার উইলিয়ম মুইর 'লাইফ অব মহম্মদ' (১৮৬৯) গ্রন্থে হজরত মহম্মদ ও ইসলাম সম্পর্কে বক্রোক্তি করেন। সৈয়দ আহমদ 'খুতুবাত-এ-আহমদীয়া' (১৮৭০) গ্রন্থে মুইরের অভিযোগের ও অপব্যাখ্যার জবাব দেন। তিনি মহম্মদের জীবনীর অলৌকিক ঘটনাগুলিকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদের মাপকাঠিতে যাচাই করে এগুলিব আধ্যাত্মিক যৌক্তিকতা নিরূপণ করেন। প্রতীকের সাহায্যে বর্ণিত আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম তত্ত্বকে ইন্দ্রিয়ানুভূত প্রকৃতিবিজ্ঞানের আলোকে বিচার করে খ্রিষ্টান পাদরিগণ মুসলমানদের ধর্ম বিশ্বাসকে বিদ্রূপ করেছেন, সৈয়দ আহমদ এই লেখাটিতে তারই যুক্তি-সঙ্গত প্রতিবাদ করেন।[১৯] তাঁর 'তাবিনুল কালাম ফি তাফসিরাত তাওরাতি অল ইনজিলে আলা মিল্লাতিল ইসলাম' গ্রন্থে ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনা আছে। সৈয়দ আমীর আলী 'লাইফ এণ্ড টিচিং অব দি প্রফেট' (১৮৭৩) গ্রন্থে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে মহম্মদের উন্নত আদর্শ ও পবিত্র জীবনের চিত্র তুলে ধরেন। তিনি যে একজন মহামানব, প্রগতিশীল চিন্তানায়ক, উদার বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন, আমীর আলী সে বিষয়েও আলোকপাত করেছেন। তিনি অপর গ্রন্থ 'ক্রিশ্চানিটি ফ্রম দি ইসলামিক স্ট্যান্ডপয়েন্ট' (১৯০৬)-এ ইসলাম ও খ্রিষ্টধর্মের তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। খ্রিষ্টান জগতে ইসলাম ও মহম্মদকে অপদস্থ করার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তিনি প্রকারান্তরে তারই জবাব দিয়েছেন এসব রচনায়। আব্দুল লতিফ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক পরীক্ষা করার সময় সাহেবদের কোন কোন রচনায় মহম্মদ ও মুসলমান সম্প্রদায় সম্পর্কে আপত্তিকর বক্তব্য আছে বলে উল্লেখ করেন এবং মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া হয় বলে সেগুলি পাঠ্যতালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলন।[২০] আবদুল লতিফ

---

১৮ রেজাউল করিম — *বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ*, পৃ. ১০

১৯ *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, পৃ. ১৬

২০ *Nawab Bahadur Abdul Latif : H is Writings and Related Documents*, pp. 219-20

'বেথুন সোসাইটি'র (১৯৫১) সদস্য ছিলেন। ১৮৬০ সালের ১৫ই জানুয়ারি সোসাইটির তৃতীয় অধিবেশনে ম্যাকক্রিণ্ডেল 'দি ক্রুসেডস' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে আবদুল লতিফ প্রবন্ধের কতকগুলি আপত্তিকর উক্তির প্রতিবাদ করেন। হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টানের মিশ্র সভায় কোন ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে বিরূপ কোন কিছু না বলার যুক্তিযুক্ততা সভা কর্তৃক স্বীকৃত হয়।[২১] ১৮৯২ সালে অতুলকৃষ্ণ মিত্র বাঙ্গালার রঙ্গমঞ্চে 'ধর্মবীর মহম্মদ' নামক পুস্তকের অভিনয়ের উদ্যোগ নিলে মুসলমান সমাজে তার প্রতিক্রিয়া হয়। আবদুল লতিফ সমাজের এরূপ মনোভাব বুঝে সেটি বন্ধ করার ব্যবস্থা করেন। তিনি ইংলণ্ডেও অনুরূপ প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে টাইমসপত্রে পত্র লিখে প্রতিবাদ করেছিলেন।[২২] ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী আত্মজীবনী 'দাস্তানে ইব্রাতবার'-এ (১৮৮০) বলেছেন যে কলিকাতা মাদ্রাসার শিক্ষা শেষ করে (১৮৫৭) তিনি কিছু কাল ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানে ব্যাপৃত হন। তিনি মৌলবী এনায়েত রসুলের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁর নিকট ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস, বাইবেল ও অন্যান্য নবী-গ্রন্থে রসুলের আগমন বার্তা সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করেন। তিনি খ্রিষ্টান পাদরীদের কাছ থেকে বাইবেলের অনুবাদ সংগ্রহ করে পড়তেন এবং তাদের সাথে বির্তকে লিপ্ত হতেন। তিনি লিখেছেন, "আমি সে সময় খ্রিষ্টানদের ভিত্তিহীন ধর্মীয় বিশ্বাস খণ্ডনে একটি পুস্তিকা রচনা করি। পাদরিদের সাথে বিতর্ক করে আমি প্রায়ই তাদের পরাস্ত করতাম।"[২৩] কলিকাতার সীমানা ছেড়ে মফস্বলেও প্রতিবাদী কণ্ঠ উচ্চারিত হয়। এবাব প্রতিবাদের ভাষা বাংলা। মুনশী মেহেরুল্লা প্রথম নেতৃত্ব দেন।

মুনশী মেহেরুল্লার জীবনীকার শেখ হবিবর রহমান মেহেরুল্লার জীবিতকালে বাংলা ও ভারতবর্ষে খ্রিষ্টান ধর্ম যাজকদের ইসলাম বিরোধী প্রচারকাযের্র প্রকৃতি বর্ণনা করে লিখেছেন, "এই শ্রেণীর পাদ্রীগণ ইসলামকে হেয় প্রতিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে বহুসংখক কোরান শরীফের তরজমা ও তফসির প্রকাশিত করিয়াছেন। 'ইসলাম-দর্শন', 'মিজানুল হক', 'তালিমে মোহাম্মদী', 'ইসলাম-দর্পণ', 'তহকিকল ইমান' এবং এই শ্রেণীর প্রাণ জুড়ানো বহু ইসলামী নামের আবরণে নানা কেতাব প্রচার করিয়া ইসলামের বিরুদ্ধে ইহার তীব্র হলাহল উদগীরণ করিয়া থাকেন। ('মোসলেম ওয়ার্ল্ড' নামে একখানি সুপরিকল্পিত পত্রিকা এই উদ্দেশ্যেই প্রচারিত হইয়া থাকে।) অসাধারণ বিদ্যাবত্তায় এইসব তার্কিক পণ্ডিতগণ সত্যকে এমনভাবে মিথ্যা প্রমাণিত করেন যে, তাহাতে সাধারণের ত দূরের কথা, অনেক মৌলভী মৌলানা বা বিচক্ষণ পণ্ডিত ব্যক্তিরও মাথা ঘুরিয়া যায়। ... বহুলোকই ভ্রান্তিবশে পাদ্রীদের সম্মোহনমন্ত্রে আকৃষ্ট হইয়া খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করে বা ইসলামের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। বিরুদ্ধ রাজশক্তির বন্দুক, কামান, বোমা, বেয়োনেট ইসলামের যে

২১ যোগেশচন্দ্র বাগল — 'বেথুন সোসাইটি', *বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ*, কলিকাতা, ১৩৬৭, পৃ, ৬১-৬২

২২ মন্মথনাথ ঘোষ — 'মহাত্মা আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর সি.আই.ই.', *মালঞ্চ*, আশ্বিন ১৩২৪

২৩ মুহম্মদ আবদুল্লাহ — 'ওবায়দুল্লাহ আল উবায়দী সুহরাওয়ার্দীর আত্মজীবনী', *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিত, ১৩৮৮, পৃ. ৮৮

ক্ষতি করিতে পারে, এই শ্রেণীর সাহিত্য কর্তৃক ক্ষতি তাহা অপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক।"[২৪] 'ইসলাম-প্রচারকে'র প্রথম সংখ্যার (ভাদ্র ১২৯৮) সূচনায বলা হয়, "আমাদের ধর্মের শত্রু আজকাল প্রধানত খ্রিষ্টিয়ানগণ। ইহারা বৎসরে লাখে লাখে টাকা খরচ করিয়া স্ত্রী পুরুষ নানা ভেক ধারণ করিয়া নানা উপায়ে ধর্ম প্রচার করিতেছে, ইহাদের অধ্যাবসায় অটল, ইহারা ধর্মপ্রচারের জন্য জলের ন্যায় অর্থবৃষ্টি করিয়া থাকে। আবার দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে সেই অঞ্চল আড্ডা করিয়া গরীব লোকদিগকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করে। এই উপায়ে নদীয়া যশোহর জেলার বহু সংখ্যক নিরক্ষর মুসলমান খ্রিষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। নদীয়া কৃষ্ণনগরের পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামেব প্রায় সমস্ত চাষী প্রজাই 'ঈসাই দীন' কবুল করিয়াছে।"[২৫] 'মোসেলম ক্রনিকলে' (২৫ এপ্রিল ১৮৯৫) প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করে লেখা হয় যে, কিছুকাল আগে নদীয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে খ্রিষ্টান মিশনারিরা কয়েক মুষ্টি শস্যের বদলে মুসলমানদের মধ্যে দীক্ষার কাজে বেশ সফলতা লাভ করেছে। দুটি বাংলা পত্রিকা 'খ্রিষ্টীয় বান্ধব' ও 'প্রচার' (১৮৯২) এবং একটি ইংরাজি পত্রিকা 'মোসলেম ওয়ার্ল্ড' ইসলাম, মহম্মদ ও কোররানের বিরুদ্ধে প্রচার চালাত। সুতরাং উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে খ্রিষ্টান মিশনারিরা মুসলমান সমাজেও তাঁদের মিশনের জাল বিস্তার কবেন। নিম্নবর্ণ ও নিম্নবিত্তের মধ্যে ধর্মান্তরিত হয়েছে বেশী — অশিক্ষা এবং দারিদ্র্যই এর প্রধান কারণ। হিন্দু সমাজের মত মুসলমান সমাজেও এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয। যে যে পদ্ধতিতে আঘাত বা আক্রমণ এসেছে প্রতিরোধ বা প্রতিকার হয়েছে সে সে পদ্ধতিতে অর্থাৎ বক্তৃতার জবাব বক্তৃতায়, পত্রিকার জবাব পত্রিকায়, পুস্তকের জবাব পুস্তকে, মিশনের জবাব মিশনে প্রদান করার প্রয়াশ হয়েছে। সভাসমিতি করে বক্তৃতা স্থলে কেবল পাল্টা বক্তৃতা নয়, পূর্ব ঘোষণার দ্বাবা মুখোমুখি বির্তক হযেছে। এরূপ সভাসমিতি ও তর্কযুদ্ধে অংশ নিয়ে যাঁবা ইসলামেব স্বার্থবক্ষায় এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে মুনশী মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ ইব্রাহিম, শাহ আবদুল্লা, মনিরুজ্জামান ইসলামাবাদী, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। তবে মুনশী মেহেরুল্লা ও শেখ জমিরুদ্দীনেব কণ্ঠ অধিক সোচ্চার ও সক্রিয় ছিল। তাঁরা অজস্র ধর্মীয় সভায় বক্তৃতা প্রদান, বিবিধ পুস্তক ও প্রবন্ধ রচনা, সমিতি ও বিদ্যালয় স্থাপন করে মুসলমান সমাজের উপর খ্রিষ্টানদের আক্রমণ প্রতিহত করেছেন ও ইসলাম ধর্মের মহিমা প্রচার করেছেন। তাঁদের বাগ্মীজীবনের ও সাহিত্যজীবনের শুরু পাদরিদের প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উত্থাপনের মাধ্যমেই। পাদরিরা হাটে হাটে বক্তৃতা দিয়ে ধর্মপ্রচার করতেন। মুনশী মেহেরুল্লা প্রথম বক্তৃতা শুরু করেন গ্রামের হাটগুলিতে। জীবনীকার

২৪ শেখ হাবিবর রহমান — *কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা*, মখদুমী লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৯৩৪ 'ইসলাম-দর্শন' (বাংলা) পাদরী য্যাকব কান্তিনাথ বিশ্বাস কর্তৃক প্রণীত। 'মিজানুল হক' (ফারসি আগ্রার চার্চ মিশনারীর পাদবি জন ফাণ্ডার কর্তৃক রচিত। গ্রন্থেব প্রতিবাদে মওলানা বহমতুল্লা 'রদ্দে মিজানউল মিজান' ও 'এযাজে ইসুকি' গ্রন্থ লিখেন। 'তালিমে মোহাম্মদী' (উর্দু) রচনা করেন পাদরী আমানুদ্দীন। — *সুধাকর*, ১৯ চৈত্র ১২৯৯

২৫ *ইসলাম-প্রচারক*, ভাদ্র ১২৯৮

লিখেছেন, "হাটের একদিকে পাদ্রীদের বক্তৃতা, অন্য দিকে মুনশী সাহেবের বক্তৃতা, হাটের লোক ভাঙ্গিয়া আসিয়া মুনশী সাহেবের বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। তাহারা এতদিন দেখিয়া আসিতেছে, পাদ্রীগণ নিঃস্বার্থভাবে হাটে হাটে ধর্মবক্তৃতা প্রদান করেন ; কেহ কখনো তাহার প্রতিবাদ করেন না। মৌলবী মৌলানা সাহেবেরা এই সমস্ত বক্তৃতা ও আলোচনা সভায় সাবধানে এড়াইয়া চলিতেন। কেহ এতদসম্বন্ধে কিছু বলিলে কাফেরী ও গোমরাহী ফৎওয়া দিয়া নাসারাদিগকে দোজখে পাঠাইয়া দিতেন। ... যে পাদ্রীদের বিরুদ্ধে এতদিন কেহই একটি কথা বলিতে সাহস করে ন্যই, মোহাম্মদ মেহেরুল্লা নামক একজন তরুণ যুবক আজ তাঁহাদিগকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করিতেছেন। ... দশের দূর-দূরান্তে সাড়া পাড়িয়া গেল।"[২৬] এরপর যখন যেখান থেকে ডাক এসেছে, মেহেরুল্লা তখন সেখানে ছুটে গেছেন এবং বক্তৃতার মাধ্যমে ইসলামের সমুন্নত আদর্শ তুলে ধরেছেন। শেষে ধর্মপ্রচারই তাঁর মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। তিনি দুটি বড় বিতর্ক সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন একটি বরিশালের পিরোজপুরে, অপরটি নদীয়ার রাণাঘাটে। পিরোজপুরে পাদরি স্পার্জন এবং রাণাঘাটে পাদরি মনরো ছিলেন প্রতিদ্বন্দ্বী। পূর্ব ঘোষণার দ্বারা নিরপেক্ষ বিচারক মণ্ডলীর উপস্থিতিতে পিরোজপুরের তর্কযুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। 'ইসলাম-প্রচারকে' এর বিবরণ দিয়ে লেখা হয় : "ইংরেজি ৭ই অক্টোবর (১৮৯১) তর্ক সভার দিন স্থির হয়। নির্দিষ্ট তারিখে উভয় পক্ষ পিরোজপুরে সমাগত হয়। খ্রিষ্টিয়ান পক্ষই অসংখ্য প্রশ্নজাল বিস্তার করিয়া তাহার উত্তরপ্রার্থী হইয়াছিলেন। মুসলমান পক্ষ হইতে সুধাকর ও ইসলাম প্রচারকের নির্দিষ্ট প্রতিনিধি ও প্রচারক মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা তাঁহাদের প্রশ্নের অকাট্য উত্তর প্রদান করিয়া সভাস্থ ব্যক্তিগণকে মোহিত করিয়াছিলেন। উপযুক্ত মধ্যস্থদিগের দ্বারা উভয় পক্ষের জয় পরাজয় নির্ধারিত হইয়াছে, শীঘ্রই উহার কার্যবিবরণী ও উভয় পক্ষের প্রশ্নোত্তর ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইবে।"[২৭] মেহেরুল্লা প্রণীত 'খ্রিষ্টান-মুসলমানের তর্কযুদ্ধ' গ্রন্থখানি উক্ত বিতর্কের ফল।[২৮] রাণাঘাটের তর্কযুদ্ধে পাদরি মনরো শেষ পর্যন্ত অংশ গ্রহণ করেননি ; মুনশী মেহেরুল্লা দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে পাদ্রিদের অভিযোগ খণ্ডন এবং ইসলামের মহিমা কীর্তন করেন। তিনি যশোহর, ঝিনাইদহ, নোয়াখালী ও কলিকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ারে প্রতিবাদমূলক সভায় বক্তৃতা করেন।[২৯]

'খ্রীষ্টীয় বান্ধবে' (জুন ১৮৯২) জন জমিরুদ্দীন 'আসল কোরান কোথায়?' শিরোনামে একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে 'মহাকোরানের প্রতি অযথা আক্রমণ ও ব্যাঙ্গোক্তি' করেন। কোরানে

২৬ *কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা*, পৃ. ২০-২১

২৭ *ইসলাম-প্রচারক*, আশ্বিন ১২৯৮

২৮ পত্রে খ্রিষ্টান পক্ষের কয়েকটি প্রশ্নের উল্লেখ আছে, যথা — ক. 'কোরআনে মিথ্যা বলিবার উৎসাহজনক উপদেশ আছে।' খ. 'মহম্মদ সাহেব পাপী অর্থাৎ গোনাহগার ছিলেন। . . . খোদা মোহাম্মদকে নিজ পাপের ক্ষমা চাহিতে বলিয়াছেন।' (কোরআনের সুরা আলমমিন ৬ রুকু ৫ আয়াত)। মুসলমান পক্ষের প্রধান প্রশ্ন ছিল : 'যীশু খ্রীস্ট যে ঈশ্বরের পুত্র এবং তিনি যে ঈশ্বর তাহার প্রমাণ কি?' — *ইসলাম-প্রচারক*, বৈশাখ ১২৯৯

২৯ *কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা*, পৃ. ৩৬-৩৯

অন্যের হস্তক্ষেপ আছে এই প্রশ্ন তুলে তিনি কোরানকে 'জাল' বলতে চেয়েছেন। মুনশী মেহেরুল্লা 'সুধাকরে' (১৯ চৈত্র ১২৯৯) 'ইসাই বা খ্রীষ্টানী ধোকাভঞ্জন' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে জমিরুদ্দীনের অভিযোগর উত্তর দেন। জমিরুদ্দীন চিঠির মারফত মুনশী মেহেরুল্লার বক্তব্যের বিরোধিতা করেন ; জমিরুদ্দীনের পাল্টা প্রশ্ন ছিল শিয়া-সুন্নির মধ্যে প্রচারিত কোরান অভিন্ন নয় কেন? মেহেরুল্লা প্রবন্ধের মাধ্যমে তারও জবাব দেন। জন জমিরুদ্দীন আর বির্তকে অগ্রসর হননি ; এর অল্পকাল পরে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং মুনশী মেহেরুল্লার শিষ্যভুক্ত হন। অতঃপর তিনি ইসলাম ধর্মের পক্ষে ও খ্রিষ্টধর্মের বিপক্ষে আজীবন প্রচার কার্য চালিয়েছেন। সভায় বক্তৃতা দিয়ে, পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখে ও স্বতন্ত্র পুস্তক রচনা করে এ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তাধারা ও অভিমত ব্যক্ত করেছেন। শাহ আবদুল্লা ও মোহাম্মদ এহসানুল্লা প্রথমে খ্রিষ্টান ছিলেন ; তাঁরা পক্ষে ইসলামধর্ম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম-খ্রিষ্টান বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন। সুধাকর, মিহির ও সুধাকর, ইসলাম-প্রচারক, হাফেজ প্রভৃতি পত্রিকা তাঁদের মতামত প্রকাশের মাধ্যম ছিল। এরূপ তর্ক-বিতর্ক ও মতামত প্রকাশের ফলে কি ধরনের ও কি পরিমাণের রচনার সৃষ্টি হয়েছিল তার একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল :

লেখক	প্রবন্ধ	পত্রিকা
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	ইসাই বা খ্রীষ্টানী ধোকাভঞ্জন	সুধাকর, ২০ ও ২৭ চৈত্র ১২৯৯, ২ বৈশাখ ও ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩০০
”	আসল কোরান সর্বত্র	সুধাকর,১৩০০
অজ্ঞাত	সত্যের ভয়ে দুঃখ কেন	প্রচারক, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬
”	আল্লার দাস	প্রচারক, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬
”	সেই ভাববাদী বা সত্যের বিভা	প্রাচারক, চৈত্র ১৩০৬
চন্দ্রনাথ সরকার	খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম নীতি	প্রচারক, জ্যৈষ্ঠ, কার্তিক, পৌষ ১৩০৭
শাহ আবদুল্লা	হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাহার শিক্ষা	—
শেখ জমিরুদ্দীন	বাইবেল আপনি আপনার বিরুদ্ধে	ইসলাম-প্রচারক, জুলাই, ১৮৯৯
	প্রভু যীশু খ্রিষ্ট কে?	জুলাই, আগস্ট ১৮৯৯
রেয়াজুদ্দীন আহমদ	লিভারপুলের নবদীক্ষিত মুসলমান	” ” জুলাই, আগস্ট ১৮৯৯
শেখ জমিরুদ্দীন	বাইবেলে বহুবিবাহ	জুলাই সেপ্টেম্বর ১৮৯৯

এবনে মাআজ	প্রচারের প্রগলভতা	জুলাই, নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৮৯৯
শেখ জমিরুদ্দীন	বাইবেলে যুদ্ধ ও জীবহত্যা	"
এবেনে মাআজ	প্রচারের অপূর্ব প্রলাপ	ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০
শেখ জমিরুদ্দীন	প্রকৃত বাইবেলের কি অস্তিত্ব আছে?	" সেপ্টেম্বর অক্টোবর ১৯০১
শাহ আবদুল্লা	কৈতব	" নভেম্বর-ডিসেম্বর, ১৯০১
মোহাম্মদ মেহেবুল্লা	ইসাই ও ইসলাম ধর্মশাস্ত্র সংঘর্ষ	" মার্চ-এপ্রিল ১৯০২
শেখ ফজলল করিম	যীশু খ্রিষ্টের জীবনী আলোচনা	" মে-জুন ১৯০২
আনিসউদ্দীন আহমদ	পাদরী মনরো সাহেবের ভ্রমসংশোধন	মিহির ও সুধাকর, মার্চ এপ্রিল ১৯০৩
শেখ জমিরউদ্দীন	টমাস কার্লাইল ও ইসলাম	ইসলাম-প্রচারক, মার্চ-এপ্রিল ১৯০৩
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	ইস্রায়েল কি ইসমাইল বংশ শ্রেষ্ঠ	" নভেম্বর-ডিসেম্বর ১৯০৩
শেখ জমিরুদ্দীন	হজরত মহাম্মদ (দঃ) নবযুত সম্বন্ধে বাইবেলের সাক্ষ্য	" নভেম্বর, ১৯০৪, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, এপ্রিল ১৯০৫
দলিলউদ্দীন আহমদ	ক্রুসেড বা খ্রিষ্টানধর্মযুদ্ধ	নবনূর, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, ১৩১১
শেখ জমিরুদ্দীন	হজরত মোহাম্মদ (দঃ) সম্বন্ধে ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের বক্তৃতা	ইসলাম-প্রচারক, জুলাই " নভেম্বর ১৯০৫, মার্চ ১৯০৬
মোহাম্মদ এববার আনসারী	নব্যভারতে চেহলাম	" মার্চ, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, ডিসেম্বর ১৯০৫
	র পরিবর্তন	" সেপ্টেম্বর, অক্টোবর ১৯০৫

তালিকায় একটি বিষয় স্পষ্ট যে ইসলাম প্রচারক বেশি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে; সুধাকর ও প্রচারকেরও ভূমিকা ছিল। প্রচারকের আক্রমণের স্থল ছিল খ্রিষ্টান পরিচালিত 'প্রচার' পত্রিকা, আর সুধাকরের ছিল 'খ্রিষ্টীয় বান্ধব' পত্রিকা। ইসলাম-প্রচারক উভয় পত্রিকাকে আক্রমণ করেছে। বাঙালি খ্রিষ্টান গোপালচন্দ্র দত্ত 'প্রচার' সম্পাদনা করতেন। গোপালচন্দ্র দত্ত প্রচারে (জুন ১৯০০) 'মোসলমের স্বপ্ন' শিরোনামে একটি প্রবন্ধে ইসলাম-প্রচারকে প্রকাশিত 'তফসির হাক্কানী' নামক রচনার বিরূপ সমালোচনা করেন।[৩০] তিনি লিখেন,

৩০ 'তফসির হাক্কানী' র মূল লেখক দিল্লীর মৌলানা আবদুল হক। আলাউদ্দিন আহম্মদ এর বঙ্গানুবাদ করে ইসলাম-প্রচারকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করেন।

"মুসলমান ভাইসাহেবদের 'প্রচারক' পত্রে এক উদ্ভট রকমের স্বপ্নের বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। ... 'তফসির হাক্কানী' নামে যে একখানি মুসলমানি পুস্তক আছে, তাহা বোধ হয় দুই একজন মুসলমান ব্যতীত কেহই অবগত নহে। যে অজ্ঞাত পুস্তকের বিষয় কেহ জানে নাই, কেহ শুনে নাই, যাহার অস্তিত্ব বিষয় কেহ কিছু অবগত নহে তাহা দ্বারা কিরূপে যে হিন্দু ব্রাহ্ম ও খ্রিষ্টিয়ানদের মধ্যে এত পরিবর্তন সংসাধিত হইল, তাহার কাল্পনিক অস্তিত্ব মহামান্য প্রচারক সম্পাদক মহোদয়ের সুমার্জিত মস্তিষ্ক ব্যতীত আর কোথায় স্থান পাইতে পারে? ... ইসলামের খড়গ যাহা পারিল না, তাহা কি একখানি ক্ষুদ্র মাসিক পত্রিকা পারিবে"৩১ "প্রচারের প্রগলভতা' প্রবন্ধে এবনে মাঔজ (সম্পাদকের ছদ্মনাম) এর জবাব দেন। সম্পাদক ব্যক্তিগতভাবে আক্রমণ করে বলেন, "ইনি (গোপালচন্দ্র দত্ত) যদিও যীশুভক্ত ত্রিত্ববাদী, কিন্তু নামটিতে এখন পর্যন্ত পৌত্তলিকতার স্পষ্ট চিহ্ন বিদ্যমান। ফলতঃ পুরাতন খ্রিষ্টীয়ান অপেক্ষা নূতন খ্রিষ্টীয়ানের বাড়াবাড়িটা কিছুটা অতিরিক্ত সন্দেহ নাই।"৩২ 'লিভারপুলের নবদীক্ষিত মুসলমান' প্রবন্ধে বর্ণিত খ্রিষ্টানের মুসলমান হওয়ার ঘটনা 'প্রচার' পত্র মানতে চায় না। প্রচার সম্পাদকের প্রশ্ন 'খ্রিষ্টিয় কি কখন মুসলমান হয়?' এবনে মাঔজ 'প্রচারের অপূর্ব প্রলাপ' প্রবন্ধে উক্ত ঘটনার সত্যতা প্রতিপন্ন করেন এবং প্রচার-সম্পাদকের অনৃতবাদিতা সম্পর্কে কটাক্ষ করেন। তাঁর ভাষায় "মিথ্যা কথা ত ইহাদের পক্ষের ভূষণ। যখন মরিয়ম পুত্র যিশুখ্রিষ্টকে ঈশ্বর বা ঈশ্বররের পুত্র বলিয়া মিথ্যা ঘোষণা করিতে লজ্জা বা সঙ্কোচ হয় না, তখন অন্য মানুষের সম্বন্ধে মিথ্যা কল্পনা জল্পনা করা আশ্চর্য্যের বিষয় কি?"৩৩ 'প্রচার' ও 'প্রচারকের মধ্যেও ধর্ম বিষয়ে তর্ক-বিতর্ক হয় ... নিজ নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এই মসিযুদ্ধ। 'বাইবেল নীতিপূর্ণ শাস্ত্র' খ্রিস্টান পক্ষের এই দাবীর অসারতা দেখাবার জন্য বাইবেল থেকে ব্যভিচার দৃশ্যের বর্ণনা দিয়ে 'সত্যের জয়ে দুঃখ কেন' প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। খ্রিষ্টানরা যিশুখ্রীষ্টকে ঈশ্বর পুত্র জ্ঞানে পূজা করেন, সেজন্য প্রচারক তাঁদের 'নরপূজক' বলে আখ্যাত করেছে।[৩৪] 'আল্লার দাস' প্রবন্ধে মহম্মদের আগমন সূচক দুটি পদ বাইবেল থেকে উদ্ধৃত করা হয়। পদ দুটির বক্তব্য এরূপ : "কিন্তু যিনি (মহম্মদ) আমার পরে আগমন করিতেছেন, তিনি আমা অপেক্ষা ক্ষমতাবান, যাঁহার পাদুকা বহন করিতেও আমি যোগ্য নহি, তিনিই তোমাদিগকে পবিত্র আত্মাতে এবং অগ্নিতে বাপ্তাইজ (দীক্ষিত) করিবেন। কুলা (জেহাদীয় করবাল) তাঁহার হস্তে রহিয়াছে, তিনি আপনার খামার (মণ্ডলী) কি শেষে পরিষ্কার করিবেন, ; আপনার গোম (মোসলমান লোক) তিনি গোলায় (মণ্ডলীতে) সংগ্রহ করিবেন, এবং আখড়া (কাফের) সকল তিনি

৩১ *ইসলান প্রচারক*, নভেম্বর ১৮৯৯

৩২ ঐ।

৩৩ ঐ, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০

৩৪ ঐ।

৩৪ *প্রচারক*, মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬

অনির্বাণীয় অগ্নিতে দগ্ধ করিবেন।"[৩৫] জন মনরো প্রচার পত্রিকায় ঐ উদ্ধৃত পদটির প্রতিবাদ করেন। তারই পাল্টা প্রতিবাদে 'সেই ভাববাদী বা সত্যের বিভা' প্রবন্ধটি লেখা হয়। পাদরি চন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত 'খ্রিষ্টীয়ান ধর্মনীতি' একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ। তিনি এতে মথি, মার্ক, লুক ও যোহন লিখিত সুসমাচার শীর্ষক চারখানি পুস্তিকার আলোচনা করেছেন।[৩৬]

ইসলাম-প্রচারকে শেখ জমিরুদ্দীন ছিলেন উচ্চকণ্ঠ। তিনি খ্রিস্টান মিশনারি থেকে লেখা পড়া শিখেন এবং পাদরির পদ লাভ করে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করার মর্যাদা পান। যিশুখ্রিষ্ট যে মনুষ্য সন্তান, ঈশ্বরপুত্র নন, 'প্রভু যিশুখ্রিষ্ট কে' প্রবন্ধের এটাই প্রতিপাদ্য বিষয়। পাদরিগণ 'ত্রিত্ববাদে' র ভিত্তিতে যিশুকে ঈশ্বরপুত্র এবং সেই সূত্রে জীবের একমাত্র ত্রাণকর্তা বলে দাবী করেন। এদেশে খ্রিষ্টধর্ম প্রচারের পদ্ধতির উপর মন্তব্য করে তিনি বলেছেন, "আজকাল ইসাই বা খ্রিষ্টীয়ান পাদরিগণ প্রায় সর্বদা সর্বত্রই হজরত ইসাকেই (আলা:) একমাত্র নাজাৎ দেহেন্দা বা ত্রাণকর্তা বলিয়া প্রচার এবং বহুতর হিন্দু মুসলমান নর-নারীর হৃদয় ক্ষেত্রে ঐরূপ বিশ্বাসবীজ বপন করিয়া থাকেন। ... এখন যে কেহ সেই ইসাকে অবতার এবং ত্রাণকর্তা বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, তিনি আর কোনও পুণ্যকার্য না করিলেও স্বর্গে যাইবেন।"[৩৭] শেখ জমিরুদ্দীনের দাবী হজরত মহম্মদ শ্রেষ্ঠ নবী—এটা অস্বীকার করে পাদরি জন টেকল 'শ্রেষ্ঠ নবী কে ও মুনশীর ভুল' (১৯১৩) শিরোনামে গ্রন্থ লিখেন। বলা বাহুল্য, তিনি হজরত ঈসাকে শ্রেষ্ঠ নবী বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন।[৩৮] কোরান বহুবিবাহের প্রশ্রয় দেয়, ধর্মপুস্তক বাইবেলে একটি মাত্র বিবাহের বিধান আছে পাদরিগণের প্রচারিত এরূপ একটি অভিযোগের প্রতিবাদে শেখ জমিরুদ্দীন 'বাইবেলে বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি লেখেন। কোরানে কোথায় কি পরিস্থিতিতে চারটি বিবাহের কথা বলা হয়েছে তা তিনি ব্যাখ্যা করেন এবং মূলত একবিবাহ অভিপ্রেত তার সপক্ষে যুক্তি দেখান।[৩৯] পক্ষান্তরে বাইবেল থেকে দৃষ্টান্ত দিয়ে 'ধর্ম পুস্তকে' বহুবিবাহের প্রশ্রয় আছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।[৪০]

৩৫ *প্রচারক*, চৈত্র ১৩০৬

৩৬ *ঐ*, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৭

৩৭ চন্দ্রনাথ সরকার বরিশালের অক্সফোর্ড মিশনেব দেশীয় পাদরি ছিল। একজন ধার্মিক ও সমাজকর্মী হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল।

৩৮ *ইসলাম-প্রচারক*, আগস্ট ১৮৯৯

৩৯ জে. টেকল— *শ্রেষ্ঠ নবী কে ও মুনশীর ভুল*, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১৯১৩ ; *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ*, ১৯১৩।

৪০ প্রমাণ স্বরূপ কোরআনের একটি আয়াত উদ্ধৃত করেন : "এবং যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, অনাথাদিগের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে তবে তোমাদের যে রূপ অভিরুচি তদনুসারে দুই তিন ও চারি নারীব পাণি গ্রহণ করিতে পারে ; পরন্তু যদি আশঙ্কা কর যে, ন্যায় ব্যবহার করিতে পারিবে না, তবে এক নারীকে (বিবাহ করিবে) অথবা তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাহার উপর অধিকার লাভ করিয়াছে তাঁহাকে (পত্নীস্থলে গ্রহণ করিবে), ইহা অন্যায় না করার নিকটবর্তী।" সুরা নেসা, ৩ আয়েৎ। — ইসলাম-প্রচারক, সেপ্টেম্বর ১৮৮৯, প. ৮৭-৮৮

৪১ *ঐ*, নভেম্বর ১৮৯৯, পৃ: ৬৯

"খ্রিষ্টান পাদরিগণ প্রায় বলিয়া থাকেন যে 'দীন ইসলাম' তলোয়ার দ্বারা প্রচারিত হইয়াছে ও হজরত মোহাম্মদ (দঃ) জোর করিয়া লোকদিগকে মুসলমান করিয়াছেন। কিন্তু বাইবেলে প্রেম প্রচারিত হইয়াছে। 'দীন ইসলাম' যে তলোয়ার দ্বারা প্রচারিত হয় নাই, তাহা আমাদিগের 'তাওয়ারিখ মোহাম্মদী' পাঠ করিলেই অবগত হওয়া যায়। কিন্তু খ্রিষ্টানী ত্রিত্বময় ঈশ্বর ও খৃষ্টানী দেবতারা এতই অন্যায় যুদ্ধ করিয়াছেন, যাহা পাঠ করিলেই অবাক হইতে হয়। জগতে অন্য কোন জাতি এরূপ যুদ্ধ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। আমরা এখন বাইবেল হইতে দেখাইতেছি যে, সেগুলি যুদ্ধ না প্রেম।"[৪১] এরপর লেখক বহু ঘটনার উল্লেখ করে ও উদ্ধৃতি দিয়ে তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করেছেন 'বাইবেলে যুদ্ধ ও জীব হত্যা' প্রবন্ধে। তিনি যখন খ্রিষ্টান ছিলেন তখন তাঁর নিজেরই অভিযোগ ছিল যে, কোরানে হস্তক্ষেপ হয়েছে, আসল কোরান আর এখন নেই। "বাইবেলের পরিবর্তন' প্রবন্ধে তিনি পাদরি সি. বমওয়েচের বঙ্গানুবাদিত বাইবেল অবলম্বনে 'ধর্মপুস্তকে' কিভাবে পরিবর্তন এসেছে তার ধারাগুলি উল্লেখ করে দেখান।[৪২] তিনি এরপর প্রশ্ন করেন, "যদি এখন পাদ্রী ফাণ্ডার, পাদ্রী যাকুব, পাদ্রী ইমামুদ্দীন ও পাদ্রী সফদার আলী জীবিত থাকিতেন, তাহা হইলে তাহারা কি করিতেন জানি না। এখন পাদ্রী রাউস, পাদ্রী কৈলাসচন্দ্র, পাদ্রী গোপালচন্দ্র, পাদ্রী ফিলিপ মহাশয়রা কি করিবেন করুন ও কি বলিবেন বলুন।"[৪৩] লেখক একই সঙ্গে প্রতিবাদের ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুর তুলেছেন।

জমিরুদ্দীনের অপর প্রবন্ধ 'বার্ণবার ইঞ্জিল'-এর বক্তব্য বিষয় হল : "বার্ণবার ইঞ্জীলে হজরত মহম্মদ বিষয়ক ভবিষ্যদ্বাণী আছে বলিয়া খ্রিষ্টানেরা উহা গোপন করিয়া রাখিয়াছে ; কিন্তু সেল সাহেব (জর্জ সেল কোরানের অনুবাদক) তাহা প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। খ্রিষ্টান পাদ্রী ও প্রচারকগণ! হে মনরো ও এফিফেনি প্রচার সম্পাদক! বল ভাই আর কত কাল সত্যকে গোপন রাখিবে? সত্বর সত্য প্রকাশ কর, নতুবা পরিণামে নিশ্চয় অমঙ্গল ঘটিবে।"[৪৪]

শাহ আবদুল্লা প্রথমে খ্রিষ্টান ছিলেন, পরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন এবং খ্রিস্টান-ইসলাম বাক্ ও মসিযুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেন। তিনি 'প্রচারকে' 'হজরত মোহাম্মদ (দঃ) ও তাঁহার শিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ রচনা করেন। এই প্রবন্ধের প্রতিবাদ করে পাদরি ডব্লিউ. বি. মনরো একটি ইংরাজি প্রবন্ধ রচনা করেন। মনরোর প্রবন্ধের প্রত্যুত্তরে তিনি 'রেভাঃ ডব্লিউ ডি. মনরো সাহেবের প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা' শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধটি রচনা করেন। শাহ আবদুল্লার প্রতিবাদের ভাষা কঠোর ও

---

৪২ *খ্রিষ্টীয় বান্ধব*, জুন ১৮৯২

৪৩ শেখ জমিরুদ্দীন বলেছেন যে, তিনি যখন কলিকাতার সি. এম. এস ডিভিনিটি কলেজে থিয়লজি পড়তেন তখন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল বল সাহেব চার্চ মিশনারি সোসাইটির পাদরী বমওয়েচ সাহেবের ঐ বাইবেল খানি পড়াতেন ও বাইবেলের পরিবর্তনের কথা বলতেন। বমওয়েচের বাইবেল মূল গ্রিক ভাষার ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে অনূদিত।

৪৪ ইসলাম-প্রচারক, ডিসেম্বর ১৯০৫

৪৫ ঐ, জুন ১৯০৫

বিদ্রূপাত্মক ছিল। তাঁর ধারণা ঃ "যাঁহারা বিদ্বেষবুদ্ধি পরবশ ও ক্রোধে কাণ্ডজ্ঞান পরিশূন্য হইয়া তর্কবিতর্কচ্ছলে বিবাদ ও তিরস্কার করিতে প্রবৃত্ত হন, তথাবিধ ব্যক্তিদিগের সহিত সাধুভাবে কোন শাস্ত্রীয় আলাপ হইতেই পারে না।"[৪৫] তিনি পাদরি সমাজকে আক্রমণ করে বলেছেন, "আমরা জানি যে, লম্বা একটা 'কেছাক' পরিয়া কোমরে একটা দড়ি বাঁধিবার অধিকার পাইলেই যে কোন লোক পাদ্রী হবে এমত নহে। বরং অনেক সময় দেখা গিয়াছে যে, ঐ লম্বা 'কেছাকে'র অন্তরালে পাদ্রী কিংবা ক্লার্জিম্যান নামধারী মহাপুরুষদিগের কোমরবন্দ দড়িতে শয়তান বাধাঁ থাকে।"[৪৬] তাঁর প্রধান অভিযোগ যে পাদ্রী মনরো তাঁর প্রবন্ধের 'সারভাগ অন্ধকারে রাখিয়া দুই একটা বাক্যের ছল ও বিভিন্ন মতের দুই একটি কথা লইয়া বিস্তর হাবুডুবু' খেয়েছেন ; খণ্ডিত দৃষ্টি ও অভিপ্রেত মত দিয়ে কোন বিষয়ের যথার্থ বিচার করা হয় না। তাই 'কর্তব্যের অনুরোধে দুই একটি কথা বলা নিতান্ত প্রয়োজনীয় বিধায় পাদ্রী সাহেবের সুদীর্ঘ প্রতিবাদের সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় প্রবৃত্ত' হয়েছেন তিনি। তাঁর 'ইঞ্জিন কেতাব' প্রবন্ধ 'ক্রিশ্চান ট্রাক্ট'-এর প্রতিবাদে রচিত। রানাঘাটের 'আরবী ভাষাবিদ' পাদরি জন মনরো 'হজরত মোহাম্মদের বেগোনাহ থাকা বিষয়ে মুসলমান মৌলভী সাহেবগণের শিক্ষা' নামে একখানা পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তিনি কোরানের 'কতকগুলি আয়াতের অর্থ করিতে যাইয়া ভাষায় যেরূপ অনভিজ্ঞতা' প্রদর্শন করেন এবং সেই সূত্রে হজরত মহম্মদের প্রতি 'যেরূপ অযথা দোষারোপ' করেন, তারই প্রতিবাদ ও প্রত্যুত্তর দিয়ে মৌলভী আনিসউদ্দীন আহমেদ 'পাদরী মনরো সাহেবের ভ্রম সংশোধন' প্রবন্ধটি রচনা করেন। এটি 'মিহির ও সুধাকরে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়।[৪৭] মোহাম্মদ এবরার আনসারী ইসলামের বিরুদ্ধে ত্রিত্ববাদী ফ্রিম্যানের আনীত অভিযোগগুলির উত্তর দিয়েছেন 'নব্য ভারতে চেহলাম' প্রবন্ধে। ফ্রিম্যান ইসলামের ইতিহাস থেকে তথ্যোদ্ধার করে নিজ ধারণানুযায়ী কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, সেগুলি হল :

১. মুসলমানগণের নানাবিধ সদগুণ থাকা সত্ত্বেও তারা মহত্ত্ব লাভ করতে পারেনি, তার কারণ ইসলাম ধর্মনীতি 'রূঢ়'।

২. মুসলমানদের স্বাভাবিক দোষগুলি সংশোধিত হওয়া অসম্ভব।

৩. তারা কোন কিছু রক্ষা করেনি বরং জগতের অন্য জাতির সুনীতিগুলি ধ্বংস করেছে।

৪. তারা আত্মকলহে পটু।

৫. ধর্মান্ধতা, পরকালসর্বস্বতা, অত্যাচার, বহুবিবাহ এবং দাসত্বপ্রথা প্রভৃতি কলঙ্করাজি মুসলিম সমাজে বিদ্যমান।[৪৮]

---

৪৬ ঐ, জুন ১৯০৫

৪৭ ঐ।

৪৮ *মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র* , পৃ: ৫৫ (পাদটিকা)।

৪৯ *ইসলাম-প্রচারক*, জুন ১৯০৫

বাদপ্রতিবাদমূলক প্রবন্ধরাশির সহিত ঐসব লেখকের পুস্তকরাশি মিলিয়ে দেখলে খ্রিষ্টান-ইসলাম দ্বন্দ্বের প্রকৃত ছবিটি উদ্ধার করা যায়। মুনশি মেহেরুল্লার প্রায় ৭ খানি, শেখ জমিরুদ্দীনের ৭ খানি, শাহ্ আবদুল্লার ১ খানি, আবদুল লতিফ আহমদের ১ খানি, আবদুল গণি আলার ১ খানি গ্রন্থ এই উদ্দেশ্যে রচিত। অংশত আলোকপাত করা হয়েছে এমন গ্রন্থও অনেক রচিত হয়েছে, যেমন শেখ আবদুর রহিমের 'হজরত মহম্মদের (দঃ) জীবনচরিত ও ধর্মনীতি' (১২৯৪), মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীনের 'এসলামতত্ত্ব' (১২৯৫), আমীর আলীর 'স্পিরিট অব ইসলাম' (১৮৯১) ইত্যাদি। ঈষৎ পরবর্তীকালে রচিত মোহাম্মদ গোলাম লতিফের 'ইসলাম প্রভা' (১৯০৮) গ্রন্থখানি খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের প্রভাব থেকে ইসলামকে রক্ষার উদ্দেশ্যে রচিত হয়।[৪৯] তারপরে মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা লেখেন 'খ্রিষ্টীয় ধর্মের অসারতা' (১৩১৮) শীর্ষক আক্রমণাত্মক বই। বাঙালি মুসলিম মানসচিন্তার এখানেই শেষ হয়নি ; তাঁরা খ্রিষ্টান মিশনের আদর্শে 'ইসলাম মিশন ' স্থাপন করে সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খলভাবে ইসলামের প্রচার ও অভ্যন্তরীণ সমস্যা দূর করার চেষ্টা করেছেন। 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' (১৯০৪) ঐরূপ যৌথ ধর্মীয় চিন্তার ফল। মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ছিলেন এরূপ পরিকল্পনার পুরোভাগে। রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত সমিতির প্রথম অধিবেশনের সভায় গৃহীত প্রথম প্রস্তাবটি ছিল এরূপ : "অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন মানবসমাজের মধ্যে পবিত্রতম সত্য সনাতন ইসলাম ধর্ম ভাস্করের অত্যুজ্জ্বল স্বর্গীয় রশ্মির বিকীর্ণতা সাধন, ত্রিত্ববাদী খৃষ্টান প্রভৃতি বিধর্মীদিগের অযথা আক্রমণ হইতে ইসলাম ধর্ম ও মোসলেম সমাজের রক্ষা বিধান এবং আবশ্যকমত আক্রমণগুলির প্রতি উত্তর প্রদান, খ্রিষ্টান প্রভৃতি বিধর্মীগণের প্রকাশিত ইসলাম ধর্মের গ্লানিকর ট্রাক্ট্ বা পুস্তিকাগুলির প্রতিবাদকরণ এবং বিধর্মীগণের আরোপিত সন্দেহভঞ্জন, হতচেতন মোসলেম সমাজের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধি ও ধর্ম বিস্তৃতি এবং ইসলাম ধর্মের সর্বপ্রকারে উন্নতি চেষ্টা প্রভৃতি নানাবিধ উদ্দেশ্যে বঙ্গভাষায় নানাবিধ ট্রাক্ট্ বা পুস্তিকা এবং পত্রিকা প্রকাশ করা।[৫০] সমিতির কার্যাবলীতে ইসলাম প্রচারকদের ট্রেনিং দেওয়া, জেলায় জেলায় মিশনের শাখা স্থাপন করা, মিশন ফান্ড খোলা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা, গ্রন্থাগার তৈরি করা ইত্যাদি বিষয়ের পরিকল্পনা লক্ষ্য করা যায়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে বক্তৃতা, পত্রিকা, প্রবন্ধ, পুস্তক, সমিতি প্রভৃতির মাধ্যমে মুসলমান সম্প্রদায় ব্যাপক চিন্তা ও কর্মশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। খ্রিষ্টানের আক্রমণের স্থল ছিল কোরান, মহম্মদ এবং ইসলামের ধর্মনীতি। মুসলমান প্রবক্তারা একাধারে খ্রিষ্টানের অভিযোগের উত্তর দিয়েছেন ও পাল্টা আক্রমণ করেছেন এবং অন্যধারে ইসলামের মহিমা প্রচার করেছেন। তাঁদের আক্রমণের ক্ষেত্র ছিল খ্রিষ্টানের ত্রিত্ববাদ, প্রভু যিশুখ্রিষ্ট, ধর্মপুস্তক বাইবেল এবং খ্রিষ্টান সমাজের আচারবিধি। এসব বাদ-প্রতিবাদ, আলোচনা-সমালোচনার ভেতর দিয়ে বাংলার মুসলমানের ধর্মীয় চেতনা, সমাজ-সংহতি ও

৫০ *Muslim Community in Bengal*, p. 331

৫১ মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী — 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি', *ইসলাম-প্রচারক*, মে-জুন ১৯০৪

অস্তিত্ববোধ জাগ্রত হয়। এরূপ ধর্মকলহের মধ্য দিয়েই উনিশ শতকের প্রথম ভাগে যেমন হিন্দু সমাজের, ঐ শতকের দ্বিতীয় ভাগে তেমন মুসলমান সমাজের স্বধর্মপ্রীতি ও সমাজচেতনার উন্মেষ হয় এবং নবজাগরণ ও আত্মবিকাশ সংঘটিত হয়।

ইসলাম, হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম

ভারতবর্ষের হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার নিয়ে বিরোধ একটা অংশের মধ্যে বরাবর ছিল। ধর্মবিশ্বাস, ধর্মনীতি ও ধর্মাচরণের পার্থক্য থেকে এ বিরোধের উৎপত্তি। এ সম্পর্কে আমরা পূর্বে আলোকপাত করেছি।[৫২] ধর্মাদর্শ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হয়েছে, খ্রিষ্টান-মুসলমানের ধর্মনীতি নিয়ে প্রত্যক্ষ বাক্-বিতণ্ডা হয়েছে। বাইরের কতকগুলি ধারণা ও আচার-আচরণ নিয়ে হিন্দু-মুসলমানে মসিযুদ্ধ হয়েছে। গো-হত্যা নিয়ে শুধু মসিযুদ্ধ হয়নি, উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে রীতিমত দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়েছে। মসজিদের সম্মুখ দিয়ে ঢোল-বাদ্য সহকারে পূজার শোভাযাত্রা এবং মন্দিরের সম্মুখ দিয়ে মহরমের তাজিয়াসহ শোকমিছিল করার ঘটনা নিয়ে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বাদ-প্রতিবাদ, হানাহানি হয়েছে। আলোচ্য যুগে মুসলমান সমাজকর্মী, চিন্তাবিদ ও ধর্মনেতাগণ ধর্ম সংস্কারের যে দিকটি বড় করে দেখেছেন, সেটি হল মুসলমান সমাজে অনৈসলামিক রীতিনীতির অনুপ্রবেশ ও প্রভাব বিস্তার। সমাজের সাধারণ শ্রেণীর মুসলমান হিন্দুর কতক দেবদেবীর পূজা ত করেই, উপরন্তু তদনুকরণে পীরপূজা, কবরপূজা ইত্যাদি বেশরাহ্ ধর্মাচরণ ও পালন করে। হিন্দুর ধর্মীয় সামাজিক আমোদ-প্রমোদমূলক উৎসবে যোগদান, বর্ণভেদ প্রথা ও বিধবা বিবাহ রীতি অনুসরণ করা, হিন্দু নাম গ্রহণ করা ইত্যাদির মধ্যে ধর্মচ্যুতির দোষত্রুটি ধরেছেন তাঁরা। এগুলি দীর্ঘকাল ধরে উভয় সম্প্রদায়ের একত্র বসবাসের ফল। প্রকৃত ধর্মশিক্ষা ও প্রচারের অভাবের কারণে ধর্মান্তরিত মুসলমানরা পূর্বপুরুষের সংস্কার ও বিশ্বাস কাটিয়ে উঠতে পারেনি। এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে ধর্মসংস্কারক ও ধর্মপ্রচারকগণ সমাজজীবন থেকে এগুলির প্রভাব দূর করার আন্দোলন করেছেন।

এ সময়ে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে ব্রাহ্মধর্মের প্রত্যহ দ্বন্দ্ব হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায়কে ব্রাহ্মধর্মের প্রবর্তক বলা হয়। রামমোহন আরবি-ফারসি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। তিনি পাটনায় ঐ দুটি ভাষা শিক্ষা ও ইসলামী শাস্ত্র পাঠ করেন। ইসলামের একেশ্বরবাদের আদর্শে তিনি বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদের আদর্শ প্রচার করেন। আল্লাহ্ এক ও অদ্বিতীয়, তিনি আকার-প্রকারহীন সর্বগুণান্বিত ও সর্বশক্তিমান আধ্যাত্মিকসত্তা। ব্রাহ্মধর্মে অবাঙমানসগোচর, শব্দাতীত ও স্পর্শাতীত ব্রহ্মার আরাধনার কথা বলা হয়েছে। খ্রিষ্টানের ত্রিত্ববাদের কেন্দ্র-বিন্দুতেও আছে একেশ্বরবাদিতা। রামমোহনের এসব ব্রহ্মবাদের চিন্তার পশ্চাতে প্রধান কারণ খ্রিষ্টানধর্মের প্রভাব থেকে শিক্ষিত হিন্দু সন্তানদের রক্ষা করা। ঐ সময় খ্রিষ্টান মিশনারিদের প্রভাবে অনেকেই খ্রিষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিল। রামমোহনের

৫২ এ - অধ্যায়ের 'সমাজ' অংশ দ্রষ্টব্য।

সম্পাদনায় প্রকাশিত 'ব্রাহ্মণ সেবধি' (১৮২১) পত্রিকার মৌলিক আবেদন ছিল 'মিশনারিদের তরফ হইতে হিন্দুধর্মের প্রতি অযথা আক্রমণ রোধে প্রতিবাদ করা।'[৫২] তিনি প্রথমে 'আত্মীয় সভা' (১৮১৫) এবং পরে 'ব্রাহ্মসমাজ' (১৮২৮) প্রতিষ্ঠা করেন ধর্ম সংস্কারের আদর্শ নিয়েই।[৫৩] পরবর্তীকালে 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) এবং তত্ত্ববোধিনী সভার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪১)' সর্বোৎকৃষ্ট পরম ধর্ম বেদান্তপ্রতিপাদ্য ব্রাহ্ম বিদ্যা প্রচারে'র উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫৪] এ সময় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর নেতৃত্ব দেন। সদর ও মফস্বলে ব্রাহ্মসমাজের শাখা প্রতিষ্ঠিত হয় ; ধর্মগ্রন্থ, পত্রিকা ও প্রচারক মারফত ব্রাহ্মধর্মের প্রচার কার্য শুরু হয়। ক্রমে কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮–১৮৮৪) ব্রাহ্মধর্ম প্রচার শুরু করেন। তিনি ১৮৫৭ সালে ঐ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং ব্রাহ্মসমাজকে সুগঠিত ও শক্তিশালী করে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হন। তিনি এই ধর্মকে বাংলার বাইরে ভারতের প্রদেশগুলিতে প্রচারের মাধ্যমে জনপ্রিয় করে তোলেন। কেশবচন্দ্র সম্পাদিত 'ইন্ডিয়ান মিরারে'র এক সংখ্যায় (১ জানুয়ারি ১৮৬৬) বাংলা ও বাংলার বাইরে মোট ৫৪টি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হওয়ার খবর দেয়।[৫৫] তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও ইন্ডিয়ান মিরার ছাড়া সত্তর দশকের দিকে ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক পৃষ্ঠপোষিত ও পরিচালিত আরও ১২ খানা ইংরেজি–বাংলা পত্রিকা চলত, যথা ধর্মতত্ত্ব (১৮৬৪), সত্যান্বেষণ (১৮৬৫), সত্যজ্ঞান প্রদায়িনী (১৮৬৫), ধর্মপ্রচারিণী (১৮৬৪), ন্যাশনাল পেপার, ঢাকা প্রকাশ (১৮৬১), বিজ্ঞাপনী (১৮৬৫), বর্ধমান মাসিক পত্রিকা (১৮৬৬), সুলভ সমাচার (১৮৭০) বঙ্গবন্ধু (ঐ), বালকবন্ধু (১৮৭৮) ও তত্ত্বকৌমুদী। কেশবচন্দ্র নেতৃত্বভার গ্রহণ করে পূর্ববঙ্গ বিশেষ করে ঢাকায় ব্রাহ্মধর্ম প্রচার জোরদার করেন। তিনি ১৮৬৫ সালে প্রথমবার এবং ১৮৬৯ সালের মার্চে দ্বিতীয়বার ও ডিসেম্বরে তৃতীয়বার ঢাকা ও অন্যান্য অঞ্চলে গমন করেন এবং ব্রাহ্মসভা ও ব্রাহ্ম মন্দির প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরই উদ্যোগে ঢাকায় প্রথম 'ব্রহ্মোৎসব' পালিত হয়। 'পূর্ববঙ্গ ব্রাহ্ম মন্দির' (১৮৬৯) প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে ঢাকায় দুদিন ধরে উৎসব হয়, ঢাকার নবাব আবদুল গণি সে উৎসবে অংশ গ্রহণ করেন। এ সময় 'একজন উৎসাহপূর্ণ সরলহৃদয় মুসলমান যুবা' ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষা লাভ করেন।[৫৬] কেশবচন্দ্র অত্যন্ত সুবক্তা ছিলেন। ৭ ডিসেম্বর ১৮৬৯ সালে ঢাকায় একটি সভায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি ৩৫ জনকে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত করতে সক্ষম হন।[৫৭] তখন থেকে ব্রাহ্মদের তৎপরতা ও

৫৩ *বাংলা সাময়িকপত্র*, পৃ. ১৫(৪র্থ সং)

৫৪ *বাংলার বিদ্বৎ সমাজ*, পৃ. ৬৩

৫৫ *বাংলা সাময়িকপত্র*, পৃ. ৮১

৫৬ বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ,পৃ: ২২৯–৩০

৫৭ রেয়াজউদ্দীন আহমদের আত্মজীবনী থেকে জানা যায়, ঐ সময় জালালউদ্দীন নামে একজন যুবক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। সেই সম্ভবত এই দীক্ষিত ' উৎসাহপূর্ণ সরল হৃদয় মুসলমান যুবা'। তার ধর্মান্তর গ্রহণে ঢাকার মুসলমানদের প্রতিক্রিয়া হয়, জালালউদ্দীন ঢাকা ত্যাগ করে জলপাইগুড়িতে আশ্রয় নেয়। মোহাম্মদ ইদরিস আলী —'এসলামতত্ত্ব', *মাহে নও*, জুন ১৯৫৪

৫৮ উপাধ্যায় গৌরগবিন্দ রায় — *আচার্য কেশবচন্দ্র শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ খণ্ড*, কলিকাতা ১৯০৮, পৃ.২০৩

দীক্ষাদানের উৎসাহ বৃদ্ধি পায়। হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর লোক ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করত, ফলে উভয় সম্প্রদায়ের লোকের মনে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'হিন্দুহিতৈষিণী' (১৮৬৫), 'হিন্দুরঞ্জিকা' (১৮৬৬), 'সনাতন ধর্মোপদেশিনী' (১৮৭০) প্রভৃতি পত্রিকা বাহ্মধর্মের প্রচার রোধ করার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রথমটি ঢাকা, দ্বিতীয়টি রাজশাহী, তৃতীয়টি কলিকাতা থেকে বের হত। হিন্দুহিতৈষিণীর পরিচয় প্রসঙ্গে 'পূর্ণচন্দ্রোদয়ে' (১১ জুলাই ১৮৬৫) লেখা হয়, "অল্পদিন হইল ঢাকায় হিন্দুহিতৈষিণী নামে একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে, বিক্রমপুরের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত জগদ্বন্ধু বসু এবং ঢাকার জজ আদালতের উকীল শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীকান্ত মুন্সী এই সভার প্রতিষ্ঠাতা। তত্রত্য সুশিক্ষিত ব্রাহ্মদিগের দৈনন্দিন উন্নতি দেখিয়া হিন্দুধর্মের গৌরব রক্ষার্থে প্রাচীন সম্প্রদায়িরা এই সভা করিয়াছেন। হিন্দুহিতৈষিণী পত্রিকাখানি এই সভার মুখপত্র স্বরূপ।"৫৮

মুসলমান সমাজের প্রতিক্রিয়াটিও সমকালীন পুস্তক ও পত্রপত্রিকায় প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। 'এসলামতত্ত্বে' র (১২৯৫) লেখক চতুষ্টয়, যাঁরা পরে 'সুধাকর' (১২৯৬) প্রকাশ করেন, তাঁরা এসলামতত্ত্ব ও সুধাকরে ব্রাহ্মধর্মের প্রচারশীল নীতির কথা প্রথম সমাজকে অবহিত করেন এবং সেই সঙ্গে প্রতিরোধের কথা চিন্তা করেন। এসলামতত্ত্বের ভূমিকায় লেখা হয়, ' ... অপর এক সম্প্রদায় একেশ্বরবাদিত্বের ভাণ করিয়া ধর্মপ্রচারক ও তত্ত্ববাহকের (পয়গম্বরের) আবশ্যকতা অস্বীকার করিতেছে। এই সম্প্রদায়ের দুই একটা মহাপুরুষ প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হইয়া স্ব স্ব বিকৃত মস্তিষ্ক চিন্তাদৌর্বল্যের পরিচয় দিতে ত্রুটি করে নাই। কেবল মাত্র বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া অনেক লোক গোপনে ব্রাহ্মমত স্বীকার করিতেছে। বাঙ্গালা ভাষায় এসলাম ধর্ম বিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থাদি বর্তমান থাকিলে তাহাদের এরূপ শোচনীয় পরিণাম হইত না। ... আমরা এই সকল বিপথগামী ও অন্ধবিশ্বাসী লোকদিগের চোখে আঙ্গুলি নির্দেশপূর্বক দেখাইব যে, পৃথিবীতে এসলাম ধর্মই প্রকৃত ধর্ম।" ৫৯ মুসলমান সমাজের লোকদের এই ধর্মত্যাগের পথরোধ করার উদ্দেশ্যেই এসলামতত্ত্ব লেখার পরিকল্পনা। সুধাকরের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় মুসলমানের ধর্মান্তর গ্রহণ এবং ব্রাহ্ম-মুসলমানের বিতর্কের সংবাদ প্রকাশিত হয়। "কোচবিহার অন্তঃপাতি হলদীবাড়ি নিবাসী শ্রীযুক্ত ইয়ানতুল্লা প্রধান প্রভৃতি মুসলমান ভ্রাতৃগণ কিছু কিছু ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত থাকিয়া, নবধর্ম প্রচার করিতেছিলেন, এবং পিতৃ-মাতৃ বহিষ্কৃত অল্পবুদ্ধি কতিপয় মুসলমান উহাদের দলবৃদ্ধি করিয়াছিল। ইহাতে ভোগডাবুরী নিবাসী ধার্মিক প্রবর শ্রীযুক্ত মুন্সী হেমায়েতউল্লা বসুনীয়া সাহেব মর্মান্তিক কষ্ট অনুভব করাতে ভাগলপুর প্রভৃতি স্থান হইতে নানা ভাষাবিদ মোসলমান ধর্মশাস্ত্রজ্ঞ মৌলভী আনয়নপূর্বক একটি সভা আহুত করেন। ... গত ২৭ ও ২৮ এ ভাদ্র সভার অধিবেশন হয়। ... কলিকাতা নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু গৌরগোবিন্দ রায় ও কোচবিহারস্থিত শ্রীযুক্ত বাবু

৫৯ *বাংলা সাময়িকপত্র*, প. ২০৩
৫০ *এসলামতত্ত্ব*, ১খণ্ড, কলিকাতা, ১২৯৫

প্রাণকৃষ্ণ দত্ত ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক মহোদয়, নবধর্মদীক্ষিত শ্রীযুক্ত ইয়ানতুল্লা প্রধানের পক্ষ সমর্থন করেন।"৬০ সুধাকরগোষ্ঠির অপর পত্রিকা 'ইসলাম-প্রচারক'কেও ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে দেখা যায়। পত্রিকায় প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যার সূচনায় লেখা হয়, "এই ধর্ম (ব্রাহ্মধর্ম) দিন দিন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। একঘেয়ে বাঙ্গালা শিক্ষার যে ফল, তাহা এই ক্ষেত্রে বিকাশ পাইয়াছে। অতএব ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য ও ব্রাহ্মধর্মের অযৌক্তিকতা মধ্যে মধ্যে 'ইসলাম প্রচারকে' দেখান হইবে।"৬১ ইসলাম-প্রচারকের 'জাতীয় ধর্মসংবাদ' অংশে ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রভাব সম্পর্কে নানা তথ্য পরিবেশিত হত।

সেকালের অনেক চিন্তাবিদের ধারণা হয়েছিল যে, বাংলার মুসলমানের অধঃপতনের প্রধান কারণ হল ইসলামের আদর্শ থেকে বিচ্যুতি। ইসলামের শরাহ্-শরিয়ত মত ধর্মকর্ম না করে তারা বেশরাহ্-বেদাত কর্মে লিপ্ত হয়েছে। তাঁরা মনে করেছেন, এ বেশরাহ্-বেদাত আচারগুলি এসেছে হিন্দুধর্ম থেকে। ইসলামের নৈতিক শিক্ষা, ধর্মীয় অনুশাসন যথাযথভাবে গ্রহণ ও পালন না করার জন্য মুসলমান সমাজে অনৈসলামিক রীতিনীতি প্রবেশ করে জাতীয় চরিত্রকে হীনবীর্য ও হীনমন্য করে তুলেছে। ওয়াহাবি ও ফারায়েজি আন্দোলনের ধর্ম সংস্কারের একটি প্রধান দিক ছিল, সমাজে অনুপ্রবিষ্ট কুসংস্কারগুলি দূর করে ইসলামের শরিয়তি আদর্শ স্থাপন করা। সাময়িকপত্র ও পুস্তকগুলি সে আদর্শেরই প্রতিধ্বনি তুলেছে। ১২৯৯ সন আষাঢ় সংখ্যায় 'ইসলাম-প্রচারকে' লেখা হয় : "হজরত মাওলানা কেরামত আলী মরহুম মগফুরের আগমনের পূর্বে বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান পৌত্তলিকতামূলক কুসংস্কারে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ... মুসলমানগণ নমাজ, রোজা প্রভৃতি ধর্মকর্ম ছাড়িয়া দিয়া, নানা প্রকার হিন্দু দেবদেবীর পূজা অর্চনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিল। মনসাপূজা, শীতলাপূজা, ষষ্ঠীপূজা, সত্যপীরের পূজা, কালীর নামে পাঁঠা উৎসর্গ এ সমস্ত কার্য্য মুসলমান জনসাধারণ মধ্যে বিশেষরূপে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছিল। তদ্ব্যতীত পীরপূজা, দরগাপূজা, দরগাঘরে নানাবিধ বেদাতী কার্য্য, মহরমের সময় তাজিয়াজারী, জারীগান, গাজীর গীত ইত্যাদি শত শত প্রকার ধর্ম বিগর্হিত কার্য্যের অনুষ্ঠান হইত। বিবাহ, খানা ও স্ত্রীলোকের রজস্বলা উপলক্ষ্যে জঘন্য আমোদ প্রমোদ, বাদ্য বাজনা প্রভৃতির বিশেষরূপ অনুষ্ঠান হইত।"৬২ ১৮৯৭ সালের মার্চ সংখ্যায় 'হাফেজ' পত্রিকায় 'সেরেক ও বেদাত' প্রবন্ধে অনুরূপ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। "আমাদের এই হিন্দুস্থানবাসী মুসলমান নামধারী ভ্রাতাগণের মধ্যে যে কত শত নূতন মনগড়া কার্য্য প্রচলিত রহিয়াছে, তাহার আর ইয়ত্তা করা যায় না, . . খৎনার সময় আমোদ আহ্লাদ, লোকজন খাওয়ান, ... তাজিয়া বাহির করা, মহরমের মজলেস করা, আলম করা, মেহেদী বানান, মৃত্যুর চতুর্থ (চাহারাম), দশম (দশা), ৪০ দিন, ছয় মাস বা এক বৎসরে

৬১ *সুধাকর*, ২৩ কার্তিক ১২৯৬, পৃ:. ৬-৭
৬২ *ইসলাম-প্রচারক*, ভাদ্র ১২৯৮
৬৩ *ইসলাম-প্রচারক*, আষাঢ় ১২৯৯

মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য কোন প্রচার কার্য্য করা, কবর চাদর দ্বারা ঢাকা, ... সন্ধ্যার সময়ে কবরে চেরাগ দেওয়া ... বিধবার পুনর্ব্বিবাহ না দেওয়াকে আয়েব জানা প্রভৃতি এরূপ কার্য আছে, যাহা কোরান ও হাদিস শরীফে নাই। ... যাহা হউক, যখন ইহার সম্বন্ধে কোনরূপ তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হয়, তখন আমাদের উচিত, পয়গম্বর সাহেবকে বিচারক নিযুক্ত করা।"[৬৩] হিন্দুজাতীয়তাবাদের পুনরুত্থানের আন্দোলনের যুগে কোন কোন হিন্দু লেখকের লেখায় মুসলমানের ইতিহাস, ঐতিহাসিক চরিত্র, ইসলাম ধর্মনীতি, হজরত মহম্মদ এবং মুসলমান জাতিকে হেয় প্রতিপন্ন করা হলে মুসলমান সমাজে এর প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 'এক হাতে কোরান ও অপর হাতে তরবারি নিয়ে মুসলমানগণ ধর্মপ্রচার করেছেন।' 'ধর্মযুদ্ধে জয়ী হলে গাজী, আর মৃত্যু হলে শহীদ—এরূপ বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে মুসলমানগণ ধর্মপ্রচারে প্রবৃত্ত হতেন।' হিন্দু লেখকগণ এ ধরনের মন্তব্য করতেন।[৬৪] এতে মুসলমানদের ধর্মানুভূতি আহত হত। 'অর্চনা' মাসিক পত্রে (শ্রাবণ ও ভাদ্র ১৩১২) কেশচন্দ্র গুপ্ত 'ধর্মদ্বেষিতা' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। তিনি সেখানে কতগুলি মন্তব্য করেন, যথা—"খৃষ্টান এবং মুসলমান যখন বুঝিতে পারে, একটি ব্যতীত জনম নাই, এই জনমের কার্যকলাপের সহিত অনন্তকাল ব্যাপী সুখ-দুঃখের সম্পর্ক ... নিজধর্মে অপরকে৯ দীক্ষিত করা একটা মহাপুণ্যকর্ম, তখন অপরকে আপনার ধর্মশ্রেণীভুক্ত করিবার বাসনা তাহার হৃদয়ে আপনা আপনিই সমুত্থিত হয়।" "পাড় *মহম্মদীয়গণ স্বকীয় ধর্মে কাফেরদিগকে দীক্ষিত করিবার জন্য উষ্ণ নরশোণিতে ধরিত্রীর শস্যশ্যামল মাটি লোহিত বর্ণে চিহ্নিত করিয়াছিলেন।*"[৬৫] কোহিনুর পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী 'মাসিক সাহিত্যসমালোচনা' অংশে এবং আহমদ কবীর 'ইসলাম ও হিন্দু ধর্ম' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কেশবচন্দ্র গুপ্তের রচনার প্রতিবাদ করেন। আহমদ কবীর বলেছেন, "বল প্রয়োগপূর্বক অন্যকে স্বধর্মে দীক্ষিত করিবার আদেশ কোরানের কোন স্থানে লিখিত নাই। কোরানে ঈশ্বরের আদেশ এই যে, "ধর্মবিষয়ে বল প্রয়োগ করিও না। ... লোকদিগকে জ্ঞানের সহিত এবং নম্রতার সহিত পরমেশ্বরের পথে আহবান কর এবং তাহাদের সঙ্গে ভদ্রতার সহিত ধর্মবিষয়ে তর্ক কর'।"[৬৬] তিনি সেখানে বলেছেন যে, মুসলমানরা যুদ্ধ করেছেন রাজনৈতিক কারণে, ধর্ম প্রচার উদ্দেশ্যে নয়। ইসলাম ধর্মের এরূপ সমালোচনা ও মুসলমানের ধর্মচ্যুতির কারণে সমাজপতিগণ বিচলিত হয়েছেন। তাঁরা এসবের কারণ অনুসন্ধান করেছেন, এগুলির প্রতিকারের উপায় উদ্ভাবন করেছেন এবং সমাজের মানুষের মধ্যে ইসলামের মাহাত্ম্য ও আদর্শ পৌছে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। উপযুক্ত ধর্মপ্রচারক ও বাংলা ভাষায় ধর্মপুস্তকের অভাবের জন্য সাধারণ মানুষ নিজেদের রীতিনীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকেছে, তারা অন্যদের প্রচারে সহজেই বিভ্রান্ত ও প্রলোভিত হয়েছে। এদেশে বহুকাল পূর্ব থেকে পীর-দরবেশ, মৌলবী-মৌলানা, মুনশী-

৬৪ *হাফেজ*, মার্চ ১৮৯৭, পৃ. ১৩৭

৬৫ ইসমাইল হোসেন সিরাজী—'নবনূর ও জেহাদ', *ইসলাম-প্রচারক*, অগ্রহায়ণ-পৌষ, ১৩১০, পৃ. ৪৪৭

৬৬ কোহিনুর, আষাঢ় ১৩১২, পৃ. ৭৮

৬৭ ঐ, আশ্বিন ১৩১২, পৃ. ১৮৪

মোল্লাগণ ইসলাম চর্চা ও প্রচারের দায়িত্ব পালন করে এসেছেন। সমাজের অধঃপতনের যুগে তাঁরা উচ্চ শিক্ষা ও পৃষ্ঠপোষকতা হতে বঞ্চিত হয়ে আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়েন। যে নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থপরতা থাকলে লোকে মুগ্ধ হয়, ঐ শ্রেণীর ধর্মপ্রচারক তা হারিয়ে ফেলেন। ক্রমে তাঁরা ধর্মপ্রচারকে ব্যবসায় হিসাব গ্রহণ করেন। পীর-মোল্লা-আলেমদের অযোগ্যতা, আদর্শহীনতা ও নির্বুদ্ধিতার অভিযোগ করে ঐ সময়ে পত্র-পত্রিকায় অনেক লেখালেখি হয়। "বঙ্গদেশের ধর্মপ্রচারক মৌলবীর সংখ্যা অল্প নহে, কিন্তু তাঁহারা বিধর্মীর নিকট ধর্মপ্রচারের উপযুক্ত পাত্র নহেন। আবার তাঁহারা নিজের পেটের চিন্তায় এতই ব্যতিব্যস্ত যে, সমাজের কল্যাণচিন্তা আদৌ স্থান পায় না। ... আবার মৌলবী সাহেবগণ বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের 'ওয়াজ-নসিহত' উর্দু ভাষায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। ... একজন নাস্তিক, একজন হিন্দু, একজন খ্রীষ্টিয়ান বা ব্রাহ্ম আসিয়া একটি যুক্তিতর্ক উত্থাপন করিলে মৌলবী সাহেবের চক্ষু স্থির। এরূপ অবস্থায় আমাদের মৌলবী সাহেবগণ ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদিগের নিকট কিরূপ ফল লাভ করিতে পারে, তাহা ব্যক্তি মাত্রেরই বিবেচ্য।"[৬৭]

বাংলা ভাষায় ধর্মপুস্তকের অভাবের কথা প্রথম অনুভব করেছিলেন টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন, তৎপর কলিকাতার সুধাকর-গোষ্ঠীর লেখকগণ ও রাজশাহীর মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। নইমুদ্দীনের 'কোরানের বঙ্গানুবাদ', 'ফতুয়ায়ে আলমগীরি', মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন ও অন্যান্যের রচিত 'এসলামতত্ত্ব', ইউসুফ আলীর 'সৌভাগ্য স্পর্শমণি' রচনার উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের সারমর্ম ও রীতিনীতি বাংলা ভাষার মাধ্যমে পাঠকের কাছে পৌঁছে দেওয়া। তখন থেকে শুরু করে ছোট-বড় বিভিন্ন শ্রেণীর লেখকের হাতে বহু ধর্মগ্রন্থ রচিত হয়েছে। মুনশী মেহেরুল্লা 'হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা' ও 'বিধবাগঞ্জনা' পুস্তকে হিন্দু ধর্ম ও সমাজের প্রতি সরাসরি কটাক্ষ করেছেন। গোলাম কিবরিয়ার 'উচিত কথা'য় হিন্দুধর্মের রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আছে। এসব প্রশ্নে তাঁরা মুক্তির পথ অনুসরণ করেননি, বরং ধর্মান্ধতা ও ধর্মবিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাবকে জিইয়ে তুলেছেন। শেখ জমিরুদ্দীন, শাহ আবদুল্লা, মোহাম্মদ এব্রাহিম, দীন মোহাম্মদ গাঙ্গুলী, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, আনিসউদ্দীন আহমদ পারিলী প্রমুখ বক্তা ও লেখক কমবেশী ঐ ধারাকেই লালন করে গেছেন। মৌলানা কেরামত আলী এবং তৎপুত্র আবদুল হাফিজ, হুগলীর ফুরফুরার পীর আবু বকর, যশোহরের আবদুল মজিদ লাহুরিয়া প্রমুখ ধর্মনেতার ভূমিকাও স্মরণ করতে হয়। এঁদের প্রভাব সমাজের গভীরে ছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতকে 'দারুল ইসলাম' বলে আখ্যাত করে কেরামত আলী জৌনপুরীই ওয়াহাবি ভাবধারার প্রভাব থেকে দেশবাসীর আবেগ ও দৃষ্টিকে মুক্ত করেন। তিনি ও অন্যান্য ধর্মনেতা ধর্মীয় সভায় যোগদান করে ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের উত্তর, ইসলামের মাহাত্ম্য ও গৌরব, মুসলমানের ধর্ম ও ধর্মপালনের রীতিনীতি ইত্যাদি ব্যাখ্যা করতেন। আখবারে এসলামীয়া, আহমদী, সুধাকর,

৬৮ *ইসলাম-প্রচারক*, ভাদ্র ১২৯৮, সূচনা' দ্রষ্টব্য।

প্রচারক, ইসলাম-প্রচারক প্রভৃতি পত্রিকার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ধর্মপ্রচার। এর সঙ্গে দেশের নানা স্থানে বিভিন্ন আঞ্জুমনগুলির ক্রিয়াকলাপ সংযুক্ত করলে ইসলাম ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পুরো রূপটি প্রকাশ পায়। 'নূর-অল-ঈমান সমাজ', 'আঞ্জুমনে হেমায়েতে এসলাম'. 'অঞ্জুমনে মঈনাল এসলাম', 'আঞ্জুমনে আশ-আতে-ইসলাম', 'ধর্মোত্তেজিকা সভা', 'আঞ্জুমনে নূরুল ইসলাম', আঞ্জুমনে মফিদুল ইসলাম', 'অঞ্জুমনে ইসলামিয়া' 'বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি' ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান মূলত ধর্মভিত্তিক ; কোন কোনটির ধর্মের সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকাও ছিল। সর্বতোভাবে ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষা করে আঞ্জুমনগুলির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রিত হত। অনেক প্রতিষ্ঠান উদ্যোগী হয়ে মাদ্রাসা স্থাপন করেছে এবং ধর্মীয় পুস্তক প্রণয়নে ও প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দান করেছে।

ইসলাম ও বাউল মতবাদ

সতের শতকের শেষের দিকে অথবা আঠার শতকের গোড়ার দিকে বাউল মতবাদের জন্ম হয়। এটি সম্পূর্ণরূপে লৌকিক ধর্মমত, বাংলার মাটি এর লালন ও চারণ ক্ষেত্র। সুফিবাদ, বৈষ্ণবধর্ম, নাথধর্ম ও তান্ত্রিক সাধনার সমন্বয় সাধন করে বাউল মতবাদের উদ্ভব হয়। শ্রেষ্ঠ বাউল লালন শাহ (১৭৭৪-১৮৯০) এ মতবাদকে জনপ্রিয় করে তোলেন। বাউল গানই বাউলদের সাধনার অঙ্গ। এছাড়া, অন্য কোন দর্শন বা শাস্ত্র তাদের নেই। গানের মাধ্যমে তারা তাদের আরাধ্যের অনুসন্ধান করে। পারিভাষিক শব্দে তিনি বলেন 'মনের মানুষ' 'অচিন পাখি', 'মন মনুয়ার', 'অধরা', 'অটল' প্রভৃতি। জীবদেহেই তাঁর অধিষ্ঠান। দেহভাণ্ডকে জানলে ব্রহ্মাণ্ডকে জানা যাবে—এই তাদের ধর্ম দর্শন। বেদের 'আত্মানং বিদ্ধি' বা সুফির 'মান আরাফা নাফসাহু, ফাকাদ আরাফা রাব্বাহু'—নিজেকে জানলে ঈশ্বরকে জানা যায়, বাউল দর্শন এই ধর্মনীতির অনুসারী। বাউলেরা জাতির বিচার করে না অর্থাৎ হিন্দু-মুসলমান জাতিভেদ, উচু-নীচ বর্ণভেদ, ধনী-নির্ধন শ্রেণীভেদ মানে না। হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই শাস্ত্রধর্মে ও সামাজিক নীতিতে এসবেরই নানা বাছবিচার বিদ্যমান। ইসলাম নীতিগতভাবে সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শ বহন করলেও ব্যবহারিক জীবনে তা রক্ষিত হয়নি। লালন শাহ প্রমুখ বাউল শাস্ত্র বা শরিয়তিধর্মের কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতা ভেঙে দিয়ে একটি উদার মানবতাবাদ এবং সহজপন্থী মরমীয়াবাদের সৃষ্টি করেন। লালন কুষ্টিয়ার ছেঁউড়িয়ায় আস্তানা করে সাধনা করতেন। কৃষক ও তাঁতি সম্প্রদায়ের লোকেরা বাউল মতে দীক্ষা নিত। লালনের কয়েক লক্ষ বাউল শিষ্য ছিল। বাউলরা মুখ্যত বিবাগী, তারা চাষাবাদ, তাঁতবোনা প্রভৃতি স্বাভাবিক জীবিকা ছাড়াও ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করত। বাউল মতে দেহসাধনার কথা আছে, তান্ত্রিকদের মত তারা নারীসঙ্গম ও মদ্যপানাদি সমর্থন করে। এই বামাচারী তামসিক ধর্মাচরণের জন্য অন্য সম্প্রদায়ের লোকেরা বাউলদের সুনজরে দেখত না, বরং সামাজিক অনাচারের ভয়ে তারা বাউলদের বিরূপতা করে উৎপাত করার চেষ্টা করেছে। মুসলমান যুবকেরা সংসারধর্ম ত্যাগ

করে বাউল মতে দীক্ষা নিত, শরিয়তপন্থী মুসলমানরা এটিকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি। মোল্লা-মৌলবীরা 'বাউল ধ্বংস ফতোয়া' পর্যন্ত জাহির করেছিলেন। লালন শাহের জীবিতকালেই বাউলবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। লালন নিজেই কয়েকটি বিতর্কে অংশ গ্রহণ করেন। লালন শিষ্য দুদ্দু শাহ বলেছেন, "বাহাস করিতে এসে বয়াত হইনু, আমি অতি অভাজন লালন সাঁই বিনু।" কুষ্টিয়ার হিজলবাট গ্রামের মুন্শী তোফাজ্জল হোসেনের সাথে লালনের একাধিকবার কোরান হাসিদ নিয়ে বিতর্ক হয়। কাঙ্গাল (ছদ্মনাম) রচিত 'সহি আক্ষেপনামা' পুথিতে এ সবের বিবরণ আছে।[৬৮] লালন বিদ্যাহীন প্রচার সর্বস্ব শরিয়তপন্থীদের আক্রমণ করে বলেছেন :

বে-এলম, বে মুরীদ জনা,
শরীয়তের আঁক চেনে না,
কেবল মুখে তোড় ধরে।[৬৯]

তিনি শুষ্ক আচার-আনুষ্ঠানিকতারও বিরোধিতা করেছেন।

কলমা আর নামাজ
রোজা জাকাত হজ,
এই করিয়ে আদায় কর শরিয়ত?
আমি ভাবে বুঝতে পাই
এসব আমল শরিয়ত নয়
আরো কিছু অর্থ থাকতে পারে।[৭০]

বাউলের কোন সংগঠন ছিল না, মৌখিক গান ছাড়া লিখিত কোন বিধি ছিল না, তারা বৈষয়িক চিন্তা অপেক্ষা পারমার্থিক ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়েছিল। লালনের মৃত্যুর পর নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্য ব্যক্তিও ছিলেন না। এসব কারণে বাউলেরা সহজে পর্যুদস্ত হয়ে পড়ে, তাদের অনেকে শাস্ত্রধর্মে ফিরে গিয়ে গৃহধর্ম পালন করতে থাকে। ওয়াহাবি-ফারায়েজি ধর্মসংস্কারের সময় থেকে বাউলদের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু হয়।[৭১] পরবর্তীকালে সভাসমিতি, পত্রপত্রিকা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে এদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। যশোহরের মুন্সী মেহেরুল্লা খ্রিষ্টান মিশনারিদের মত বাউলদেরও বিরুদ্ধে প্রচার-অভিযান চালান। তিনি বক্তৃতা করে তাদের ইসলামের পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর জীবনীকার শেখ হাবিবর রহমান এক জায়গায় লিখেছেন, "এদেশের অনেক তথাকথিত মুসলমান এই তথ্য না বুঝিয়া হিন্দু সন্ন্যাসীদের আদর্শে ফকির দরবেশ সাজিয়া দেশে নানা অনাচারের সৃষ্টি করিয়া থাকে। ইহারা নামাজ রোজা ইত্যাদি শরিয়তের অবশ্য

৬৯. খোন্দকার রেয়াজুল হক—'লালনশাহী ভাবসঙ্গীতে বাংলাদেশের সমাজচিত্র', **পূর্বাচল**, কার্তিক ১৩৮৩, পৃ. ১৬
৭০. খোন্দকার রফিউদ্দীন—*ভাবসঙ্গীত*, পৃ. ১৬
৭১. **ঐ**. পৃ. ১৬
৭২. *বঙ্গে সুফী প্রভাব*, পৃ. ১৯৯-২০০

প্রতিপাল্য কার্যসমূহ কিছুই করে না। নানা প্রকার চাতুরির সহিত ইহারা লোকদিগকে মুগ্ধ করে। ইহাদের অনেকে এমনই অধঃপতিত যে কাপালিক অঘোরপন্থী ইত্যাদি হিন্দু সন্ন্যাসীদের অনুকরণে মলমূত্র পর্যন্ত আহার করিতে ঘৃণাবোধ করে না। এদেশে শত শত নেড়ার ফকির মুন্সী সাহেবের (মেহেরুল্লার) নিকট তওবা করিয়া খাঁটি চরিত্রবান মুসলমান হইয়াছিল।"[৭২] তিনি 'মেহেরুল এসলাম' (১৮৯৭) গ্রন্থে বাউল-বিরোধী বক্তব্য তুলে ধরে লিখেছেন :

নাড়ার ফরিক যারা আছে পায় পায়।
এই ঘোরে বহুজনে ফেলিল দাগায়॥
বহুতি আপসোস হয় তাহাদের তরে।
বানাইল পশু তারা বহুতর নরে॥ [৭৩]

তিনি বাউলদের 'গণ্ডমূর্খ ভেদুয়া' ও বাউলগানকে 'কাফেরী কালাম' বলে অভিহিত করেছেন।[৭৪] মীর মশাররফ হোসেন 'সঙ্গীত লহরীতে (১২৯৪) বাউলদের কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেছেন।

ঠেটা গুরু ঝুটা পীর
বালা হাতে নেড়ার ফকীর,
এরা আসল সয়তান, কাফের বেইমান
তাকি তোমরা জান না।[৭৫]

মশাররফ হোসেন যখন এই কবিতা লেখেন, তখন লালন শাহ জীবিত ছিলেন। লাহিনীপাড়া ও ছেঁউড়িয়ার দূরত্ব অতি সামান্য। তিনি অত্যন্ত কাছে থেকে বাউলের কার্যকলাপ প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যশোহরের হরিশপুর নিবাসী মোহম্মদ ওসমান খান 'হেদায়েতল ফাসেকিন' (১৮৯৭) গ্রন্থে বাউলদের আচার-আচরণের তীব্র নিন্দা করেছেন। এই হরিশপুর ছিল লালনের জন্মভূমি। বশিরহাটের গোলাম কিবরিয়া ও কাজী কেরামতুল্লার রচিত 'উচিত কথা'য় (১৮৮৯) বাউলদের নিন্দা ও গালাগালি করা হয়েছে। সমকালীন সাময়িকপত্রেও তাদের বিরুদ্ধে প্রচার চালান হয়। প্রথম বর্ষের প্রথম সংখ্যায় 'ইসলাম-প্রচারক' ঘোষণা করে, 'ফকির মতাবলম্বী এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মের ভীষণতম শক্র। হিন্দু, ব্রাহ্মণ, খৃষ্টিয়ান বা নাস্তিকদিগের দ্বারা যে ক্ষতি সাধন হইতেছে, মুসলমান নামধারী এই সকল ভণ্ড পাষণ্ডের দ্বারা তাহার শতগুণ ক্ষতির অনুষ্ঠান হইতেছে। ইহাদের ভীষণ ও বীভৎস মতগুলি জনসাধারণের পরিজ্ঞাত নহে, শিক্ষিত লোক এই সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক নহেন; কিন্তু যাহাদিগকে লইয়া বিশাল মুসলমানের সমাজ গঠিত, সেই সরল বিশ্বাসী

৭৩. *কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা*, পৃ. ১০০
৭৪. *মেহেরুল এসলাম*, পৃ. ৪৩ (৭সং)
৭৫. *মেহেরুল এসলাম*, পৃ. ১২
৭৬. *মশাররফ রচনা-সম্ভার*, পৃ. ৬৭২

মুসলমানগণ ইহাদের কুহকে পতিত হইয়া জাহান্নামের পথ পরিষ্কার করিতেছে ইহাদের পৈশাচিক ও পাষণ্ডোচিত কার্যকালাপের বিষয় লিপিবদ্ধ করিয়া আমরা লেখনী কলুষিত করিতে পারিব না। ... কতকগুলি ইন্দ্রজালিক কার্য ও ভেলকিবাজী দেখিয়া বর্ণজ্ঞানশূন্য সরল বিশ্বাসী কৃষক শ্রেণীর মুসলমানগণ সহজেই ইহাদের পদানুকরণ করে। শত শত কৃষক ইহাদের কুহকে পতিত হইয়া কৃষিকার্য পরিত্যাগ করতঃ 'ফকির' নাম ধারণ করিয়াছে। এই জঞ্জালগুলির সংস্কার না করিতে পারিলে ইহারা শীঘ্রই বঙ্গদেশ উৎসন্ন দিবে।"[৭৬] বাউলদের মধ্যে শিক্ষিত লোক না থাকায় এসব আক্রমণের বিরুদ্ধে তাদের মধ্যে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল, তা জানা যায় না। তবে কোথাও কোথাও তারা দলবদ্ধভাবে শরিয়তপন্থীদের ধর্মকর্মে বাধা দিয়েছিল। ইসলাম-প্রচারকে (ভাদ্র ১২৯৮) প্রকাশিত রাজশাহীব 'আঞ্জমনে আহমদী'র এক প্রতিবাদপত্রে এ বিষয়ে উল্লেখ আছে। বাউল বিরোধী আন্দোলন পরবর্তীকালেও চলতে থাকে। কুষ্টিয়ার কবুরহাট নিবাসী ফজলুল রহমানের 'ভণ্ড ফকীর' (১৩২১), নাটোরের দেওয়ান নাসিরুদ্দিন আহমদের 'সমাজ সংস্কার' (১৯১২), কুষ্টিয়ার বানিয়াকান্দির এমদাদ আলীর 'রদ্দে নাড়া' (১৩২৪, অপ্রকাশিত) শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদের 'বাউল ধ্বংস ফৎওয়া' (১৩৩২, ২ সং) প্রভৃতি গ্রন্থে বাউলদের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়েছে। এরূপ আন্দোলনের ফলে বাউলরা ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ে, তাদের অনেকে ইসলামের পথে ফিরে আসে। ফলে তাদের সংখ্যা ও প্রভাব হ্রাস পায়।

অন্তর্বিরোধ : সুন্নি ও শিয়া

"এদেশে হিন্দু-মুসলমানে সম্মিলন অপেক্ষা ব্রাহ্মণে-শূদ্রে সিয়া-সুন্নিতে সম্মিলন অধিকতর দুর্ঘট।" উক্তিটি করেছেন নওশের আলী খান ইউসফজয়ী 'নবনূর' পত্রিকায় (চৈত্র ১৩১২)। আমরা পূর্বে বলেছি, শিয়া-সুন্নির বিরোধের মূল কারণ হজরত আলীর খলিফাত্ব নিয়ে। তৃতীয় খলিফা হজরত ওসমানের মৃত্যুর পর চতুর্থ খলিফা কে হবেন এ নিয়ে মোয়াবিয়া ও আলীর সমর্থকদের বিবাদ হয়। হয়রত আলী শেষ পর্যন্ত গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ হারান। মোয়াবিয়া খলিফা হলে আলীর সমর্থকগণ তাঁর নেতৃত্ব স্বীকার না করে বিদ্রোহী হন, এজন্য তাঁদের 'উলভি' বা শিয়া বলা হয়। শিয়া সুন্নীর বিরোধের মূল কারণ এটা হলেও উভয়ের মধ্যে আরও মত পার্থক্য আছে। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন লিখেছেন, "শিয়াদের বাহ্য আড়ম্বর (মহরমের সময়) সুন্নিগণ ভাল মনে করেন না। বক্ষে করাঘাত করিলে বা শোকবস্ত্র পরিধান করিলেই যে শোক করা হইল, সুন্নিদের এরূপ বিশ্বাস নহে। মতভেদের কথা হইল এই যে, শিয়াগণ হজরত আয়েষা সিংহাসন আলীকে না দিয়া মোয়াবীয়াকে দিয়াছেন বলিয়া আয়েষাকে নিন্দা করে। ... সুন্নিগণ মাননীয়া আয়েষার নিন্দা সহ্য করিতে পারেন না। শিয়া সুন্নিতে এইটুক মতভেদ। এ বিষয় লইয়াই

৭৬ *ইসলাম-প্রচারক*, ভাদ্র ১৮৯৮

দলাদলি।"[৭৭] এদেশে শিয়াগণ 'মহরম' ও 'বেরা নামে দুটি উৎসব করেন। মহরমের তাজিয়া, দুলদুল, দরগাহ নির্মাণ থেকে মাতম করা, জারি গাওয়া, লাঠি খেলা, শোভাযাত্রা করা ইত্যাদি আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে মূর্তি বা প্রতীক পূজার অনুকরণ আছে বলে সুন্নিগণ অভিযোগ করেন। হাসান—হোসেনের জোড়া 'মকবেরা'র উপর তাজিয়া নির্মাণ করে ঢোল-বাদ্য ও শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে গিয়ে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়, এটি হিন্দুদের প্রতিমা বিসর্জনের অনুরূপ। সুন্নিগণ এটাকে বেদাত কার্য বলে মনে করেন। ভাদ্র মাসে 'বেরা' উৎসব হয়। কলার ভেলা তৈরি করে তাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে ভোগের দ্রব্যসহ খাজা খিজিরের উদ্দেশ্যে সেটি ভাসিয়ে দেওয়া হয়। শরিয়ত মতে এটিও বেদাতি অনুষ্ঠান। মুর্শিদাবাদ, হুগলী ও ঢাকায় ইমামবাড়া আছে। ঐ তিনটি স্থানেই শিয়াদের বসবাস আছে। ১৮৯৫ সালের ২৫ জুলাই 'মোসলেম ক্রনিকলে' হুগলীতে শিয়া-সুন্নির বিরোধের খবর আছে। ইমামবাড়ার তৎকালীন মতওয়াল্লী সৈয়দ আশরাফউদ্দীন আহমদ খান বাহাদুর উভয় শ্রেণীর মধ্যে বিরোধ মীমাংসায় ও সম্প্রীতি রক্ষায় সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। ঐ বছর লক্ষ্ণৌতেই শিয়া-সুন্নির মধ্যে সংঘর্ষ হয়। শিয়ারা কোরান-হাদিস থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে হজরত আলীকে 'খলিফা বিলাফসল' প্রমাণ করলে সুন্নিগণ বিপরীত উদ্ধৃতি ও ব্যাখ্যা দিয়ে তাঁদের মত অস্বীকার করেন—এ নিয়েই উক্ত বিবাদের সূত্রপাত।[৭৮] শুধু ধর্মজীবন নয়, পরবর্তীকালে রাজনৈতিক জীবনকেও এই দ্বন্দ্ব বিঘ্নিত করেছে। ১৯৩৭-৩৯ সালে ভারতবর্ষের মুসলমান রাজনীতিতে উত্তর প্রদেশের শিয়া-সুন্নির অন্তর্বিরোধ একটা কাল ছায়া ফেলেছিল।[৭৯] তবে বাংলাদেশে শিয়া-সুন্নির বিরোধ কোন সময় তীব্ররূপ ধারণ করেনি। কারবালার আবেগময় কাহিনী ও অনুষ্ঠানাদি শিয়া সুন্নি নির্বিশেষে বাঙালির অন্তর্জীবন ও হৃদয়লোককে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। এখানে শিয়াদের দ্বারা সুন্নিরাই প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কারবালার সেই বিবাদের ঘটনাবলীকে অবলম্বন করে মধ্যযুগে মর্সিয়া, জারি, পুথিসাহিত্য এবং আধুনিকযুগে কবিতা, উপন্যাস ও প্রবন্ধ রচিত হয়েছে। লৌকিক চেতনা ও আবেগকে আশ্রয় করে জারিগান এবং শিক্ষিত মানুষের কল্পনা ও অনুভূতিকে আশ্রয় করে মর্সিয়া সাহিত্য বাঙালি মুসলমানের কাছে খুবই জনপ্রিয় ছিল। মহরম উপলক্ষে যে লাঠিখেলা, শোক মিছিল, মেলা ইত্যাদি হয় তা সকল শ্রেণীর মানুষের মনে সাড়া জাগায়। মহরম ক্রমে মুসলমানদের 'জাতীয় উৎসবে'র অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। আঠার-উনিশ শতকের পুথিসাহিত্য কারবালার কাহিনীকে আরও আবেগধর্মী ও প্রাণস্পর্শী করে তোলে। উনিশ শতকের আট দশকে মীর মশাররফ হোসেনের 'বিষাদ-সিন্ধু' এক অনন্য রচনা : বাঙালি মানস ও মননের, আবেগ ও চিন্তার, বেদনা ও শোকানুভূতির একত্র সমন্বয় ঘটেছে বিষাদ সিন্ধুতে। চট্টগ্রামের হামিদ আলী 'কাসেমবধ কাব্য' (১৩১১) ও 'জয়নালোদ্ধার কাব্য' (১৩১৪) লিখে এ ধারাকেই পরিপুষ্ট করেছেন।

৭৮. *রোকেয়া রচনাবলী,* পৃ. ১২

৭৯. *The Moslem Chronicle,* 8 August 1895, P. 340

৮০ Amalendu De -- Islam in India (a Research Paper), 1977, p.8

মূলে যে কাহিনী মুসলমানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বাড়িয়েছে, ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে পরাধীনতা ও পতনের যুগে সেই জাতীয় ঐক্য সৃষ্টিতে ও উদ্দীপনা সঞ্চারে সহায়তা করেছে।

হানাফি ও মোহাম্মদি

শিয়া-সুন্নির মতবিরোধ অপেক্ষা সুন্নি শ্রেণীভুক্ত হানাফি-মোহাম্মদির মতবিরোধ গুরুতর ছিল। হানাফিগণ পীরবাদকে অস্বীকার করেননি। পীরবাদ ও পীরাচারকে কেন্দ্র করে এদেশের নানা কুসংস্কার গড়ে উঠেছে। পীরের আস্তানায় মাজার নির্মাণ, মাজার দর্শন, মাজারে মানত মানা, বাতি দেওয়া, শিরনি দেওয়া, সুতা বাঁধা ইত্যাদি কাজকে শরিয়তপন্থীরা অশাস্ত্রীয় আচরণ বলে মনে করেন। এ ছাড়া, কোন কোন নামাজ পড়ার পদ্ধতি, রোজা পালন ও সামাজিক প্রথা নিয়ে উভয় শ্রেণীর মধ্যে মতভেদ আছে। এই মতভেদের জন্য অনেক সময় সামাজিক লেনদেন ও বিবাহ সম্পর্ক পর্যন্ত স্থাপিত হয় না। কিছু মৌলিক, কিছু সাধারণ বিষয় নিয়ে এই মতবিরোধ তর্ক-বিতর্ক থেকে দলাদলি, মারামারি ও মামলা-মোকদ্দমা পর্যন্ত গড়িয়েছে। সমাজের দ্বন্দ্ব-কলহ বক্তৃতার সভাস্থল থেকে পত্রপত্রিকায় ও প্রবন্ধ-পুস্তকে উঠে এসেছে। সমর্থকগণ সভাসমিতি করে দলবদ্ধ হয়েছেন। তাঁরা নিজ নিজ মতের মুখপত্র হিসাবে পৃথক পত্রিকা প্রকাশ করেছেন। টাঙ্গাইলের করটীয়ার 'আখবারের এসলামীয়া' এবং দেলদুয়ারের 'আহমদী' পত্রিকা যথাক্রমে হানাফি ও মোহাম্মদি সম্প্রাদয়ের মুখপত্র ছিল। কলিকাতার 'সুধাকর' ও 'প্রচারক' ছিল হানাফি সমর্থক। ময়মনসিংহের এম. এস. নুরুল হোসেন কাশিমপুরী কর্তৃক সম্পাদিত 'হানাফী' (১৯০৩) পত্রিকা হানাফি সম্প্রদায়ের মুখপত্র ছিল। মোহাম্মদ আকরম খাঁ সম্পাদিত 'মোহাম্মদী' (১৯১৫) মোহাম্মদী সম্প্রদায়কে সমর্থন দিত। পরবর্তীকালে মোহাম্মদ আব্দুল হাকিম ও মোহাম্মদ বাবর আলীর যুগ্ম-সম্পাদনায় 'আহলে হাদিস' (১৯১৫) প্রকাশিত হয় 'আঞ্জমন আহলে হাদিস' সমিতির মুখপত্র হিসেবে। পত্রিকার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল মোহাম্মদি মতের সমর্থন দান এবং হানাফি মতের বিরোধিতা করা।[৮০] 'ইসলাম-প্রচারক' ও 'নূর-অল-ইমান' উভয় সম্প্রদায়ের সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছে। মোহাম্মদ নইমুদ্দীন রচিত 'ইনসাফ অর্থাৎ লা-মজহাবিগণের ধোকাভঞ্জন' (১৮৮৯), 'এসবাতে আখেরজ্জোহর' (১৮৯১), 'রফা ইদায়েন' ও 'আদেল্লায় হানিফিয়া বা রদ্দে লা-মজহাবি' (১৮৯৭) এই চারখানি গ্রন্থে তৎকালীন হানাফি ও লা-মজহাবি সম্প্রদায়ের বাদ-বিতণ্ডার কথা বর্ণিত হয়েছে। এগুলির কোন কোনটি 'আখবারে এসলামীয়া'য় প্রকাশিত হয়। প্রথম ও চতুর্থ গ্রন্থ দুটিতে হানাফিমতের বিরুদ্ধে মোহাম্মদীদের আনীত অভিযোগের উত্তর আছে। ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে কতক বিষয়ে 'মসলা' বা নীতি-নির্দেশ নিয়ে এই বিরোধ দেখান হয়েছে। উভয় সম্প্রদায় রক্ষণশীল, তবে হানাফিগণ প্রচলিত ধারা অনুসরণ করতে চান, মোহাম্মদিগণ পিউরিটানদের মত মৌলিক শাস্ত্রকথাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে চান—এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিরোধের উৎপত্তি।

৮১ *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ৩৪৫

নামাজ পড়ার সময় কতগুলি শারীরিক প্রক্রিয়া আছে, 'রুকু' তার মধ্যে একটি।[৮১] রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াবার সময় দু'হাত তোলার নিয়ম মোহাম্মদিরা মানেন, হানাফিরা মানেন না। রুকুর সময় হাত উঠানর রীতিকে 'রফাইদায়েন' বলে। হজরত মহম্মদ প্রয়োজনবোধে উভয় প্রক্রিয়ায় নামাজ পড়েছেন। তৎসত্ত্বেও কোনটির মসলা কি এই নিয়ে উভয় দলে বিবাদ। রমজান মাসে রোজা পালনের সময় রাত্রে 'তারাবি' ও 'বেতার' নামাজ পড়তে হয়। এগুলি দৈনিক পাঁচ বার ফরজ নামাজের অতিরিক্ত। হানাফিগণ ২০ 'রেকত' তারাবি ও ৩ রেকাত বেতর মোট ২৩ রেকাত পড়েন, মোহাম্মদিরা ৮ ও ৩ বা ১০ ও ১ মোট ১১ রেকাত পড়েন।[৮২] এখানে এই সংখ্যা নিয়ে মতভেদ। মোহাম্মদিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে আখবারে এসলামীয়ায় লেখা হয় : 'লা মজাহবীগণ যে নফল নমাজ পড়া দূরে থাকুক সোন্নত নামাজ পরিত্যাগ করিয়াছে, তারাবির নামাজও ছাড়িয়া দিয়াছেন, বেতরের নামাজ তিন রেকাতকে এক রেকাত করিয়াছেন, ... ইহাদের কার্যকলাপে আক্ষেপ। খোদাতালা হেদায়েত করেন এই প্রার্থনা।'[৮৩] 'সুরা ফাতেহা'র একেবারে শেষ শব্দটি 'দোওল্লিন' কি 'জোওল্লিন' হবে এই নিয়েও উভয়ের মধ্যে বিবাদ আছে। 'মিহির ও সুধাকরে' এ সম্পর্কে লেখা হয়, "যশোহর, খুলনা ও ফরিদপুর অঞ্চলে নব নব মৌলবীগণ উপস্থিত হইয়া 'দোওল্লিন' ও 'জোওল্লিন' উচ্চারণ সম্বন্ধে মহা গোলযোগ উপস্থিত করিয়াছেন, তাঁহাদের উত্তেজনায় মূর্খ লোকগণ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। এই গোলযোগ মীমাংসা করিবার জন্য যশোহর নিবাসী জনাব কারি হাফেজ মোহাম্মদ সফিউল্লা সাহেব একজন মহাবিজ্ঞ আলেম বন্ধুসহ শীঘ্রই উক্ত অঞ্চলে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছেন।"[৮৪] 'মোল্লাচরিত্র' নামে একটি কবিতায় ইসমাইল হোসেন শিরাজী অনুরূপ চিত্র দিয়েছেন,

ধন্য বাঙ্গালার মোল্লা হস্তীসম জ্ঞানী,
'দাল্লিন,' 'জাল্লিন' লয়ে করে হানাহানি।[৮৫]

জোহর, আসর, মগরেব, এসার, ফজর— প্রতিদিন এই পাঁচবার নামাজ পড়ার নিয়ম আছে। শুক্রবার জোহরের স্থলে জুমার নামাজ পড়তে হয়। হানাফিগণ জুমার নামাজের সঙ্গে অতিরিক্ত চার রেকাত 'আখেরজ্জোহর' পড়ার পক্ষপাতী। মোহাম্মদিগণ কেবল দু' রেকাত জুমা ও তৎসঙ্গে সোন্নত নামাজ পড়েন। নইমুদ্দীন 'এসবাতে আখেরজ্জোহর' গ্রন্থে হানাফি ও লা-মজহাবিগণের মধ্যেকার এই বিতর্ক সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, "জুমার ফরজের পরে জুমার সোন্নত পড়িয়া তৎপর চারি রাকাত আখেরজ্জোহর পড়িতে হইবে।"[৮৬] নঈমুদ্দীনের গ্রন্থের প্রতিবাদে

৮২. কোমব পর্যন্ত সামনের দিকে ঝুঁকে হাঁটুতে হাত দিয়ে হেঁট হয়ে দাঁড়ান প্রক্রিয়াকে 'রুকু' বলে।

৮৩. প্রথমে দাঁড়িয়ে নামাজ আরম্ভ করার পর থেকে 'রুকু' ও 'সিজদা' (বসে মাটিতে মাথা রাখা) শেষ করে আবাব দাঁড়ান পর্যন্ত একটা পূর্ণ প্রক্রিয়াকে রেকাত বলে। এক এক আঙ্গিক প্রক্রিয়ায় এক এক সূরা ও দোয়া-দরুদ পড়ার নিয়ম আছে।

৮৪. *আখবারে এসলামীয়া*, শ্রাবণ ১৩০২, পৃঃ ৬৯ (পাদটীকা)

৮৫ মিহির ও সুধাকর, ৯ ফাল্গুন ১৩০৮

৮৬ *ইসলাম-প্রচারক*, সেপ্টেম্বর-আগস্ট ১৯০৩, পৃঃ ৩৬৯

৮৭. মোহাম্মদ নইমুদ্দীন — *এসবাতে আখেরজ্জোহর*, টাঙ্গাইল, ১৮৯৭, পৃঃ ৫৮ (২ সং)

ময়মনসিংহের খোন্দকার আবুল ফজল আহমদ 'আখেরের জোহরের প্রতিবাদ' (১৯০৩) শিরোনামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন।[৮৭] 'এনসাফ অর্থাৎ লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জনে'র তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকায় (১৮৯২) মোহাম্মদ নইমুদ্দীন লিখেছেন, "এনসাফ করিয়া দেখিলে এই কেতাব লা-মজহাবী রোগের অমোঘ ঔষধ এবং হানাফী মজহাবের ধারাল তরবারি। লা-মজহাবীগণকে গোমরাহ করিয়া দলবল পুষ্টি করিবার জন্য স্থানে স্থানে জাল ফেলিয়াছেন, পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিতেছেন।"[৮৮] তিনি ঐ গ্রন্থে বহু হাদিস দলিল উদ্ধৃত করে লা-মজহাবি মতের অসারতা প্রতিপাদন করেছেন। তিনি লা-মজহাবিদের যে পরিচয় দিয়েছেন, তা উল্লেখযোগ্য :

শয়তানের শিং সেই আবদুল ওহাব।
যাহার খবর নবী দিয়াছিল সাফ॥
আব্দুলের তাঁবেদার যাহারা বাঁচিল।
ওহাবী বলিয়া তারা জাহের হইল॥
এদেশেতে দেখ তাই যত লা-মজহাবি।
নিশ্চয় জানিও এরা সকলি ওহাবী॥
ওহাবীর ধর পাকড় এদেশে যখন।
ইংরেজ করিল শুরু, জান সর্বজন॥
তখন ওহাবী নাম দিল বদলাইয়া।
মহাম্মদী বলি কেহ জাহের হইয়া॥
আহলে হাদিস বলি কেহ হইল বাহির।
গায়েব মোকাল্লেদ বলি কেহ প্রকাশিল॥...
আজকাল মহাম্মদী যাহারা বলয়।
ওহাবীর দল ঠিক জানিবে নিশ্চয়॥[৮৯]

'আদেল্লায় হানিফিয়া বা রদ্দে লা-মজহাবি' গ্রন্থে তিনি দাবি করেছেন যে, উক্ত গ্রন্থ পাঠে লা-মজহাবিগণের 'দাগাবাজি, ফেরববাজি, ঝুটামি সকলি প্রকাশ হইয়া পড়িবে'।[৯০] লেখকের আক্রমণেব ভাষা থেকে কোন্দলের তীব্রতা ও তিক্ততা অনুমান করা যায়। সৈয়দ আমানত আলী 'প্রচারকে' প্রকাশিত 'হানাফি ও লা-মজহাবি সংঘর্ষণ' নাম একটি প্রবন্ধে লা-মজহাবিদের প্রতি আরও রূঢ় ভাষা ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, "ভ্রাতাগণ! আমার অনুরোধ এই যে আপনারা শরা শরিফের প্রাচীন ও জগৎ বিখ্যাত কেতাবসমূহে যথা হেদায়া, শরে বেকায়া, আলমগিরী, দোররল মোক্তার...ইত্যাদি কোন কেতাবে সুন্নত জমায়েতের একতা বিশিষ্ট মজহাব চতুষ্টয় (হানাফি, সাফী, মালেকী, হাম্বলী) নাম ব্যতীত আপনারা 'মহাম্মদী' মজহাবের নাম কেহ কখন শুনিয়াছেন কি? বোধ করি কস্মিনকালেও কেহ দেখেন নাই শুনেন নাই। অতএব উহাই দজ্জালী দলের নতুন মজহাব।"[৯১]

৮৮. *বেঙ্গল লাইব্রেরী ক্যাটালগ,* ৪ চৈত্র. খ, ১৯০৪
৮৯. মোহাম্মদ নইমুদ্দীন— *এনসাফ অর্থাৎ লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন,* ১৮৯২ (৩ সং)
৯০. *এনসাফ অর্থাৎ না-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন,* ১৮৯২ (৩সং)
৯১. মোহাম্মদ নইমুদ্দীন- *আদেল্লায় হানফীয়া বা রদ্দে লা-মজহাবী*
৯২. *প্রচারক,* ভাদ্র-আশ্বিন ১৩০৬

'প্রচারকে' সৈয়দ আমানত আলীকে 'লা-মজহাবি-নাশক' এবং মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদীকে 'লা-মজহাবি-অরি' বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[৯২] 'প্রচারকে' মনিরুজ্জমানের দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয় : একটি 'লা-মজহাবিগণের ধর্ম রহস্যভেদ' (মাঘ-ফাল্গুন ১৩০৬) এবং অপরটি 'মজহাবের সত্যতা' (বৈশাখ ১৩৭০)। প্রথম প্রবন্ধে তিনি লা-মজহাবিদের সংস্কার প্রবণতার প্রতি কটাক্ষপাত করে মন্তব্য করেছেন, "যে সকল বস্তুর জাকাত আদায় করা ফরজ বলিয়া সমুদয় আলেম ও ইমামগণ আজ ১২/১৩ বৎসর হইতে মত দিয়া আসিতেছেন আজ লা-মজহাবিগণ, স্বাধীনতা বজায় রাখার জন্য তাহা উঠাইয়া দিতে বিরত থাকিতেন না। কালে যে তাঁহারা ইসলামধর্মের পঞ্চমূলের এক একটি ক্রমন্বয়ে সমূলে উৎপাটন করিয়া সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি?"[৯৩] তিনি ইসলাম-প্রচারকে এই দ্বন্দ্বের প্রকৃতি সম্পর্কে বলেন, "হানাফি, লা-মজহাবি ও জাহেরী, বাতিনী দলের সমস্যা দিন দিন ভীষণ মূর্তি ধারণ করিতেছে। স্থানে স্থানে তামাকের মসলা ও মৌলুদ শরিফের 'কেয়ামের' তর্ক লইয়া মাথা ফাটাফাটি ও মোকদ্দমাবাজীও চলিতেছে।"[৯৪] তিনি পরবর্তীকালে 'সোলতান' পত্রিকায় 'হানাফি মোহাম্মদী' শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেন, "বঙ্গদেশে হানিফী ও মোহাম্মদীর মধ্যে ১০ বৎসর পূর্বে নানা প্রকার বিবাদ বিসম্বাদ ছিল।...এক দল আরেক দলকে কাফের বলিয়া ফতোয়া দিতেন। কেহ কাহারও পশ্চাতে নামাজ পড়িতেন না। এমন কি কোন কোন মসজিদে এক দল আরেক দলকে নামাজ পড়িতে দিত না।"[৯৫] কিভাবে এ বিবাদের অবসান হয় সে সম্পর্কে আলোকপাত করে তিনি বলেন, "আঞ্জমনে ওলামা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর খববের কাগজের আন্দোলন আলোচনা, আঞ্জমানের প্রচারক ও পরিচালকগণের প্রাণপণ চেষ্টা, সভা-সমিতি এবং ওয়াজ বক্তৃতার ফলে এই সঙ্কীর্ণ সত্য ও সাংঘাতিক সাম্প্রদায়িক মতভেদ এবং বিবাদ কয়েক বৎসরের মধ্যে এক প্রকার মিটিয়া গিয়াছিল।"[৯৬]

সমসাময়িককালের বটতলার পুথিতে হানাফি-মোহাম্মদির বিতর্কের বিবরণ আছে। মনুশী মোহাম্মদী ফসিহ রচিত দুখানি পুথি আছে যেগুলির প্রতিপাদ্য বিষয় ছিল উভয় দলের 'বাহাস' বা বিতর্ক। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার মাড্ডা ও গোরাবাজারের বিতর্ককে অবলম্বন করে যথাক্রমে 'সয়ফল মোমেনিন' (১৮৭৫) ও 'সমসামিল মওয়াহেদিন' (১৮৮৭) গ্রন্থ লেখেন। মাড্ডার বিতর্ক সভায় মোহাম্মদির পক্ষে মৌলবী আবদুল্লা এবং হানাফির পক্ষে মৌলবী এহসান আলী নেতৃত্ব দেন এবং গোরাবাজারের বিতর্ক সভায় আল্লামা ইব্রাহিম মোহাম্মদির পক্ষে এবং মোল্লা আরেফ, করিম বক্স প্রমুখ হানাফির পক্ষে নেতৃত্ব দেন। দ্বিতীয় সভায় জজকোর্টের একজন উকিল বিচারক ছিলেন। বিতর্কের বিষয় ছিল 'তকলিদ-এ সখসি' বা অন্ধ অনুসরণ।[৯৭] মাড্ডার বিতর্ক সভাটি ১২৬৯ সনের ২৪ বৈশাখ অনুষ্ঠিত হয়। এর একটি প্রশ্নোত্তর ছিল এরূপ :

৯৩ ঐ, মাঘ ফাল্গুন ১৩০৬, পৃ. ৫৪
৯৪ *প্রচারক*, পৃ. ১৬-১৭
৯৫ *ইসলাম-প্রচারক*, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৩, পৃ. ৩৬০
৯৬ *সোলতান*, ২১ আষাঢ় ১৩৩০
৯৭ ঐ।
৯৮ মুন্সী ফসিহউদ্দীন— *সমসামিল মওয়াহেদিন*, কলিকাতা, ১৮৮৭, পৃ. ৩০

আবদুল্লা (সওয়াল)

চাহার মজহাব এ ফরজ কি ছোন্নত।
নফল ওাজেব কিবা বলো নেক জাত॥
মোবাহ কি মসকুক মকরুহ কিবা মস্তাহাব।
রাখিলে আজাব কি না রাখিলে ছওাব॥
হকে গণ্য হয় কি নাহকেতে ছোমার।
কতদিন হৈতে হৈল বুনিয়াদ ইহার॥
কি ফল মজহাবে ফলে কি চিজ মজহাব।
দোহাই হকের হক দাও হে জওাব।

লোৎফল হক (জওয়াব)

ছোন্নত নফল না ওয়াজেব এ মজহাব।
মোবাহ ও মসকুক মকরুহ নহে মোস্তাহাব।॥
না হক নহে কো হক মজহাব চাহার।
চৌথা জমানেতে হৈল বুনিয়াদ এহার॥
রাখিলে ছওাব আছে ছাড়িলে আজাব।
নেক ফল ফলে এতে ভাল এ মজহাব॥
বেসক মজহাব চারি ফরজে দাখিল।
কোরান সরিফে ছাফ মৌজুদ দলিল॥
পাঁচ ছেপারাতে ছুরা নেছার বিচেতে।
লেখি সে আয়েত নিচে মানো একিনেতে॥ [৯৮]

স্পষ্টত হানাফিদের চার মজহাব নিয়ে এ বিতর্ক : মজহাব মানা এবং মজহাব মানলে তার ফল কি ইত্যাদি বিষয়ে এখানে প্রশ্নোত্তর হয়েছে। মজহাব সম্পর্কে মোহাম্মদ নইমুদ্দীনের একই অভিমত : তিনি লিখেছেন, "চারি মজহাব হজরতের সময় যদিও ছিল না তথাপি চারি মজহাবের এক মজহাব মত চলা ওয়াজেব। কেননা এই চারি মজহাবের প্রতিই এসলামধর্ম নির্ভর করিতেছে, ইহারই প্রতি এজমা হইয়াছে। এই চারি মজহাব ব্যতীত যদি অন্য কোন মজহাব বাহির হয়, তবে তাহা হারাম বেদাত।"[৯৯] এই দ্বন্দ্বের অবসান হয়নি, আরও কিছুকাল ধরে চলেছিল, 'আহলে হাদিস' (১৯১৫), 'হানাফি' (১৯২৬) প্রভৃতি পত্রিকায় তার প্রমাণ আছে। বিতর্কমূলক গ্রন্থ রচিত হয় : হাবিলুদ্দীনের 'রদ্দে হানাফি ও মজহাব দর্পণ' (১৯২৫) এরূপ একখানি গ্রন্থ ছিল। বিশ শতকের দুই দশকের পর থেকে এই বিরোধের তীব্রতা কমে আসে, 'সোলতান' পত্রিকার পরোক্ষ মন্তব্য থেকে তা জানা যায়।

জুমা ও ঈদের নামাজ পড়া নিয়ে কোন কোন শ্রেণীর মৌলবী-মৌলানাগণের মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছিল। ওয়াহাবিগণের অভিমত ছিল যে, খ্রিষ্টানশাসিত ভারতবর্ষে জুমার ও ঈদের নামাজ পড়া সিদ্ধ নয়, এজন্য তাঁদের কেউ কেউ হিজরতের পক্ষপাতী ছিলেন।

৯৯ মোহম্মদ ফসিহ—*সয়ফুল মোমেনীন*, কলিকাতা, ১২৮২, পৃ. ২৪

[illegible] মোহাম্মদ নইমুদ্দীন —*এনসাফ অর্থাৎ না মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন*

মৌলানা কেরামত আলী প্রমুখ নব্যপন্থিগণ এর বিরুদ্ধে ফতোয়া দিয়ে বলেছিলেন যে, যেহেতু বিধর্মী সৈনিক ধর্মপালনে হস্তক্ষেপ করেন না, সেহেতু জুমা ও ঈদের নামাজ পড়া সিদ্ধ। ঢাকা মাদ্রাসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মৌলানা ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী আত্মজীবনীতে অনুরূপ সমস্যার কথা বলেছেন। তাঁর ভাষায় "দেশের এ অংশে 'তকলীদ' (পূর্ববর্তী ইমামদের অনুসরণ) নিয়ে সুধী সমাজ ও সর্বসাধারণের মত বিরোধ রয়েছে।...মাদ্রাসায় অনুষ্ঠিত দুতিনটি ওয়াজ-মজলিসে আমি উপস্থিত লোকজনদের সম্বন্ধে এ বিষয়টি সম্পর্কে আমার মতামত ব্যক্ত করেছি।...বিকর্তমূলক বিষয়াদির মধ্যে একটি হল দেশের জুমার নামাজ বৈধ কি না? মুসলমানদের পরস্পর বিবাদ ও বিরোধ নিরসনের উদ্দেশ্যে ইতিমধ্যে আমি এ বিষয়ে একটি পুস্তিকা প্রণয়ন করেছি।"[১০০] উভয়পক্ষীয় মত অবলম্বনে কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হয়, যথা আবদুল গফুরের 'তকরারে মাকুল' (১৮৯৮), মোহাম্মদ ইসমাইলের 'জুমা ও ঈদের ফতুয়া' (১৯০০) ইত্যাদি।

উনিশ শতকে হিন্দু ধর্মসংস্কার আন্দোলনের মৌল প্রেরণা ছিল নব্য মানবতাবাদ। পাশ্চাত্যের বিজ্ঞান ও যুক্তিবিদ্যা চিন্তার জগতে ভাবান্তর এনেছে। ধর্ম মানুষের জন্য, ধর্মের জন্য মানুষ নয়, মুক্ত যুক্তিবাদের এই উপলব্ধি থেকে মানুষের মহিমা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ধর্মভীরুতা থেকে হিন্দুগণ সতীদাহ, গঙ্গায় সন্তান বিসর্জন, মৃত্যুপথযাত্রীর অন্তর্জলি, অস্পৃশ্যপ্রথা, বিধবা বিবাহ, গৌরীদান প্রথা, কুলীন প্রথা ইত্যাদি কতকগুলি নিয়ম ও আচার পালন করতেন। ডেভিড হেয়ার, উইলিয়ম বেন্টিঙ্কের প্রত্যক্ষ সহায়তায় রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ নব্যপন্থিগণ ধর্মের পাষাণ চাপা সমাজের রুগ্ন প্রাণকে মুক্ত করেছিলেন। সংস্কারের পথ নিরঙ্কুশ ছিল না, রক্ষণশীলদের বাধাবিপত্তি, তর্ক বিতর্ক, প্রাণনাশের হুমকি সবই ছিল। শেষ পর্যন্ত মানবতার জয় ঘোষিত হয়। হিন্দু সমাজে সংস্কার-আন্দোলনে তাই একটা বিপ্লব আছে। এই বিপ্লবের ভেতর দিয়ে সমাজে 'নবজাগরণ' এসেছে।

শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে বাংলার মুসলমান সমাজে যে ধর্ম-আন্দোলন হয়, তার প্রকৃতি ছিল ভিন্ন। বিধবা বিবাহ বা শ্রেণীভেদ প্রথা মুসলমান সমাজের শাস্ত্রীয় সমস্যা ছিল না। এগুলি ধর্ম-আন্দোলনকারীদের প্রধান লক্ষ্যও ছিল না। তাঁদের প্রধান লক্ষ্য ছিল, বাইরের শক্তিগুলি থেকে ইসলামের উপর যে আঘাত এসেছে, সেগুলি প্রতিহত করা। আবার নিজেদের মধ্যে শিয়া-সুন্নি, হানাফি-মোহাম্মদির মতবাদ নিয়ে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল, তারও নিরসন করা। স্বধর্মীদের উন্মার্গগামিতা ও আত্মকলহের কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে তাঁরা প্রধানত ধর্ম শিক্ষার কথাই জোর দিয়ে বলেছেন। তাঁরা মনে করেছেন, ইসলাম অপরিবর্তনীয় ধর্মমত, কোরান অপৌরুষেয় ও হাসিদ অকাট্য বাণী। কোরান-হাদিসের নীতি-নির্দেশের সঙ্গে কোন আপোষ চলে না। সুতরাং ধর্মসংস্কার বলতে তাঁরা সমাজের অনৈসলামিক আচার-আচরণের সংস্কার বুঝেছেন। রক্ষণশীল মনোভাব থেকে এর প্রেরণা এসেছে। শিক্ষিত ব্যক্তিগণও এই আন্দোলনকে সমর্থন দিয়েছেন। এটি নব্যযুগের নব্যশিক্ষা ও নব্যচিন্তার আলোকে কোন বিপ্লবমুখী আন্দোলন ছিল না, এ ছিল ইসলামের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলন।

---

১০১ পূর্বোক্ত, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ আশ্বিন ১৩৮৮, পৃ. ১১

মুসলমানের এই ধর্মান্দোলনের একটা প্রত্যক্ষ ফল বাংলা চর্চা ও ধর্মসাহিত্যের সৃষ্টি। অংশত হলেও পূর্বে এই ধর্মীয় সংস্কার বাংলা ভাষা চর্চার পক্ষে অন্তরায় ছিল। আলোচ্য যুগেও সমাজের এক শ্রেণীর মানুষের আরবি-ফারসি-উর্দুর প্রতি মোহ ও আকর্ষণ ছিল। তাঁরা বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্মশিক্ষার বিরোধী ছিলেন। ভাষাগত দুস্তর ব্যবধানের জন্য সাধারণ মানুষ ইসলামের মাহাত্ম্য বুঝতে পারছে না, এজন্য তারা অন্যের কুহকের সহজ শিকারে পরিণত হয়। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রিষ্টান সকলেই বাংলা ভাষার মাধ্যমে ধর্মালোচনা করেন ও পুস্তক-পত্রিকা রচনা করেন। নতুন ধর্ম-আন্দোলনকারিগণ এর গতিরোধ করার জন্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষাতেই ধর্মপুস্তক রচনার প্রয়োজন বোধ করেন। কোরানের অনুবাদ, হাদিস, ফেকাহ ও অন্যান্য ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ হয়েছে, আবার শিক্ষামূলক, আলোচনামূলক, বিতর্কমূলক পুস্তক-পুস্তিকাও রচিত হয়েছে। কোরানের বঙ্গানুবাদ একদিন অকল্পনীয় ছিল। যাঁরা প্রথম অনুবাদে অগ্রসর হন, তাঁরা গোঁড়া শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে লাঞ্ছনা পেয়েছেন। ধর্মকথা, সাধু-সন্তজীবনী এবং ঐতিহাসিক বীরগাথা রচনা করে তাঁরা মানুষের দৃষ্টিকে স্বধর্মের পথে ফিরিয়ে এনেছেন এবং নিজেদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েছেন। ধর্মপ্রচার করতে গিয়েও মুখের ভাষা সাহিত্যের ভাষায় উঠে এসেছে, বাংলা ভাষার বিরোধী মনোভাবের অবসান হয়েছে।

এযুগের মুসলমানের ধর্ম-আন্দোলনের প্রকৃতি বিচার প্রসঙ্গে জনৈক লেখক মন্তব্য করেছেন, "চার মজহাবের ব্যাখ্যার মধ্যে ইসলামের সত্যকে সীমাবদ্ধ করে একদিন যেমন চিন্তার রাজ্যে এক অতি উচ্চ প্রাচীরের সৃষ্টি করা হয়েছিল, তেমনি ওহাবিদের গ্রহণবিমুখীনতাতেও হয়েছিল অপর একটি প্রাচীরের সৃষ্টি। এ বিশ্বে মুসলিম মানসে আর স্বাধীন চিন্তা ও স্বকীয় মননশীলতার কোন সুযোগ থাকেনি।"[১০১] বাঙালি মুসলমানের ধর্মান্দোলনকে আশ্রয় করে যে ধর্ম সাহিত্য গড়ে উঠেছে, তাতে স্বাধীনচিন্তা, মুক্তবুদ্ধির ছাপ পড়েনি, এটিই তার প্রধান কারণ ছিল। অশিক্ষা ও দারিদ্র্য মানুষের প্রধান শত্রু ছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির মধ্যে মানুষের আত্মজাগরণ ও নবজাগরণ সম্ভব, একথা সেযুগের কোন শ্রেণীর নেতাই উপলব্ধি করেননি। তাঁরা ধর্মের মধ্যের মুক্তির ও উন্নতির পথ খুঁজেছেন।[১০২] তাঁরা আত্মরক্ষামূলক নীতি নিয়ে প্রাচীন ধারাতেই ইহাবিমূখ আধ্যাত্মিক মক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। সুতরাং এ শ্রেণীর ধারাতেই ইহবিমুখ আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ নির্দেশ করেছেন। সুরতাং এ শ্রেণীর রচনা সমাজকে অগ্রগতির পথে নিয়ে যেতে পারেনি। ধর্মের কারণে একটি ঘুমন্ত সমাজ জেগেছে সত্য, কিন্তু সে শক্তিকে সমাজের ছিদ্রপথ বন্ধ করার কাজে লাগান হয়েছে, সমাজের বিকাশ ও মুক্তির কাজে প্রয়োগ করা হয়নি। মুসলমান সমাজের উক্ত সংস্কার আন্দোলনের এটাই প্রকৃত বৈশিষ্ট্য।

১০২ *পূর্বাচল,* কার্তিক ১৩৮৩, পৃ.১

১০৩ *ফারায়েজি আন্দোলনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক শোষণমুক্তির বীজ ছিল সত্য কিন্তু নেতারা জাতিধর্ম* নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর মানুষকে একত্র করতে পারেননি। ধর্মীয় রঙ থাকার ফলে হিন্দু কৃষক প্রজা ফারায়েজী আন্দোলনে যোগদান করেনি। নচেৎ শোষক ও অত্যাচারী জমিদাব--মহাজনের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন শ্রেণী সংগ্রামের রূপ নিতে পারত।

শিক্ষা

আলোচ্য যুগে বাংলার মুসলমান সমাজে শিক্ষা প্রসঙ্গটি জটিল রূপ ধারণ করে।[১] অথচ শিক্ষাই ছিল জাতিব জীবন-মবণ কাঠি। একটি সমাজের উন্নতি-অবনতি নির্ভর করে যুগোপযোগী শিক্ষা গ্রহণ-বর্জনের উপব। উনিশ শতকে ইংরাজি ভাষা শিক্ষা ও ইউরোপীয় বিদ্যাচর্চা জাতিব উন্নতির জন্য অত্যাবশ্যক ছিল। বাংলার মুসলমান সমাজে এ শিক্ষা নিয়ে সংশয়, দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ দেখা দেয়। বৈষয়িক উন্নতির জন্য ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা আবশ্যক হলেও ধর্মীয় ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপ সম্পাদনের জন্য আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা ও শাস্ত্রজ্ঞান অপরিহার্য ছিল। মুসলমান আমলে ফারসি ছিল রাজভাষা। রাজপদ লাভ করার জন্য হিন্দু-মুসলমান উভয়েই ঐ ভাষা শিক্ষা করতেন। মুসলমান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে আরবি-ফারসির কদর ছিল। সতের-আঠার শতকেব দিকে এদেশেব আব একটি ভাষাব আমদানী হয়—সেটি হল উর্দু ভাষা। উত্তর ভারত থেকে শাসকশ্রেণীর মৌখিক ভাষা হিসাবে উর্দু আরবি-ফারসির পাশে স্থান করে নেয়। হিন্দু সমাজে ধর্ম ও সংস্কৃতির ভাষা হিসাবে সংস্কৃতের চর্চা বরাবর অব্যাহত ছিল। বাজভাষা বা ধর্মভাষার মর্যাদা না পেলেও মাতৃভাষা বাংলা চর্চার ধারা কোন সময় শুকিয়ে যায়নি। ইংরাজদের আগমনের পূর্বে বাংলাদেশে এই পাঁচটি ভাষার প্রচলন ছিল। মক্তব-মাদ্রাসা, টোল-চতুষ্পাঠীতে এগুলির চর্চা হত। ইংরাজ আমলে ইংরাজি ভাষার প্রচলন হলে ভাষার সংখ্যা দাঁড়ায় ছয়টি। এক সময় সরকার আইন করে অফিস-আদালতের ভাষা হিসাবে ফারসির স্থলে ইংরাজির প্রবর্তন করেন (১৮৩৭)। স্কুল-কলেজে ইংরাজি শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা হয়। লর্ড ওয়ারেন হেস্টিংস কলিকাতা মাদ্রাসা (১৭৮০) স্থাপন করে ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা করেন বিচার ও রাজস্ব বিভাগে যোগ্য কর্মচারী তৈরি করার জন্য। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজেও (১৮০০) ইংরাজি-বাংলার সাথে উর্দু-ফারসি শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। যতদিন এ ব্যবস্থা চালু ছিল, ততদিন মুসলমান সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়নি ; সমস্যার আকার ধারণ করে তখন, যখন ফারসি রহিত করে ইংরাজির প্রচলন হয়। কলিকাতা মাদ্রাসায় ইংরাজি শিক্ষা দেওয়ার প্রশ্ন উঠলে (১৮২৩) আরবি-ফারসি ভাষা শিক্ষা ও ইসলাম ধর্মপ্রচার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত মাদ্রাসার মৌলিক আদর্শ ক্ষুণ্ন হবে, এরূপ অজুহাত দেখিয়ে মাদ্রাসার পরিচালক মণ্ডলী প্রথমে প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু পরে ঐ মাদ্রাসার অঙ্গনে ইংরাজি শিক্ষার ব্যবস্থা হয় (১৮২৬)। ১৮৩০ সালে মাদ্রাসায় ৮৭ জন ছাত্র প্রাথমিক ইংরাজি শিখতো। ঢাকার মুসলমানগণ শহরে একটি ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপনের

প্রদীপ সিনহা বলেছেন, The question of Muhammadan learning presents a variety of facets, some of which are of fascinating complexity. Pradip Sinha Nineteenth Century : Aspect of Social History. Firma K. L. Mukhopadhyay. Calcutta. 1965. P. 50

জন্য হেবসের নিকটে আবেদন করেছিলেন (১৮২৬) ; কিন্তু অর্থাভাবের অজুহাত দেখিয়ে সরকার তাঁদের আবেদন অগ্রাহ্য করে দেন। মুর্শিদাবাদে নবাব পরিবারের সন্তানদের ইংরাজি শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি প্রাথমিক ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় (১৮২৪)। এছাড়া, খ্রিষ্টান মিশনারি পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে ও কিছু কিছু মুসলমান ছাত্র শিক্ষা লাভ করত। সুতরাং ইংরাজি ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার প্রতি ঐ সময় পর্যন্ত মুসলমানদেব বিরূপ মনোভাব ছিল না।[২] বরং বলা যায়, ঐ সময় পর্যন্ত প্রয়োজন ছিল না বলে তারা এ ব্যাপারে মনোযোগ দেয়নি। যখন ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার প্রকৃত প্রযোজন দেখা দিল, তখন মুসলমান সমাজে নানাবিধ সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল।

মুসলমান সমাজে বিত্ত, বিদ্যা ও কুলের দিক দিয়ে আশরাফ, আতরাফ শ্রেণীভেদ ছিল। উচ্চ বর্ণের হিন্দুর মত আশরাফ বা অভিজাত মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার রীতি ছিল, নিম্ন বর্ণের হিন্দুর মত আতরাফ বা অনভিজাত শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা ছিল না। শেখ, সৈয়দ, মোঘল, পাঠান বংশোদ্ভূত লোকেরা নিজেদের অভিজাত মনে কবতেন। কৃষক, মাঝি-মাল্লা, জেলে-জোলা, মুটে-মজুর ছিল আতরাফ শ্রেণীভুক্ত। দেশের এবাই সংখ্যাগবিষ্ঠ। শিক্ষা এদের কাছে প্রায় অজ্ঞাতই ছিল। গ্রামের কোন কোন পবিবারের ছেলেরা মক্তব মাদ্রাসায লেখাপড়া করত বটে, কিন্তু সেটি ছিল ধর্ম শিক্ষা নির্ভব ; বৈষযিক উন্নতি কিংবা জ্ঞানচর্চার জন্য ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার মনোভোব প্রায অনুপস্থিত ছিল। সুতরাং তাদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ বা বর্জনের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আশবাফ শ্রেণীব মধ্যে একটি অংশ যথা আলেম, পীব, দরবেশ, মৌলবী, মওলানা কেবল আরবি-ফারসি শিক্ষায় নিজেদের নিয়োজিত রাখতেন, সমাজের পার্থিব ভালমন্দের কথা না ভেবে, মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে তাঁরা অধিক নজর দিতেন। তাঁদের কাজ ছিল ধর্ম প্রচার করা এবং ধর্মীয ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি পালন করা।[৩] যেহেতু ইসলামের ধর্মশাস্ত্র ও ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি গ্রন্থ আরবি-ফারসিতে লেখা, সেহেতু আববি-ফারসি শিক্ষা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর ছিল না। ইংরাজি ও বাংলা শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে টোল-চতুষ্পাঠিব সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পায়। কিন্তু মুসলমানরা মক্তব মাদ্রাসার শিক্ষা ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখে। ফারসি-শিক্ষার মানও উন্নত ছিল। উইলিয়াম এড্যাম তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে বলেছেন যে, বাংলা বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তার তুলনায় মাদ্রাসার ফারসি শিক্ষা অধিক সংহত ও উদার প্রকৃতির ছিল।

সাধারণভাবে অভিযোগ করা হয় যে, ফারসির প্রতি মোহ থাকায় মুসলমানরা ঐ ভাষা ত্যাগ করতে পারেননি। ভারতবর্ষে রাজকার্য পরিচালনা, শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি চর্চার

২. উইলিয়াম এড্যাম তাঁর রিপোর্টে বলেন, "Learned Musalmans are in general much better prepared for reception of European ideas than learned Hindus".

৩. সব রকমের নামাজ পাঠ যথা প্রতিদিন পাঁচবার ফরজ, সুন্নত ও নফল নামাজ, জুমার নামাজ, ঈদের নামাজ, রমজানের মাসে তারাবী নামাজ, জানাজার নামাজ, এসতেশকার নামাজ প্রভৃতি এবং মিলাদমহফিল দোয়া দরুদ পাঠ, বিবাহ পাঠ ইত্যাদি মুসলমানের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি আরবি ভাষাতে সম্পন্ন করতে হয়।

বাহন হওয়ায় ফারসি শিক্ষা সামাজিক মর্যাদার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। ফারসি বিদ্যা সমাজে ও রাষ্ট্রে প্রতিপত্তি লাভের উপায় ছিল। জমিদারপুত্র ভারতচন্দ্র সংস্কৃত শিখেছিলেন বলে পরিবারের লোকের কাছে সমাদর পাননি, তিনি দুঃখে গৃহত্যাগ করেন এবং রামচন্দ্র মুন্সীর কাছে দীর্ঘদিন অধ্যয়ন করে ফারসি আয়ত্ত করেন, তখন গৃহে সম্মান হয়। রামমোহন রায় প্রথমে ফারসি শিখেছিলেন, ডিগবি সাহেবের অধীনে সেরেস্তাদারের কাজ করার সময় ইংরাজি শিখেছিলেন। 'মীরাৎ-উল-আখবার' (১৮২৩) পত্রিকা তাঁরই সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। তাঁর 'তুহাফাতুল মওয়াহিদিন' (১৮০৪) ফারসিতে রচিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর উত্তম ফারসি জানতেন। মুসলমান বনেদি পরিবারগুলিতে ফারসির স্থান এর আলোকে বিচার করলে তাঁদের মোহের কারণ বুঝা যায়। গোলাম হোসেন সলিম বাংলার প্রামাণিক ইতিহাস গ্রন্থ 'রিয়াজ-উস-সলাতিন' (১৭৮৬-৮৮) রচনা করেন ফারসিতে। তিনি উডনি সাহেবের অধীনে মালদহে চাকুরি করতেন। তাঁর ন্যূনাধিক একশো বছর পরে মুর্শিদাবাদের দেওয়ান খোন্দকার ফজলে রাব্বি 'হাকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) রচনা করেন ফারসিতে। হুগলীর ইমামবাড়ার মতওয়াল্লী সৈয়দ কেরামত আলী (মৃত ১৮৭৩) ফারসিতে 'মুখজুল উলুম' গ্রন্থ লেখেন। আবদুল লতিফের পিতা কাজী ফকির মোহাম্মদ 'জামিউল তাওয়ারিখ' (১৮৩৬) গ্রন্থ লেখেন ফারসিতে। আবদুল লতিফের তত্ত্বাবধানে ও সৈয়দ রেয়াজতুল্লাহর সম্পাদনায় ফারসি সাপ্তাহিক 'দূরবীন' (১৮৫৩) প্রকাশিত হয়। 'মহামেডান লিটারে সোসাইটিতে (১৮৬৩) বক্তৃতা, প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হত ইংরাজি, ফারসি ও উর্দুতে। ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দীর কবিতার সংকলন 'দিওয়ান-ই-ওবায়দী' (১৮৮৬) ফারসিতে রচিত হয়। আশরাফ শ্রেণী শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে ফারসিকে এভাবে জিইয়ে রেখেছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যাঁরা ডিগ্রি নিয়েছেন, তাঁদের বিষয় নির্বাচনের তালিকা দেখলে বুঝা যায় তাঁদের কিরূপ ফারসি-প্রীতি ছিল। ১৮৫৭ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত যে সকল ছাত্র বি. এ (অনার্স) ও এম এ পাশ করেছেন, তাঁদের বিষয়ভিত্তিক একটি পরিসংখ্যান এরূপ :[৪]

বিষয়	সংখ্যা	হার
ফারসি	১০৭	৫৩.২
ইংরাজি	৫৩	২৫ ৩
আরবি	২১	১০.০
গণিত	১০	৪.৮
দর্শন	৮	৩.৮
বিজ্ঞান	৫	২.৪
ইতিহাস	৩	১.৪
সংস্কৃত	২	১.০

৪. পরিসংখ্যানটি ১৯২৯ সালে প্রকাশিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারের সাহায্যে প্রণীত। পবিশিষ্ট ১ (ক) দ্রষ্টব্য।

ফারসির সংখ্যা সর্বোচ্চ। স্মরণীয় যে, বাংলা ও অন্যান্য প্রদেশের মুসলমান ছাত্র এ সংখ্যার মধ্যে আছে। সুতরাং রাজভাষার পরিবর্তনে বাংলার এক শ্রেণীর মুসলমানরা মানসিকভাবে আঘাত পেয়েছিলেন। বৈষয়িক সুবিধা হারাবার ফলে তাঁদের মনঃক্ষুণ্নতা আরও বেড়ে যায়। আইনের দ্বারা একটা ভাষার মুণ্ডচ্ছেদ হলেও যাঁরা এ ভাষাকে ভালবাসেন তাঁরা রাতারাতি এটিকে বিসর্জন দিতে পারেননি। সুতরাং ফারসি ভাষার প্রভাব মুসলমান সমাজে থেকে যায়।

বদরুদ্দীন উমর এটিকে অন্য একটি দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। রাজভাষার সম্মান হতে ফারসির স্থানচ্যুত হওয়াকে মুসলমানরা দেখেছেন শাসকগোষ্ঠীর সাথে কলিকাতার ইংরাজি শিক্ষিত হিন্দু মধ্যবিত্তের একটি ষড়যন্ত্র হিসেবে। তাঁদের আশঙ্কা হয়েছিল, ফারসি ত্যাগ করলে তাঁরা স্বাধীন মনোবৃত্তি হারিয়ে 'দাস মনোভাবাপন্ন' হয়ে পড়বেন।[৫] কারণটি একেবারে অমূলক ছিল না। কলিকাতার সাময়িকপত্রে এ নিয়ে আন্দোলন হয়। ১৮২৮ সালের ২৬ জানুয়ারি একটি বাংলা সাপ্তাহিকীতে লেখা হয়, "ফার্সী বর্তমানে সমগ্র বাংলাদেশের আদালতের ভাষা রূপে ব্যবহৃত হয়। ইহা বিচারক, উকিল, বাদী, বিবাদী অথবা সাক্ষী কাহারই ভাষা নয়। আমরা মনে করি, যদি কোন বিদেশী ভাষাকে আদালতের ভাষা রূপে ব্যবহার করা হয় তাহা হইলে ইংরাজী ভাষাই গ্রহণ করা উচিত। এতদিন ইংরাজীকে সরকারি ভাষা রূপে গ্রহণের প্রধান আপত্তি ছিল এই যে, বাঙালি জাতি ইংরাজী জানে না। কিন্তু এখন সে আপত্তি টিকিতে পারে না। এখন হিন্দু কলেজে ৪০০ ছাত্র ইংরাজী শিখিতেছে। কলিকাতার অন্যান্য স্কুলগুলিতে কমপক্ষে এক হাজার ছাত্র ইংরাজী শিক্ষা পাইতেছে। ইংরাজী ভাষায় তাহাদের যে জ্ঞান হইয়াছে তাহাতে তাহাদের পক্ষে এই ভাষায় আদালতের কাজ চালান কিছুমাত্র কঠিন হইবে না। সরকার যাহাতে ফার্সীর জায়গায় ইংরেজীকে আদালতের ভাষারূপে প্রচলন করেন সেজন্য কলিকাতাবাসীদের আবেদন করা উচিত। যদি এই আবেদন গ্রাহ্য করা হয় তাহা হইলে দেশে ইংরাজি শিক্ষার প্রসার হইবে।"[৬] ১৮৩৪ সালের ১১ মার্চ ঐ পত্রিকা সরকারের কাছে দাবি করে যে, সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের ব্যাপারে ফারসির পরিবর্তে ইংরাজি জ্ঞানকে যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা উচিত। মুসলমানদেব ইংরাজি—ভীতি পশ্চাদপদ মনোভাবের লক্ষণ হলেও এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতিক্রিয়ার ফল, যা তাঁদের জাত্যাভিমানকে আরও স্পর্শকাতর করে তুলেছিল। এ সময়ে লর্ড মেকলের দম্ভোক্তি, 'একটি ভাল ইউরোপীয় গ্রন্থাগারের একটি আধারের বই-এর মূল্য ভারতীয় ও আরবি সাহিত্যের সমস্ত গ্রন্থের মূল্যের সমান' তাঁদের ক্ষুব্ধ চিত্তকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। এতে তাঁদের ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরার মনোবৃত্তি প্রবল হয়। অপরপক্ষে ইংরাজ ও ইংরাজির প্রতি সন্দেহ ও বিরূপতা বৃদ্ধি পায়। উপযুক্ত সময় না দিয়ে আকস্মিক পরিবর্তনকে তাঁরা সন্দেহের চক্ষে দেখেছিলেন। যুগের পরিবর্তনের ধারাটিও তাঁরা সম্যকরূপে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হন বলে আমাদের বিশ্বাস।

৫. বদরুদ্দীন উমর—পূর্ব **বাংলার সংস্কৃতির সংকট**, পৃ. ৯
৬. Ramesh Chandra Majumder--*Bengal in Nineteenth Centure,* P. 32

জনসাধারণের মুখের ভাষা বাংলা প্রাচীন কাল থেকেই হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান সকল শ্রেণীর কবির রচনায় সমৃদ্ধ হয়েছে। আধুনিক যুগে গদ্যশিল্পের প্রসার ঘটলে বাংলা ভাষাব শক্তি অনেক বেড়ে যায়। ফলে শুধু শিল্প-সাহিত্য চর্চা নয়, শিক্ষা, রাজকার্য ও অন্যান্য বিষয়কর্মে বাংলা ভাষার ব্যবহারেব আবশ্যকতা দেখা দেয়। বাংলার এই উপযোগিতার কথা উপলব্ধি করেই সরকাব ১৮৩৫ সালে ইংবাজির পাশে বাংলাকে শিক্ষা ও রাজকার্যের অঙ্গী করে নেন। মধ্যযুগের মোল্লা-পুরোহিত শ্রেণীর লোক বাংলায় ধর্মকথা লেখাব বিরোধী ছিলেন। কিন্তু নবাব-সুলতানেরা বাংলা ভাষার বিরোধিতা করেননি। তাঁরা অনেকে বাংলা ভাষা চর্চায় রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা দান কবেছেন। 'দৌলত উজির' (অর্থমন্ত্রী) বাহরাম খান 'অমাত্য তনয়', আলাওল, 'প্রধান উজির' মাগন ঠাকুর বাংলার সেবা করেছেন। সুতরাং মুসলমান অভিজাত শ্রেণী বাংলাকে উপেক্ষা করেননি। এদেশে বাংলা ভাষার প্রতি মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর উপেক্ষার ভাব জন্মে সম্ভবত উর্দু আমদানীর পব। উর্দু আববি লিপিতে লেখা হত, আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য সেখানে ছিল। দিল্লী-লক্ষ্ণৌর অনুকরণে একে তাঁবা মৌখিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করে শিক্ষা ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে স্থান দেন এবং বাংলাকে নিম্ন শ্রেণীর ছোটজাতের ভাষা বলে ভাবতে থাকেন। কিন্তু বাংলাব শক্তি ছিল বৃহত্তর জনগণ। আধুনিক যুগে ছাপাখানার দৌলতেই বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলা ভাষা অনেক উপরে উঠে আসে ; শিক্ষা ,শিল্প, কাব্য, বক্তৃতা, আলোচনা, সমালোচনা ও নিত্যনৈমিত্তিক কাজে বাংলা ব্যবহারের উপযোগিতা সম্প্রসারিত হয়। উর্দু-বাংলা বিতর্ক তুলেও মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর পক্ষে বাংলাকে ঠেকিয়ে রখা সম্ভব হয়নি। আবদুল লতিফ আভিজাত্যের মুখ চেয়ে শহরের উচ্চ ও মধ্যবিত্তের জন্য উর্দু এবং গ্রামের নিম্নবিত্তের জন্য বাংলা শিক্ষার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাংলার মুসলমান লেখকগণ সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েই মাতৃভাষা হিসাবে বাংলার মর্যাদা রক্ষার আন্দোলন শুরু করেন এবং জীবনের সর্বত্র বাংলা চর্চার উপযোগিতা প্রচার কবেন। তবে তাঁরা হিন্দুর হাতে গড়া বাংলা ভাষা ও হিন্দুয়ানি ভাবাশ্রিত বাংলা সাহিত্য নিয়ে বিতর্ক করেছেন, এবং কেউ কেউ ইসলামি সংস্কৃতির প্রতিফলন ঘটিয়ে মুসলমানের 'জাতীয় ভাষা', জাতীয় ভাব' ও 'জাতীয় সাহিত্য' সৃষ্টির কথা বলেছেন।

বাংলাদেশে শিক্ষার ক্ষেত্রে যখন পরিবর্তনের পালা চলেছে এবং ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে তখন মুসলমানদের মধ্যে ধর্ম-সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হয়। পশ্চিবঙ্গে তিতুমীর (১৭৮২-১৮৩১) ও পূর্ববঙ্গে হাজী শরিয়তুল্লাহ (১৭৮০-১৮৪৯) ও দুধু মিঞা (১৮১৯-১৮৬২) ওয়াহাবি ও ফারায়েজি আন্দোলনের মাধ্যমে ইংরাজ শাসন শোষণ বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলেন। ইসলামধর্মে যেসব কুসংস্কার ও অনৈসলামিক রীতিনীতি আছে, সেসব দূর করে কোরান-হাদিসের আদর্শে ইসলামকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। তাঁরা ক্রমে রাজনীতির সাথে জড়িত হয়ে পড়েন এবং শেষ পর্যন্ত ইংরাজদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন। তিতুমীর

'বাঁশের কেল্লা' নির্মাণ করে ইংরাজ সেনাবাহিনীর সহিত যুদ্ধে নিহত হন (১৮৩১)। শিখদের বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করে ঐ সময় সৈয়দ আহমদ শহীদ বালাকোটের যুদ্ধে শিখ সৈন্যের হাতে পরাজিত ও নিহত হন (১৮৩১)। তাঁর মৃত্যুর পরও জেহাদ আন্দোলন অব্যাহত ছিল। ১৮৪৯ সালে ইংরাজ পাঞ্জাব অধিকার করলে জেহাদীদের আন্দোলন ব্রিটিশ বিরোধী অন্দোলনে পরিণত হয়।[৭] বাংলাদেশ থেকে মুজাহিদ ও অর্থ সংগৃহীত হয়ে সীমান্ত প্রদেশে এই জেহাদের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হত। মালদহ, ঢাকা, রাজমহল প্রভৃতি অঞ্চলে জেহাদীদের প্রচারকেন্দ্র ছিল। এই আন্দোলনই সাধারণভাবে 'ওয়াহাবি আন্দোলন' নামে পরিচিত। শরিয়তুল্লাহ ও তিতুমীর সৈযদ আহমদ শহীদের আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। অত্যাচারী জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ছিল। তাঁরা এ সংগ্রামে সরকারের সহানুভূতি বা সমর্থন পাননি, উপরন্তু সরকার জমিদাব ও নীলকরদের পক্ষ নিয়ে তাঁদের বিরুদ্ধে দমননীতি চালিয়েছেন। এর ফলে ইংরাজ বিবোধী মনোভাব জোরদার হয়, ইংরাজি ভাষা-সংস্কৃতি মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয় বলে ফতোযা জারি হয। গ্রামেব মানুষের ইংবাজি শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিবোধী মনোভাবের পরিচয় দিয়ে মীর মশাররফ হোসেন 'আমাব জীবনী'তে লিখেছেন, 'আত্মীয় স্বজন গুরুজনগণের ধারণা ও বিশ্বাস যে ইংবেজী পডিলেই, একরূপ ছোটখাট শয়তান হয়।...সবাব খায়। জাবহাঝটকার বিচাব নাই। হালাল হাবামে প্রভেদ নাই। পাক না পাকের জ্ঞান থাকে না। মাথার চুল খাট করিয়া নানা ভাবে ছাঁটে, সাহেবি পোশাক পরে। ছুরি কাঁটায খানা খাইতে চায়। নামাজ রোজায় ভক্তি কবে না। আদব তমিজের ধার ধারে না।...নম্রতাব নাম গন্ধ থাকে না।"[৮] ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী কলকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার ছাত্রদের ইংবাজি বিবোধী মনোভাবের একটি বিবরণ দিয়েছেন এভাবে, 'বর্তমানে অধ্যয়নরত কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার ছাত্ররা এসেছে পূর্ববঙ্গ হতে। এদের মধ্যে আবার চট্টগ্রাম ও সুধারামের ছাত্র সংখ্যাই বেশী। পশ্চিমবঙ্গ বা শহরতলীর জেলাগুলির ছাত্র সংখ্যা শতকরা চার/পাঁচ ভাগ। চট্টগ্রামের মুসলমান ছাত্রবা খুবই ধর্মান্ধ, আধুনিক জীবনের প্রতি তাদের সামান্যতম সহানুভূতি নেই। স্বভাবতই তারা ইংরাজি শিক্ষার বিরোধী হয়।"[৯] ইংরাজি বিদ্যালয় পাঠাভ্যাস অনেকে ধর্মনাশের আশঙ্কা করতেন।[১০] খ্রিষ্টান মিশনারিগুলি ইসলাম বিরোধী প্রচার চালিয়ে এ আশঙ্কাকে সত্যে পরিণত করেছিল। সেখানে বিদ্যাচর্চা করতে গিয়ে অনেক হিন্দুছাত্র খ্রিষ্টানধর্ম গ্রহণ করে, মুসলমান ছাত্রেরও দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। ইয়ং বেঙ্গলদের আচার-আচরণ কলকাতা শহরে হিন্দু-মুসলমান

৭. *সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস,* পৃ. ১৩৩।

৮. *আমার জীবনী,* পৃ. ১৩৩

৯. Obaidullah Al Obaidi--'Muhammedan Education,' *The Bengal Magazine,* February, p. 310

১০. আবদুল লতিফ হান্টার কমিশনকে বলেছিলেন, যে, তিনি লোকের মত নিয়ে জেনেছেন সমাজের এক শ্রেণীর লোক মনে করেন, ইংরাজি শিক্ষা মুসলমান ধর্মমতে অবিশ্বাস জন্মায়। আবার কেউ কেউ ইংরাজি শিক্ষা পদ্ধতিতে মুসলমান ধর্মমতে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় ঐ শিক্ষা নিষ্প্রয়োজন বলে মত দেন। *মালঞ্চ,* ভাদ্র ১৩২৪, পৃ. ৩৮৩-৮৪

উভয় শ্রেণীর মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। ডাক্তার জেমস ওয়াইজ বলেছেন, ঢাকার শিক্ষিত মুসলমানরা তাঁদের সন্তানদের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাই দিতেন ; ইয়ং বেঙ্গলদের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য তাঁরা ইংরাজি শিক্ষার কথা ভাবতেন না।[১১] এর উপরে আছে মুসলমানদের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য। ব্যয়বহুল ইংরাজি স্কুলে সন্তানদের পড়ান দরিদ্র পবিবারগুলির পক্ষে সম্ভব ছিল না। আধুনিক বিদ্যালয়গুলি ছিল শহর অঞ্চলে সীমাবদ্ধ, গ্রামে যাদের সামান্য সামর্থ্য ছিল, তারাও বিদ্যালয়ের অভাবে ছেলেদের লেখাপড়া শিখাতে পারেনি।

এব সঙ্গে যোগ করতে হয় সরকারেব শিক্ষানীতির কথা। ব্রিটিশ শাসনের প্রথম পঞ্চাশ-ষাট বছর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতীয়দের শিক্ষার জন্য কোন স্পষ্ট শিক্ষানীতি গ্রহণ করেননি। প্রথম দিকে বরং উদাসীন ছিলেন এই ভেবে যে, শিক্ষার উপর হস্তক্ষেপ করলে জনগণের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হবে। এদেশে মক্তব-মাদ্রাসা, টোল-চতুষ্পাঠীতে ধর্ম-শিক্ষাবই ব্যবস্থা-ছিল। খ্রিষ্টান মিশনারিরা স্কুল খুললে কোম্পানির লোকেরা তাঁদের উৎসাহ দেননি ববং মিশনারিদের বাধা দিয়েছিলেন এই আশঙ্কায় যে, ধর্মভীরু ভারতবাসী মিশনারিদের ধর্মপ্রচারে ক্ষিপ্ত হবে।[১২] ডিরেক্টরদের একজন পরামর্শ দিয়েছিলেন যে, ভারতীয়দের আধুনিক শিক্ষা দিলে আমেরিকায় ব্রিটেনবাসীর যে দশা হয়েছিল ভারতেও সেরূপ ঘটবে।[১৩] অর্থাৎ স্বাধীন চিন্তার বিকাশ হলে আত্মজাগরণ ও মুক্তি আন্দোলন হবে, যার পরিণতি স্বরূপ ভারতবর্ষ থেকে ইংরাজদের পাততাড়ি গুটাতে হবে। কিন্তু একটি দেশের কোটি কোটি মানুষকে চিরকাল অশিক্ষার অন্ধকারে রাখা যায় না ; তাছাড়া, প্রশাসনিক কাজে স্থানীয় লোকের সহযোগিতা আবশ্যক হয়। ১৮১৩ সালে ২০ বছব মেয়াদি সনদ লাভের সময় কোম্পানি ভাবতীয়দের শিক্ষা দানের জন্য সর্ব প্রথম বার্ষিক ১ লক্ষ টাকা ব্যযের অনুমোদন লাভ করে। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে খ্রিষ্টান মিশনারিদের পাশ্চাত্য জ্ঞানালোক প্রচাব করতে বলা হয়, যার ফলে উইলিয়ম কেরী প্রমুখ ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপনের সুযোগ পেয়েছিলেন।[১৪] ১৮২৩ সালে 'জেনেরাল কমিটি অব পাবলিক ইনসট্রাকসন' বা জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদ গঠিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ঐ ১ লক্ষ টাকার সুষ্ঠু ব্যয় সম্ভব হয়নি। হোরেস হেম্যান উইলসন এর পরিচালক নিযুক্ত হন। তিনি ও বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট বেশির ভাগ টাকা বেসরকারি হিন্দু কলেজের জন্য ব্যয় করেন। ১৮২৫ সালে সংস্কৃত কলেজে ইংরাজি ক্লাশ খোলা হয় এবং হিন্দু কলেজে উচ্চ

১১. Dr James Wise — *Notes on the Races, Castes and Trades of Eastern Bengal*, London, 1883, p. 36

১২. Muhammad Mohar Ali--*The Bengali Reaction to Christian Missionary Activities*, The Mehrub Publication, Chittagong, 1965, p. 2

১৩. Syed Mahmud--*History of English Education in India (1781-1893)*, Aligzrh, 1895, p. 2

১৪. J A. Jamil--*The Muslimm Year Book of India and Who.s Who*, Bombay. 1948.
P. 239

ইংরাজি শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এ দুটি প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্ররা পড়ার সুযোগ পেত না। সুতরাং তৃতীয় দশকের আগে পর্যন্ত শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সরকারের উদ্যোগ একান্ত ভাবে কলকাতা শহরে সীমাবদ্ধ ছিল, সরকারের বরাদ্দকৃত অর্থের ফলভোগী হয়েছে উচ্চ বর্ণেব ও উচ্চ বিত্তের হিন্দু সম্প্রদায়। দেশের অন্যান্য অঞ্চলের অপরাপর জনসাধারণ সে সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

শিক্ষার মাধ্যম কি ও শিক্ষা-পদ্ধতি কিরূপ জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদ সে সম্পর্কে কোন নীতি গ্রহণ করতে পারেনি। গবর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিঙ্ক শিক্ষা সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তাঁর পরামর্শে জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদের ডিবেক্টব লর্ড মেকলে ভারতের শিক্ষা-সংক্রান্ত'মন্তব্যপত্র' প্রকাশ করেন (১৮৩৩)। তার আগে পবিষদে সদস্যদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক হয়। ওবিযেন্টালিস্ট বা প্রাচ্যপন্থী ও এঙ্গলিসিস্ট বা পাশ্চাত্যপন্থী—এ দুই দলেব মধ্যে বিতর্ক হয় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার ব্যাপারে। মেকলে ছিলেন ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জান-বিজ্ঞান শিক্ষাব পক্ষপাতী। তিনি স্বীয় মন্তব্য পত্রে এদেশের উচ্চ শ্রেণীব মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। তাঁর প্রথম যুক্তি হল, এ শ্রেণীকে শিক্ষা দিলে তাঁরা পবে নিজেদেব মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের সুযোগ করে নিবে, এটাই মেকালের 'ফিলট্রেশন থিওবী' বা 'অভিসচেনতত্ত্ব' নামে পবিচিত। দ্বিতীয় যুক্তি হল, ইংবাজি শিক্ষা প্রবর্তিত হলে ব্রিটিশ সরকারের রাজনৈতিক সুবিধাব সৃষ্টি হবে—এতে ভারতীয়দের মধ্যে এমন একটি শ্রেণী তৈরী হবে যারা রক্তে ও বর্ণে ভারতীয় থাকবে, কিন্তু চিন্তাধারা, নীতিজ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তিতে ইংরাজ হয়ে পড়বে। এরা সরকারের অনুগ্রহপ্রার্থী হয়ে আনুগত্য বজায় রাখবে। মেকলের আরও যুক্তি ছিল, সেটি তাঁর মাকে লেখা একটি পত্রে প্রকাশিত হযেছে ; তিনি সেখানে বলেছেন, "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যদি আমরা নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করি তা হলে ত্রিশ বছর পরে বাংলাদেশে কোন পৌত্তলিক থাকবে না।"[১৫] বলা বাহুল্য, খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের সুবিধার কথা তিনি ইঙ্গিত করেছেন। মেকলের প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৮৩৫ সালের ৭ মার্চ সরকার ইংরাজি ভাষা শিক্ষা ও ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কেবলমাত্র ইংরাজি শিক্ষা খাতে সরকারি অর্থ-ব্যয়ের কথা বলা হয়।[১৬] মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ তুলে দেওয়ার কথা জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদ বলেছিলেন, কিন্তু জনগণের আপত্তির কারণে সেগুলির অস্তিত্ব বজায় থাকে। মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তিদান পদ্ধতি অব্যাহত রাখা হল বটে, কিন্তু প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বৃত্তি বণ্টনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। এরূপ প্রতিযোগিতায় ইংরাজি ছাত্রদের সুবিধা হত বেশি।

---

১৫. *History of Freedom Movment*, Vol. 2 p. 252. ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে চার্লস গ্রান্ট প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "প্রকৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করলে হিন্দুদের ধর্মের ভিত ধবসে পড়বে, যন্ত্র বিজ্ঞানের আলোকে ভারতীয়রা উদ্ভাসিত হবে এবং ক্রমশ: পৌত্তলিকতা ও কুসংস্কারের স্থলে খ্রিস্টধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। *British Policy and the Muslims in Bengal*, p. 168

১৬. Ibid, p. 202

১৮৩৬ সালে মহসীন ফাণ্ডের টাকায় হুগলী কলেজ স্থাপিত হয়। সেখানে হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণীর ছাত্র পড়ত। ঐ সালে সরকারি খরচে কলকাতায় মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়। ১৮৩৭ সালে ফারসি ভাষা রহিত করে ইংরাজি ও মাতৃভাষায় আদালত ও অফিসের কাজ চলবে বলে ঘোষণা করা হয়। ১৮৪৩ সালে হিন্দু কলেজে আইন পড়বার ব্যবস্থা হয়। ১৮৪৪ সালে ভারতীয়দের সরকারি চাকুরিতে নিয়োগের জন্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ব্যবস্থা হয়। ১৮৪২ সালে জনশিক্ষা সাধারণ পরিষদের স্থলে 'এডুকেশন কাউন্সিল' বা শিক্ষা পরিষদ নামকরণ করে শিক্ষা ব্যবস্থাকে তার অধীনে আনা হয়। ১৮৪৪ সালে পরিষদ কতকগুলি জেলা স্কুল স্থাপন করেন। ১৮৩৫-৩৮ সাল পর্যন্ত জরিপ চালিয়ে উইলিয়ম এ্যাডম শিক্ষা বিষয়ক তিনটি রিপোর্ট তৈরি করেন। তিনি গ্রামাঞ্চলে মাতৃভাষায় শিক্ষা দেওয়ার উপর জোর দিয়েছিলেন। ১৮৪৪ সালে সরকার প্রতি জেলায় মাতৃভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ৩৬টি জেলায় ১০১টি বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ; এগুলিকে রেভেনিউ বোর্ডের তত্ত্বাবধানে রাখা হয়। যেভাবেই বিচার করি না কেন, সরকারের এসব প্রচেষ্টায় লাভবান হয়েছে শহরের লোকেরাই এবং বিশেষভাবে ইংরাজি শিক্ষানুরাগীরাই। মুসলমানদের মধ্যে এসময় ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন হয়নি। কেবল কলকাতা মাদ্রাসায় প্রাথমিক মানের ইংরাজি শিক্ষা দেওয়া হত, মাদ্রাসার ছেলেরা কলেজের উচ্চ শিক্ষিত ছাত্রদের সাথে প্রতিযোগিতায় টিকতে পারত না।

উনিশ শতকের ত্রিশ-চল্লিশ দশকের দিকে মুসলমানরা এসব কারণেই আধুনিক শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে। বৃহত্তর জনগণ নানারূপ ভাবধারা ও চিন্তাধারার দ্বন্দ্বে আন্দোলিত হয় এবং নেতৃত্বহীন, সংগঠনহীন অবস্থায় সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে বিরাজ করতে থাকে। ষাট দশকে আবদুল লতিফের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত বাঙালি মুসলমানদের চরম বিপর্যয় ও নৈরাশ্যের কাল গেছে। ষাট-সত্তর দশক থেকে যাঁরা শিক্ষা আন্দোলনে এগিয়ে আসেন, তাঁদের এসব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছে। আরবি, ফারসি, উর্দু, ইংরাজি, বাংলা এই পঞ্চ ভাষায়[১৭] শিক্ষা সমস্যা, বাংলা ও ইংরাজি শিক্ষার ব্যাপারে প্রতিবন্ধকতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অভাব, সমাজের দারিদ্র দশা, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার দ্বন্দ্ব, ত্রুটিপূর্ণ পাঠ্য-পুস্তক, নারীশিক্ষার প্রতি বিমুখতা, সরকারের অপরিণত শিক্ষানীতি, সমাজের ধর্মান্ধতা, সাধারণ শ্রেণীর শিক্ষার প্রতি অনাগ্রহ বিষয় সম্বন্ধে তাঁদের প্রথমে ভাবতে হয়েছে, তারপর শিক্ষাসংক্রান্ত কর্মসূচি গ্রহণ করতে হয়েছে। সমাজের দারিদ্রের কথা ভেবে তাঁরা অবৈতনিক শিক্ষা ও বৃত্তিদানের ব্যবস্থা করেছেন, মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করেছেন, বোর্ডিং স্থাপন করে স্কুল কলেজে ছাত্রদের থাকার সমস্যা দূর করেছেন, সরকারের কাছ থেকে সুযোগ সুবিধা আদায়ের জন্য আবেদন-নিবেদন ও স্মারকপত্র প্রদান করেছেন, ধর্মশিক্ষা বজায় রেখে ব্যবহারিক ও

১৭. ১৮৫৪ সালে কলকাতা মাদ্রাসায় ঐ পাঁচটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। ঐ বছর ইঙ্গো-আরবির স্থলে ইঙ্গো-ফারসি বিভাগ খোলা হয়, তৎসঙ্গে বাংলা ও উর্দু শিক্ষারও ব্যবস্থা আছে।

অন্যান্য বিদ্যাদানের ব্যবস্থা করেছেন, ভাষাগত প্রশ্নে সিদ্ধান্তে পৌছেছেন যে, মাতৃভাষা বাংলা ছাড়া গত্যন্তর নেই, ইংরাজি শিক্ষার বিপক্ষে যে ভুল ধারণা ছিল, তা নিরসন করেছেন, ইসলামি সংস্কৃতি অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করে পাঠ্যপুস্তকের অভাব দূর করেছেন, সভাসমিতি থেকে বক্তৃতা দিয়ে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বাড়িয়েছেন, পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে শিক্ষার উপযোগিতার কথা বলে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। এক কথায় তাঁরা বহুমুখী দায়িত্ব নিয়ে শিক্ষা প্রসারে সংগ্রাম করেছেন।

সিপাহী বিদ্রোহকে শাসক ইংরাজ মনে করেছিলেন, রাজ্যহারা মুসলমানদের ক্ষমতালাভের পুনঃপ্রয়াস বলে। ইংরাজদের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ ও আক্রোশ আছে, এটা তাঁরা বুঝতে পারেন। মুসলমানরা সামাজিক ও আর্থিক দুর্গতির জন্য ইংরাজদের দায়ী করতেন। সিপাহী বিদ্রোহে ইংরাজদের অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়, বিদ্রোহ দমন করতে খরচ হয় চার কোটি টাকা। সুতরাং ভারতীয়দের প্রতি তাঁদের মনোভাব পবিবর্তিত হয়। বিশেষ করে, তাঁরা মুসলমানদের অভাব-অভিযোগের প্রতি নজর দেন। শিক্ষার অভাবই মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ, এজন্য কিভাবে শিক্ষা বিস্তার করা যায়, সেদিকে প্রথম মনোনিবেশ করেন। সে সময় মোটামুটি আলোকপ্রাপ্ত, বুদ্ধিদীপ্ত, বিচক্ষণ, কর্মপটু ও উদ্যমী পুরুষ হিসাবে বাংলাদেশ থেকে আবদুল লতিফ ও উত্তর প্রদেশ থেকে সৈয়দ আহমদকে নির্বাচন করা হয়। আবদুল লতিফের অব্যবহিত পরে আমীর আলীর আবির্ভাব হয়। তাঁদের পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকলেও ইংরাজি শিক্ষার প্রচলনে কোন দ্বিমত ছিল না। আবদুল লতিফ ও আমীর আলী ব্যক্তিগতভাবে ও সমিতির মাধ্যমে যৌথভাবে মুসলমানদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা বিস্তারে চেষ্টা করেছেন। আবদুল লতিফ মাদ্রাসাগুলিতে আরবি-ফারসি শিক্ষা অব্যাহত রেখে তার সঙ্গে ইংরাজি বিভাগ খুলে ইংরাজি শিক্ষা দানের চিন্তা করেছেন। 'এ শর্ট এ্যাকাউন্ট অব মাই হাম্বল এফার্টস টু প্রমোট এডুকেশন স্পেশালি এমং দি মহামেডানস' (১৮৮৬) গ্রন্থে আবদুল লতিফ তাঁর শিক্ষা -সংক্রান্ত কর্মসূচির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। কলিকাতা ও হুগলী মাদ্রাসার ভগ্নদশার উন্নতি সাধন করে সেগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করার প্রয়াসের মধ্যে তাঁর বেশির ভাগ উদ্যম ব্যয়িত হয়েছে।

মহসীন ফাণ্ডের টাকায় হুগলী কলেজের ব্যয় নির্বাহ হত। সেখানে মুসলমান ছাত্র অপেক্ষা হিন্দু ছাত্র বেশি অধ্যয়ন করত। আবদুল লতিফ মহসীন ফাণ্ডের টাকা বাঁচিয়ে রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে নতুন মাদ্রাসা স্থাপনের পরামর্শ দিলে সরকার তা কার্যকরী করে (১৮৭৪)। হুগলী, রাজশাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রামে ছাত্রাবাস নির্মিত হয় এবং ছাত্রদের বৃত্তিদানের ব্যবস্থা হয়। মুসলমানের শিক্ষা উন্নতির ব্যাপারে আবদুল লতিফ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে সরকারের কাছে যে সুপারিশ করেন তার ভিত্তিতে সরকার দেশের সব রকম শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মুসলমান ছাত্রদের বেতন দুই তৃতীয়াংশ মুক্ত করেন এবং নয়টি জেলা-স্কুলে ফারসি শিক্ষক নিযুক্ত করেন।[১৮] আবদুল লতিফের চেষ্টায় ১৮৫৩ সালে

---

১৮. *Nawab Bahabur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, p 216

হিন্দু কলেজ প্রেসিডেন্সী কলেজে রূপান্তরিত হয়। এতে মুসলমান ছাত্ররা উচ্চ ইংরোজি শিক্ষার সুযোগ পায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হিসাবে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচি প্রণয়নে (১৮৭৩) এবং 'কেন্দ্রীয় টেক্সট বুক কমিটি'র সদস্য হিসাবে গ্রন্থ নির্বাচনে (১৮৮২) মুসলমান সমাজের স্বার্থরক্ষায় আবদুল লতিফ সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। 'দি স্পেক্টর', 'দি তালিসম্যান', 'রিফ্লেকসন ইন একজাইল' ইত্যাদি রচনায় হজরত মহম্মদ ও ইসলামের বিরুদ্ধে আপত্তিকর বক্তব্য আছে, এরূপ অভিযোগ এনে তিনি পাঠ্যসূচি থেকে সেগুলি বাদ দেওযাব কথা বলেন। এ ধরনের পাঠ্যপুস্তক মুসলমানদের ইংরাজি শিক্ষার পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন।[১৯] ১৮৮২ সালে হান্টার কমিশনের কাছে আবদুল লতিফ অভিজাত ও মধ্যবিত্তের জন্য উর্দু ও সাধারণ শ্রেণীর জন্য বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের পরামর্শ দিয়েছিলেন।[২০] উচ্চ শিক্ষায় দরিদ্র ছাত্রদেব আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য আবদুল লতিফ বিত্তবানদের উৎসাহিত করে কতকগুলি বৃত্তি ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করেছিলেন। ১৮৮৩ সালে লর্ড রিপন কলিকাতা মাদ্রাসার বার্ষিক পারিতোষিক সভায় এলে তাঁর স্মৃতিরক্ষা স্বরূপ চাঁদাদাতার নামের সঙ্গে বৃত্তি ও পুরস্কাবগুলির নাম যথাক্রমে 'বিপন বৃত্তি' ও 'বিপন পুরস্কার' করা হয়।[২১] এছাড়া, 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'কে আবদুল লতিফ মুখ্যত শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও গবেষণার চিন্তার ও চর্চার কাজে লাগিয়েছিলেন। 'এ মিনিট অন হুগলী মাদ্রাসা' (১৮৬১) 'এ পেপার অন মহামেডান এডুকেশন' (১৮৬৮), 'এ পেপার অন প্রেজেন্ট কনডিশন অব দি ইণ্ডিয়ান মহামেডানস এণ্ড দি বেস্ট মীনস ফর ইটস ইম্প্রুভমেন্ট' (১৮৮৩), হানটাব কমিশনকে প্রদত্ত প্রশ্নোত্তর (১৮৮২) প্রভৃতি রচনায় আবদুল লতিফের সমকালীন শিক্ষা বিষয়ে চিন্তা ও চেতনার ছাপ পড়েছে।

সৈয়দ আমীর আলী বিভিন্ন লেখায় ও রিপোর্টে, আলোচনায় ও বক্তৃতায মুসলমান সমাজের শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যার সঙ্গে শিক্ষা বিষয়ক সমস্যারও মোকাবেলা করেছে। ১৮৮২ সালে মার্কুইস অব রিপনকে প্রদত্ত 'স্মারকপত্রে' সৈয়দ আমীর আলী বলেছিলেন যে, ১৮৩৭ সালে ফারসি শিক্ষার উপযোগিতা ফুরিয়ে গেছে, এর পুনঃপ্রবর্তনের প্রচেষ্টা এখন অচল, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ফারসি বা উর্দুতে পরীক্ষা নেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষা দ্বারা জাতির পুনর্জাগরণ সম্ভব বলে তাঁর স্থির বিশ্বাস ছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্য-সংস্কৃতি রপ্ত করার মধ্যে তিনি সম্মান ও মর্যাদার চিহ্ন দেখেছিলেন। এজন্য দেশবাসীকে শাসকের ভাষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য গ্রহণ করার পক্ষে রায় দিয়েছিলনে।[২২] আবদুল লতিফের শিক্ষা সংক্রান্ত চিন্তাধারার সঙ্গে

১৯. Ibid, pp. 218-22.241
২০. Ibid. p. 224
২১. Op. cit. PP. 237-38
২২. K. K Aziz--*Ameer Ali : His Life and Works*, pp. 37-38

আমীর আলীর চিন্তাধারার এখানেই পার্থক্য ছিল, এই কারণে তাঁরা একত্রে মিলতে পারেনি। ১৮৯৯ সালে ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় 'মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্সের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে তিনি মাদ্রাসাগুলি তুলে দিয়ে আলিগড় কলেজের আদর্শে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার পরামর্শ দেন।[২৩] 'এসোসিয়েশনের মাধ্যমে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আয়োজন করে সংস্কৃতির চর্চায় উৎসাহিত করেছেন, ছাত্রবৃত্তির ব্যবস্থা করে গরিব ও মেধাবী ছাত্রদের আর্থিক সাহায্য দানের ব্যবস্থা করেছেন। শাখা এসোসিয়েশনগুলি নিজ নিজ এলাকায় কোথাও ইংরাজি বিদ্যালয়, কোথাও বাংলা বিদ্যালয়, কোথাও মাদ্রাসা স্থাপন করে শিক্ষা বিস্তারের কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।[২৪]

আবুল লতিফ ও আমীব আলী ছাড়া ওবায়দুল্লাহ ওবায়দী, সৈয়দ শামসুল হোদা, স্যার আবদুর রহিম, আবদুল করিম বিএ, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, আবদুল আজিজ বিএ, হেমায়েতউদ্দীন আহমদ বিএল প্রমুখ উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বসমাজে শিক্ষা বিস্তারে অবদান রেখে গেছেন। তাঁবা পুস্তক-প্রবন্ধ রচনা করে, সভাসমিতি গঠন করে এবং বিদ্যালয় স্থাপন করে শিক্ষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। 'কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা', 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী', 'চট্টগ্রাম মোসলমান শিক্ষা সভা', 'অঞ্জমনে হেমায়েত ইসলাম' (বরিশালে) 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি', প্রভৃতি সভাসমিতি শিক্ষা-প্রচার উদ্দেশ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়। এগুলির মধ্যে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির উদ্যোগ ও কর্মসূচি ব্যাপক ছিল। বিভিন্ন সমিতির বার্ষিক সম্মিলনের আয়োজন করে উদ্যোক্তাগণ জনসাধারণের মনে আধুনিক শিক্ষা সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। ওবায়দুল্লাহ ঢাকা মাদ্রাসার প্রথম সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন। আবদুল আজিজ, হেমায়েতউদ্দীন তাঁর ভাবশিষ্য ছিলেন। তিনি 'বেঙ্গল ম্যাগাজিনে' (ফেব্রুয়ারি ১৮৭৩) 'মহামেডান এডুকেশন' শীর্ষক একটি স্মারগর্ভ প্রবন্ধ লিখেন।

কলিকাতা হাই-কোর্টের উকিল সৈয়দ শামসুল হোদা সমাজ-উন্নতির জন্য যেসব কর্মসূচি নিয়েছিলেন সেসবের মধ্যে শিক্ষা ছিল প্রধান। তিনি কিছুকাল কলিকাতা মাদ্রাসায় আরবি-ফারসির সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে শিক্ষকতা করেছিলেন। ১৯০২ সালে প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির সভাপতি হন। তিনি বাংলা মাসিক 'সুধাকর' ও ইংরাজি সাপ্তাহিক 'মহামেডান অবজারভার' পত্রিকা প্রকাশে আর্থিক সাহায্য দান করেন। সুতরাং আইন ব্যবসায় করলেও শিক্ষা-সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। কলকাতার কারমাইকেল হোস্টেল প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি ছিলেন মূলশক্তি। মুসলমানদের জন্য একটি সরকারি কলেজ স্থাপনের আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন, এরই ফল স্বরূপ ওয়েলেসলি স্ট্রিটে নয় লক্ষ টাকা ব্যয়ে ইসলামিয়া কলেজের জন্য জমি ক্রয় করা হয়। কলিকাতা মাদ্রাসায় অভিজাত শ্রেণীর ছেলেরা পড়ত। সাধারণ শ্রেণীর ছেলেদের

২৩. Abstract of the Proceedings of an Extraordinary Meeting of this Committee of the Mahomedan Literary Society of Calcutta,...9June, 1900

২৪. বিস্তৃত আলোচনার জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভাসমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

কাছে শিক্ষার সুযোগ পৌঁছে দেওয়াব জন্য তিনি 'কড়েয়া মুসলিম বয়েজ স্কুল' প্রতিষ্ঠায় অংশ গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ক্ষেত্রেও তাঁর দান আছে ; ৬ জন প্রতিষ্ঠাতা-সদস্যের মধ্যে তিনি ছিলেন একজন। শিক্ষা বিভাগে চাকুরির ক্ষেত্রে 'এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন ফর মুসলিম এডুকেশন' এবং প্রতি বিভাগে একজন করে 'এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনস্পেক্টর ফর মুসলিম এডুকেশন' পদ সৃষ্টি তাঁর উদ্যোগের ফল। পদগুলির সৃষ্টিতে মুসলমান শিক্ষা বিস্তারে সুদূর প্রসারী ফল ফলে। প্রথম মুসলমান সহকারি স্কুল-ইনস্পেক্টর আবদুল করিম স্বপেশায় নিযুক্ত থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত বিবিধ সমস্যার মুখোমুখী হয়েছেন, তিনি সেগুলি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং সমাধানের চেষ্টা করেছেন। 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থখানি শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতা ও চিন্তার ফল। আবদুল লতিফের মত তিনি মাদ্রাসা শিক্ষা অক্ষুণ্ন রেখে শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন কামনা করেছেন। তিনি সরকারের কাছে বিভিন্ন সময়ে মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলে বিদ্যালয় স্থাপন, মুসলমান শিক্ষক ও স্কুল পরিদর্শক নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেছেন।

কোন কোন বিদ্যোৎসাহী ও শিক্ষানুরাগী জমিদার ও জোতদার নিজ ব্যয়ে বিদ্যালয়, মাদ্রাসা ও ছাত্রাবাস নির্মাণ করে শিক্ষা প্রসারে সহযোগিতা করেছেন। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী 'ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে বাংলা বিদ্যালয়গুলোতে মুসলমান ছাত্রের বাংলা শিক্ষার অসুবিধার কথা সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। বাংলা ভাষায় শব্দে এবং সাহিত্যে হিন্দুয়ানি ভাবের প্রাধান্য থাকায় তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির সমালোচনা করেন।

মুসলমান শিক্ষা সম্পর্কে শিক্ষিত সমাজ সত্তর-আশি দশকে যে পটভূমি রচনা করেছিলেন, নব্বই দশকে মুসলমান লেখকেরা বাংলা পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকের মাধ্যমে প্রচার চালিয়ে সেটিকে জোরদার করেন এবং ক্রমশ ব্যাপক আন্দোলনের রূপ দেন। আধুনিক শিক্ষার সপক্ষে জনমত গড়ে তুলতে পত্রিকাগুলি বিশেষ সহায়তা করেছে। লেখক -সম্পাদকগণ বিচিত্র সংবাদ পরিবেশন করে এবং বিভিন্ন লেখার মাধ্যমে আলোচনা ও বিতর্ক উত্থাপন করে একাধারে সমাজের দোষত্রুটির কথা তুলে ধরেছেন, অন্যধারে কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন-নিবেদন করে দাবি-দাওয়া পূরণের চেষ্টা করেছেন। তাঁরা পাঠ্যপুস্তক রচনা করে মুসলমান সমাজের ঐ বিষয়ে চরম শূন্যতা দূর করেছেন। মীর মশাররফ হোসেন লিখেছেন 'মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা' (১ম ভাগ ১৯০৩, ২য় ভাগ ১৯০৮) গ্রন্থ। তাঁর 'মৌলুদ শরীফ' (১৯০৩) ধর্মীয় শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থ। নওশের আলী খান ইউসফজয়ী শিক্ষা বিষয়ক একাধিক গ্রন্থ লিখেছেন, যথা 'দলিল রেজিস্ট্রারী শিক্ষা' (১৮৯৭), 'উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি' (১৯০২), এবং 'নোটস অন মহামেডান এডুকেশন'। আবদুল জব্বার 'নামাজ শিক্ষা' (১৯০৪) গ্রন্থে ধর্মশিক্ষার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন রেয়াজুদ্দীন আহমদ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'বোধোদয়' গ্রন্থের অর্থপুস্তক 'বোধোদয়তত্ত্ব' (১৮৭৯) রচনা করেন শিশুদের কাছে ঐ গ্রন্থ সহজবোধ্য করে তোলার জন্য। তাঁর 'পদ্য প্রসূন' (১৮৮০) ও 'তোহফাতুল মোসলেমিন' (১৮৮৫) শিশুপাঠ্য বই ছিল। মোজাম্মেল

হক ও কাজী ইমদাদুল হক স্বসমাজের শিক্ষা বিস্তারে অত্যন্ত আগ্রহী ও উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁরা উভয়ে ছাত্রপাঠ্য অনেক বই লেখেন। 'সাহিত্য শিক্ষা', 'পদ্যশিক্ষা', 'সরল বাংলা শিক্ষা', 'শিশুরঞ্জন বর্ণশিক্ষা', 'পত্রদলিল লিখনশিক্ষা' প্রভৃতি বই মোজাম্মেল হক রচনা করেন। তাঁর কোন কোন গ্রন্থ তৎকালীন স্কুল বুক কমিটির অনুমোদন লাভ করে। তাঁর 'পদ্যশিক্ষা' ডিরেক্টর সাহেব বাহাদুরের প্রচারিত পাঠ্যলিস্টে ৪র্থ শ্রেণীর নীতিশিক্ষার জন্য নির্দিষ্ট' ছিল।[২৫] সহকারী স্কুল-ইনস্পেক্টর ইমদাদুল হকের শিক্ষানুরাগিতা খুব স্বাভাবিক ভাবে প্রখর ছিল। নিজ পেশায় নিযুক্ত থেকে তিনি মুসলমানের শিক্ষা-উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেছেন, উপরন্তু বিবিধ প্রবন্ধ রচনা করে তাঁর কর্ম প্রয়াসকে বাস্তবরূপ দিয়েছেন। তিনি 'নবি কাহিনী' (১৯১৭) পুস্তকখানি বালকদের পাঠোপযোগী করে রচনা করেন, এটি স্কুল টেক্সট বুক বোর্ডের অনুমোদন পেয়ে পাঠ্য তালিকাভুক্ত হয়।

এদিকে মুনশী মেহেরুল্লা, শেখ জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, ইসমাইল হোসেন শিরাজী প্রমুখ সুবক্তা বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে ধর্মীয় ও যুগোপযোগী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা প্রচার করেন। জনগণের সাথে থেকে জনগণের প্রকৃত অসুবিধা উপলব্ধি করে সেগুলি নিরসনের পথ ও পদ্ধতির কথা বলেছেন তাঁরা। তাঁরা ধর্মশিক্ষার সঙ্গে অর্থকরী কৃষি, শিল্প, কারিগরি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথাও প্রচার করেছেন। তাঁরা প্রায় সকলেই রাজভাষা ইংরাজি শিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব ছিল না, তবে কেউ কেউ প্রচলিত শব্দমালা এবং ভাবধারার পরিবর্তন কামনা করেছেন। দেশের নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি, লেখক, সাংবাদিক, বাগ্মী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের প্রচেষ্টায় সেযুগে শিক্ষা-সংস্কারের যে আন্দোলন হয়েছিল, এখন তার প্রধান ধারাগুলি নিয়ে আলোচনা করা যায়।

আধুনিক শিক্ষা

আধুনিক শিক্ষার ব্যাপারে শিক্ষার মাধ্যম, শিক্ষণীয় বিষয় ও শিক্ষা পদ্ধতি এই ত্রিবিধ সমস্যা জড়িত ছিল, পূর্বে সে বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা, নিম্ন শ্রেণীর জন্য আর এক ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা, ধর্ম ও ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা, মাদ্রাসা শিক্ষার সহিত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার সম্পর্ক স্থাপন ইত্যাদি বিষয়গুলি শিক্ষা সমস্যাকে আরও জটিল করে তোলে। এক কথায়, মুসলমান শিক্ষা সেযুগে বহুমুখী সমস্যার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এসব প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা, বিতর্ক হয়েছে, তদন্ত হয়েছে, তদন্ত রিপোর্ট অনুযায়ী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। অর্থাৎ এসব কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়েই শিক্ষা-সংক্রান্ত চিন্তা-ভাবনার উদয় হয়। পুরাতন শিক্ষা প্রণালী বিদায় নেয়, আধুনিক শিক্ষা প্রণালীর আবির্ভাব ঘটে। সমাজের সমস্যা সেযুগের সাহিত্যিকদের চিন্তাকে আলোড়িত করেছিল। পঞ্চভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করে মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ লিখেছেন, "বঙ্গীয় মুসলমানদিগের

২৫. মিহির ও সুধাকর, ১৩০২ পৃ. ৭০

শিক্ষার পথে দারুণ অন্তরায়। হিন্দুদিগের যে স্থানে ২টা বা ৩টা ভাষা শিক্ষা করিতে হয়, বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে তথায় ৫টা ভাষা আয়ত্ত না করিয়া উপায় নাই। প্রথমত বাঙ্গালা ইহাদের মাতৃভাষা হইলেও বিশুদ্ধ অর্থাৎ খাঁটি বাঙ্গালা নহে। উহা আরবী মিশ্রিত এক প্রকার মুসলমানী বাঙ্গালা। সুতরাং মুসলমানদিগকে বাঙ্গালা ভাষা দস্তুর মতন শিক্ষা করা চাই। তারপর আরবী বেশি না হউক কোরান শরীফ বিশুদ্ধ ভাবে পাঠ করিবার উপযোগী হওয়া চাই। জাতীয় আচার ব্যবহার উন্নত করণ জন্য, 'আদব-কায়দা' শিক্ষার জন্য, ভাল জাতীয় কাব্য ও ইতিহাসের রসাস্বাদন জন্য, অতি সুমধুর ও স্মৃতিসুখকর পারসী ভাষা শিক্ষা করিতেই হইবে। তৎপর উর্দু ভাষা, ইহা ভারতীয় মুসলমানদিগের জাতীয় ভাষা বলিয়া পরিবর্তিত হইতে পারে। প্রয়োজনীয় ধর্মগ্রন্থাদি সমস্তই প্রায় এই ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে বা হইতেছে। এই ভাষা শিক্ষা না করিলে নাগরিক সম্ভ্রান্ত মুসলমানদিগের সহিত বাক্যালাপ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। সুতরাং উর্দু ভালরূপে শিক্ষা করা দরকার। অবশেষে রাজভাষা ইংরাজী, ...এই পাঁচটি ভাষা আয়ত্ত করিতে পারিলে, বঙ্গীয় মুসলমান প্রকৃত প্রস্তাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।"[২৬] ভাষা শিখতেই মুসলমান ছাত্রদের শিক্ষার বয়স অতিক্রান্ত হয়, এর উপর ঐ ভাষার বিদ্যা আয়ত্ত করা ছিল এক দুঃসাধ্য ও প্রাণান্তকর ব্যাপার। প্রকৃতপক্ষে এতে কোনো বিদ্যাই ভালভাবে অর্জিত হয় না। বয়সের আধিক্যহেতু উচ্চ শিক্ষা ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখা দিত। রেয়াজুদ্দীনের উক্তিতে অংশত আবদুল লতিফের চিন্তার প্রতিফলন আছে।

সৈয়দ আবদুল আগফর 'তরফের ইতিহাস' (১২৯৪) গ্রন্থে বলেছেন, "ইংরেজী ভাষার প্রতি মুসলমানদের পূর্ব হইতেই ভয়ানক ঘৃণা ও বিদ্বেষ। ইংরাজী শিখিলেই নরকগামী হইতে হইবে এবং ইংরাজী পড়াইয়া খৃষ্টীয় ধর্মে দীক্ষিত করা ইংরাজ গবর্ণমেন্টের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া তাঁহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস। বহু কালের সংস্রবে এবং দেশের প্রচলিত ভাষার গতিকে বাঙ্গালার প্রতি বিদ্বেষের লাঘব হওয়াতে অনেকেই বাঙ্গালা শিখিতেছেন।"[২৭] তিনি বলেছেন যে, তরফের লস্করপুর নিবাসী সৈয়দ মফজ্জল হাসন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র সৈয়দ মজম্মিল হাসনকে ইংরাজী ভাষা শিক্ষা দিলে সমাজের কাছ থেকে তিনি 'কিয়ৎকাল ভয়ানক গঞ্জনা সহ্য' করেছিলেন।[২৮] পায়রাবন্দের জমিদার জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের জ্যেষ্ঠ কন্যা করিমুন্নেসা খানমের বাংলা শিক্ষার ব্যবস্থা করতে গিয়েও সমাজে নিন্দার ভাগী হয়েছিলেন।[২৯] ইংরাজী বিরোধী লোকদের চিহ্নিত করে মহম্মদ কে চাঁদ লিখেছেন, "মৌলভীগণ প্রায় বলিয়া থাকেন যে, বিজ্ঞান দর্শন 'কুফরে কামাল' ও ইংরাজী শিক্ষা 'এলমে বেদিন'। ইহা অল্প শিক্ষিত আলেম, ফাজেল, মৌলভী, ওয়ায়েজ প্রভৃতি উজ্জ্বল উপাধিধারী কাটমোল্লাগণের স্বরচিত বচন মাত্র। ইহার

২৬. *ইসলাম-প্রচারক*, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮।
২৭. সৈয়দ আবদুল আগফর—*তরফের ইতিহাস*, পৃ. ১১
২৮. ঐ, পৃ. ১২
২৯. *রোকেয়া-রচনাবলী*, পৃ. ২৮৫

ভিত্তি ইসলাম ধর্মে, কোরানে বা হাদীসে কোন স্থানেই নাই। তাহারা জীবিকা নির্বাহের জন্য অজ্ঞ মুসলমানদিগকে বিবিধ অলীক ভিত্তিশূন্য গল্পকে হাদীস বলিয়া শুনাইয়া তাহাদিগকে মোহিত করে এবং এইরূপে তাহাদিগকে জ্ঞানান্ধ করিয়া রাখিয়াছে।' '৩০

সমাজের এই অন্ধত্বের ভাব শেষ পর্যন্ত টিকেনি, মানুষের মনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসে; প্রথম দিকে দ্বিধা-সংকোচ নিয়ে সমাজ কিভাবে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করেছে, সে-বিষয়ে আলোকপাত করে মোহাম্মদ আফতাবউদ্দীন আহমদ লিখেছেন, "ইংরাজী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনেকে এখন একটু একটু বুঝিতেছেন, কিন্তু সাধারণ বিশ্বাস, ইহা চাকুরীর সহায় মাত্র, কিন্তু ধর্মের প্রবল শত্রু। তাই ধন লাভের আশায় কেহ কেহ ইংরাজী শিক্ষার প্রতি আকৃষ্ট। আমার বিশ্বাস, ইংরাজী শিক্ষার সহিত আরব্য-পারস্য ভাষায় যতই মুসলমানগণ শিক্ষিত হইতে থাকিবেন, ততই তাঁহারা হৃদয়রস সংগ্রহ করিয়া জাতীয় ভাবে সুদৃঢ় হইতে পারিবেন।"৩১ কাজী ইমদাদুল হক দ্বিধা-সংকোচ কাটিয়ে উঠে সমাজকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন, "শিক্ষার বিস্তার করিতে হইলে এক্ষণে ইরাজী শিক্ষার বহুল প্রচলন আবশ্যক। আজকাল ইংরাজী শিক্ষা না করিলে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। যাঁহারা কাফেরী ভাষা বলিয়া ইংরাজী শিক্ষার এবং এলমে বেদীন বলিয়া বিজ্ঞানের বিরোধী, তাঁহারা মূর্খ, তাঁহারা দয়াব পাত্র। আমরা ইংরাজী শিক্ষা করিব যে শুধু চাকুরী করিবার জন্য তাহা নহে, জ্ঞান প্রচারের জন্য, বিজ্ঞানে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য। যাঁহারা বিদেশীয় ভাষা সম্পূর্ণরূপে পরিহার করিয়া আরবী ভাষা দ্বারা জ্ঞান অর্জন এবং জ্ঞান প্রচার করিবার পক্ষপাতী, তাঁহাদিগকে আরব দেশে গমন করিতে অনুরোধ করি। ইসলাম কখনো একমাত্র আরবী ভাষা মধ্যে আবদ্ধ নহে, বিজাতীয় ভাষা শিক্ষা করিলে ইসলামের গৌরব বৃদ্ধি ছাড়া কখনো খর্ব হইবে না।"৩২ ইমদাদুল হক গ্রাজুয়েট ছিলেন, তিনি আমীর আলীর চিন্তাধারা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি আরবি-ফারসী প্রেমিকদের দেশ ছাড়তে বলেছেন, সেযুগে এরূপ বলা সহজসাধ্য ছিল না। শেখ ফজলল করিম প্রায় অনুরূপ প্রতিধ্বনি তুলে বলেছেন, "এ যুগ বেশীর ভাগ ইংরাজীর। ইংরাজী না শিখিলে আর মাথা তুলিবার ক্ষমতা নাই। বর্তমান শিক্ষা প্রণালী ধর্মের হিসাবে আমাদের কাজে আসিতেছে না। লুপ্ত জাতীয়তা জাগাইতে পারিতেছে না। জাগাইতেছে লাম্পট্য, চৌর্য, বিলাসিতা ও ভান। সুতরাং শিক্ষা প্রণালীর সংস্কার করিয়া নতুন ধরণের একটা তার্কিক ব্যূহ গঠনের প্রয়োজন হইয়াছে।"৩৩

মাদ্রাসা শিক্ষার ত্রুটির উল্লেখ করে 'প্রচারক' সম্পাদকময়েজউদ্দীন আহমদ বলেন, "যতদিন আরবী এবং ফারসী ভাষার ব্যাকরণ ও অভিধান বঙ্গভাষায় লেখা না হইবে,

৩০. মোহাম্মদ কে চাঁদ —' মুসলমানদিগের বিদ্যা শিক্ষায় অবনতির কারণ', *ইসলাম-প্রচারক*, ফাল্গুন, ১৩১৩

৩১. এম. আফতাবউদ্দীন আহমদ—'বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা, *ইসলাম-প্রচারক* অগ্রহায়ণ ১৩১১।

৩২. কাজী ইমদাদুল হক—'ধর্ম এবং শিক্ষা, *নবনূর*, ফাল্গুন ১৩১

৩৩. শেখ ফজলল করিম—'ধর্মহীনতা ও সমাজ সংস্কার', *কোহিনুর*, আষাঢ় ১৩২১

ততদিন চিন্তায় কোন ফল হইবে না। যেদিন মাদ্রাসার শিক্ষকেরা আরবী এবং পারসী ভাষা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অর্থ করিয়া ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিবেন, সেই দিন বঙ্গীয় মোসলমানের শিক্ষার পথ পরিষ্কার হইবে। যেদিন মাদ্রাসাসমূহ আধুনিক পদার্থবিদ্যা, ভূগোল এবং ইতিহাস নিয়মিত শিক্ষা দিবেন সেই দিন আমরা দ্রুতগতিতে উন্নতির দিক অগ্রসর হইব।"[৩৪] বাংলাদেশের মাদ্রাসাগুলিতে বাংলাভাষা ও সাহিত্য পড়াবার ব্যবস্থা ছিল বটে,[৩৫] কিন্তু বাংলা ছাড়া অন্যান্য বিষয় উর্দু মাধ্যমে পড়ান হত, পরীক্ষার খাতায় উর্দুতে লিখতে হত। ইংরাজী-বাংলা শিক্ষার সঙ্গে গণিত, ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষার ব্যবস্থা করে মাদ্রাসা শিক্ষা-সংস্কারের জন্য আবদুল করিম ও আবু নসর ওহীদ যত্নবান হন। আবু নসর ওহীদ মধ্যপ্রাচ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করে ধর্মের সঙ্গে আধুনিক বিদ্যার সামঞ্জস্য রেখে 'নিউ মাদ্রাসা স্কীম' শিক্ষা পদ্ধতি চালু করেছিলেন (১৯০৮)। তাঁর এই প্রচেষ্টার মধ্যে সরকারের সহযোগিতা ছিল। আধুনিক শিক্ষানুরাগীরা এভাবেই প্রতিক্রিয়াশীলদের মোহ ও সংস্কারের বিরুদ্ধে কণ্ঠ তুলেছিলেন। যেহেতু তাঁদের চিন্তাধারা ছিল যুক্তিশীল, কর্মপন্থা ছিল বাস্তব প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে সম্পর্কিত, সেহেতু তাঁরা সে মোহ ও সংস্কারের আবরণ ভেদ করতে সক্ষম হয়েছেন। শতাব্দীর শেষে সমাজের মতিগতি ফিরতে শুরু করে এবং নব যুগের পদধ্বনি শোনা যায়।

ছাত্রাবাস আন্দোলন

জাতীয় চেতনার উন্মেষের কালে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাঙালী মুসলমানদের পশ্চাদপদতার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেল, অত্যধিক দারিদ্র্যবশত তাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। প্রথম দিকে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি শহর-বন্দরে কেন্দ্রীভূত থাকায় যে-কোনো শিক্ষা গ্রহণ করতে গ্রামের মানুষকে শহরে যেতে হতো। মুসলমান সমাজে 'জায়গীর প্রথা' প্রচলিত ছিল। অবস্থাপন্ন লোকেরা নিজগৃহে ছাত্র রেখে তাদের ভারণপোষণ চালাতেন। কলিকাতা মাদ্রাসার ইতিহাসে দেখা যায়, মাদ্রাসার মফস্বলের ছাত্ররা ছোটখাট ব্যবসায়ী, উকিল-মোক্তার, এমন কি বাবুর্চি-খানসামার গৃহে থেকে পড়াশুনা করত।[৩৬]

ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী আত্মজীবনী 'দস্তানে ইব্রাত্‌বারে' (১৮৮০) কলিকাতার জায়গীর প্রথার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে, "কলিকাতায় দু'প্রকার জায়গীর—ছাত্রদেরকে কোনো শর্ত ছাড়াই থাকার জায়গা ও খাওয়া-দাওয়া পরিবেশন করা হয়। দ্বিতীয় রকমের জায়গীর—বাড়ীওয়ালার দিক থেকে কাজের শর্ত থাকে, যেমন ছেলেপুলে পড়ানো, হিসাবপত্র লেখা ইত্যাদির দায়িত্ব তালিবে ইলমের উপর ন্যস্ত করা হয়। এ ধরনের

৩৪. *প্রচারক*, কার্তিক ১৩০৭

৩৫. ১৮৮৪ সালে জনশিক্ষা ডিরেক্টর আলফ্রেড ক্রফটের নির্দেশে মাদ্রাসায় বাংলা ও অংক শিক্ষা ব্যধ্যতামূলক করা হয়।
Supplementary Note on Mahomedan Education (Director of Public Instruction), 1883-84, Para 12.

৩৬. *Muslim Community in Bengal*, p. 64.

জায়গীরকে কোনো কোনো স্থলে খাওয়া-দাওয়ার খরচ বহন ছাড়া মাসিক কিছু নগদ অর্থও দেওয়া হয়। আমাদের আর্থিক সংকটের প্রতি লক্ষ করে আমার ভাই ঠনঠনিয়া মহল্লায় মির্জা ফতে আলীর বাড়ীতে আমার জন্য শর্তযুক্ত জায়গীর ঠিক করলেন। বড় বাজারে ফতেহ আলীর আতরের দোকান ছিল। সেই দোকানের হিসাবপত্র লেখার দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়।"[৩৭] তিনি পরে মুরগী হাট্টা মহল্লায় শেখ আসাদুল্লাহর গৃহে ছেলে পড়ানোর শর্তে জায়গীর থাকতেন। তাঁর মেজ ভাই মোবারক আলী বোংগা মহল্লায় মুহম্মদ আলী খান নামক একজন আড়তদারের গৃহে জায়গীর থেকে আলিয়া মাদ্রাসায় লেখাপড়া করতেন। বড় ভাই মুহম্মদ আলী তালতলা মহল্লায় থেকে ঐ মাদ্রাসায় পড়তেন।[৩৮] মীর মশাররফ হোসেন 'আমার জীবনী'তে (১৯০৮) বলেছেন যে তিনি কলিকাতা আদালতের আমিন নাদির হোসেনের গৃহে থেকে পড়াশুনা করার জন্য সেখানে গিয়েছিলেন। নাদির হোসেনের কন্যা আজিজন্নেসার সাথে তাঁর প্রথম বিবাহ হয়।[৩৯]

শহরে মুসলমানের সংখ্যা কম, তদুপরি নাগরিক জীবনে ক্রমবর্ধমান আর্থিক চাপ সৃষ্টি হলে এরূপ ছাত্রপোষণ প্রথা উঠে যায়। সুতরাং ছাত্রদের থাকার জন্য ছাত্রাবাসের সমস্যা দেখা দেয়। আবদুল লতিফ হুগলী মাদ্রাসার তদন্ত রিপোর্টে এ সমস্যার কথা তুলেছিলেন। হুগলী শহরে মুসলমান বাশিন্দা খুবই কম। মুসলমান ছেলেরা যাতে মহসীন ফাণ্ডের সুবিধা পায়, সেজন্য আবদুল লতিফ হুগলী মাদ্রাসার সহিত ইংরাজি-ফারসি বিভাগ খোলা এবং মুসলিম ছাত্রাবাস নির্মাণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তাঁর পরামর্শ গৃহীত হয় এবং মাদ্রাসা সংলগ্ন ছাত্রাবাস নির্মিত হয়।[৪০] কলিকাতা মাদ্রাসা সংলগ্ন 'এলিয়ট হোস্টেল' নির্মাণেও আবদুল লতিফের দান ছিল। হোস্টেলে রক্ষিত 'স্মৃতি-ফলকে' সেকথার উল্লেখ আছে (১৮৯৮)।[৪১] ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রামের আবাসিক মাদ্রাসায় প্রথম থেকেই ছাত্রাবাস ছিল।

বরিশল সরকারি স্কুলের ছাত্রের জন্য 'বেল ইসলামিয়া বোর্ডিং' (১৮৯৫) নির্মিত হয়।[৪২] স্থানীয় সরকারি উকিল হেমায়েতউদ্দীন আহমদ এটি নির্মাণে নেতৃত্ব দেন। ৬০ জন ছাত্রের বাসোপযোগী এই বোর্ডিং-এর সঙ্গে একটি 'লাইব্রেরী' ও 'রিডিং রুম' ছিল।

৩৭. পূর্বোক্ত, *বাংলা একাডেমী পত্রিকা*, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৮৮, পৃ. ৭৮-৭৯
৩৮. ঐ পৃ. ৭৮-৮১
৩৯. *আমার জীবনী*, পৃ. ২০৮, ২৬০
৪০. *A Minute on Hooghly Madrasnah*, 1861.
৪১. ১৮৯৬ সালে সরকারের খরচে দ্বিতল বিশিষ্ট একটি হোস্টেল নির্মিত হয়। কিন্তু স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহ পর্যাপ্ত না হওয়ায় ১৮৯৮ সালের আগে এটি উদ্বোধন করা হয়নি। ১৯০২ সালে তিন তলা করা হয়। প্রায় ১৫০ জন ছাত্র এখানে থাকার সুযোগ পায়।
Muslim Community in Bengal, p. 70 : *The Moslem Chronicle*, 20 August 1898.
৪২. বিটসন বেল ঐ ছাত্রাবাস নির্মাণের একজন উৎসাহদাতা ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি বাংলা সরকারের ল্যান্ড রিকুইজিশন এন্ড এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর ছিলেন। *ইসলাম-প্রচারক*, আষাঢ় ১৩১০

শায়েস্তাবাদের জমিদার সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন ৫০০ টাকা চাঁদা দিয়েছিলেন। সরকার ঘোষিত 'সেলফ-হেলপ' বা স্বাবলম্বনের নীতিতে বিদ্যালয় বা ছাত্রাবাস নির্মাণের মোট টাকার বেশির ভাগ অংশ স্থানীয় লোকের চাঁদায় সংগৃহীত হলে সরকার কিছু অনুদান প্রদান করত। মুসলমান সমাজে বিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রবণতা ঐ সময় থেকে দেখা যায়।[৪৩]

চট্টগ্রামের সরকারি স্কুল-ইনস্পেক্টর আবদুল আজিজের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রাম শহরে 'ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল' নির্মিত হয় (১৮৯৯)। স্থানীয় জমিদার চৌধুরী সোলতান আহমদ খান ২০০০০ টাকা মূল্যের সম্পত্তি দান করেছিলেন। হোস্টেলে ৪০ জন ছাত্রের স্থান সংকুলান হয়।[৪৪]

রাজশাহীতে 'ফুলার হোস্টেল' (১৮৯৯) নির্মাণে নেতৃত্ব দেন সাব-রেজিস্ট্রার মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। 'ইসলাম-প্রচারকে' (ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮) লেখা হয়, ইউসুফ আলী নওগাঁয় অনুরূপ আর একটি মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণে সচেষ্ট আছেন। মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ও তাঁর সহযোগীদের উদ্যোগে কুষ্টিয়ায় ছাত্রাবাস নির্মিত হয়, তাঁরা ফরিদপুরের রাজবাড়িতে অপর একটি ছাত্রবাস নির্মাণের চেষ্টায় রত আছেন। ঢাকাতেও ফুলারের নামে ছাত্রাবাস নির্মিত হয়। ঢাকার নবাব আহসানুল্লাহ গৃহ নির্মাণের ভূমিদান করেন।[৪৫]

কুমিল্লা শহরে 'মোসলেম বোর্ডিং' নির্মাণের জন্য বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতির দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভায় চাঁদা সংগ্রহ করা হয়।[৪৬] মালদহ মহামেডান এসোসিয়েশন এক সভায় শহরে একটি ছাত্রাবাস নির্মাণের প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৪৭] কাটোয়ায় 'মোসলেম বোর্ডিং হাউস' তৈরির জন্য স্থানীয় আয়মাদার আবদুল হালিম চাঁদা সংগ্রহ করেন।[৪৮] ছোটলাট স্যার আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জির (১৮৯৫-৯৮) পাবনা পরিদর্শন উপলক্ষে স্থানীয় মুসলমানগণ তাঁকে অভিনন্দন জানাবার প্রস্তুতি সভায় মিলিত হয়ে পাবনা জেলা স্কুলের মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য চাঁদা সংগ্রহের প্রস্তাব নেয় : স্থানীয় জমিদার চৌধুরী ফয়েজউদ্দীন ২০০০ টাকা এবং রফিকুন্নেসা ও ফকরুন্নেসা চৌধুরাণীদ্বয় ২০০০ টাকা দান করেন।[৪৯] স্যার জন উডবার্ন ময়মনসিংহ পরিদর্শনে গেলে স্থানীয় লোকে 'মোসলেম বোর্ডিং হাউস' স্থাপনের জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন করেছিলেন, কিন্তু স্থানীয় চাঁদা সংগৃহীত না হওয়ায় ছোটলাট তাঁদের প্রার্থনা নাচক করে দেন।[৫০]

৪৩. Quinquennial Review of Education in India, 1892-97, p 346 ; *The Moslem Chronicle,* 1 October 1898, p. 998
৪৪. *ইসলাম-প্রচারক,* শ্রাবণ-ভাদ্র ১৩১০
৪৫. *The Moslem Chronicle*, 1 October 1898, p. 998.
৪৬. *কোহিনুর,* বৈশাখ ১৩১২, পৃ. ৩২
৪৭. *The Moslem Chronicle*, 11 July 1898, p. 310.
৪৮. *Ibid.*,12 November, 1898, p. 1079.
৪৯. *Ibid.*, 26 December. 1898, p. 581
৫০. *Ibid* , 1 October, 1891, p. 991.

সমগ্র দেশের চাহিদার তুলনায় এ প্রচেষ্টা নগণ্য, কিন্তু দেশের মানুষ নিজেদের অভাব বুঝতে পেরেছে এবং সে অভাব দূর করার প্রয়োজন আছে—এসব ক্ষুদ্র প্রয়াসের মধ্যে তার আভাস পাওয়া যায়। ছাত্রাবাস স্থাপনের এসব প্রয়াসে আনন্দ প্রকাশ করে রেয়াজুদ্দীন আহমদ একটি প্রবন্ধে বলেছেন, "বঙ্গদেশে আজকাল বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস স্থাপন সম্বন্ধে বেশ একটু আন্দোলন হইয়াছে। কয়েক বৎসর যাবৎ উন্নতহৃদয় উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানের প্রাণপণ চেষ্টায় কয়েকটি মুসলমান ছাত্রাবাস নির্মিত হইয়াছে। যেরূপ উদ্যোগ আয়েজন দৃষ্ট হইতেছে, তাহাতে বোধ হয়, বঙ্গদেশে শীঘ্রই বহুতর মুসলমান ছাত্রাবাস স্থাপিত হইবে।"[৫১]

পাঠ্যপুস্তক

আবদুল লতিফ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার ইংরোজি পাঠ্যপুস্তকের এবং সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী নিম্ন ও মধ্য বিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্যপুস্তকের আপত্তিকর অংশ বর্জন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। সমাজের নিন্দা, অপমান ও গ্লানি শিখবার জন্য অভিভাবকগণ তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারেন না বলে তাঁরা অভিমত দিয়েছিলেন। ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা গ্রহণ করার মতো মনোভাব সমাজের তখনও গড়ে ওঠেনি। আধুনিক শিক্ষা প্রণালীতে ধর্মশিক্ষার স্থান তো নেই, উপরন্তু ইসলাম ধর্মের বিরোধী কথা আছে, ধর্ম ও সমাজের আদর্শ ও গৌরবের কথা না থাকায় মুসলমান ছাত্রের ধর্মচেতনা ও আত্মবিশ্বাসের হানি ঘটছে—এসব অভিযোগ আবদুল লতিফ প্রমুখের চিন্তা ও বক্তব্যের সূত্র ধরেই মুসলমান লেখকগণ তাঁদের লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করেন। খ্রিষ্টান ও হিন্দুয়ানি বিষয়-আশ্রিত পুস্তকের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রধান অভিযোগ। দ্বিতীয় অভিযোগ মুসলমানের লেখা পাঠ্যবই কর্তৃপক্ষের অনুমোদন পায় না, তার বিরুদ্ধে।

মীর মশাররফ হোসেন 'মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা' (১৩১০) গ্রন্থের 'বিজ্ঞাপনে' বলেন, "বঙ্গে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিবার পুস্তক যথানিয়মে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও আমি যে এই ১ম শিক্ষা পুস্তক প্রকাশ করিতেছি, অবশ্যই ইহার কোন কারণ আছে।"[৫২] তিনি কারণটি সেখানে আর বলেননি, তবে পুস্তকখানির পাঠ করলে স্পষ্ট বুঝা যায়, তিনি ইসলামি ঐতিহ্যের প্রতিফলন ঘটিয়ে মুসলমান ছাত্রের পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। ১৯০৮ সালে রচিত আত্মজীবনীতে তিনি যা লিখেছেন, "আমরা দুই ভাই কুষ্টিয়া স্কুলে ভর্তি হইলাম, ইংরাজী আর বাঙ্গলা পড়িতে হয়। এতদিন পড়িলাম—আল্লাহ্-রসুলের নাম কোনো স্থানে পাইলাম না। যিনি গুরু তাঁহার মুখেও না, বরং ইংরাজী কেতাব মধ্যে কয়েক জায়গায় শূকরের নাম পাইলাম। পাকসাফ পবিত্রতার নামগন্ধ পাইলাম না। আল্লাহ্-

৫১. এবনে মাঔজ (রেয়াজুদ্দীন আহমদের ছদ্মনাম)—'মুসলমান বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস', ইসলাম প্রচারক, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮

৫২. মীর মশাররফহোসেন—*মুসলমানের বাঙ্গলা শিক্ষা* (১ম ভাগের প্রথম অংশ), কলিকাতা ১৩১৩, 'বিজ্ঞাপন' দ্রষ্টব্য।

রসুলের নাম কেতাবে নাই কিন্তু রাম শ্যাম হরি কালী দুর্গা শূকর, কুকুর, শৃগালের নাম অনেক স্থানে পাইলাম।'[৫৩] বাল্যকালের এই বেদনাদায়ক স্মৃতিকথা অন্তরে লালন করেই তিনি পরবর্তীকালে 'মুসলানের বাঙ্গলা শিক্ষা' রচনা করেন। যাঁরা বাংলা স্কুলে পাঠ করেছিলেন তাঁদের সকলেরই এরূপ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আত্মচিন্তার যুগে এরূপ অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিক নিয়মে হয়েছে।

রেয়াজুদ্দীন আহমদ আধুনিক শিক্ষা-প্রণালীর সমালোচনা করে বলেছেন, "মুসলমান বালক ও যুবকের পক্ষে বিদ্যালয়ের শিক্ষা প্রণালী নিরাপদ নহে। এই শিক্ষার দোষে ইংরাজী শিক্ষিত মুসলমানদিগের মধ্যে অনেক গুরুতর দোষ প্রবেশ করিয়াছে। প্রধান দোষ ধর্মাচারবিহীনতা ও নীতিজ্ঞানপরিশূন্যতা। ধর্মবিশ্বাসেও অনেকের ত্রুটি আছে। অনেকের ধর্মমত নাস্তিকের কাছাকাছি।"[৫৪] লেখক ইংরাজি শিক্ষার বিরোধিতা করেননি, ইংরাজী শিক্ষা প্রণালীতে যে দোষ আছে তার প্রতিকার চেয়েছেন। তিনি অপর একটি প্রবন্ধে বলেছেন, ইসলাম ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কহীন পাশ্চাত্য বিদ্যা শিক্ষার জন্য শিক্ষিত ব্যক্তির মনে ধর্মহীনতা বিরাজ করছে। তাঁরা 'আপনাদের জাতীয় ধর্মগ্রন্থাদি পড়িতে বা উপযুক্ত ধার্মিক পুরুষদিগের নিকট ধর্মকথা শুনিতে অনিচ্ছুক হন।'[৫৫] তিনি পার্থিব উন্নতির জন্য ইংরাজী এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ধর্মশিক্ষা কামনা করেছেন। আফতাবউদ্দীন আহমদ পাঠ্যপুস্তকের ত্রুটির কথা উল্লেখ করে লিখেছেন, "শিক্ষা ব্যবস্থার ত্রুটিতে আমাদিগকে ধর্মগন্ধবিহীন বাঙ্গলা ইংরাজী ও সংস্কৃতের বকুনি শিখিতে হইয়াছে। যাঁহারা আপনাদিগের শিক্ষা বিধানের জন্য নিয়োজিত তাঁহারা ভিন্ন ধর্মাবলম্বী বলিয়া মুসলমান শাস্ত্রানুমোদিত পাঠ্য নির্দেশ না করিয়া, হিন্দু ও খ্রীষ্টিয়ান নীতি অনুমোদিত পাঠ্যে আমাদিগকে বাধিত করিয়াছেন।'[৫৬] রেয়াজুদ্দীন আহমদের মতো আফতাবউদ্দীন আহমদ আধুনিক শিক্ষার সঙ্গে ধর্ম-শিক্ষার সমন্বিত পাঠ্য প্রণালী কামনা করেছেন : "ধর্ম প্রচারক মৌলবী মোল্লা সাহেবেরা ইংরাজী বাঙ্গলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করিয়া, ইংরোজী শিক্ষার সহিত ধর্মশিক্ষার বিষয়ে ওয়াজ নসিহত করিলে, বোধ হয় সমাজচিত্র ভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত দেখিতে পাইতাম।"[৫৭] পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে অভিযোগ পরবর্তীকালে শহীদুল্লাহর কণ্ঠেও শোনা যায়। তিনি বলেছেন যে, ধর্মপুস্তকে হিন্দু-বৌদ্ধ ধর্মের এবং ইতিহাসগ্রন্থে হিন্দু রাজা-মহারাজার গুণকীর্তন করা হয়। ইতিহাসগ্রন্থে মুসলমান শাসকদের অত্যাচারী ও নিষ্ঠুররূপে চিত্রিত করা হয়। এরূপ গ্রন্থ পাঠ করে হিন্দু ছাত্রদের মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তার ফলস্বরূপ 'রাষ্ট্রীয় একতার মুলোচ্ছেদন করা হয়।'[৫৮]

৫৩. *আমার জীবনী*, পৃ. ১৭৮-৮০
৫৪. *ইসলাম-প্রচারক*, ফাল্গুনচৈত্র ১৩০৮
৫৫. এবনে মাআজ—'আমাদের কি করা উচিত', *ইসলাম-প্রচারক*, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০
৫৬. আফতাবউদ্দীন আহমদ—'বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা', *ইসলাম-প্রচারক*, আষাঢ় ১৩১১
৫৭. ঐ
৫৮. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ—'আমাদের দরিদ্রতা', *আল-এসলাম*, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩।

সভাসমিতির মাধ্যমেও পাঠ্যপুস্তকের অনৈসলামিক বিষয়বস্তুর সমালোচনা করা হয়। রাজশাহীর আঞ্জুমনে হেমায়েত ইসলাম এদেশের 'শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক' সম্পর্কে অভিযোগ করে বলে, "বাঙ্গালা পাঠশালায় মুসলমান সন্তানদিগকে রীতিনীতি, আদব তমিজ ও ধর্মসংক্রান্ত কোনো বিশেষ পুস্তক পড়ান হয় না। যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহাতে ;হিন্দুদিগের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার মুখস্থ করিতে হয়। মোসলমানদের মধ্যে বাঙ্গালা গ্রন্থকর্তা অধিক নাই। যে দুই চারিজন আছেন তাঁহাদের পুস্তক সিলেক্ট কমিটির হিন্দু মেম্বরগণের সুবিচারে পাঠ্যপুস্তকের তালিকায় স্থান পায় না। ... এইজন্য আমাদের বঙ্গ বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের চক্ষে মোসলমান গ্রন্থকর্তার পুস্তক পড়ে না এবং দুনিয়াতে মোসলমান লেখক আছেন বলিয়া আমাদের বালকগণ বুঝিতে পারেন না।"[৫৯] বঙ্গীয় প্রাদেশিক শিক্ষা সমিতির শিক্ষা বিষয়ক সামগ্রিক আন্দোলনের মধ্যে পাঠ্যপুস্তক সংক্রান্ত আন্দোলন ছিল অন্যতম। সমিতির প্রথম বার্ষিক সম্মিলনে মুসলমান ছাত্রের পাঠ্যপুস্তক বিষয়ে গৃহীত একটি প্রস্তাব ছিল এরূপ : 'বর্তমান সময়ে বহু সংখ্যক মুসলমান বালক স্কুল, পাঠশালা, মক্তব ও মাদ্রাসায় বিদ্যাভ্যাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদের জন্য পাঠোপযোগী পুস্তক অতি বিরল থাকায় এই সমিতির মতে ঐরূপ পুস্তক সংগ্রহের জন্য সেন্ট্রাল কমিটি কর্তৃক উপযুক্ত বন্দোবস্ত অনুসারে গ্রন্থকারদিগকে পুরস্কার অথবা ছাপা খরচ দিয়া উৎসাহিত করা আবশ্যক। এবং যাহাতে পাঠোযোগী পুস্তকগুলি টেক্সট বুক কমিটি কর্তৃক তালিকাভুক্ত এবং মুসলমান বালকদিগের জন্য গবর্ণমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত হয়, সেজন্য শিক্ষাবিভাগের জন্য গবর্ণমেন্ট সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়সমূহে প্রচলিত হয়, সেজন্য শিক্ষাবিভাগে উক্ত কমিটি কর্তৃক সময়ে সময়ে আবেদনপত্র প্রেরিত হওয়া আবশ্যক।"[৬০]

শিক্ষা প্রণালী ও পাঠ্যপুস্তক সংস্কারের দাবি ব্যর্থ হওয়ার কারণ হিসাবে শিক্ষাবিভাগের অমুসলিম কর্মচারীদের দায়ি করা হয়। ফলে মুসলমান শিক্ষক, স্কুল-ইনস্পেক্টর ও অন্যান্য কর্মচারী নিয়োগের দাবি ওঠে। দাবি ওঠে আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরও।[৬১]

১৯০৩ সালের জুলাই মাসে আলিগড় কলেজের ইংলন্ড প্রবাসী পুরাতন ছাত্রগণ লন্ডনে এক সান্ধ্যসভায় মিলিত হন। সৈয়দ আমীর আলী সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তিনি নিজ ভাষণে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে 'হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়' নামে অভিহিত করে 'মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের আবশ্যকতা প্রতিপন্ন করেন। এ কথার উল্লেখ করে 'নবনূরে'র সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী বলেছেন, "বস্তুত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একরূপ হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়। মুসলমানের নিকট ইহা নানা কারণে আলমা-মেটার রূপে

৫৯. *নূর-অল-ইসলাম*, শ্রাবণ ১৩০৭।
৬০. *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ. ৪৭-৪৮
৬১. ১৯০০ সালে সরকর নিযুক্ত ৩৮২ জন শিক্ষকের মধ্যে মুসলমান শিক্ষক ছিলেন মাত্র ২৬ জন। *Muslim Community in Bengal*, p 65.

পরিচিত হইতে অবসর প্রাপ্ত হয় নাই। ইহাতে শৈশবে যেসব পুস্তক মুসলমান বালকগণ সাধারণত অধ্যয়ন করিয়া থাকে তাহা প্রায় সম্পূর্ণরূপেই হিন্দু ধর্মের ও হিন্দু সমাজের আদর্শ লইয়া লিখিত, হিন্দু বালকের পক্ষে তাহা বিশেষ উপযোগী সত্য, কিন্তু মুসলমান সমাজের পক্ষে বড়ই অহিতকর। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে মুসলমানের শিক্ষার উপযোগী করিতে হইলে সর্ব প্রথম শিশুপাঠ্য পুস্তকের পরিবর্তন আবশ্যক। হিন্দু মুসলমান উভয় জাতির বিষয় যেসব পাঠ্যপুস্তকে থাকিবে কেবল তাহাই নির্বাচন করিতে হইবে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সমগ্র মুসলমান সমাজ হইতে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত করা একান্ত কর্তব্য। যদি হিন্দু-মুসলমান সম্মিলন একান্ত প্রার্থনীয় হয়, তবে দেশের মুখের দিকে চাহিয়া সাম্প্রদায়িক স্বার্থ কিয়ৎ পরিমাণে বিসর্জনপূর্বক, সহৃদয় হিন্দুদেরও এই আন্দোলনে যোগদান করা উচিত। যদি এসব বিষয়ে একটা কূলকিনারা না হয়, তাহা হইলে বাধ্য হইয়াই মুসলমানদিগকে হিন্দুদের হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া শিক্ষার বন্দোবস্ত করিতে হইবে এবং সেইরূপ অবস্থায় 'মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপন একরূপ অনিবার্য।"[৬২] এই আন্দোলন উগ্রপন্থী লেখকদের খুব সহজে আলোড়িত করে। রেয়াজুদ্দীন আহমদ 'স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে'র দাবি তোলেন, তাঁর যুক্তি ছিল এরূপ : "বিধর্মী হিন্দু প্লাবিত দেশে, বিধর্মী খৃস্টান গভর্ণমেন্ট প্রবর্তিত পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রণালীর গতি কে রোধ করিবে? যতদিন না আমাদের মনের মতন স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয় হইবে, ততদিন আমাদের এই সর্বনাশের পথ কিছুতেই রুদ্ধ হইবে না।"[৬৩] ১৯০৩ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি যে 'অনুষ্ঠানপত্র' প্রচার করেন, তাতে একটি 'রেসিডেন্স্যাল কলেজ' স্থাপনের প্রস্তাব ছিল, যেখানে মুসলমান ছাত্ররা পড়ার সুযোগ পাবে। অনুষ্ঠানপত্রের ভাষায়—"বঙ্গীয় মুসলমানদিগের একটি মাত্রও ফার্স্ট গ্রেড কলেজ নাই। তাহাদের উচ্চ শিক্ষার জন্য একটি কলেজ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ... আরবি, পারসী, উর্দু, ইংরেজী ও বাঙ্গলা প্রভৃতি ভাষাসমূহ সম্পূর্ণ রূপে শিক্ষা দেওয়া যায় এবং তৎসহ ধর্মশাস্ত্র ও নীতিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ সুবিধা হয়, এইরূপ একটি সর্বাঙ্গসুন্দর রেসিডেন্স্যাল কলেজ স্থাপন করা শিক্ষা সমিতির পরোক্ষ প্রধান উদ্দেশ্য।"[৬৪]

সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী 'মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়ে'র একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি 'মুসলমান বিশ্ববিদ্যালয়' (১৯১৯) শিরোনামে একটি প্রচারপত্র (৪ পৃষ্ঠা) বিলি করেছিলেন। প্রচারপত্রের উদ্দেশ্য ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য চাঁদা সংগ্রহ করা। তাঁর মতে ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা ভারতের মুসলমানদের পুনর্জীবন ঘটবে। মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান একেবারে 'আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য ছিল এরূপ : "আরবী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা আমরা মানুষের মতো মানুষ গড়াইতে চাহি, স্বজাতি বৎসল, সমাজহিতৈষী, দেশগতপ্রাণ,

৬২. *নবনূর*, অগ্রহায়ণ ১৩১০, পৃ. ২৭৯
৬৩. *ইসলাম-প্রচারক*, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০
৬৪. পূর্বোক্ত, অগ্রহায়ণ-পোষ ১৩১০

ধার্মিক, চরিত্রবান লোক গড়ানই আমাদের অভিপ্রেত। বড় দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, উকিল, ব্যারিষ্টার, সিভিলিয়ান, শিল্পী তৈয়ার করা আমাদের প্রস্তাবিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য নহে, এক কথায় বলিতে গেলে জগতে এসলামের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠাকল্পে আধুনিক ধরণের উপযুক্ত ধর্মপ্রচারক গড়ানই আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য।"[৬৫] তিনি ঐরূপ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের উদ্দেশ্যে চট্টগ্রামে জমিও খরিদ করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আরবি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়নি।

নারী শিক্ষা

১৮৬৮ সালে 'বঙ্গল সোস্যাল এসোসিয়েশনে'র এক সভায় আবদুল লতিফ 'মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল' শিরোনামে যে প্রবন্ধ পাঠ করেন তাতে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করে প্যারীচাঁদ মিত্র এক প্রশ্নের মাধ্যমে জানতে চেয়েছিলেন যে, বর্তমান হিন্দু সমাজের মতো মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার জন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে কিনা। কলিকাতা মাদ্রাসার মৌলবী আবদুল হাকিম প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার বিষয়টি অজ্ঞাত নয়, ইসলামের নীতিতে নারী-পুরুষ উভয়ের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, স্বয়ং হজরত মুহম্মদ তাঁর স্ত্রী-কন্যার শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। আরবের খলিফা ও ভারতের বাদশাহরা নিজ নিজ কন্যাদের শিক্ষা দিতেন। মুসলমানরা ভালভাবে জানে যে মা শিক্ষিত হলে শিশু সুশিক্ষা পায়। শিক্ষিতা স্ত্রী সাংসারিক কাজে স্বামীকে সাহায্য করতে পারেন। পুরুষের শিক্ষার উন্নতির সঙ্গে নারীশিক্ষারও উন্নতি ঘটবে। তবে কথা এই যে, অন্য সম্প্রদায়ের মতো মুসলমানরা তাদের কন্যাদের স্কুল-কলেজে পাঠাতে পারেন না। মেয়েদের পর্দানশীল করে রাখতে তাঁরা ধর্মের কারণে বাধ্য, অন্য জাতির মতো তাঁরাও তাঁদের ধর্মবিধি পালন করতে বদ্ধপরিকর।[৬৬] অন্য কথায় আবদুল হাকিম মেয়েদের গৃহশিক্ষার কথা বলেছেন, স্কুল-কলেজের শিক্ষা সমর্থন করেননি। বনেদী পরিবারে এ রীতি প্রচলিত ছিল। পর্দার অন্তরালে থেকে মেয়েরা গৃহশিক্ষকের কাছে লেখাপড়া শিখত। বিদ্যালয়ে যাওয়া দূরের কথা, তারা বাড়ির বাহির মহলেও যেতে পারত না। সে শিক্ষা আবার আরবি-ফারসির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল।[৬৭] ইংরাজি-বাংলা শিক্ষা নারীর অন্দর মহলে প্রবেশ করেনি। পায়রাবন্দের 'সাবের' পরিবারে মেয়েদের জন্য গৃহশিক্ষার ব্যবস্থা ছিল বলে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন উল্লেখ করেছেন।[৬৮] গৃহশিক্ষক

৬৫. এসলামাবাদী—'আরবী বিশ্ব্যিালয়', *আল-এসলাম*, আষাঢ় ১৩২৭

৬৬. *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, p. 76.

৬৭. আরবি 'দীনিয়াত' পাঠের দ্বারা বর্ণ পবিচয় ও বানান পদ্ধতি শিক্ষা শেষ হলে 'সিপারা' (কোরানের ৩০-তম অধ্যায়) পড়ান ও মুখস্থ করান হয় এবং তারপরে পুরো কোরান সুর করে পড়ান হয়। অর্থ জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না, কোরান পাঠে পুণ্য আছে, এ প্রেরণাতেই এই শিক্ষা। এর সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার নামাজ পাঠ ও দোয়া-দরুদ পাঠ শিক্ষা দেওয়া হয়।

৬৮. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের গৃহশিক্ষাই মূল সম্বল ছিল। জ্যেষ্ঠভ্রাতা আবুল আসাদ ইব্রাহিম সাবেরের কাছে কিছু ইংরাজি ও বাংলা শিখেছিলেন। বাকি শিক্ষা বিলাত ফেরত স্বামী সাখাওয়াত হোসেনের সহযোগিতায় সম্পন্ন হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মুক্ত মন ও চিত্তের বিকাশ হয়।

তাজউদ্দীনের কাছে ফয়জন্নেসা চৌধুরানী শিক্ষা সম্পর্কে পাঠ নেন, তাঁর বাকী শিক্ষা ছিল স্বশিক্ষা। গৃহে 'ফয়জন পাঠাবার' স্থাপন করে সেখানেই বিদ্যাচর্চা ও কাব্যচর্চা করতেন। তিনি পর্দার আড়ালে থেকে কর্মচারীদের আদেশ-নির্দেশ দিয়ে জমিদারী পরিচালনা করতেন। মুর্শিদাবাদের নবাবপত্নী বেগম শামসি জাহান ফেরদৌস মহল কলিকাতায় নারীশিক্ষা বিস্তারের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।[৬৯] ঢাকার নবাবেরা নারীশিক্ষা তো দূরের কথা, গৃহের কন্যারা পাছে সম্পত্তির ভাগ দাবী করেন, এজন্য প্রায় অশিক্ষিত, অকর্মণ্য, অথর্ব পুরুষের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে তাঁদের ঘরেই বন্দিনী করে রাখতেন।[৭০] গ্রামের অবস্থাপন্ন গৃহস্থরা বালিকামতি বয়সে মক্তব-মসজিদে নামাজ ও কোরান পাঠের বিদ্যা দিয়ে নারীশিক্ষার পর্ব শেষ করতেন।

আবদুল লতিফ প্যারীচাঁদ মিত্রের প্রশ্নের উত্তর দেননি, উত্তর দিয়েছিলেন আবদুল হাকিম। মুসলমান সমাজে নারীশিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে উত্তর দেওয়ার মতো তখন কিছু ছিল না।[৭১] আবদুল লতিফ প্রায় চল্লিশ বছর ধরে শিক্ষার জন্য যা কিছু করেছেন তার সবই ছিল ছেলেদের শিক্ষার জন্য। প্যারীচাঁদ মিত্রের ঐ প্রশ্নের পরেও পঁচিশ বছর স্বসমাজে শিক্ষাবিস্তার ও উন্নতির জন্য চেষ্টা কবেছেন, কিন্তু নারীশিক্ষার কথা তাঁর মনে রেখাপাত করেছে এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। আবদুল লতিফের চার পুত্র উচ্চ শিক্ষা পেয়েছিলেন, জ্যেষ্ঠ পুত্র আবদুর রহমান বিলাত থেকে ব্যারিস্টারী পাশ করে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁর একমাত্র কন্যাকে কোনো শিক্ষা দিযেছিলেন কি না তা জানা যায় না।[৭২] 'বনেদী ঘরের মেয়েরা স্কুল-কলেজে যেতে পারে না' আবদুল হাকিমের এই অভিমতের সমর্থক ছিলেন আবদুল লতিফ। অর্থাৎ মুসলমান মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ছিল পুরোপুরি রক্ষণশীল। তিনি এক্ষেত্রে যুগধর্ম ও যুগমানসিকতার প্রভাব একেবারেই কাটিয়ে উঠতে পারেননি।

সৈয়দ আমীর আলীর দৃষ্টিভঙ্গি অন্য অনেক বিষয়ের মতো নারীশিক্ষার ক্ষেত্রেও প্রগতিশীল ছিল। তিনি ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত 'মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্সে' সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে, মেয়েদের শিক্ষা ছেলেদের শিক্ষার সমান্তরালভাবে চলা উচিত। তাতেই সমাজে ভারসাম্য রক্ষিত হবে, পুরুষ নারী একত্রে সমান উন্নতি করতে না পারলে প্রকৃত সুফল পাওয়া যাবে না। বরং এক অংশকে শিক্ষিত ও অপর অংশকে নিরক্ষর করে রাখলে ফল মারাত্মকই হবে। শিক্ষিত অংশ

৬৯. *The Moslem Chronicle*, 23 January 1897, p. 29
৭০. *বাংলাব মধ্যবিত্তেব আত্মবিকাশ*, পৃ. ৩৫
৭১. ১৮৮১-৮২ সালের বালিকা বিদ্যালয়েব ছাত্রী সংখ্যার একটি রিপোর্ট থেকে জানা যায়, উচ্চ ইংবাজি বালিকা বিদ্যালয়েব মোট ১৮৪ জন ছাত্রীব মধ্যে মুসলমান মেয়েব সংখ্যা শূন্য। মধ্য ইংবাজি বালিকা বিদ্যালয়ের মোট ৩৪০ জন ছাত্রীর মধ্যে মুসলমান মেয়ের সংখ্যা মাত্র ৪ (১.১%)। বিনয় ঘোষ-বাংলা *সামাজিক ইতিহাসের ধাবা*, পৃ. ২১৯
৭২. আবদুল লতিফেব জামাতা সৈয়দ মুহম্মদ খান বাহাদুর ইনস্পেক্টর জেনেরাল অব রেজিস্ট্রেশন পদে কাজ করতেন। এটি অতি সম্মানিত চাকুরি ছিল। *মালঞ্চ*, আশ্বিন ১৩২৪

আনন্দালাভের জন্য অসামাজিক আচরণের দিকে ঝুঁকে পড়বে।[৭৩] আমীর আলী নারীশিক্ষার সপক্ষে অভিমত দিলেও তিনি সে শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য কোনো চেষ্টা করেননি। বিদেশী মহিলার পাণিগ্রহণ করে তিনি জীবনের শেষ ২৪ বছর বিলাতেই অতিবাহিত করেন।

১৮৯৬ সালে কলিকাতার প্রভাবশালী ডাক্তার জহিরুদ্দীন আহমদের কন্যা বেথুন কলেজে ভর্তি হতে পারেনি, কারণ সেখানে মুসলমান মেয়েদের পড়ার অধিকার ছিল না।[৭৪] সম্ভবত তখন কোনো কোনো সমাজকর্মীর চিত্ত উদ্বেল হয়। দেখা যায়, এর প্রায় দেড় মাস পরেই কলিকাতার কয়েকজন বিশিষ্ট নাগরিক ব্যারিস্টার ই. এ. খোন্দকারের বাসগৃহে একটি সভায় (১০ মে ১৮৯৬) মিলিত হয়েছে, উদ্দেশ্য মুসলমান মেয়েদের জন্য বড় আকারে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা। সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রিন্স মোহাম্মদ বখতিয়ার শাহ, মোহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর, শেখ মোহাম্মদ জিলানী শামসুল উলমা, আবুল সালাম খান বাহাদুর, আবদুল কাদির, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, আবুল হাসান খান বাহাদুর, ডাক্তার জমিরুদ্দীন আহমদ, আবদুল হামিদ, মির্জা সুজাত আলী বেগ, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন প্রমুখ। বখতিয়ার শাহকে সভাপতি এবং সুজাত আলী বেগ ও ওয়াহেদ হোসেনকে যুগ্ম-সম্পাদক করে ৬ জন সদস্যসহ একটি 'সাময়িক কমিটি' গঠন করা হয়। সভায় মুর্শিদাবাদের নবাব বেগম শামসি জাহান ফেরদৌস মহলকে পৃষ্ঠপোষকতা করার অনুরোধ জানান হয়।[৭৫]

১৮৯৭ সালের ১৯ জানুয়ারি ঐ বিদ্যালয়টি লেডি ম্যাকেঞ্জি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। এর নামকরণ হয় 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা'। নবাব বেগম ফেরদৌস মহলে গৃহনির্মাণের খরচ বহন করেন, নবাব আহসানুল্লাহ ১০০০ টাকা দান করেন। ২৫ জন ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টির যাত্রা শুরু হয়।[৭৬] মুসলমানদের উদ্যোগে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত এটিই প্রথম বালিকা বিদ্যালয়। মোসলেম ক্রনিকলে লেখা হয়, বিদ্যালয় স্থাপনের প্রাক্কালে সমাজের তরফ থেকে আপত্তি উঠেছিল, কিন্তু সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেনের অদম্য ইচ্ছা ও অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে শেষ পর্যন্ত এটি খোলা সম্ভব হয়।[৭৭]

মহিলা স্কুল-ইনস্পেক্টর মিস ব্রুক ১৯০৫-০৬ সালে প্রদত্ত এক রিপোর্টে তৎকালীন মুসলমান নারীশিক্ষার একটি পরিষ্কার চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন, I have this year seen more of Mohammadan Schools and come more into touch with Mohammadan Zanana life. Education both in the Schools and in the Zanana

---

৭৩. Syed Ameer Ali M. A., C. I E.–Muhammadan Eeucation and Muhammadan Society (Presindential Address delivered at the Muhammadan Educational Conference of 1899, Calucuua, 1900.

৭৪. *The Moslem Chronicle*, 24 March 1896, p. 142.

৭৫. *Ibid.*, 16 May 1896, p. 122.

৭৬. *Ibid.*, 16 May 1896, p.122.

৭৭. Ibid., 23 January 1897. p.621

is of the most meager description. In the former this is undoubtedly due to the early age of which girls are withdrawn, not for marriage, but within the pardah : in the latter it is owing to the almost utter lack of training and education in the teachers From what I have observed I consider that in the case of Mohammadans the work has not yet been attempted on the right lines for success. The majority of the Mohammadan will no doubt for years to come view the movement for the education of women with dislike ; but that will be no bar, if certain conditions are allowed, to the progress of education both in the Zanana and in the Schools. Mohammadan Schools must be altogether pardah, and all the local male officials, entirely withdrawn from the Schools. A conveyance grant for the Schools is necessary if high class Moammadan girls are to be secured. Women of good family must be obtained as teachers for the schools, but above all for the Zanana. These teachers must be able to speak good Urdu. Lastly one of the most important points is, I consider, the giving of certain concession with regard to the curriculum The text books above all should be such as are acceptable to the Muhammadans. I am convinced that if we could obtain teachers capable of giving an acceptable course of instruction, a large number of Zanana would be at once available.[৭৮]

ঠিক এই সময় কলিকাতায় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আবির্ভাব হয়। তিনি প্রথমে লেখনির মাধ্যমে নারীমুক্তির বাণী প্রচার করেন। মিস ব্রুকের মতো তাঁরও বিশ্বাস ছিল যে মুসলমানের পর্দাপ্রথাই নারীশিক্ষার প্রধান অন্তরায়। এই পর্দার কারান্তরাল থেকে নারীদের বের করে আনতে হবে। তিনি শৈশব কালে পিতৃ-পরিবারে যে অভিজ্ঞতা এবং বিবাহিত জীবনে স্বামীর পরিবারের যে পরিচয় লাভ করেছেন, তা থেকে জ্ঞান আহরণ করে নারীর বন্দীদশার করুণ চিত্র তুলে ধরেন। অশিক্ষার কারণেই নারীরা আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে, যার ফল স্বরূপ তারা পুরুষের উপর নির্ভরশীলা হয়, তাদের ব্যক্তি স্বাধীনতাও অবলুণ্ঠিত হয়। উপযুক্ত শিক্ষা লাভ করলে নারী অর্থ-স্বাধীনতা ও তৎসঙ্গে ব্যক্তি-স্বাধীনতা লাভ করে। 'মতিচূর' (১৯০৪), 'সুলতানার স্বপ্ন' (১৯০৫), 'অবরোধবাসিনী' (১৯২৮) প্রভৃতি গ্রন্থে তিনি মুখ্যভাবে এটাই প্রচার করেছেন। ১৯১১ সালে 'সাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস্ স্কুল' স্থাপন করে তিনি তাঁর চিন্তাজগতের আদর্শকেই বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। নিজে সমাজের সমালোচনা ও লাঞ্ছনা সহ্য করে প্রকৃতপক্ষে বাঙালি মুসলমান নারীর আধুনিক শিক্ষার দ্বার উন্মোচন করেছিলেন।

মফস্বলে নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে নবাব ফয়জন্নেসা চৌধুরানীর আবদানই সর্বাগ্রগণ্য। অভিজাত ঘরের মেয়েরা ধর্মের কারণে স্কুল-কলেজে যেতে পারে না বলে আবদুল

৭৮ *The Muslim Community in Bengal*. p. 399 (Appendix--D)

হাকিম ও তাঁর নীরব সমর্থক আবদুল লতিফ যে-সময় নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন, তার মাত্র ৫ বছর পরে ফয়জন্নেসা চৌধুরানী সম্পূর্ণ নিজ ব্যয়ে কুমিল্লায় একটি উচ্চ ইংরাজি বালিকা বিদ্যালয় (১৮৭৩) স্থাপন করেন। শুধু তাই নয়, হোস্টেলে মেয়েদের মাসিক বৃত্তির ব্যবস্থা করে তাদের শিক্ষায় উৎসাহিত করেছেন। তিনি পশ্চিম গাঁওয়ে একটি প্রাথমিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন।[৭৯] ফয়জন্নেসার এ প্রচেষ্টার পথ নিরঙ্কুশ ছিল না : ফতুয়াপ্রপীড়িত দেশে তাঁকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, কিন্তু তিনি পিছপা হননি। তিনি নিজে জ্ঞানের যে স্বাদ, মুক্ত চিন্তার যে আলো পেয়েছেন, তা নারী সমাজে ছড়িয়ে দিয়েছেন নির্দ্বিধায়। তবে তাঁর এই স্বতোৎসারিত চিন্তাশক্তিকে লেখনির মাধ্যমে কিংবা অন্য কোনো ভাবে আন্দোলনের আকার দিতে পারেননি, ঐরূপ চেষ্টাও তাঁর ছিল না। বেগম রোকেয়া সেদিক থেকে অগ্রবর্তিনী ছিলেন।

১৮৮৩ সালে ঢাকা কলেজের পাঠরত কতিপয় ছাত্র 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' স্থাপন করে প্রথম যৌথভাবে নারীশিক্ষার অভিযান চালান। তাঁরা যে প্রক্রিয়ায় শিক্ষার ব্যবস্থা করেন তা সম্পূর্ণ অভিনব। বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা সম্ভব নয় ভেবে তাঁরা গৃহশিক্ষাকে অবলম্বন করে বার্ষিক পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করেন। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠ্যসূচি ও পাঠ্যপুস্তক ঠিক করে দিতেন। তারই ভিত্তিতে ছাত্রীরা তৈরি হতো, পরীক্ষক গিয়ে স্থানীয় অভিভাবকের সহায়তায় পরীক্ষা নিতেন। তাঁরা বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাতেই শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। যারা পরীক্ষায় সফল হত, তাদের সম্মিলনের তরফ থেকে পরীক্ষা-পাশের সার্টিফিকেট ও পারিতোষিক দেওয়া হতো। কোনো বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শিক্ষাপদ্ধতি এটি। একে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ উন্মুক্ত বিদ্যালয় বলা যায়। নিজেদের আর্থিক ক্ষমতা ও সমাজের বিরূপ মনোভাবের দিকে চেয়ে তাঁরা এরূপ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। সমাজের জাগরণ ও উন্নতির সঙ্গে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির যে গভীর সম্পর্ক আছে, তা উপলব্ধি করে তাঁরা তাঁদের সামর্থের মধ্যে এরূপটি করেছিলেন। তাঁদের প্রচেষ্টা ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু তা নিঃসন্দেহে মহৎ ছিল। অবশ্য এ ব্যবস্থা নিতান্ত সাময়িক ও সীমিত ছিল।

সাময়িকভাবে শিক্ষাবিস্তারের উদ্যোগ নিয়ে আন্দোলনের জোয়ার এনেছিল বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি। সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন সমিতির 'অনুষ্ঠানপত্রে' (১৯০৩) স্ত্রীশিক্ষাকে অন্তর্ভূত করে বলেছেন, "আমাদের সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার করাও শিক্ষা সমিতির এক প্রধান উদ্দেশ্য। স্ত্রীশিক্ষার জন্য পৃথক বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং যাহাতে মুসলমান বালিকাগণ ধর্ম ও নীতিশাস্ত্র সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিতে পারে তাহার বিশেষ বন্দোবস্ত করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।"[৮০] রাজশাহীতে সমিতির প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে (চৈত্র ১৩১০) গৃহীত পঞ্চম প্রস্তাবটি ছিল স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ক : মির্জা সুজাত

৭৯. *নওয়াব ফয়জুন্নেসা শতবার্ষিকী স্মরণিকা* ১৯৭৩, কুমিল্লা, ১৯৭৫, পৃ. ৩০-৩১
৮০. *ইসলাম-প্রচারক*, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩১০, পৃ. ৪১৮

আলী বেগ প্রস্তাব করেন, দিনাজপুর নিবাসী মেসেরউদ্দীন আহমদ সমর্থন করেন। প্রস্তাবটি এরূপ : "অধুনা মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষার প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শিত হইয়া থাকে, এই সমিতির মতে পরদার সহিত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রতি মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক।"[৮১] এ প্রস্তাব অনুযায়ী নারীশিক্ষা কতদূর অগ্রসর হয়েছিল, তা জানা যায় না। হিন্দু-মুসলমানের যৌথ উদ্যোগে পরিচালিত 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' (১৮৭৬) শ্রীহট্ট জেলার বালিকাদের মধ্যে শিক্ষ বিস্তারের চেষ্টা করে। ঢাকার মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর অনুরূপ শ্রীহট্ট সম্মিলনী নিজস্ব পদ্ধতিতে শিক্ষা দান করত এবং সফল পরীক্ষার্থিনীদের সার্টিফিকেট, পদক ও পারিতোষিক প্রদান করত। ১৮৮৯ সালে সম্মিলনীর বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী সভায় কলিকাতা হাইকোর্টের উকিল মৌলবী সিরাজুল ইসলাম খান বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুসলমান মেয়েদের উৎসাহিত করার জন্য ১০ টাকা মূল্যের পুরস্কার ঘোষণা করেন। সিরাজুল ইসলাম, আবদুল করিম বি.এ. মৌলবী আহমদউল্লা সম্মিলনীর সভ্য ছিলেন।[৮২]

লেখকসমাজের কমবেশি সকলেই নারীশিক্ষার সমর্থক ছিলেন, বিরোধী কেউ ছিলেন না। তবে তাঁরা যা বলেছেন, নিতান্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই বলেছেন, আন্দোলনের রূপ দেওয়ার জন্য কেউ বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি। 'মিহির ও সুধাকরে' 'মুসলমান স্ত্রী সমাজে ইংরাজী শিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখা হয় : "আমরা কখনও স্বপ্নেও ভাবি নাই, ১৯০১ সালের আদমশুমারী আমাদের নিকট ৫০০ মুসলমান স্ত্রীলোকের ইংরাজী শিক্ষার কথা প্রচার করিবে। .... যদি অন্তঃপুরে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলন সম্ভব, তবে স্কুল স্থাপন করিয়া বালিকাগণকে শিক্ষা দিতে আপত্তি কি? যেসব স্কুলে মুসলমান বালিকার প্রবেশাধিকার আছে, তথায় তাহাদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে ক্ষতি কি? বিশেষ আমাদের বালিকা মাদ্রাসাগুলিতে ইংরাজী শিক্ষার বন্দোবস্ত করিলে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা অবলম্বন করা হয়।"[৮৩] প্রবন্ধকার নারীশিক্ষায় আশাবাদ প্রকাশ করলেও তেমন উচ্চকণ্ঠ ছিলেন না। নারীর উচ্চ শিক্ষা মিহির ও সুধাকর সমর্থন করত না। সাধারণ মানের শিক্ষাই পত্রিকার কাম্য ছিল। রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন 'নবনূরে' (ভাদ্র ১৩১১) 'আমাদের অবনতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে নারীর উচ্চ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা বললে, তার প্রতিবাদ করে মিহির ও সুধাকরে লেখা হয়, "আজকাল মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা ও অবরোধপ্রথা লইয়া ঘোর আন্দোলন চলিতেছে এবং সংবাদপত্রেও তৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি সর্বদাই বাহির হইতেছে। স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা ও স্বাধীনতা দান করা সমাজের কর্তব্য কিনা এই বিষয়ের মীমাংসার এ পর্যন্ত চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হইল না। স্ত্রীশিক্ষা বাঞ্ছনীয় বটে কিন্তু তাহার একটা সীমা নির্দিষ্ট থাকা চাই। অর্থাৎ কোরান শরীফ পড়া, কিছু উর্দু ও বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানি মসলা-মসায়েলের কেতাবগুলি পাঠ করিয়া ধর্মসম্বন্ধীয় যাবতীয় রীতিনীতি

---

৮১. ঐ. বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, পৃ. ৭৫
৮২. সুন্দরীমোহন দাস— *শ্রীহট্ট সম্মিলনীর জন্মকথা*, শ্রীহট্ট, ১৯৩৬
৮৩. *মিহির ও সুধাকর*, ২৩ মাঘ ১৩০৯

অবগত হইয়া শরাশরীয়ত অনুযায়ী সমস্ত ধর্মকার্য যথা নিয়মে সম্পাদন করিতে এবং বাঙ্গালা ভাষায় ললনা সুহৃদ বা তত্তুল্য কোনো স্ত্রীপাঠ্য পুস্তক পড়িয়া সাংসারিক কাজকর্মের সুশৃঙ্খলা, স্বাস্থ্যরক্ষা, সন্তান লালন-পালন রীতি ও অন্যান্য গুরুজনের প্রতি ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞানলাভে সমর্থ হইতে পারা যায়, এইহেতু আমাদের সমাজের ভগ্নিগণকে ঐ পরিমাণ বিদ্যাশিক্ষা করিতে অনুরোধ করি। তাহাদের উচ্চ শিক্ষা লাভ করা আমাদের অভিপ্রেত নহে।"[৮৪] কোনো কোনো নব্যশিক্ষিত ব্যক্তি স্ত্রীশিক্ষা ব্যাপারে নিঃশঙ্ক ও দ্বিধাহীন ছিলেন। কাজী ইমদাদুল হক বলেন, "স্ত্রী-সমাজে কুশিক্ষার বিষাক্ত প্রভাবে আমাদের সমাজ জর্জরিত হইয়া গিয়াছে। স্ত্রীলোকগণই মানবকুলের মাতা, তাহারাই আবার সমাজের উন্নতি বা অবনতির প্রসূতি। স্ত্রীগণ অশিক্ষিত থাকিলে সমাজের অর্ধাঙ্গ বিকল হইয়া পড়ে, সুতরাং সে সমাজ দ্বারা কোনো কর্মই সুসাধিত হয় না। স্ত্রীলোকগণের মতিগতি ও শিক্ষা সংস্কার যেরূপ থাকে, বালকগণের সরলচিত্তে তাহা দৃঢ়রূপে চিরদিনের জন্য মুদ্রিত হইয়া যায়। আমাদের বালকগণ তাহাদের মাতৃসমাজের কুসংস্কার, অবনতি ও অজ্ঞানতা লইয়াই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। যতদিন আমাদের মাতৃসমাজ সুশিক্ষিত হইয়া উপযুক্ত না হইবে, ততদিন আমাদের উন্নতির আশা নাই।"[৮৫] উনিশ শতকের শেষ পাদে নারীশিক্ষা সম্পর্কে মুসলমান সমাজের নিশ্চলতার অবস্থা থেকে সচলতার অবস্থায় উত্তরণ ঘটেছে। সমাজের গতি যে পরিবর্তনের দিকে ছিল, এতে তাই প্রমাণিত হয়।

৮৪. *মিহির ও সুধাকর*, ১৪ আশ্বিন ১৩১১, পৃ. ৪
৮৫. কাজী ইমদাদুল হক—'আমাদের শিক্ষা', *নবনূর*, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০

ভাষা ও সাহিত্য

"বাঙ্গালা হিন্দু-মুসলমানের দেশ – একা হিন্দুর দেশ নহে। কিন্তু হিন্দু মুসলমান এক্ষণে পৃথক-পরস্পরের সহিত সহৃদয়তাশূন্য। বাঙ্গালার প্রকৃত উন্নতির জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় যে হিন্দু মুসলামনে ঐক্য জন্মে। যতদিন উচ্চ শ্রেণীর মুসলামনদিগের মধ্যে এমত গর্ব থাকিবে যে তাঁহারা ভিন্ন দেশীয়, বাঙ্গালা তাঁহাদের ভাষা নহে, তাঁহারা বাঙ্গালা লিখিবেন না, বা বাঙ্গালা শিখিবেন না, কেবল উর্দু ফারসীর চালনা করিবেন, ততদিন সে ঐক্য জন্মিবে না। কেননা জাতীয় ঐক্যের মূল ভাষার একতা।"[১] কথাগুলি বলেছেন অক্ষয়কুমার সরকার মীর মশাররফ হোসেনের 'গোরাই ব্রিজ' (১৮৭৩) কাব্যের সমালোচনা প্রসঙ্গে। এটি 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়। "মুষ্টিমেয় অভিজাত সম্প্রদায় তখনও অতীত গৌরবের গোরস্থানে বসিয়া বাঙালী মুসলমানদের ভাষা 'বাংলা কি উর্দু' সে বিচার লইয়া মশগুল। কিছুদিন পরেই সমিতি গড়িয়া, সভা ডাকিয়া, বাংলা ভাষায় বক্তৃতা দিয়া তাঁহারা বাংলার জনসাধারণকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, বাঙালী মুসলমানদের ভাষা বাংলা নহে, 'দোভাষী বাংলা'ও নহে, একবোরে সরাসরিভাবেই 'উর্দু'।"[২] এ উক্তি ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হকের। তাঁদের উভয়ের কণ্ঠধ্বনি এক : একজন সমসাময়িক কালের অভিজ্ঞতার কথা বলেছেন, অপরজন গবেষণালব্ধ জ্ঞানের কথা বলেছেন। বাঙালি মুসলমানের মাতৃভাষা বাংলা না উর্দু এরূপ বিতর্ক দীর্ঘকাল ধরে চলছিল, কখন উপর তলার মানুষের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণে, কখন উঠতি নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর মোহের কারণে, আবার কখন নেতৃবর্গের রাজনৈতিক স্বার্থ উদ্ধারের কারণে।

ষোল-সতের শতকের দিকে মোগল শিবিরে সেনাবাহিনীর মৌখিক ভাষা হিসাবে উর্দু ভাষার উৎপত্তি হয়। শিবিরের প্রতিশব্দ উর্দু। উর্দু ভাষা সৈন্যের ছাউনি ছেড়ে দরবারের স্বীকৃতি লাভ করে সম্রাট শাহজাহানের আমলে (১৬২৬-৫৭)।[৩] উত্তর ভারতের আঞ্চলিক হিন্দুস্থানী ভাষার কাঠামোয় আরবি বর্ণমালা ও লিপিপদ্ধতি এবং আরবি-ফারসি শব্দমালা আত্মসাৎ করে উর্দু ভাষার উদ্ভব হয়। প্রথমে কবি গালিব (১৭৯৬-১৮৬৯), কবি হালি (১৮৩৭-১৯১৪) এবং পরে আলিগড় আন্দোলনের নেতা সৈয়দ আহমদ (১৮১৭-৯৮),শিবলী নোমানী (১৮৫৭-১৯১৪) প্রমুখের চেষ্টায় উর্দু সর্বতোভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মোঘল বাদশাহ কর্তৃক প্রেরিত নবাব-সুবেদার-মনসবদার-জায়গিরদার-আয়মাদার ও তাঁদের পরিবার পরিজন, সৈন্য ও ধর্মপ্রাচরক দ্বারা উর্দু ঢাকা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি কেন্দ্রে

১ *বঙ্গদর্শন*, পৌষ ১২৮০

২. *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*, পৃ: ৩০৩

৩. 'উর্দুয়ে মোয়াল্লা' বা রাজশিবিরের ভাষা নাম দিয়ে শাহজাহান প্রথম ঐ ভাষাকে রাজদরবারে স্বীকৃত দিয়েছিলেন। *সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস*, পৃ: ৭৭

নীত হয়। সে সময় থেকে এদেশে অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে উর্দু চর্চার সূত্রপাত হয়। মোঘল আমলে দিল্লীর সঙ্গে বাংলা যুক্ত থাকায় উত্তর ভারতের ভাগ্যান্বেষীর দল রাজধানী ও বাণিজ্যিক শহরগুলিতে এসে ভিড় করত। এদের সমন্বয়ে এদেশে ক্রমে উর্দুভাষী অবাঙালি মুসলামনের একটি নাগরিক শ্রেণী গড়ে ওঠে। তাঁরা উর্দুকে পারিবারিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন।

১৭০২ সালে ঢাকা থেকে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হয়। ঐ সময় থেকে মুর্শিদাবাদের গুরুত্ব বেড়ে যায়, মুর্শিদাবাদই শিক্ষা-সংস্কৃতি চর্চার কেন্দ্র হয়ে ওঠে। দেশের যাঁরা উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও যশোলিপ্সু, তাঁরা শহরের সংস্কৃতি গ্রহণ করতে উন্মুখ হন। জমিদারগণ নবাব-নাজিম ও আমির-ওমরাহর অনুকরণ করতেন। তাঁরা সামাজিক মর্যাদা লাভের জন্য আরবি-ফারসিকে বিদ্যা চর্চার ভাষা ও উর্দুকে পারিবারিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। বিশেষ করে, বাঙালি মুসলমান পরিবারগুলিতে উর্দুপ্রীতি ও আরবি-ফারসি মোহ জাগতে থাকে।[৪] রাজকার্যের সাথে সম্পর্ক রাখার জন্য হিন্দু রাজা-মহারাজা, জমিদারগণ ফারসি শিখতেন এবং নবাবি আদব-কায়দা ও সংস্কৃতি অনুসরণ করতেন। এমন কি, ইংরাজরাও প্রথম দিকে নবাবী চালচলন খানাপিনা ও আমোদ-প্রমোদ পছন্দ করতেন। ভারত থেকে প্রত্যাগত ইংরাজদের ইংলণ্ডবাসীরা 'নাবুব' বলে অভিহিত করত।[৫]

নবাবের আমলে মুর্শিদাবাদ ছিল বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজধানী, কলিকাতা ব্রিটিশ শাসিত সমগ্র ভারতের রাজধানী হয়। প্রথমে গবর্ণর বা গবর্ণর জেনেরাল এবং পরে লেফটেন্যান্ট গবর্ণরের অধীনে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যা-আসাম শাসিত হতে থাকে। ১৮৭৪ সালে আসাম একজন চীফ কমিশনারের অধীনে পৃথক হয়ে যায়। আধুনিক শহররূপে কলিকাতা গড়ে উঠলে জীবিকার নানা উপায় সেখানে বেড়ে যায়। জীবিকার সন্ধানে ব্রিটিশ ভারতের সব অঞ্চলের ভাগ্যান্বেষী মানুষেরা কলকাতায় ভিড় করতে থাকে। শিক্ষিত জ্ঞানীগুণী ও বিদ্বান লোকেরা শহরের সুবিধা ভোগ করার জন্য এগিয়ে আসেন। তাই কলিকাতায় বাংলার বাইরের প্রদেশগুলি থেকে উর্দু ভাষাভাষী লোকদের আগমন ধারা অব্যাহত ছিল। কলকাতা বিশ্বদ্যিালয়ের আওতায় পাঞ্জাব থেকে রেঙ্গুন পর্যন্ত অঞ্চলসমূহ ছিল। কলিকাতা মাদ্রাসায় কাশ্মীর থেকে ছাত্ররা অধ্যয়ন করতে আসত। ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদের, ১৭৯৯ সালে মহীশূরের ও ১৮৫৬ সালে অযোধ্যার পতন হয়। বিদ্রোহ এড়াবার জন্য কোম্পানি ঐ সব রাজ-পরিবারকে সরকারি খরচে কলকাতায় নিজ

৪. মীর মশাররফ হোসেন 'আমার জীবনী'তে লিখেছেন যে, তাঁর পিতামহ মীর এবরাহিম হোসেন উর্দুভাষা শিক্ষার জন্য পদমদী ত্যাগ করে মুর্শিদাবাদ রওনা হয়। মশাররফের পিতা মীর মোয়াজ্জেম হোসেন বাংলা জানতেন না, বাংলা বিদ্যাকে বিদ্যা বলে মনে করতেন না। জমিজমার কাগজপত্র সই করতেন ফারসিতে। মীর পরিবারকে গ্রামে সভ্রান্ত জোতদার হিসাবে ধরে আমরা ঐ যুগের বাংলার মুসলমান বনেদি শ্রেণীর মানুষের মনোভাবটি অনুধাবন করতে পারি

৫. গোপাল হালদার—*বাংলা সাহিত্যের রূপরেখা, ১ম খণ্ড,* পৃ: ১৮৩ (৩য় সং)।

তত্ত্বাবধানে রাখতেন। মুর্শিদাবাদের নবাব গার্ডেনরীচে, মহীশূরের নবাব টালিগঞ্জে এবং অযোধ্যার নবাব মেটিয়াবুরূজে বহু সংখ্যক চাকর-বাকর দাস-দাসী নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। সঙ্গে অনুরাগীরাও এসেছিলেন। উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশ শাসকদের দরবারে এঁদের মান-সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। বলা বাহুল্য, তাঁরা উর্দু ভাষার সমর্থক ছিলেন।

ঢাকার নতুন নবাব পরিবারের মৌখিক ভাষা উর্দু ছিল। পূর্ব পুরুষ কাশ্মীর থেকে ব্যবসায় করতে এসে প্রথমে শ্রীহট্ট ও পরে ঢাকায় বসতি স্থাপন করেন। খাজা আবদুল গণির চতুর্থ পুরুষ হাফিজুল্লাহ ১৮১২ সালে প্রথম ভূ-সম্পত্তি কিনে জমিদারীর গোড়াপত্তন করেন। আবদুল গণি সিপাহি বিদ্রোহে ব্রিটিশ সরকারকে সহযোগিতা করেন। তার প্রতিদানে তিনি বংশ পরম্পরায় 'নবাব' উপাধি পান। প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বনেদি অথবা নতুন, উভয় শ্রেণীর জমিদার বংশ-কৌলিন্য, সামাজিক প্রতিপত্তি ও আর্থিক প্রাধান্য বজায় রাখার জন্য পুরাতন মোঘলাই সংস্কৃতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করতেন। তাঁরা উর্দুকে পারিবারিক ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেন। আরবি-ফারসি শিক্ষাকে তাঁরা সংস্কৃতিবানের শিক্ষা বলে মনে করতেন। যত দূর জানায় যায়, রংপুর পায়রাবন্দের 'সাবের' পরিবার, টাঙ্গাইল-করটিয়ার 'পন্নী' ও দেলদুয়ারের 'গজনবী' পরিবার, ময়মনসিংহ-ধনবাড়ির 'চৌধুরী' পরিবার, বগুড়ার 'চৌধুরী' পরিবার, সায়েস্তাবাদের 'চৌধুরী' পরিবার, মেদিনীপুরের 'সোহরাওয়ার্দী' পরিবার প্রভৃতি উর্দু-ফারসি চর্চা করতেন। নব্যশিক্ষিত আবদুল লতিফ, সৈয়দ অমীর আলী, আবদুর রহিম, আবদুল জব্বার খান বাহাদুর, সৈয়দ শামসুল হোদা প্রমুখ উর্দু, ফারসি ও ইংরাজি ভাষার সেবা করেছেন। মাদ্রাসার শিক্ষিত মৌলবী-মৌলানারাও উর্দু-ফারসির সমর্থক ছিলেন। তাঁরা ঐ ভাষাতেই শিক্ষা লাভ করতেন। তাঁরা ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদিতে ওয়াজ-নসিহত করতেন উর্দুতে। তাঁরা বাংলা ভাষাকে বাঙালি হিন্দুর ভাষা বলে মনে করতেন।

১৮৩৭ সালে ফারসির স্থলে ইংরাজি রাজভাষা হলে মুসলমান সামাজে ইংরাজি শিক্ষার প্রয়োজন দেখা দেয়। ঐ সময় থেকে সরকার ক্রমশ একটি সুষ্ঠু শিক্ষানীতি গ্রহণ করতে থাকেন। কলকাতা মাদ্রাসায় ইঙ্গ-ফারসি বিভাগ এবং হুগলী মাদ্রাসায় ইঙ্গ-আরবি বিভাগ খোলা হয়। ১৮৩৫-৩৮ সালে এ্যাডাম তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত রিপোর্টে মুসলমানদের জন্য শহরে উর্দু ও গ্রামে বাংলা শিক্ষা দেওয়ার কথা বলেছেন। ১৮৫৪ সালে উডের 'ডেসপ্যাচে' প্রাথমিক শিক্ষার উপর জোর দেওয়া হলে গ্রাম-গ্রামান্তরে স্কুলের সংখ্যা বেড়ে যায়। পাটের চাহিদা ও মূল্যবৃদ্ধির জন্য গ্রামের কৃষকদের হাতে টাকা আসে। ঠিক এ সময় আবদুল লতিফ, আমীর আলী ইংরাজি শিক্ষার প্রচলনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রি লাভ করে অনেকে বেরিয়ে আসেন। সমাজের মধ্যে আধুনিক চেতনার বীজ তাঁরাই ছড়িয়ে দেন। স্কুল-কলেজের ছাত্রবৃত্তি,নর্মাল, এন্ট্রাস, বিএ-বিএল পাস যুবকেরা বাংলা সাহিত্য চর্চা শুরু করেন। বাংলা বাঙালির মাতৃভাষা, হাজার বছরের পরীক্ষায় এ সত্য প্রমাণিত হয়ে গেছে। এ ভাষার

চর্চার দ্বারাই সমাজের, দেশের উন্নতি সম্ভব। উর্দু কোন কালে বাঙালির মাতৃভাষা ছিল না। একে বাঙালির মাতৃভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াসও বৃথা। নব্যশিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ক্রমে এ উপলব্ধি জাগ্রত হয়। তখন উর্দুপন্থীদের সাথে তাঁদের বাংলা –উর্দু প্রসঙ্গে বির্তক উপস্থিত হয়।

বাংলার মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রথম আন্দোলন করেন আবদুল লতিফ। তাঁর শিক্ষা সংক্রান্ত পূর্বাপর কর্মসূচি ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, তিনি মূলত আরবি–ফারসি–উর্দু ভাষা ও প্রাচ্যবিদ্যার পক্ষপাতি ছিলেন। ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান–বিজ্ঞান সমর্থন করেছেন সত্য, কিন্তু এ বিষয়ে তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল চাকুরি–বাকুরির ক্ষেত্রে সুবিধা লাভ করে আর্থিক ও সামাজিক অবস্থার উন্নতি করা। বাঙালি মুসলমানদের জীবনে ও চিন্তায় বিপ্লব আসুক, এমন কথা তিনি কোথাও বলেননি। অর্থাৎ মনোভাবের দিক থেকে তিনি প্রায় পুরোপুরি প্রাচীনপন্থী ও রক্ষণশীল ছিলেন। তিনি বরাবর মাদ্রাসা শিক্ষার সপক্ষে ছিলেন। ১৮৮০ সালে মুসলমান শিক্ষা বিষয়ক এক পুস্তিকায় সৈয়দ আমীর হোসেন মাদ্রাসা তুলে দিয়ে আধুনিক কলেজ করার পরামর্শ দিলে আবদুল লতিফ মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির সভা করে এর প্রতিবাদ করেছিলেন।[৬] লতিফের মৃত্যুর পর তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র আবদুর রহমান পিতার আদর্শ রক্ষা করে চলেন এবং মহামেডান লিটারেরি সোসাইটির মাধ্যমে মাদ্রাসা পদ্ধতির শিক্ষার সপক্ষে ওকালতি করনে। হুগলী মাদ্রাসার রিপোর্টে আরবি ফারসি শিক্ষার সপক্ষে যুক্তি দেখিয়ে লতিফ বলেছিলেন, "Unless a Mahomedan is a Persian and Arabic scholar, he cannot attain a respectable position in Mahomedan society ; i. e., he will not be regarded or respected as a scholar, and unless he has such a position, he can have no influence in the Mahomedan Community. Consequently a Mahomedan who has received an English education, and has omitted the study of the Persian and Arabic, is little able to impart the benefit of that education to the members of his community. But, if he knows Persian and Arabic along with English, he acquires infiuence in society and is of course sure to use his influence in the interests of the Government. The Government should, therefore, in my humble opinion,devise such means whereby the Mahomedans may be taught at once English and Persian and Arabic"[৭] আবদুল লতিফের এই উক্তির মধ্যে সেকালের শরিফ মুসলমানদের শিক্ষা সম্পর্কে মনোভাবটি ব্যক্ত হয়েছে। তিনি নিজেও সে মনোভাবের ধারক ছিলেন। 'হিতকরী' পত্রিকায় (১০ পৌষ ১২৯৭) 'আমাদের শিক্ষা' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে মীর

Syed Ameer Hossein --A *Pamphlet on Mohammadan Education in Bengal*, Bose Press, Calcutta, 1880
Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents, p. 23

মশাররফ হোসেন বলেছেন, "সমাজের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। ... সমাজে ছাত্রবৃত্তির আদর নাই, এন্ট্রান্সেরও সেই দশা। জাতীয় বিদ্যায় আলাপ জাতীয় রীতিনীতি পদ্ধতি রক্ষা করিতে না পারিলে, না জানিলে, এক প্রকার বিপদ, অপ্রস্তুতের একশেষ। কাজেই উর্দু, ফারসি শিক্ষার নিতান্তই প্রয়োজন। শুধু ইংরাজি শিখিলে আমাদের কোন লাভ নাই। ইংরাজির সঙ্গে সঙ্গে সমাজ আদৃত, সমাজ প্রচলিত উর্দু ফারসি শিক্ষা অতীব প্রয়োজনীয় ; উর্দু ফারসি শিক্ষা অবহেলা করিয়া, শুধু ইংরাজি, কি কেবলই বাঙ্গালা শিক্ষা করিলে সমাজে মুখ পাইবার উপায় নাই। বাধ্য হইয়া প্রথম শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উর্দু ফারসি শিক্ষা করা সর্বতোভাবে আবশ্যক।"[৮] মীরের এই উক্তিতে আবদুল লতিফের বক্তব্যের প্রতিফলন আছে।

পাশ্চাত্য বিদ্যা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে দেশবাসীর আগ্রহ বাড়াবার জন্য আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' স্থাপন করেছিলেন। সোসাইটির মাসিক, বার্ষিক, বিশেষ, জরুরী সব রকম সভায় আলোচনায়, বক্তৃতায়, প্রবন্ধ পাঠে ইংরাজি, উর্দু, আরবি ও ফারসির ব্যবহার হত, সেখানে বাংলার স্থান একেবারেই ছিল না। সোসাইটির প্রতিষ্ঠার দিন প্রথম সভায় (২ এপ্রিল ১৮৬৩) আবদুল লতিফ সোসাইটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে ফারসিতে প্রবন্ধ পাঠ করেন। সোসাইটির পঞ্চম অধিবেশনে এফ. জি. তীলে সাহেব 'বিদ্যুৎ ও বৈদ্যুতিক তারবার্তা' সম্পর্কে ইংরাজিতে প্রবন্ধ পাঠ করলে আবদুল লতিফ উপস্থিত শ্রোতার কাছে বোধগম্য করে তোলার জন্য তা উর্দুতে আক্ষরিক অনুবাদ করে শোনান। আবদুল লতিফের ব্যক্তিগত সব রচনা হয় ইংরাজিতে অথবা ফারসিতে লেখা হয়। ১৮৬৩ সালে আলিপুরে সরকারি উদ্যোগে প্রথম কৃষিপ্রদর্শনী মেলা হয়। প্রদর্শনী কমিটির সদস্য হিসাবে আবদুল লতিফ মেলার উদ্দেশ্য ও উপযোগিতার বিষয় তুলে ধরে উর্দুতে প্রচারপুস্তিকা লেখেন, স্যার সিসিল বীডন সেটি অনুমোদন করেন এবং বাংলায় তর্জমা করার পরামর্শ দেন। আবদুল লতিফ আত্মজীবনীতে লিখেছেন, I translated it into Bengali, and circulaterd several thousands of copies in the Mofussil with the best results."[৯] সম্ভবত এটিই আবদুল লতিফের বাংলাচর্চার একমাত্র নিদর্শন। আবদুল লতিফ ভাল বাংলা জানতেন বলে 'রইস ও রায়ত' (১৫ই জুলাই ১৮৯৩) পত্রিকায় লেখা হয়। মীর মশাররফ হোসেন তাঁর 'বসন্তকুমারী নাটক' (১৮৭৩) আবদুল লতিফকে উৎসর্গ করেন। সেখানে তিনি বলেছেন যে, আবদুল লতিফ 'বঙ্গ সাহিত্যের প্রতি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন' করতেন। সুতরাং আবদুল লতিফ বাংলা ভাষা জানতেন। বাংলা সাহিত্যের প্রতিও তাঁর অনুরাগ ছিল। ১৮৮২ সালে হান্টারের শিক্ষা কমিশনের কাছে পরামর্শপত্রে মধ্যবিত্ত ও উচ্চ শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম উর্দু এবং গ্রামের নিম্ন শ্রেণীর মুসলমানদের শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা বলে অভিমত জ্ঞাপন করেন। আবদুল লতিফের ভাষায়, "Briefly summerised my opinion as

৮. *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ: ৩২৬ (২য় সং)
৯. Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents, p. 174

regards Bengal, is that Primary instruction for the lower classes of the People, who for the most part are ethnically allied to the Hindoos, should be in the Bengali Language--purified, howerver, fr0m the superstructure of Sanskritism of learned Hindoos and supplemented by the numerous words of Arabic aud Persian Origin which are current in everyday speech : for this the Bengali of the Law-Courts furnishes a good example.

For the middle and the upper classes of Mahomedans, the Urdoo should be recogised as the vernacular. . . The middle and upper classes of Mahomedans are descended from the original conquerors of Bengal, or the pious, the learned and the brave men, who were attracted from Arabia, Persia and Central Asia to the Service of the Mahomedan Rulers of Bengal ; or from the Principal Officers of Government, who. . . were appointed and sent from the Imperial Court, many of whom permanently settled in these parts. All these, for the most part, naturally retain the Urdoo as their vernacular."[১০]

এটি ছিল মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্পর্কে কমিশনের চতুর্থ জবাব। তিনি বাংলার মুসলমানদের ভাষার সঙ্গে জাতিকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। বাঙালি মুসলমানদের বাংলা, বাঙালি হিন্দুর বাংলা অভিন্ন নয়, মুসলমানের বাংলা সংস্কৃতের প্রভাবমুক্ত ও আরবি–ফারসি শব্দযুক্ত হবে। শিক্ষা, ভাষা, বিদ্যাচর্চা সম্পর্কে আবদুল লতিফের এই ধারণাকে সেকালের প্রভাবশালী সমাজপতিদের ধারণা বলে ধরা যায়। এটা যে সেকালের সাংস্কৃতিক সংকট, তাতে সন্দেহ নেই। এই সংকট বাংলার মানুষের জন্য কি ফল নিয়ে এসেছিল সে সম্পর্কে মন্তব্য করে বদরুদ্দীন উমর বলেন, "বাংলাদেশের মুসলমানেরা আরও বেশ কিছুকাল মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করে শুধু আরবি, ফারসি, উর্দু জবান রপ্ত করার চেষ্টা চালালেন। তার ফলে ইংরেজি শাসনের নতুন কাঠামো এবং আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে জীবিকার উপযুক্ত সংস্থানের অভাবে এ জাতীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত মুসলমানেরা মাদ্রাসা–মক্তবে মৌলবীগিরি, মসজিদে ইমামতী, পীর–মুর্শিদী ইত্যাদি দ্বারা জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হলেন এবং সমগ্র মুসলমান সমাজের আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রগতিকে দারুণভাবে ব্যাহত করলেন।" [১১]

আবদুল লতিফের পরেই সৈয়দ আমীর আলীর স্থান। তাঁর পিতা সাদত আলী ছিলেন আযোধ্যার অধিবাসী, তিনি অযোধ্যা থেকে উড়িষ্যা হয়ে চুঁচুড়ায় বসতি স্থাপন করেন। আমীর আলীর জন্ম উড়িষ্যার কটকে। তিনি এক পুরুষে উর্দু জবান ছেড়ে বাংলা ধরতে পারেন না। রংপুরের শেখ রেয়াজুদ্দীন আহম্মদকৃত 'আরবজাতির ইতিহাস' (১খণ্ড,

---

১০. *Ibid.*, p. 225

১১. বদরুদ্দীন উমর—*পূর্ব বাংলার সংস্কৃতিক সংকট*, নবজাতক প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ: ১১

১৩১৭) পড়ে আমীর আলী লণ্ডন থেকে এক পত্রে (২৮ সেপ্টেম্বর ১৯১১) তাঁকে লিখেছিলেন, "বাংলা ভাষায় আমার সীমাবদ্ধ জ্ঞান নিয়ে বিচার করে বলা যায়, আমার শর্ট হিষ্টরি অব দি সারাসীনস্ গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের বঙ্গানুবাদ অপূর্ব হয়েছে।"[১২] আমীর আলী বাংলা শিখেছিলেন, কিন্তু বাংলা ভাষাচর্চা করেননি। তাঁর দৃষ্টি ছিল সমস্ত ভারতের মুসলমানের কল্যাণের উপর। তাঁর সমস্ত রচনা ইংরাজিতে লেখা যেগুলিতে ইসলামের গৌরব ও মাহাত্ম্যের কথা আছে। তিনি সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন গঠন করে নব্যশিক্ষিতদের রাজনৈতিকভাবে সচেতন করে তুলেছিলেন। এসোসিয়েশনের কাজকর্ম ইংরাজি ও উর্দুতে সম্পন্ন হত। সেখানে বাংলার স্থান ছিল না।

হুগলীর দেলওয়ার হোসেন আহমদ, কুমিল্লার সিরাজুল ইসলাম ও সৈয়দ শামসুল হোদা, শ্রীহট্টের আবদুল করিম, মেদিনীপুরের আবদুল রহিম ও ওবায়দুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী, বর্ধমানের আবদুল জব্বার খান বাহাদুর সরকারি অফিস, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান এবং সভা-সমিতিতে প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁরা উর্দুর সমর্থক ছিলেন। আবদুল করিম বিএ পাশ করে (১৮৮৫) 'দারুল সলতানত' নামে উর্দু পত্রিকার সম্পাদক হন। 'ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্বের ইতিহাস' গ্রন্থখানি ইংরাজি, বাংলা, উর্দু তিন ভাষাতেই রচনা করেন।[১৩] মোহাম্মদ ইউসুফ উত্তর প্রদেশ ও সৈয়দ আমীর হোসেন বিহারের অধিবাসী ছিলেন, তাঁরা কর্মোপলক্ষে দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় ছিলেন। কোন কোন বিষয়ে তাঁরাও সমাজে নেতৃত্ব দেন। প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট আবদুর রহিমের উদ্যোগে কলকাতা মুসলমান শিক্ষাসভার একটি অধিবেশনে কড়েয়া অঞ্চলে একটি মক্তব প্রতিষ্ঠা এবং সেখানে শিক্ষা দান বিষয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে কলকাতা মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এডওয়ার্ড ডেনিসন রস (১৯০৩-১১) একটি প্রস্তাবে বলেন, "মক্তবে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। কেননা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিলে মুসলমানের জাতীয়তা অর্ধেক বিনষ্ট হইবে এবং বাঙলা ভাষা মুসলমানদিগকে হীনবীর্য করিয়া ফেলে।"[১৪] উক্ত সভায় সৈয়দ আমীর আলী, স্যার আবদুর রহিম, সৈয়দ শামসুল হোদা, দেলওয়ার হোসেন আহমদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। মি. রস-এর প্রস্তাবটি সর্বসম্মতি ক্রমে গৃহীত হয়। উপস্থিত বাঙালি সভ্যগণ যে মি. রসের সাথে অভিন্ন মত পোষণ করতেন এতে তাই প্রমাণিত হয়। মিহিরের সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম বলেছেন, "বাঙ্গালাকে একটা ভাষা বলিতে যাও, তাহাতেই অনেকের আপত্তি আছে। বিশেষ ওপাড়ার কয়েকজন নবাব বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, ডাক্তার, কবিরাজ ও অনেক বড় বড় x y z এঁরা পর্যন্ত ইহাকে এখনও ভাষা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। সুতরাং তাহার সাহিত্য এবং তাহার আবার চর্চা, এ সম্পূর্ণ বাতুলতা।"[১৫] মোজাফফর আহমদ একটি প্রবন্ধে উর্দুপন্থীদের সম্পর্কে বলেছেন,

১২. শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ--*আরব জাতির ইতিহাস* , ২য় খণ্ড, ব্রাহ্মণমিশন প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯

১৩. Muhammad Ali Azam--*Life of Moulvi Abdul Karim*, p. 37

১৪. *মিহির ও সুধাকর*, ১৩ আষাঢ় ১৩০৯

১৫. *মিহির*, জানুয়ারি ১৯৮২

"কতিপয় অবাঙালী মোসলমান কার্যব্যাপদেশে কলিকাতা শহরে বাস করেন। অনেকে স্থায়ী অধিবাসীও হইয়া গিয়াছেন। ইহারা মাতৃভাষা উর্দুর উন্নতির জন্য চেষ্টা করিতেছেন। কিন্তু উর্দুভাষীরা যে বাংলাদেশের মোসলমানদিগের মধ্যে বাংলার পরিবর্তে উর্দু ভাষা চালাইবার চেষ্টা করেন এইটা তাহাদের বড় অন্যায়। এইরূপ চেষ্টা যাঁহারা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সঙ্গে আবার একদল 'ফেউ' আছেন। এই 'ফেউরা' প্রায় খাঁটি বাঙালী।"[১৬] মোল্লারাও উর্দু সমর্থন করতেন। মোজাফফর আহমদ বলেন, "আর একদল লোক আছে, যাহারা বক্রাক্ষর দেখিলেই আত্মহারা হইয়া যায়। অর্থাৎ আরবি অক্ষরে যাহাই লিখিত হউক না কেন তাহাদের নিকট তাহাই সত্য, তাহাই পবিত্র উর্দু যখন আরবি অক্ষরে লিখিত হয় তখন ইহার সব কথাই ধর্মের কথা। ... আবার কেউ কেউ মনে করেন উর্দু সাহিত্য উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাই বাঙালি মোসলমান মাত্রেরই উর্দু শেখা উচিত। তাহা না হইলে তাঁহারা ইসলামী সভ্যতা হইতে বঞ্চিত থাকিবে।"[১৭] কলিকাতা, হুগলী, ঢাকা, রাজশাহী ও চট্টগ্রাম মাদ্রাসাগুলি ঐ সব মোল্লা তৈরি করত। ইংরাজি ও বাংলা বিদ্যা না থাকায় তাঁরা সরকারি চাকুরি পেতেন না। তাঁরা গ্রামে ফিরে গিয়ে মক্তব-মাদ্রাসায় ধর্মশিক্ষা দান,সামাজিক অনুষ্ঠনাাদি পালন এবং জলসা-মিলাদ মহফিলে ওয়াজ-নসিহত করতেন। তাঁরা শহরের রইসদের অনুকরণে উর্দুতে কথাবার্তা বলে প্রসাদ লাভ করতেন। 'নুর-অল-ইমান' উর্দুপন্থী বাঙালি অনুগতদের 'খেদদমৎগার' নামে চিহ্নিত করে মন্তব্য করেন, "শরীফ সন্তানেরা এবং তাঁহাদের খেদমৎগারগণ উর্দু বলেন, বাঙ্গালা ভাষা ঘৃণা করেন, কিন্তু সেই উর্দু জবানে মনের ভাব প্রকাশ করা দূরে থাকুক, পশ্চিমা লোকের লিখিত চবিত শব্দগুলিও অনেকে যথাস্থানে শুদ্ধ আকারে যথার্থ অর্থে প্রয়োগ করিতেও অপারগ। অথচ বাঙ্গালায় মনের ভাব প্রকাশ করিবার সুবিধা হইলেও, ঘৃণা করিয়া তাহা হইতে বিরত হন।" [১৮]

শেখ আবদোস সোবহান বাংলার মুসলমান জমিদারদের বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অজ্ঞতার ও বিরূপতার সমালোচনা করে বলেন, "আপনারা (জমিদারগণ) কেহ কেহ, কখনও কখনও বলিয়া থাকেন 'আমরা আসল বিলাতি আশরাফ ...দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের বংশ হিন্দুস্থানে আসিয়াছে , আমরা কি বাঙ্গলা শিক্ষা করিতে পারি। বাঙ্গালা কি আলীমান্দান মোসলমানের জন্য?...বাঙ্গালার উপরই আপনাদের সমস্ত বিষয়কার্য, পত্র, পত্রোত্তর নির্ভর করিতেছে— কেবল তাহাতে আপনার নামের পারসির গুটী চারি 'তোগরা' অক্ষর দ্বারা স্বীয় শিয়রে কুঠারাঘাত করিতেছেন—তাতেও আবার বাঙ্গালার প্রতি ঘৃণা?"[১৯]

১৬. মোজাফফর আহমদ—'উর্দু ভাষা ও বঙ্গীয় মোসলমান', *আল এসলাম*, শ্রবণ ১৩২৪

১৭. ঐ, *আল এসলাম*, শ্রাবণ ১৩২৪

১৮. *নুর-অল-ইমান*, ভাদ্র ১৩০৭

১৯. *সেখ আবদোস সোবহান—হিন্দু মোসলমান* , ভিক্টোরিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৮, পৃ: ৯৭

কোন কোন বাংলার লেখকও উর্দুর প্রতি নমনীয় মনোভাব পোষণ করতেন। তাঁরা উর্দুকে 'লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা' বা সর্বভারতীয় মুসলমানের ভাবের আদান-প্রদানের মাধ্যম বলে মনে করতেন। তাই তাঁরা বাঙালি মুসলমানদের জন্য উর্দু চর্চাকে জিইয়ে রাখতে চেয়েছেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মিলনে' (১৩২৫) সভাপতির অভিভাষণে মোহাম্মদ আকরম খাঁ বলেন, "...উর্দু আমাদের মাতৃভাষাও নহে, জাতীয় ভাষাও নহে। কিন্তু ভারতবর্ষে মোসলেম জাতীয়তা রক্ষা ও পুষ্টির জন্য আমাদের উর্দুর দরকার।"[২০] সবচেয়ে আপত্তিজনক মন্তব্য করেছেন মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ তাঁর 'হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা' (১৯২৭) গ্রন্থের ভূমিকায়। তিনি লিখেছেন, "উর্দু ভাষা না থাকিলে আজ ভারতের মোসলমানগণ জাতীয় ভাবহীন ও কিরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হইত, তাহা চিন্তা করিবার বিষয়। বাঙ্গালা দেশের মোসলমানদিগের মাতৃভাষা বাঙলা হওয়াতে বঙ্গীয় মোসলমান জাতির সর্বনাশ হইয়াছে। এই কারণে তাহারা জাতীয়তা বিহীন, নিস্তেজ, দুর্বল ও কাপুরুষ হইয়া গিয়াছে। ... বঙ্গের প্রায় সাড়ে তিন কোটি মোসলমান সংস্কৃত বা প্রাকৃতমূলক বাঙলা লইয়া একেবারে মাটি। ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মোসলমানগণ হইতে তাহারা এই ভাষা বিভ্রাটে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে।"[২১] এই উক্তিতে মি. রসের অভিমতের প্রতিধ্বনি রয়েছে।

অক্ষয়কুমার সরকার ও মুহম্মদ এনামুল হকের মন্তব্যের প্রকৃত পটভূমি ছিল এটাই। ভাষা সম্পর্কে এরূপ প্রতিকূল মনোভাবের সম্মুখীন হয়ে সে যুগের বাংলার লেখকগণকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পক্ষে লেখনি ধারণ করতে হয়েছিল। বাংলা সাময়িকপত্রের মাধ্যমে এ আন্দোলনটি জোরদার হয়। উনিশ শতকের নয় দশকের গোড়া থেকেই মুসলমান সম্পাদিত সাময়িকপত্রের সংখ্যা বেড়ে যায়। পত্রিকাগুলি অনুষ্ঠানপত্রে, সম্পাদকীয় নিবন্ধে এবং প্রবন্ধাবলীতে বাংলা– উর্দুর দ্বন্দ্বের কথা তুলে মাতৃভাষা বাংলাকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। 'হিতকরী' (১০ পৌষ ১২৯৭) পত্রিকায় 'আমাদের শিক্ষা' প্রবন্ধে মীর মশাররফ হোসেন বলেন, "বঙ্গবাসী মুসলমানদের দেশভাষা বা মাতৃভাষা 'বাঙ্গলা'। মাতৃভাষায় যাহার আস্থা নাই, সে মানুষ নহে। বিশেষ সাংসারিক কাজ কর্মে মাতৃভাষারই সম্পূর্ণ অধিকার । মাতৃভাষায় অবহেলা করিয়া অন্য ভাষায় বিখ্যাত পণ্ডিত হইলেও তাহার প্রতিপত্তি নাই। ইস্তক ঘরকন্যার কার্য, নাগাএদ রাজসংশ্রবী যাবতীয় কার্যে বঙ্গবাসী মুসলমানদের বাঙ্গালা ভাষার প্রয়োজন।[২২] মাতৃভাষায় আস্থাহীন ব্যক্তি 'মানুষ' নয়—এরূপ আক্রমণ তিনিই প্রথম করেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বাংলা ভাষার একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বাংলা ভাষা যে বাঙালি মাত্রেরই মাতৃভাষা, সে বিষয়ে তাঁর সংশয় ছিল না। দৈনন্দিন কাজকর্মে

২০. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মাঘ ১৩২৫
২১. মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ—*হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা*, সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা ১৩৫৫ (৪সং) 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
২২. *আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা*, পৃ: ৩২৭

কথাবার্তায় যে মাতৃভাষা মাতৃস্তন্যের মত পান করা হয়, সে ভাষা ত্যাগ করে তার স্থলে অন্য যে কোন ভাষার চিন্তা করাকে তিনি 'মূর্খের কল্পনা' বলে মনে করেছেন : এমন কি তিনি বাংলা ভাষার কোনরূপ বিকারও পছন্দ করেননি ; সম্ভবত তিনিই প্রথম বঙ্গদর্শনের ইঙ্গিতটি বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি বলেন, "কোন অধঃপতিত সমাজের বা জাতির যদি কখনও কিছু হওয়ার আশা থাকে, তবে তাহা জাতীয় ভাষার সহায়তাতেই হইবে, অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। বঙ্গভাষা ত্যাগ করিতে গেলে একই ভাগ্যসূত্রে গ্রথিত আমাদের হিন্দু ভ্রাতৃগণকেও ত ত্যাগ করা হইবে।...যাহাই বলুন না কেন? হিন্দু মুসলমান একই পাদপের দুইটি প্রধান শাখা বা একই দেহের দুইটি অবয়ব ভিন্ন আর কিছুই নহে।"[২৩] সমাজের এই দেহে যারা ফাটল ধরাতে চায়, আবদুল করিম তাদের 'স্বদেশদ্রোহী' ও 'স্বজাতিদ্রোহী' বলে অভিহিত করেছেন। জাতীয় ভাষার নামে মাতৃভাষাকে যারা বিকৃত করতে যায়, তিনি তাদের 'বকধার্মিক স্বজাতিহিতৈষী' বলে চিহ্নিত করেছেন। "বঙ্গভাষা দেবভাষা সংস্কৃতের দুহিতা হইলেও মুসলমানধাত্রীর ক্রোড়াশ্রয়েই ইহা প্রতিপালিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে।" সুতরাং বাংলা ভাষা হিন্দু-মুসলমানের যৌথ সম্পদ, একে পরিত্যাগ করার অর্থ 'স্বাধিকারচ্যুত্য' হওয়া।[২৪]

'নবনূর' পত্রিকার সম্পাদক সৈয়দ এমদাদ আলী বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়চিত্ত ছিলেন। তিনি বলেছেন দেশের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা, এ ভাষা ব্যতীত 'আমাদের ন্যায় গরীব দুঃখীদের গত্যন্তর ও মত্যন্তর' নেই। লেখকের মতে উচ্চপদ বিশিষ্ট অনেক মুসলমান বাংলাকে মাতৃভাষা রূপে স্বীকার করতে চান না, তাঁরা উল্টো উর্দুকে বাঙালির মাতৃভাষার আসন দিতে চান। তাঁদের মতে, বাংলা 'ভীরুর ভাষা', সমগ্র ভারতে মুসলমানদের একই ভাষা হবে এবং সেটি হবে উর্দু।[২৫] সৈদয় এমদাদ আলী এমতের বিরোধিতা করে বলেন, "যে ভাষা ধীরে ধীরে সামান্য মুসলমান কৃষকদিগকে আপনার আয়ত্তাধীন করিয়া ফেলিয়াছে, সেই ভাষাকে স্থানচ্যুত করিয়া অন্য ভাষার প্রচলন করা কি সম্ভবপর?...বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে শিক্ষার প্রতি যে একটা পরিবর্ধমান টান অধুনা পরিলক্ষিত হইতেছে, তাহার বেগ রুদ্ধ হইয়া যাওয়া বিচিত্র নহে। এতদিনে মোহনিদ্রা পাশ ছিন্ন করিয়া আজ যদি সমাজ শিক্ষার জন্য জাগিয়া উঠিয়াছিল, তবে তাহার সেই গতিরোধ করিবার জন্য আমাদের সমাজে তথাকথিত নেতাগণের এই বৃথা সংকল্প কেন?"[২৬] সৈয়দ এমদাদা আলীর দৃষ্টি ছিল বাস্তব—ভাষার সঙ্গে শিক্ষা এবং শিক্ষার সঙ্গে উন্নতি জড়িত, ভাষাসমস্যার কথা তুলে সমাজে শিক্ষা ও উন্নতি ব্যাহত করা অবিবেচকের কাজ হবে। 'মাতৃভাষা ও জাতীয় উন্নতি' শীর্ষক একটি প্রবন্ধে ইসমাইল হোসেন সিরাজী মাতৃভাষার সেবা ও জাতীয় উন্নতি

২৩. আবদুল করিম—'যোগ কালন্দর', *ইসলাম প্রচারক* , জানুয়ারি ১৯০৩ পৃঃ ২১-২২
২৪. আবদুল করিম—বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানী প্রভাব, নবনূর, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১, পৃ: ৫৯
২৫. *নবনূর,* পৌষ ১৩১০, পৃ: ৩৪৮
২৬. *ঐ, পৃঃ* ৩৪৪

সাধনকে অভিন্ন দৃষ্টিতে দেখেছেন। তাঁর মতে "মাতৃভাষা প্রাণের ভাষা—ইহা পবিত্র ও পূজ্য। ইহার সেবা না করিলে ঘোরতর অধর্ম হয়।"[২৭] সমাজে ইংরাজির মত বাংলা শিক্ষাও অধর্ম ছিল।[২৮] এখন বাংলা শিক্ষা না করলে অধর্ম হবে— সমাজে এ দাবি উঠেছে। সমাজে পরিবর্তনটি এভাবে সূচিত হচ্ছে। মাতৃভাষা হিসাবে বাংলাকে স্বীকৃতি দান এবং সে ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালি মুসলমানের জাতীয়তাবোধের প্রথম উন্মেষ হয়।

বাংলা–উর্দু ভাষা কেন্দ্রিক বিতর্কের সঙ্গে আরবি-ফারসি-সংস্কৃত শব্দ কেন্দ্রিক বিতর্ক শুরু হয়। এ বিতর্ক হিন্দু সমাজেও সম্প্রসারিত হয়। হিন্দু লেখকগণের সংস্কৃত শব্দ বহুল বাংলা নয়, মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনে আরবি-ফারসি শব্দ মিশ্রিত যে ভাষা ব্যবহৃত হয়, সে ভাষায় সাহিত্য রচনা করতে হবে। বলতে গেলে, আবদুল লতিফ এই হান্টার কমিশনকে প্রদত্ত উত্তরপত্রে বিতর্কের সূচনা করেন। তিনি আরবি-ফারসি শব্দের মিশ্রণ দ্বারা বাংলা ভাষার একটা 'মুসলমানী চরিত্র' দাঁড় করাতে চেয়েছেন। এর ফলে নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদের পক্ষে ধর্মশিক্ষা সহজ হবে এবং উচ্চ ও মধ্যবিত্তের সংস্কৃতির সহিত সংযোগ স্থাপিত হবে। সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী 'ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল' (১৯০০) গ্রন্থে বাংলা স্কুলের পাঠ্যপুস্তকের সংস্কৃতঘেঁষা বাংলার বিরোধিতা করেছেন।[২৯] বাংলার মুসলমান লেখকেরা এই ভাবদ্বন্দ্বে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁরা কেউ কেউ একটা স্বতন্ত্র 'জাতীয় ভাষা' সৃষ্টির স্বপ্ন দেখেছিলেন। যেহেতু ইসলামের ধর্মবিশ্বাস ও রীতিনীতি মুসলমানদের সামাজিক জীবনে প্রতিফলিত হয়, সেহেতু আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার কতক ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ে। ধর্মসম্পৃক্ত কতকগুলি শব্দের পরিভাষাও সম্পূর্ণ অচল। 'দুগ্ধ-সরোবর' (১৮৯১) নামে একখানি সমাজ উন্নয়নমূলক 'কওমী পুস্তিকা' প্রণয়ন করেন মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী। গ্রন্থে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার আছে। ইউসুফ আলী বলেছেন, "বহু শতাব্দি হইতে যে সকল আরবি, ফারসি, হিন্দি ইত্যাদি নানা ভাষার শব্দ নানা কারণে বাংলার গ্রাম্য অধিবাসীর প্রচলিত ভাষার সহিত রক্ত মাংসের ন্যায় মিশিয়া গিয়াছে, সেই সকল শব্দের কিছু কিঞ্চিৎ দুগ্ধ-সরোবরে ব্যবহার করা হইয়াছিল, তজ্জন্য সেই দুগ্ধ-সরোবর সামালোচনা কালে কোন খবরের কাগজওয়ালা হিন্দু ঠাট্টা করিয়া বলিয়াছিলেন, মুসলমানের বাবুর্চিখানায় পক্ক দুগ্ধ হিন্দুর অস্পৃশ্য, এই জন্য আমরা এ দুগ্ধের আস্বাদ লইতে পারিলাম না।"[৩০] মির্জা ইউসুফ আলী এটাকে সহজভাবে নিতে পারেন নি। তাঁর সম্পাদনায় নুর-অল-ইমান পত্রিকা

---

২৭. *ইসলাম প্রচারক*, জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি ১৯০২

২৮. বাংলা ইংরাজি পড়া কহয়ে 'হারাম'
বাঙ্গালাব মোল্লাদের্র চরণে সালাম।
—ইসমাইল হোসেনে শিরাজী
ইসলাম প্রচারক, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০১, পৃ: ৩০৮

২৯. Vernacular Education in Bengal, p. 10

৩০. ভাষা সম্বন্ধে নুর-অল-ইমানের কৈফিয়ৎ, *নুর-অল-ইমান*, শ্রাবণ ১৩০৭

প্রকাশিত হলে তার মাধ্যমে তিনি কৈফিয়ৎ স্বরূপ কতকগুলি বক্তব্য তুলে ধরেন। তাঁর ভাষায় : ৩১

> "আমরা মোসলমান। আমরা নিজে, আমাদের পরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ, আমাদের দাস-দাসী, গোলাম-বান্দী, পাড়া-পড়শী সকলে বাঙলা ভাষার যে শব্দ আরামের সাহিত মনের ভাব প্রকাশ করিতে ব্যবহার করিয়া থাকি, সেইরূপ শব্দ ইহার মধ্যে বেশ থাকিবে।
>
> বর্তমান বঙ্গভাষার জনক, প্রাতঃস্মরণীয়, মহাত্মা বিদ্যাসাগর যখন স্বহস্তে বঙ্গভাষার অঙ্গে বেশভূষা পরাইয়া দিতেছিলেন, তিনি 'বাদশার' 'দরবারে' 'মেজর' 'বন্দোবস্ত' না করিয়া 'রাজাধিরাজ চক্রবর্তী রাজসভায়' 'উচ্চ কাষ্টমঞ্চের আয়োজন' দ্বারা বঙ্গভাষার কোমল বাল্যপদে কঠিন লৌহ শৃঙ্খল পরাইতে নারাজ ছিলেন।
>
> করুণাময় অনুগ্রহ করিলে, নুর-অল-ইমান বঙ্গভাষার কমনীয় জোলফে বসরার গোলাপ ফুলের মালা ঝুলাইয়া দিতে পারে।"

পত্রিকায় আরও লেখা হয়, "বাঙ্গালা পাঠশালায় হিন্দু শিক্ষকের নিকট হিন্দুর প্রণীত পুস্তক পাঠ করিয়া যাঁহারা বাঙ্গালা শিখিয়াছেন, তাঁহারা তোতা পাখীর মত সংস্কৃতমূলক সাধু বাঙ্গালা শিখিয়াছেন। বলিবার সময়ে ও লিখিবার কালে সংস্কৃত পণ্ডিতগণের 'এস্তেমালী' সাধু ভাষা শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। ইসলাম ধর্মের সহিত অপরিবর্তনীয় সম্বন্ধবদ্ধ ওজু, গোসল, ফরজ, ওয়াজেব, হালাল, হারাম, আল্লাহ, রসুল ইত্যাদি শব্দগুলিও যাবনিক বলিয়া ঘৃণা করেন এবং তৎসমুদয়ের সংস্কৃতমূলক সাধু বাংলায় তর্জমা করিয়া ব্যবহার করিয়া থাকেন।...সতেজ স্বাভাবিক বাঙ্গালা ভাষা স্বাধীনতা পাইলে তৎসঙ্গে পল্লীবাসী মোসলমান সমাজের উন্নতির যুগান্তর উপস্থিত হইবে। ...বাঙ্গালা ভাষাকে হিন্দুর ভাষা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া আপনাদের অবস্থা ও সময়ের উপযোগী করিয়া লউন।"৩২ 'মাতৃভাষা ও বঙ্গ মুসলমান' প্রবন্ধে সৈয়দ এমদাদ আলী যা বলেছেন তাতে মুসলমানদের জন্য আলাদা ভাষার আভাসটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি লিখেছেন, "এই বঙ্গভাষা রূপ নূতন দুর্গের মধ্যে আমরা নিরাপদে আমাদের নিজেদের জন্য স্বতন্ত্র স্থান করিয়া লইতে পারি এবং তাহা করাই আমাদের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। নতুবা হিন্দু-ভাব ও হিন্দু আদর্শপূর্ণ সাহিত্য পাঠে মুসলমান সমাজ ক্রমে ক্রমে নিজেদের বিশেষত্ব বর্জিত হইয়া এক অদ্ভুত মূর্তি পরিগ্রহ করিবে।... ইহাতে মুসলমান সমাজ প্রচলিত বঙ্গভাষা হিন্দুর ভাষা হইতে একটু স্বতন্ত্র হইয়া পড়িবে, কিন্তু তাহাতে বঙ্গভাষার বা বঙ্গদেশের কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং বল সঞ্চয় হইবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। কারণ সমাজ বিশেষের ছাপ বক্ষে ধারণ করিলেও বঙ্গভাষা বঙ্গভাষাই রহিয়া যাইবে।"৩৩ ইসলাম-

৩১. *সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত*, পৃ: ৩২৮-২৯
৩২. *নুর-অল-ইমান*, ভাদ্র ১৩০৭
৩৩. *নবনুর*, পৌষ ১৩১০, পৃঃ ৩৪৯

প্রচারকের সম্পাদক মোহাম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদের বক্তব্যেও অনুরূপ ধ্বনি শোনা যায়। তিনি লিখেছেন, "যেদিন আমরা এই মাতৃভাষা বাঙ্গালায়, জাতীয় ভাষা আরবি, ফারসি, উর্দু প্রভৃতি হইতে জাতীয় বহুল শব্দ, জাতীয় ভাব, জাতীয় তেজ, জাতীয় ধর্মপ্রাণতা আনয়ন করিতে পারিব, সেইদিন এই মাতৃভাষা দ্বারা আমরা যথোচিত ফল লাভ করিতে সক্ষম হইব। ... আরবি, ফারসি, উর্দু ভাষার আলোচনা এদেশ হইতে উঠিয়া গেলে, আমরা জাতীয়ত্ব হারাইয়া সম্পূর্ণ হিন্দু হইয়া পড়িব, তাহা হইলে কালে বৌদ্ধদিগের ন্যায় আমাদিগের অস্তিত্ব হিন্দু দিগের মধ্যে বিলীন হইয়া যাইবে।"[৩৪] উক্তিগুলিতে কেবল হীনমন্যতাবোধ ও প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব ফুটে উঠেনি, এর মধ্যে পশ্চাৎবর্তী মধ্যবিত্তের স্বার্থবুদ্ধিও ক্রিয়া করেছে। 'বঙ্গভাষা রূপ নূতন দুর্গে'র অবলম্বন চাওয়ার অর্থ হল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অপরাগতা। হিন্দুত্ব ভীতিকে ব্যবহার করা হয়েছে আবরণ হিসাবে।

ভাষা ও শব্দমালার মত সাহিত্যের বিষয় ও আঙ্গিক নিয়েও পত্র-পত্রিকায় আলোচনা হয়। 'মিহিরও সুধাকর' পত্রিকায় থিয়েটারের 'বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা' প্রকাশিত হয়। 'মিহির ও সুধাকরের রুচি-বিকৃতি' শিরোনামে এবনে মাআজ ইসলাম প্রচারকে কঠোর ভাষায় তার প্রতিবাদ লিখেন। লেখকের ধারণা, "নাট্যাভিনয় মানেই পাপানুষ্ঠানের প্রশস্ত দ্বার স্বরূপ। এই সংক্রামক বিষে এদেশের যুবদিগের যে মনে অনিষ্ট সাধান করিতেছে তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। এগুলি সাধারণতঃ ব্যভিচারাদি পাপের শিক্ষাক্ষেত্র।"[৩৫] এ ধরনের রচনা দ্বারা সমাজের ক্ষতির আশংকা করে তিনি আরও বলেছেন, "থিয়েটারের বিজ্ঞাপন ও সমালোচনা প্রকাশ দ্বারা যদি একটি মাত্র মুসলমানের দেহ কলঙ্কিত হয়, অধ্যাত্মিক অবনতি ঘটে, তবে কি স্বত্বাধিকারী ও সম্পাদক সাহেব দায়ী হইবেন না? পাপের প্রশ্রয় দান কিরূপ মহাপাপ, আমরা চৌধুরী সাহেবের শিক্ষাগুরু ও সভাসদ মৌলবী সাহেবদের নিকট ফতোয়া তলব করি।"[৩৬] থিয়েটার ও নাট্যমঞ্চের সঙ্গে নাট্যসাহিত্যের গভীর সম্পর্ক। সুতরাং নাট্যাভিনয়ের বিরোধিতা দ্বারা নাট্যশিল্পেরই বিরোধিতা করা হয়। নাচ-গানের মত যাত্রা-থিয়েটার ইসলাম ধর্মে অননুমোদিত, এরূপ বিশ্বাস থেকেই বিরোধী মনোভাবের উদ্ভব।

১৩০৭ সালের বৈশাখ মাসে 'লহরী' প্রথম প্রকাশিত হয়। উক্ত পত্রিকার সমালোচনা করে ইসলাম-প্রচারকের সম্পাদক মন্তব্য করেন, "সর্বপ্রথম মুসলমান কবির সম্পাদিত কবিতাময়ী মাসিক পত্রিকাখানি যে সর্বাঙ্গ সুন্দর হইবে সেই বিষয়ে আমাদের কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু সমাজের অবস্থা দেখিয়া ভয় ও ভাবনা হয়। বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ এখনও গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। শিক্ষিত নামে অভিহিত ব্যক্তিদিগকে জীবনীশক্তিশূন্য দেখিতেছি। আমরা নিখুঁত ইংরেজি ছাঁচে ঢালা কবিতার পক্ষপাতী নহি। মুসলমানদিগের ভাষা সমন্বিত কবিতাবলীও উপেক্ষার সামগ্রী নহে, ভরসা করি সুযোগ্য সম্পাদক সাহেব

৩৪. *ইসলাম-প্রচারক*, জানুয়ারি ১৯০৩, পৃ: ২১ (পাদটীকা)।
৩৫. ঐ, মার্চ-এপ্রিল ১৯০০, পৃঃ ২৮৫
৩৬. ঐ, মার্চ-এপ্রিল ১৯৮০

একথা স্মরণ রাখিবেন।"[৩৭] 'ইংরেজি ছাঁচে ঢালা কবিতা' বলতে সমালোচক সম্ভবত আধুনিক গীতিকবিতার কথা বুঝাতে চেয়েছেন। 'বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের'র বর্তমান অবস্থার কথা ভেবে তিনি 'ভাবময়ী' কবিতার বিরোধিতা করেছেন। সুপ্তিমগ্ন ও জীবনীশক্তিশূন্য জাতিকে জাগাতে হলে জাতীয় ভাবের উদ্দীপনাময়ী কবিতার প্রয়োজন, তিনি প্রকারান্তরে এটাই বলতে চেয়েছেন। প্রায় অনুরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী কল্পনাসর্বস্ব, সারবস্তুহীন, রসকল্প রচনার বিরোধিতা করেছেন। তিনি নিজেই একজন সৃষ্টিশীল লেখক, তৎসত্ত্বেও কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, সংগীত ইত্যাদি সুকুমার সাহিত্যের প্রয়োজনীয়তা অধঃপতিত সমাজের জন্য স্বীকার করেননি। যুগ ও সমাজের চাহিদা মিটাবার জন্য ঐ শ্রেণীর রচনা অপেক্ষা ধর্ম ও নীতিশিক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও ভাবোদ্দীপক রচনার উপযোগিতা অধিক বলে তিনি অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি 'সাহিত্যশক্তি ও জাতি সংগঠন' নামে একটি প্রবন্ধ 'নবনূরে' প্রকাশ করেন। জাতি সংগঠন ও সমাজ উন্নয়নের ক্ষেত্রে সাহিত্যশক্তির প্রয়োজন আছে, কিন্তু সকল শ্রেণীর সাহিত্য দ্বারা সেটি সম্ভব নয়। তাঁর মতে, 'সাহিত্যের মূল্য জগতের সমুদয় রাজকোষের ধনরত্নের অধিক।...পক্ষান্তরে কদর্য সাহিত্যের কুৎসিতভাব, কুকল্পনা এবং কুচিন্তার কলুষরাশি, জগতের সমুদয় পাপ প্রলোভন অপেক্ষাও ভায়াবহ'। তিনি 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ছড়াছড়ি' এবং 'গল্পগুজবের বাড়াবাড়ি' দেখে আশঙ্কা করে বলেছেন, "সাপ্তাহিক হইতে আরম্ভ করিয়া সাময়িক পত্রিকা পর্যন্ত প্রায় সমস্তই গাঁজাখুরী গল্প এবং নায়ক-নায়িকার উচ্ছৃঙ্খল প্রণয়যুগলের পূতিগন্ধে পরিপূর্ণ। ...উপন্যাস পাঠে যে উপকার, ইতিহাস, দর্শন, কাব্য, বিজ্ঞান, ধর্মনীতি, সমাজনীতি, জীবনী, প্রাণীতত্ত্ব ও উদ্ভিদতত্ত্বের আলোচনা কি তদপেক্ষা বহুল উপকারের আশা নাই?"[৩৮] হিন্দু লেখকের অনুকরণে মুসলমান লেখকের এমন 'কামিনী-কোমল উপন্যাস' এবং 'বনিতার ন্যায় কোমল কবিতা' লেখা উচিত নয়, কেননা মুসলাম সমাজ অধঃপতিত ও দুর্দশাগ্রস্ত। এখন তেজোদীপ্ত, উচ্চ লক্ষ্যযুক্ত সাহিত্য আবশ্যক, পচনশীল সাহিত্য নয়। তাঁর আবেদন, "ভ্রাতৃগণ সাবধান হও—বঙ্গীয় মুসলমান পাপে পাপে মরিয়া গিয়াছে, এখন আর সেই মৃতদেহ বিষাক্ত প্রেম-রস-বারি সিঞ্চনে পচাইওনা। তাহা হইলে উহাতে আর জীবনীশক্তি সঞ্চারের আশা থাকিবে না।"[৩৯] 'রায়-নন্দিনী' (১৩২২) উপন্যাসের 'উপক্রমণিকা'য় ইসমাইল হোসেন শিরাজী লিখেছেন, "একই দেশের অধিবাসী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সদ্ভাব থাকা সবর্দা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী ভ্রাতারা কাল্পনিক আর্যামীর গৌরব গানে বিভোর হইয়া... অসদ্ভাবের বীজ রোপণ করিতেছেন। দেশমাতৃকার কল্যাণের নিমিত্ত তাঁহাদের সাবধানতার জন্য এবং মুসলমানদের আত্মবোধ জাগাইবার জন্যই, উপন্যাসের ঘোর বিরোধী আমি, কর্তব্যের নিদারুণ তাড়নায় 'রাস-নন্দিনী' রচনা করিয়াছি।"[৪০]

৩৭. ঐ, নভেম্বর -ডিসেম্বর ১৮৯৯, পৃ: ১৯০-৯১
৩৮. *নবনূর*, জ্যৈষ্ঠ ১৩১০, পৃ: ৫৯-৬০
৩৯. ঐ, আষাঢ় ১৩১০, পৃ: ১০৮
৪০. *শিরাজী রচনাবলী* (উপন্যাস খণ্ড), পৃ: ৫

ধর্মচিন্তা ও নীতিবোধকে সামনে রেখে সাহিত্য রচনার প্রেরণা পেয়েছেন কায়কোবাদও। তিনি 'শিব-মন্দির' (১৯২২) কাব্যের ভূমিকায় লিখেন, "অধঃপতিত ও নিদ্রিত জাতিকে জাগাইবার প্রকৃষ্ট উপায়ই সৎসাহিত্যের আলোচনা। ... অকবি রচিত পাপের পূতিগন্ধময় নিকৃষ্ট চরিত্র সমাজকে ধ্বংস ও অধঃপতনের দিকে টানিয়া নেয়। এই কাব্যখানাতে আমি পাপ-পুণ্যের সংকট দেখাইয়া পাপের পতন দেখাইয়াছি।"[৪১] হিন্দু লেখকগণ স্বদেশচেতনা ও জাতীয়তাবোধের কথা বলতে গিয়ে ধর্মের কথা, জাতির অতীত গৌরবকাহিনী, পুরাণ ও ইতিহাসকে সাহিত্যের বিষয়বস্তু করেছিলেন। মুসলমান লেখকগণও অনুরূপভাবে অতীতের গৌরবময় কাহিনী ও চরিত্র নির্বাচন এবং ধর্মকথা প্রচার করে সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হন। নবজাগরণের কালে অতীতের বীরকাহিনী, মহৎ জীবন জাতিকে প্রেরণা জোগায়। উনিশ শতকের মধ্যভাগে ওয়াহাবি-ফারায়েজি আন্দোলনের ফলে শাস্ত্রধর্মের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা হয়, ঐ শতকের আট দশকের দিকে আমদানী হয় প্যান-ইসলামী চেতনা। প্যান-ইসলামবাদ দেশ ও রাষ্ট্রের সীমানা মানে না—বিশ্ব-মুসলমানের ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ব কামনা করে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব' ঘোষণা করে ওয়াহাবিরা মুসলমান শাসিত আফগানিস্তানে 'হিজরত' করার মত প্রচার করেছিলেন। এসব কারণে ভারতীয় মুসলমানরা আরব-ইরানের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণ অনুভব করত। এদিকে হিন্দু-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ ইসলামী ধ্যান-ধারণা ও ইতিহাস-ঐতিহ্যপ্রীতিও বৃদ্ধি পায়। শিক্ষা ও সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দুয়ানি বিষয় বর্জনের প্রশ্ন দেখা দেয়। মুসলমানদের আত্মাভিমান এমন স্পর্শকাতর হয়ে উঠেছিল যে, আবদুল লতিফ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচিতে ইসলাম-বিরোধী ইংরাজি পুস্তকেরও বিরোধিতা করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে, 'ইলিয়ড' পড়ে গ্রিক-পুরাণ উপাখ্যান জানার চেয়ে এদেশের ছাত্রদের পক্ষে 'রুস্তম-সোহরাব' পড়ে প্রাচ্য বীরযুগকে জানার প্রয়োজনীয়তা অধিক।[৪২] গ্রামের বাংলা-বিদ্যালয়গুলির পাঠ্যসূচির হিন্দুয়ানি ভাবের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তোলেন সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী। হিন্দু লেখকগণের রচিত পাঠ্যপুস্তকে হিন্দু দেবদেবী ও পৌরাণিক বিষয় প্রাধান্য পায়। মুসলমান ছাত্ররা তাদের ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারে না। সাহিত্যে ও ইতিহাসে যেখানে মুসলমানের কথা আছে, সেখানে তাদের খুনী, জঙ্গী, দুর্ধর্ষ রূপে দেখান হয়েছে, এসব পাঠ করে মুসলমান ছাত্রদের মনে পূর্বপুরুষ সম্পর্কে খারাপ ধারণা জন্মে। নওয়াব আলী চৌধুরী প্রশ্ন তুলেছেন, "Should we send our boys to Schools only to learn of the vices and not of the virtues of our civilization and our forefathers?"[৪৩]

ঢাকার 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র ১৮৮৬-৮৭ সালের বার্ষিক অনুষ্ঠানপত্রে লেখা হয়, "শিক্ষিত মুসলমান যুবকের মধ্যে অনেকেই যীশুখ্রীস্টের প্রপিতামহের জীবনচরিত বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের ষোলশত গোপিনীর নামকরণ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহাকে মহম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের মূল সূত্রগুলি জিজ্ঞাসা কর, অমনি তাহার চক্ষুস্থির।...আক্ষেপের

৪১. কায়কোবাদ— *শিব-মন্দির*, ১৯২১, 'ভূমিকা' দ্রষ্টব্য।
৪২. Nawar Bahadur Abdul Latif . His Writings and related Documents p. 220
৪৩. *Vernacular Education in Bengal*, p. 11

বিষয় এই যে, স্কুলসমূহে ধর্মশিক্ষার কোন প্রকার বন্দোবস্ত নাই।...তাই মুসলমান অভিভাবকগণ বালকদিগেব ইংরেজী ও বাঙলা শিক্ষার বিরোধী ও বাস্তবিক ধর্মশিক্ষার অভাবেই আধুনিক শিক্ষার দ্বারা আমাদের সমাজবন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া উঠিতেছে, উহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই।"[৪৪] পাঠশালায় পাঠ্যপুস্তকের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে 'নূব-অল-ইমানে' লেখা হয়, "পাঠশালার যে সকল পুস্তক পড়ান হয়, তাহাতে হিন্দুদিগের পোরাণিক কাহিনী, রাম রাবণের যুদ্ধ, কুরুপাণ্ডবের লীলা পড়িতে হয়। তৎসঙ্গে হিন্দুদিগের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার মুখস্থ করিতে হয়। তাহা করিয়াও নিস্তার নাই। কোমলমতি বালকদিগের পাঠ্যপুস্তকে মোসলমানের নিন্দা, এসলামী আচার-ব্যবহারের কুৎসা এবং মোসলমান জাতিকে ম্লেচ্ছ, যবন ইত্যাদি নামে ঘৃণা প্রদর্শন করা হইয়া থাকে। এই সকল বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া পাঠশালায় শিক্ষার্থীগণের হৃদয়ে কিরূপে আত্মসম্মান ও জাতীয় প্রেম জন্মিতে পারে?"[৪৫] 'বাসনা' পত্রিকায় জনৈক প্রবন্ধকার অনুরূপ অভিযোগ তুলে মন্তব্য করেন, "যাহাতে মুসলমানী ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর কথা, বীর-বীরাঙ্গনার বিবরণ, সাধু-দরবেশের আখ্যান, পয়গম্বরগণের উপাখ্যান, ধার্মিক-ধার্মিকাদের বৃত্তান্ত, নবাব-বাদশাহদের জীবন, সতী রমণীগণের গুণ কাহিনী, ইসলাম ধর্মের সারতত্ত্ব, হাদিস-দলিলের সারসংগ্রহ, নামাজ-রোজার উপকারিতা, মুসলমানী পর্বাদির কথা ইত্যাদি আবশ্যকীয় বিষয় সরল বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হইয়া বিদ্যালয়ের পাঠ্যভুক্ত হয়, তৎপক্ষে চেষ্টা করা মুসলমান মাত্রেরই উচিত।"[৪৬]

লেখকদের মনে এসব প্রশ্ন সমাজের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকেই উত্থিত হয়েছে। ধর্মের বিধান, সমাজের শাসন এক দিকে, অপর দিকে যুগ ও সমাজের চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে তাঁদের লেখনি ধারণ ও চালনা করতে হয়েছে। আলোচ্য যুগে মুসলমান রচিত উপন্যাস-নাটকের সংখ্যা যেমন কম, তেমনি তুচ্ছ। বিষয়বস্তুতে ও আঙ্গিকে সীমাবদ্ধতা এবং নির্বাচন-প্রবণতা থাকলে মুক্ত ও সাবলীল সাহিত্য রচিত হতে পারে না। সমাজের চোখ রাঙানিকে মেনে নিয়ে যাঁরা সাহিত্য চর্চা করেছেন, তাঁরা ভাব ও ভাষার 'দুর্গে' বন্দী। রাশ টেনে ধরে সাহিত্যের সব লেখাকে সমাজের সেবায় লাগিয়ে দিলে সমাজের সেবা হয়, কিন্তু সাহিত্য গতি, প্রাণ ও স্বচ্ছন্দতা হারায়। এ যুগের মুসলমান রচিত সাহিত্যের ক্ষেত্রে তাই হয়েছে। ভাব, ভাষা, শব্দ, সাহিত্যের বিতর্কে আত্মজিজ্ঞাসা ও নবজাগরণের প্রেরণা এসেছে বটে, কিন্তু তা এসেছে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও স্বাতন্ত্রচিন্তার বর্ণে রঞ্জিত হয়ে। বাংলার হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আত্মবিচ্ছেদের এটিও একটি কারণ। এই পর্বে মুসলমান লেখকগণ বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করলেও বিষয় ও আঙ্গিক সম্পর্কে সংস্কারমুক্ত ছিলেন না বলে তাদের দ্বারা উন্নত সাহিত্য রচিত হয়নি। এজন্য তাঁদের আরও কিছুকাল অপেক্ষা করতে হয়েছে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর প্রচণ্ড জীবনীশক্তি ও প্রখর সৃজনশক্তি নিয়ে সর্বপ্রথম সমাজের এই প্রতিবন্ধকতা ভাঙতে ও অতিক্রম করতে পেরেছিলেন।

৪৪. ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র, পৃ: ৬-৭
৪৫. *নুর-অল-ইমান*, শ্রাবণ ১৩০৭
৪৬. *বাসনা*, জৈষ্ঠ্য ১৩১৬

রাজনীতি

১৭৫৭ সালে সিরাজদ্দৌলার পতনের পর বাংলাদেশে মধ্যযুগীয় রাজনীতির অবসান হয়। মধ্যযুগীয় রাজনীতি ছিল সাম্রাজ্যবাদী সামন্ত প্রভুর রাজনীতি, তাতে জনগণের কোন ভূমিকা ছিল না। ভূমিতে ব্যক্তি-মালিকানা না থাকায় এবং অর্জিত সম্পত্তিতে ব্যক্তি-অধিকার অনিশ্চিত থাকায় রাজনীতিতে জনগণের অংশ গ্রহণ আবশ্যক হত না। শ্রমোৎপাদিত পণ্যের নির্ধারিত অংশ সময়মত রাজকোষে জমা হলে রাজপুরুষেরা প্রজাদের অভ্যন্তরীণ জীবনে হস্তক্ষেপ করতেন না। গ্রামের মানুষ দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিজেরা উৎপাদন করত, অন্যের উপর নির্ভর করত না। এমন কি, ছোটখাট বিচার আচার নিজেরাই মীমাংসা করে নিত। ফলে রাজপুরুষ ও রাজনীতি থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা জীবন যাপন করত। চার্লস্ মেট্‌কাফ বাংলার স্বল্পতুষ্ট স্বনির্ভর গ্রামসমাজকে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্র (little republics) বলেছেন,[১] তার প্রধান কারণ এখানেই নিহিত আছে।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি এদেশে রাষ্ট্রক্ষমতায় এসে সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শাসননীতি প্রবর্তন করেন। বণিক সরকার শাসন ও শোষণের ভিত্তি দুদৃঢ় করার জন্য পুরাতন দেশীয় রাজপুরুষ, ধনী সামন্ত ও বণিক শ্রেণীকে হয় ধ্বংস করেন অথবা নিষ্ক্রিয় করে তোলেন। এই প্রক্রিয়ায় মীর জাফর খান, রেজা খান, জসরত খান, জগৎ শেঠ, রানী ভবানী, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র, বর্ধমান ও বীরভূমের জমিদার পরিবার অচিরেই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর স্থলে প্রশাসনিক ও বাণিজ্যিক শহর কলকাতায় একটি নতুন সামাজিক শ্রেণীর উদ্ভব হয, যারা বণিক শাসকগোষ্ঠীর দালালি-দেওয়ানি-কেরানী-বেনিয়ানি করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করেছিল। এদের একটি অংশ ক্রমে ভূমি কিনে নতুন ভূস্বামী হন। তাঁরা ইজারাদার, পত্তনিদার, নায়েব, দেওয়ান, গোমস্তা, মুন্সী, পাইক, পেয়াদার হাতে জমিদারি পরিচালনার ও রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়ে শহরেই বসবাস করতেন। যেহেতু কোম্পানির অনুগ্রহ ও আশীর্বাদ তাঁদের ভাগ্যোন্নয়নের প্রধান কারণ ছিল, সেহেতু তাঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যাননি। শাসকশ্রেণীর সম্পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করে তাঁদের সেবাদাস হিসেবে কাজ করেছেন। তাঁরা ব্রিটিশ শাসনকে কেবল অভিনন্দন জানাননি, দেশ ও জাতির স্বার্থের পরিপন্থী কাজেও শাসকশ্রেণীকে সহযোগিতা দান করেছেন। বিশেষত ব্রিটিশ উপনিবেশের প্রথম একশ' বছরের ইতিহাস—এ নির্জলা আনুগত্যের ইতিহাস।

১. "The village communities are little republics, having nearly everything they want within themselves, and almost independent of any foriegn relation. They seem to last where nothing else lasts."--Charles Metcalfe. *Report of the Select Committee of the House of Commons*, 1832, Vol. 11 (Appendix 84) p. 331.

এদিকে বিদেশী বণিক সরকার এবং দেশীয় 'কম্প্রাডর' তথা নব্য মধ্যবিত্তের লোভ ও লাভের পুরো বোঝা বহন করতে হয় হতভাগ্য জনসাধারণকে। কোম্পানির মুহুর্মুহু রাজস্বনীতির ও বাণিজ্যনীতির পরিবর্তনের ফলে তাদেরর জীবন-ব্যবস্থা ধ্বসে পড়ে, তারা এক বর্ণনাতীত দুর্গতির সম্মুখীন হয়। ক্ষমতার হস্তান্তরের ক্রান্তিকালীন আইন-শৃঙ্খলার অবনতি এবং সীমাহীন আর্থিক শোষণের কারণে সাধারণভাবে ভীরু, শান্ত ও নিরীহ প্রকৃতির হয়েও বাংলার জনগণ একাধিকবার বিদ্রোহ করতে বাধ্য হয়েছে! গ্রামই বিদ্রোহের কেন্দ্র ছিল, গ্রামের দলপতি বা সমাজপতি ছিলেন বিদ্রোহের নেতা। বাংলার মাটিতে ব্রিটিশ শাসনের শুরু থেকেই একে একে ফকির ও সন্ন্যাসী বিদ্রোহ (১৯৬৩-১৮০০), বিবিধ কৃষক ও প্রজা বিদ্রোহ, তাঁতি বিদ্রোহ (১৭৭০), লবণ বিদ্রোহ (১৭৮০), চোয়াড় বিদ্রোহ (১৭৮৯), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫), সিপাহী বিদ্রোহ (১৮৫৭), নীল বিদ্রোহ (১৮৫৯), ওয়াহাবি আন্দোলন (১৮৩১-৭০), ফারায়েজি আন্দোলন (১৮৩৮) ইত্যাদি সংঘটিত হয়েছে, সেগুলির সাথে কৃষক-শ্রমিক-মজদুর-কুটিরশিল্পী প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষ প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিল। এসব বিদ্রোহে ও আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন মজনু শাহ, মুসা শাহ, ভবানী পাঠক, শমসের গাজী, বলাকি শাহ, নবাব শামসুদ্দৌলা, শহীদ তিতুমীর, শরীয়তুল্লা, দুধু মিয়া এবং নামহীন শত শত মুজাহিদ ও সিপাহী। অধিকাংশ বিদ্রোহই ছিল আঞ্চলিক এবং সম্প্রদায়গত অথবা পেশাভিত্তিক। তাঁতির বিদ্রোহে কৃষক যোগদান করেনি, কৃষকের বিদ্রোহে তাঁতি অংশ গ্রহণ করেনি। অনুরূপভাবে লবণ বিদ্রোহে মলঙ্গী, সাঁতাল বিদ্রোহে সাঁওতাল, নীল বিদ্রোহে নীলচাষী পৃথক-পৃথকভাবে অংশ গ্রহণ করেছে। ওয়াহিব ও ফারায়েজি আন্দোলন প্রায় সমকালে হলেও সমতালে মিলিতভাবে হয়নি। অর্থাৎ বিদ্রোহ ও সংগ্রামগুলি সমগ্র দেশব্যাপী ঐক্যবদ্ধ বিদ্রোহ ও সংগ্রাম ছিল না। প্রধানত সংগঠন ও সমর কৌশলের দিক থেকে গ্রামীণ নেতৃত্ব অত্যন্ত দুর্বল ছিল। 'বাঁশের কেল্লা'র যুগ অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে, তিতুমীর তা উপলব্ধি করতে পারেননি। দেশের কামারশালায় নির্মিত ধাতব অস্ত্র, দূর পাল্লার গোলা-বারুদের অস্ত্রের কাছে টিকতে পারে না—এ ধারণাও অনেকের ছিল না। তাঁদের দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতি ছিল সন্দেহ নেই, কেননা দেশপ্রেম ও স্বাধীনতা-প্রীতি ছাড়া কেউ রক্ত দিতে পারে না, তবে তাঁদের আবেগ ও অজ্ঞতাও ছিল। শত্রুর সমরাস্ত্র ও সমর-কৌশল সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান না রেখেই তাঁরা যুদ্ধ করেছেন এবং প্রাণ দিয়েছেন। ফলে সব বিদ্রোহই ব্যর্থ হয়েছে। অধিকতর সুগঠিত এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী ওয়াহাবি-ফারায়েজি আন্দোলনও ব্যর্থ হয়েছে। সনাতন নেতৃত্বের ও চেতনার কারণে এ ধরনের রাজনীতিতে ধর্মীয় আবেগ ও গোষ্ঠী মনোভাব প্রাধান্য পায়। আধুনিক রাজনীতির আদর্শ জাতীয়বাদ। জাতীয়তার আদর্শে সকলকে ঐক্যবদ্ধ করা যায়। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে আমাদের দেশে জাতীয়তাবাদী রাজনীতির সূচনা হয়, ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনে যার আত্মপ্রকাশ ঘটে। শহরের নব্য শিক্ষিত শ্রেণী এ ধরনের রাজনীতির নেতৃত্ব দেন। উল্লেখ্য যে, পূর্বের বিদ্রোহ ও আন্দোলনগুলিতে নব গঠিত মধ্যশ্রেণী যোগদান করেননি, এমন কি সেগুলি সমর্থনও করেননি।

জনগণের ক্ষুদ্র,খণ্ড সংগ্রাম ব্যর্থ হলেও তাদের জীবনধারার উপর দিয়ে একের পর এক যে ঝড় বয়ে যায়, তাতে সামগ্রিক জীবন-ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয় এবং পুরাতন মূল্যবোধ

নষ্ট হয়ে যায়। ক্রমশ তাদের ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব ত্যাগ করতে হয়। এবং নতুন শাসননীতিব, রাজনীতি ও অর্থনীতির সাথে খাপ খাওয়াতে হয়। প্রধানত সিপাহী বিদ্রোহের (১৮৫৭) এবং ওয়াহাবি আন্দোলনের সমাপ্তির (১৮৭০) পর থেকেই এরূপ পরিবর্তন ঘটে। শহরের নব গঠিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী নেতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দাবিদাওয়া আদায়ের রাজনীতি শুরু করেন। আন্দোলনকে জোরদার ও ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য তাঁরা জনগণের সমর্থন ও সহযোগিতা গ্রহণ করেছেন। এভাবে দেশে মধ্যবিত্ত ও জনসাধারণের যৌথ রাজনীতির ধারা প্রবর্তিত হয়। মধ্যবিত্ত ব্রিটিশ সরকারের কাছে থেকে যা পাওয়ার শতাব্দীকালের ব্যবধানে তা পেয়ে গেছে। নতুন শিক্ষা-পদ্ধতিতে যথেষ্ট যোগ্যতা ও দক্ষতা অর্জন করেছে। এখন তারা রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায় নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ঔপনিবেশিক সরকার তা সহজে ছেড়ে দিত পারেন না। ফলে সরকারের সাথে তাদের বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। মধ্যশ্রেণী যে ইংরাজের আনুগত্য ত্যাগ করে বিপক্ষে গেছে, তার প্রকৃত তাৎপর্য এখানেই নিহিত আছে। এটি সমাজ-বিকাশের ধারায় স্বাভাবিক নিয়মেই সম্পন্ন হয়েছে। কতক ক্ষেত্রে জনগণের অংশগ্রহণ অত্যাবশ্যক ছিল। যেমন ইউনিয়ন বোর্ড, জেলা বোর্ড, মিউনিসিপ্যাল বোর্ড প্রভৃতি স্বায়ত্তশাসিত আধা-স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা হলে তারা প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ে। ক্রমশ দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ইত্যাদির প্রশ্ন তুলে ঔপনিবেশিক সরকারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া তাদের পক্ষে সহজতর হয়েছে। আমরা এটাকেই নব্য জাতীয়তাবাদ বলেছি। দেনদরবার করা সম্ভব হয়েছে এই জাতীয়তাবাদের আদর্শের কারণেই। পত্র-পত্রিকায় ও পুস্তক-পুস্তিকায় দেশীয় ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ধর্ম ও ভাষার মহিমাকীর্তন করে জাতীয়তাবাদের আদর্শ প্রচার করা হয়েছে। একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নিজেদের ধর্ম, জাতিত্ব, ভাষা, ঐতিহ্য, সনাতন রীতিনীতি ও অন্যান্য অধিকার হারাবার কারণে যখন গ্রামের সাধারণ মানুষ সংগ্রাম করেছে এবং রক্ত দিয়েছে তখন শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত উটতি মধ্যবত্তি শ্রেণী দূরে সরে থেকেছে। কিন্তু যখন নিজেদের অধিকার আদায় এবং স্বার্থ উদ্ধারের প্রয়োজন হয়েছে তখন জাতীয়বাদের নামে তারা দেশীয় ভাষা-সাহিত্য-ধর্ম-ঐতিহ্য-জাতিত্বের গৌরব প্রচার করেছে। এমনিতেই মধ্যবিত্তের মধ্যে অভ্যন্তরীণ বিবিধ বিরোধ আছে, তদুপরি ঔপনিবেশিক অর্থনীতিতে ইংরাজের হাতে-গড়া দেশীয় মধ্যবিত্তের নানাবিধ দুর্বলতাও ছিল। মধ্যবিত্তের দেশপ্রেমের চেয়ে আত্মপ্রেম বেশি। তারা জনগণকে সাথে নিয়েছে যতটা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য ততটা জনগণের ভাগ্যোন্নয়নের জন্য নয়।

উনিশ শতকের বাংলার রাজনীতির মোটামুটি এটাই হল উপর কাঠামো (extra-structure)। এর একটা আন্তর-কাঠামো (intra-structure) ছিল যা আলোচনা না করলে আমাদের রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা অস্পষ্ট ও অব্যক্ত থেকে যায়। বাংলার রাজনীতির আন্তর-কাঠামোটি হল দুটি প্রধান সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যেকার বিরোধ ও দ্বন্দ্ব।

এই অন্তর্বিরোধের নানা কারণ ছিল তা আমরা পূর্বে আলোচনা করেছি।[২] এই অন্তর্বিরোধের সুযোগ নিয়ে ইংরাজগণ 'ভেদনীতির শাসন' (divide and rule policy) চালিয়েছেন। এটা হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ককে তিক্ত ও বিভক্ত করেছে। উপরন্তু মুসলমানের রাজনীতির একটা স্বতন্ত্র ধারা ছিল যা হিন্দুর রাজনীতির সাথে মিলে না। যেমন ক্রুসেড বা জিহাদ এবং প্যান-ইসলামিজম বা বিশ্ব-মুসলিমবাদের নীতি ও আদর্শ কখনও হিন্দুর রাজনীতির আদর্শ হতে পারে না। উনিশ শতকের মুসলিম রাজনীতিতে জিহাদ ও বিশ্ব-মুসলিমবাদের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। জিহাদ নীতির কারণে ওয়াহাবিগণও ব্রিটিশ শাসন মেনে নিতে পারেনি, হিন্দুর পক্ষে ব্রিটিশ শাসন মেনে নেওয়ার এরূপ কোন বাধা ছিল না। আবার বিশ্ব-মুসলিমবাদের কারণে মুসলিম নেতৃবর্গের দৃষ্টি ভারতের ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে আরব-ইরান-তুরস্ক-আফগানিস্তানে প্রসার লাভ করে। এগুলি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিকভাবে মিলনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করে। এর বিপরীত বিন্দুতে বর্ণহিন্দুর 'আর্যাভিমান' ছিল যার সূত্র ধরে হিন্দুর নবজাগরণ, নব অধ্যাত্মবাদ ও জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। তারা তাদের ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা আন্দোলনে মুসলমানদের সঙ্গে নেননি। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেকার বিচ্ছিন্নতাবাদের বীজ অনুসন্ধান করতে হলে এসব সূত্র ধরেই করা সংগত।

ব্রিটিশ আনুগত্য

উত্তর ভারতে সৈয়দ আহমদ এবং বাংলাদেশে আবদুল লতিফ কর্মক্ষেত্রে প্রায় একই সময়ে আবির্ভূত হন। ব্রিটিশ সরকারের ধারণা হয়েছিল যে সিপাহী বিদ্রোহের পিছনে দিল্লীর ম্রিয়মান শক্তির পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা ছিল ; এর জন্য সরকার মুসলিম সম্প্রদায়কে অধিক দায়ী করেন। ঐ সময় কলিকাতায় অবস্থানরত অযোধ্যায় বৃত্তিপ্রাপ্ত নবাব ওয়াজেদ আলীকে আটক করা হয়। ফারায়েজি আন্দোলনের নেতা দুধু মিয়াকে গ্রেফতার ও কারারুদ্ধ করা হয়। ওয়াহাবি আন্দোলনকে সরকার যথেষ্ট সন্দেহের চোখে দেখতেন। ১৮৭০-৭২ সালের পর পর দুটি হত্যাকাণ্ড ইংরাজদের মনে সন্দেহ ও আশঙ্কা বাড়িয়ে তোলে। বিচারপতি নরম্যানকে আবদুল্লাহ এবং বড়লাট লর্ড মেয়োকে শের খান হত্যা করেন। সরকার কঠোর মনোভাব নিয়ে ওয়াহাবিদের ব্যাপক ধর-পাকড় করেন এবং রাণীর শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ এনে অনেককে জেল-জুলুম-ফাঁসি-দ্বীপান্তর দিয়ে ওয়াহাবি আন্দোলন দমন করেন। সমাজের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে সৈয়দ আহমদের ও আবদুল লতিফের প্রথম কাজ হল ভারতীয় মুসলমানদের প্রতি ইংরাজগণের যে সন্দেহ আছে, তা দূর করা। তাঁরা উভয়ে সিপাহী বিদ্রোহের বিপক্ষে রায় দেন এবং সভা ডেকে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। সৈয়দ আহমদ উর্দুতে 'ভারতের বিদ্রোহের কারণ' (১৯৫৯) বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করে সরকারের সন্দেহভঞ্জনের চেষ্টা করেন।[৩]

২. এই অধ্যায়ের 'সমাজ' অংশ দ্রষ্টব্য।
৩. সৈয়দ আহমদ রচিত গ্রন্থখানির নাম 'আসবাব-এ বাগাওয়াত-এ হিন্দ'।

আবদুল লতিফ কলকাতায় সভার আয়োজন করেন। সেখানে মৌলানা কেরামত আলী ঘোষণা করেন যে, ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষ 'দারুল হরব' নয়, 'দারুল ইসলাম'। রাণীর ঘোষণাপত্র (১৮৫৮) অনুযায়ী যেহেতু ধর্মপালনে বাধা নেই, সেহেতু শাসক বিধর্মী হলেও ধর্মের কারণে জেহাদ অসিদ্ধ, সুতরাং যাঁরা জেহাদ করবেন, তাঁরা ধর্মের চোখেও দণ্ডণীয় হবেন।[৪] এ-সময়ে উইলিয়ম উইলসন হান্টার 'দি ইন্ডিয়ান মুসলমান্‌স' (১৮৭১) পুস্তক রচনা করে মুসলমানের অসন্তোষ সম্পর্কে সরকারকে অবহিত করেন এবং সে অসন্তোষ দূর করার জন্য সরকারকে পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেন। তিনি কেরামত আলীর প্রতিধ্বনি করে বলেন যে সরকার প্রজার ধর্মকর্মে হস্তক্ষেপ করেন না বলে মুসলমানরা ব্রিটিশ শাসকের প্রতি অনুগত হলে তা ইসলামের নীতির বিরুদ্ধে যায় না।[৫]

সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পরে রাণী ভিক্টোরিয়ার ঐতিহাসিক 'ঘোষণাপত্রে' (১ নভেম্বর ১৮৫৮) বলা হয় যে, ব্রিটিশ সরকার সম্প্রসারণ নীতি পরিহার করে চলবে, ভারতীয়রা যোগ্যতা অনুসারে সরকারি চাকুরি পাবে এবং আইন প্রণয়নে তাদের মতামত গ্রহণ করা হবে। রাণী ঐ ঘোষণাপত্রে ভারতীয়দের সামাজিক ও ধর্মীয় ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেন। ঐ সময় ভারতবর্ষ রাণীর সরাসরি শাসনাধীনে চলে যাওয়ায় ভারতীয়রা ব্রিটিশের অন্যান্য প্রজার সমান মর্যাদা ও অধিকার লাভ করে। এসব ঘটনা এদেশের মানুষের বিরূপ মনোভাব পবিবর্তনের সহায়ক হয়। আবদুল লতিফ ও তাঁর সহযোগীরা প্রথমে 'মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৫৫) এবং পরে 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' (১৮৬৩) গঠন করে সমাজের ক্ষয়িষ্ণু অভিজাত শ্রেণীকে এবং শহরের মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন। তিনি ইংরাজি ভাষা ও পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার কথা প্রচার করেন। সরকারি ও সওদাগরি অফিসে ইংরাজি জ্ঞান ছাড়া প্রবেশ করা যায় না। সরকারে প্রতি অনুগত থেকে চাকুরিতে প্রবেশ করে ভাগ্যোন্নয়ন করতে হবে—সমাজোন্নতি সম্পর্কে এই ছিল তাঁর ধারণা।

সৈয়দ আমীর আলী সমাজোন্নতির পথ ও পদ্ধতির ব্যাপারে আবদুল লতিফের সাথে একমত ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' (১৮৭৮) রাজনৈতিক সংগঠন ছিল। তিনি এসোসিয়েশনের মাধ্যমে সমাজের দাবি-দাওয়া সরকারের কাছে তুলে ধরেন। লর্ড রিপনের কাছে প্রদত্ত ১৮৮২ সালের বিখ্যাত 'স্মারকলিপি' তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও সমকালীন সমাজ-চিন্তার প্রকৃষ্ট দলিল। যেহেতু মুসলমানরা শিক্ষায় দীক্ষায় পিছিয়ে আছে, সেহেতু চাকুরিতে নিয়োগের ব্যাপারে মুসলমান প্রার্থীর যোগ্যতা শিথিল করতে হবে এবং মুসলমানের জন্য নির্দিষ্ট পদ-সংখ্যা সংরক্ষিত রাখতে হবে।[৬] অগ্রসরমান হিন্দু সম্প্রদায়ের সাথে তুলনা করে আমীর আলী এরূপ বাড়তি সুযোগ-সুবিধা

৪. *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and Related Documents*, P, 87
৫. *The Indian mussalmas*, 1871
৬. *Ameer Ali : His Life and Works*, PP.23-40.

চেয়েছিলেন। নচেৎ সাম্প্রদায়িক মনোভাব তাঁর ছিল না। তাঁর সংগঠনে নব্যশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি ছিল। সারা দেশে এসোসিয়েশনের শাখা ছিল, এজন্য তাঁর মতাদর্শ ও চিন্তাধারা কলিকাতা শহর ছেড়ে মফস্বল শহরেও বিস্তার লাভ করে। আবদুল লতিফ কেবল উপর-তলার মানুষের উন্নতির কথা বলেছেন, যাদের সংখ্যা খুবই নগণ্য ছিল। সাধারণ শ্রেণীর মানুষের স্বার্থকে তিনি তাঁর আন্দোলনের সাথে জড়াতে চাননি, এজন্য তিনি শহর ও মফস্বলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও বিদ্যা শিক্ষার বিধান দিয়েছিলেন। আবদুল লতিফের ও আমীর আলীর চিন্তাধারার মধ্যে এখানে গুণগত পার্থক্য ছিল।

রাজপুরুষেরা যখন কার্যভার গ্রহণ অথবা কর্মস্থল ত্যাগ করতেন তখন তাঁরা সংগঠনের মাধ্যমে অভিনন্দন ও বিদায় সম্বর্ধনা দিয়ে সমাজের অভাব-অভিযোগ প্রকাশ করতেন। এজন্য সমকালের পত্র-পত্রিকা তাঁদের রাজনীতিকে 'আবদেন-নিবেদনে'র রাজনীতি বলে আখ্যাত করে।[৭] আমীর আলী সামাজিক-রাজনৈতিক বিষয়ক বিবিধ রচনা প্রকাশ করেন। তিনি এসোসিয়েশন এবং রচনার মাধ্যমে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানগুলিতে মুসলমানদের জন্য স্বতত্র প্রতিনিধিত্ব দাবি করেন। হিন্দুগণ নির্বাচন প্রথার সমর্থক ছিলেন, কারণ তাঁরা সংখ্যায় বেশি ও যোগ্যতায় উন্নত ছিলেন। হিন্দুগণ চাকুরির ক্ষেত্রেও মেধা, দক্ষতা ও প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে নিয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। শিক্ষার ক্ষেত্রেও সুযোগ বৃদ্ধি ও সুবিধা বণ্টনের ব্যাপারে উভয় সম্প্রদায় ভিন্ন মত পোষণ করেছে। আমীর আলী ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের মত উচ্চ সরকারি পদে 'মনোনয়ন প্রথা'র দাবি করেন ঐ একই কারণে যে, মুসলমানরা লেখাপড়ায় পিছিয়ে আছে। মুসলমান পরিচালিত সমকালের বাংলা ইংরাজি পত্র-পত্রিকা শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র সুবিধা দেওয়ার ব্যাপারে জনমত প্রচার করেন। তাঁদের এ-আবেদন বিফলে যায়নি। ১৮৮৫ সালের ১৫ জুলাই এক সরকারি গেজেটে বলা হয়, যে মুসলমানরা সরকারি চাকুরিতে পূর্ণ অংশ পাচ্ছে না ; সুযোগ সৃষ্টি হলেই স্থানীয় সরকার ও উচ্চ আদালতসমূহ এই বৈষম্য দূর করার চেষ্টা চালাবে এবং উক্ত সম্প্রদায়ের প্রার্থী নিয়োগ সংক্রান্ত নির্বাচন-অনুষ্ঠানে অধস্তন কর্মচারীদের উপর প্রভাব বিস্তার করবে।[৮] ১৮৯৭ সালের ১৫ সেটম্বর প্রচারিত সরকারি সার্কুলারটি ছিল এরূপ : "If there be two candidates for one appointment, each of them possesing the requisite

৭. *The Moslem Chronicle*, 3 October 1896

৮. *Gazette of India*, Juljy 1885 ; *The Moslem Chronicle*, 15 August 1895 p. 344 মূল প্রস্তাবটি ছিল এরূপ : "The Governor-General in Council desires that in those Provinces where Muhammedans do not receive their full share of State employment, the Local Governments and the High Courts will endeavour to redress this inequality as opportunity offers, and will impress upon subordinate officers the importance of attending to this in their selection of candidates."

qualifications, preference should be given to the Muhammedan candidate."[৯] এটি বাংলার শিক্ষা বিভাগের চাকুরির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল। বেকার সমস্যায় জর্জরিত হিন্দুগণ সবকারের এই নীতিকে প্রীতির চোখে দেখেননি। তাঁরা এ সবের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করেছেন। 'মুসলমানের পিঠ চাপড়ান' নীতির পেছনে সরকারের ভেদনীতি কাজ করেছে বলে অভিযোগ করা হয় এবং সরকার অতিরিক্ত পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন বলে 'গভর্ণমেন্টের পোষ্যপুত্র' বলে তাদের অভিহিত করা হয়।[১০] এতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টি হয় ও তিক্ততা বৃদ্ধি পায়।

জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলমান

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের রাজনৈতিক সংগঠন 'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে' (১৮৮৪) যোগদানের ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদ ও তিক্ততা সৃষ্টি হয়। আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলী কংগ্রেসে যোগদান করেননি। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে, কংগ্রেসে যা আলোচিত হয় এবং যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়,তাতে মুসলিম সমাজের স্বার্থ রক্ষিত হয় না। উপরন্তু কংগ্রেসে ব্রিটিশ বিরোধী কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করা মুসলমানের পক্ষে সমীচীন হবে না, কারণ অশিক্ষা ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পেতে হলে তাদের জন্য ঐ সময়ে ইংরাজের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক ছিল। ১৮৮৬ সালে কংগ্রেসের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ পেয়ে আবদুল লতিফ মহামেডান লিটারেরী সোসাইটির পক্ষ থেকে লিখেন, "This committe of Muhammedan Literary Society of Calcutta regret their inability to accept your invitation as they not anticipate any benefit to be derived from further discussion of the difficult and momentous questions likely to occupy the deliberations of the Congress."[১১] সৈয়দ আমীর আলী সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রায় একই মনোভাব ব্যক্ত করে বলেন, "This Committe (C. N. M. A) think that no possible adventage will result either to their community or the country at large by assuming attitude of uneasiness towards the Government and the steps it has taken and intends to take."[১২]

১৮৮৭ সালের ২৮ ডিসেম্বর লক্ষ্ণৌ ও ১৮৮৮ সালের ১৬ মার্চ মীরাটের বক্তৃতায় সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান করতে প্রকাশ্যে নিষেধ করেন। আলীগড়ে 'পেট্রিয়টিক এসোসিয়েশন' (আগস্ট ১৮৮৮) গঠন করে তিনি কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন

৯. Government Circular No. 588 42 T.G. Darjeeling, 15th September, 1897 ; *The Moslem Chronicle*. 16 July 1898.
১০. *নবনূর*, আষাঢ় ১৩১২, পৃ. ১২৩
১১. *The Statesmen and Friend of India*. 25 December 1886
১২. Ibid. 19 December 1886

গড়ে তোলেন।[১৩] ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মত বাংলাদেশেও তার তরঙ্গ উত্থিত হয়। বাংলার সদর ও মফস্বলের শহরগুলিতে বিবিধ এসোসিয়েশন ও আঞ্জুমান ছিল। সেগুলির অধিকাংশ সৈয়দ আহমদের আবেদনে সাড়া দেয় এবং কংগ্রেস-বিরোধী 'স্বাক্ষরতা অভিযান' চালায়। ঢাকায় খাজা মোহাম্মদ ইউসুফের সভাপতিত্বে একটি 'কংগ্রেস-বিরোধী আন্দোলন কমিটি' গঠিত হয়। ঢাকার ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান থেকে বিরত রাখাই ঐ কমিটির উদ্দেশ্য ছিল। উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সময় ঢাকার আঞ্জুমনে ইসলাম কংগ্রেসের পক্ষে ছিল।[১৪] ময়মনসিংহের মহামেডান এসোসিয়েশনের সম্পাদক হামিদউদ্দীন আহমদ এতদঞ্চলে সন্তোষজনক আন্দোলনের বিবরণ দিয়ে সৈয়দ আহমদকে পত্রোত্তর দেন। হুগলীর ন্যাশনাল মহামেডান এসোশিয়েশনের সম্পাদক আশরাফউদ্দীন আহমদও অনুরূপ পত্রোত্তর দেন।[১৫] নব্বই দশকের মুসলমান সম্পাদিত বাংলা ও ইংরাজি পত্র-পত্রিকার বেশির ভাগই সৈয়দ আহমদের আন্দোলনকে সমর্থন দেয় এবং জনমত গড়ে তুলতে প্রচার অভিযান চালায়। সাপ্তাহিক মিহির ও সুধাকরের ২য় বর্ষ ১২শ সংখ্যায় (২৭ পৌষ ১৩০৭) 'কংগ্রেস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শিরোনামে সম্পাদকীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। বাংলার মুসলমান কেন 'কংগ্রেসের বিরুদ্ধবাদী' সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিয়ে ঐ নিবন্ধে লেখা হয়, "আমরা কংগ্রেসের প্রধান উদ্দেশ্যের প্রতিযোগী নহি। কিন্তু যে প্রণালীতে কংগ্রেসের কার্য চলিয়া আসিতেছে, তৎসম্বন্ধে আমাদের আপত্তি। আমরা দেখিতেছি; প্রজার প্রকৃত হিতসাধনের পরিবর্তে কংগ্রেস এখন নানাবিধ অপ্রীতিকর রাজনৈতিক বিষয়ে অবতারণা করিয়া সাধারণ বাঙ্গালী জাতিকে রাজপুরুষদের চক্ষে ঘৃণিত ও হেয় করিয়া তুলিতেছেন। এই চাকুরিজীবী বাঙ্গালী এই কংগ্রেসের জন্য রাজপুরুষদের বিরাগভাজন হইয়াছেন। একতা লইয়া কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। কংগ্রেস মন্দিরে কংগ্রেস পাণ্ডাদের মধ্যে সে একতা কোথায়? বাঙ্গালাদেশ কংগ্রেসের উদ্ভব ক্ষেত্র, কিন্তু বাঙ্গালী সম্পাদকেরা, কংগ্রেসের অধিনায়কেরা আত্মদ্রোহে নিমগ্ন।... সৈয়দ আহমদ সাহেব প্রথমে কংগ্রেসের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা দেখিয়া ভবিষ্যৎ বুঝিয়া সেই কর্মবীর তাহার প্রতি সহানুভূতিশূন্য হন। আমরা তাই নানা কারণে কংগ্রেস দ্বারা সুফল লাভের আশা করিতেছি না। অনেকে বলেন-আমরা কংগ্রেসের বিরোধী।...আমরা কংগ্রেসের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি পূর্ণ। কিন্তু ইহার বর্তমান কর্ম প্রণালীর বিরোধী।"

মাসিক হাফেজের প্রথম বর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় (ফেব্রুয়ারি ১৮৯৭) সেখ ওসমান আলী বিএল 'কংগ্রেস ও মুসলমান জাতি' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। মুসলমানগণ কংগ্রেসে যোগদানে অনিচ্ছুক কেন সে বিষয়ে আলোকপাত করে তিনি বলেন, "কংগ্রেস যেরূপভাবে গবর্ণমেন্টের কার্যাবলীর সমালোচনা প্রতিবাদ আদি করিয়া থাকে,

১৩. মুজিবর রহমান (অনূদিত)—*স্যার সৈয়দ আহমদ*, ঢাকা ১৯৬৯,ম পৃ. ৩০৬-৩৯
১৪. *Hindu-Muslim Relations in Bengal*, pp. 116
১৫. *Ibid.*, pp. 117, 123

তাহাতে বোধ হয় কংগ্রেস গভর্ণমেন্টের বিরোধী, সুতরাং এহেন কংগ্রেসে মুসলমানদের যোগ দিয়া গভর্ণমেন্টের বিরাগভাজন হওয়া উচিৎ নহে...মুসলমানেরা বলেন যে, কংগ্রেস দ্বারা কোন ফল লাভ হইলে হিন্দুরাই তাহা বণ্টন করিয়া লইবে, মুসলমানেরা কিছুই পাইবে না।" মাসিক প্রচারকের ১৩০৮ সনের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যায় (৩য় বর্ষ ৮–৯ম সংখ্যা) এ. উ. আহমদ 'কংগ্রেস ও মুসলমান' শীর্ষক প্রবন্ধে কংগ্রেসের কার্যকলাপে সন্দেহ পোষণ করে বলেন, "ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ও মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্বাচন প্রথা প্রচলন করিয়া গভর্ণমেন্ট অবশ্য কংগ্রেসের নেতাগণের অনুমোদিত কার্যই করিয়াছেন।...এই সমস্ত অধিকার হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টানগণ সকলেই পাইয়াছে, পাইয়া ফল কি দাঁড়াইয়াছে? প্রত্যেক মিউনিসিপ্যালিটীতেই হিন্দু মেম্বারগণই মনোনীত হইয়াছে, লাট সাহেবের সভায় হিন্দু মেম্বরগণই নির্বাচিত হইতেছে। প্রথম বারে দেখাইবার নিমিত্ত খান বাহাদুর সেরাজুল ইসলাম সাহেবকে চট্টগ্রাম বিভাগ হইতে মনোনীত করিয়াছিলেন ; তারপর হইতেই সেন, বাঁড়ুয্যে, মুখুর্যদেরই এক চেটিয়া হইয়াছে।...কংগ্রেসের রঙ্গমঞ্চের উদারতা মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনে স্বার্থপরতার নিকট হার মানিয়াছে। আমরা মিউনিসিপ্যালিটীতে নির্বাচন প্রথা প্রচলন হওয়ার পর হইতে যে সমস্ত মুসলমান মেম্বর দেখিতে পাই, তাহার সমস্তই গভর্ণমেন্ট নির্বাচিত মেম্বর।" একিনউদ্দীন আহমদ অভিন্ন শিরোনামে (Muhammedans and the Congress) ইংরাজি সাপ্তাহিক মোসলেম ক্রনিকলে (১০ জানুয়ারি ১৮৯৫) বলেন, Among these one of the most import is the profound want of confidence felt by them (Muhammedans) in their Hindu compatriots, who have, all along been demanding power in the name of the people at large," ক্ষমতার দাবিতে কংগ্রেস নেতাদের স্বার্থপরতার জন্য মুসলমানরা আস্থা হারিয়ে ফেলেছে, এখানে তার প্রতি ইঙ্গিত আছে। মৌলভী শামসুল হোদা এমএ বিএল 'Indian Politics and the Muhammedans' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ মোসলেম ক্রনিকলে (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫) প্রকাশ করেন। এখানে মুসলমানদের প্রতি জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাবের একটা পরিচ্ছন্ন চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।

মুসলমানের একটি শ্রেণী কংগ্রেসের বিপক্ষে ছিল, আবার একটি শ্রেণী পক্ষেও ছিল। ব্যতিক্রম ছাড়া কংগ্রেসের প্রায় সব অধিবেশনে মুসলিম প্রতিনিধি যোগদান করেছেন।[১৬] গুনিয়াউকের আবদুর রসুল, বর্ধমানের আবুল কাসেম, লেদুয়ারের আবদুল হালিম গজনবী, পাবনার ইসমাইল হোসেন সিরাজী, ফরিদপুরের আলিমুজ্জামান চৌধুরী কংগ্রেসকে সমর্থন দেন। 'সোলতানে'র (১৯০১) মত দু'একটি পত্রিকাও কংগ্রেসের পক্ষে জনমত প্রচার করে। চট্টগ্রামের মৌলানা মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান সোলতানের সম্পাদক ছিলেন। এক ব্যারিস্টার আবদুর রসুল ছাড়া এদের নেতৃত্ব ছিল আঞ্চলিক, তাঁরা বিশ শতকের গোড়ার দিকে আবির্ভূত হন।

১৬. পরিশিষ্ট— ১ (ঘ) দ্রষ্টব্য।

মুসলিম জাতীয়তাবাদ

উনিশ শতক পর্যন্ত আবদুল লতিফ ও সৈয়দ আমীর আলীর প্রভাবই সর্বাধিক ছিল। আমীর আলী কেবল শিক্ষা, চাকুরি ও প্রশাসনে মুসলমানের আর্থিক সুবিধা ও ক্ষমতা লাভের দাবি উত্থাপন করেই ক্ষান্ত হননি, তিনি বিবিধ প্রবন্ধ ও পুস্তক রচনা করে ইসলামিক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন দ্বারা সমাজের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বলা যায়, এটি তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার ও কর্মের দ্বিতীয় ধারা ছিল। ফারায়েজি ও ওয়াহাবি আন্দোলনের আর্থ-রাজনৈতিক দিক ছাড়াও একটি ধর্মীয়-সামাজিক দিক ছিল—সেটি হল ইসলামিকরণ। অনৈসলাকি রীতিনীতি ও আচার-আচবণ মুসলিম সমাজকে পঙ্গু ও হীনবীর্য করে রেখেছে। এজন্যই পতন, দারিদ্র্য ও দুর্গতি। মৌলনা কেরামত আলীও (১৮০০-৭৩) দীর্ঘ ৫০ বছর ধরে এধারার আন্দোলন চালিয়ে যান। হাজী শরীয়তুল্লাহ ও দুধু মিয়ার সাথে কেরামত আলীর সাক্ষাৎ পরচিয় ছিল। তিনি তরিকার আধ্যাত্মিক দিক অক্ষুণ্ন রেখে ধর্ম ও সমাজের সংস্কারে মনোযোগী হন। ইসলামিকরণের সাথে ইসলামি ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবনেব চেতনা যুক্ত হয়ে বাঙালি মুসলমানের চিন্তাধারা এক নতুন রূপ গ্রহণ করে। নব্বই দশকে বাংলা সংবাদপত্রের আবির্ভাব হলে এ-দুটি বিষয়ই সেগুলির আলোচনার প্রধান বস্তু হয়ে ওঠে। স্বসমাজ সম্পর্কে এই নববোধ 'মুসলিম জাতীয়তা' সৃষ্টিতে সহায়তা করে। এটি মূলত আমীর আলীর দান। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাধারাকে অনুসবণ করে অচিরেই কয়েকজন লেখক, সাংবাদিক ও সমাজকর্মী আত্মপ্রকাশ করেন যাঁরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করে 'বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদের' জন্ম দেন। এঁদের মধ্যে আছেন মীর মশাররফ হোসেন, শেখ আবদুর রহিম, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুদ্দীন আহম্মদ মাশহাদী, মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, শেখ ফজলল করিম, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী, নওয়াব আলী চৌধুরী, আবদুল করিম বিএ, তসলিমদ্দীন আহমদ বিএ, শেখ ওসমান আলী বিএ প্রমুখ। নওয়াব আলী চৌধুরী বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ইসলামের গৌরবপূর্ণ ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিষয় অন্তর্ভুক্ত করার দাবি তোলেন। নবাব আবদুল লতিফ সর্ব প্রথম পাঠ্যপুস্তকের অনৈসলামিক ও সমাজের নিন্দামূলক বিষয়গুলি বাদ দেওয়ার কথা বলেন এবং 'সেন্ট্রাল টেকস্ট বুক কমিটি'তে বেশি মুসলমান সদস্য নিয়োগের প্রস্তাব দেন। 'পাঠ্যপুস্তক শুদ্ধি আন্দোলনে' কমবেশি সকল কবি-সাহিত্যিক এগিয়ে আসেন এবং আকাঙ্ক্ষিত আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়ে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। তাঁরা অনুবাদ, গবেষণা ও অন্যান্য মৌলিক গ্রন্থ রচনা করেও ইসলামি ঐতিহ্য তুলে ধরেন। প্রধানত খ্রিষ্টান ও হিন্দুয়ানী বিষয় ও ভাবধারার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন হয়েছিল। মাতৃভাষাকে আন্দোলনের মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করায় ক্রমে বাঙালি মুসলমানের 'আত্ম-পরিচয়বোধে'র উন্মেষ হয়। আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর আন্দোলনে বাঙালি হিসাবে আত্ম-পরিচয়ের ধারণাটি স্পষ্ট ছিল না ; তাঁরা নিজেরাই উর্দু-ফারসির সমর্থক

ছিলেন। উর্দু-বাংলা দ্বন্দ্বে উর্দুকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করে বাঙালি মুসলমান আত্ম-পরিচয়ের স্পষ্ট স্বাক্ষর দেয়।

অনেকে বলেন, দোভাষী পুথির বিষয়গত ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য প্রণোদিত ছিল। দোভাষী বাংলায় কোন হিন্দু লেখক পুথি রচনা করেননি। পুথিকারগণ উর্দু-হিন্দি-ফারসি-বাংলার মিশ্রণে মুসলমানের জন্য একটি স্বতন্ত্র ভাষা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। সংস্কৃত পণ্ডিতদের হাতে গড়া বাংলা মুসলমানের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এরূপ ধারণা আবদুল লতিফেরও ছিল। এজন্য তিনি বাংলা স্কুলে আদালতের দলিলপত্রের ভাষায় শিক্ষাদানের পরামর্শ দেন। দোভাষী পুথি শেষ পর্যন্ত টিকেনি সত্য, কিন্তু যতদিন তা চালু ছিল, ততদিন বাঙালি মুসলমানের সাহিত্যরস পিপাসা মিটিয়েছে এবং আত্মজিজ্ঞাসার সন্ধান দিয়েছে। বাঙালি মুসলমানের আত্ম-পরিচয়ের প্রথম ক্ষেত্র-প্রস্তুত করে দোভাষী পুথি। ইসলামিকরণের যে প্রক্রিয়া ওয়াহাবি-ফারায়েজিগণ শুরু করেছিলে, দোভাষী পুথিতে তারই প্রতিফলন আছে। বাংলার কৃষক-মজুর-মাঝি-মাল্লা-তাঁতি-জেলে সকল স্তরের মানুষ পুথির অনুরাগী পাঠক অথবা মনোযোগী শ্রোতা ছিল।

১৮৭১, ৮১, ৯১, সালের সেন্সাস রিপোর্ট, কতিপয় ইউরোপীয় পণ্ডিতের লেখা বাঙালির ইতিহাস, নৃতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক গ্রন্থ, খোন্দকার ফজলে রাব্বির 'হকিকাতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) ইত্যাদিতে নতুন ভাবে বাঙালি মুসলমানের আত্ম-পরিচয় জিজ্ঞাসার উদ্রেক হয়। নব্য শিক্ষিত মুসলমান লেখক-সাংবাদিকগণ বাংলা সাহিত্যে ও সংবাদপত্রে তারই সমাধান খুঁজেছেন। পরবর্তীকালে এটি আরও পল্লবিত ও পরিপুষ্ট হয়েছে। সুতরাং ইসলামিকরণের আন্দোলন এবং মুসলমান হিসাবে আত্ম-পরিচয়ের অনুসন্ধিৎসা 'মুসলিম জাতীয়তা'র বীজ বপন করে। হিন্দু জাতীয়তার পাশে মুসলিম জাতীয়তা স্থান করে নেয়। সম্প্রদায়ভিত্তিক জাতীয়তার চেতনা হিন্দু-মুসলমানের রাজনীতিকে দ্বিখণ্ডিত ও দ্বিমুখী করে। মাতৃভাষার প্রশ্নে বাংলাকে গ্রহণ করে বাঙালি মুসলমান অবাঙালি মুসলমান থেকে পৃথক হয়েছে, আবার জাতীয়তার প্রশ্নে স্বভাষী হিন্দুর সাথেও ঐক্য স্থাপন করেনি। অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক স্বার্থে দেশ-ভাষা-রক্ত-ঐতিহ্যের চেতনা চাপা পড়ে যায় এবং উভয়ে দুটি বিবদমান জাতিতে পরিণত হয়।

বিশ্ব-মুসলিমবাদ

এর সাথে 'প্যান-ইসলামিজম' বা বিশ্ব-মুসলিমবাদের বিষয়টি আলোচনা করলে বাংলার মুসলমানের রাজনীতির স্বতন্ত্র চরিত্রটি পরিস্ফুট হয়। বিশ্ব-মুসলিমবাদের প্রবক্তা ছিলেন আফগানিস্তানের সৈয়দ জামালউদ্দীন (১৮৩৮-৯৭)। তিনি ইরাকে লেখাপড়া করেন। তাঁর রাজনৈতিক কর্মক্ষেত্র ছিল তুরস্ক। তুরস্কের সুলতান সমগ্র মুসলিম বিশ্বে 'খলিফাতুল মোসলেমীন' বা আধ্যাত্মিক প্রতিনিধির মর্যাদা পেতেন। জামালউদ্দীন আফগানী খলিফাতুল মোসলেমীনের সূত্র ধরেই বিশ্ব-মুসলিমবাদের আদর্শ প্রচার করেন। তিনি একাধিক বার ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি ১৮৮০-৮২ সালে কলকাতায় অবস্থান করেন এবং

মুসলমান নেতৃবৃন্দের সাথে মিলিত হন। সৈয়দ আমীর আলী এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এলবার্ট হলে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা করেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ভ্রমণ করে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলি, বিশেষ করে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যেরূপ প্রবল হয়ে উঠেছে, তাতে তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হলে ক্ষুদ্র ও দুর্বল মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সম্মিলিত শক্তির প্রয়োজন। এজন্য তিনি ইসলামের সৌভ্রাতৃত্বের নীতিতে বিশ্ব-মুসলিম রাষ্ট্রগুলিকে ঐক্যসূত্রে বাঁধার চিন্তা করেছিলেন। এক আল্লাহ, এক রসুল, এক কোরানের বাণী প্রচার করে তিনি ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রিক সীমানা অতিক্রম করে মুসলমানদের একতা ও সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এটাই ছিল প্যান-ইসলামের ভাবাদর্শ (Ideology)। খলিফাতুল মোসলেমীনের আদর্শ ধর্মীয়, প্যান-ইসলামের আদর্শ পুরোপুরি রাজনৈতিক। স্বয়ং আমীর আলী এই আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। বাংলার অনেক লেখকও এই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। টাঙ্গাইলের মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশাহাদী জামালউদ্দীন আফগানীর সাক্ষাৎ ভাবশিষ্য ছিলেন। তাঁর 'সমাজ ও সংস্কারক' (১৮৮৯) গ্রন্থখানি প্যান-ইসলামী ভাবাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যেই রচিত হয়। ব্রিটিশ সরকার গ্রন্থটি বাজেয়াপ্ত করেন। প্রচারক পত্রিকায় (পৌষ ১৩০৭) সম্পাদক মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ বলেছেন, "সমাজ ও সংস্কারকের প্রচারে বঙ্গের অধিকাংশ মুসলমান নবজীবন লাভ করিয়াছে, স্বার্থ বলিদান করিতে শিখিয়াছে এবং কার্যক্ষম হইয়াছে।" মোহাম্মদ মেয়ারাজুদ্দীন আহমদ, মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী, ইসমাইল হোসেন সিরাজী প্রমুখ লেখকও প্যান-ইসলামি ভাবধারায় বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের রচনায় আরব-ইরান-তুরস্ক-আফগানিস্তানের গৌরব যুগের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বিবরণ বেশি স্থান পেয়েছে। সৈয়দ আমীর আলী প্রথম এদিকে দৃষ্টিপাত করেন। তাঁর বিবিধ প্রবন্ধে ও গ্রন্থে তার স্বাক্ষর আছে।

১৮৭৭ সালে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ হয়। তখন তুরস্কের সিংহাসনে আবদুল হামিদ খান (১৮৪২-১৯১৮) অধিষ্ঠিত ছিলেন। বুলগেরিয়া, রুমানিয়া, সার্ভিয়া, তুর্কী সুলতানের অধীনে ছিল। এগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুললে রাশিয়া, ফ্রান্স, ইতালি ও ইংলণ্ড চতুঃশক্তি তাদের মদদ জোগায়। আবদুল হামিদ খানের শাসন-সংস্কারেও (১৮৭৬) সন্তুষ্ট না হয়ে রাশিয়া সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে। গাজী ওসমান পাশা প্লেভনা দুর্গ জয় করেও শেষ রক্ষা করতে পারেননি। ১৮৭৮ সালের ৩ মার্চ রুশ-তুর্কীর মধ্যে 'সান স্টেফানো চুক্তি' হয়। এতে ইউরোপের অধিকাংশ রাষ্ট্রে তুরস্কের ক্ষমতা লোপ পায়। যুদ্ধকালে ইংলণ্ড রাশিয়াকে সমর্থন দিলেও, চুক্তির শর্তে রাশিয়ার এক তরফা প্রাধান্যে ইংলণ্ড খুশি হয়নি। জার্মানি এ ব্যাপারে ইংলণ্ডকে সমর্থন দিলে রাশিয়া বার্লিনের বৈঠকে মিলিত হয়ে সান স্টেফানো চুক্তি সংশোধন করতে বাধ্য হয়। এ-সময় ইংলণ্ড সুলতানের এশিয়ার রাজ্যগুলিকে 'আশ্রিত রাজ্য' (protectorate states) হিসাবে ঘোষণা করে।

অন্যূন এক বছরের রুশ-তুরস্কের এই যুদ্ধে, যুদ্ধের ফলাফল, চুক্তির শর্ত ইত্যাদি ভারতের মুসলমানদের নানাভাবে অলোড়িত ও বিচলিত করে। বহু লোক প্রাণ হারায়,

অনেকে আহত হয় ও আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তুরস্কের এরূপ ক্ষয়ক্ষতিতে ভারতে মুসলমানরা মর্মাহত হয় ; তারা যুদ্ধাহত ও ক্ষতিগ্রস্ত তুর্কীদের সাহায্যের জন্য বহু অর্থ সংগ্রহ করে দান হিসাবে সেখানে প্রেরণ করে। কলিকাতায় 'মহাম্মদি আখবার' নামে একটি বহুভাষী পত্রিকা (৪ জুন ১৯৭৭) যুদ্ধের কথা দেশবাসীর কাছে পৌছে দেওয়ার ও তাদের সহানুভূতি উদ্রেক করার উদ্দেশ্যেই জন্ম লাভ করে। অধিকাংশ সম্পাদকীয় নিবন্ধ যুদ্ধের ঘটনাবলীকে কেন্দ্র করে লেখা হত। ১৫ জুন ১৮৭৭ সালের ৪র্থ সংখ্যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধে লেখা হয় "ভাইগণ! রাশিয়া লালচ ও আদাওতের সববে রূমের' পরে চড়াই করিয়াছে, কারণ এই যে, মক্কা, বায়তুল মাকাদ্দস, মদিনা ও কারবালা হাত করিয়া মুসলমানদের ইমানের হানি করে। তুর্কি মুসলমানেরা ইমানকে জান হইতে অধিক জানে ; এই বিপদ টালিবার জন্য জোরু, লাড়কা, জানমাল শুদ্ধা খোদার রাহে দিতে আছে।... হাজারও হাসপাতালে কতোকতো জখমি পড়িয়া আছে, হাজারও বেওয়া আওরত অনাথ ও লাচার বসিয়া আছে। ঐ জখমিদের জন্য আর ঐ বেওয়াদের জন্য... তাহাদের খবর নিতে টাকা পাঠাও। দেখো সওয়াব সস্তায় বিলাইতেছে। কিনে লহ। বেহেস্ত অল্প পয়সায় পাওয়া যাইতেছে। আর বুঝিও না যে, আমাদের ইংলণ্ডের বাদশা তোমাদের উপর নারাজ হইবেন। ... আমি 'দারুল খেলাফত' নামক তুর্কি পত্রিকায় দেখিয়াছি এবং কর্ণেল লিস সাহেবের পত্রে জানিয়াছি যে, তুর্কির প্রতি ইংলণ্ডের ধনী প্রজারা অনেক মমদ করিতেছেন, আর চাঁদা কমিটিও স্থাপিত করিয়াছেন—যাহাতে সরকার কোন বাধা দেন নাই।"

রুশ-তুর্কীর যুদ্ধকে ঐ পত্রিকা মুসলমানদের জন্য 'জেহাদ' বলে উল্লেখ করেছে, জেহাদে অংশগ্রহণ করা মুসলমান মাত্রেরই পুণ্যের কাজ। ঐ পত্রিকা থেকে জানা যায় যে, ঢাকার নবাব খাজা আবদুল গণি এবং নবাব আহসানউল্লাহ ২০ হাজার টাকা, নবাব আবদুল লতিফ 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি'র পক্ষ থেকে ১০ হাজার টাকা, সৈয়দ আমীর আলী 'ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশনে'র পক্ষ থেকে ৫৭৮৩ টাকা তুরস্কে প্রেরণ করেন। বোম্বাই-এ তুরস্কের রাজদূত হোসেন হাবিব আফেন্দীর মাধ্যমে ভূপালের বেগম ২ লক্ষ ২ হাজার টাকা প্রেরণ করেন।[১৭]

আবদুল লতিফ আত্মজীবনীতে (মাই পাবলিক লাইফ) লিখেছেন যে, তুর্কী-সার্ভিয়ার যুদ্ধে বাংলার মুসলমানদের সহানুভূতি সুলতান ও তুরস্কের জনগণের প্রতি পুরামাত্রায় ছিল। তিনি বাংলা সরকারের অনুমতি নিয়ে ১৮৭৭ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে কলকাতার টাউন হলে সভা করেন। এতে একটি সাহায্য তহবিল গঠনের এবং তুরস্কের সুলতানকে রাণী ভিক্টোরিয়া যাতে সহযোগিতা করেন সেজন্য তাঁর নিকট একটি স্মারকপত্র প্রেরণের প্রস্তাব নেওয়া হয়।[১৮] 'দি ইংলিশম্যান' (৯ অক্টোবর ১৯৭৭) ঐ সভার বিস্তৃত

১৭. আবদুল কাদির-'মহাম্মদি আখবার', *মুসলিম বাংলা সাময়িকপত্র*, ঢাকা ১৩৬৬, পৃ. ২২
১৮. *Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writings and related Documents*, p. 176

বিবরণ দিয়ে বলেছে যে এত বড় সভা কলকাতা শহরে বা অন্যত্র হয়নি ; আমীর থেকে মজদুর পর্যন্ত বহু লোক সমবেত হয়েছিল। আবদুল লতিফ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং উর্দুতে বক্তৃতা দেন। তিনি রুমের সহিত ব্রিটিশ সরকারে মিত্রতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এটি রাজনৈতিক যুদ্ধ, জেহাদ নয়। ঐ পত্রিকা এই সভাকে মুসলমানদের পক্ষে অন্যতম 'রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা' বলে মন্তব্য করে।[১৯] আবদুল লতিফ বলেছেন, তাঁর এই আন্দোলন সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ে। তুর্কীর সুলতান প্রতিদানে তাঁকে 'মুজিদী' উপাধি দেন।[২০] মহাম্মদি আখবার এক সংখ্যায় (২৩ জুলাই ১৮৭৭) বলেছে যে, ঐ সময় হিন্দুরা 'রুশ-মৈত্রী'র প্রতি কটাক্ষ করেছে। তবে উদারপন্থী নেতারা বাঙালি মুসলমানদের সমর্থন দিয়েছেন। 'দি বেঙ্গলি'র সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (১৮৩৯-৯৪) পূর্বোক্ত সভা সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য আবদুল লতিফকে সাহায্য করেছিলেন।[২১] যুদ্ধের সময় মুসলমানরা মসজিদে মসজিদে বিশেষ মোনাজাতের ব্যবস্থা করে।[২২] তুর্কীর প্রতি এই সহানুভূতির রেশ দীর্ঘদিন চলে। ১৯০০ সালে 'দামেস্ক-হেজাজ রেলওয়ে' নির্মাণের সময় চাঁদা সংগ্রহের আন্দোলন হয়। এ উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয় এবং পত্র-পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে তুরস্কে প্রেরণ করা হয়।[২৩] তুর্কীর সুলতানের সিংহাসন আরোহণের 'রৌপ্য জুবিলী উৎসব' (১৯০০) খুব উৎসাহের সাথে পালিত হয়। এ সবই বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্বের চেতনার ফল। বাঙালি মুসলমানের 'আত্ম-পরিচয়' (Identity) ও 'মুসলিম জাতীয়তা'র (Muslim Nationalism) গঠনে এসবের প্রভাব পড়েছে।

হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও শিবাজী উৎসব

হিন্দু জাতীয়তার গৌরব, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রাজনারায়ণ বসু, রাম গোপাল ঘোষ যখন মোঘল-পাঠান বাদশাদের হীনবীর্য করে এবং মারাঠা-রাজপুতদের বীরপুরুষ ও আদর্শ নেতা করে চিত্রিত করেন, তখন বাংলার মুসলিম সমাজে তার প্রতিক্রিয়া হয়েছে শুধু এই কারণে যে, মোগল-পাঠান নবাব-বাদশাহ মুসলমান ছিলেন। সাম্রাজ্যবাদী শাসকশ্রেণীর নিজস্ব চরিত্র আছে—মোঘল-পাঠান

১৯. *Op. cit.* P. 185 (Appendix).

২০. *Ibid.* P. 177.

২১. Nirmal Sinha--*Freedom Movement in Bengal* (1818--1905), Calcutta, 1968,p. 260

২২. C. E. Buckland--*Bengal under the Lietenant Gorernors. Vol.* 11. 1901, p. 661

২৩. *ইসলাম-প্রচারক*, চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৬-৭
মৌলবী মোহাম্মদ ইউসুফ খান বাহাদুর (উকিল, কলকাতা হাইকোর্ট) আবদুর রহিম (ব্যারিস্টার-এট-ল) সৈয়দ জহিরুদ্দীন, ঐ), ও মোহাম্মদ আসগর (ঐ) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ঐ, অগ্রহায়ণ ১৩১২, পৃ. ৩৩১

শাসকদের সে রূপে দেখা হয়নি। ঠিক একই কারণে বালগঙ্গাধর তিলক প্রবর্তিত 'শিবাজী উৎসব'কে (১৮৯৫) বাঙালি হিন্দুগণ যেভাবে গ্রহণ করেছেন, মুসলমানগণ সেভাবে গ্রহণ করেননি। সখারাম গণেস দেউস্কর বাংলাদেশে ঐ উৎসবকে জনপ্রিয় করে তোলেন (১৯০২)। রবীন্দ্রনাথ 'শিবাজী উৎসব' (১৩১১) কবিতা রচনা করে শিবাজীর মহত্ত্ব তুলে ধরেন এবং ভারতে এক ধর্মরাজ্য গঠনের স্বপ্নের কথা প্রচার করেন। বিপিনচন্দ্র পাল এটি সমর্থন করেন এই বলে যে, 'শিবাজী হিন্দুর সামাজিক-রাজনৈতিক আদর্শের প্রতীক', তাঁকে সম্মান করার অর্থ হিন্দুর আদর্শকে সম্মান করা।[২৪] সমকালের মুসলিম পত্র-পত্রিকায় 'শিবাজী উৎসবে'র বিরূপ সমালোচনা হয়। ইসলাম-প্রচারক, মিহির ও সুধাকর ও মোসলেম ক্রনিকলে এ-সম্পর্কে সংবাদ ও প্রতিবেদন ছাপা হত। শেখ ওসমান আলী 'বাঙালি জাতি ও শিবাজী' এবং 'শিবাজী উৎসব ও মুসলমান জাতি' শিরোনামে দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে *ইসলাম-প্রচারকে* (মে-জুন ১৯০২) এবং কোহিনুরে (ভাদ্র ১৩১৩) প্রকাশ করেন। তিনি বিষয়টিকে সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করেও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে ফাটল সৃষ্টি করেছে বলে শিবাজী-উৎসবের বিপক্ষে মত দেন। তিনি এটিকে সরাসরি হিন্দুর 'সাম্প্রদায়িক উৎসব' বলে আখ্যাত করেন।[২৫] বাসনা পত্রিকায় 'শিবাজী' শিরোনামে সম্পাদকের (শেখ ফজলল করিম) মন্তব্যে বলা হয়, "বাঙ্গালা দেশের কোন কোন স্থানে আজকাল 'শিবাজী উৎসব' প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চলিতেছে। যাঁহারা 'শিবাজী উৎসবে'র পক্ষপাতী তাঁহাদের হৃদয় যে শিবাজীর প্রতি অতি মাত্রায় ভক্তিমান তাহা বলাই বাহুল্য। 'আদর্শ বীর' বলিয়াই তাঁহারা শিবাজীর চরিত্র অনুকরণ করিতেছেন, কিন্তু সত্য ইতিহাসের চক্ষে শিবাজীর এই মহত্ত্ব কৃত্রিম।... যাঁহারা শিবাজীর চরিত্র সম্যকরূপে পর্যালোচনা করিয়াও তাঁহাকে 'বীর' বলিতে কুণ্ঠিত নহেন, আমরা কদাপি তাঁহাদের উদ্দেশ্যের প্রশংসা করিতে পারি না।"[২৬] মিহির ও সুধাকরে (৩ অগ্রহায়ণ ১৩১১) টাঙ্গাইল থেকে আজিজর রহমান প্রেরিত একটি প্রতিবেদন ছিল এরূপ ; "শিবাজী উৎসবে মুসলমানের যোগ দেওয়া উচিত নহে, ইহা আপামর সাধারণ মুসলমান মাত্রেই অবগত আছেন। আমাদের বঙ্গীয় হিন্দু ভ্রাতাদের যে কি স্বার্থ আছে তাহাও আমরা বুঝিতে পারি না ; তবে যদি মুসলমানদের অন্তরে আঘাত দিবার জন্য শিবাজী উৎসব করেন, সে স্বতন্ত্র কথা। যে শিবাজী ধার্মিকবর মহামান্য বাদশাহ আওরঙ্গজেবকে অশেষ প্রকারে বিরক্ত করিয়াছিলেন, সেই শিবাজীর উৎসবে তাঁহার কার্যকলাপের গুণ বর্ণনা কালে অবশ্য বাদশাহের কার্যকলাপের কার্যকলাপের উপর দোষারোপিত হইবেই হইবে, তাহা না হইলেও যে ব্যক্তি আমাদের বাদশাহের শত্রু, সে আমাদেরও শত্রু। এইরূপ কার্যকলাপের পোষকতা করা কোন মতে উচিত নহে বলিয়া আমরা তাহাতে যোগ দিতে পারি না। সন্তোষের জমিদার মহোদয়গণ নাকি স্ব স্ব মুসলমান প্রজাবৃন্দকে শিবাজী উৎসবে যোগ দিবার জন্য কঠোর আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন।... মুসলমান সমাজ গৌরব বন্ধুবর মৌলভী আবদুল হামিদ খাঁ ইউসফজয়ী সাহেবের অগাধ যত্নে ও চেষ্টায় হিন্দু ভ্রাতাগণ শিবাজী উৎসব

২৪. Bipin Chandra Pal--*The New Spirit*, Calcutta, 1907, p. 49

২৫ *কোহিনুর*, ভাদ্র ১৩১৩, পৃ. ১১১

২৬ *বাসনা*, বৈশাখ, ১৩২৬

সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।" উল্লেখযোগ্য যে, আবদুল হামিদ খান ইউসুফজয়ী গো-হত্যা বন্ধের ব্যাপারে মীর মশাররফ হোসেনকে সমর্থন দিয়েছিলেন।

হিন্দুগণের চোখে দস্যু বর্গীরা পর্যন্ত বীরপুরুষের মর্যাদা পেয়েছে। রাজপুত-মারাঠ রাজপুরুষ বাঙালি হিন্দুর আপন জন ছিলেন না। ইংরাজের দেওয়া তথ্যের উপর নির্ভর করে এবং নিজ ভাবাবেগ ও মতাদর্শের রঙ-তুলি মিশিয়ে হিন্দুগণ যে ইতিহাস ও সাহিত্য রচনা করেছেন, তাতে ভারতের মুসলমানগণ আঘাত পেয়েছেন ; আবার হিন্দুগণের পুনর্জাগরণের যুগের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সহানুভূতির সাথে না দেখে এবং দেশীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্থলে আরব-ইরান-তুরস্ক-আফগানিস্তানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের চিন্তায় আত্মনিয়োগ করে মুসলমানগণ হিন্দুর চিত্ত থেকে দূরে সরে গেছেন। স্বজাতি, স্বভাষী, স্বদেশী, সমরক্ত ও সমসংস্কৃতির মানুষ হয়েও বাংলার হিন্দু-মুসলমান এক হতে পারেননি—এই বহির্মুখী ও বিপরীতমুখী রাজনৈতিক মতাদর্শের কারণেই। ঔপনিবেশিক শোষণে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও অবিকশিত অর্থনীতি, প্রশাসনিক সুয়োরানী-দুয়োরানী নীতি, মধ্যবিত্তের অসমবিকাশ, শ্রেণীস্বার্থের অন্তর্নিহিত বিরোধ এবং ধর্ম-বর্ণবৈষম্যের কারণে এরূপটি হয়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

উনিশ শতকে বাংলার মুসলমানের রাজনীতির ধারাবাহিকতা ছিল, তবে রাজনীতির ধরন ও নেতৃত্ব অভিন্ন ছিল না। ঐ শতকের প্রথম ভাগের রাজনৈতিক সংগ্রাম ধনী জমিদার, অত্যাচারী নীলকর ও বিদেশী ইংরাজ শাসকের বিরুদ্ধে যায়, দ্বিতীয় ভাগের রাজনৈতিক চেতনা ও প্রজ্ঞা প্রধানত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিদেশী শাসকের কাছ থেকে অধিকার আদায়ে নিয়োজিত হয়। এই সময় আত্ম-জিজ্ঞাসা, ধর্মাদর্শ ও ঐতিহ্য চিন্তার সমন্বয়ে মুসলিম রাজনীতির একটা স্বতন্ত্র চরিত্র গড়ে ওঠে। ব্রিটিশ শাসনের শুরুতে লর্ড ক্লাইভ পার্লামেন্টারী কমিটিতে সাক্ষ্য দান কালে বলেছিলেন যে, ইংরাজ যখন বিজয় গৌরবে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করে তখন লক্ষ লক্ষ লোক দাঁড়িয়ে তা দেখছিল, তারা ইউরোপীয়দের ধ্বংস করতে চাইলে কেবল লাঠি এবং পাথর দিয়েই তা করতে পারতো।[২৭] এই উক্তিতে এদেশের সাধারণ মানুষের রাজনৈতিক চেতনাব শূন্যতার ইঙ্গিত আছে। ন্যূনাধিক একশ' বছর পরে হান্টার মন্তব্য করেন যে, ভারতের মুসলমানগণ দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রিটিশ ভারত সাম্রাজ্যের একটি 'স্থায়ী বিপদ স্বরূপ' হয়ে আছে।[২৮] রাজনীতির ক্ষেত্রে এই পরিবর্তন যে হঠাৎ করে হয়নি তা আমাদের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ায় ও সামাজিক বিকাশের ধারায় ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে একটি জাতি চেতনার শূন্যতার স্তর থেকে চেতনার পূর্ণতার স্ততে অগ্রসর হয়েছে।

২৭. "That the inhabitants who were spectators upon that occasion, must have amounted to some hundred thousands ; and if they had an inclination to have destroyed the Europeans, they migth have done it with sticks and stones. **উদ্ধৃতি গৃহীত : অসিকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়— *ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য*, কলিকাতা, ১৯৬৫, পৃ. ১২ (২য় সং)।**

২৮. *The Indian Mussalmans*, 1871

উপসংহার

১২০৩ খ্রিষ্টাব্দে পাঠান শাসনকর্তা বখতিয়ার খিলজি কর্তৃক বঙ্গ বিজয় থেকে শুরু করে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধে স্বাধীন নবাব সিরাজদ্দৌলার পতন পর্যন্ত ন্যূনাধিক সাড়ে পাঁচ শ' বছরকে বঙ্গদেশের মুসলিম শাসনামল বলে গণ্য করা হয়। পাঠান ও মোঘল আমীর, সুলতান, সুবেদার, নবাব কখন দিল্লীর সাম্রাজ্যবাদী শাসকের প্রতিনিধি হিসাবে,কখন প্রাদেশিক স্বাধীন সামন্তবাদী শাসনকর্তা হিসাবে এদেশে রাজত্ব করেন। মুসলিম শাসকের অভ্যুদয়ের সাথে মুসলিম সমাজেরও গোড়াপত্তন হয়। শাসক, সৈনিক, বণিক, ধর্মপ্রচারক, ভাগ্যান্বেষী ইত্যাদি শ্রেণীর বহিরাগত মুসলমানের অবস্থান ও আবাসভূমি নির্মাণ, দেশীয় হিন্দু-বৌদ্ধ জনসাধারণের ধর্মান্তর গ্রহণ, দেশী-বিদেশীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কহেতু রক্তের মিশ্রণ—এই ত্রিবিধি পদ্ধতিতে মুসলিম সমাজের বিকাশ, বিস্তার ও সমৃদ্ধি ঘটে। ব্রিটিশ আমলে ১৮৭১ সালের সেন্সাস রিপোর্টে মুসলমান সংখ্যা-গরিষ্ঠতা লাভ করে। মধ্যযুগের সাম্রাজ্যবাদী-সামন্তবাদী শাসন-ব্যবস্থায় সামাজিক-অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও মুসলিম সমাজ যে দেশের গভীরে শিকড় গেড়েছিল তার প্রমাণ কেবল সংখ্যাবৃদ্ধিতে নয়, এদেশের শিল্প-সংস্কৃতিতেও আছে। ইসলামি নতুন ঐতিহ্য ও ভাবধারার প্রবর্তন, দেশীয় সংস্কৃতিতে সেগুলির প্রভাব ও মিশ্রণের কথা বিচার করলে মুসলিম সমাজের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ও আত্মা উপলব্ধি করা যায়।

যান্ত্রিক ও প্রকৌশলী বিদ্যা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসারের ফলে উনিশ শতকে ইউরোপের নানা স্থলে পরিবর্তন হয়েছিল, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক বাংলা ও ভারত বিজয়ের ফলে এ দেশেও পরিবর্তনের ঢেউ লাগে। কোম্পানির ঔপনিবেশিক শাসননীতির, অর্থনীতির ফলে এদেশে শাসকশ্রেণীর অনুগত একটি 'কম্প্রাডর' তথা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব হয়। এই শ্রেণী ক্রমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষা লাভ করে ধর্ম-সমাজ-শিক্ষা সংস্কারের আন্দোলন করে এবং ভাবজগতে প্রভূত পরিবর্তন সাধন করে। এরাই আধুনিকীকরণ ও নবজাগরণের অগ্রদূত ছিল। কলকাতা শহরকেন্দ্রিক নবগঠিত এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে বাংলার মুসলমানের সংখ্যা নগণ্য ছিল। স্বল্প সংখ্যক মুসলমান অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর প্রাচ্য ভাষা ও বিদ্যার প্রতি মোহ ও আকর্ষণ দীর্ঘকাল তিরোহিত হয়নি। সিপাহী বিদ্রোহে চরম বিপর্যয়ের পর প্রকৃতপক্ষে এই মোহের অবসান হয়। এ-অঞ্চলের মুসলমান উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগ থেকেই ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতির প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান গ্রহণ করে আত্মিক ও বৈষয়িক উন্নতির চেষ্টা করে।

বাংলাদেশে হিন্দু মধ্যবিত্তের তুলনায় মুসলিম মধ্যবিত্ত সংখ্যায় স্বল্প এবং সময়ের দিক থেকে পশ্চাৎবর্তী ছিল। হিন্দু মধ্যবিত্ত প্রধানত উচ্চ বর্ণের সমন্বয়ে গঠিত, তাদের পুরাতন ঐতিহ্য এবং কালিক প্রবহমানতা ছিল। মুসলমান মধ্যবিত্তের গঠন মিশ্র, তাদের

জাতীয় চেতনা ও ঐতিহ্যবোধ সম্পর্কে পরিচ্ছন্ন ধারণার অভাব ছিল। হিন্দু ও মুসলমানের ধর্মীয়-সামাজিক আদর্শ ছিল ভিন্ন প্রকৃতির, এজন্য তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন এক সাথে ও এক পথে এগোয়নি। এমন কি, রাজনৈতিক আন্দোলনেও তারা একত্র হতে পারেনি। হিন্দু সমাজে যখন ব্রাহ্মধর্ম ও আর্যধর্ম নিয়ে আন্দোলন হচ্ছে, মুসলিম সমাজে তখন ওয়াহাবি ও ফারায়েজি আন্দোলন হচ্ছে। একের আন্দোলনের সাথে অন্যের আন্দোলনের আদর্শগত ও প্রকৃতিগত মিল তো নেই, বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিরোধ আছে। ইংরাজ-বিরোধী সিপাহী বিদ্রোহে সিপাহী ও সামন্ত প্রভুরা জ।ড়ত ছিলেন, ইংরাজ-সৃষ্ট মুৎসুদ্দি (comprador) শ্রেণী তাতে অংশ গ্রহণ করেনি। গ্রামীণ ও নাগরিক নেতৃত্বের দিক থেকেও ভিন্নতা ছিল।

শহরকেন্দ্রিক মুসলিম মধ্যবিত্ত উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে জেগে উঠেই দেখে যে তার অস্তিত্ব বিপন্ন। ঔপনিবেশিক শাসক ইংরাজ প্রধান শত্রু হলেও ইংরাজের সাথে বিরোধিতা করে টিকে থাকা সম্ভব নয়। বরং বৈষয়িক সুবিধা ভোগের ও উন্নতি লাভের জন্য শাসকশ্রেণীর সহযোগিতা আবশ্যক। প্রশাসনে ও চাকুরিতে সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রশ্নে সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অগ্রসরমান হিন্দু মধ্যবিত্তের সাথে সংখ্যালঘু ও পশ্চাদপদ মুসলিম মধ্যবিত্তের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাধে। সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুবিধা করা সম্ভব নয় বলে তারা সাম্প্রদায়িকতার দিকে ঝুঁকে পড়ে। শ্রেণী হিসাবে এমনিতেই মধ্যবিত্তের মধ্যে নানা অন্তর্বিরোধ আছে, তার উপর পরস্পবের বঞ্চনানীতির ও সরকারের ভেদনীতির ফলে বিরোধ ও সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে। অসম বিকাশ ও অভ্যন্তরীণ বিরোধের কারণে বাংলার হিন্দু ও মুসলমান মধ্যবিত্ত প্রথমে দ্বন্দ্ব ও পরে বিচ্ছিন্নতার দিকে এগিয়েছে।

কলকাতা মাদ্রাসার জুনিয়ার স্কলারশিপ পাশ আবদুল লতিফ সর্ব প্রথম মুসলিম সমাজে ইংরাজি ভাষা ও ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচলনের জন্য আন্দোলন করেন। শিক্ষা ও সংস্কৃতি মূলক প্রতিষ্ঠান 'মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি' গঠন করে তিনি মুসলমানের অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীকে একত্র করেন। মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি হয়েও তিনি প্রাচীন অভিজাত ও এলিট শ্রেণীকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। এজন্য তাঁর সোসাইটিতে উর্দু-ফারসি-ইংরাজির চর্চা হয়েছে, বাংলার চর্চা হয়নি। মুসলমান সমাজের স্বার্থের প্রতি তিনি প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন, তাই বলে তাঁর ধর্মান্ধতাও ছিল না। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কে ও সম্প্রীতিতে তিক্ততার সৃষ্টি হয়, এমন কাজ তিনি করেন নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ ও বিলাতের বার-এট-ল পাশ সৈয়দ আমীর আলীর নেতৃত্ব ছিল উচ্চ ও বহুমাত্রিক এবং গতিশীল। তাঁর 'সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন' ছিল রাজনৈতিক সংগঠন। তিনি বাংলার ও ভারতের নব্য শিক্ষিত শ্রেণীকে এই সভার মাধ্যমে সংগঠিত করেন এবং মুসলিম জাতীয়তার আদর্শ প্রচার করেন। ভারতীয় মুসলিম জাতীয়তা তাঁর লক্ষ্য হলেও বিশ্ব-মুসলিমবাদের আদর্শ তিনি বিস্মৃত হননি। বিশ্ব-মুসলিমবাদের জন্মদাতা সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানীকে আবদুল লতিফ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে বক্তৃতা করতে দেননি। আমীর আলী এলবার্ট হলে তাঁর বক্তৃতার ব্যবস্থা

করেন। ব্রিটিশ সরকার জামালউদ্দীন আফগানীকে সন্দেহের চোখে দেখতেন। তিনি ইসলামি ঐতিহ্য, ইতিহাস ও সভ্যতার গুণকীর্তন করে মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। উর্দু তাঁর মাতৃভাষা, ইংরাজি শিক্ষা ও চর্চাব ভাষা। তিনি মাদ্রাসা শিক্ষার লোপ ও ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন চেয়েছিলেন। আবদুল লতিফ মাদ্রাসা শিক্ষা অক্ষুণ্ন রেখে ইংরাজি শিক্ষার প্রচলন চেয়েছিলেন। সুতবাং কোন কোন ক্ষেত্রে উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ভিন্নতা ছিল। তবে মুসলিম সমাজেব স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে আবদুল লতিফের মত আমীর আলীও অত্যন্ত সচেতন ও সক্রিয় ছিলেন।

উনিশ শতকের নব্বই দশকে আবদুল লতিফ ও আমীর আলীর প্রেরণাকে অঙ্গীকার করে নতুন মাত্রায় ও আঙ্গিকে এক নতুন শক্তির অভ্যুদয় হয়। এ সময় মুসলমান সম্পাদক ও লেখকের প্রচেষ্টায় একাধিক বাংলা সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়। তাঁরা কখনও একক কখনও যৌথভাবে বাংলা গ্রন্থ রচনা, প্রকাশ ও প্রচারে এগিয়ে আসেন। এঁদের কারও শিক্ষা মাদ্রাসায, কারও শিক্ষা বাংলা-ইংরাজি বিদ্যালয়ে। কলকাতা ও মফস্বল শহরে অবস্থান করলেও গ্রামের সাথে তাঁদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়নি। মীর মশাররফ হোসেন, শেখ আবদুর রহিম, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ, রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী, মোজাম্মেল হক, মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী, রওশন আলী চৌধুরী, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান, মুনসী মেহেরুল্লাহ, শেখ ফজলল করিম প্রমুখ লেখকের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যায়। তাঁরা বাংলাকে মাতৃভাষা হিসাবে গ্রহণ করে এবং সে-ভাষায় গ্রন্থ রচনা করে, পত্রিকা সম্পাদনা করে ও সভায় বক্তৃতা দিয়ে ইসলামিকরণ ও শিক্ষা-সংস্কারের আন্দোলন করেন। ফলে তাঁদের আন্দোলন দেশের গভীরে প্রবেশ করে। মাতৃভাষার প্রশ্নে উর্দুকে প্রত্যাখ্যান করে এবং বাংলাকে গ্রহণ করে বাংলার মুসলমান সর্বপ্রথম মুসলিম জাতীয়তাবাদে সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক বর্ণ আরোপ করে। এটাই ক্রমশ 'বাঙালী মুসলিম জাতীয়তাবাদে' রূপান্তরিত হয়। এই সূত্রে সামাজিক-রাজনৈতিক নেতত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। শহরের উপর তলার সীমিত নেতৃত্ব লোপ পায়, শহর ও গ্রামের মধ্যে সংযোগ স্থাপিত হয় এবং বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে যৌথ নেতৃত্বের ধারা প্রবর্তিত হয়।

ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদেরা এদেশের সমাজ, ইতিহাস, নৃতত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে বাঙালি মুসলমানের জাতিতত্ত্ব ও আত্ম-পরিচয় সম্পর্কে প্রথম আলোকপাত করেন। সেন্সাস রিপোর্টে বিচিত্র বিষয়ক পরিসংখ্যান ও তালিকা দেখে বাঙালি মুসলমানের আত্ম-জিজ্ঞাসা উৎসারিত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মুসলমানদের দেশীয় নিম্ন বংশোদ্ভূত বলে মত প্রচার করেন। খন্দকার ফজলে রাব্বি 'হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ' (১৮৯১) গ্রন্থে বাংলার মুসলমানের একটা বড় অংশ বিদেশাগত উচ্চ বংশজাত, সে সম্পর্কে অভিমত প্রচার করেন। ১৮৯৫ সালে লেখক স্বয়ং এর ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। এর অল্পকাল পরে বাংলা পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে এর অনুবাদ প্রকাশিত হয়। সুতরাং বাঙালির চিন্তায় বিষয়টি গুরুত্ব পায়। এই আত্ম-পরিচয়ের অনুসন্ধিৎসা মুসলমানের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ উন্মেষের সহায়ক হয়।

বড় জ্যোতিষ্কের চারপাশে অনেক ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক বিরাজ করে। আবদুল লতিফ ও আমীর আলী বড় জ্যোতিষ্ক ছিলেন। তাঁদের অনুসারী ক্ষুদ্র জ্যোতিষ্ক হিসাবে যাঁদের নাম করা যায়, তাঁরা হলেন ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী, দেলওয়ার হোসেন আহমদ, নবাব সিরাজুল ইসলাম, নবাব সৈয়দ শামসুল হোদা, খন্দকার ফজলে রাব্বি, মির্জা সুজাত আলী বেগ, স্যার আবদুর রহিম, ব্যারিস্টার আবদুর রসুল, সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন, আবদুল আজিজ বিএ, আবদুল করিম বিএ, হেমায়েতউদ্দীন আহমদ, সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী, আলী নওযাব চৌধুরী, আবদুল মজিদ চৌধুরী, আলিমুজ্জামান চৌধুরী প্রমুখ। তাঁরা প্রায় সকলেই নব্য শিক্ষিত এবং আধুনিক জীবনধারা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। তাঁরা শিক্ষা, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের উন্নতি ও অগ্রগতি চেয়েছেন। তাঁদের কারও নেতৃত্ব আঞ্চলিক, কারও আংশিক ছিল ; তবে একথা ঠিক যে, তাঁরা স্বজাতির মৌলিক সমস্যার সাথে পরিচিত ছিলেন। তাঁদের আঞ্চলিক প্রতিপত্তির কারণে তাঁদের আন্দোলন অধিক ফলপ্রসূ হয়েছে। উপরন্তু শহরের নেতৃত্বের বিকেন্দ্রীকরণ হয় ও মফস্বলে প্রসার ঘটে। তাঁরা স্বসমাজের দুর্গতি ও অবনতিতে অধিকতর কাতর ছিলেন, এজন্য তাঁদের দৃষ্টি সাম্প্রদায়িক স্বার্থের উর্ধে যেতে পারেনি। ব্রিটিশের আনুগত্য, হিন্দুর বিরোধিতা এবং স্বসমাজের স্বার্থে—এই ত্রিবিধি ধারায় তাঁদের সমস্ত চিন্তা ও কর্ম আবর্তিত হয়েছে।

যুক্তশক্তির মিলন ও আন্দোলনের উদ্দেশ্যে এযুগে বিভিন্ন ধরনের সভা-সমিতি গঠিত হয়েছে। কলকাতাস্থ মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ও সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন দুটি প্রধান সংগঠন ছিল। সমাজ, শিক্ষা, রাজনীতি বিষয়ক আন্দোলন সংগঠন দুটির মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। প্রধানত এ-দুটির আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় শহরে ও মফস্বলে একাধিক আঞ্জমন ও এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নব্য শিক্ষিত যুবকেরা এরূপ সংগঠনের উদ্যোক্তা ও কর্মকর্তা ছিলেন। তাঁরা উপরের অভিজাত ও ধনী এবং নিম্নের সাধারণ শ্রেণীকে এসব সংগঠনের মাধ্যমেই একত্র করেন এবং সমাজের অভিন্ন স্বার্থে উদ্বুদ্ধ করেন। অর্থাৎ এগুলির দ্বারা সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে মিলনসেতু রচিত হয়েছে। সমকালীন সমস্যার উপর সজাগ দৃষ্টি রেখে এসোসিয়েশন ও আঞ্জমনগুলি বক্তৃতার আয়োজন করেছে, জনমত সৃষ্টি করেছে, চাঁদাসংগ্রহ করেছে, স্বপক্ষে-বিপক্ষে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে, প্রচারপত্র, পুস্তিকা প্রকাশ করেছে, কর্তৃপক্ষের কাছে স্মারকলিপি ও প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে, অধিকার প্রতিষ্ঠা ও দাবি আদায়ের প্রশ্নে একের কণ্ঠের সাথে বহুর কণ্ঠ মিলে উচ্চকণ্ঠের সৃষ্টি হয়েছে। আর এভাবে সমাজের সংস্কার ও নবজাগরণের আন্দোলন জোরদার ও ক্ষুরধার হয়েছে।

হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙালির মাতৃভাষা যে বাংলা তা হাজার বছরের ইতিহাসের গতিধারায় প্রমাণিত হয়ে গেছে। উনিশ শতকের শুরুতে বাংলা গদ্যের আবিষ্কার অনেক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের মতই চমকপ্রদ ও যুগোপযোগী ছিল। যন্ত্রশিল্পের মত গদ্যশিল্প সর্বস্তরে সমাজের সেবায় এসেছে। এক অর্থে গদ্যশিল্পের

শক্তি অতুল, কেননা জীবনের অন্তর ও বাহির উভয় ক্ষেত্রেই তার প্রভাব পড়ে। আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়ায় বাংলা গদ্যের ব্যাপক ভূমিকার কথা সকলেই স্বীকার করেন। মধ্যযুগে হিন্দুর মত বহু সংখ্যক মুসলমান কবির আবির্ভাব হলেও আধুনিক যুগে প্রবেশ করে মাতৃভাষা রূপে বাংলার স্বীকৃতি ও শিক্ষা-সাহিত্যে বাংলা গদ্যের ব্যবহারে অভিজাত ও শিক্ষিত মুসলমানের মধ্যে এক অভূতপূর্ব পরিবর্তন দেখা গেল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এরাই মধ্যমণি—সমাজের সংস্কার ও উন্নতির আন্দোলন এদের দ্বারাই সম্ভব হয়। হিন্দু শিক্ষিত শ্রেণী প্রথম থেকেই বাংলা গদ্যের চর্চা করে এসেছেন, মাতৃভাষার প্রশ্নে তাঁরা সম্পূর্ণ দ্বিধামুক্ত ছিলেন। মীর মশাররফ হোসেনের আবির্ভাবের পূর্বে মুসলমান গদ্য লেখক ছিলেন না। দোভাষী পুঁথি মুসলমানের সাহিত্য-পিপাসা নিবৃত করলেও যেহেতু তা কৃত্রিম ছিল, সেহেতু সমাজে তার প্রভাব স্থায়ী ও উপযোগী হয়নি। শিক্ষিত লোকেরা উর্দুতে ও ফারসিতে শিক্ষাচর্চা ও শিল্পচর্চা করতেন, উপরন্তু তাঁদে চর্চার বিষয় ছিল প্রাচ্যমুখী ও প্রাচীনমুখী। বাংলা ভাষায় যাঁদের দখল ছিল, তারা উর্দু-ফারসি সম্পদ থেকে কোন জ্ঞান আহরণ করতে পারেনি। হিন্দুর রচিত শিল্প-সাহিত্য-ইতিহাস-শাস্ত্রকথায় মুসলমানরা আকর্ষণ অনুভব করেনি, বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে। সুতরাং বাংলা গদ্যশিল্পের সামাজিক, বৈষয়িক, মানসিক উপযোগিতা থেকে সত্তর দশক পর্যন্ত বাংলার মুসলমান সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন থাকে।

ব্রিটিশ শাসনকে মেনে নিয়ে এবং ইংরাজি ভাষা ও বিদ্যাকে গ্রহণ করে ভাগ্য-পরিবর্তন ও সমাজোন্নয়নের যে ধারা আবদুল লতিফ ও আমীর আলী শুরু করেছিলেন, মুসলিম লেখকগণ আধুনিক গদ্যের-পদ্যের চর্চায় সে-ধারা অব্যাহত রাখেন, তবে তাঁরা মাতৃভাষা হিসাবে উর্দুকে প্রত্যাখ্যান ও বাংলাকে গ্রহণ করে সমাজ উন্নতির গতি বাস্তবমুখী ও সুচিমুখী করে তোলেন এবং জাতীয়তার প্রশ্নে সঠিক পথে এগিয়ে যান। তাঁরাই বাংলা ভাষায় জ্ঞানর্চচা, শিল্পর্চচা করে বাঙালি মুসলিম জাতীয়তাবাদের বীজ প্রথম বপন করেন। ইংরাজি ভাষা শিখে তাঁরা আধুনিক ভাবধারার সাথে পরিচিত হন এবং বাংলা চর্চা করে চিত্তের বিকাশ ও আত্মার উন্নতি সাধন করেন। মুসলিম জাতির জন্য এটা ছিল নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন উপলব্ধি।

একজন লেখক তাঁর রচনার মাধ্যমে পাঠকের অন্তর্লোকে প্রবেশ করেন এবং তাঁর আবেগ-অনুভূতি, চিন্তা-চেতনা, জ্ঞানবুদ্ধিকে জাগ্রত করতে পারেন। সেদিক থেকে লেখনি একটি শক্তিশালী মাধ্যম। উনিশ শতকে মুসলিম সমাজে উঁচু ধরনের প্রতিভা বিরল ছিল। যাঁদের প্রধান লেখক রূপে চিহ্নিত করা যায়, তাঁরা কেউ উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁরা অধিকাংশ গ্রামীণ মধ্যবিত্তের সন্তান। শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্র সম্পর্কে মুসলমান সমাজের একটা বিরূপ মনোভাব ছিল। অনেকে মনে করেন যে, ওয়াহাবিরা আবেগোচ্ছাসপূর্ণ সুকুমার শিল্পের বিরোধী ছিলেন। মুসলিম লেখকগণের কেউ কেউ এরূপ ধারণার বশবর্তী হয়ে নাটক-নভেল-থিয়েটারের বিরোধিতা করেছেন। তাঁরা চিন্তাশীল রচনার প্রতি বেশি আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। অনগ্রসর, অনুন্নত মুসলিম সমাজের জন্য

জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুক্তিপূর্ণ আলোচনাকে তাঁরা অধিক উপযোগী বলে মনে করেছেন। আত্ম-পরিচয় উদ্‌ঘাটনের ও নব জাতীয়তাবোধের উন্মেষের যুগে অতীত ইতিহাস-ঐতিহ্য-গৌরবকথার আবিষ্কার ও মূল্যায়ন হয়েছে বার বার। সমাজের অধঃপতনের কারণ এবং উন্নতির উপায় সম্পর্কে আলোচনা হয়েছে। সমকালের ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। কাব্য, মহাকাব্য, উপন্যাস, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ, আলোচনা, পাঠ্যপুস্তক প্রভৃতি সব শ্রেণীর রচনায় কমবেশি এসব বিষয়ই মুখ্য স্থান লাভ করেছে। এক কথায় মুসলিম লেখকগণের বাস্তব চেতনা ও গঠনমুখী ভূমিকা ছিল যায় মধ্য দিয়ে নবজাগরণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

শহর ও মফস্বলের প্রধান-অপ্রধান লেখকের বিবিধ রচনার দ্বারা আত্মচেতনা, দেশ-চেতনা, জাতীয়তা চেতনা ও যুগ চেতনা সম্প্রসারিত হয়। মীর মশাররফ হোসেন, আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, কাজী ইমদাদুল হক, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন প্রমুখের রচনায় উদারতার, প্রগতিশীলতার লক্ষণ ছিল। মৌলভী মোহাম্মদ নইমুদ্দীন, মুনশী মেহেরুল্লাহ, মুনশী জমিরুদ্দীন, মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ প্রধানত রক্ষণশীল ছিলেন। কায়কোবাদ, মোজাম্মেল হক, শেখ আবদুর রহিম, শেখ ফজলুল করিম, নওশের আলী খান ইউসফজয়ী প্রমুখ মধ্যপন্থী ছিলেন। অধিকাংশ লেখক স্বসমাজের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রেখে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য কামনা করেছেন। মুসলিম সমাজের চারদিকে যখন ঘোর অন্ধকার তখনই লেখকদের সাহিত্য-ক্ষেত্রে আবির্ভাব। মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদ ছাড়া বড় প্রতিভা আর কারও ছিল না। এজন্য মুসলমানের রচনায় উচ্চভাব, উচ্চ আদর্শের অভাব ছিল। ধর্মীয় চেতনা ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থ প্রাধান্য পাওয়ায় ধর্মনিরপেক্ষ রচনা খুব কমই লেখা হয়েছে। মীর মশাররফ হোসেন ও কায়কোবাদের প্রতিভা ছিল, তবে সীমাবদ্ধতাও ছিল। উভয়ের শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল নিম্ন মানের, চাকুরিও করতেন নিম্ন মানের। তাঁরা মফস্বলবাসী ছিলেন। নাগরিক মধ্যবিত্তের জীবন-ধারা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে তাঁদের সম্যক ধারণা ছিল না। অথচ আধুনিক সাহিত্য মধ্যবিত্তের নাগরিক চেতনা, আদর্শ ও মূল্যবোধ নিয়েই গড়ে ওঠে। অর্থাৎ আধুনিকীকরণ ও নগরায়ণ যে দুটি গুণ এযুগের ভাল সাহিত্যের জন্য আবশ্যক ছিল, তা তাঁদের ছিল না। এজন্য তাঁরা সফল সাহিত্য পাঠককে উপহার দিতে পারেননি। ন্যূন ও সাধারণ প্রতিভার মুসলিম লেখকদের সীমাবদ্ধতা আরও বেশি ছিল। সামাজিকভাবে ও শ্রেণী হিসাবে পিছিয়ে থাকার কারণে মধু-হেম-নবীন-বঙ্কিম-দীনবন্ধু-দ্বিজেন্দ্র-রবীন্দ্রনাথের মত একজনও মুসলিম লেখকের আবির্ভাব ঘটেনি।

জনমত সৃষ্টিতে পত্র-পত্রিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। সাময়িকপত্র একটি ব্যয়বহুল যৌথশিল্প। এগুলি শুধু সমকালের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সমস্যা সম্পর্কে মতামত তুলে ধরে না, সেই সাথে নিজস্ব মতাদর্শও প্রচার করে। বাংলা ভাষায় মুসলিম সাময়িকপত্রের আবির্ভাব হয় উনিশ শতকের নব্বই দশকে।

দশ-পনের বছরে দৈনিক, অর্ধ সাপ্তাহিক, সাপ্তাহিক, মাসিক আকারে প্রায় দু ডজন পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। বেশির ভাগ পত্রিকা ক্ষীণজীবী ও অনিয়মিত ছিল। এর প্রধান কারণ ছিল দুটি—অর্থবলের ও জনবলের অভাব। এযুগে মুসলিম লেখক ও পাঠকের অভাব ছিল। প্রধানত অশিক্ষা ও দারিদ্র্যের কারণে সাময়িকপত্র-শিল্পের বিকাশ ও প্রচার আশানুরূপ হয়নি। প্রধান-অপ্রধান অনেক লেখকই হয় সম্পাদক রূপে অথবা লেখক রূপে পত্রিকাগুলির সাথে জড়িত ছিলেন। সুতরাং লেখকের আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনা এবং পত্র-পত্রিকার আশা-আকাঙ্ক্ষা, চিন্তা-চেতনা প্রায় অভিন্ন ছিল। আখবারে এসলামীয়া, ইসলাম-প্রচারক ইসলামপন্থী ছিল, সুধাকর, আহমদী, হিতকরী, হাফেজ, কোহিনুর, নবনূর, সোলতান মূলত মধ্যপন্থী ছিল, তবে এগুলির উদারনৈতিক ও অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গিও ছিল। মুসলিম সামযিকপত্রের এটি ছিল শৈশবকাল। শৈশবকালের দুর্বলতা ও সীমাবদ্ধতা নিয়েও পত্রিকাগুলি মুসলিম সমাজেব স্বার্থ তুলে ধরতে এবং জাতীয়তাবোধ প্রচার করতে সহায়ক হয়েছে। এগুলি দেশ, সমাজ, জাতির হিতে, সম্মিলিত চেতনার সৃষ্টি করে জনজীবনে শক্তি ও সংহতি বৃদ্ধি করেছে। একজন লেখক, একজন সমাজসেবক, একজন ধর্মনেতা, একজন বক্তা—সকলের কণ্ঠের মিল হয়েছে এখানে।

লেখক, গবেষক, সাংবাদিক, শিক্ষাবিদ, রাজনীতিবিদ, সমাজসেবক, ধর্মনেতা, বক্তা কখন এককভাবে, কখন যৌথভাবে সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, ভাষা-সাহিত্য ও রাজনীতি প্রধানত এই পাঁচটি ধারায় তাঁদের চিন্তা ও চেতনাকে নিয়োজিত করেছিলেন। জনজীবনে এসব ক্ষেত্রেই সংকট ও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। আধুনিক যুগে প্রবেশ করেও বাংলার মুসলিম সমাজ যুগের সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে ক্রমশ অধঃপতন ও ধ্বংসের দিকে এগিয়েছে। সমাজজীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন, ধর্মজীবন কুসংস্কারাচ্ছন্ন, আর্থিক জীবন বিধ্বস্ত, শিক্ষাজীবন বিপর্যস্ত, সাংস্কৃতিক জীবন লক্ষ্যভ্রষ্ট, রাজনৈতিক জীবন বিপন্ন — জাতির এরূপ ভগ্নদশা ও দুরবস্থা থেকেই তাঁরা যাত্রা শুরু করেন। অনৈসলামিক রীতিনীতি দূর করে সমাজের ও ধর্মের ক্ষেত্রে ইসলামিকরণের যে প্রক্রিয়া ওয়াহাবি আন্দোলনের মাধ্যমে চলছিল, নব্য সমাজ-সংস্কারকগণ তা সমর্থন করেন। তাঁরাও সমাজকে ও ধর্মকে কলুষমুক্ত করার আন্দোলন করেন। অনৈসলামিক ও অন্যান্য সামাজিক গলদের মধ্যে ছিল আশরাফ-আতরাফ শ্রেণীভেদ মান্য করা, বাল্যবিবাহ দেওয়া, বিধবাবিবাহ না দেওয়া, নারীর অবরোধ ও পর্দানশীলতার উপর কঠোরতা আরোপ করা, তালাকপ্রথা ও বান্দীপ্রথা টিকিয়ে রাখা ইত্যাদি। নব্যপন্থীরা প্রায় সকলেই এসবের শরিয়ত বিরোধী ও অমানবিক দিকগুলির সংশোধন ও সংস্কার চেয়েছেন। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কথা ভেবে কেউ কেউ সুদ গ্রহণ ও উত্তরাধিকার আইনে সম্পত্তি বণ্টন রীতির পুনর্বিবেচনা কবতে বলেছেন। হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ঐক্যের কারণে গো-হত্যা বন্ধের সপক্ষে মোশাররফ হোসেন রায় দিয়েছিলেন। গো-হত্যার পক্ষেও আন্দোলন হয়। এসব আলোচনা ও বিতর্কের মধ্যে দিয়েই সমাজের স্থবিরতা দূরীভূত হয় এবং তদস্থলে গতিশীলতা সঞ্চারিত হয়।

শরিয়তী ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার জন্য ধর্মসংস্কার আন্দোলন হয়েছে। প্রতিবেশি হিন্দু সম্প্রদায়ের নানা রকম কুসংস্কার ও দেশাচার ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করেছে। মুসলমানরা কেবল হিন্দুর দেবদেবীর পূজায় ও লৌকিক মেলায় অংশ গ্রহণ করে না, তারা হিন্দুদের

অনুসরণে পীরপূজা, কবরপূজা, মানত, মর্সিয়া, তাজিয়া, শোক মিছিল ইত্যাদি শরিয়ত বহির্ভূত আচারও পালন করে। খ্রিস্টান পাদরি ও ব্রাহ্ম ধর্মপ্রচারক থেকে নতুন করে আঘাত আসছে। তাঁরা ইসলামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করেন এবং মুসলমানকে তাঁদের ধর্মে দীক্ষিত করেন। ফকির-বাউলরাও ইসলামের পরিপন্থী আচরণ করত। এগুলি ছিল বহির্দ্বন্দ্ব। শিয়া-সুন্নি, হানাফি-মোহাম্মদির মধ্যে ধর্মের ছোটখাট ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত নিয়ে মতভেদ ও অন্তর্বিরোধ ছিল। এসব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের অবসান ও বিরোধ-বিতর্কের নিষ্পত্তি কামনা করে এযুগের ধর্মীয় আন্দোলন হয়েছে। মূল প্রবণতা ছিল শরিয়তের মূল আদর্শে ফিরে যাওয়া। মূলনীতির পরিবর্তন বা সংস্কার ইসলামে অসম্ভব। ধর্মপ্রচারকগণ সে চেষ্টা করেননি। তাঁদের প্রধান ভূমিকা ছিল অনৈসলামিক রীতিনীতি থেকে ইসলামকে বিশুদ্ধ করা, অন্যের আক্রমণ থেকে ইসলামকে রক্ষা করা এবং ইসলামের গৌরব ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা। কেউ কেউ ধর্ম প্রচারের চেষ্টাও করেছেন। এসব কাজে কালক্ষেপ ও চিন্তাশক্তির প্রয়োগ বেশি হয়েছে, সাফল্যও বেশি অর্জিত হয়েছে।

ব্রিটিশ সরকার শিক্ষার ভাষা, শিক্ষার পদ্ধতি পরিবর্তন করে এদেশের সনাতন শিক্ষা ব্যবস্থার ধারায় সংকট সৃষ্টি করেন। সরকারি অনুদানে পরিচালিত মক্তব-মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতিতে মুসলমানরা অভ্যস্ত ছিল। ইংরাজি শিক্ষা ছিল ব্যয়বহুল। প্রধানত ভাষাজ্ঞান দ্বারা চাকুরিজীবী অনুগত ও বংশবদ একটি মুৎসুদ্দি শ্রেণী সৃষ্টি করা ইংরাজি শিক্ষার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল। দেশেব লোককে প্রকৃত অর্থে শিক্ষিত করে তোলার শিক্ষানীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেননি, ঔপনিবেশিক স্বার্থে সরকার তা গ্রহণ করতেও পারেন না। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে প্রচলিত দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়ে। দারিদ্র্যের কারণে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে নতুন শিক্ষা গ্রহণও অসম্ভব হয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম সমাজে শিক্ষার ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় দেখা দেয়। সরকারি-সওদাগরি চাকুরি বৈষয়িক উন্নতির প্রধান উপায় ছিল। হিন্দুগণ সময়মত ইংরাজি শিক্ষা লাভ করে এক্ষেত্রে অনেক দূর অগ্রসর হন। মুসলমানগণ জীবিকার কারণে শেষ পর্যন্ত ফারসির মোহ ত্যাগ করে ইংরাজি শিক্ষা গ্রহণ করেন এবং সরকার সৃষ্ট সুযোগ-সুবিধার প্রতি আকৃষ্ট হন। সনাতন পদ্ধতির মাদ্রাসা শিক্ষার ও আধুনিক পদ্ধতির স্কুল-কলেজের শিক্ষার স্থান-বদল নিয়ে মুসলমানের শিক্ষা চিন্তার একটা মোটা অংশ ব্যয় হয়েছে। ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা একেবারে ত্যাগ করা সম্ভব হয়নি। তাই মাদ্রাসা শিক্ষাকে টিকিয়ে রেখে আধুনিকীকরণের চেষ্টা হয়েছে। মাদ্রাসার শিক্ষাসূচিতে ইংরাজি ভাষা ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও শিক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছে। শিক্ষা আন্দোলনের সাথে সরকারি সাহায্য বৃদ্ধি, বৃত্তি বৃদ্ধি, শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও ছাত্রাবাস নির্মাণ, মুসলমান ছাত্রের উপযোগী পাঠ্যপুস্তক রচনা, নারীশিক্ষার প্রসার ইত্যাদি বিষয়ে আন্দোলন হয়েছে। একটা শ্রেণী ইংরাজি ভাষা ও ইউরোপীয় বিদ্যার বিরোধী ছিল। প্রধানত ওয়াহাবিরা যখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে তখন থেকে এরূপ মনোভাবের উদ্ভব হয়। খ্রিষ্টান মিশনারিদের ধর্মপ্রচার এ ধর্মান্তরীকরণের নীতি দেশবাসীর মনে সন্দেহ বৃদ্ধি করে। অভিজাত ও শিক্ষিত শ্রেণীর অনেকেই বাংলাকে শিক্ষা-চর্চা ও জ্ঞানানুশীলনের ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেননি। অথচ এদেশের আধুনিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এ-দুটি ভাষা শিক্ষা দেওয়া হত। তাই ফারসির

স্থলে ইংরাজিকে এবং উর্দুর স্থলে বাংলাকে শিক্ষা ও চর্চার মাধ্যম করার আন্দোলন হয়েছে। এ-ব্যাপারে পুস্তক, পত্রিকা, সভা-সমিতি, বক্তৃতামঞ্চ, স্মারকলিপি প্রভৃতির সাহায্যে ব্যাপক প্রচারাভিযান চালান হয়েছে। শেষের দিকে মানুষের মতিগতির পরিবর্তন হয় ও সমাজের অগ্রাভিযান শুরু হয়।

আধুনিক গদ্য ও পদ্যকে সামাজিক সংগঠনের কাজে মুসলিম লেখকগণ বেশি ব্যবহার করেছেন, এজন্য মননশীল ব্যবহারিক সাহিত্য অধিক রচিত হয়েছে, রসধর্মী সৃজনশীল রচনার সংখ্যা খুবই কম। অস্তিত্বের দ্বন্দ্বে সংগ্রামরত জাতীয় চেতনা এরূপ রসধর্মী ও নান্দনিক সাহিত্য কর্মের বিপক্ষে ছিল। পচনশীল সমাজকে ইন্দ্রিয়োত্তেজক, ভাবাবেগপ্রধান নাটক-নভেল-থিয়েটার দ্বারা আর অধিক না পচানোর জন্য ইসমাইল হোসেন সিরাজী পরামর্শ দেন। অনেকে মুসলিম সমাজ, ইতিহাস ও ঐতিহ্যের প্রতিফলন দ্বারা ইসলামি সাহিত্য অর্থাৎ জাতীয় ভাবধারা অবলম্বনে জাতীয় সাহিত্য বচনার কথা বলেছেন। ইসলামি ভাবাদর্শের অনুরসণে পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং সেগুলি পাঠ্য শ্রেণীভুক্ত করার আন্দোলনে একই মানসিকতার পরচিয় রয়েছে। আরবি-ফারসি-উর্দু অনুবাদে এবং ধর্ম-ইতিহাসাদি মৌলিক গ্রন্থে বিশ্ব-ইসলামের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। ইসলামের অতীত-বর্তমানের গৌরবময় কাহিনী, এমন কি, অলৌকিক বীরকাহিনী অবলম্বনে সাহিত্য রচিত হয়েছে। উদ্দেশ্য জাতীয় চরিত্র গঠন দ্বারা সমাজজীবনে উদ্দীপনা সঞ্চার। বাংলা ভাষায় আরবি-ফারসি-সংস্কৃত শব্দের ব্যবহাররীতি ও পরিমাণ নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ঐ একই কারণে—হিন্দুয়ানি প্রভাব থেকে সাহিত্যকে মুক্ত করে মুসলমানের আশা-আকাঙ্ক্ষার ও জীবনধারার সাথে সংগতিপূর্ণ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তোলা। কেউ কেউ মুসলমানের জন্য স্বতন্ত্র ভাষা ও সাহিত্য কামনা করেছেন। মুসলিম জাতীয়তাবাদ এসব ধারণা থেকে জন্ম লাভ করেছে।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ পর্যন্ত মুসলিম রাজনীতি ছিল ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ; দ্বিতীয়ার্ধে এই রাজনীতির ধারা পরিবর্তিত হয়ে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষে যায়। আঞ্চলিক ও সাময়িক ছোটখাট বিদ্রোহ ছাড়া তিনটি বড় ধরনের রাজনৈতিক আন্দোলন ও বিদ্রোহ হয়েছে ; সেগুলি হল ওয়াহাবি আন্দোলন, ফারায়েজি আন্দোলন ও সিপাহী বিদ্রোহ। ওয়াহাবি ও ফরায়েজি আন্দোলন দীর্ঘস্থায়ী ও ব্যাপক অঞ্চলভিত্তিক ছিল। ফারায়েজি আন্দোলন মূলত বাংলাদেশে গ্রামকেন্দ্রিক কৃষক আন্দোলন ছিল। ওয়াহাবি আন্দোলন ছিল সর্বভারতীয় ; গ্রাম-শহরের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে তা ছড়িয়ে ছিল। উভয়ই একান্তভাবে মুসলমানের আন্দোলন ছিল ; হিন্দুগণ আন্দোলনের সম্পূর্ণ বাইরে ছিলেন। আন্দোলনের আর্থ-সামাজিক ভিত্তি ও ধর্মীয় চরিত্রের কারণেই এরূপটি হয়েছে। সিপাহী বিদ্রোহ ছিল সর্বভারতীয় এবং হিন্দু-মুসলমানের মিলিত রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ত প্রভু ও বঞ্চিত দেশীয় সিপাহীর মিলিত সংগ্রামে শহরের সুবিধাপ্রাপ্ত নব্য ধনী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী অংশগ্রহণ করেননি, এমন কি সমর্থনও দেননি। তাঁরা উল্টো ব্রিটিশকেই সমর্থন ও সাহায্য দান করেছেন। সরকার কঠোর হস্তে সিপাহী বিদ্রোহ ও ওয়াহাবি আন্দোলন দমন করেন। এতে ব্রিটিশ-বিরোধী মুসলিম রাজনীতির সংগ্রামী ধারায় ছেদ পড়ে। মধ্যবিত্তের নব্য শিক্ষিতের নেতৃত্বে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আবেদন-নিবেদনের রাজনীতি শুরু হয়। হিন্দু-মুসলমান মধ্যবিত্তের সামাজিক অবস্থান অভিন্ন হলেও শ্রেণীচরিত্রের অভ্যন্তরীণ

বিরোধের কারণে তাঁরা রাজনৈতিকভাবে মিলতে পারেননি, বরং কায়েমি স্বার্থরক্ষা ও সুবিধা আদায়ের জন্য পরস্পরে মধ্যে বিরোধিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মনোভাব পোষণ করেছেন। ক্রমে তাঁরা ঔপনিবেশিক শাসকচক্রের ভেদনীতির শিকার হয়ে পরস্পর বিবদমান দুটি শিবিরে পরিণত হয়েছেন। এর ফলে ক্রমেই এদেশের মাটিতে রক্ত–বর্ণ–ভাষা–ধর্ম–সংস্কৃতির আবরণে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্ভব হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুসলিম রাজনীতির স্বতন্ত্র চরিত্র ছিল, যেমন জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ এবং প্যান–ইসলামিজম বা বিশ্ব–মুসলিমবাদ। শাসক যদি বিধর্মী হন এবং ধর্ম পালনে বিরোধিতা করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা ইসলামের ধর্মীয় নির্দেশ আছে। ধর্মযুদ্ধে মরলে শহীদ, জয়ী হলে গাজী—ইহলোক ও পরলোকে উভয়ের সম্মান উচ্চে। একজন ধর্মবিশ্বাসী মুসলমান ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিতে আস্থা রাখতে পারেন না। ধর্মের কারণে এরূপ জেহাদি মনোভাব অন্য শ্রেণীর মধ্যে ছিল না।

সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী প্রবর্তিত ও প্রচারিত বিশ্ব–মুসলিমবাদ ছিল উনিশ শতকের একটি নতন বাজনৈতিক চেতনা । ইসলামের সাম্য সৌভ্রাতৃত্বের আদর্শে বিশ্বের মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য এবং পারস্পরিক সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করা বিশ্ব–মুসলিমবাদের বৈশিষ্ট্য ছিল। বর্ণ ও শ্রেণীবিভক্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে এরূপ রাজনৈতিক চেতনা ছিল না। গো–হত্যা ও গো–রক্ষার ব্যাপারেও উভয় সম্প্রদায় একমত হতে পারেনি। হিন্দু মধ্যবিত্তের ও মুসলিম মধ্যবিত্তের বিকাশ সমকালে সমতালে সমমানে এবং সমপরিমাণে না হওয়ার দরুণ সরকারি সুযোগ সুবিধা লাভের ও ভোগের ব্যাপারে পরস্পরের মধ্যে অসম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভাব জেগে ওঠে। হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও মুসলিম জাতীয়তাবাদ ভিন্নমুখী ও ভিন্নগামী হয়। সুতবাং হিন্দু–মুসলমানের রাজনীতিতে ঐক্য স্থাপিত হয়নি। বাংলার হিদু ও মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদের কারণ এসবের মধ্যে নিহিত আছে। নেতৃত্ব বদল ও নেতৃত্বের প্রকৃতি বদল এযুগের মুসলিম রাজনীতির দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল। ব্রিটিশ সরকারের পক্ষপুটাশ্রিত এই রাজনীতিতে সংগ্রামীচেতনা ও স্বাধীনতাস্পৃহা ছিল না। মুসলিম জাতীয়তাবাদের আদর্শে পরিচালিত রাজনীতিতে সম্প্রদায়গত সংহতি স্থাপিত হয় এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের কারণে যৌথ–চেতনার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়।

পূর্বাপর সামগ্রিক আলোচনায় লক্ষ্য করা যায় যে, এযুগের বাংলার মুসলিম সমাজ নানা ভাবদ্বন্দ্ব ও আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গেছে। সমাজসচেতন একটি শ্রেণীর চেষ্টায় আধুনিক ধারার প্রবর্তন হয়েছে। অবশ্যই সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটেনি। কেননা এসব আন্দোলন বিপ্লবাত্মক ছিল না। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক মুক্তির চিন্তা ও চেতনা না থাকায় রেনেসাঁস সম্ভব হয়নি। এযুগের আন্দোলনের মূল প্রবণতা ছিল সংস্কার সাধন, বৈপ্লবিক পরিবর্তন দ্বারা দেশের সার্বিক মুক্তি সাধন নয়। ঔপনিবেশিক শাসননীতি ও অর্থনীতিতে এরূপ পরিবর্তন সম্ভবও নয়। ধর্মীয় চিন্তা ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থবুদ্ধির আলোকে মুসলিম সমাজে আংশিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে ; রূপ ও গুণগত বিবেচনায় একে 'মুসলিম নবজাগরণ' (Muslim Revivalism) বলা যায়।

পরিশিষ্ট-১
গ্রাজুয়েট-তালিকা (১৮৫৭-১৯০৫)
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।[১]

বিএ (অনার্স) ও এমএ

১৮৬৮	আমীর আলী	ইতিহাস	হুগলী কলেজ
১৮৭১	আলী রেজা খান	আরবি	আগ্রা কলেজ
১৮৭৭	আমজাদ আলী	,,	বেনারস কলেজ
	আশরাফ আলী	,,	বেনারস কলেজ
	রাজা হোসেন	ফারসি	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
১৮৮২	হাসমত উল্লাহ	আরবি	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ

এমএ

১৮৮৫	গোলাম হায়দার খান	ইংরাজি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৮৬	আবদুর রমিম	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুস সামাদ	,,	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
১৮৮৭	আহমদ	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ কল্লন	ফারসি	শিক্ষক
	মুবারক হোসেন	,,	ম্যুইর সেট্রাল কলেজ
১৮৮৮	মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	ইংবাজি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আজিজুর রহমান খান	,,	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
১৮৮৯	মোহাম্মদ আব্বাস আলী	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সোহরাওয়ার্দী জাহাদুর রহিম জাহিদ	ফারসি	প্রাইভেট
	সৈয়দ শামসুল হোদা	,,	প্রাইভেট
১৮৯০	মোহাম্মদ মোস্তফা খান	ইংরাজি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আশফাক হোসেন	ফারসি	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
১৮৯১	শাহ বাহাদুর আলী	আরবি	এম. এ. ও. কলেজ
	গোলাম গাউস	ফারসি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৯২	মোহাম্মদ আজিজুল হক	ইংরাজি	প্রাইভেট
	সৈয়দ কল্লন	আরবি	শিক্ষক
	নূর বক্স	,,	এম. এ. ও. কলেজ
	এম. মঈনুদ্দীন আহমদ	ফারসি	প্রাইভেট
১৮৯৪	দাউদ ভাই	আরবি	প্রাইভেট
	কমর আলী	,,	প্রাইভেট
	এস. এম. খলিল আহমদ	ফারসি	প্রাইভেট
	মোহাম্মদ আখতার	মেন্টাল ও মোরাল সায়েন্স	প্রেসিডেন্সী কলেজ

তালিকাটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত The Calendar for the year 1929, Part II, Vol. (Calcutta, 1932) গ্রন্থের সাহায্যে সংকলিত।

১৮৯৫	মোহাম্মদ আমীর	আরবি	প্রাইভেট
	শেখ আহসানুল্লাহ	মেন্টাল ও মোরাল সায়েন্স	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল মজিদ	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	এ. কে. ফজলুল হক	গণিত	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৯৬	শেখ বাহারাম আলী	ইংরাজি	এফ সি অব স্কটল্যান্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ
	এম. নিজামুদ্দীন আহমদ	ফারসি	প্রাইভেট
১৮৯৭	নাসিরুদ্দিন আহমদ	ইংরাজি	এফ সি অব স্কটল্যান্ডস ইনাস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ
	আবু নসর মোহাম্মদ ওহিদ	আরবি	প্রাইভেট
	জিয়াউদ্দীন আহমদ	গণিত	এম. এ. ও কলেজ
১৮৯৮	আনিসুজ্জামান খান	ইংরাজি	প্রেসিডেন্সী কগলজ
	সোহরাওয়ার্দী আবদুল্লাহ মামুন	আরবি	প্রাইভেট
	আলফাজউদ্দীন আহমদ	গণিত	জেনারেল এ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশন
১৮৯৯	ফিদা আলী খান	আরবি	এম. এ. ও. কলেজ
	মোহাম্মদ নাসরুল্লাহ খান	ফারসি	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আবু আহমদ আবদুল বাসিত	ফারসি	শিক্ষক
১৯০০	মোহাম্মদ ইকবাল	আরবি	প্রাইভেট
	মোহাম্মদ জলিল	ফারসি	শিক্ষক
	সৈয়দ আবদুল কাদির	,,	শিক্ষক
	আবদুর রহমান মাহমুদ	,,	প্রাইভেট
	আবদুল মজিদ	ন্যাচারাল এণ্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৯০১	আবদুল হাসান খান চৌধুরী	ইংরাজি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবুল খায়ের মোহাম্মদ ইসহাক	আরবি	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ আমীর আলী	মেন্টাল ও মোরাল সায়েন্স	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৯০২	সৈয়দ আতা হোসেন	ফারসি	প্রাইভেট
	নাসিরুদ্দীন আহমদ	,,	প্রাইভেট
	মোহাম্মদ রাজা খান	,,	পাটনা কলেজ
১৯০৩	কামালউদ্দীন আহমদ	আরবি	প্রাইভেট
	মোস্তাফিজুর রহমান	ফারসি	প্রাইভেট
	কামাল উদ্দীন আহমদ	,,	প্রাইভেট
	সৈয়দ মুন্সী কাজিম	,,	প্রাইভেট
	সৈয়দ মোহাম্মদ আলী হাসান	,,	প্রাইভেট
১৯০৪	মোহাম্মদ হাসান জান	ইংরাজি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবু মোহাম্মদ মাহফুজ	ফারসি	এফ সি অব স্কটল্যান্ডস ইনস্টিটিউশন এন্ড ডফ কলেজ
	আলী আহমদ	ফারসি	প্রাইভেট

	আবুল মোহাম্মদ রশীদ	,,	প্রাইভেট
	এ এফ এম আবদুল আলী	,,	প্রাইভেট
১৯০৫	আকরামুজ্জামান খান	,,	প্রাইভেট

বিএ (অনার্স)

১৮৮৫	তাববেজ আলী	গণিত	হুগলী কলেজ
১৮৮৬	আহমদ	ইংরাজি	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
	আবদুস সামাদ	,,	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
	আবদুব রহিম	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আজমত আলী ফিবোজ	,,	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	মোহাম্মদ হোসেন আজমী	,,	ম্যুইব সেন্ট্রাল কলেজ
	আবদুল কবিম	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুস সামাদ	,,	পাটনা কলেজ
	জহুরুল হক	ইংবাজি	ঢাকা কলেজ
	সোহরাওযার্দী জাহাদুব বহিম জাহিদ	ফাবসি	ঢাকা কলেজ
	মুবারক হোসেন	,,	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	হাফিজ ইবাদুল্লাহ	,,	আগ্রা কলেজ
	মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ	,,	পাটনা কলেজ
১৮৮৬	আবদুল মজিদ	ইংবাজি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মোহাম্মদ আজিজ মির্জা	,,	এম. এ. ও. কলেজ
	মোহাম্মদ হাসান	,,	পাটনা কলেজ
	মোহাম্মদ সুলতান আলম	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল মজিদ	মেন্টাল ও মোরাল সায়েন্স	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈযদ ওযাহিদদ্দীন আহমদ	ফাবসি	হুগলী কলেজ
	সৈয়দ কল্লন	,,	এম. এ. ও. কলেজ
	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	,,	সিটি কলেজ
	সৈযদ আজিজুল হাসান	,,	পাটনা কলেজ
	মোহাম্মদ নাসিম	আরবি	ক্যানিং কলেজ
	মোহাম্মদ আজিজ মির্জা	ইতিহাস	এম. এ. ও. কলেজ
১৮৮৮	আব্বাস আলী	মেন্টাল এণ্ড মোরাল সায়েন্স	এম. এ. ও. কলেজ
	মোহাম্মদ শাখাওয়াৎ হোসেন	ফারসি	বেরেলী কলেজ
	সৈয়দ আহমদ আলী	,,	পাটনা কলেজ
	মঈন ভাই আবদুল হোসেন	গণিত	জব্বলপুর কলেজ
১৮৮৯	মোহাম্মদ আজিজুল হক	ইংরাজি	পাটনা কলেজ
	সৈযদ গালিব হোসেন	,,	পাটনা কলেজ
	মোহাম্মদ আজিজুল হক	গণিত	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মাহবুবুর রহমান	সংস্কৃত	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আশরাফ হোসেন	ফারসি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৯০	গোলাম গাউস	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	শেখ মোহাম্মদ আবদুল মজিদ	,,	পাটনা কলেজ

	শাহাবুদ্দীন খান	ফারসি	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	এইচ এস ই করিম	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	এস জেড আহমদ	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আলীমুদ্দীন আহমদ	,,	প্রসিডেন্সী কলেজ
১৮৯১	আবদুল কাদির	ইংরাজি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	জামিল আখতার	ফারসি	পাটনা কলেজ
	শেখ মোহাম্মদ আবদুল হাকিম	,,	পাটনা কলেজ
	ওয়াসি আহমদ	ফারসি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মোহাম্মদ জহুর আলম	,,	এফ সি অব স্কটল্যান্ডস ইনস্টিটিউশন
	সৈয়দ আবদুল মালেক	ইতিহাস	রাজশাহী কলেজ
১৮৯২	ওয়ালি মোহাম্মদ	ইংরাজি	পাটনা কলেজ
	মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	ফজিলত হোসেন	ফারসি	পাটন কলেজ
	ওয়ালি মোহাম্মদ	,,	পাটনা কলেজ
	এহসান আলী	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	,,	পাটনা কলেজ
	মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান	গণিত	পাটনা কলেজ
১৮৯৩	আফজর রহমান	ইংরাজি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মোহাম্মদ আখতার	ফাবসি	পাটনা কলেজ
	আবু ইমাম ফজলুর রহমান	,,	হুগলী কলেজ
	শেখ জলিল আহমদ	,,	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ ইজহার হোসেন	,,	পাটনা কলেজ
১৮৯৪	আবদুল মজিদ	ইংরাজি	পাটনা কলেজ
	নুরুদ্দীন আহমদ	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	এ কে ফজলুল হক	গণিত	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মতলন আহমদ খান চৌধুরী	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মোহাম্মদ আমীর	আরবি	টি এন জুবলী কলেজ
	আবদুল মজিদ	ফারসি	পাটনা কলেজ
	এস এ মোহাম্মদ আবদুল বরকত	,,	পাটনা কলেজ
	এ কে ফজলুল হক	ফিজিকস ও কেমিস্ট্রি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৯৫	সৈয়দ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ	ফারসি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল আজিজ খান	,,	হিসলপ কলেজ
	আবদুল মজিদ	,,	শিক্ষক কলেজ
	ওয়ালি আজম	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আলফাজউদ্দীন আহমদ	গণিত	এফ সি অব স্কটল্যান্ডস ইনস্টিটিউশন
১৮৯৬	নাসিরুদ্দীন আহমদ	ইংরাজি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবুদল করিম	,	জেনারেল এ্যাসেমব্লি ইনস্টিটিউশন

	জাহাদুব বহিম	গণিত	সিটি কলেজ
	আবদুল বাবি	ফাবসি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবু নসব মোহাম্মদ আলী	ফিজিকস ও কেমিস্ট্রি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৯৭	আনিসুজ্জামান খান	ইংবাজি	পাটনা কলেজ
	সাদত্ত আলী খান	সংস্কৃত	ঢাকা কলেজ
	আবু নসব মোহাম্মদ ওহিদ	আববি	শিক্ষক কলেজ
	মইনুল হক	ফাবসি	টি এন জুবিলী কলেজ
১৮৯৮	সোহাবাওয়ার্দী আবদুল্লাহ আল মামুন	ইংবাজি ও আববি	ঢাকা কলেজ
	আবু আহমেদ আবদুল বাসিত	ফাবসি	ঢাকা কলেজ
	মোহাম্মদ জলিল	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মীব মোহাম্মদ কবিম	,,	বি এন কলেজ (বাঁকিপুব)
	আবদুল হাফিজ	,,	বি এন কলেজ
	মোহাম্মদ নসিকুল্লাহ্ খান	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈযদ তাহাবত কবিম মালিক	,,	বি এন কলেজ
	শামসুদ্দীন হাযদাব	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৯৯	সৈযদ আবদুল লতিফ	দর্শন	ঢাকা কলেজ
	আবদুব বহমান মাহমুদ	ফাবসি	ঢাকা কলেজ
	মোহাম্মদ আলী হাক্কানী	,,	শিক্ষক
	আবদুব বউফ	ফাবসি	শিক্ষক
	মোহাম্মদ নাসিকল হক	,,	শিক্ষক
	শেখ সিবাজুদ্দীন আহমদ	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈযদ নুকল হাসান	,,	বি এন কলেজ
	আবদুল মজিদ	ফিজিকস ও কেমিস্ট্রি	ঢাকা কলেজ
১৯০০	মোহাম্মদ ইবফান	আববি	পাটনা কলেজ
	সৈযদ মোহাম্মদ ইযাকুব	ফাবসি	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ আমীব আলী	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	তাজাম্মল আলী	,,	ঢাকা কলেজ
	আবদুল মজিদ	,,	টি এন জুবিলী কলেজ
	আলাউদ্দীন আহমদ	,,	টি এন জুবিলী কলেজ
	আমীব হোসেন	,,	পাটনা কলেজ
	আবদুল হাকিম	,,	পাটনা কলেজ
	সৈযদ আমীব আলী	দর্শন	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৯০১	সালেহ আহমদ	ইংবাজি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	নাসিকদ্দীন আহমদ	ফাবসি	টি এন জুবিলী কলেজ
	আবদুল মজিদ	,,	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল হামিদ	,,	টি এন জুবিলী কলেজ
	আবুল খাযেব মোহাম্মদ ইসহাক	,,	পাটনা কলেজ
	মোহাম্মদ আবদুল গনি	,,	হিসলপ কলেজ
১৯০২	আবদুল মজাফফব আহমদ	ইংবাজি	ঢাকা কলেজ
	কামালউদ্দীন আহমদ	আববি	প্রেসিডেন্সী কলেজ

	সৈয়দ মোহাম্মদ আলী হোসেন	ফারসি	পাটনা কলেজ
	মোহাম্মদ রাজা করিম	গণিত	পাটনা কলেজ
১৯০৩	মোহাম্মদ হানিফ	ইংরাজি	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আবদুল গাফফার	ইংরাজি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল নাঈম	ফারসি	টি, এন জুবিলী কলেজ
	আবদুল খালেক রহমান	,,	পাটনা কলেজ
১৯০৪	আবুল হাসনাত মোহাম্মদ হাই	,,	ঢাকা কলেজ
	আবু মোহাম্মদ মহফেজ	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আলী আহমদ	ফারসি	শিক্ষক
	আমানত হোসেন	,,	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈযদ মোহাম্মদ আবদুল জব্বার	,,	বি. এন. কলেজ
	আবুল আলী মোহাম্মদ চৌধুরী	,,	শিক্ষক
১৯০৫	নাজিরুদ্দীন আহমেদ	ইংরাজি	ঢাকা কলেজ
	এম এইচ আহমদ সোহরাওয়ার্দী	ফারসি	পাটনা কলেজ
	সৈযদ হাসান আসকাবী	,,	পাটনা কলেজ
	সৈযদ আবু তাহের	,,	হুগলী কলেজ
	আবদুব বহমান	,,	পাটনা কলেজ
	নাজিরুল হক	,,	শিক্ষক

বিএ (পাশ)

১৮৬১	আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৬৫	মহম্মদ দায়েম	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৬৬	আবদুল আজিজ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
১৮৬৭	আমির আলী	হুগলী কলেজ
	মহম্মদ ইউসুফ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সুবজাত ইসলাম	ঢাকা কলেজ
	সৈয়দ হোসেন	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৬৮	আহমদ হামিদুদ্দিন	শিক্ষক
	ওবেদুব রহমান	বহবমপুর কলেজ
১৮৬৯	ফজল কাদির	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মহম্মদ ওয়াজেদ	শিক্ষক
১৮৭০	আবদুল বারি	ক্যাথেড্রল মিশন কলেজ
	মহম্মদ আলী রেজা খান	আগ্রা কলেজ
১৮৭১	মমতাজ আহমদ	রিপন কলেজ
১৮৭৩	আবদুল খায়ের	হুগলী কলেজ
	আবদুল খালেক	হুগলী কলেজ
	সৈয়দ মুজহার ইমাম	পাটনা কলেজ
১৮৭৪	ফজল রসুল	বেরেলী কলেজ
১৮৭৪	ফজুল্লা এম এন	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	সৈয়দ আলী আশরাফ	পাটনা কলেজ

১৮৭৫	আহমদ হাসান খান	বেরেলী কলেজ
১৮৭৬	রাজা হোসেন	বেবেলী কলেজ
১৮৭৭	আবুল ফজল	শিক্ষক
	আমজাদ আলী	বেনারস কলেজ
	আশরাফ আলী	বেনারস কলেজ
	ইজাদ বক্স	হুগলী কলেজ
	নিজামউদ্দীন হাসান	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	সাঈদ ফয়জুদ্দীন হোসেন	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	সৈয়দ খযবাত আহমদ	শিক্ষক কলেজ
	তসলিমউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৭৮	ফজলুল করিম	হুগলী কলেজ
	মাজহারুল আনোয়াব	হুগলী কলেজ
	সৈযদ সাখাওয়াত হোসেন	হুগলী কলেজ
১৮৮০	ফরিদউদ্দীন আহমদ	হুগলী কলেজ
	মহম্মদ ইসমাইল	পাটনা কলেজ
	সৈযদ মহম্মদ ফজল হক	পাটনা কলেজ
	করিমউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	ওমব বক্স	লাহোবে কলেজ
১৮৮১	আলী আহমদ	পাটনা কলেজ
	আমজাদ আলী	পাটনা কলেজ
	এইচ এম আবদুল গণি	হুগলী কলেজ
	হাসমতুল্লাহ	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	সৈয়দ আহমদ আলী	পাটনা কলেজ
১৮৮২	মহম্মদ শফি	লাহোর কলেজ
১৮৮৩	আবদুর রহমান	হুগলী কলেজ
	আবদুর বব চৌধুরী	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	ফজলুল করিম	ঢাকা কলেজ
	হাফাজত করিম	পাটনা কলেজ
	ওযাজিদ হোসেন	পাটনা কলেজ
১৮৮৪	আবদুল হাকিম	পাটনা কলেজ
	আবদুল জব্বার	হুগলী কলেজ
	আবদুল জওয়াদ	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
	আবদুল লতিফ	এম. এ. ও. কলেজ
	আবদুল মজিদ	ঢাকা কলেজ
	আসগর আলী খান	পাটনা কলেজ
	গোলাম হায়দার খান	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ আইনুল হক	পাটনা কলেজ
	মহিবুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	রিয়াজুদ্দীন	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	সমিরুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ

	সাজ্জাদ হোসাইন	এম. এ. ও. কলেজ
	সঈদ হোসাইন	এম. এ. ও. কলেজ
	শামসুল হুদা	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ ইউসুফ আলী	প্রেসেডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ ওয়াজির হোসেন	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	একিনউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৮৫	আবদুর রহিম	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
	আহমদ হাসিম খান	এম. এ. ও. কলেজ
	বজলুর রহিম	ঢাকা কলেজ
	ইমতিয়াজ আলী	ক্যানিং কলেজ
	লুৎফর রহমান	হুগলী কলেজ
	মহম্মদ আজিমুদ্দীন	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	মহম্মদ ওয়াজির আহমদ	বেনারস কলেজ
	তবরেজ আলী	হুগলী কলেজ
১৮৮৬	আবদুল হক	শিক্ষক
	আবদুল করিম	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল ওয়াজিদ	ঢাকা কলেজ
	আবদুর রহমান	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুস সামাদ	পাটনা কলেজ
	আবদুস সামাদ	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
	আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আজমত আলী ফিরোজী	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	হাফিজ ইবাদুল্লাহ	আগ্রা কলেজ
	হেমায়েতউদ্দীন আহমদ	ঢাকা কলেজ
	মহম্মদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মির্জা ওয়াহিদ আলী বেগ	ক্যানিং কলেজ
	মোবারক হোসেন	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	মহম্মদ হাবিবুল্লাহ	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ হোসাইন আজমি	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	মহম্মদ ইসহাক	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
	মহম্মদ ইসরাইল	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	নাজির হোসেন	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
	সোহরাওয়ার্দী জাহাদুর রহিম জাহিদ	ঢাকা কলেজ
	সৈয়দ মহম্মদ আলী	এম. এ. ও. কলেজ
	ওয়াজিব আহমদ	বেরেলী কলেজ
	ইয়াওয়ার হোসেন খান	পাটনা কলেজ
	জহুরুল হক	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৮৭	আবদুল মকারম	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল মজিদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আলমদার হোসেন	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ

	আলি মহম্মদ	ফ্রি চার্চ ইনস্টিটিউশন
	আলিম-উজ-জামান	হুগলী কলেজ
	আজিজুর রহমান খান	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	কবিরুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মাশুক আলি	এম. এ. ও. কলেজ
	মির্জা কালব আলী বেগ	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	মহম্মদ আবদুল্লাহ	সিটি কলেজ
	মহম্মদ আজিজ মির্জা	এম. এ. ও. কলেজ
	মহম্মদ হাসান	পাটনা কলেজ
	সৈযদ কল্লন	এম. এ. ও. কলেজ
	শাহেনশাহ হোসেন রিজভি	ক্যানিং কলেজ
	ওদাহিদউদ্দীন আহমদ	হুগলী কলেজ
	জিল্লুর রহমান	শিক্ষক
	মহম্মদ নাসিম	ক্যানিং কলেজ
	মহম্মদ সুলতান আলম	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৮৮	আবদুল হামিদ	শিক্ষক
	আহমদউল্লাহ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আলী হাসান	পাটনা কলেজ
	এস. বিযাজউদ্দীন কাজী	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	ইজাদ বকস	হুগলী কলেজ
	মিযাভাই আবদুল হোসেন	জব্বলপুর কলেজ
	মির্জা বেদার বখ্ত	হুগলী কলেজ
	মহম্মদ আব্বাস	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মহম্মদ হাসান	ঢাকা কলেজ
	মহম্মদ মুঘল আলম	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	সামসুজ্জোহা	পাটনা কলেজ
	এস এম ইসহাক	ম্যুইর সেন্ট্রাল কলেজ
	সৈয়দ গোলাম দরবেশ	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ মহমদুল হাসান	আগ্রা কলেজ
	সৈয়দ মুহম্মদ মুফতব	আগ্রা কলেজ
	ওয়ালিয়ার রহমান	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৮৯	আবদুল মহম্মদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আমির আলী	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আসফাক হোসেন	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	ফজলুল হক	রিপন কলেজ
	ইজহার হোসেন	পাটনা কলেজ
	খলিলুদ্দীন আহমদ	জব্বলপুর কলেজ
	খলিলুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	খলিলুর রহমান	পাটনা কলেজ
	মাহবুবুর রহমান	প্রেসিডেন্সী কলেজ

	মনিরুদ্দীন হায়দার	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মনজির, এম	বিশপ কলেজ
	মহম্মদ শওকত হোসেন	বেরেলী কলেজ
	মোফাখারুল ইসলাম	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মহম্মদ আজিজল হক	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈযদ গণি হায়দার	পাটনা কলজে
	সৈযদ করম হোসেন	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ হাবিবুল্লাহ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মহম্মদ মুস্তফা খান	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ তাহের	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈয়দ আবদুল মাহমুদ	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ আবদুল মালিক	বাজশাহী কলেজ
১৮৯০	আবদুল আজিজ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল গাফফার খান	পাটনা কলেজ
	আবদুল হামিদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আবদুল লতিফ	হুগলী কলেজ
	আফসারউদ্দীন মহম্মদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আলি কবিম	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আলিমুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	এনাযেত করিম	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	ফখরুদ্দীন আহমদ	পাটনা কলেজ
	গোলাম গাউস	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	হাবিবুল্লাহ কাদের ভাই এম	জব্বলপুর কলেজ
	মির্জা ওয়াজারাত হোসেন	শিক্ষক
	এম. মঈনউদ্দীন	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মকবুল আলী	ঢাকা কলেজ
	কসীমুদ্দীন খান	পাটনা কলেজ
	সাঈদ আবদুল গাফফার	র‍্যাভেনশ কলেজ
	শাহাবউদ্দীন খান	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	শেখ মহম্মদ আবদুল মজিদ	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ আলী হাসান	হুগলী কলেজ
	এস. জেড. আহমদ	সেন্ট জেভিয়াডর্স কলেজ
	তাজাম্মল আলি	র‍্যাভেনশ কলেজ
	ওয়াহিদুদ্দীন আহমদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
১৮৯১	আবদুল হামিদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল কাদির	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	এ এস এইচ হোসেন	এফ সি অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ
	জামিল আখতার	পাটনা কলেজ
	মির্জা মহম্মদ ফসিহ	পাটনা কলেজ

	মহম্মদ জহির	এফ সি অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ
	মহম্মদ জহুর আলম	এফ সি অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ
	সা'দ আবদুল ফইজল	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	শেখ মহম্মদ আবদুল হাকিম	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ আবদুল সালেক	রাজশাহী কলেজ
	সৈয়দ আলি মজাহার	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	ওয়াসি আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৯২	আসফ খান	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	এহসান আলি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	গোলাম মহম্মদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	কামালউদ্দীন	পাটনা কলেজ
	এম চয়নউদ্দীন	রাজশাহী কলেজ
	মহম্মদ মহিবুর রহমান	রাজশাহী কলেজ
	মহম্মদ খান	শিক্ষক
	মহম্মদ ইউসুফ আলী	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সংঘাত আলি	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈয়দ আবদুল মজিদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈয়দ আলী আশরাফ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ মহম্মদ হোসেন	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ নুরুল হাসান	পাটনা কলেজ
	ওয়ালি মহম্মদ	পাটনা কলেজ
১৮৯৩	আবদুল আজিজ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আবদুল আজিজ	ঢাকা কলেজ
	আবদুল হামিদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আবদুল মকসুদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আবদুর রহিম	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবু ইমাম ফজলুর রহিম	হুগলী কলেজ
	আফজাবর রহমান	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আমিনুল ইসলাম	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আতাই এলাহী	হুগলী কলেজ
	এইচ এম আবদুল গণি	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ আখতার	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ সোলায়মান	হুগলী কলেজ
	সৈয়দ মোহসীন আলী	হুগলী কলেজ
	শাহানত হোসেন	টি, এন, জুবিলী কলেজ
	শেখ কাদের বক্স	শিক্ষক
	শেখ খলিল আহমদ	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ জয়নুদ্দীন	বি এন কলেজ

	তালাতুফ হোসেন	ঢাকা কলেজ
	ওয়াহিদুন নবি	সিটি কলেজ
	এস এম ফজলুর রহমান	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈয়দ আতা হোসেন	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ ইজহার হোসেন	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ মহম্মদ নকী	পাটনা কলেজ
১৮৯৪	আবদুল গফুর	পাটনা কলেজ
	আবদুল হাদি	মরিস কলেজ
	আবদুল কাসিম	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল মালেক	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আবদুল মাজেদ	পাটনা কলেজ
	এ কে ফজলুল হক	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আলাউদ্দীন আহমদ	ঢাকা কলেজ
	আনোয়াব করিম	পাটনা কলেজ
	হাবিব আহসান	পাটনা কলেজ
	মজিবুর বহমান	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মাসুদুল হোসেন	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মহম্মদ সাদউদ্দীন	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ আমির	টি. এন. জুবিলী ইনস্টিটিউশন কলেজ
	মহম্মদ ইয়াসিন	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মতলব আহমদ খান চৌধুরী	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	নাজিরুল হক	পাটনা কলেজ
	নুরুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	এম. এ. মুহম্মদ আবদুল বরকত	পাটনা কলেজ
	শেখ আহসানুল্লাহ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	শেখ বাহারাম আলি	পাটনা কলেজ
	শেখ মহম্মদ ইসমাইল	মেট্রোপলিটন কলেজ
	ওসমান আলি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ আবদুল হায়াত	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ আলি মহসিন	শিক্ষক
	সৈয়দ হোসেন আলি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ খালিক বকস	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	জহিরুল হক	শিক্ষক
১৮৯৫	আবদুল আজিজ খান	হিসলপ কলেজ
	আবদুল গণি	রিপন কলেজ
	আবদুল মজিদ	শিক্ষক
	আবদুল ওয়াদুদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	আবরার হোসেন	সিটি কলেজ
	আলফাউদ্দীন আহমদ	এফ. সি. অব স্কটল্যান্ডস ইনস্টিটিউশন সেন্ড ডফ কলেজ

	মহম্মদ এসকান্দর আলি	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মহম্মদ আবদুস সামাদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মহম্মদ শামসুজ্জোহা	এফ. সি. অব স্কটল্যান্ডস ইনস্টিটিউশন এন্ড ডফ কলেজ
	পি. মহিউদ্দীন	বিশপ কলেজ
	শেখ আমিরুদ্দীন আহমদ	সিটি কলেজ
	শেখ ওয়াহেজুদ্দীন	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ আবদুল কাদির	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈয়দ খায়ের আলি	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈয়দ খলিল আহমদ	পাটনা কলেজ
	জিয়াউন নবি	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈযদ মহম্মদ আবদুল্লাহ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	ওয়ালি আজম	সেন্ট জেবিয়ার্স কলেজ
১৮৯৬	আবদুল আজিজ খান	হিসলপ কলেজ
	এ. মজিদ খান	হিসপল কলেজ
	আবদুল আজিজ খান	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	আবদুল গাফফার বাবি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুর রাজ্জাক	পাটনা কলেজ
	আলি আকবর	ঢাকা কলেজ
	খাজা এম. ইসমাইল	পাটনা কলেজ
	মুহম্মদ মুসলেহউদ্দীন	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ সাদউদ্দীন	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ আব্দুল মমিন	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মহম্মদ আল মামুন	ঢাকা কলেজ
	মহম্মদ মুস্তফা খান	হিসলপ কলেজ
	নাসিরুদ্দীন আহমদ চৌধুরী	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সোহরাওয়ার্দী মহম্মদ আল মামুন	ঢাকা কলেজ
	তসাদ্দক হোসাইন	পাটনা কলেজ
	ওযাযেজুল হক	পাটনা কলেজ
	বিলায়েত হোসেন	এম. এ. ও. কলেজ
	জাহাদুর রহিম জাহিদ	সিটি কলেজ
	জাকিউদ্দীন আহমদ	জেনারেল এসেমব্লি ইনস্টিটিউশন
১৮৯৭	আবদুল হামিদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আসগর আলি	রিপন কলেজ
	আনিসুজ্জামান খান	পাটনা কলেজ
	আসাদুজ্জামান	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	ফয়েজনর আলি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	লুৎফর রহমান	সিটি কলেজ
	মইনুল হক	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	মহম্মদ ইসমাইল	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ

	রেজা করিম আহমদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সাদত আবদুল মাসুদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সাদত আলি খান	ঢাকা কলেজ
	শরাফত আলি খান	ঢাকা কলেজ
১৮৯৮	আবদুল হাফিজ	বি. এন. কলেজ
	আবদুল হাকিম	বি. এন. কলেজ
	আবু আহমদ আবদুল বাসিত	ঢাকা কলেজ
	আবুল ফজল মহম্মদ আবদুল জব্বার	ঢাকা কলেজ
	আতাউর রহমান	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	দলিলউদ্দীন আহমদ	রিপন কলেজ
	দলিলুর রহমান	সেন্ট জেভিযার্স কলেজ
	এলাহ নওয়াজ খান	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	হামিদুর রহমান	ঢাকা কলেজ
	মহম্মদ জলিল	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মহম্মদ নসরুল্লাহ খান	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মহম্মদ আকবর আলি	ঢাকা কলেজ
	মহম্মদ ইরফানউল্লাহ	শিক্ষক
	মহম্মদ সাঈদ	পাটনা কলেজ
	মীর মহম্মদ করিম	বি. এন. কলেজ
	মির্জা শেগুফতা বখ্‌ত	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মহিউদ্দীন আহমদ	পাটনা কলেজ
	এস. এ সামাদ	পাটনা কলেজ
	শামসুদ্দীন হায়দার	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সোহরাওয়ার্দী আবদুল্লাহ আল মামুন	ঢাকা কলেজ
	সৈয়দ তাহাইরত করিম মালিক	বি. এন. কলেজ
	জিয়াউল হক	র‍্যাভেনশন কলেজ
১৮৯৯	আবদুল মজিদ	ঢাকা কলেজ
	আবদুর রউফ	শিক্ষক
	আবদুর রাজ্জাক	পাটনা কলেজ
	আবদুর রহমান মাহমুদ	ঢাকা কলেজ
	আবদুর রশিদ	পাটনা কলেজ
	আবুল হাসেম খান চৌধুরী	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মহম্মদ মাওলা বকস	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মহম্মদ আসগর আলি	হিসলপ কলেজ
	মহতাবউদ্দী আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মোশারফ হোসেন	হুগলী কলেজ
	মহম্মদ নাসিরুল হক	শিক্ষক কলেজ
	মহম্মদ আবদুস সুবহান খান	হিসলপ কলেজ
	মহম্মদ আলি হাক্কানী	শিক্ষক
	মহম্মদ ইমদাদউদ্দীন	রাজশাহী কলেজ

	মহম্মদ মুসা	বি. এন. কলেজ
	নজবত হোসাইন	বি. এন. কলেজ
	ফুকন আলি	সিটি কলেজ
	কামরুদ্দীন আহমদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	শেখ সিরাজুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	শামসুদ্দীন আহমদ	বিপন কলেজ
	সৈয়দ আবদুল লতিফ	ঢাকা কলেজ
	সৈয়দ আলি মাহদী	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ দিলাওব আলি	ব্যাভেনশন কলেজ
	সৈয়দ নুরুল হোসেন	বি. এন. কলেজ
	ওয়ারাসত হোসেন	পাটনা কলেজ
	জহিরুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৯০০	আবদুল হাকিম	পাটনা কলেজ
	আবদুল হাসনাত সৈযদ	পাটনা কলেজ
	আবদুল মোযাইদ খান	ঢাকা কলেজ
	আলাউদ্দিন আহমদ	টি, এন. জুবিলী কলেজ
	আলি আকবব	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আলি আসগর	সিটি কলেজ
	আমির হোসেন	পাটনা কলেজ
	আবদুস শুকুব	পাটনা কলেজ
	আমিরুদ্দীন মণ্ডল	সিটি কলেজ
	জালালউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	কাজি ইমদাদুল হক	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	খবিবউদ্দীন আহমদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মহম্মদ গোলাম কাদির	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মফিজুর বহমান	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ গোলাম কাদির	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মফিজুর রহমান	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ আসাদ	রাজচন্দ্র কলেজ
	মহম্মদ হানিফ	হুগলী কলেজ
	মহম্মদ ইরফান	শিক্ষক
	মহম্মদ ইসহাক	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ ওমব খান	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ সাঈদ	পাটনা কলেজ
	মাশাবফ হোসেন	বঙ্গবাসী ললেজ
	শেখ দাউদ	হিসলগ কলেজ
	শোজনত আলি	হুগলী কলেজ
	সৈয়দ আমির আলি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ মহম্মদ সাজিরুদ্দিন	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ মহম্দ রশিদ	প্রাইভেট কলেজ

	সৈয়দ মহম্মদ ইয়াকুব	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ রশিদুন নবি	হুগলী কলেজ
	তাজাম্মল আলি	ঢাকা কলেজ
	ওয়াসিমুদ্দীন আহমদ	রাজশাহী কলেজ
১৯০১	আবদুল আজিজ	পাটনা কলেজ
	আবদুল হামিদ	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	আবদুল মজিদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবুল খায়েব মহম্মদ ইশহাক	পাটনা কলেজ
	আহমদ আলি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আলতাফ করিম	পাটনা কলেজ
	ইকরাম হোসেন	পাটনা কলেজ
	খাদেম রসুল	ঢাকা কলেজ
	খাজা মহম্মদ নূর	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মহম্মদ ইব্রাহিম হোসেন	রিপন কলেজ
	মহম্মদ আবু সঈদ	এফ. সি. অব স্কটল্যাণ্ড ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ. কলেজ
	মহম্মদ আবদুল গণি	হিসলপ কলেজ
	মহম্মদ আকবর	শিক্ষক
	মহম্মদ ফজলুল করিম	ঢাকা কলেজ
	নসিরউদ্দীন আহমদ	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	সালেহ আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সাইদুর রহমান	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	এস. সইফুদ্দীন আহমদ	হুগলী কলেজ
	সৈয়দ রাহাত হোসেন	টি. এন. জুবিলী কলেজ
১৯০২	আবদুল গফুর	ঢাকা কলেজ
	আবদুল খালেক	রাজচন্দ্র কলেজ
	আবদুস সাত্তার	ঢাকা কলেজ
	আবদুল ওয়াহিদ	রাজচন্দ্র কলেজ
	আবদুর রহমান খান	রাজশাহী কলেজ
	এ. এফ. এম. মাহমুদ	রিপন কলেজ
	আমির হামজা	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	আতোয়ার রহমান	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আজিমউদ্দীন আহম্মদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	বাশারউদ্দীন আবুল তাহের খন্দকার	রিপন কলেজ
	কামালউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	করম নওয়াজ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মকবুল হোসেন	শিক্ষক
	মহম্মদ ইব্রাহিম খান	রিপন কলেজ
	মহম্মদ ইসহাক	ঢাকা কলেজ
	মহম্মদ আবদুল বরকত	পাটনা কলেজ

	মহম্মদ শাহাবুদ্দিন খান	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	মোস্তাফিজুর বহমান	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈয়দ মুসা কাজিম	পাটনা কলেজ
	শেখ আলি করিম	জি. বি. বি. কলেজ
	সৈয়দ আবদুল্লাহ অল মুসা।ওয়াহিয়ুল কার্দি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ মহম্মদ আলি হাসান	পাটনা কলেজ
১৯০৩	আবদুল গাফফাব	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুল নাঈম	টি. এন. জুবিলী ইনস্টিটিউশন
	আবুল মহম্মদ বশিদ	সেন্ট জেভিযার্স কলেজ
	এ এফ. এম. আবদুল আলি	ডভটন কলেজ
	আজিজুর বহমান	সিটি কলেজ
	লুৎফর রহমান	রিপন কলেজ
	মুহম্মদ আজিজুর রহমান	সেন্ট জেভিয়ার্স
	মহম্মদ আমজাদ	বাজশাহী কলেজ
	মুহম্মদ হাযদার আলি	রাজশাহী কলেজ
	মহম্মদ হামিদ	বাজশাহী কলেজ
	মুহম্মদ হাসান জান	পাটনা কলেজ
	নুরুল হোসেন হাজাবকা	সেন্ট জেভিযার্স কলেজ
	রশিদউদ্দীন মহম্মদ	সিটি কলেজ
	এস. মহম্মদ তাহিব	এফ. সি. অব স্কটল্যাণ্ডস ইনস্টিটিউশন এণ্ড ডফ কলেজ
	সৈয়দ আইজউদ্দীন আহমদ	হিসলপ কলেজ
	সৈয়দ খলিলুর রহমান	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ মহম্মদ করিম	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	সৈয়দ মুজাফফর হোসেন শফি	হিসলপ কলেজ
	সৈয়দ তাহিরউদ্দীন আহমদ	বি. এন. কলেজ
	সৈয়দ ওয়াসি আহমদ	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	তৌহিদুল হাসান	জি. বি. বি. কলেজ
১৯০৪	আবদুল হাসানাত মহম্মদ আবদুল হাই	ঢাকা কলেজ
	আবু আলি মহম্মদ চৌধুরী	শিক্ষক
	আবু মহম্মদ মহফুজ	সেন্ট জেভিযার্স কলেজ
	আকরামুজ্জামান খান	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আলি আহমদ	শিক্ষক
	আমানত হোসেন	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	এ. এম হোসামউদ্দীন হায়দার	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	দীন মুহাম্মদ শেখ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	খুরশাদ হোসেন	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মহম্মদ মহসিন	বি. এন. কলেজ
	মহম্মদ ইয়াকুব	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	সমিরউদ্দীন ভুঁইয়া	ঢাকা কলেজ

	সৈয়দ মহম্মদ আবদুল জব্বার	বি. এন. কলেজ
	সৈয়দ মোয়াজ্জমউদ্দীন হোসেন	বি. এন কলেজ
	সৈয়দ নাজিরউদ্দীন	বি. এন. কলেজ
	সৈয়দ ওয়াজির হায়দার	বি. এন. কলেজ
১৯০৫	আবদুল গাফফার খান	শিক্ষক
	আবদুল্লাহ	ঢাকা কলেজ
	আবদুর রহিম	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	আবদুর বহমান	পাটনা কলেজ
	আবু মুহম্মদ	পাটনা কলেজ
	কাজি আবদুল ওযাব	রিপন কলেজ
	খলিলুব রহমান	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মহম্মদ ইব্রাহিম	রিপন কলেজ
	মহম্মদ নাজিব আলম	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ ইয়াসিন আলি	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মোবারক আলি	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মহম্মদ সুবহানুল হক	সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ
	মুহম্মদ আবদুল হাফিজ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	মুহম্মদ আবদুব বশিদ	ঢাকা কলেজ
	মুহম্মদ হাসান	পাটনা কলেজ
	মুহম্মদ জামিল আহমদ	পাটনা কলেজ
	মুহম্মদ সা'দউল্লাহ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	নাজিরুদ্দীন আহমদ	ঢাকা কলেজ
	নজিরুল হক	শিক্ষক
	পজিরুদ্দীন আহমদ	রিপন কলেজ
	রেজা করিম	বি. এন. কলেজ
	এস. এইচ. আহমদ সোহরাওয়ার্দী	পাটনা কলেজ
	শেখ ইমাম আলি	বিপন কলেজ
	সৈয়দ আবু মহামেদ	বি. এন. কলেজ
	সৈয়দ আবু তাহের	হুগলী কলেজ
	সৈয়দ হাসান আসকারি	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ মাহবুবুর রহমান	ঢাকা কলেজ
	সৈয়দ ওয়াসিক আলি	র‍্যাডেনসা

বিএল

১৮৬৯	আমির আলি	হুগলী কলেজ
	ওবায়দুর রহমান	বহরমপুর কলেজ
১৮৭১	মহম্মদ ওয়াজেদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৭৩	সিরাজুল ইসলাম	ঢাকা কলেজ
১৮৭৪	মহম্মদ দায়েম	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৭৫	সৈযদ মাজহার ইমান	প্রেসিডেন্সী কলেজ

১৮৭৯	ইজাদ বকস	প্রেসিডেন্সী কলেজ
	সৈয়দ খায়রেদ আহমদ	পাটনা কলেজ
১৮৮০	বজলুল কবিম	ঢাকা কলেজ
	মাজহার-উল আনোয়ার	হুগলী কলেজ
১৮৮১	নিজামুদ্দীন হাসান	ক্যানিং কলেজ
১৮৮২	মির্জা মহম্মদ ইসরাইল	পাটনা কলেজ
	তসলিমউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৮৩	আলি আহমদ	পাটনা কলেজ
	তকবিমুদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৮৫	ফজলল করিম	ঢাকা কলেজ
	সৈয়দ মহম্মদ হোসেন	রিপন কলেজ
	ওয়াজিদ হোসেন	পাটনা কলেজ
১৮৮৬	আবদুল মজিদ	ঢাকা কলেজ
	আসগর আলি খান	পাটনা কলেজ
	গোলাম হায়দার খান	সিটি কলেজ
	হিম্মত আলি	ঢাকা কলেজ
	মহিউদ্দীন আহমদ	সিটি কলেজ
	মহম্মদ আইনুল হক	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ আহমদ হাসান	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ ওয়াজিব হোসেন	পাটনা কলেজ
	একিনুদ্দীন আহমদ	সিটি কলেজ
১৮৮৭	আবদুল হামিদ	পাটনা কলেজ
	আবদুল জওয়াদ	সিটি কলেজ
	আবদুর রহিম	সিটি কলেজ
	রিয়াজুদ্দীন আহমদ	সিটি কলেজ
১৮৮৮	আবদুল জব্বার	রিপন কলেজ
	আবদুস সামাদ	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ ইশফাক	মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন
	সমিরুদ্দীন আহমদ	সিটি কলেজ
	সৈয়দ নাজির হোসেন	মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশন
	ইয়াওয়ার হোসেন খান	রিপন কলেজ
১৮৮৯	আবদুর রহমান রাজশাহী	রিপন কলেজ
	এস. ডব্লিউ. হোসেন	রিপন কলেজ
	মহম্মদ ইউসুফ আলি	সিটি কলেজ
১৮৯০	আবদুল আজিজ খান	রিপন কলেজ
	লুৎফর রহমান	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ রিপন	পাটনা কলেজ
	মির্জা বেদার বখ্ত	হুগলী কলেজ
	এম. মনজুর	সিটি কলেজ
	ওয়ালুর রহমান	ঢাকা কলেজ

	জাহাদুর রহিম জাহিদ	রিপন কলেজ
	জহুরুল হক	ঢাকা কলেজ
১৮৯১	মহম্মদ আজিজুল হক	হুগলী কলেজ
	মহম্মদ হাবিবুল্লাহ	সিটি কলেজ
	মহম্মদ মুস্তফা খান	রিপন কলেজ
	আবদুল ওয়াজিদ	ঢাকা কলেজ
	আলি করিম	পাটনা কলেজ
	এফ. রিয়াজউদ্দীন কাজী	বিপন কলেজ
	হেমায়েতউদ্দীন আহমদ	ঢাকা কলেজ
	মাহবুবর রহমান	বিপন কলেজ
	মনিরুদ্দীন হায়দার	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	সৈয়দ আলি বিলগ্রামী	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ গণি হায়দার	পাটনা কলেজ
১৮৯২	আহমদউল্লাহ	রিপন কলেজ
	আসিব আলি	সিটি কলেজ
	ফকরুদ্দীন	পাটনা কলেজ
	ইজ্জাদ বকস	হুগলী কলেজ
	মহম্মদ তাহির	বিপন কলেজ
	শেখ মহম্মদ আবদুল মজিদ	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ আলি হাসান	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	সৈয়দ গোলাম দরবেশ	পাটনা কলেজ
১৮৯৩	জামিল আখতার	পাটনা কলেজ
	এস. ই. করিম	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ মহম্মদ হাসান	পাটনা কলেজ
১৮৯৪	ফজিলত হোসেন	পাটনা কলেজ '
	ওয়াজিব মহম্মদ	ইউনিভার্সিটি ল' কলেজ
	ওয়াসি আহমদ	সিটি কলেজ
১৮৯৫	মহম্মদ আখতাব	রিপন কলেজ
	মহম্মদ জমির	রিপন কলেজ
১৮৯৬	আবদুল খালেক	রিপন কলেজ
	ইজহার হোসেন	পাটনা কলেজ
	মহম্মদ আবদুল্লাহ	বি. এন. কলেজ
	মজিবর রহমান তরফদার	রিপন কলেজ
	মহম্মদ আসফ খান	সিটি কলেজ
	নুরুদ্দীন আহমদ	রিপন কলেজ
	সৈয়দ আবদুল মজিদ	সিটি কলেজ
	সৈয়দ নুরুল হাসান	রিপন কলেজ
	ওয়াহিউদ্দনি আহমদ	রিপন কলেজ
	শেখ কাদির বকস	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	শেখ মহম্মদ আবদুল হাকিম	সিটি কলেজ

	শেখ মহম্মদ ইসমাইল	বি. এন. কলেজ
	শেখ ওসমান আলি	সিটি কলেজ
	শামসুল হক	সিটি কলেজ
১৮৯৭	আবদুল মজিদ	বি. এন. কলেজ
	এ. কে ফজলুল হক	রিপন কলেজ
	হফাজাত কবিম	পাটনা কলেজ
	কামালউদ্দনি	বি. এন. কলেজ
	মহম্মদ ইসরাইল খান	রেঙ্গুন কলেজ
	মফাখ্খারুল ইসলাম	রিপন কলেজ
	নাসিরুল হক	পাটনা কলেজ
	সংঘাত আলি	বিপন কলেজ
	শাহাদাত হোসেন	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	সৈযদ আজিজুল হাসান	পাটনা কলেজ
	সৈযদ খাযের আলি	সিটি কলেজ
	সৈয়দ খালিক বকস	সিটি কলেজ
১৮৯৮	আনোযাব কবিম	পাটনা কলেজ
	খাজা এম. সইদউদ্দীন	বিপন কলেজ
	শাহাবুদ্দীন খান	বিপন কলেজ
	শেখ বাহারাম আলি	রিপন কলেজ
	ইউসুফ মহম্মদ	পাটনা কলেজ
১৮৯৯	আবদুর রাজ্জাক	মেদিনীপুর কলেজ
	আমিনুল ইসলাম	রিপন কলেজ
	আসাদুজ্জামান	ঢাকা কলেজ
	নাসিরুদ্দীন আহমদ	রিপন কলেজ
	সৈয়দ আলি মহসিন	মেদীনীপুর কলেজ
	সৈয়দ ওয়াহিদুদ্দীন আহমদ	রিপন কলেজ
	জোহাদুর রহিম জাহিদ	সিটি কলেজ
১৯০০	আবদুল করিম	ঢাকা কলেজ
	আসগর আলি	রাজচন্দ্র কলেজ
	লুৎফর বহমান	রিপন কলেজ
	মহম্মদ ইসমাইল	ঢাকা কলেজ
	সৈয়দ জয়নুদ্দীন	বি. এন. কলেজ
১৯০১	আনিসুজ্জামান খান	বি. এন. কলেজ
	হাসিবুদ্দীন আহমদ	রিপন কলেজ
	মহম্মদ জলিল	হুগলী কলেজ
	মহম্মদ ইরফানুল্লাহ	রাজশাহী কলেজ
	নাজাবাত হোসেন	সিটি কলেজ
	শামসুদ্দীন আহমদ	বঙ্গবাসী কলেজ
	ওয়াজুল হক	পাটনা কলেজ
	ওয়ারাস্মত হোসেন	বি. এন. কলেজ

১৯০২	আবদুল আজিজ খান	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	আবদুল হাদি	মরিস কলেজ
	আবদুল হাফিজ	বি. এন কলেজ
	আবদুল হাকিম	রিপন কলেজ
	আলি আকবর	বিপন কলেজ
	মির্জা শেখ গুফ্তা বখত	রিপন কলেজ
	মহম্মদ শফি	বি. এন কলেজ
	মুশারফ হোসেন	বঙ্গবাসী কলেজ
	আবদুল মজিদ	রিপন কলেজ
	সাদত আলী খান	ঢাকা কলেজ
১৯০৩	আবদুল হমিদ	বিপন কলেজ
	খাজা মহম্মদ নূর	বিপন কলেজ
	মহম্মদ ইব্রাহিম হাসান	বঙ্গবাসী কলেজ
	মহম্মদ আসগর আলি	মবিস কলেজ
	সৈযদ মহম্মদ এ. ববকত	বি. এন কলেজ
	সৈযদ মহম্মদ ইযাকুব	বঙ্গবাসী কলেজ
১৯০৪	আবদুল গণি	সিটি কলেজ
	আবদুল সাত্তার	বিপন কলেজ
	আবদুশ শকুর	বঙ্গবাসী কলেজ
	এ. এফ. মাহমুদ	বিপন কলেজ
	আবাউদ্দনি আহমদ	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	মহিউদ্দনি আহমদ	বি. এন কলেজ
	মহম্মদ আবদুস সামাদ	রিপন কলেজ
	মহম্মদ এমাদুদ্দীন	বঙ্গবাসী কলেজ
	মহম্মদ ওমর খান	বি. এন. কলেজ
	মকবুল হোসেন	রিপন কলেজ
	মীর মহম্মদ করিম	বি. এন. কলেজ
	আমীর হোসেন	রিপন কলেজ
	এলাহ্ নওয়াজ খান	রাজচন্দ্র কলেজ
	ফয়জনূর রহমান	রিপন কলেজ
	সাইদুর রহমান	রিপন কলেজ
	শেখ জোহাদুর রহমান	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	শেখ আলি করিম	পাটনা কলেজ
	সৈয়দ জামির আলি	পাটন কলেজ
	ওয়াসিমউদ্দীন আহমদ	রাজশাহী কলেজ
১৯০৫	মহম্মদ আবদুল বরকত	বি. এন. কলেজ
	মইনুল হক	টি. এন. কলেজ
	মহম্মদ হাসান জান	রিপন কলেজ
	মহম্মদ নাসিরুল হক	টি. এন. জুবিলী কলেজ
	আলতাফ করিম	পাটনা কলেজ

	আমির হামজা	বি. এন. কলেজ
	সৈয়দ বাহাত হোসেন	টি. এন. জুবিলী কলেজ

এম. বি.

১৮৭৮	সৈযদ হোসেন	মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতা

লাইসেনসিয়েট ইন ল'

১৮৬৯	বাবি ফজলল	প্রেসিডেন্সী কলেজ
১৮৭৩	আবদুল্লাহ্ ফয়েজ	,, ,,
	ফজলুল কাদিব	,, ,,
	গোলাম আলতাফ	হুগলী "
	হামিদউদ্দীন আহমদ	প্রেসিডেন্সী ,,

এম. এল. এস.

১৮৭১	লুৎফব কবিব	মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতা
	জলমুর আলি আহমদ	,, ,,
	জহিব উদ্দীন	,, ,,
১৮৭২	আকবর খান	,, ,,
১৮৭৪	আবদুর রাজ্জাক	,, ,,
১৮৭৮	আসদর আলি	,, ,,
	ফজলুব রহমান	,, ,,
১৮৮৯	সাউদব বহমান	,, ,,
১৯০০	শাহ্জাহান আলি	,, ,,
	এল. এম. হাবিবুর রহমান	মেডিক্যাল কলেজ কলিকাতা
	সৈয়দ মহম্মদ আফজল	,, ,,
১৯০২	আবদুল গফুর	,, ,,
১৯০৪	আবদুস সাত্তার খান	,, ,,
	মহম্মদ ইসমাইল খান	,, ,,
	সৈয়দ আলি হাসান	,, ,,
	খলিলউদ্দীন আহমদ	,, ,,

বি. ই.

১৯০০	তোফাজ্জল আহমদ	সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ
১৯০৩	এস. এস. আবদুল আজিজ	,, ,,

এল. ই.

১৮৯০	আবদুর রহমান	,, ,,

(খ)
সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন
চাঁদাদাতা সদস্যবৃন্দ ১৮৮৩[১]

আলী আহমদ	কলিকাতা
আলী বকস, হাজি, মোক্তার	কলিকাতা হাই কোর্ট
আলী করিম, জমিদাব	ত্রিপুরা
আলী নকি, সৈয়দ	কলিকাতা
আলী মোহাম্মদ	কলিকাতা
আজম হোসেন, সৈয়দ	কলিকাতা
আবদুল আউয়াল	কলিকাতা
আবদুল আজিজ, খাজা	কলিকাতা
আবদুল বারি, মোহাম্মদ, সাব-রেজিস্ট্রার	আমতা
আবদুল গফুর, সব-রেজিস্ট্রার	ফুলবাড়িয়া, দিনাজপুর
আবদুল গাফফাব	আহমদগঞ্জ, বরিশাল
আবদুল হালিম, ব্যারিস্টাব	কলিকাতা
আবদুল করিম, খান বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	বাকরগঞ্জ
আবদুল কাদের, মোহাম্মদ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	নড়াইল, যশোহর
আবদুল লতিফ আহমদ	কলিকাতা
আবদুল নঈম	ঢাকা
আবদুল ওয়াহাব, খান বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	জলপাইগুড়ি
আবদুল ওয়াহিদ	কলিকাতা
আবদুল ওয়াহিদ, তালুকদার	পটুয়াখালি, বাকেরগঞ্জ
আবদুল ওয়াহাব, মোক্তার	কলিকাতা হাইকোর্ট
আবদুল্লাহ দগমান	কলিকাতা
আবদুল্লাহ, মোহাম্মদ, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
আবদুলল্লাহ আরব	কলিকাতা
আবদুল্লাহ আবদুল ওয়াহিদ	কলিকাতা
আবদুল্লাহ খান, চৌধুরী	চট্টগ্রাম
আবুল হাসান খান, ব্যারিস্টার	কলিকাতা হাইকোর্ট
আবুল খায়ের, প্রফেসর	কলিকাতা মাদ্রাসা
আবদুর রাজ্জাক, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
আবদুর রহমান	শ্রীহট্ট

কলকাতা সদর ও বাংলা মফস্বলে যাঁদের ঠিকানা আছে, কেবল তাঁদের নাম গৃহীত হয়েছে। বাংলার বাইরে যাঁদের ঠিকানা আছে, তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করা হয়নি। এঁরা সকলে বাঙালি নাও হতে পারেন, আবার বাইরে যাঁদের ঠিকানা আছে, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙালি থাকতে পারেন।

Report of the Committee of the Central National Muhammadan Association for the past 5 years (adopted unanimously at a General Meeting of the Association, held on the 15th April, 1883), pp. 6-30.

আবদুর রহমান মূসা	কলিকাতা
আবদুর রহমান, সৈয়দ, ব্যারিস্টার	কলিকাতা
আবদুর রব, সৈযদ, জমিদার	শায়েস্তাবাদ
আবদুস সামাদ, শেখ	কলিকাতা
আবদুস সামাদ	কলিকাতা
আবদুস সালাম	কলিকাতা
আদিলউদ্দীন, মোহাম্মদ	নারায়ণপুর, ফরিদপুর
আফতাবউদ্দীন, মোহাম্মদ	উকিল, ত্রিপুরা
আহমদ, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
আহমদ	কলিকাতা
আহমদ, কাজী, সৈযদ, খান বাহাদুর, বিদেশী অফিসার	কলিকাতা
আলীমউদ্দীন	কলিকাতা
আহসানউল্লাহ, খান বাহাদুর, নাবাব	ঢাকা
আজিজুল বারি	কলিকাতা
আজিজুর রহমান আহমদ খান, সাব রেজিস্ট্রার	ত্রিপুরা
আজিমুদ্দীন	কলিকাতা
আমানত উদ-দৌলা বহাদুর	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
আমীর আলী, সৈযদ	কলিকাতা
আমীর হোসেন, সৈযদ, খান বাহাদুর, ভারতপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট,	কলিকাতা
আমীরউদ্দীন, প্রিন্স	চুঁচূড়া
আনোয়ার আলী, পেস্কার	কলিকাতা হাইকোর্ট
আরিফর রহমান	ত্রিপুরা
আশরাফউদ্দীন, উকিল	ঐ
আশরাফউদ্দীন আহমদ,	মতওল্লী, হুগলী
আসমত আলী খান চৌধুরী	জমিদার, বাকরগঞ্জ
আসমত জাহ বাহাদুর, প্রিন্স	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
আজমল-উদ দৌলা বাহাদুর	ঐ কলিকাতা
আওলাদ হাসেন, সৈয়দ, সাব-রেজিস্ট্রার,	শ্রীনগর, ঢাকা
বদিউল আলম, মোহাম্মদ	জমিদার, চট্টগ্রাম
বদরুদ্দীন হায়দার	কলিকাতা
বজলুর রহমান শিক্ষক,	কলিকাতা মাদ্রাসা
বজলুর রহমান, পুলিশ ইনস্পেক্টর	মালদহ
বজলুল হক, জমিদার	ত্রিপুরা
বাকের, মির্জা মোহাম্মদ সিবাজী	কলিকাতা
বশীরুদ্দীন, প্রিন্স	,,
দীন মোহাম্মদ	,,
একরাম আলী খান, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
বজলুর রহমান খান	কলিকাতা হাইকোর্ট
বজলুর রহমান, ডাক্তার	কলিকাতা
বজলুর রাশেদ, পুলিশ অফিসের কেরানী	কলিকাতা

ফজলুল করিম	বিদেশী অফিস কলিকাতা
ফজলুল করিম	মালদহ
ফজলুল কবিম, জমিদার	ঢাকা
ফজলুল করিম, খান বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	চট্টগ্রাম
ফয়জুদ্দীন হোসেন, খান বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ময়মনসিংহ
ফররুক শাহ, মোহাম্মদ, প্রিন্স	টালিগঞ্জ, কলিকাতা
ফযজুন্নেসা খাতুন, চৌধুবানী,	জমিদার, হোমনাবাদ, ত্রিপুরা
ফারুক-উদ-দৌলা বাহাদুব	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
গোলাম নবি খান, মোক্তার	কলিকাতা হাইকোর্ট
গোলাম বারি	কলিকাতা
গোলাম সারোযাব, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
হামিদ বকত, খান বাহাদুব	শ্রীহট্ট
হামিদ--উদ-দৌলা বাহাদুর	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
হাবিবুদ্দীন আহমদ, পুলিশ ইনস্পেক্টব	মালদহ
হাসান ইসমাইল	কলিকাতা
হেদাযেত হোসেন, মীব, মোক্তাব	কলিকাতা হাইকোর্ট
ইকরাম রসুল, খান বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	মাল· হ
ইজ্জত-উদ--দৌলা বাহাদুর	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
ইব্রাহিম হোসেন, মোহাম্মদ, জমিদার	ত্রিপুরা
ইমদাদ আলী, কোর্ট সাব-ইনস্পেক্টব	চট্টগ্রাম
জান মোহাম্মদ কালিম	কলিকাতা
জাফর ইস্পাহানি, মোহাম্মদ	,,
জাহান কাদর, মির্জা, প্রিন্স	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
কমরুদ্দীন আহমদ, খান বাহাদুব	কলিকাতা
কমব কাদের, প্রিন্স	খিদিরপুর, কলিকাতা
করিম বকস	কলিকাতা
কুদরতুল্লাহ, হেড ক্লার্ক, ক্যান্টনমেন্ট, ম্যাজিস্ট্রেট	রাণীখেত
কুদরতুল্লা, শেখ	কলিকাতা
খোদা বকস	,,
খুরশেদ কাদেব, সৈয়দ, ইস্কান্দার মির্জা	মুর্শিদাবাদ
লতাফত হোসেন, শাহ, মীর, মোক্তার	কলিকাতা হাইকোর্ট
লুৎফর রহমান, ব্যারিস্টার	কলিকাতা
মওলা বকস	বর্ধমান
মজাফফর আহমদ, জমিদার	নোয়াখালী
মজাফফর হোসেন, সৈয়দ	শায়েস্তাবাদ, বরিশাল
মাজহারুল ইসলাম, কোর্ট ইনস্পেক্টর	বরিশাল
মাজহারুল হক, ক্লার্ক, পুলিশ অফিস	কলিকাতা
মজিদ বখত, খান বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	শ্রীহট্ট
মমতাজউদ্দীন আহমদ, উকিল	যশোহর
মোফাজ্জল-উল-ইসলাম, কাজী, উকিল	গোয়ালপাড়া

মনসুর-উদ-দৌলা বাহাদুর	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
মুস্তফা হোসেন, সৈয়দ,খান বাহাদুর,	জজকোর্ট, কুষ্টিয়া
মুকসুদ আলী, শেখ	দালটনগঞ্জ
মজিরুদ্দীন আখন্দ	,,
মফিজুদ্দীন আহমদ, হেডক্লার্ক	মাগুরা, যশোহর
মর্তুজা, আগা সৈয়দ	কলিকাতা
মুসা আলী	,,
মাহমুদ খুলজি	,,
মেহেদী হাসান, মোক্তার	কলিকাতা হাইকোর্ট
মীর মোহাম্মদ আলী, নবাব, জমিদার	পদমদী, ফরিদপুর
মোহাম্মদ, খান বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	ত্রিপুরা
মোহাম্মদ আখতার, কাজী	বর্ধমান
মোহাম্মদ ইব্রাহিম	কুসুমগাঁও, বর্ধমান
মোহাম্মদ জিলানী, শেখ	কলিকাতা
মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
মোহাম্মদ ইউসুফ বি. এল.	কলিকাতা
মোহাম্মদ ওয়াহিজ, উকিল	বরিশাল
মোহাম্মদ ইয়াহিয়া, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
মোহাম্মদ শরীফ, মির্জা	চুঁচূড়া
মোহাম্মদ মাহমুদ, জমিদার	শ্রীহট্ট
মোহাম্মদ আলী, মির্জা	কলিকাতা
মোহাম্মদ সালেহ এলিয়াস	,,
মোহাম্মদ সোইনি, সাব-রেজিস্ট্রার	ভাতারি, চট্টগ্রাম
মোহাম্মদ ওয়াজির, শেখ	পূর্ণিয়া
মোহাম্মদ খলিল সিরাজী, মির্জা	কলিকাতা
মোহাম্মদ কাসিম, মির্জা	,,
মোহাম্মদ জাফর ইসপাহানি	,,
মোহাম্মদ তৈয়ব	,,
মোহাম্মদ মেহেদী	,,
মোহাম্মদ গাজী, চৌধুরী	ভকত, ত্রিপুরা
মোহাম্মদ ফয়েজ, চৌধুরী	বাতাগাঁও, ফরিদপুর
মোহাম্মদ ইউসুফ, খাজা, জমিদার	ঢাকা
মোহাম্মদ হোসেন, সৈয়দ	শায়েস্তাবাদ, বরিশাল
মোহাম্মদ সাজ্জাদ হাকিম	কলিকাতা
মোহাম্মদ আবদুল বারি, সব-রেজিস্ট্রার	হাওড়া
নূর মোহাম্মদ	কলিকাতা
নাজিরুদ্দীন, মোহাম্মদ	,,
নাজিরুদ্দীন, মোহাম্মদ	হুগলী
নাজিরুদ্দীন আবুল হোসেন, জমিদার	বগুড়া
নাজিরুল হক	কলিকাতা

নাজিবুদ্দীন	,,
নুরুল হক, ইনস্পেক্টর, ডাকঘর	,,
নুরুল হুদা, সৈয়দ, ব্যারিস্টার	,,
নওয়াব জান	,,
ওমরাও, মির্জা	খিদিরপুর, কলিকাতা
রহিমুল্লাহ চৌধুরী, জমিদার	প্রাকপুর, চট্টগ্রাম
রেয়াজুদ্দীন আহমদ, জমিদাব	ত্রিপুরা
রাজিউদ্দীন আহমদ, জমিদাব	ঢাকা
সদরুদ্দীন আহমদ, সৈয়দ, জমিদার	বোহার, বর্ধমান
সেরাজুদ্দীন আহমদ, জমিদাব	বর্ধমান
সাদিক ইসমাইল	কলিকাতা
সাদেক সুস্ত্রী, সৈয়দ	কলিকাতা
সিরাজুল ইসলাম বিএল	,,
সিরাজুল হক, মোহাম্মদ, খান বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	বগুড়া
সোবহান হায়দাব, খান বাহাদুব	চট্টগ্রাম
সমা-উদ-দৌলা বাহাদুর	গার্ডেনরিচ, কলিকাতা
সৈয়দ আফজাল হোসেন	কৃষ্ণনগর
শফিউদ্দীন আহমদ, সাব-ডেপুটি কালেক্টব	আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি
শামসুল হোদা	কলিকাতা
তাজাম্মল হোসেন, সৈয়দ	,,
তসলিমউদ্দীন আহমদ বি. এল.	,,
তসাদ্দক হোসেন, পেস্কার	কলিকাতা হাইকোর্ট
তসাদ্দক-উন-নবী	মণ্ডালকোর্ট, বর্ধমান
তাহের মোহাম্মদ সালেহ	কলিকাতা
ইকরুম-উন-নেসা খাতুন চৌধুরানী	,,
ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী, সুপারিন্টেনডেন্ট	ঢাকা মাদ্রাসা
ওয়াসিবুদ্দীন আখন্দ	কলিকাতা
ওয়াহিদুদ্দীন আহমদ, অনুবাদক	কলিকাতা হাইকোর্ট
ইউসুফ আলী খান চৌধুরী	হোমনাবাদ, ত্রিপুরা
জিয়াউদ্দীন আহমদ, কাজী, জমিদার	ঢাকা
জমিরুদ্দীন আহমদ, ডাক্তার	কলিকাতা
জুলফিকার আলী, সুপারিন্টেডেন্ট	চট্টগ্রাম মাদ্রাসা।[২]

২. হিন্দু সভ্য : বিনোদবিহারী মল্লিক (কলিকাতা) বদ্রীদাস রায়বাহাদুর (কলিকাতা), দুর্গাপ্রসন্ন ঘোষ (কলিকাতা), গণেশ চন্দর চন্দ্র (এটর্নি, কলিকাতা হাইকোর্ট), হীরালাল মুখোপাধ্যায় (কলিকাতা), কে. এম. চট্টোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার (কলিকাতা), লক্ষ্মীপত সিংহ রায়বাহাদুর (মুর্শিদাবাদ), মদনমোহন ভাট (কলিকাতা), নবীনচন্দ্র বোস (অনুবাদক), নবীবচন্দ্র বড়াল (এটর্নি, কলিকাতা হাইকোর্ট), প্রভাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, পিরোজপুর বরিশাল), পিয়ারী মোহন মুখোপাধ্যায় (উত্তরপাড়া), সালিগ্রম সিংহ (কলিকাতা) শ্রীরাম চন্দ্র (এটর্নি, কলিকাতা হাইকোর্ট), শ্যামলাল মল্লিক (কলিকাতা)।

শাখাসমূহ : বগুড়া[৩]

খোন্দকার খায়রুজ্জামান
মধু মোহাম্মদ
বাহারুদ্দীন
জিয়াউল্লাহ
নবী বকস

মোবাবক আলী চৌধুরী
নজবত আলী চৌধুবী
সৈযদ আবুল হোসেন
দরুজ্জামান সবকাব
মোহাম্মদ আসাদ
খোন্দকার সফদব আলী
হানিফ তালুকদাব
খোন্দকার মোবারক আলী
হাজি মোহাম্মদ আলী
সনজিদ খান
কলিমুজ্জামান চৌধুরী
নাজিরুদ্দীন আহসান
দুর্গতিযা সবকার
আশার সরকাব
পীর মোহাম্মদ প্রামাণিক
রমজান খান
দীনাতউল্লাহ চৌধুরী
মকবুলউদ্দীন মণ্ডল
রফিউল্লাহ মণ্ডল
খোন্দকার ইমদাদ আলী
তাহের আলী মিয়া
জয়নুল্লা সোনার
খোন্দকার আনোয়ারুল্লাহ
নুর তালুকদার
কলিমুদ্দীন ফকিব
বদশারত উল্লাহ

তমিজউদ্দীন

খোন্দকার হেরাসতুল্লাহ
সৈযদ নেওয়াজ আলী চৌধুরী
সৈয়দ হজিরুদ্দীন হোসেন চৌধুরী
সরফরাজ আলী চৌধুরী
সৈয়দ আবদুল মজিদ চৌধুরী
আবুল হাফিজ
আবদুব বহিম খান
আশরাফউদ্দীন
আবদুর রহমান সরকার
গোলাম সুলতান
সৈয়দ আবদুল মজিদ
আমিরুদ্দীন খান
গোলাম সামদানী
মহব্বত আলী খান
হাজি মইনুদ্দীন
রহমত উল্লাহ সবকাব
মোহাম্মদ বসু ফকির
সৈয়দ আবদুল হোসেন
হাজি হাবিবুল্লাহ
ইযার মোহাম্মদ মণ্ডল
সোনাউল্লাহ মণ্ডল
জমিরুদ্দীন মণ্ডল
মঈনউদ্দীন তালুকদার
নবী বকস তালুকদার
মুরাদ মসুম
অকুল তালুকদার
বরদুল্লাহ প্রামাণিক
মনসুরুল্লাহ তালুকদার
সৈয়দ আব্বাস আলী

চট্টগ্রাম

ইফরাম রসুল, খান বাহাদুর, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট (সভাপতি)
মোহাম্মদ সোবহান হায়দার, খান বাহাদুর ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট

৩. 'কার্যকরী কমিটির'র জন্য দ্বিতীয় অধ্যায়ের 'সভা-সমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

জুলফিকাব আলী (সম্পাদক),	সুপাবিন্টেন্ডেন্ট, মাদ্রাসা
আবদুব বহমান খান চৌধুবী,	জমিদাব
আবদুল কাদিব	,,
ফযেজ আলী	,,
হামিদ আলী খান	,,
হামিদউল্লাহ চৌধুবী	,,
হেদাযেত আলী চৌধুবী	,,
আবদুল কুদ্দুস চৌধুবী	,,
আবদুল আলী, মোযাল্লাম	নাখোদা
নাজমুল্লাহ মোযাল্লাম	,,
জিনাত আলী মোযাল্লাম	,,
আবফান আলী	মোক্তাব
বদরুদ্দীন	,,
আবদুল্লা	মদাববিস
আবদুল ওযাদুদ	,,
আসগব আলী	,,
খলিলুল্লাহ	,,
মোহাম্মদ ইযাকুব	,,
মসিউল্লাহ	,,
আহমদ উল্লাহ	শিক্ষক
ফজলে আলী	,,
খযবতি মিযা	,,
আবদুল আজিজ	ইমাম মসজিদ
বাশাবতউল্লাহ	,,
নাজিব হোসেন	,,
আব্বাসউদ্দীন	কাজী
আবদুস সাত্তাব	,,
আবদুব বহিম	আমিন
আমীব আলী	মন্তুবী
আমীব হোসেন	,,
আশবাফ হোসেন	,,
গোলামুজ্জামান	,,
গোলাম বব্বানী	,,
হামিদুল হক	,,
লুৎফুল্লা	,,
মোহাম্মদ ইসমাইল	,,
মোহাম্মদ হোসেন	

মোকবুল আলী	,,
আসাদ আলী	সওদাগব
আমজাদ আলী	,,
আবদুল মজিদ	,,
বুরহানউদ্দীন	,,
ফকিব মোহাম্মদ	,,
হোসেন আলী	,,
মোহাম্মদ আকবর	,,
ইউসুফ আলী	,,
জিন্নাত আলী	,,
তরবিয়াত খান	,,
সফর আলী	ক্যাপ্টেন ও সওদাগর
বাশারত খান	ইনস্পেক্টব
দেওয়ান আলী	উকিল, জজকোর্ট
মোহাম্মদ আজিমুল্লাহ খান	,,
মোহাম্মদ ফাজুল্লাহ	,,
হাকিমউল্লাহ	উকিল, মুন্সেফ কোর্ট
গফুর আলী	,,
বয়রতি	,,
ফজলে আলী	দাবোগা
কলিমুল্লাহ	,,
হোসেনুজ্জামান	কাবি
ইমদাদ আলী	সাব-ইনস্পেক্টর, পুলিশ
নূর আলী	হাফিজ

হুগলী[৪]

জামীরুদ্দীন	প্রিন্স
আশরাফউদ্দীন আহমদ	মতওয়াল্লী, ইমামবাড়া
আবুল মোজাফফর, সৈয়দ	জমিদার
আজাদ আলী, সৈয়দ	কর্মচারী, ডাকঘর
আইনুদ্দীন আহমদ	হেডক্লার্ক, ইমামাবাড়া
আফজাল আলী, সৈয়দ	জমিদার
আতহার আলী, সৈয়দ	,,
আহমদ আলী, সৈয়দ	,,
আহমদ হোসেন	,,

৪ 'কার্যকরী কমিটি'র জন্য 'সভা সমিতি' অংশ দ্রষ্টব্য।

আবদুল আজিজ, চৌধুরী	,,
আবদুল্লাহ	,,
ফতেহ আলী, মির্জা	,,
গোলাম মেহেদী	,,
হেলালউদ্দীন	,,
ইদাদ আলী	,,
কোববান আলী, মির্জা	,,
লুৎফুল্লাহ	,,
মেহেদী হোসেন	,,
আহমদ খান	,,
আহসান আলী	ব্যবসায়ী
আবদুল আলী	,,
মনজুরুল হক	,,
কুদরত শাহ	,,
আলী আহমদ, মির্জা	সবকারি কর্মচাবী
আহমদ বকস	,,
আবদুল মজিদ	,,
ফররুক হোসেন	,,
কসিমমুদ্দীন	,,
নজমুল হক	,,
আবদুব বহিম মির্জা	কর্মচাবী, ইমামবাড়া
আবদুল হোসেন	,,
আশেক আলী খান	,,
আফজল হোসেন, মির্জা	,,
আগা আলী, মির্জা	,,
আলী মোহাম্মদ আরা	,,
এনায়েত আলী, মির্জা	,,
ফিদাহ আলী, মির্জা	,,
গোলাম হোসেন, মির্জা	,,
হায়দার হোসেন, মীর	,,
হোসেন জান	,,
জওয়াদ শাহ, হাকিম	,,
খুররম আলী	,,
কুচুক নজকি, আগা	,,
মেহেদী হোসেন, মীর	,,
মেহেদী হোসেন খান	,,
মোহাম্মদ হোসেন, সৈয়দ	,,

মোহাম্মদ আলী, মির্জা	,,
মোহাম্মদ হাজি	,,
রহিম বকস	,,
রহিমুদ্দীন	,,
আবদুল কাদের	আরবি অধ্যাপক হুগলী কলেজ
রশিদ	আরবি অধ্যাপক হুগলী কলেজ
আবদুল জলিল	ইংরাজি, শিক্ষক হুগলী কলেজ
আবদুল আজিজ	আরবি শিক্ষক হুগলী শাখা স্কুল
আলী আহমদ খান বাহাদুর	,,
শেখ আবদুল্লাহ	,,
বসিরুদ্দীন, প্রিন্স	,,
দৌলত হোসেন, মীর	,,
গোলাম হোসেন, কারী	,,
মজহারুল আনোয়ার,	উকিল ও জমিদার
মোহাম্মদ খান	,,
মোজাফফর আলী	,,
সুম্মুন খান	,,
মহসিন জান	,,
মাশুক জান	
মাসরুল উল্লাহ	,,
মশিয়ত উল্লাহ	,,
মোহাম্মদ কাজেম, মির্জা	,,
মোহাম্মদ শরিফ, মির্জা	,,
নাজিরুদ্দিন, খান বাহাদুর	,,
নওয়াব জান	,,
নজুফ আলী, মির্জা	,,
রমজান আলী, মির্জা	,,
সদরুদ্দীন	ডাক্তার
সরফরাজ আলী	,,
সালামত আলী	,,
সাদত আলী, মির্জা	,,
সৈয়দ হোসেন, আগা	,,
বিলায়েত আলী ·	,,
জহুর আলী, মির্জা	,,

(গ)
'ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে'র বাৎসরিক অধিবেশনে যোগদানকারী মুসলিম প্রতিনিধিবৃন্দ (১৮৮৫—১৯০৫)

	নাম	পেশা	স্থান
১৮৮৬	নূরুল হক	উকিল	ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, উলুবাড়িয়া শাখা, হাওড়া
	সওগাত আলী	ব্যবসায়ী	ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, উলুবাড়িয়া শাখা, হাওড়া
	সামিরুদ্দীন আহমদ	জমিদার	রংপুর
	রজব আলী আহমদ	উকিল	নীলফামারী এসোসিয়েশন, রংপুর
	সৈয়দ বাসাবতউল্লাহ	তালুকদার	বাগেরহাট পিপল এসোসিয়েশন, খুলনা
	সা'দউদ্দীন মহম্মদ	উকিল ও জমিদার	বরিশাল পিপলস্ এসোসিযেশন, বাকেরগঞ্জ
	খাজা আবদল আলিম	জমিদার	ঢাকা পিপলস্ এসোসিযেশন, ঢাকা
	সৈয়দ আবদুল বারি	জমিদার	ঢাকা পিপলস্ এসোসিয়েশন, ঢাকা
	রেজাউদ্দীন	জমিদার	ঢাকা পিপলস্ এসোসিযেশন, ঢাকা
	আতহার আলী	ডাক্তার ও জমিদাব	চুয়াডাঙ্গা, নদীযা
	ফকির আলী মিয়া	জোতদার	কাটদহ এসোসিয়েশন, নদীযা
	তমিজউদ্দীন আহমদ	ডাক্তার	জলপাইগুড়ি
	লতিফ হোসেন	ডাক্তার	শাবাজপুর, ত্রিপুবা
	এনায়েত আলী	ডাক্তার	কানসুয়া, ত্রিপুরা
	হামিদউদ্দীন আহম্মদ	উকিল	ময়মনসিংহ
	নওশের আলী খান ইউসফজয়ী	তালুকদার	টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ
	নওয়াব গোলাম রব্বানী	রাজপরিবার	বুসাপাগল ইমপ্রুভমেন্ট এসোসিয়েশন, ২৪ পরগণা
১৮৮৭ ও ১৮৮৮	সৈয়দ মহম্মদ হোসেন গাউস	জমিদার ও ডাক্তাব	চুচুড়া হুগলী
১৮৮৮	মহম্মদ হাফিজ	জমিদার	বাকেরগঞ্জ
	আবদুর রহমান	শিক্ষক	রাজশাহী মাদ্রাসা, রাজশাহী
১৮৮৯	সৈয়দ করিমউল্লাহ	জমিদার	ঢাকা
	শেখ হেদায়েত বকস	তালুকদার ও ব্যবসায়ী	ঢাকা
	সবদর আলী	উকিল ও জমিদার	চুয়াডাঙ্গা, নদীয়া
১৮৯৬	মহম্মদ জান মহম্মদ, গাজী	ব্যবসী	কলিকাতা
	হারুনর রশিদ	ব্যবসায়ী	কলিকাতা
	গোলাম মওলা	উকিল	বারাসত, ২৪ পরগণা
	জহিরুদ্দীন আহমদ, ব্যারিস্টার	জমিদার	মেহদিবাগ, কলিকাতা

	সৈযদ আলী আজম	মোক্তাব	কলিকাতা হাইকোর্ট
	মহম্মদ হাযাত	আইন-ব্যবসায়ী	আলীপুর, কলিকাতা
	আবদুল মজিদ, বি এল	উকিল	আলীপুর কোর্ট, কলিকাতা
	মহম্মদ ইশফাক বি এল	উকিল	কলিকাতা হাইকোর্ট
	মির্জা আহমদ আলী	ব্যবসাযী	কলিকাতা
	সৈযদ হোসেন	ডাক্তাব	কলিকাতা
	আবদুল হালিম গজনভী	জমিদাব	কলিকাতা
	মেহেব আলী আলাদিন	ব্যবসাযী	কলিকাতা
	জাফব আলী	ডাক্তাব	কলিকাতা
	আব্বা মিযা আবদুস সাত্তাব	ব্রোকাব	কলিকাতা
	জেড আব জাহেদ এমএ, বি এল	উকিল	কলিকাতা হাইকোর্ট
	বদিউল আলম	জমিদাব	কলিকাতা
	আলী আজম	জমিদাব ও ডভটন কলেজেব অধ্যাপক	কলিকাতা
	কবিরুদ্দীন আহমদ	জোতদাব	মহতা, বর্ধমান
	হাযদাব আলী	[illegible]	কলিকাতা
	আবদুল জওযাদ	[illegible]	[illegible] হজ্রাদপুব, বর্ধমান
	ইকবামুল হক	[illegible]	[illegible]
	আসাদউজ্জামান, বি এ	জোতদাব	কলিকাতা
১৮৯৬ ও ১৯০১	আবদুল খালেক	উকিল	বধমান
১৯০১	আবুল কাসেম বি এ	জমিদাব	কলিকাতা
	মহম্মদ ইবফান	জমিদাব	পালিগ্রাম, বর্ধমান
	আবদুল আলী	জমিদাব	পালিগ্রাম, বর্ধমান
	সৈযদ আবদুস সালাম	জমিদাব	পালিগ্রাম, বর্ধমান
	আবদুল মওলা	জোতদাব	বর্ধমান
	গোলাম আসদেক বিএল	উকিল	বর্ধমান
	মজহারুল আনোযাব	উকিল	হুগলী
	সৈযদ আমিব আলী	জোতদাব	কালনা
	সৈয়দ হোসেন আলী	জোতদাব	বসুলপুব, বর্ধমান
	কাজী আবদুল মজিদ	জোতদাব	কাজিপাড়া, নদীয়া
	মহম্মদ জান	জোতদাব	কোজিপাডা, নদীয়া
	কাজী মহম্মদ শামসুজ্জোহা	জোতদাব	কোজিপাডা, নদীযা
	কাজী এবাদউল্লাহ	উকিল	বনগাঁ, যশোহব
	হামিদুব বহমান	জমিদাব	চট্টগ্রাম
	নাসিরুদ্দীন	মোক্তাব	বংপুব
	ইযাকুনুদ্দীন আহমদ	উকিল	দিনাজপুব

১৮৯৮, ১৮৯৯			
১৯০০	আলিমুজ্জামান চৌধুবী	জমিদাব	ফবিদপুব
১৯০১	এস. এ. আসগর	ব্যাবিস্টাব	কলিকাতা
	সৈযদ নরুল হুদা	জমিদাব	কলিকাতা
	এম সামসুব বহমান	জমিদাব	কলিকাতা
	আবদুব বহমান	তালুকদাব	উলুবাড়িয়া, হুগলী
	নুরুল হক	উকিল	উলুবাড়িয়া, হুগলী
	মহম্মদ আহসান	জমিদাব	বধমান
	সৈযদ মহম্মদ হামিদুল্লাহ	জমিদাব	বধমান
১৯০১-১৯০৫	আবুল কাসেম	উকিল	বর্ধমান
	মহম্মদ ইযাসিন	উকিল	বধমান
	আবদুল হামিদ	উকিল	বধমান
	জিযাননুবী	জমিদাব	বধমান
	সৈযদ ওযাহিদ বকস	জমিদাব	বধমান
	আজিমুদ্দীন আহমদ	ব্যবসাযী	বধমান
	সৈযদ ওযাসি আহমদ	জমিদাব	বধমান
	মহম্মদ ইযাসিন	জমিদাব	বধমান
	আবদুব বহমান	তালুকদাব	হুগলী
	মোহাম্মদ এযাকুব	জমিদাব	হুগলী
	এমাজুদ্দীন	জমিদাব ও ব্যবসাযী	বহবমপুব, মুর্শিদাবাদ
	আসগাব আলী	জমিদাব ও ব্যবসাযী	বহবমপুব, মুর্শিদাবাদ
	মহম্মদ আজিজুব বহমান	জমিদাব ও ব্যবসাযী	বহবমপুব, মুর্শিদাবাদ
	হাজি আহোন বশিদ	ব্যবসাযী	বহবমপুব, মুর্শিদাবাদ
	মোবাবক আলী	—	বগুডা
	চৌধুবী হাফিজুল বহিম	জমিদাব	বগুডা
১৯০১ ও ১৯০৩	চৌধুবী মহম্মদ ইসমাইল খান	জমিদাব	ফবিদপুব
১৯০৩	আবদুল গফুব সবদাব	জমিদাব	যশোহব
	হাবিবুর বহমান	জোতদার	যশোহব
	মোল্লা আতাউল্লাহ	জোতদার	মযমনসিংহ
	এইচ. আমমদ	উকিল	মযমনসিংহ
	এ. এম. গজনভী	জমিদার ও উকিল	টাঙ্গাইল
	আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী	তালুকদার	পিপলস এসোসিয়েশন, টাঙ্গাইল
	রিয়াজুদ্দীন আহমদ	উকিল	চট্টগ্রাম এসোসিযেশন, চট্টগ্রাম
	কাজী আবদুল করিম	ব্যবসায়ী	চট্টগ্রাম এসোসিয়েশন, চট্টগ্রাম
	রফিউদ্দীন আহমদ	জোতদার	বর্ধমান
	খন্দকার আনোয়ার আলী	জমিদার	ফবিদপুব

১৯০৫	এ কে এম আবদুল কাইয়ুম	উকিল	বর্ধমান
	মহম্মদ নুববান	উকিল ও জমিদাব	মালদহ
	আবদুল হালিম গজনভী	জমিদাব ও উকিল	মুক্তাগাছা, ময়মনসিংহ
	সৈযদ হেদাযেত বকস	জোতদাব ও ব্যবসাযী	ঢাকা
	বহমতউল্লাহ	মোক্তাব	সিবাজগঞ্জ, পাবনা*

(ঘ)
সবকাবী উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ (১৮৫৭-১৯০৫)

সি আই ই	
আবদুল লতিফ, নাবাব, খান বাহাদুব	১৮৮৩
সৈযদ আমীব আলী	১৮৮৭
আহসানউল্লাহ, নবাব বাহাদুব	১৮৯১
আবদুব জব্বাব, খান বাহাদুব	১৮৯৫
বখতিযাব শাহ	১৮৯৮
জি সি আই ই	
মুর্শিদাবাদেব নবাব বাহাদুব	১৮৯১
কে সি আই ই	
জাহান কদব মির্জা, প্রিন্স	১৮৯৪
আহসানউল্লাম, নবাব বাহাদুব	১৮৯৮
সি এস আই	
খাজা সলিমুল্লাহ, নবাব	১৯০৫
নবাব সৈযদ আসগব আলী দিলাব জঙ্গ খান বাহাদুব	১৯০৫
নবাব	
আবদুল গণি	১৮৭৬
আমীব আলী, খান বাহাদুব	১৮৭৬
আবদুল লতিফ, খান বাহাদুব	১৮৮০
সৈয়দ আজম আলী, খান বাহাদুব	১৮৮৬
ফযজুন্নেসা চৌধুবানী, হোমনাবাদ	১৮৮৯

১৮৮৫, ১৮৯১-৯৫, ১৮৯৭-৯৮ সালে কংগ্রেসেব অধিবেশনে কোন মুসলমান প্রতিনিধি যোগদান কবেননি। ১৮৯০ সালে ১৫জন প্রতিনিধি যোগদান কবেছিলেন, কিন্তু বিপোর্টে তাঁদের নাম পাওয়া যায় না।

Sufia Ahmed *Muslim Community in Bengal (1884–1912)*, Oxford University Press, Dacca pp 378–393

নবাবজাদা

আবুল খায়ের মোহাম্মদ আবদুস সোবহান, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	১৮৯৫

খান বাহাদুর

কুদরতুল্লাহ, তালুকদার, বীরভূম	১৮৬০
মওলা বকস, ডেপুটি কলেক্টর	১৮৬০
সৈয়দ আমীর আলী	১৮৬৪
হেদায়েত আলী, ক্যাপ্টেন	১৮৬৬
খাজা আহসানউল্লাহ, নবাব	১৮৭৬
আবদুল লতিফ, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	১৮৭৭
তাজুম্মল আলী, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	১৮৮৫
মোহাম্মদ ইউসুফ, উকিল, কলিকাতা হাইকোর্ট	১৮৮৫
সিরাজুল ইসলাম, বিএ, বিএল.	১৮৮৭
সৈয়দ রেজা হোসেন, কাজী	১৮৮৮
আবদুস সোবহান চৌধুরী, জমিদার, বগুড়া	১৮৯৩
সৈয়দ আশরাফউদ্দীন আহমদ, মতওয়াল্লী, হুগলী ইমামবাড়া	১৮৯৩
সৈয়দ দিলদার হোসেন আহমদ, আরবি ও পারসি অধ্যাপক, কলিকাতা মাদ্রাসা	১৮৯৩
দেলওয়ার হোসেন আমমদ, ইনস্পেক্টর জেনারেল অব রেজিস্ট্রেশন	১৮৯৪
আজহার হোসেন	১৮৯৫
আসগর হোসেন, কামরূপ	১৮৯৫
খোন্দকার ফজলে রাব্বি, দেওয়ান, মুর্শিদাবাদ	১৮৯৬
বদরুদ্দীন হায়দার, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, শিয়ালদহ	১৮৯৬
আলী নওয়াব চৌধুরী, জমিদার, ত্রিপুরা	১৮৯৭
গোলাম কাসিম, বসিরহাট	১৮৯৭
আবদুল মজিদ চেধুরী, জমিদার, রংপুর	১৮৯৮
এ. এফ. এম. আবদুর রহমান	১৮৯৮
মির্জা সুজাত আলী বেগ, মুর্শিদাবাদ	১৮৯৮
রহিম বকস পেস্কার, জমিদার, জলপাইগুড়ি	১৮৯৯
বজলুলু রহিম	১৯০০
এহসান হোসেন, ম্যারেজ রেজিস্ট্রার, বীরভূম	১৯০১
সৈয়দ মোহাম্মদ খান, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	১৯০২
সামসুজ্জোহা, অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট, বীরভূম	১৯০৩
খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ হোসেন, ঢাকা	১৯০৪
সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ, নবাব	১৯০৪
সৈয়দ মোহাম্মদ জয়নুল আবেদীন ফিরোজ জঙ্গ	১৯০৪
আহমদ, শামসুল উলামা, আরবি অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ	১৯০৪

আবদুল কাদির, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট	১৯০৪
আবদুস সালাম, এমএ	১৯০৪
ইলবাম বসুল, ডেপুটি কালেক্টব	১৯০৪
আবদুল জব্বাব	১৯০৪
আবদুল খালেক, ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, যশোহর	১৯০৪
মীব মোযাজ্জম হোসেন, জমিদার, শায়েস্তাবাদ	১৯০৪

খান সাহেব

নওযাব জান	১৮৮৭

শামসুল উলামা

আহমদ, আববি অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ	১৮৯১
আতাউর বহমান	১৮৯৩
জুলফিকার আলী	১৮৯৬
বেলায়েত হোসেন, সহকাবী মৌলবী, কলিকাতা মাদ্রাসা	১৮৯৮
মির্জা আশবাফ আলী, আরবি অধ্যাপক, প্রেসিডেন্সী কলেজ	১৮৯৮
মোহাম্মদ ইউসুফ, খান বাহাদুর	১৯০৩
সাদত হোসেন, শিক্ষক, কলিকাতা মাদ্রাসা	১৯০৩
মোহাম্মদ ইয়াকুব, সুপাবিন্টেন্ডেন্ট, চট্টগ্রাম মাদ্রাসা	১৯০৩
আবুল খাযেব মোহাম্মদ সিদ্দিক, সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ঢাকা মাদ্রাসা	১৯০৩

কায়সার-ই-হিন্দ

মোহাম্মদ ইউসুফ, খান বাহাদুর	১৯০১

অর্ডার অব দি ক্রাউন অব ইন্ডিয়া

বেগম শামস-ই-জাহান ফেবদৌস মহল, মুর্শিদাবাদ	১১৮৯৮

অর্ডার অব দি স্টার অব ইন্ডিয়া

সৈযদ আজিমুদ্দিন হোসেন, খান বাহাদুর	১৮৬৮*

* তালিকাটি নিম্নোক্ত গ্রন্থ দুটির সাহায্যে সংকলিত :

ক Consolidated Alphabetical Index to the Proceedings of the Government of Bengal. Political Department (Political Branch), 1859–1908.

খ Who"s Who in India, 1911, part 1V, V, VIII, Calcutta

(ঙ)
কলিকাতার 'এসিয়াটিক সোসাইটি'র মুসলমান সদস্যবৃন্দ
(১৮৫৭-১৯০৫)[৫]

ফাত্তাহ আলী	৭ ডিসেম্বর ১৮৫৯	কলিকাতা
আমীব আলী, খান বাহাদুব সি আই ই	৩ অক্টোবর ১৮৬০	কলকাতা
আবদুল লতিফ, খান বাহাদুর	৫ ডিসেম্বর ১৮৬০	কলিকাতা
আসগর আলী, খান বাহাদুর	৪ সেপ্টেম্বব ১৮৬১	কলিকাতা
সদরুদ্দীন, মুন্সী	২ অক্টোবর ১৮৬১	পাণ্ডুয়া
ওয়াহিদুন্নবী, মৌলবী	৭ অক্টোবর ১৮৬৩	কলিকাতা
কবিরুদ্দীন আহমদ, নবাব	৭ এপ্রিল ১৮৬৯	কলিকাতা
জাহান কদর মহম্মদ ওয়াহেদ প্রিন্স, কেসি আই ই	৪ আগস্ট ১৮৬৯	গার্ডেনবিচ, কলিকাতা
হাবিবর রহমান, মৌলবী	৭ জুন ১৮৭১	কলিকাতা
আহসানউল্লাহ, নবাব, খান বাহাদুর	৩ এপ্রিল ১৮৭২	ঢাকা
আবদুল হাই, মৌলবী	৯ ডিসেম্বর ১৮৭৫	কলিকাতা মাদ্রাসা
সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ, নবাব, খান বাহাদুর সি এস আই	৪ জুলাই ১৮৭৭	কলিকাতা
দেলওয়ার হোসেন আহমদ মৌলবী	৯ ডিসেম্বর ১৮৮০	ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা
মহম্মদ ফারুক শাহ, প্রিন্স	৬ জুলাই ১৮৮১	কলিকাতা
গোলাম সারওয়ার, মৌলবী	৩ মে ১৮৮২	কলিকাতা
মহম্মদ ইউসুফ, খান বাহাদুর	২ আগস্ট ১৮৮২	কলিকাতা
আলী কদর সৈয়দ হাসান, নবাবা বাহাদুর, কেসি আই ই	৫ মার্চ ১৮৮৪	মুর্শিদাবাদ
ইসকান্দর আলী মির্জা, প্রিন্স	২ মে ১৮৮৪	কলিকাতা
আহমদ, শামসুল উল্মা, খান বাহাদুর	৪ এপ্রিল ১৮৮৮	প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা
সৈয়দ মহম্মদ জয়নুল আবেদীন ফিরোজ জঙ্গ, নবাব, খান বাহাদুর	৪ জুলাই ১৮৮৮	মুর্শিদাবাদ
আবদুল ওয়ালি, মৌলবী	২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪	শৈলকূপা, যশোহর

৫. কলিকাতার 'এসিয়াটিক সোসাইটি' (১৭৮৪) একটি উচ্চমানেব গবেষণামূলক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল। দেশের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বুদ্ধিজীবী ও সংস্কৃতিবান ব্যক্তি এর সদস্য শ্রেণীভুক্ত হতেন। তালিকাটি এসিয়াটিক সোসাইটিব প্রসিডিংস থেকে নির্ণীত হয়েছে। কলিকাতায় ও বাংলাব অন্যান্য অঞ্চলে যাঁদের ঠিকানা দেওয়া আছে, কেবল তাঁদের নাম এখানে উল্লিখিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, এঁদেব দনেকে অবাঙালি ছিলেন, বনেদি সামন্তশ্রেণীও নব্য শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সোসাইটির সদস্যভুক্ত হয়েছেন ।

এএফ. এম আবদুর রহমান ব্যারিস্টা	৬ মার্চ ১৮৯৫	কলিকাতা
আবদুস সালাম, মৌলবী	৯ মে ১৮৯৫	কলিকাতা
শেখ মহম্মদ জিলানী,শামসুল উলামা	২৯ আগস্ট ১৮৯৫	কলিকাতা
মহম্মদ আবদুল কদর খান বাহাদুর	১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৫	কলিকাতা
আবদুল করিম বিএ, মৌলবী	৪ মার্চ ১৮৯৬	কলিকাতা
আবদুল আজিজ খান, বিএ. মৌলবী	৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯	কলিকাতা
আবদুল আলিম	৪ ফেব্রুয়ারী ১৯০৩	কলিকাতা[৬]

৬. হুগলীর ইমামবাড়ার মতওয়াল্লী সৈয়দ কেরামত আলী ৭ ফেব্রুয়ারী ১৮৩৮ সালে সোসাইটির সাধারণ সদস্য নির্বাচিত হন, তিনিই প্রথম বাঙালি মুসলমান সদস্য। তিনি ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত সোসাইটির এসোসিয়েট সদস্য হিসাবে জড়িত ছিলেন। ঐ বছর তাঁর মৃত্যু হয়। চুঁচুড়ার সুলতান মহম্মদ বসিরুদ্দীন ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৫৬ সালে সদস্য হন। প্রিন্স জালালউদ্দীন ও আগা বেগ সোসাইটির সঙ্গে জড়িত থেকে যথাক্রমে ১৮৬৪ ও ১৮৬৫ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

পরিশিষ্ট—২

(ক)
'সুরিয়া-বিজয়' (১৩০২) গ্রন্থের 'উৎসর্গপত্র'

অশেষগুণালঙ্কৃত, ধর্মপরায়ণ, সমাজহিতৈষী, উদারহৃদয়, দানশীল, মুসলমান জমিদার-কুলরত্ন, জনাব সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী সাহেব করকমলেষু

ধার্মিকবর,

অনিত্য আমোদোপযাচিকা সংসারপতির ঘোর আবর্তনের মধ্যে অবস্থিতি করিয়া ভবদীয় জীবন এবং সম্পদ যেরূপ অকাতরে পবিত্র ধর্মকার্যে উৎসর্গ করিতেছেন এবং সমাজহিতকর বিবিধ বিষয়ের অনুষ্ঠানে বঙ্গীয় মুসলমানদিগের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন, বিষেষতঃ জাতীয় ইতিহাস ও ধর্মপুস্তকাদি বঙ্গভাষায় অনুবাদ বঙ্গীয় মুসলমানদিগকে ধর্ম ও জাতীয় একাতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে সবর্স্ব সমর্পণ করিয়াছেন। অধিকন্তু এই সকল সদেচ্ছা ও সৎপ্রবৃত্তি অপ্রতিহতভাবে রাখিয়া ধর্মের আদেশানুবর্তী হইয়া পবিত্রভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করাই ভবদীয় জীবনের মহা উদ্দেশ্য। সেই মহা উদ্দেশ্যে অনুপ্রাণিত হইয়া মহোদয় আমার এক চির বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য কার্যে পরিণত করায় কৃতজ্ঞতার দীন-চিহ্ন স্বরূপ "সুরিয়া-বিজয়" ভবদীয় করকমলে অর্পণ করিলাম। ইতি

সংগ্রহক।[৭]

(খ)
'জাতীয় ফোয়ারা' (১৩১৯) গ্রন্থের 'উপহারপত্র'

যিনি জাতীয়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া জাতীয় উন্নতিকল্পে জীবনোৎসর্গ করিয়াছেন, যাঁহার নিঃস্বার্থ যত্ন ও চেষ্টায় সমাজের সমূহ উপকার সাধিত হইয়াছে, সেই উদার-হৃদয়, সদগুণনিলয়, পরম ভক্তিভাজন পুণ্যপ্রাণ কর্মবীর অনারেবল নবাব মৌলবী সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী খান বাহাদুর সাহেবের সুপবিত্র করকমলে ভক্তিপ্রীতিপূর্ণ প্রাণে এই অকিঞ্চিৎকর "জাতীয় ফোয়ারা" সসম্মানে উপহার প্রদান করিলাম।

হক মঞ্জেল, শান্তিপুর, নদীয়া — মোজাম্মেল হক
১৩১৯, জ্যৈষ্ঠ

৭. পণ্ডিত রেয়াজউদ্দীন আহমদ মাশহাদী 'সুরিয়া-বিজয়' প্রণয়ন করেন, মাসিক 'মিহিরে' (১৮৯২) ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। পরে সম্পাদক শেখ আবদুর রহিম পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করে এটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।
আবদুল কাদির সম্পাদিত— *মাশহাদী রচনাবলী,* ১ম খণ্ড, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০, পৃ. ৯৩।

(গ)

'ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার' (১৮৯০) গ্রন্থের 'উৎসর্গপত্র'

শ্রীযুক্ত হাফেজ মাহমুদ আলি খাঁন চৌধুরী সাহেব মহোদয় করকমলেষু

মহাত্মন !

অলক্ষ্যে কর্তব্য সাধনই প্রকৃত মহাজনের জপনীয় মন্ত্র। আপনি সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মুসলমান ধর্মের জ্যোতিঃ বিকাশ এবং মুসলমান সমাজে তৎসাধন-সূচিকা বঙ্গভাষা প্রচার করিতেছেন। এহেন কার্যকলাপের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ মুসলমান ধর্মাবলম্বীদিগের উন্নতিমূলক উপকারই ভবিষ্যৎ ভারতে আপনার যশঃসৌরভ বিস্তার করিবে ; সুতরাং এতাদৃশ্য লোপশীল পুস্তকের একপ্রান্তে আপনার মূল্যবান নামাঙ্কনের কিঞ্চিদপি প্রয়োজন নাই। তথাপি ভক্তি এবং আনন্দ উচ্ছ্বাসে এই ক্ষুদ্র মুসলমান ধর্মযুদ্ধ-নীতি পুস্তকখানি আপনার বিমল করকমলে অর্পণ করিলাম। নানা দোষে মলিন থাকিলেও আপনার উদার করে ইহার পরম শোভা হইবে, ইহাই দেখিব, আমাদের একমাত্র বাসনা, ইতি।

অনুগত
রেয়াজুদ্দীন আহমদ
ও
আবদুর রহিম

(ঘ)

'জমিদার দর্পণ' (১৮৭২) নাটকের 'উপহারপত্র'

পরম পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত মীর মোহাম্মদ আলী সাহেব, পূজ্যপদেষু।

আর্য্য !

আপনি আমাদের বংশের উজ্জ্বলমণি বিশেষ। আমাকে বাল্যকাল হইতে একাল পর্যন্ত অন্তরের সহিত ভাল বাসিতেছেন। সামান্য উপহার স্বরূপ, আজ্ঞাবহ কিঙ্করের ন্যায় জমিদার দর্পণ সম্মুখে ধারণ করিতেছি। এবার কটাক্ষপাত করিয়া যত্নে রক্ষা করিবেন, এই আমার প্রার্থনা। অনেক শত্রু দর্পণখানি ভগ্ন করিতে প্রস্তুত হইতেছে।

আজ্ঞাবহ
মীর মোশাররফ হোসেন

(ঙ)
'বিষাদ-সিন্ধু'র (১৮৮৫) 'উৎসর্গপত্র'

পূজনীয়া শ্রীমতি করিমন্নেসা খাতুন সমীপে
মাত!

যদিও আমি আপনার গর্ভজাত সন্তান নহি, কিন্তু সদরোপম আবদুল করিম ও আবদুল হালিম অপেক্ষা আমার প্রতি কোন অংশেই কোন দিন আপনার স্নেহ-মমতাব কিছুমাত্র ন্যূনতা দেখি নাই। সন্তানের উপার্জ্জিত অর্থ অনেক মাতাই আশা কবিয়া থাকেন। যদিও মা, আপনার সে আশা নাই, জীবনে কখনও হইবে কিনা সন্দেহ, তথা আপনাব আশ্রয়ে থাকিয়া যাহা করিয়াছি তাহা আজ আপনার হস্তেই অর্পণ করিলাম। দুঃখী সন্তানের প্রদত্ত বলিয়া ঘৃণা করিবেন না, এই আমার প্রার্থনা। "বিষাদ-সিন্ধু" আপনার হস্তেই অধিকতর শোভা পাইবে।

চির আজ্ঞাবহ দাস
মীর মোশাররফ হোসেন।[৮]

(চ)
'মতিচুর' ২ খণ্ড (১৩২৮) গ্রন্থের 'উৎসর্গপত্র'

আপাজান।

আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ণ পরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও পারসী পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাঙ্গলা পড়ার ঘোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাঙ্গালা পড়ার অনুকূলে ছিলে। আমার বিবাহের পর তুমি আশঙ্কা করিয়াছিলে যে, আমি বাঙ্গালা ভাষা একেবারে ভুলিয়া যাইব। চৌদ্দ বৎসর ভাগলপুরে থাকিয়া বঙ্গভাষায় কথাবর্তা কহিবার একটি লোক না পাইয়াও যে বঙ্গভাষা ভুলি নাই, তাহা কেবল তোমারই আশীর্বাদে। অতঃপর কলিকাতায় আসিযা ১১ বৎসর যাবত এই উর্দু স্কুল পরিচালনা করিতেছি, এখানেও পরিচারিকা, ছাত্রী, শিক্ষয়িত্রী ইত্যাদি সকলেই উর্দুভাষিণী। প্রাতঃকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত উর্দু ভাষাতেই কথা কহিতে হয়। আবার বলি, এতখানি অত্যাচারেও যে বঙ্গভাষা ভুলিয়া যাই নাই, তাহা বোধ হয় কেবল তোমারই আশীর্বাদের কল্যাণে। স্নেহ-ভক্তির নিদর্শন-স্বরূপ এই গ্রন্থখানি তোমার করকমলে সমর্পণ করিতেছি, গ্রহণ করিলে ধন্য হইব। এই পুস্তকে তোমার বড় সাধের 'ডেলিশিয়া হত্যা'ও দেওয়া হইয়াছে।[৯]

'বিষাদ-সিন্ধুর কেবল প্রথম সংস্করণে এই উৎসর্গপত্রটি আছে, পরবর্তী আর কোন সংস্করণে এটি

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল— *মীর মশাররফের গদ্য রচনা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫, পৃ. ৬০-৬১

৯ *রোকেয়া-রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃ. ৭৬

(ছ)
'বসন্তকুমারী নাটকে'র (১৮৭৩) 'উপহারপত্র'

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর শ্রদ্ধাস্পদেষু।
মহামহিম মিত্র

আপনি আমাদের সমাজের একটি রত্ন। বিশেষতঃ আমার প্রতি আপনার অকপট স্নেহ। বঙ্গসাহিত্যের প্রতি আপনি যথোচিত অনুরাগ প্রদর্শন করেন। স্নেহ আর অনুরাগের বশম্বদ হইয়া আমাব কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ ইন্দ্রপুব রাজকুমারী এই বসন্তকুমারীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। আপনার উদারচিত্ততা, মিত্রানুরাগিতা এবং সাধারণ সমাজানুরাগিতায় বিশেষ যত্ন দেখিয়া আমি বহু যত্ন প্রসূত বসন্ত কুসুম-কলিকা বসন্তকুমারীকে আপনার হস্তে সমর্পণ করিলাম। সাহিত্য উদ্যানে বিচরণ করিবার ফল স্বরূপ এই আমার একটি নব-কুসুম। প্রত্যাশা করি, এই কুমারীকে স্নেহ নয়নে দর্শন করিয়া সযত্নে বক্ষা করিবেন।

ভবদীয় স্নেহপাত্র চিরকৃতজ্ঞ
মীব মশাররফ হোসেন

(জ)
'তৃষ্ণা' ১৯০০ কাব্যের 'উপহারপত্র'

অশেষ গুণালঙ্কৃত, সমাজগতপ্রাণ, উদার-হৃদয় মাননীয় মৌলবী ডাক্তার ফয়েজউদ্দীন আহমদ "প্রচারক" সম্পাদক মহোদয় করকমলে —মহাত্মন!

যে মহামন্ত্র হৃদয়ে ধারণ করিয়া আপনি পতিত সমাজকে জড়তাশূন্য করিবার নিমিত্ত, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতেও কুণ্ঠিত হইতেছেন না, আমি তাঁহারই একজন ভক্ত উপাসক। বিশেষতঃ সেই দুই দিনের আকস্মিক আনন্দ মিলনে আপনার হৃদয়স্থিত যে স্বর্গীয় জ্যোতি দেখিতে পাইয়াছিলাম, তাহার তেজপুঞ্জ এই অল্পকালের মধ্যে আমার হৃদয়ে দিব্য-জ্ঞানের মহা-মিলনাশা জাগাইয়া দিয়াছে। তাই আপনাকেই ইহা উৎসর্গ করিবার যোগ্য পাত্র বিবেচনা কবিয়াছি ; অপিচ আপনি আমার কবিতাগুচ্ছ পাঠ করিতে ভালবাসেন সুতরাং আপনি কি আমার এই মানস কানন-জাত কোমল বন-ফুলগুলি পায়ে ঠেলিবেন?

একান্ত অনুগত
সেখ ফজলল করিম

(ঝ)
'কাসেমবধ কাব্যে'র (১৯০৫) 'উৎসর্গপত্র'

সুনীতি মুকুট-বিভূষিত স্বনাম খ্যাত মহাত্মা মৌলবী আবদুল কবিম বিএ চট্টগ্রাম বিভাগের স্কুলসমূহের ইনস্পেক্টর মহোদয়ের শ্রীচরণ কমলেষু —

বঙ্গীয় শিক্ষক শ্রেণী, শিক্ষাপ্রণালীর
উৎকর্ষ সাধন তরে সেই পরিশ্রম
করেছেন অবিরত অক্লান্ত শরীরে
তাহার প্রতিদান কি হে আছে মহাত্মন।
তবে এই শোকোচ্ছ্বাস নবী-বংশ-বধে,
(প্রকাশ করেছি যাহে সন্তপ্ত হৃদয়ে)
ভক্তি-উপহার রূপে শোভিত চরণে।
দিবসে প্রদীপ যদি কোন মূঢ় জন
জ্বালায় গগনস্থিত প্রদীপ্ত ভাস্কর
তার প্রতি নাহি হাসে। পূর্ব উপহার
সতত সজীব যথা স্নেহ-দৃষ্টি লোভে,
সেইরূপ এ মলিন কাব্য-রত্ন-হার
শোভুক প্রদীপ্ত হয়ে ও কর পরশে।

স্নেহপ্রার্থী
এ. এম. এম. হামিদ আলী

(ঞ)
Bust

(Senate House, Calcutta University)
Nawab Bahadur Abdul Latif C.J.E
borm 1829[১০] died 1893

"This bust is erected in grateful commemoration of his life long devotion to the Spread of Eastern and Western learning among Indian Mohamedans and his strenous endeavour to accomplish their moral and intellectual advancement. He devoted his life to the promotion of two great principles, the encouragement of education among his Mahomedan fellow-subjects and this promotion of confidence and good will between those who

১০. আবদুল লতিফের জন্মসাল সর্বত্র ১৮২৮ সাল পাওয়া যায় ; সম্ভবত এটি ভুল সাল খোদিত রয়েছে।

professed his own religion and their Hindu and European neighbours. He recognised Great Empire and in security its good Government."

Member of this Senate 1863-1893.

Memorial Tablet

"With the concurrence of the Govermment of Bengal this table is erected by the Memorial Committee to the memory of a great benefactor of the Muhammedans of Bengal, Nawab Bahadur Abdul Latif C.I.E. in grateful commemoration of his life long services in the encouragement of Western and Oriental Education among his co-religionists, and his warm interest in the Calcutta Madrasah Hostel. He was foremost in every good work calculated to promote the moral, social and intellectual advancement of the Muhammedans of India

Born, March 1828 Died, 10th July, 1893

পরিশিষ্ট- ৩

(ক)

Central National Muhammedan Association

First Five Years Report 1883

"The present backward condition of the Indian Moslems is due partly to internal and partly to external causes The disintegration of the Mahommedan Society, the decadence of their principal families, and the general ruin which has evertaken all classes of the Mussulman Community, combined with the absence of any means to represent to Government, faithfully and honestly, the views of the Mussulmans of India, have placed them in a most disadvantageous position as regards political influence and power relatively to the other Indian Communities It may safely be afirmed that until the establishment of the Central National Mahommedan Association, there existed no political body among the Indian Mahommedan, capable of representing to the Government, from a loyal but indipendent stand point, the hopes and aspirations, the legitimate wants and requirements of the large body of Moslems in this country who by their number and homogeneity constitute such an important factor in all questions concerning the welfare of India. The Mahommendan Societies which had been formed here and there were in the main, literary and scientific, having their stensible object the promotion of a desire for European knowledge among the Mahommedans The absence of a really representative political institution occasionally forced the Government to consult the societies upon questions affecting the Mahommedan Community of particular localities. The opinion thus elicited hardly represented, however the views of the leaders of thought among them, who were alive to the exigencies of the times The factions and cliques into which the Mahommedan Community was divided not only prevented their acting in consult with their Hindoo and Christain fellow subject on general question of public policy, but absolutely precluded the possibility of collective action in the way of social progress and refrom. In order to obviate the difficulties under which the Mahommedan Association was instituted six years ago for the portection and conservation of the general interests of the community.

The Association has been formed with the object of promoting by all legitimate and constitutional means, the well-being of the Mussulmans of India. It is founded essentioally upon the principle of strict and loyal apparence to the British Crown Deriving its inspirations from the noble traditions of the past, it proposes to work in harmony with western culture and the progressive tendencies of the age. It aims of the political regeneration if the Indian Mahommedans by a moral revival, and by constant endeavours to obtain from Government a recognition of their just and reasonable claims.

"The Association does not, however, overlook the fact that the welfare of the Mahommedans is intimately connected with the well-being of the other races of India. It does not, therefore, exclude from its scope, the advocacy and furtherances of the public interests of the people of this country at large. It is hoped that the Association, whilst working the cause of the Mussulmans, will also be able to promote and consume the interests of their non-Moslem compatriots "[১]

National Mahommadan Association. Rangpur Branch

(Letter to the Government of Bengal by the President
Khan Bahadur Abdul Majid Chowdhury)

"All the sacred books of the Muhammadans being written either in Arabic, Persian or Urdu, it is essentially necessary for a Muhammedan to learn of first something of those languages, if he to claim any knowledge of his religion and respect from the society. The Muhammadan parents also do not like to educate their children in Bangali only, as the language is full of Hindu polytheistic ideas and thoughts, and tends to denationalise their youths. To meet this general inclination, well-to-do Muhammadans have set up Mukhtabs at their own expense.... but hitherto the Mukhtabs have neither received any aid from the Government nor are they being supervised by any educational officer, nor are they in any way recognized by the the Goverment and consequently their condition, status and usefulness are not so good as could be desired.

১ *Rules and Objects of the Central National Mahommadan Branch Association,* Associations with Quinquennial and Annual Reports and list of Members. Calcutta. 1885, pp. i-iii.

The District Board contributes about half a lakh of rupees towards the maintenance of Bengali Pathsalas in Rangpur, but unfortunately nothing is spent for these Mukhtabs educating the children of the Muhammadans, who comprise more than two-thirds of the entire population of the District.

The Government has recently granted four lakhs of rupees in addition to the District Board's grant for primary education in Bengal, and out of this amount. Rs. 11,135 has been alloted to Rangpur. The District Board has already made an ample provision for the pathsalas where only Bengali is taught. If the Mukhtabs be included in the category of the lower primary schools and out of the above grants Rs. 5,000 be specially reserved for these Mukhtabs to be expended in granting stipend and other aids to the boys, and also in paying the salary of a qualified Maulvi with English education to be appointed as Special Sub-Inspector to supervise them, it will go a great way in solving the great educational problems of the Muhammadans of Bengal The Mukhtabs should, of course, conform to such standard of a lower primary pathsala as might be feasibly done, without inspiring the special facility for which these Mukhtabs exist, viz, the boys should be taught Persian or Urdu as well as Bengali. Should this process be adopted in the Mukhtabs, it will be necessary to change the existing standard of the junior and senior Madrassahs to which these Mukhtabs might serve as feeders, that is to say, the students after passing the final examination from these Mukhtabs might be taken the fourth class of a junior Madrassah.''[১]

(গ)

National Muhammedan Association, Mymensing Branch

(A Letter to Sir Syed Ahmed Khan by the Secretary of the Branch Association)

''Perhaps you have learnt already that we were compelled to postpone the intended meeting at Dacca. the reason was simply this that after I had left the place Babu Surendra Nath Banerjee came there and that strong headed advocate of the Congress, the president of the so-called Anjuman-i-Islamia of Dacca of whom I spoke much in may last, like a man void of all sense of

১. Khan Bahadur Abdul Majid Chowdhury to the Govt. of Bengal. 30 November, 1902, paras 1-3, Bengal Education Proceedings.Sept.1903.

honour shamelessly threw away his mash. and against all his big promises and solemn assurances again joined the Babus and allowed himself to be elected a delegate and threw me in a very awkward position. He presided in a meeting in which Mr.Banerjee made a vehement speech. But your letter which I thoroughly explained to the Dacca Mohammedans was fresh in their memory they violently opposed the speaker. This discouraged the Babu so much that he thought it advisable to change his programme. Without any attempt to come here as was pre-arranged he returned to Calcutta. However Syed Abdul Bari's treachery has provoked the whole community. He has already lost the sympathy of his friends and followers. He stands alone but to make up the loss he was trying to come here to entice away fools but I got timely information and he is baffled in his attempt. He is against the Nowab of Dacca and is trying to gain notoriety by joining the Hindus. Though he has non of the qualifications of Bhimjee yet be aspires to soar like that notorious merchant The friends of the Congress have made much out of Abdul Bari's disgraceful conduct. To counteract this we intend to hold a grand meeting on the 11th November, 88 at the Nawab's palace in which we of East Bengal and all the Associations of this quarter.....The meeting will be held chiefly on the basis of your note and the prospectus of the patriotic Association so although it is too far yet is desirable that the Patriotic Association should send some one to explain fully your views to that meeting. That will add great weight If it be not convenient you may at least empower me or any other gentleman to do task. At the same time, I shall feel much obliged if you send me a copy of your first speech against the Congress or any other paper which may assist me in explaining your views.''[১]

Dated, Mymensingh. Hamiduddin Ahmed
the 31st Oct.1888. Hon. Secretary.

১. Quoted from *Hindu-Muslims Relations in Bengal (1905 - 1947)* by Hossainur Rahaman. Bombay. 1947. pp. 177-18

(ঘ)

Malda Muhammedan Association

Letter from Secretary Published in 'The Moslem Chronicle.'

"An Association styled the Malda Muhammedan Association was started here in the year 1891 with the object of improving upon the political, social and educational status of the Muhammedans of Malda. Meeting chiefly in connection with the establishment and maintenaces of a Madrassah at the Sudder Station of the District out of the very large income of the great wakf estate of Bais Hazari in this District were from time to time be held until as a meeting on the 15th December, 1895 it was thought fit to re-organise the Association on a firmer basis on the model of the Central National Muhammendan Association at Calcutta. Fresh rules were passed and Chowdhuri Mowahedur Rahman Saheb, a leading zeminder of the District was unanimously elected president of the Association . One of the resolution of the said meeting of the 15th Dec , 1895, was to the effect that the District Board of Malda be requested to appoint a sufficient number of Muhammedans in the education Department under its charge having regard to circular no. 80, dated 25th june,1894, of the Director of Public Instruction, Bengal. The Board on a requisition from the Association passed a resolution to consider the claims of Muhammedan candidates for employment under head education and to issue one notice of a vacancy occuring. Nothing, however, has yet been done by the Board to give any material help to the Muhammedans in the direction, and the Association is carefully watching the action of the Board in filling up a vacancy that has lately occured in the post of an inspecting Pandit for which two Muhammadan candidates have applied.

The next ordinary meeting of the committe of Management of the Association was held on 8th March, 1896. It was there amongst other matters unanimously resolved that the Chairman, District Board, Malda, be requested to nominate at least six Muhammadan gentlemen for appointment as members of the District Board of Malda, regard being had to the large Muhammeden population of the District, which is close upon 50 per cent of the total population.... It is much to be regretted that the leading Muhammedans of this District take little or no interest in this direction.....

The want of Boarding House for Malda students is keenly felt here. Muhammedan students from mofussil desiring to prosecute their studies in the zillah School are sadly disappointed to find no suitable lodging for them in the town. The few Muhammedan legal practioners and officers of the Court with the limited sources at their disposal are quite unable to provide lodging for mossil students and it will be necessary for us to resusciate proceedings with a view to ask to both the Bais Hazari and Shah Hazari Maliks for contribution for a permanent fund to meet the cost of establishing and maintenance of a Muhammedan Boarding House here."[১]

20th June, 1896

Abdul Aziz Khan
Secretary of Malda Mhuhammedan
Association

(ঙ)

Muhammedan Reform Association

(A Circular Published in the Moslem Chronicle)

"All educated Muhammedan gentlemen who have applied themselves to the question of the welfare and progress of their community have long felt the use of an organisation whose deliberations and action will be guided by a sole regard to its true interests unhampered by any other consideration and which by its constitution will be able to faithfully represent views of the Muhammedans and at the same time command the confidence of the public in general as well as of the Government. It is to supply this want of that the Muhammedan Reform Association has been founded. The promoters of the Muhammedan Reform Association have, therefore. considered it a matter of vital importance to introduce a rule to the effect that all office bearers shall be elected annually by means of ballot so that the community which entrusts its interest in their hands may have a real and effective control over their actions. The special efforts of the Association will be directed to the advancement of the welfare of the Muhammedans of India by all legitimate means. At the same time it will always consider its duty to contribute its share to the promotion of the well-being and prosperity of all classes and communites in India without distinction of race or creed. The promoters of

১. *The Moslem Chronicle.* 11July 1896.

this Association think it right state that it will always be the policy of the Muhammedan Reform Association to strengthen the hands of the Government in all just and useful measures and while it will feel itself bound to freely criticise all such actions of the Government as they think to be detrimental to the interested of the country and the Muhammedan community, it will also bear in mind that the cause of good Goverment in India requires that the prestige of the British Goverment should be in no way inspired by violent and indiscriminate attacks. Lastly the promoters of the Muhammedan Reform Association do not share the apprehension which may possibly be felt in some quarters that this new Association is calculated to create discord among the Muhammedans, on the other hand the Muhammedan Reform Association will always be ready and willing to work in conjunction with other Association either in Culcutta or elsewhere in all measures likely to advance the well-being of the Community.

It is earnestly hope that all well-wishers of Muhammedan community will join this Association and lend their help in ensuring its success.

Mohamed Yousuff
Vakils' Library

Abdur Rahim,
Bar Library.[১]

(চ)

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র

ভ্রাতৃগণ! আপনারা বঙ্গীয় মুসলমানদিগের বর্তমান দুরবস্থার কথা একবার নিবিষ্ট মনে চিন্তা করিয়া দেখেন কি? ... বিদ্যাশিক্ষাই মনুষ্যজাতির উন্নতির একমাত্র উপায়। ... দুর্ভাগ্যবশত: বঙ্গের নির্জীব মুসলমানবৃন্দের মধ্যে সেই অমূল্য পদার্থের সম্পূর্ণ অভাব।

বর্তমান সময় বঙ্গের মুসলমান অধিবাসিগণের অবস্থা যাহাতে সংশোধিত ও পরিবর্তিত হইতে পারে, যাহাতে তাঁহাদের অসহ্য দারিদ্র্য যন্ত্রণা বিদূরিত এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলা অপনীত হইতে পারে, যাহাতে তাহারা বিদ্যাশিক্ষায় ব্রতী হইয়া জ্ঞানালঙ্কারে অলঙ্কৃত হইতে পারেন, এই সকল গুরুতর কার্য্য সম্পাদনের জন্য 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ... অন্যদিগের সভার কিয়দংশ জাতীয় পুরুষ শিক্ষার নিমিত্ত প্রযোজিত হইবে। ... সম্প্রতি স্থানীয় ভদ্রলোকদিগের সহানুভূতিতে আশান্বিত এবং মফঃস্বল সভ্যদিগের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া আমরা এই গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেছি। ... আজি মুসলমানগণ আপনাদের দুরবস্থা পরম্পরায়, অন্যান্য সম্প্রদায়ের নিকট আসন লাভ করিবার অনুপযুক্ত, ইহা অপেক্ষা ক্ষোভের ও পরিতাপের আর কি

১. *The Moslem Chronicle*, 16 May, 1896.

হইতে পারে? স্মরণ করিতেও বিজাতীয় মর্মবেদনায় নিপীড়িত ও নিরাশার তীব্র বিষে বিকলচিত্ত হইতে হয়। আর কতকাল আমরা এই অজ্ঞানতমসে সমাচ্ছন্ন থাকি? ... পাশ্চাত্য শিক্ষাভিমানী যুবকদিগের স্বধর্মের প্রতি যেরূপ অনাস্থা এবং অনাদর তাহা স্মরণ করিলেও অভাবনীয় মর্মপীড়ায় নিপীড়িত হইতে হয়। ... শিক্ষিত মুসলমান যুবকের মধ্যে অনেকেই যীশুখ্রিষ্টের প্রপিতামহের জীবনচরিত্র বলিতে পারেন, শ্রীকৃষ্ণের ষোল শত গোপিনীর নামকরণ করিতে পারেন, কিন্তু তাহাকে মোহাম্মদীয় ধর্মশাস্ত্রের মূলমন্ত্রগুলি (কলেমা প্রভৃতি) জিজ্ঞাসা কর, অমনি তাঁহার চক্ষু স্থির! এই শোচনীয় অভাবের কারণানুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে, বর্তমান একদেশদর্শী শিক্ষাপ্রণালীর অঙ্গহীনতাই ইহার প্রধান কাবণ। ... আক্ষেপের বিষয় এই যে, স্কুলসমূহে ধর্মশিক্ষার কোন প্রকাব বন্দোবস্ত নাই। তাই মুসলমান অভিভাবকগণ বালকদিগের ইংবাজী ও বাঙ্গালা শিক্ষার বিরোধী ও বাস্তবিক ধর্মশিক্ষার অভাবেই আধুনিক শিক্ষার দ্বারা আমাদের সমাজবন্ধন দিন দিন শিথিল হইয়া উঠিতেছে ইহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। ... এই সকল শোচনীয় অভাব দূবীকরণার্থে 'মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী' আমাদের সাধারণ শিক্ষাব সহিত ধর্মশিক্ষার কোন প্রকার উপায অনুষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত বিধিমত যত্ন ও চেষ্টা কবিবেন। ... প্রত্যেক জেলাতেই ' মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'র শাখা সমিতি কিংবা সহযোগী সমিতি স্থাপন একান্ত বাঞ্ছনীয। ভবসা করি প্রত্যেক জিলাবাসী শিক্ষিত এবং স্বজাতিবৎসল মুসলমান এ বিষয়ে যত্নবান ও অগ্রসর হইবেন।[১]

(ছ)

Anjuman-i-Ashaati Islam

(Letter from The Moslem Chronicle)

"I am glad to inform you that an Association by the name of the 'Noakhali Islamic Propaganda' (Anjuman-i-Ashaasti Islam) has been established by the Mussulmans of this district . the immediate task of this Association will be to preach Islam through paid missionaries whose principal duty later on will be to travel over and preach in those parts of our country where Islam is less in rogue or not at all The Association will have special attention towards those places where the moral degradation of the lower strata of the Mussulman community has produced in them a litigious and other ferocious spirits. Steps will be taken if fund allows, to encourage education among Mussulmans. At present there will be a library in connection with this Association.

১ *ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ১৮৮৬–৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র*, ঢাকা, ১৮৮৭, পৃ. ১–৭

This is, I believe, the first step in this direction ever taken in Bengal and as such it must meet with co-operation of our co-religionists from the more enlightened parts of our country. Its is pleasing to note this undertaking has meet with warm support from all classes of people here. Our noble Magistrate Mr. S. K. Agasti has kindly given as his wards to render any assistance in his power for furthering the objects of this Association."[১]

(জ)

Tipperah Hito Sadhinee Sava

As expected, the contemplated transfer of the Chittagong Division to Assam has caused great consternation among the people. The following telegram, we understand, has been sent both to the Government of Bengal and the Government of India, by Moulvi Serajul Islam Khan Bahadoor, as President of the Tipprah Hitshudhinee Sava :

Chittagong Division much alarmed at its Proposal transfer to Assam. Prays for suspending final decision. Memorials follow.

It is a pity that Moulvi Serajul Islam is no longer in the Bengal Council, for : he would have been then in a position to do considerable service to the Division, which he represented so ably, by interpellating the Government on the subject. It is quite true that he asked a question last year and failed to elicit a satisfactory answer from the Government : but Sir Charles Elliot is no longer the ruler of Bengal, and there is no doubt that Sir A. Mackensie will deal more fairly with those members who intend availing of the privilege of interpellation than his predecessors did. Imagine the nature of the wrong, if the Chittagong Division is transfered to Assam, that a man like Moulvi Serajul Islam will no longer have of serving in the Council as a popular representative. The proposal is monstrous on the face of it : but yet it has the support of the statement. And why does the statement support a proposal which has created such alarm in the minds of the public? Perhaps, because, it emanated from Sir Charles Elliot."[২]

১ *The Moslem Chronicle*, 12 December, 1896
২ The Moslem Chronicle, 11 January, 1896

(ঝ)

আঞ্জুমনে নুরুল ইসলাম

('মিহির ও সুধাকরে' প্রকাশিত একটি পত্র)

প্রায় তিন বছর হইল যশোহর মনোহরপুর গ্রামে শ্রীযুক্ত ডাক্তার মহাতাবউদ্দীন সাহেবের প্রযত্নে 'শুভকরী' নামে একটা সমিতির সৃষ্টি হয়। সেই সমিতির ঐকান্তিক যত্ন ও প্রচেষ্টায় অত্র মনোহরপুরস্থ নিম্ন প্রাথমিক স্কুলটিকে 'প্রভাকর' নাম দিয়া মধ্য ইংরাজী স্কুলে পরিণত করিয়া তৎসঙ্গে মাদ্রাসা আলিয়ার ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত আরবী ও পারসী ক্লাশ খুলিবার প্রস্তাব এবং অতি সত্বরই তাহা কার্য্যে পরিণত করা হয়। তৎপর ইহার বিগত ১৩০৭ সালের ৯ই মাঘ তারিখের অধিবেশনে সভ্যগণ একমত হইয়া উক্ত স্কুলটিকে স্বর্গীয় মৌলানা কারামত আলি মরহুম মাগফুর সাহেবের নামে উৎসর্গ করিয়া 'মাদ্রাসা কারামাতিয়া' নামে অভিহিত করেন। পরে বিগত ১৩০৮ সালের কার্তিক মাসে ইহার বার্ষিক অধিবেশন হয়। আমাদের ভক্তিভাজন যশোহরের মোসলেম কুল-গৌরবরবি, স্বজাতি ও স্বধর্মহিতৈষী প্রবীণ উকিল শ্রীযুক্ত খোন্দকার তোফেলউদ্দিন সাহেব সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া তার গৌরব বর্দ্ধন করেন। আর যশোহর খড়কি নিবাসী আলেম কুলরত্ন পীর দস্তগীর জনাব মৌলবী আবদুল করিম সাহেব, জনাব মুনশী কাসেম আলি সাহেব এবং অন্যান্য বহুতর গণ্যমান্য হিন্দু-মুসলমান এই অধিবেশনে যোগদান করেন। এই অধিবেশনে মাদ্রাসাগৃহ নতুন করিয়া বড় আকারে প্রস্তুত, তাহার জন্য উপযুক্ত স্থান এবং স্কুলের উন্নতির জন্য সুবন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করা হয়। তৎপরে মাদ্রাসার সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত মুনশী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেব শিক্ষাভাবে বঙ্গীয় মুসলমান সমাজের অবনতি, শিক্ষার উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন। মাদ্রাসা ও সমিতির উদ্যোগী মেম্বর মুনশী জাহাঁ বখশ ১।। বিঘা জমি দান করেন, নসিরদ্দিন ২৫ টাকা দান করেন।

বর্তমান ১৩০৯ সালের ২৪শে শ্রাবণ শনিবার তারিখে ইহার আর এক অধিবেশন হয়। তাহাতে আমার পরম ভক্তিভাজন মোসলেম কুলশিরোরত্ন যশোহরের ডিস্ট্রিক ও সেসন জজ জনাব সৈয়দ নুরুল হোদা সাহেবের যশোহরে অবস্থানের স্মরণচিহ্ন জন্য উক্ত 'প্রভাকর' সমিতির নাম পরিবর্তন করিয়া 'নুরুল ইসলাম' রাখা হয়। ... ১৪ই অক্টোবর অধিবেশন হয়। এই অধিবেশনে ইহা স্থিরীকৃত হয় যে, যশোহরে গভর্ণমেন্ট সার্কুলার অনুসারে ৫জন স্কুল সব-ইনেস্পেক্টরের মধ্যেও ৩ জন মুসলমান আর ২ জন মাত্র হিন্দু থাকিবার কথা। কিন্তু এই পর্যন্ত মাত্র ১জন মুসলমান সব-ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হইয়াছেন। ইতোমধ্যে ইহার আর একটা পদ খালি হয়। কিন্তু স্থানীয় ডিস্ট্রিক বোর্ড ও স্কুলের ডেপুটি ইন্সপেক্টরের ষড়যন্ত্রে ঐ পদে ডিস্ট্রিক বোর্ডের জনৈক এন্ট্রান্স ফেল কেরানী নিযুক্ত হন। সুতরাং হিন্দু ভ্রাতাদের এই কর্মের প্রতিবাদ এবং তাহার প্রতিকার জন্য সদ্দাশয় কমিশনারের দৃষ্টিগোচর করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করিয়াই ঐ সমস্ত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ প্রেসিডেন্সী বিভাগের কমিশনার বাহাদুর ও ডিরেক্টর বাহাদুরের নিকট

পৃথক পৃথক দরখাস্ত পাঠানো যাউক। এবং উহা শীঘ্রই পাঠান হইয়াছে। ... পরস্পর শুনা যাইতেছে যে, সদাশয় কমিশনার বাহাদুর উহার জন্য ডিস্ট্রিক বোর্ডের নিকট কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন।

যশোহরের ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটী কলেক্টর শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। তাঁহার এই জাতীয় সহানুভূতিতে আমরা বাস্তবিক মোহিত (হইয়াছি) ও কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিয়াছি।[১]

(এ৩)

কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা

('মিহির ও সুধাকরে' প্রকাশিত একটি প্রতিবেদন)

আজকাল আমাদের স্কুল কলেজে ধর্মহীন শিক্ষার প্রচলন হওয়ায় স্কুল ও কলেজের ছাত্রগণ অনুদিন কিরূপ ধর্ম ও নীতিবিহীন হইয়া পড়িতেছে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। শিক্ষার উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন, কিন্তু ধর্মহীন শিক্ষায় সে উদ্দেশ্য গঠিত হইতেছে না। পিতামাতা বহু অর্থ ব্যয় করিয়া স্ব স্ব পুত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন, শেষে তাহারা দেখিতে পান যে, পুত্রগণ উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া একটি কিম্ভূতকিমাকার জীবরূপে সংসারে ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন, তখন তাহাদের দুঃখের সীমা থাকে না। এইরূপ ধর্মহীন শিক্ষাস্রোত যাহাতে বন্ধ হয়, আজকাল তৎপ্রতি সকলেরই দৃষ্টি পতিত হইয়াছে। খৃষ্টানী স্কুল কলেজে খৃস্টান বালকদের শিক্ষার সঙ্গে ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য অনেক পরিমাণে পূর্ণ হয়। কিন্তু ভারতবাসীর শিক্ষার অঙ্গ হওয়ার কোন উপায় আজিও নির্ধারিত হয় নাই। যদি হিন্দু ও মুসলমান ছাত্রগণকে শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে উহাদের স্ব স্ব ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে যে প্রকৃত শিক্ষা দেওয়া হইবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মি. আবদুর রহিম সাহেব কলিকাতার উত্তর বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবার পর হইতে মুসলমানদিগের শিক্ষার উন্নতির জন্য একটি সভা স্থাপন করিয়াছেন। কয়েকজন উচ্চ শিক্ষিত মহোদয় উক্ত সভার সভ্য পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। সভার উদ্দেশ্য, মুসলমান ছাত্রগণ যাহাতে শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতি করিতে পারে তাহার উপায় অবলম্বন করা। ... হিন্দুস্থানী মুসলমানদিগের মধ্যে সভাটি দিন দিন লব্ধপ্রসর হইয়া পড়িতেছে। আবদুর রহিম সাহেব বাঙ্গালা দেশের মুসলমান, তিনি এখন উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়া ও উচ্চ পদে সমাসীন হইয়া তাঁহার বঙ্গদেশীয় ভ্রাতাগণকে ভুলিয়া কতিপয় হিন্দুস্থানী ভ্রাতার উন্নতিকল্পে যত্নবান হইয়াছেন। আর আমাদের বঙ্গীয় গভর্ণমেন্টের নিকট উহার উন্নতিকল্পে সাহায্য ও সহানুভূতির প্রার্থী হইয়াছেন।

১ *মিহির ও সুধাকর, অগ্রহায়ন*, ১৩০৯

সেদিন মি. আবদুর রহিম সাহেবের গৃহে উক্ত সভার একটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। মি. আমীর আলি সি. আই. ই. সাহেব উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। ... প্রিন্সিপাল মি. রস সাহেবও সভাস্থলে উপস্থিত ছিলেন।

সেদিন সভায় স্থিরীকৃত হয় যে, কলিকাতার কড়েয়া অঞ্চলে একটি আদর্শ মক্তব স্থাপন করা হইবে। মক্তবে মাসিক ৫০ টাকা সাহায্য এই সভা হইতে দেওয়া হইবে। ...

এখন কি নিয়মে মক্তবে শিক্ষা দেওয়া হইবে তাহার বিষয় আলোচিত হইতে লাগিল। মাননীয় মি. আমীর আলি ধর্মহীন শিক্ষার ঘোর বিদ্বেষী, যাহাতে মক্তবে ধর্মশিক্ষার সঙ্গে পার্থিব অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা দেওয়া হয় তাহার অনুকূলে সুন্দর যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করিলেন, সর্বসম্মতিক্রমে জজ বাহাদুরের প্রস্তাব গৃহীত হইল। তৎরে মি. রস সাহেব প্রস্তাব করিলেন যে, মক্তবে উর্দু ভাষায় শিক্ষা দেওয়া হইবে। কেননা বাঙ্গালা ভাষায় শিক্ষা দিলে মুসলমানদের জাতীয়তা অর্ধেক বিনষ্ট হইবে এবং বাঙ্গালা ভাষা মুসলমানদিগকে হীনবীর্য করিয়া ফেলে। রস সাহেবের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। তৎপরে উক্ত আদর্শ মক্তবে মাসে মাসে ধর্মনীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেওয়া হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। প্রথম মাসে বস সাহেব ইসলাম নীতি সম্বন্ধে বক্তৃতা করিবেন। তৎপর মাসে খান বাহাদুর মৌলবী দেলওয়ার হোসেন আহমদ বি.এ., তৎপর মাসে মৌলবী শামস-উল-হোদা এম.এ., বি,এল. সাহেব বক্তৃতা করিবেন। ... এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, রস সাহেব যে বাঙ্গালা ভাষার অপকারিতার বিষয় সর্বসমক্ষে ঘোষণা করিলেন, আর উপস্থিত সভ্যগণ কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ বসিয়া রহিলেন, পরে তাঁহার মতে মত দিয়া একজন ইংরাজের মনস্তুষ্টি করিলেন, ইহা কি তাহারা স্বতঃপ্রমত্ত হইয়া করিয়াছেন, না স্বার্থসিদ্ধির জন্য করিয়াছেন?

বঙ্গীয় মুসলমানগণ যদি বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা না করে, তাহা হইলে অন্যভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে, ইহা কি আমাদের কথিত সমাজপতিগণ বিচার করিয়া দেখেন নাই? কলিকাতা মাদ্রাসার শেষ পরীক্ষোত্তীর্ণ মৌলভীগণ বাঙ্গালা শিক্ষার অভাবে দারিদ্রের কঠোর নিষ্পেষণে কিরূপ নিষ্পেষিত হইতেছে, তাহা কি তাঁহারা দেখিয়াও দেখিতেছেন না? ... গভর্ণমেন্টের চাকুরি করিতে হইলে, ব্যবসা-বাণিজ্য করিতে হইলে, চাষাবাদ করিতে হইলে বাঙ্গালার মুসলমানদিগকে বঙ্গদেশ ত্যাগ করিতে হইবে। ... পরিশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, কলিকাতাস্থ কথিত সমাজ নেতাগণ বঙ্গীয় মুসলমানের পক্ষ হইতে যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান করেন, তাহাতে তাহাদের স্বার্থ বিজড়িত, তাহাতে বঙ্গীয় মুসলমানগণের উপকারের আশা কিছুমাত্র নাই।[১]

১ *মিহির ও সুধাকর*, ১৩ আষাঢ়, ১৩০৯

(ট)

Anjumani-Islam (Faridpore)

(A petition to the Magistrate by the Secretary of the Anjuman)

"I have been directed by the members of the Anjuman-i-Islam, Faridpore to bring to your kind notice that the fact that cow-killing question has been the source of constant disputes between the Hindus and Muhammedans of Behar and other provinces of upper India. But fortunately the Eastern Bengal was quite free from those riots upto this time ..... Recently placards are being circulated by one Jogendra Chandra Ghosh, Secretary to the Branch Gorakhini Sava of Faridpore inciting the people to exert their best to stop cow-killing any how they can The result the circulation and notification has been that the powerful Hindu Zamindars are combing themselves to prervent the sale of cows to butchers and the killing of them in their Zaminadary mohallas. If the Hindus combine to prevent cow-killing Muhammedans are not likely to yield : that the result will be a constant dispute to ill-feeling between two communities so long living in peace and amity in Eastern Bengal

I, therefore, request you on behalf of the members of the Anjuman to take early step to prevent the circulation of those objectionable placards."[১]

১. *The Moslem Chronicle*, 4 April, 1895

পরিশিষ্ট-৪

(ক)

'বিষাদ-সিন্ধুর' সমালোচনা

"গ্রন্থকর্তা বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অনেকগুলি গ্রন্থ লিখিয়া এবং গত জীবন 'আজীজন নাহার' সম্বাদ পত্রের সম্পাদকীয় কার্য নির্বাহ করিয়া সাহিত্যসমাজে বিশেষ পরিচিত, সুতরাং তাঁহার লেখনীর নতুন পরিচয় প্রদান বাহুল্য। প্রসিদ্ধ মহরমের আমূল বৃত্তান্ত বিষাদ-সিন্ধুর গর্ভ পূর্ণ করিয়া বিষাদসিন্ধু নামের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। ইহার এক একটি স্থান এরূপ করুণ রসে পূর্ণ যে, পাঠ কালে চোখের জল রাখা যায় না। ... মুসলমানদিগের গ্রন্থ এরূপ বিশুদ্ধ বঙ্গভাষায় অল্পই অনুবাদিত ও প্রকাশিত হইয়াছে।"

গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১২৯২

"প্রথম খণ্ডের ন্যায় দ্বিতীয় খণ্ডও (উদ্ধারপর্ব) উপন্যাসের মত লিখিত। সুতরাং বড়ই সুখপাঠ্য। তবে প্রথম খণ্ডের ভাষা দ্বিতীয় খণ্ড অপেক্ষাও বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল।"

ভারতী ও বালক, মাঘ ১২৯৫

"এই গ্রন্থখানি (মহরমপর্ব) পাঠ করিলে কেবল মুসলমান নয়, হিন্দুগণেরও বিলক্ষণ প্রীতি জন্মিতে পারে।"

ঢাকা প্রকাশ, ৪ আশ্বিন ১২৯৩

"ইহা (বিষাদ-সিন্ধু) একখানি উপন্যাস ইতিহাস। ইহার বাঙ্গালা যেমন পবিষ্কার, ঘটনাগুলি যেমন পবিস্ফুট, নায়ক নাযিকার চিত্রও ইহাতে তেমনি সুন্দর রূপে চিহ্নিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে একজন মুসলমানেব এত পরিপাটি বাঙ্গালা রচনা আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না।"

ভারতী, ফালগুন ১২৯৩

(খ)

অশ্রুমালা (১৮৯৪) কাব্যের সমালোচনা

অশ্রুমালা (১৮৯৪) — কবি কায়কোবাদের অশ্রুজল অত্যন্ত উত্তপ্ত, প্রতি বিন্দুতেই শোকাচ্ছ্বাস দেদীপ্যমান। ... কবি কায়কোবাদ কাঁদিতে জানেন, স্মৃতির সঙ্গে মিশিয়া বিচ্ছেদ গীত গাহিতে জানেন, তাই তাঁহার কান্নায় বিরহীর বিরহ বেদনা ঘুচে, প্রাণের জ্বালা উপশমিত হয়। কবি মুসলমান হইয়াও 'বিরহিনী ধারা'র দুঃখে ম্রিয়মান হইয়াও নির্বাণের মন্ত্রে বিমোহিত, মুসলমান হইয়াও বিধবার বৈধব্যে সমবেদী। কবি কায়কোবাদ ভাষা গাঁথিতে জানেন, কাব্য সাজাইতে জানেন, ভাব আঁকিতে জানেন, তাঁহার কবিতা কষ্টকল্পনার জিনিষ নহে, তোতাপাখির নাম পড়া নহে, তাহা প্রাণের জিনিষ — সহজ

স্বাভাবিক, প্রাণস্পর্শী। আমাদের বিশ্বাস, রীতিমত উপাসনা করিতে পারিলে কবি কায়কোবাদ নিশ্চয়ই কাব্যজগতে কোবিদ পদবী লাভ করিতে সক্ষম হইবেন।

ঢাকা গেজেট, ১৮ চৈত্র ১৩০২

আমরা এ কবিতা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। মুসলমান হইয়া এরূপ শুদ্ধ বাঙ্গালায় এমন সুন্দর কবিতা লিখিতে পারেন, দেশে এমন কেহ আছেন, আমাদের জানা ছিল না। সুকবি মুসলমান বাঙ্গালা দেশে বিরল। কায়কোবাদ সাহেব সুকবি, সুরসিক এবং ভাবুক। ... কালে তিনি যশস্বী হইবেন, আমাদের এমন ভরসা আছে।

বঙ্গবাসী, ২১ ভাদ্র ১৩০৩

আমরা এই কাব্য পাঠ করিয়া যার পর নাই প্রীতি লাভ করিয়াছি। কবি কায়কোবাদ নব্য মুসলমান কবিদের মধ্যে অতি উচ্চাসন পাইবার উপযুক্ত। তাঁহার ভাষা বিশুদ্ধ, প্রাঞ্জল ও মর্মস্পর্শী, ভাব পবিত্র, মনোহর। ... সমালোচ্য কাব্যের বহুল কবিতাতেই কবির রচনানৈপুণ্য, কবিত্ব, মাধুর্য ও ভাবসৌন্দর্য স্পষ্ট প্রতিভাসিত। কায়কোবাদের রচনা কি তীব্র মাদকতাপূর্ণ ও করুণ, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা অপেক্ষা অনুভব করাই সহজ। ... তাঁহার হৃদয় আছে, সে হৃদয় প্রকাশের ক্ষমতাও আছে।

নবনূর, শ্রাবণ ১৩১১

(গ)

'বঙ্গীয় মুসলমান' (১৮৯১) গ্রন্থ সম্পর্কে মতামত

Bangio Mussalmen by Moulvi Nowshre Ali Khan Yousufzai of Tangail, Mymensingh It is a well written pamphlet on the political and social disintegration of the Mussalmen of Bengal. In a very impressive language the author has shown the decaying process of the aristocratic class of Muhammedans and has statistically proceed the gradual decline of cultivating classes into ignorance and impoverished circumstances. The general want of culture among our landlords.The want of education among our cultivating classes are to-day eating away the life blood of our society. The book is on the whole thoughtfully got up, and would amply repay perusal in the hands of every behind of any position :

The Moslem Chronicle, 7 Dec., 1895.

I have gone through the book with sincere pleasure, your appeal to the Bengal Mussalmans to effect their own improvement and progress by social and moral reforms by education and earnest work has ring of true patriotism and enlists my sympathy and admiration. I have been employed in different

districts in Bengal for 20 years and more than half that period has been passed in districts where the majority of the population was Mussalman. I have always tried to incalculate the principle of self-help to those among whom I have worked and I have rejoined wherever I had opportunities to help those who knew how to help themselves. I am glad therefore to find that you preach the same noble doctrine to your co-religionists that you are urging them to effect soical and moral reforms and to improve their own position by education and hard steady work. These I believe to be the only means of a nation's progress—it is idle and useless to look to other means for improvement and advancement.

Opinion of R.C. Dutt, Dinajpur, 23 March 1891.

It is significant sign of the time that the Muhammedan gentleman in this part of the country have been successful in writing works in the Bengali language in a style that would not suffer in the least in comparison with the comppposition of those who are 'so the manner born'. It is also a matter of rejoining that our Muhammedan fellow countrymen have bestiired themselves into activity and taken to discussing their shortcomings and wants in spirit that cannot fail to benefit them in the long run In the treatise the examples writer gives of the conditions of his countrymen in Bengal in their social and political and religious aspects and ascribes much of their drawbacks to want of proper education. His suggestions for their amelioration breath a true spirit of patriotism and eminently worthy of being considered by his co-religionist. To others the book is also interesting in as much as it gives them a good insight into the present condition of a section of the Indian community among whom their lot is cast.

The Indian Mirror, 3 May 1895.

পরিশিষ্ট-৫

(ক)

ইসলাম প্রচারকের প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ— 'সূচনা'

পরম দয়াময় খোদাওন্দ করিমের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া আমরা 'ইসলাম প্রচারক' প্রচারে প্রবৃত্ত হইলাম। ইসলাম প্রচারক যাহাতে প্রকৃত ইসলাম প্রচারকের ন্যায় কার্য করিতে পারে তৎসম্বন্ধে যত্ন-চেষ্টায় ক্রুটি হইবে না। বর্তমান সময়ে নানা কারণে আমাদের পবিত্র ধর্মের বিমল জ্যোতিঃ বঙ্গদেশীয় মুসলমানদিগের দ্বারা হীনপ্রভঃ হইয়া পড়িতেছে। আমাদের সমাজে ধর্মপ্রচারক ও ধর্মগ্রন্থের অভাবই ইহার একমাত্র কারণ। 'ধর্মগ্রন্থের অভাব' বলিতে বাঙ্গালা ভাষায় ধর্মগ্রন্থের অভাবই বলিতে হইবে, নচেৎ আরবী, পারসী, উর্দু ভাষায় আমাদের ধর্মগ্রন্থ অধিক পরিমাণে বিদ্যমান আছে, ...থাকিলে কি হইবে, বঙ্গভাষাপ্লাবিত বাঙ্গালা দেশে কয়জন লোক এ সকল মহাগ্রন্থের মর্ম বুঝিতে সক্ষম। একেত কালের বিপরীত স্রোত, এদেশ হইতে আরবী, পারসী, উর্দু ভাষার চর্চা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইতেছে, পক্ষান্তরে মুসলমানদিগের মধ্যে বাঙ্গালা ভাষার অনুশীলন দিন দিনই বাড়িয়া উঠিতেছে, এরূপ অবস্থায় মুসলমানদিগকেও সময়ের স্রোতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কার্য কবা উচিত। প্রচার ভিন্ন ধর্মের উন্নতি হইতে পারে না, একথা বুদ্ধিমান ব্যক্তি মাত্রেরই স্বীকার্য।...

বঙ্গদেশে ধর্মপ্রচারক মৌলবীর সংখ্যা মন্দ নহে, কিন্তু তাঁহারা বিধর্মীর নিকট ধর্ম-প্রচারের উপযুক্ত পাত্র নহেন। আবার তাঁহারা নিজের পেটের চিন্তায় এতই ব্যতিব্যস্ত যে সমাজের কল্যাণ চিন্তা তাহাদের মনে আদৌ স্থান পায় না। ...আবার মৌলবী সাহেবগণ বাঙ্গালা ভাষায় অনভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহাদের 'ওয়াজ নছিহত' উর্দু ভাষায়ই সম্পন্ন হইয়া থাকে। গ্রাম্য নিবক্ষর মুসলমানগণ উর্দু ভাষা কিরূপ বুঝিতে পারে তাহার পরিচয় দিতে হইবে না, ...সুতরাং মৌলবী সাহেবদিগের সেই একঘেয়ে ওয়াজ নছিয়ত অতি অল্পমাত্র কার্যকরী হইয়া থাকে। পক্ষান্তরে একজন নাস্তিক, একজন হিন্দু, একজন খ্রীষ্টিয়ান বা একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া একটি যুক্তিমূলক তর্ক উত্থাপন করিলে মৌলবী সাহেবের চক্ষুস্থির।...

আমাদের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্কুল বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ। ছাত্রগণ শিক্ষা বিভ্রাটে পতিত হইয়া জাতীয় ধর্মে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা লাভ করিতেছে। ফাঁকা ইংরাজী ও ছাঁকা বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা করিয়া তাহারা স্বধর্মের উন্নত জ্ঞান হইতে সম্পূর্ণরূপেই বঞ্চিত হইতেছে। ...নিজের ধর্মতত্ত্ব মোটেই তাহারা জানে না। ...হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার নাম অনেকের কণ্ঠস্থ। মহাভারত ও রামায়ণের কাহিনী অনেকে অনর্গল বলিয়া যাইতে পারে, কিন্তু হজরতের বংশাবলী চরিত্র প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা হা করিয়া থাকে। ...যে জাতি এইরূপ দুদর্শাগ্রস্ত, এইরূপ আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞ, এইরূপ বিজাতীয় ইতিহাসে পরিপক্ক তাহাদের দ্বারা ইসলাম নষ্ট না হইয়া যাইবে কোথায়?

এইরূপে আমাদের ধর্মের পথে কি অন্তরায় আছে, আর কি রূপে সেই সকল অন্তরায় দূরীভূত করিয়া ধর্ম প্রচারের পথ সুপ্রশস্ত করা যায়, একবার তাহারই আলোচনা করা

যাউক। ...আমাদের ধর্মের শত্রু প্রধানতঃ খ্রীষ্টিয়ানগণ। ইহারা প্রচারে লাখে লাখে টাকা খরচ করিয়া স্ত্রী-পুরুষে নানা ভেক ধাবণ করিয়া নানা উপায়ে ধর্ম প্রচার করিতেছে, ইহাদের অধ্যবসায় অটল, ইহারা ধর্ম প্রচারের জন্য জলের ন্যায় অর্থ-বৃষ্টি করিয়া থাকে। আবার দুর্ভিক্ষাদি উপস্থিত হইলে সেই অঞ্চলে আড্ডা করিয়া গরীব লোকদিগকে প্রলোভন দ্বারা বশীভূত করে। এই উপায়ে নদীয়া-যশোর জেলার বহু সংখ্যক নিরক্ষর গরীব মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান হইয়া গিয়াছে। নদীয়া-কৃষ্ণনগরেব পার্শ্ববর্তী কয়েকখানি গ্রামের প্রায় সমস্ত চাষী প্রজাই 'ইসাই দীন' কবুল করিয়াছে। ...আমরা 'ইসলাম প্রচারকে 'খ্রীষ্টীয় ধর্মের' অসারতা বিশেষরূপে প্রদর্শন কবিব।

দ্বিতীয়—ব্রাহ্মধর্ম। এই ধর্ম দিন দিন ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে স্বীয় ক্ষমতা বিস্তাব করিতে আরম্ভ কবিযাছে। ...স্বীয় ধর্মে অনভিজ্ঞ কোচ-বিহারবাসী কয়েকটি অজ্ঞ যুবা ইসলাম ধর্মেব আশ্রয় ছায়া পবিত্যাগ পূর্বক ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন কবিয়াছে। অতএব ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্য ও ব্রাহ্মধর্মের অযৌক্তিকতা মধ্যে মধ্যে 'ইসলাম প্রচারকে' দেখান হইবে।

তৃতীয়—বঙ্গভাষাভিজ্ঞ মুসলমান বালক ও যুবক এবং আপামর সর্ব সাধাবণের মুসলমানী ধর্মে-কর্মে অনভিজ্ঞতা, ইহাও কম মাবাত্মক নহে। বাঙ্গালা ভাষায় আবশ্যকীয় মসলা-মাসায়েল শিক্ষাব সুবিধা অতি অল্পই আছে, এজন্য আমবা 'ইসলাম প্রচারকে' নিয়মিতভাবে মসলা-মসায়েল বাহির করিব।

চতুর্থ—মুসলমানদিগের সামাজিক নিযমাদিও যে ধর্মের প্রধাণ অঙ্গ, তাহা কাহার ও অবিদিত নাই। আমাদের সমাজ বন্ধন শিথিল হওযাতে ধর্মের বন্ধনীও শিথিল হইয়া পড়িতেছে, সুতরাং সামাজিক রীতি পদ্ধতিরও সংখ্যাধিক পরিমাণে আলোচনা কবা অসাময়িক হইবে না। ...সামাজিকতা রক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন কখনও যুক্তিগত নহে।

পঞ্চম—জাতীয় ইতিহাস। মুসলমান জাতিই প্রকৃত ইতিহাসের সৃষ্টিকর্তা। ইতিহাস জাতীয় জীবন রক্ষায় প্রধান অবলম্বন। আমরা বঙ্গীয় মুসলমান—ইতিহাসের মর্যাদা ভুলিয়াই এরূপ দুর্দশায় পতিত হইয়াছি। বাঙ্গালা ভাষায় মুসলমানের জাতীয় ইতিহাস কিছুই নাই। মুসলমানদিগের অতীতকালের গৌরবান্বিত ইতিহাস বর্তমান সময়ের নির্জীব মুসলমানদিগের স্মরণপথে উপস্থিত করিলে তাহাদেব ধর্মভাবও সজীব হইয়া উঠিত; সুতরাং আমরা মুসলমানদিগের গৌরবান্বিত ইতিহাস ধারাবাহিকরূপে লিখিতে থাকিব।

ষষ্ঠ—ফকির মতাবলম্বী এক শ্রেণীর লোক আমাদের সমাজের সর্বনাশ সাধন করিতে অগ্রসর হইয়াছে। এই সম্প্রদায় ইসলাম ধর্মের ভীষণতম শত্রু। হিন্দু, ব্রাহ্ম, খ্রীষ্টিয়ান বা নাস্তিকদিগের দ্বারা যে ক্ষতি সাধন না হইতেছে, মুসলমান নামধারী এই সকল ভণ্ড পাষণ্ডের দ্বারা তাহার শতগুণ ক্ষতির অনুষ্ঠান হইতেছে। ...চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, যশোর ও খুলনা জেলায় এই শ্রেণীর নর-প্রেতের সংখ্যানুকল্পে ৪/৫ লক্ষ হইবে। ...কতকগুলিক ঐন্দ্রজালিক কার্য ও ভেল্কীভাজী দেখিয়া বর্ণজ্ঞানশূন্য সরল বিশ্বাসী কৃষকশ্রেণীর মুসলমানগণ সহজেই ইহাদের পদানুকরণ করে। এই জঞ্জালগুলি সংস্কার করিতে না পারিলে ইহারা শীঘ্রই বঙ্গদেশ উৎসন্ন দিবে। ...অতএব ইহাদের দলবলের বিবরণও আমরা মধ্যে মধ্যে প্রকাশ করিব।

সপ্তম—কোরান শরীফের বঙ্গানুবাদ, এইটি সর্বাপেক্ষা গুরুতর কার্য। ...যে মহাগ্রন্থ খোদাতালার পবিত্র বাক্যে পরিপূর্ণ, যাহা মুসলমানদিগের পার্থিব জীবনের আইন-কানুনও পারলৌকিক জীবনের নিত্য সহচর, সেই মহাগ্রন্থের বাক্যাবলী ও উন্নত উপদেশাবলী মুসলমান মাত্রেই মানা একান্ত আবশ্যক। কোরানের অনুপম মাহাত্ম্য ও অতুলনীয় সৌন্দর্য অবগত না থাকাতেই আমাদেব অনেকে লক্ষ্য ভ্রষ্ট হইয়া বিপরীত পথে বিচরণ করিতেছে। ....ইসলাম প্রচারকে মহাকোরানেব সরল বঙ্গানুবাদ ও সরল ব্যাখ্যা মাসে মাসে নিয়মিত রূপে বাহির হইবে।

অষ্টম—মুসলমান সাধু অর্থাৎ ফকির দববেশদিগের তত্ত্বকথা ও উপদেশাবলীও মধ্যে মধ্যে ইসলাম প্রচাবকে স্থান পাইবে। প্রধান প্রধান ত'পসদিগের জীবন চরিতও সময় সময় প্রকাশ করা যাইবে। ...

নবম—ধর্ম বিষয় সভা সমিতিব বিববণ গত দুই বৎসরের মধ্যে বঙ্গদেশে অনেকগুলি ধর্ম বিষযক সভা সমিতির সৃষ্টি হইয়াছে। ইহা যে আমাদের ভাবী মঙ্গলের নিদর্শন, তাহাতে অনুমাত্রও সন্দেহ নাই। সুতরাং আমরা এই সকল সভা সমিতির কার্যকলাপ সম্বন্ধে মধ্যে মধ্যে আলোচনা করিব।

আমবা অতীত ব্যাযভাব মস্তকে লইয়া কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলাম। ...মুসলমান ভ্রাতৃদিগকে যথোচিতভাবে অভিবাদন করিয়া আমরা এই কঠোর সাধনায প্রবৃত্ত হইলাম।[১]

(খ)

'মিহিরে'র প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ—'আভাস'

আজকাল কোন কার্য আরম্ভ করিবার পূর্বেই লোকেরা সভা সমিতি করিয়া বড় বড় বক্তৃতা করিয়া তাহার উদ্দেশ্য সাধারণ্যে প্রকাশ করেন, পরে কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আর যাহাদের সেই উপায় নাই তাঁহারাও বড় বড় হ্যাণ্ডবিল, নোটিশ, বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া দেশময় বিস্তার করেন, তদ্দ্বারা তাঁহাদের উদ্দেশ্য সাধারণ্যে সুপ্রকাশিত হইয়া থাকে,কিন্তু আমরা এই উভয়বিধি উপায়েরই কোন সারবত্তা দেখিতে পাই না। এবং অনেক সময় ইহা বক্তৃতা বা কাগজ-কলমেই বদ্ধ থাকে, কার্য স্বতন্ত্র পথে যায়। সুতরাং কার্য ও কল্পিত উদ্দেশ্যের মধ্যে ভিন্নতা আসিয়া পড়ে। মিহিরের উদ্দেশ্য সমাজের নিকট মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করিতে প্রবৃত্তি না থাকিলেও আমরা ইহার মূল ও স্থূল কয়টির কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রকাশ করা সঙ্গত বিবেচনা করি।

মাসিক পত্রিকার প্রধান উদ্দেশ্য সচরাচর সাহিত্যচর্চা। কিন্তু বঙ্গদর্শন, আর্য্যদর্শন, বান্ধব, ভারতী প্রভৃতির পরেও যে এ দেশে আবার সাহিত্যচর্চার আবশ্যক আছে, এমন কথা যিনি মনে করেন তাঁহার বুদ্ধির বিশুদ্ধতা সম্বন্ধে লোকের মনে স্বতঃই নানা প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হয়। বাঙ্গালাকে একটা ভাষা বলিতে যাও, তাহাতেই অনেকের আপত্তি আছে। বিশেষ ও পাড়ার কয়েকজন নবাব বাহাদুর, খাঁ বাহাদুর, ডাক্তার, কবিরাজ ও অনেক বড় বড় x,y,zএরা পর্যন্ত ইহাকে এখনও ভাষা বলিয়া স্বীকার করে

১ *ইসলাম-প্রচারক*, ভাদ্র ১২৯৮

নাই। সুতরাং তাহার আবার সাহিত্য এবং তাহার আবার চর্চা, এ সম্পূর্ণ বাতুলতা।...তবে যদি আলালী ভাষায়, বঙ্কিমভাবে ছোটখাট শব্দে এক কথা দশবার বলিয়া নাটক,উপন্যাস, নবন্যাস, রসোন্যাস বা আরও কোন ন্যাস প্রস্তুত করা যায়, তবে তাহা একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য হইলেও হইতে পারে। নতুবা বিশুদ্ধ ইংরেজী পড়িলেও যে ভাষায় পারদর্শী হওয়া যায় না, বাচস্পত্য বিদ্যাসাগরীয়, বিদ্যাভূষণীয় অশ্রুতপূর্ব কটমট শব্দগুলি যে ভাষায় আধিপত্য করে, সেই অভিশপ্ত ভাষায় সাহিত্যচর্চা করিতে যাওয়া কেবল ভস্মে ঘৃত নিক্ষেপ করা মাত্র। তবে ভারত গৌরব, আর্যকীর্তি ও যবনদশন যত লেখা যাইতে পারে, দেশের ততই মঙ্গল, বরং ইহাতে দিন দিন ভাষার কান্তিপুষ্ট স্ফূর্তিমান দৃষ্ট হইতেছে। আমরা এইরূপ উন্নত সাহিত্য লিখিতে এখনও অভ্যস্ত হই নাই। ...তবে আমাদের লেখাকে যদি পাঠক বর্গ অনুগ্রহপূর্বক সরল সাহিত্য বলিয়া বিবেচনা করেন, তবে আর আমাদের সাহিত্যচর্চার স্পদ্ধা নিতান্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয় না

সাহিত্যের পর ইহাতে আমাদের মাসে মাসে বিজ্ঞানের চর্চা করার অভিলাষ ছিল। অভিলাষে কি হয়? এদেশীয় বিলাতি ভাষার বড় বড় পণ্ডিতেরা সকলেই এক বাক্যে বলিতেছেন যে, এ ভাষা বিজ্ঞানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। বাস্তবিকই এই বাংলা ভাষাটা যেমনি বিতিকিচ্ছি, তেমনই দুষ্ট, এ বরাবর হইতেই অবগত আছে যে, আমাদের মৌলিক নির্মাণক্ষমতা একেবারেই নাই, তাহা সত্ত্বেও সাহিত্য, অলঙ্কার, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ প্রভৃতি বিষয়ে আবশ্যক শব্দে সুসমৃদ্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিতে এ কিছুতেই স্বীকৃত হয় নাই। তবে যাঁহারা নিতান্ত ঠেকিয়া পড়েন, তাঁহারা বাঙ্গালা ক্রিয়াপদের সহিত ইংরেজী শব্দের কর্তা, কর্ম দিয়া এক প্রকার কাজ চালাইয়া লইতেছেন, কিন্তু আমাদের সে ক্ষমতাও নাই। তবু আমরা দেশী ভাষায় যতদূর পর্যন্ত পারি তাপ, তাড়িত, উষ্ণতা, আলোক, গতি, বল, রসায়ন, আকর্ষণ প্রভৃতি এবং তৎসহ অন্যান্য বিজ্ঞান সম্মত বিষয় সর্বদা প্রকাশে যত্নবান থাকিব। তবে আমাদের গবেষণাপরায়ণ পাঠকবর্গ ব্রাহ্মণের অন্ন যবনে স্পর্শ করিল, তাহাতে কি রাসায়নিক পরিবর্তন হয়, বিবাহের বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব ,যুবক-যুবতীর শরীরের বৈজ্ঞানিক গঠন, নবমী তিথিতে অলাবুর গোমাংস প্রাপ্তি, সূতিকা গৃহস্থ কন্যার পরিণয় সংস্কারে , কি অক্ষয় স্বর্গফল লাভ হয়, ব্যক্তিবিশেষের প্রাণদানে কিরূপে জগতে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়, সে সকল অতি গভীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আমাদের নিকট প্রত্যাশা করিবেন না।

পুরাবৃত্ত প্রকাশ সম্বন্ধে আমরা সবিশেষ মনোযোগ করিব, কারণ, ইহাতে তেমন প্রতিবন্ধক নাই, বরং প্রত্যেক শ্রেণীর সম্বন্ধেই ইহার উপযোগিতা আছে।

রাজনীতি বিষয়ে আমরা সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিব। কারণ এ সম্বন্ধে আমাদের অপূর্ণতা লক্ষিত হইয়া থাকে। বিশেষ যে দেশে বসিয়া আমরা রাজনীতির আলাচনা করিব, সে দেশের নীতিজ্ঞান অনেকদিন অজীর্ণতা ও দুর্বলতা ভোগ করিয়া অবশেষে মারা গিয়েছেন। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি বড় বড় প্রবীণ চিকিৎসকগণ সে মহানিদ্রাকে মূর্ছা মনে করিয়া নানা প্রকার চিকিৎসায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৃতদেহ তেজ ঔষধ পতিত হইয়া কেবল পচন ও গলন কার্য্যে সত্বরতা বৃদ্ধি করিয়াছে। শটিত নীতি এমন সহৃদয়গণের নিকটে দুর্নীতি বলিয়া পরিচিত। সুতরাং আমরা বরং নীতিবিহীন হইয়া আবার রাজার

নীতির সমালোচনা করিতে যাইব, ইহা নিতান্ত ধৃষ্টতার পরিচয় মাত্র। তবে দেশে কখন কোন আবশ্যক বা গুরুতর পরিবর্তন সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উপস্থিত হইলে আমরা শাসন সমিতি অভিপ্রায় বিশদরূপে প্রচার করিতে চেষ্টা করিব। কিন্তু তাহাতে আমাদের অভিমত খ্যাপন (ক্ষেপণ) করিতে সর্বদাই বিরত থাকিব।

সামাজিক কল্যাণসাধন অনেকের মতানুসারে মাসিক পত্রের অতি প্রয়োজনীয় বিষয়। কিন্তু সমাজ বলিয়া কোন স্বতন্ত্র বস্তুর অস্তিত্ব অনেক সময়ে ধ্যানেও পাওয়া যায় না। লৌকিক আচার ব্যবহার ও সমাজের উপর প্রকৃতপক্ষে ধর্মশাস্ত্র যতদূর প্রভুত্ব করেন, এতদ্দেশীয় লোকেরা উভয়ের মধ্যে তদপেক্ষা সমধিক ঘনিষ্ঠতা ও অনন্য সাক্ষেপতা স্থাপন করিয়াছেন। ...ধর্ম-জগত ও জনসমাজ এ উভয়ের অবস্থাই আজকাল শোচনীয় বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। সমাজ উচ্ছৃঙ্খল, ধর্ম ক্ষতিগ্রস্ত, লৌকিকতা পাপগ্রস্ত, শাস্ত্র অবনমিত, আচার ব্যবহার আবিল ও ধর্ম কেবল কতিপয় সংসার বিরাগী লোকের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু লৌকিকতার এই স্বাতন্ত্র্য ও ধর্ম পরাবৃত্তি উভয় জনসাধারণের ক্ষতিকর ও অবনতি বিধানকারী। এই বিশ্বব্যাপী দুর্দ্দিনে মনীষীমণ্ডলী আর এক প্রস্তাব উপস্থিত কবিয়াছেন। ...তাঁহারা বলেন, মূল ধর্মশাস্ত্রানুসারে কেবল আধ্যাত্মিক কার্য্য করা উচিত এবং মানবের ইচ্ছা, রুচি ও ক্ষমতা অনুসারে তাহাদের আচার ব্যবহারের গতি নির্ণীত হওয়া শ্রেয়স্কর। ...বর্তমান শতাব্দী ধরিয়া ইউরোপে পরীক্ষা চলিতেছে। ধর্মশাস্ত্র স্বভাবতঃ লৌকিকতার উপর আধিপত্য করিতে যতদূর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন, আমরা তাহতে সম্পূর্ণ সম্মত আছি। কিন্তু তদপুরি টীকাটিপ্পনী করিয়া অখণ্ড আচার ব্যবহারকে ধর্মের অধীনে স্থাপন করিতে আমরা অভিলাষী। এইরূপ ধর্মশাসনের বাহিরে লৌকিকতার যে অংশ অবস্থিত, আমরা অবসর পাইলেই তৎসম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিব। ইহাই আমাদেব সমাজতত্ত্ব বা Social question.

এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত বিষয়ের পরে আমরা মিহিরকে সম্পূর্ণরূপে সাময়িক করিতে অভিলাষ করিয়াছি। দেশের প্রাকৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক যখন যে পরিবর্তন সংঘটিত হইবে, আমরা নিরপেক্ষভাবে তাহা প্রচার করিব। এবং যে সকল ঘটনার দ্বারা উত্তরকালে দেশের সাধারণ অবস্থায় এক প্রকার স্থূলজ্ঞান হইতে পারে বা ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাহায্য করিতে সক্ষম হয়, এমন ঘটনা অনুসন্ধান ও প্রচারে আমরা সর্বদা ব্যাপৃত থাকিব।

আমরা মিহিরের সম্বন্ধে এই প্রতিজ্ঞা ও লক্ষ্যের উপর স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সর্বদা ইহার গতি ও উন্নতির প্রতি যত্নবান থাকিব। ...উদারহৃদয় পাঠকবর্গ আমাদের এই প্রতিজ্ঞার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমাদিগকে বিশ্বাসের দৃষ্টিতে সার্থক করেন, এই বিনীত প্রার্থনা।[২]

(গ)

সুধাকরের অনুষ্ঠানপত্র

সংবাদপত্র জাতীয় উন্নতির প্রাণ-স্বরূপ। ইহা সভ্যতা বিস্তারের উৎকৃষ্ট পন্থা, সুতরাং সংবাদপত্র বিশেষ আবশ্যকীয় জিনিস। বাংলাদেশের ভাষা বাঙ্গালা, আমরা বঙ্গীয় মোসলমান, অতএব আমাদের একখানা উপযুক্ত বাঙ্গালা সংবাদপত্র নিতান্ত প্রয়োজন।

---

২ *মিহির*, পৌষ ১২৯৮

বঙ্গদেশে হিন্দু অপেক্ষা মোসলমানের সংখ্যা বড় কম নহে, হিন্দুদিগের ভাষায় মাসিক, পাক্ষিক, সপ্তাহিক ও দৈনিক পত্রপত্রিকা সংবাদপত্র আছে। বঙ্গদেশে মুষ্টিমেয় পরিমাণ ব্রাহ্ম সম্প্রদায়ের মধ্যেও পত্রপত্রিকা সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র চলিতেছে, বঙ্গ ভাষাভিজ্ঞ সামান্য সংখ্যক খ্রীষ্টানদিগের মধ্যেও বাঙ্গালা সংবাদপত্র আছে, দুঃখের বিষয়, মোসলমানদিগের একখানিও নাই।

সংবাদপত্র ভিন্ন স্বজাতির সুখদুঃখ কাহিনী গবর্ণমেন্টকে, স্বজাতীয় ভ্রাতাদিগকে এবং অপর সাধারণকে জানাইবার আর কোনও উপায় নাই বলিয়া তাহার প্রতিকার হওয়াও অসম্ভব।

মোসলমানদিগের বিরুদ্ধে অন্যান্য সংবাদপত্রে কত কি লেখা হইতেছে, কত পুস্তক পুস্তিকা বাহির হইতেছে, কত ব্যঙ্গ বিদ্রূপ চলিতেছে, কিন্তু প্রতিবাদ হইতেছে না, কেন? বাঙ্গালা সংবাদপত্রের অভাবে। ...

ইহাতে রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাসপ্রভৃতি সমস্তই থাকিবে। আরবী, ফারসী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষার প্রধান প্রধান সংবাদপত্র হইতে উৎকৃষ্ট ও টাটকা সংবাদসকল সংগ্রহ করিয়া ইহার কলেবর গঠিত করা হইবে। ...

পৃথিবীস্থ মোসলমান রাজ্যসমূহের অবস্থা ও প্রাত্যহিক ঘটনা এবং রাজকীয় সংবাদ হইতে প্রচুর পরিমাণে দেখিতে পাইবেন। মোসলমান জাতির বিগত শৌর্য বীর্য্য ও পরাক্রম এবং বিদ্যাবুদ্ধির প্রকৃষ্ট নিদর্শনসূচক ইতিহাস সকল জ্বলন্তভাবে দেখান যাইবে। এতদ্ভিন্ন এসলাম ধর্মের মাহাত্ম্য বিষয়ক এক একটি প্রবন্ধ প্রতিমাসে এই কাগজে বাহির হইবে।

আমাদের যখন যে অভাব হইবে, তখনই তাহা সদাশয় ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের গোচরীভূত করিয়া তৎপ্রতীকারের চেষ্টা করা যাইবে। নতুন নতুন আইন কানুন যখন যাহা বিধিবদ্ধ হয়, তাহার মর্ম সমাজকে জানান যাইবে, এবং যাহার জাতীয় স্বার্থ ব্যাঘাত হয়, তাহার প্রতিকার জন্য বিধিমত চেষ্টা করা যাইবে। ইহা রোগে—ঔষধ, শোকে—সান্ত্বনা, ক্ষুধায়—তৃপ্তি, পিপাসায়—শান্তি,চিন্তায়—প্রবোধ, নিরাশায়—ধৈর্য্য, ব্যবসায়ে—সহকারী, সাংসারিক ব্যাপারে—প্রিয় সুহৃদ এবং ভাষণে—সহচর -স্বরূপ কার্য্য করিবে। ...

আয়-ব্যয় পরিদর্শন ঃ কলিকাতাস্থ ডভটন ও সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজদ্বয়ের আরব্য ও পারস্যাধ্যাপক বঙ্গের সর্বত্র পরিচিত জনাব মৌলভী মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেব এই সংবদপত্রফণ্ডের আয়-ব্যয় পরিদর্শন নিযুক্ত হইলেন।

সম্পাদক ও লেখক ঃ বঙ্গের প্রধান মোসলমান লেখক বলিয়া যাঁহারা পরিচিত এবং যাঁহাদের লেখা পাঠ করিয়া মোসলমান সকলেই মুক্ত কণ্ঠে প্রশংসা করেন, 'এসলামতত্ত্ব' যাঁহাদের সুপক্ক লেখনি-প্রসূত অর্থাৎ জনাব মৌলভী মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ সাহেব, মুন্সী মুহম্মদ রেয়াজউদ্দীন আহমদ সাহেব ও শেখ আবদুর রহিম সাহেব দ্বারাই এই কাগজখানি সম্পাদিত হইবে।[৩]

৩ *সুধাকর,* ২৩কার্তিক ১২৯৬

গ্রন্থপঞ্জি

মৌলিক গ্রন্থ ও নথি

আজিমর্দ্দিন মহাম্মদ চৌধুবী	**জীবনচরিত**, সত্যপ্রকাশ যন্ত্র, বরিশাল, ১২৯৬
আবুল মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী	**কাসেমবধ কাব্য বা শাহাদতে ইমাম কাসেম**, মেটকাফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১২
	জয়নালোদ্ধার কাব্য, ভাবতমিহিব যন্ত্র, কলি , ১৯০৭ ভ্রাতৃবিলাপ, কলিকাতা, ১৯০৩
আবদুব বশিদ খান	**১৯০১ সনেব নোয়াখালীর মোকদ্দমা। মহাত্মা পেনেলের বিচার**, বামেন্দ্র যন্ত্র, নোযাখালী, ১৯০০
আবদুব বহমান	**অশ্রুহার**, কলিকাতা, ১৯০৪
আবদুল আলা	**কবিতাকুসুমমালা, ১ম** ভাগ, ববার্ট প্রেস, কলিকাতা, ১২৯০
আবদুল কবিম সাহিত্য বিশাবদ	**বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথি বিবরণ, ১ম খণ্ড**, সাহিত্য পবিষদ, কলিকাতা, ১৩২০
	রাধিকার মানভঙ্গ, কলিকাতা, ১৩১২
আবদুল হামিদ খান ইউসুফজযী	**উদাসী**, টাঙ্গাইল, ১৩০৭
	প্রবোধ সঙ্গীত, আহমদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল, ১২৯৮
	বাঙ্গালার মুসলমানগণের আদিবৃত্তান্ত, ভাবতমিহিব যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৬
	বিরাগ সঙ্গীত, আহমদী যন্ত্র, টাঙ্গাইল, ১২৯৭
	সারসংগ্রহ, ১ খণ্ড, ভারতমিহির প্রেস, ময়মনসিংহ, ১৮৭৮
আলাউদ্দীন আহমদ	**উপদেশ-সংগ্রহ**, বেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৮ (২য় সং)
কাজী ইমদাদুল হক	**ওমর চরিত্র**, সঞ্চয প্রেস, ফরিদপুব, ১৩১০
	আঁখিজল, ভারতমিহিব যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৬
	নবি কাহিনী, ১ম ভাগ, স্টুডেন্স লাইব্রেবী, ঢাকা, ১৩২৪ (২য় সং)
	কাজী ইমদাদুল হক রচনাবলী, আবদুল কাদির সম্পাদিত, কেন্দ্রীয বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৬৮
কাদেব আলী	**মোহিনী প্রেম-পাশ**, গুপ্ত প্রেস, কলিকাতা, ১২৭৮
কাযকোবাদ	**মহাশ্মশান**, ১৯১৭ (২য় সং)
	শিবমন্দির, ১৯২১
খোন্দকার গোলাম আহমদ	**এসলামের প্রভাব ও ধর্মনীতি**, এডওয়ার্ড প্রেস, কাটোয়া, ১৯০৫
খোন্দকাব শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী	**উচিৎ শ্রবণ অর্থাৎ পরমার্থ লাভ**, বিদ্যাবত্ন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৭৮২ শকাব্দ (১৮৬০ খ্রী:)
	ভাবলাভ, হানিফি প্রেস, কলিকাতা, ১৮৫৩
গোলাম কিবরিয়া	**উচিত কথা**, কলিকাতা, ১৮৯০
গোলাম মোহাম্মদ	**তক্তে তাউস বা দিল্লীর ময়ূরাসন, ১ম খণ্ড**, শাহান, শ্রা: এণ্ড কোম্পানী, কলিকাতা, ১৮৯৭
গোলাম হোসেন	**হাড় জ্বালানী**, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ন যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৭১
জহিরুদ্দীন আহমদ	**অস্ত্র চিকিৎসা বা সার্জ্জারী**, রবার্ট প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৩ (২য় সং)

তজমুল আলী	**তোওয়ারিখ-হেলিমী**, সামন্তক প্রেস, ঢাকা, ১২৯৯
দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ	**পুষ্পহার**, ১৯০৩
দৌলত আহমদ	**কক বরমা অং ত্রিপুরা ব্যাকরণ**, অমব যন্ত্র, কুমিল্লা, ১৩০৭, ত্রিং
	কুসুমমঞ্জরী, সিংহ যন্ত্র, কুমিল্লা, ১২৯২
	জীবন মঙ্গল, উপেন প্রেস, কুমিল্লা, ১৯০৫
	পুরুষ প্রসঙ্গ, ,, ,, ১৯০৪
	ভূ-পৃষ্ঠ পবিচয, অমব যন্ত্র, কুমিল্লা, ১৩০২
নওশেব আলী খান ইউসফজবী	**উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি**, ভাবতমিহিব যন্ত্র, কলিকাতা, ১৯০১
	বঙ্গীয মুসলমান, হিন্দু প্রেস, কলিকাতা, ১২৯৭
	শৈসব-কুসুম, আহমদী প্রেস, টাঙ্গাইল, ১৩০২
ফজলুব বহমান	**বক্ষ:পীড়া**, বিধান প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৬
ফযজুন্নেসা চৌধুবানী	**তত্ত্ব ও জাতীয সঙ্গীত**, বাঙ্গালা প্রেস, ঢাকা, ১৮৮৭
	রূপ-জালাল, গিবিশ যন্ত্র, ঢাকা, ১৮৭৬
বোবহানুদ্দীন আহমদ	**সহজ পাবসী**-শিক্ষা, বেযাজ-উল-ইসলাম, প্রেস, কলিকাতা, ১৩০৭
ব্রজেন্দ্র কুমাব ও মুন্সী	**চাহাব দরবেশ**, অধিবাজ যন্ত্র, বধমান, ১২৯১
মকবুল আলী	**মেনহাজুল আবেদীনেব বঙ্গানুবাদ**, ১৮৯৯
	বোজা, হিতৈষিণী যন্ত্র, ব্রহ্মণবাড়িযা, ১৩০৮ (২য সং)
মযেজউদ্দীন আহমদ	**শান্তিকর্তা বা হজবত মোহাম্মদদেব (দ:) জীবনী, ৩য খণ্ড**, কলিকাতা, ১৩২২
মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	**দুগ্ধ-সরোবর**, বিনোদ প্রেস, বোযালিযা, ১৯১৪ (২য সং)
	সৌভাগ্য স্পর্শমণি, ১ খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৩, ('বুক্স এণ্ড বুক্স, সংস্কবণ)
মীব আশবাফ আলী	**ধাত্রীবিদ্যা**, দাস এণ্ড সন্স, কলিকাতা, ১৮৬৯
	বাল্যচিকিৎসা, বঙ্গবিদ্যা প্রকাশিকা যন্ত্র, কলিকাতা, ১৮৭৫ (২য সং)
মীব মশাববফ হোসেন	**আমার জীবনী**, ডক্টব দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত, জেনাবেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৭৭
	গো-জীবন, টাঙ্গাইল, ১২৯৫
	বিবি খোদেজার বিবাহ, কলিকাতা, ১৩১২
	বিষাদ-সিন্ধু, আবদুল আজীজ আল-আমান সম্পাদিত হবফ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৩
	মৌলুদ শরীফ, মোহাম্মদী বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৩২৪ (৫ম সং)
	হজরত ওমরের ধর্ম জীবন লাভ, কলিকাতা,, ১৩১২
	মশাররফ রচনা সম্ভার, ১ খণ্ড, ডক্টব কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬
	ঐ, ২য় খণ্ড, ডক্টব কাজী আবদুল মান্নান সম্পাদিত (অপ্রকাশিত)।
মুন্সী নামদাব	**নারীর ষোলকলা**, কলিকাতা, ১৭৮৫ শকাব্দ (১৮৬৩ খ্রী:)
মুন্সী মহম্মদ, গোলাম বব্বানী এবং দুর্গানন্দ কবিবত্ন	**হাতেমের উপাখ্যান**, সত্যপ্রকাশ যন্ত্র, বর্ধমান, ১৮৭৩ (২য সং)
মেয়বাজউদ্দীন আহমদ ও আঁবদুব বহিম	**ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার**, মিলন প্রেস ডিপজিটবি, কলিকাতা, ১২৯৭
মোজাম্মেল হক	**অপূর্ব দর্শন**, **মহম্মদীয় লাইব্রেরী**, শান্তিপুব, ১২৯২
	আল্লার শত নাম ও নামের মাহাত্ম্য, শান্তিপুব, ১৩১৭

	কুসুমাঞ্জলি, কব প্রেস, কলিকাতা, ১২৮৮
	জাতীয় ফোয়ারা, নাথ এণ্ড কোং, কলিকাতা, ১৩১৯
	জাতীয় সঙ্গীত, কলিকাতা, ১৩০৪
	পদ্য-শিক্ষা, ১ম ভাগ, নিউ মুন প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৯
	প্রেম-হাব, কালিকা প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮
	ফেবদৌস চবিত, বেযাজ উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮
	মহর্ষি মনসুব, মিলন প্রেস, কলিকাতা, ১৩০৩
	হজবত মহম্মদ, হেবল্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কস, কলিকাতা, ১৩১৭ (২য সং)
মোসলেম উদ্দীন খান	**হিতকাব্য**, টাঙ্গাইল, ১৩০১
মোহাম্মদ আবেদিন	**ধর্মপ্রচাবণী**, বাঙ্গালা সাপ্তাহিক বিপোর্ট যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৮১
মোহাম্মদ আবদুল আজিজ	**সংক্ষিপ্ত মহম্মদ-চবিত**, মথুবানাথ যন্ত্র, কুমাবখালী, ১৯০১
মোহাম্মদ আবদুল কবিম	**এরশাদে খালেকীয়া বা খোদাপ্রাপ্তি তত্ত্ব**, বেযাজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৬ (২য সং)
মোহাম্মদ আব্বাস আলী	**মহবম উৎসব**, পোস্ট-ডেসপ্যাচ প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৪
মোহাম্মদ আর্জুমন্দ আলী	**প্রেম দর্পণ**, মোহাম্মদ আবদুল কাইউম সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৫
মোহাম্মদ ইবরাহীম খা	**জ্ঞান-বৃক্ষ**, ২য ভাগ, মিলন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৮৯৪
মোহাম্মদ ইযাকুব	**উদ্যান**, গোবিন্দ যন্ত্র, নোযাখালী, ১৩০২
মোহাম্মদ কাজেম আলী	**মানব সুহৃদ বা চতুর্দ্দশ নীতিবত্ন**, বেযাজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৮৯৮
মোহাম্মদ নঈমদ্দীন	**এনসাফ অর্থাৎ লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন** মাহমুদীযা যন্ত্র, কবটীযা, ১৮৮৯ এসবাতে আখেকজ্জোহব, টাঙ্গাইল, ১৮৯৭
	কোবান শরিফ, শেষ খণ্ড, মাহমুদীযা যন্ত্র, কবটীযা, ১৩০০
	জোব্দাতল মসায়েল, মাহমুদীযা যন্ত্র, কবটীযা, ১৯০১
	গো-কাণ্ড, কবটীযা, ১৮৮৯
	ফতওয়ায মাহমুদীয়া অর্থাৎ ফতওয়ায় আলমগিবী, ১-৪ খণ্ড, মাহমুদীযা যন্ত্র, কবটীযা, ১৮৮৪-১৮৯২
মোহাম্মদ ফসিহ	**সমসামল মওয়াহেদিন**, কলিকাতা, ১৮৮৭
	সযফুল মোমেনিন, কলিকাতা, ১২৮২
মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী	**তুরস্কের সুলতান**, বেযাজ-উল-ইসলাম, প্রেস, কলিকাতা, ১৯০১
মোহাম্মদ মেহেরুল্লা	**খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা**, বেয়াজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৬ (৩য় সং)
	বিধবা গঞ্জনা ও বিষাদভাণ্ডার, যশোহর, ১৩৭৫ (৭ম সং)
	মেহেরুল এসলাম, ১৩৩২ (৭ম সং)
	হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা, কলিকাতা, ১৮৯৮ (২য় সং)
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ	**এসলামতত্ত্ব, ১ম খণ্ড**, অমরযন্ত্র, কলিকাতা, ১২৯৫
	গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ, ১ম খণ্ড, কলিকাতা, ১৩১৭ হিজরী (১৮৯৯)
	হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা, সোলেমানী প্রেস, কলিকাতা,, ১৩৫৫ (৪র্থসং)
মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন মণ্ডল	**হায় রে সেদিন কোথায় গেল**, দাস যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৭
রহিম বক্স পেস্কার	**ওয়াকফনামা**, রেয়াজুল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৯০৪

বেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী	**প্রবন্ধ-কৌমুদী**, কলিকাতা, ১৮৯১
	সমাজ ও সংস্কারক, কলিকাতা, ১২৯৬
	সুরিয়া-বিজয়, মিলন যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০২
	মাশহাদী রচনাবলী, ১ম খণ্ড, আবদুল কাদিব সম্পাদিত, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নযন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭০
বোকেযা সাখাওযাত হোসেন	**মতীচুর, ১ম খণ্ড**, কলিকাতা, ১৯০০
	বোকেয়া বচনাবলী, আবদুল কাদিব সম্পাদিত বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৩
শেখ আবদুল বহিম	**প্রণয় যাত্রী**, কলিকাতা, ১৩২৭ (২য সং)
	শেখ আবদুর রহিম গ্রন্থাবলী, ২য খণ্ড, বাংলা একাডেমী ঢাকা ১৯৬৭
	হজরত মহম্মদের জীবনচবিত ও ধর্মনীতি, কলিকাতা ১৯২৬ (৬ষ্ঠ সং)
শেখ আবদুল লতিফ	**মানব সংস্কারক**, মেদিনীপুব, ১৮৭৮
শেখ ওসমান আলী	**অলোকসভা**, কালিকা প্রেস, কলিকাতা ১৯০৪
	দেবলা, বেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস, কলিকাতা ১৯০১
শেখ ফজলুল কবিম	**আসবাত-উস-ছামী বা ছামাতত্ত্ব**, বেযাজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩২০
	তৃষ্ণা, কাকিনা (বংপুব) ১৩০৭
	পরিত্রাণ, কলিকাতা, ১৩১০
	ভগ্নবীণা, কলিকাতা, ১৯০৪
	মানসিংহ, বিকাশ মেসিন প্রিন্টিং ওযাকস, ববিশাল, ১৯০৩
	লায়লী-মজনু, নূব লাইব্রেবী, কলিকাতা, ১৩২১ (২য সং)
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন	**আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বৃত্তান্ত**, অন্নপূর্ণা প্রেস, যশোহব, ১৩০৪
	ইসলামের সভ্যতা সম্বন্ধে পবধর্মাবলম্বীদিগের মন্তব্য, ১৩০৭
	হজবত ইসা কে, ১৩০৬
	শেখ জমিরুদ্দীন বচনাবলী, ডক্টব মুস্তাফা নূবউল ইসলাম সম্পাদিত, অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা
শেখ বেযাজুদ্দীন আহমদ	**আরব জাতিব ইতিহাস, ২য খণ্ড**, ব্রাহ্মনিশান প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯
সমিনউদ্দিন আহমদ	**পঞ্চাইত বিধি**, কৃপানন্দ যন্ত্র, কলিকাতা, ১৩০৭
সমিবউদ্দীন আহমদ	**মোহাম্মদীয় ধর্ম-সোপান**, নাবায়ণ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১১
সলিমউদ্দীন মুহম্মদ	**প্রেমাবলী**, সামন্তক প্রেস, ঢাকা, ১৮৮৬
শেখ আজিমদ্দী	**কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে**, অজ্ঞানদীপক যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৭৫ (২ মুদ্রণ)
শেখ আবদোস সোবহান	**হিন্দু মোসলমান**, ভিক্টবিয়া প্রেস, কলিকাতা, ১৮৮৮
সৈয়দ আবু মোহাম্মদ ইসমাইল হোসেন সিবাজী	**অনল-প্রবাহ**, ১৯০১
	স্বজাতি প্রেম, কলিকাতা, ১৯৪৬

	শিরাজী রচনাবলী, উপন্যাস খণ্ড, আবদুল কাদির সম্পাদিত, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন--বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭৬
সৈয়দ আবুল হোসেন	**যমজভগিনী কাব্য বা সিরাজদ্দৌলা**, কলিকাতা, ১৯০৫
সৈয়দ আবদুল আগফব	**তরফের ইতিহাস**, জাহ্নবী যন্ত্র, কলিকাতা, ১২৯৪
সৈয়দ এমদাদ আলী	**ডালি**, সৈয়দ আলী আহসান সম্পাদিত, ঢাকা, ১৯৬৮
সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন	**প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি**, কলিকাতা, ১৯০৩
সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী	**ঈদুল আজহা**, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৯ হিজরী (১৯০০ খ্রী:)
	মৌলুদ শরিফ, লতিফ প্রেস, কলিকাতা, ১৩২২ হিজরী (১৯০৩ খ্রী:)
হবীবুল্লাহ বাহার চৌধুরী	**হবীবুল্লাহ বাহার রচনাবলী**, কবীর চৌধুরী ও সেলিনা বাহার চৌধুরী সম্পাদিত, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮
Abdool Lateef	**A Short Account of My Public Life**, Calcutta, 1885
	Nawab Bahadur Abdul Latif : His Writtings and Realated Documents, edited by Enamul Haque, Samudra Prakashani, Dacca, 1968
Rev Moulvi Zainuddin	**Glory of Islam,** Garadoh, Nadia, 1929
Syed Ameer Alli	**The Spirit of Islam** (a history of the evolution and ideals of Islam with a life of the Prophet), London, 1955 (8th edition)
	Memories and other Writtings of Syed Ameer Ali, edited by Syed Razi Wasti, Peoples Publishing House, Lahore, 1968

A brief history of the Mahomedan Literary Society of Calcutta, 10th Turner Street, Calcutta, 1922

A quarter century of the Mahomedan Literary Society of Calcutta (A resume of its work from 1863 to 1889)

Abstract of Proceedings of the Mahomedan Literary Society of Calcutta at a meeting held . . on Wednesday, the 23rd November, 1870 (Lecture by Moulvi Karamat Ali), Calcutta, 1871.

Abstract of the Proceedings of an Extraordinary Meeting of the Committee of the Mahomedan Literary Society of Calcutta held at No. 16 Taltollah, on 9th June, 1900, at 7-30 p.m Calcutta, 1900.

Khan Bahadur Abdul Majid Chowdhury to Government of Bengal, 30 November, 1902, Bengal Education Proceedings, September, 1903.

Memorial of the National Muhammadan Association. Calcutta, 1882.

Proceeding of an Extraordinary General Meeting of the National Mahomedan Association held on Sunday the 16th February, 1879.

Report of the Committee of the Central National Muhammadan Association for the Past five years (Adopted unanimously at a General

meeting of the Association held on the 15th April, 1883)

Report of the Committee of the Central National Muhammadan Association for the year 1878-84, Calcutta, 1885

Rules and Objects of the Central National Mahommedan Association and its Branch Association with the quinquenial and Annual Reports and List on Members Thomas S. Smith, City press Calcutta 1885

Selections from Bengal Government Records on Wahhabi Trials (1863 1870) by Muinuddan Ahmed Khan

Selections from the Records of the Bengal Government Vol XIV 1854 (Papers Relating to the Presidancy College)

Selections from the Records of the Government of India Home Department No CCV serial No @ (Correspondence of the subject of the Education of the Muhammedan Community in British India and the employment in the Public Service Generally) Calcutta 1886

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনীর প্রথম বার্ষিক কার্যবিবরণী, গিরিশ যন্ত্র, ঢাকা, ১৮৮৩

ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, ১৮৮৬-৮৭ সনের অনুষ্ঠানপত্র, ঢাকা, ১৮৮৭

সহায়ক গ্রন্থ ও নথি

অমলেন্দু দে — **বাঙালী বুদ্ধিজীবী ও বিচ্ছিন্নতাবাদ**, রত্না প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৭৪

আনিসুজ্জামান — **মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯
মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৪

আবু মহামেদ হাবিবুল্লাহ — **সমাজ, সংস্কৃতি ও ইতিহাস**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪

আবদুল মওদুদ — মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ : সংস্কৃতির রূপান্তর, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, ১৯৬৯

আহমদ শরীফ — **জীবনে-সমাজে-সাহিত্যে**, খান ব্রাদার্স এণ্ড কোং, ঢাকা, ১৯৭৪ (২য় সং)

ইবরাহীম খাঁ — **বাতায়ন**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭

উইলিয়াম হান্টার — **দি ইণ্ডিয়ান মুসলমানস** (আবদুল মওদুদ অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪

উপাধ্যায়, গৌর গোবিন্দ রায় — **আচার্য কেশব চন্দ্র, শতবার্ষিকী সংস্করণ, ১ম খণ্ড**, কলিকাতা, ১৯০৮

কাজী আবদুল মান্নান — **আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে মুসলিম-সাধনা**, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ঢাকা, ১৯৬৯ (২য় সং)

কাজী মোহাম্মদ মিছের — **রাজশাহীর ইতিহাস**, কাজী প্রকাশনী, বগুড়া, ১৯৬৫

কামরুদ্দীন আহমদ — **পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি**, স্টুডেন্টস পাবলিকেশন, ঢাকা, ১৩৭৬
বাংলার মধ্যবিত্তের আত্মবিকাশ, ঢাকা, ১৩৮২

খোন্দকার রফিউদ্দীন — **ভাব সঙ্গীত**

গোপাল হালদার — **বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, ২য় খণ্ড**, এ. মুখ্যার্জি এণ্ড কোং প্রাইভেট লি:, কলিকাতা, ১৩৭২ (২য় সং) ; **সংস্কৃতির রূপান্তর**, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলিকাতা, ১৯৬৫

ত্রিপুরা শঙ্কর সেন — **সাহিত্যের নবজন্ম ও যুগচেতনা**, শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা, ১৩৫৬

নবেন্দ্র কুমার গুপ্ত চৌধুরী — **শ্রীহট্ট-প্রতিভা**, ১৯৬১

পার্থ চট্টোপাধ্যায় — **বাংলা সংবাদপত্র ও বাঙালীর নবজাগরণ** (১৮১৮-১৮৭৮), সাক্ষরতা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৭৭

বদরুদ্দীন উমর — **পূর্ব বাংলার সংস্কৃতির সংকট**, **নবজাতক প্রকাশন**, কলিকাতা, ১৯৭৯

বিনয় ঘোষ — **বাংলার বিদ্বৎ সমাজ**, প্রকাশ ভবন, কলিকাতা, ১৯৭৩

বাংলার সামাজিক ইতিহাসের ধারা (১৮০০-১৯০০), ৫ম খণ্ড, পাঠভবন, কলিকাতা, ১৯৬৮

বাঙ্গালীর নবজাগৃতি, ১ম খণ্ড, ইন্টার ন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৩৫৫

সাময়িকপত্রে বাংলার সমাজচিত্র, ৪র্থ খণ্ড, পাঠভবন, কলিকাতা, ১৯৬৬

বিপিনচন্দ্র পাল — **সত্তর বছর**, কলিকাতা, ১৯৬২

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় — বাংলা সাময়িকপত্র, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৯ (২য় সং), ১৩৭৯ (৪র্থ সং) সাহিত্য সাধক চরিতমালা ২৯, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৫৫

মনিরুদ্দীন ইউসুফ — **উর্দু সাহিত্যের ইতিহাস**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৮

মুনীর চৌধুরী — **মীর মানস**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৫

মুস্তাফা নুরউল ইসলাম — **সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত (১৯০১-১৯৩০)**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৭

মুহম্মদ আবদুল হাই ও সৈয়দ আলী আহসান — **বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত**, বইঘর, চটগ্রাম, ১৩৮৯ (৪র্থ সং)

মুহম্মদ এনামুল হক — **বঙ্গে সূফী-প্রভাব**, কলিকাতা, ১৯৩৫

মুসলিম বাংলা সাহিত্য, পাকিস্তান পাবলিকেশনস, ঢাকা, ১৯৬৫ (২য় সং)

মুহম্মদ এনামুল হক, ও কবীর চৌধুরী সম্পাদিত — **আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ স্মারকগ্রন্থ**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন — **বাংলা সাহিত্যে মুসলিম সাধনা, ২য় খণ্ড**, হাসি প্রকাশনালয়, ঢাকা, ১৩৭১

মোতাহার হোসেন, সুফী — **সাহিত্যসেবী তসলিমুদ্দীন আহমদ**, কেন্দ্রীয় বাংলা উন্নয়ন-বোর্ড, ঢাকা, ১৯৭২

মোশফেকা মাহমুদ — **পত্রে রোকেয়া-পরিচিতি**, ঢাকা, ১৯৬৫

মোহাম্মদ আজিজুল হক — **বাংলাদেশে মুসলিম শিক্ষার ইতিহাস এবং সমস্যা** (ডক্টর মুস্তাফা নুরউল ইসলাম অনূদিত), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৯

মোহাম্মদ আবদুল আউয়াল — **মীর মশাররফের গদ্যরচনা**, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৫

মোহাম্মদ ইদরিস আলী — **মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ**, ঢাকা, ১৩৬৫

মোহাম্মদ সেরাজুল হক — **সিরাজী চরিত**, **হিন্দুস্থান প্রিন্টার্স**, কলিকাতা, ১৯৩৫

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য — **বাঙ্গালার বৈষ্ণবভাবাপন্ন মুসলমান কবি**, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা, ১৯৬১ (২সং)

যোগেশচন্দ্র বাগল — **উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা**, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা, ১৯৬৩ (২য় সং)

	বেথুন সোসাইটি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা, ১৩৬৭
বমেশচন্দ্র মজুমদাব	**বাংলাদেশের ইতিহাস,** ৩য় খণ্ড, জেনাবেল প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা, ১৩৭৮
বেজাউল কবিম	**বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ,** ইণ্ডিযান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লি:, কলিকাতা, ১৩৬১ (২য সং)
শামসুন নাহাব	**বোকেয়াজীবনী,** প্রেসিডেন্সী লাইব্রেবী, ঢাকা, ১৯৫৮
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন	**মেহেব চরিত,** বেযাজুল ইসলাম প্রেস, কলিকাতা, ১৩১৫
শেখ হাবিবুব বহমান	**কর্মবীর মুন্সী মেহেরুল্লা,** মখদুমী লাইব্রেবী, কলিকাতা, ১৯৩৪
সতীশচন্দ্র মিত্র	**যশোহর-খুলনার ইতিহাস,** ২য় খণ্ড, কলিকাতা, ১৯৬৫ (২য সং)
সুধীবকুমাব মিত্র	**হুগলী জেলার ইতিহাস,** মিত্রাণী প্রকাশন, কলিকাতা, ১৯৬২
সৈযদ মর্তুজা আলী	**মুজতবা-কথা ও অন্যান্য প্রসঙ্গ,** এ বি বুক স্টোর্স, ঢাকা, ১৯৭৬
হুমায়ুন আবদুল হাই	**মুসলিম সংস্কাবক ও সাধক,** বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৬
A F Salahuddin Ahmed	**Social Ideas and Social Change in Bengal (1818-1835),** Calcutta, 1976 (2nd ed)
Abdul Karim, B A	**Muhammedan Education in Bengal,** Metacalf Press, Calcutta, 1900
Abdus Salam	**Riyaj-us-Salatin, or A History of Bengal** by Ghulam Husain Salim Asiatic Society Calcutta, 1904
Abdul Khair Nazmul	**The Modern Muslim Political Elite in Bengal** (unpulished Doctoral Thesis) University of London 1964
Anil Seal	**The Emergence of Indian Nationalism,** Cambridge, 1971
Aparna Basu	**The Growth of Education and Political Development in India (1898-1920),** Oxford University Press, Delhi, 1974
Arther Mayhew	**The Education of India,** London, 1921
Azizur Rahman Molliok	**British Policy and the Muslims in Bengal (1757-1856),** Dacca, 1961
Bipin Chandra Pal	**Memories of My Life and Times (1857-1884),** Calcutta, 1932.
B B Misra	**The Indian Middle Classes in Modern Times,** Oxford University Press, London, 1961
Bimanbehari Majumdar	**Indian Political Associations and Reform of Legislature (1818-1917),** Firma, K L Mukhopadhyaya, Calcutta, 1956
C E Buckland	**Bengal Under the Lieutenant Governors (1854-98), Vol. I,** D.K. Lahiri and Co , Calcutta, 1901.
	Dictionary of Indian Biography, London, 1906.
Colesworthy Grant	**Rural Life in Bengal,** London, 1860.

F B. Bradley-Brit	**Twelve Men of Bengal in the Nineteenth Century,** Calcutta, 1910
H J S Cotton	**India in Transiton,** London, 1885.
H Sharp (ed)	**Selection from Educational Report, part I, 1771-1839,** Calcutta, 1920
Hellingbery	**The Bengal Administration Report of 1872-73. Vol. I.**
Henry Beveridge	**The District of Bakerganj - its History and Statistics,** Calcutta, 1876
Herbet Alick Stark	**Vernacular Education in Bengal from 1813 to 1912.** The Calcutta General Publishing Co , Calcutta, 1916
Hossainur Rahman	**Hindu-Muslim Relations in Bengal, (1905-1947),** Nachiketa Publishing Limited, Bombay, 1974
J D Cunningham	**A History of the Sikhs,** 1903
Jagadish Narayan	**Islam in Bengal** (Thirteenth to Nineteenth Century), Ratna Prakashan, Calcutta, 1972
James Long, Rev	**An Introduction to the Sociology of Islam,** 1931-33
	Five hundred questions on the Social Condition of the Natives, London, 1865
James Wise	**Notes on Races, Castes and Trades of Eastern Bengal, London,** 1883.
Jogendra Chandra Bagal	**History of the Indian Association (1874-1951),** Calcutta, 1953
K K. Aziz	**Amir Ali : His Life and Works,** Karachi, 1963
K Zacharia (ed)	**History of Hooghly College,** Bengal Government Press, Calcutta, 1936.
Kamruddin Ahmed	**A Political History of Bengal,** Dacca, 1975 (4th Ed.)
Khandker Fuzli Rubbee	**The Origin of the Muslims of Bengal,** Translation of Haqiqate Musalman-i-Bangalah, Calcutta Thacker, Spink and Co., Calcutta, 1895.
L.F. Rushbrook William	**Great men of India,** the Home Library Club (Year not mentioned).
Leonard A. Gordon	**Bengal : The Nationalist Movement (1871-1940).** Manohar Book Service, Delhi, 1974.
Lokenath Ghosh	**The Modern History of the Indian Chiefs, Rajas, Zaminders etc., Part II,** Calcutta, 1879.

M Fazlur Rahman — **The Bengali Muslims and English Education (1765-1835),** Bengali Academy, Dacca, 1973

M K A Siddiqui — **Muslims of Calcutta,** Calcutta, 1974

N T Titus — **Islam in India and Pakistan,** London 1930

Mehdi Husain (ed) — **The Rehla of the Ibu battuta.** Oriental Institute Baroda 1953

Muhammad Ali Azam — **Life of Moulvi Abdul Karim,** Calcutta 1939

Muhammad Azizul Haq — **History and Politics of Moslem Education in Bengal,** Calcutta 1917

Muhammad Mohar Ali — **The Bengal Reaction to Christain Missionary Activities (1833-1857).** The Mehiub Publications Dacca 1965

Muinuddin Ahmed Khan — **History of the Faridi Movement,** 1963

Mustafa Nurul Islam — **Bengali Muslim Public Opinion as Reflected in the Bengali Press, (1901-1930),** Bangla Academy Dacca 1973

N K Sinha — **History of Bengal (1757-1905).**

Nirmal Sinha — **Freedom Movement in Bengal (1818-1905).**

Peter Hardy — **Moslems of British India,** London 1973

Ram Gopal — **Indian Muslims, A Political History (1858-1947).** Asia Publishing House Calcutta 1964 (Reprinted)

S M Jamil — **The Muslim Year Book of India and Who's Who (1948-49),** bombay, 1948

W Adam — **Third Report on the State of Education in Bengal,** 1838

Shila Sen — **Muslim Politics in Bengal (1937-1947),** New Delhi, 1976

Sukumar Sen — **Seka Subhodava,** The Asiatic Society Calcutta, 1963

Sufia Ahmed — **Muslim Community in Bengal (1884-1912),** Oxford University Press Bangladesh, Dacca, 1974

Syed Ameer Ali — **Muhammadan Education and Muhammadan Society,** (Presidential address delivered at the Mubammadan Educational Conference of 1899), Calcutta, 1900

Syed Ameer Hossain — **A Pamphlet on Mohammedan Education in Bengal.** Bose Press, Calcutta, 1880

Syed Mahmood — **History of English Education in India (1781-1893),** Aligarh, 1895

Syed Murtaza Ali — **Personal Profiles,** National Institute of Public Administraton, Dacca, 1965

Syed Sajjad Hussain (ed.) — **Pakistan : An Anthology,** The Society for Pakistan Studies, Dacca, 1964

Thomas M. Arnold — **The Preaching of Islam,** Lahore, 1956

Wilfred Seawen Blunt — **India Under Ripon - A Private Diary,** London 1909

W. W. Hunter — **Report of the Indian Education Commission,** 1883

The Indian Mussalmans, London, 1871

Yusuf Hussain (ed.) — **Selected Documents from the Aligarh Archives,** Asia Publishing House, Calcutta, 1967

বিনয় সবকাবেব বৈঠকে, ১ম ভাগ, চক্রবর্তী, চ্যাটার্জি এণ্ড কোং লিমিটেড, কলিকাতা, ১৯৪৪ (২য় সং)

মওলানা ইসলামাবাদী স্মৃতিবার্ষিকী, ঢাকা, ১৯৬৬

মুসলিম বাংলা সামযিকপত্র, পাকিস্তান পাবলিকেশনাস, ঢাকা, ১৯৬৬

শতবার্ষিকী স্মবণিকা, কুমিল্লা ফযজুন্নেসা উচ্চ বালিকা বিদ্যালয, কুমিল্লা, ১৯৭৫

Consolidated Alphabetical Index to the Proceedings of the Government of Bengal, Political Department (1859-1908), Calcutta

General Report of Public Instruction in Bengal, 1872-73

Imperial Gazetteer of India, Provincial Series (Eastern Bengal and Assam), Calcutta, 1909

List of Associations recognized by Government (corrected upto 1st April, 1923) Government of Bengal, Political Department, September 1923, Proceedings Nos 143-158B

Nowab Bahadur Abdul Latif C I E , Published by Thacker, Spink and Co , Calcutta

New Calcutta Directory, 1856 •

Proceedings of Asiatic Society of Bengal, 1892-93 to 1896-97

Report of the Moslem Institute, Calcutta, 1922-23

Report on the Sensus of Bengal, 1872 (General Statement I B) Calcutta, 1872

Report of the Sensus of the Bengal 1818, Calcutta, 1883

Report of the Sensus of India, 1891 Vol V (Lower Provinces of Bengal and their Feudatories), Calcutta, 1893

Struggle for Indepencence 1857-1947, Pakistan Publications, Karachi, 1958

Supplementary Note on Mohammedan Education (Director of Public Instruction, 1883-84)

The Calendar for the year 1929, Part II, Vol I, Calcutta University, Calcutta, 1932.

The Proceedings of the Government of India in the Home Department (Education), No 300, dated Simla, the 7th August, 1871.

অভিধান, বিশ্বকোষ, গ্রন্থপঞ্জি ও অন্যান্য

নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত — **বিশ্বকোষ, ১৪শ ভাগ,** কলিকাতা

পূর্ণেন্দ্র প্রসাদ ভট্টাচার্য প্রণীত — **ভারতকোষ, ১-৫ খণ্ড,** বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, কলিকাতা

সুধীরচন্দ্র সরকার সংকলিত — **জীবনী অভিধান,** কলিকাতা ১৩৭৩

সুবলচন্দ্র মিত্র সংকলিত — **সরল বাঙ্গালা অভিধান,** নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রা:) লি:, কলিকাতা, ১৯৭১ (৮ম সং)।

যোগেন্দ্রনাথ সমাদ্দার ও রাখাল রাজ রায় — **১৩২২ বঙ্গাব্দের সাহিত্য-পঞ্জিকা,** সমসাময়িক ভারত কার্যালয়, বাঁকীপুর (বিহার), ১৩২৩

আলী আহমদ সংকলিত — **বাংলা মুসলিম গ্রন্থপঞ্জী,** বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৫

C E Buckland — **Dictionary of Indian Biography,** Swan Comenschein and Co Limited, London, 1909

Edwin R A Seligman (ed) — **Encyclopeadia of Social Sciences** Vol 9, The Macmillan Company New York, 1950 (Reprinted)

F Steingass (ed) — **Persian-English Dictionary,** London, 1957 (4th Edn)

J C Dasgupta — **National Biography of India,** Dacca

Jagadish Saran Sharma — **The National Biography, Dictionary of India,** Sterling Publications (P) Ltd , New Delhi 1972

James Long, Rev — **Descriptive Catalogue of Vernacular Books and Pamphlets,** forwarded by the Government of India to the Paris University Exhibition of 1867

S P Sen (ed) — **Dictionary of National Biography, Vol.I,** Institute of Historical Studies, Calcutta, 1972

Author Catalogue of Printed Books in Bengali Language Vol I-IV, National Library, Calcutta

Bengal Library Catalogue, 1873-1905

British Museum Library Catalogue, Vols I and II

Encyclopeadia Britannica, Vol XXIII

Encyclopeadia of Islam, London, 1961

Thacker's India Directory, 1900

Who's Who of India, Newul Kishore Press, Lucknow, 1911

প্রবন্ধাবলী

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় — মুসলমান শিক্ষা-সমিতি, **সাহিত্য,** চৈত্র ১৩১০

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় — কবি কায়কোবাদ, **সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা,** ৭০ বর্ষ ১-৪ সংখ্যা, ১৩৭০

আনিসুজ্জামান — মীর মশাররফ হোসেন রচিত 'এর উপায় কি?' **পাণ্ডুলিপি,** চট্টগ্রাম, ১২৮০

আফতাবউদ্দীন আহমদ	বঙ্গীয় মুসলমানের শিক্ষা, **ইসলাম-প্রচারক**, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, অগ্রহায়ণ ১৩১১
আবদুল করিম	বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানী প্রভাব, **নবনূর**, জ্যৈষ্ঠ ১৩১১
	যোগ কালন্দর, **ইসলাম-প্রচারক**, জানুয়ারি ১৯০৩
আবদুল কাদির	নওশের আলী খাঁ ইউসুফজয়ী, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭
	বিষাঙ্কুর কাব্য, **লেখক সংঘ পত্রিকা**, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮ মতীয়ুর রহমান খানের সাহিত্য সাধনা, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৪
	মোহাম্মদ নঈমুদ্দীন, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৬
আবদুল গফুর সিদ্দিকী	মুসলমান ও বঙ্গসাহিত্য, **সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা**, ২৩ বর্ষ ২ সংখ্যা, ১৩২৩
আবদুল লতিফ চৌধুরী	বাঙ্গালা মৌলুদ, **মাহে-নও**, বৈশাখ ১৩৬৭
আহমদ শরীফ	বাঙ্গালায় সুফী প্রভাব, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, কার্তিক-পৌষ ১৩৭৬
ইব্রাহীম খাঁ	টাঙ্গাইলের সাহিত্য সাধনা, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
	নওশের আলী খান ইউসুফজয়ী, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, ভাদ্র-অগ্রহায়ণ ১৩৬৬
এ এম তোরাব	আশরাফ-আতরাফ, **সওগাত**, শ্রাবণ ১৩৩৫
এবনে মাস্মীজ	মুসলমান বোর্ডিং বা ছাত্রাবাস, **ইসলাম-প্রচারক**, ফাল্গুন-চৈত্র ১৩০৮
	আমাদের কি করা উচিত, **ইসলাম-প্রচারক**, অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৩০৯
কাজী ইমদাদুল হক	আমাদের শিক্ষা, **নবনূর**, জ্যৈষ্ঠ ১৩০৯
খোন্দকার রেযাউল হক	লালনশাহী ভাবসঙ্গীতে বাংলাদেশের সমাজচিত্র, **পূর্বাচল**, কার্তিক ১৩৮৩
গোলাম সাকলায়েন	কবি দাদ আলী, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
	মোহাম্মদ নজিবর রহমান, ঐ, পৌষ-চৈত্র, ১৩৬৪
জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী	বঙ্গে ইসলামী ধারা ও বৌদ্ধ সহজমত, **বাংলা সাহিত্য পত্রিকা**, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ৩ বর্ষ, ১৯৭৫
তাজুল ইসলাম হাসমী	কারামত আলী ও তারিকায়ে মুহাম্মদিয়া, **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা**, ডিসেম্বর ১৯৭৬
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার	দুই খানি নতুন পুস্তক, **নবনূর**, মাঘ ১৩১১
দেওয়ান আবদুল হামিদ	কবি সৈয়দ এমদাদ আলী, **লেখক সংঘ পত্রিকা**, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৮
দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	মানবতাবাদী কাজী আবদুল ওদুদ, **পূর্বাচল**, কার্তিক ১৩৮৩
ব্যোমকেশ মুস্তাফী	গত বর্ষের বাঙ্গালা সাহিত্য, **সাহিত্য**, ভাদ্র ১৩১০
মন্মথনাথ ঘোষ	মহাত্মা নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর সি. আই. ই. **মালঞ্চ**, আশ্বিন ১৩২৪
মির্জা আবুল ফজল	প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি, **নবনূর**, শ্রাবণ ১৩১০
মীর মশাররফ হোসেন	সৎ প্রসঙ্গ, **কোহিনূর**, ভাদ্র ১৩০৫
মীর্জা এম. এ. আজীজ	সৌভাগ্য স্পর্শমণি ও মুনশী রেয়াজুদ্দীন, **মাসিক মোহাম্মদী**, চৈত্র ১৩৪০

মীর্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী	ভাষা সম্বন্ধে নূর-অল-ইনামের কৈফিয়ৎ, **নূর-অল-ইমান**, শ্রাবণ ১৩০৭
মুনতাসীর মামুন	বিবাহ-সম্মতি আইন ও পূর্ববঙ্গে এর প্রতিক্রিয়া, **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা**, ডিসেম্বর ১৯৭৬
মুস্তাফা নূরউল ইসলাম	মুনশী জমিরুদ্দীন, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, মাঘ-চৈত্র ১৩৭৬
মুহম্মদ আবু তালিব	মির্জা ইউসুফ আলী, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭৪
মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন	দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ, **পাকিস্তানী খবর**, ২৭ জুলাই ১৯৬৩
মোজাফফর আহমদ	উর্দু ভাষা ও বঙ্গীয় মোসলমান, **আল-এসলাম**, শ্রাবণ ১৩২৪
মোসাবত আলী খান	বঙ্গীয় মুসলমান ও শিক্ষা-সমিতি সম্বন্ধে দুই একটা কথা, **মিহির ও সুধাকর**, ১ শ্রাবণ ১৩১০
মোহাম্মদ আবদুল কাইউম	ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী, **মাহে-নও**, বৈশাখ ১৩৭৪
মোহাম্মদ আবদুল কুদ্দুস	জেলাব কয়েকজন প্রখ্যাত ব্যক্তি, **নকীব**, বিশেষ সংখ্যা, ১৯৭৫, কুমিল্লা
মোহাম্মদ কে চাঁদ	মুসলমানদিগেব বিদ্যা শিক্ষায অবনতিব কাবণ, **ইসলাম-প্রচারক**, ফাল্গুন ১৩১৩
	তালাক বা মোসলেম স্ত্রীবর্জন, **ইসলাম-প্রচারক**, ৮ বর্ষ ১২ সংখ্যা ১৩১৪
মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামবাদী	ইসলাম ও মিশন, **ইসলাম-প্রচারক**, আশ্বিন-কার্তিক ১৩১০
	বঙ্গীয মুসলমানগণেব জাতীয মহাসমিতি, **মিহির ও সুধাকর**, ৫ অগ্রহায়ণ ১৩০৯
	আববী বিশ্ববিদ্যালয, **আল-এসলাম**, আষাঢ় ১৩২৭
	মুসলমান আমলে হিন্দুব অধিকাব, **আল-এসলাম**, আশ্বিন ১৩২২
মোহাম্মদ বওশন আলী	বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি, **ইসলাম-প্রচারক**, বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ ১৩১২
মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	আমাদেব দবিদ্রতা, **আল-এসলাম**, জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩
ববীন্দ্রনাথ ঠাকুব	মুসলমান বাজত্বেব ইতিহাস, **ভারতী**, শ্রাবণ ১৩০৫
	হিন্দু ও মুসলমান, সাধনা, চৈত্র ১৩০১
শেখ ফজলল কবিম	উন্নতিব উপায কি? **ইসলাম-প্রচারক**, ১৩১০
	ধর্মহীনতা ও সমাজ সংস্কার, **কোহিনূর**, আষাঢ় ১৩১২
সুরেশচন্দ্র মৈত্র	উনিশ শতকে বাঙালি মুসলমান বাজনীতি, **অনুশীলন**, আশ্বিন ১৩৭২
সৈয়দ এমদাদ আলী	খান বাহাদুব কাজি ইমদাদুল হক, **সওগাত**, ভাদ্র ১৩৩৩
	মাতৃভাষা ও বঙ্গীয় মুসলমান, **নবনূর**, পৌষ ১৩১০
	বঙ্গীয় মুসলমান সমাজে নেতার অভাব, **ইসলাম-প্রচারক**, চৈত্র-বৈশাখ ১৩০৯-১০
	মোজাম্মেল হক ও রেযাজউদ্দীন, **মাসিক মোহাম্মদী**, চৈত্র ১৩৪০
সৈয়দ মর্তুজা আলী	উত্তব বঙ্গের সাহিত্যিক, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৫
	কোহিনূর, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, বৈশাখ-শ্রাবণ ১৩৬৭
	শ্রীহট্টের ইতিহাস, **বাংলা একাডেমী পত্রিকা**, মাঘ-চৈত্র ১৩৬৮
	হজবত শাহ জালালের লেখকগণ, **মাসিক মোহাম্মদী**, আশ্বিন ১৩৪৮
হামেদ আলী	উত্তর বঙ্গের মুসলমান সাহিত্য, **বাসনা**, বৈশাখ, ১৩১৬

এডুকেশন গেজেট, ২০ পৌষ ১৩০৭, ১০ শ্রাবণ ১২৮০

বান্ধব, আশ্বিন ১০৮২, অগ্রহায়ণ
বাসনা, বৈশাখ ১৩১৮

Jafar-ul-Islam — The Aligarh Political Activities, **The Journal of the Pakistan Historical Society**, Vol. XII, part I, January, 1964.

James Wise — The Muhammedan in Eastern Bengal, **Journal of Asiatic Society of Bengal**, Vol LXIII, No. I. 1894

Obaidullah Al Obaidi — Muhammedan Education, **The Bengal Magazine**, February 1873.

Eastern Bengal and Assam Gazettee, 10 March 1905 (Supplement).
Notes on Early Commerce in Bengal, Calcutta Review, Vol. LXXII, 1881

পত্র-পত্রিকা

অনুসন্ধান, ১৫ বৈশাখ, ১৫ ফাল্গুন ১২৯৬
আখবারে এসলামিয়া, ১৩০২
ইসলাম-প্রচারক, ১২৯০, ১৩০৬ ১৩১২
কোহিনুর, ১৩০৫-১৩১২-১৩১৩
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯২
ঢাকা গেজেট, ১৮ চৈত্র ১৩০২
ঢাকা প্রকাশ, ১২ পৌষ ১২৭৬, ৫ মাঘ ১২৮৯, ২৭ পৌষ ১২৯২, আশ্বিন ১২৯৩, ১ আষাঢ় ১২৯৮, ১১ বৈশাখ ১৩০৬, ১৮ ভাদ্র ১৩০৬, ১৭ অগ্রহায়ণ১৩১২
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বৈশাখ ১২৯৬
বসুমতী, ২৬ মাঘ ১৩০৬
বার্ষিক সওগাত, ১ বর্ষ, ১৩৩৩
ভারতী, ফাল্গুন ১২৯৩, কার্তিক ১৩০৭, শ্রাবণ ১৩১০
ভারতী ও বালক, চৈত্র ১২৯৫, বৈশাখ ১২৯৮
ভিক্ষুক দর্পণ, ১৮৯৪
মাসিক মোহাম্মদী, কার্তিক, ১৩৩৪ চৈত্র ১৩৪০
মিহির, ১৮৯২
দূরবীন (ফাবসী), ১৮৫৫
ধূমকেতু, আষাঢ় ১৩১০, বৈশাখ ১৩১২
নবনূর, ১৩০৯-১৩১৩
নব্যভারত, চৈত্র ১৩০৮
নূর-অল-ইমান, ১৩০৭
প্রচারক, ১৩০৬-১৩০৮
প্রদীপ, পৌষ ১৩০৮
প্রবাসী, আশ্বিন ১৩১৫
বঙ্গদর্শন, ভাদ্র, পৌষ ১২৮০, শ্রাবণ ১২৮৫
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, ১৩২৬
বসুধা, ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩১৮
মিহির ও সুধাকর, ১৩০২-১৩০৯
সুধাকর, ১২৯৬, ১২৯৮-১৩০০
সুরভী, ১৫ ফাল্গুন ১২৮৯
হাফেজ, ১৮৯৭
হিতকরী, ১২৯৭
The Calcutta Review, 1870.
The Journal of the Moslem Institute, 1906
The Moslem Cronicle, 1895-1905.

নির্ঘণ্ট

অ

অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় ৭১, ২১৬
অক্ষয় কুমার সরকার ৫০২, ৫১০
অক্ষয়চন্দ্র সরকার ২২৮
অগ্নিকুক্কুট ২৫৫, ৪৩৩, ৪৩৪
অদ্বিতীয় উপদেশ-প্রাণপ্রিয় তাপস ৩৬৩
অনল প্রবাহ ২৭২, ৩০৭, ৩০৯
অনাথ দেব পুরস্কার
অনুসন্ধান, পত্রিকা ২২৯, ২৬৬
অপূর্ব দর্শন ২৬২, ২৬৩
অববোধবাসিনী ৩১১, ৪৯৮
অবিশ্বাসী ভৃত্য ৩৭৫
অভিসেচন তত্ত্ব ৫০
অমিয় ধাবা ২৪৯
অর্চ্চনা ৪৫৮
অলোক সভা ২৯৫, ২৯৬
অশ্রুমালা ২৪৭, ২৪৮, ৬০৪
অশ্রুহাব ৩৬৭
অশ্রুপহার ১১১
অস্ত্রচিকিৎসা ৩৩০

আ

আইন-উল হিদায়া ৯৮
আওরঙ্গজেব ১, ৬, ৪৯, ৭০, ৪২৩
আকবর ৭০, ৪১৫
আকবর হোসেন সরকার ৩৭২
আকরম খাঁ ২০০
আঁখিজল ৩১৬
আখবারে এসলামীয়া ৬৮, ৭৮, ১৯৩, ২৩৭, ৩৮০-৮২, ৩৮৪, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৬৫
আখেরজ্জোহরের প্রতিবাদ ৩৭৫, ৪৬৭
আগ্রার কাহিনী ২৯৫
আজমীর ভ্রমণ ৩৬৮
আজিজ আহমদ ৩৭২
আজিজন নাহার ২২১
আজিজন্নেসা খাতুন ৩৩৩
আজিজুল হক, স্যার ৫১, ৫২
আজিজুল হক চৌধুরী ১৭৯
আজিমদ্দী, মুনসী ২০৮, ৩২০
আজিমুদ্দীন মোহাম্মদ চৌধুরী ৩৩৮-৩৯
আঞ্জমান খাওয়াতীনে ইসলাম ৩২০
আঞ্জমনে আশ-আতে ইসলাম ১০৭, ১১৩, ১৬৯-৭০, ৫৯৮
আঞ্জমনে আহমদী ২০১-০২, ৪৬৩
আঞ্জমনে আহলে হাদিস ৪৬৫
আঞ্জমনে ইসলামিয়া ৭৯, ৮১, ১১৪, ১৭৩, ১৯১-২০১
আঞ্জমনে ইসলামী ১১৫, ১১৬, ১১৮-২১, ৪২৭
আঞ্জমনে ওলামায়ে বাঙ্গালা ৩০৫
আঞ্জমনে ওয়ায়েজিনে ইসলাম ২৬১
আঞ্জমনে তাইদে ইসলাম ২০১, ২০২
আঞ্জমনে নূরুল ইসলাম ১৭৪-৭৬, ২০৪, ৬০০
আঞ্জমনে মঈনাল এসলাম ১৫৯-৬০
আঞ্জমনে মফিদুল ইসলাম ১৯০, ৩৪৭
আঞ্জমনে মোখায়েরুল ইসলাম ২০১, ২০৩
আঞ্জমনে মোজাকারিয়া ইসলাম ২০১, ২০৩
আঞ্জমনে রেয়ায়েতে ইসলাম ২০১, ২০২
আঞ্জমনে হেমায়েত এসলাম ১০৩, ১৫৫, ১৫৭-৫৯, ২৫০, ৪৯৩
আত্মীয় সভা ৩৬, ৪৫, ১১৫, ২০৮, ৪৫৫
আদালত খান ৯১-৯৩
আদেল্লায় হানাফীয়া বা রুদ্দে লা-মজহাবী ২৪০, ৪৬৫, ৪৬৭
আনওয়ার সোহেলী ৩৫০
আনন্দমোহন বসু ৭৯
আনাল হক তত্ত্ব ১৬, ৪৩৮
আনোয়ারা ২৬৭
আফতাবউদ্দীন আহমদ ১৮৭, ৩৬৩, ৪০৭, ৪৯২

আবদুর রশিদ খান ৩৬১
আবদুর রসুল, ব্যারিস্টার ১০৯-১১০, ১৭০
আবদুর রহমান, লেখক ৩৬৭
আবদুর রহমান, ডাক্তার ৩৭৫
আবদুর রহমান আহমদ ৩৭৫
আবদুর রহমান মাহমুদ ১৭৭
আবদুর রহিম, স্যার ১০৮-০৯, ১৬৬, ১৭৭-৭৮, ৫০৮
আবদুর রহিম বক্স পেস্কাব ৮১-৮২
আবদুল আজিজ ১৫৮
আবদুল আজিজ বিএ, খান বাহাদুর ৫৪, ৮৯, ১০৭-১০৮, ১৭৭, ৪৯০
আবদুল আজিজ খান ১৪৭, ১৪৯
আবদুল আজেদ খাঁ চৌধুরী ৩৩০
আবদুল আলা ৩৩১-৩২
আবদুল আহাদ ১৪২
আবদুল ওয়ালি ১০১-০৩, ১৩৪
আবদুল ওহাব ১৭, ৪৭
আবদুল করিম বিএ ৫২, ১৬৫, ২৯৮, ৩৩৯, ৩৫১-৫৩, ৫০৮
আবদুল করিম গজনভী ৮০, ১৯২
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ২৮৮-৯০, ৪১১,৫১০
আবদুল কাদেব বিএ ১৬৯
আবদুল করিম, হাফেজ ৩৭৩
আবদুল কাদের জিলানী ২৬৫
আবদুল খাতেক ৩৭০
আবদুল খালেক ১৯৫
আবদুল গণি ৮৯, ১৬৫, ৩৩২
আবদুল গণি, নবাব ৭৪, ৪৫৫, ৫০৪
আবদুল গণি আলা ৩৭৬
আবদুল গণি খাঁ ৩৭৩
আবদুল গণি সুফিয়ানী ৩৭৪
আবদুল গফুর ৬৭, ৪৭০
আবদুল গফুর চৌধুবী ৩৭০
আবদুল গফুর সিদ্দিকী ১৭২
আবদুল জব্বার ৩৭৬
আবদুল জব্বার, খান বাহাদুর ৯১, ১২৭
আবদুল জলিল ১৬১
আবদুল বারী ৩৬৬
আবদুল মজিদ ১৫০, ১৫৩
আবদুল মজিদ চৌধুরী ৭৫, ৭৭-৭৮, ১৪৪, ১৪৫, ১৬১, ১৮৮, ২০৩, ৩৬৫
আবদুল ময়েজ ২৭৬
আবদুল মোমেন ৯১
আবদুল লতিফ, নবাব ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭০, ৭৪, ৮৪-৮৯, ৯৬, ১২১-৩০, ১৩৮, ২১০, ২১২, ৩৫৩, ৩৮০, ৪৪৩, ৪৭৪, ৪৮০, ৪৮১-৮৩, ৪৮৯, ৪৯৫-৯৬, ৫০৫, ৫০৬, ৫১২, ৫৩০
আবদুল লতিফ, হাকিম ৩২৯
আবদুল লতিফ আহমদ ৩২৯
আবদুল শাহ কালান্দব ৩৭২
আবদুল হক ২৭৯
আবদুল হাকিম, কবি ১৮
আবদুল হাকিম ৪৯৫
আবদুল হামিদ ৩৭২
আবদুল হামিদ বিএ ১৭৩, ১৮১
আবদুল হামিদ খান ৩০২, ৫২৯
আবদুল হামিদ খান ইউসফজয়ী ৭১, ৮০, ৯৪, ২৪১-৪৭, ৩৮২, ৪২৯, ৫৩৩
আবদুল হালিম গজনভী ৮০
আবদুল্লাহ ১২৩, ৪৬৮, ৫২১
আবদুল্লাহ (উপন্যাস) ৩১৭
আবদুল্লাহ সোহরাওয়ার্দী ৯০, ২৯৪
আবদুস সামাদ ১৪৯
আবদুস সালাম ১০৬-০৭, ১৩৩, ১৩৯, ১৬৫
আবদুস সোবহান চৌধুবী ৮০, ৩৫৪
আবিদ আলী খান ৩৪৪-৪৫
আবু ওয়ায়েজ মোহাম্মদ মওয়াযেজ ৩৭৫
আবু নসর ওহীদ ১১১-১২, ৪৮৮
আবু বকর, খলিফা ১৫
আবু বকর, খলিফা ১৫
আবু বকর, পীব ২৬৫
আবু মাআলী মোহাম্মদ হামিদ আলী ২৯৭-৩০০
আবুল কাসিম ৯১, ১২৮
আবুল খায়েব মোহাম্মদ সিদ্দিক ৩৩৯
আবেদ হোসেন সিদ্দিকী ৩৭৩
আমজাদ আলী ১৬৯
আমার জীবনী ২২২, ২৩৬, ৪০৭, ৪৮৯

আমার জীবনী ও ইসলাম গ্রহণ বত্তান্ত ২৭২, ২৯২
আমাব জীবনীব জীবনী কুলসুম জীবনী ২৩৬
আমার সংসাব জীবন ১৫২, ২৫৩
আমিনা ৩৫৯
আমিনুদ্দীন ৩৬৯
আমীরুদ্দীন সরকার ৩৭৪
আরব-কাণ্ড ২৪৬
আরবজাতিব ইতিহাস ৯৯, ৫০৭
আরব্য ও পাবস্য মধুপাক ১৫৮
আর্যধর্ম ২৮৩
আল-এসলাম ৪০০
আলতাফী প্রেস ৭৬, ৩৩৩
আলতাফুন্নেসা ৩৫৪
আলহামরা ২১৯, ২৬০, ৩৮৮
আলাউদ্দীন, বাদশাহ ৭০, ৪১৫
আলাউদ্দীন আহমদ ৩৪৫-৪৬, ৪০৩
আলা হেদাদ খাঁ ৩৭৭
আলিগড মহামেডান এ্যাংলো ওবি-য়েন্টাল কলেজ ৪৭, ৮৯
আলিমুজ্জামান চৌধুবী ৮৩, ১৯৮
আলী (খলিফা) ১৫
আলী নওয়াব চৌধুরী ৭৭, ১৮৪
আলী নওযাব জীবনচরিত ২৮৩
আলেকজাণ্ডার পেডলার ১২৭
আলেকজাণ্ডার ম্যাকেঞ্জি ১০৫, ৪৯০
আশবাফউদ্দীন আহমদ, পীব ১৩৩, ১৯৬, ৫২৫
আশাবৃক্ষ ৩২৫
আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ৯৯
আসগর আলী ৩৭৩
আসবাব-উস-ছামী বা ছামীতত্ত্ব ৩১৪
আসমত আলী খান ইনষ্টিটিউসন ১০৪
আসল বাইবেল কোথায় ২৯৩
আসল বাঙ্গালা গজল ২৯৪
আয়েন আলী শিকদার ৩২২
আহকামোল এসলাম ৩৪৬
আহমদ শাহ সুলতান ৯
আহমদ শাহ আবদালী ৩, ২৯৪
আহমদী, পত্রিকা ৭১, ৮০, ২৩৭, ২৪১, ৩৮২, ৩৮৪, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩৩, ৪৬৫
আহলে হাদিস, সম্প্রদায় ১৭, ২৩৮, ৪৬৯
আহলে হাদিস, পত্রিকা ৪৬৫
আহসানুল্লাহ, নবাব ৭৪, ৮৯, ১১৭, ১৩৪, ১৪৭, ১৬৪, ১৭৭, ৪৯০, ৪৯৭
আযশ-এ হিন্দ ১১৪

ই

ইউসুফ-জোলেখা ১৯
ইউনাইটেড ইণ্ডিযান প্যাট্রিযটিক এসোসিযেশন ১৪৭
ইউনানী হাকিমী চিকিৎসা প্রণালী ৩২৯
ইউনানী হাকিমী শিক্ষা ৩৭৫
ইকবাম বসুল ১৪১, ১৪৩
ইঞ্জিলে হজরত মোহাম্মদ (দ:) ও পাদ্রী বাউস সাহেবের সাক্ষ্য ৩৩৫
ইঞ্জিলে হজবত মোহাম্মদেব খবব আছে ৩৩৬
ইণ্ডিযা আপন বিপন-এ প্রাইভেট ডাযবী ১০১
ইণ্ডিযান ইকো ১৭৬
ইণ্ডিযান এসোসিযেশন ৭৯
ইণ্ডিযান প্যাট্রিযটিক এসোসিযেশন ১৯০, ১৯২
ইণ্ডিযান মিবব ২৮৬, ৪৫৫
ইনকামটেক্সেব ২-আইন ৩৭০
ইবন বতুতা ৭
ইব্রাহীম খান ১৮০, ২৩৮, ২৪৬
ইব্রাহীম শর্কি ৬
ইমাম আলী হক ৩৭৪
ইমাম গাজ্জালী ১৫৫, ২৫১
ইমাম বোখারি ২৪১
ইমাম হাসান ১৫
ইমাম হোসেন ১৫
ইরসাদউদ্দীন আহমদ পারিলী ৩৭৬
ইলবার্ট বিল ৩৮১
ইলাহী বক্স ৩৬৯
ইলিয়ড ৫১৬
ইসমত পাশা ৯৮
ইসলাম (গ্রন্থ) ৯৮, ৩৪৪
ইসলাম (পত্রিকা) ৩৬২, ৩৯৪
ইসলাম ইতিবৃত্ত ২৫৮, ২৯০
ইসলাম ইতিবৃত্ত সোপান ৩৬৫

ইসলাম এ ইউনিভারস্যাল রিলিজিয়ন অব পীস এণ্ড প্রোগ্রাম ৩৫৩
ইসলাম দর্পণ ৩৩৪
ইসলাম ধর্মনীতি ৩৪৪
ইসলাম-প্রচারক ৬৮, ৮১, ১০৪, ১৩৮, ১৫৮, ১৬০, ১৬২, ১৭৬, ২০৩, ২৪০, ২৭৬, ৩০৮, ৩৮৫-৮৭, ৪৫৭, ৪৬২, ৬০৭
ইসলাম-প্রভা ৪৫৩
ইসলাম বিলাপ ৩৩২
ইসলাম সঙ্গীত ২৬২
ইসলাম-সুহৃদ ২৮৩, ৩৫৫
ইসলামী বক্তৃতামালা ২৬৯
ইসলামেব সত্যতা সম্বন্ধে পর-ধর্মাবলম্বীদিগেব মন্তব্য ৮৪, ২৯২
ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ১০, ২১, ২২, ২৫, ২৯, ৩৪, ৪১, ৪৩, ৪৭, ৬২, ৪৪১, ৪৭৮, ৫১৮
ইয়ংবেঙ্গল দল ২৩, ৩৬, ৪৬, ৪১৪, ৪১৭, ৪৪০, ৪৭৮

ঈ

ঈদ-বক্রীদ ৩৪৮
ঈদুল আজহা ৭৭, ৩৫৬
ঈশানচন্দ্র মণ্ডল ৩৩৬
ঈশানচন্দ্রমণ্ডল খ্রীশ্চানের মুসলমান হইবার কারণ ৩৩৬
ঈশ্ববচন্দ্র গুপ্ত ৪৫, ২২৯, ২৯১
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগব ২৬৮, ২৭০, ৪১৪

উ

উইলফ্রেড স্কয়েন ব্লান্ট ৮৭, ১০১, ১৩৮
উইলিয়ম উইলসন হান্টার ৪, ৫১, ৮৮, ৯৪, ৯৬, ৩৪১, ৪০৮, ৫২২, ৫৩৩
উইলিয়ম এ্যাডাম ৪৯, ৪৪০, ৪৮০
উইলিয়ম কেরী ৩৬, ২০৭, ২১১, ৪৪০, ৪৭৮
উইলিয়ম ক্রুক ৪
উইলিয়ম গ্রে ১২৫
উইলিয়ম জোন্স ১১৫
উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক, লর্ড ৪০৯
উইলিয়ম ম্যাকনটন ৩৭১
উইলিয়ম মুইর ৬৫, ৪৪৩
উচিত কথা ৩৪৩, ৪৫৯, ৪৬২
উচিৎ শ্রবণ ২০৮, ৩১৮
উচ্চ বাঙ্গালা শিক্ষাবিধি ২৮৪, ২৮৭
উচ্ছ্বাস (কাব্য) ৩০৮
উডবার্ন, জন ১২৭, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৮
উডবার্ন পদক ৭৯, ১৬৩
উদাসী ২৪২, ২৪৪-৪৫
উদাসীন পথিকেব মনের কথা ১৩০, ৪০৭
উদ্বোধন ৩০৮
উদ্যান ৩৪৭
উপদেশ কাহিনী ৩৭১
উপদেশমালা ৩৬২
উপদেশ সংগ্রহ ৩৪৫
উমি চাঁদ ৪০
উবফি ১০৬
উলহতে মসীহ ২৯২
উর্দু গাইড প্রেস ১০৫

এ

এ আহমদ ৩৭১
এ এইচ আবদুল হামিদ ১৯১
এ. এফ. এম. আবদুল আলী ৮৯, ১২৮, ১৭৯
এ এম এম আবদুর রহমান ৮৯, ১২৭, ১৩৯, ৫০৫
এ কে খান ৩৭৫
এ. কে. ফজলুল হক ১২৮, ১৮৫, ২৭৬
এইচ বেভারিজ ৬
এফ জি তীলে ৫০৬
এফ জে মোয়াট ৪৬
এম এইচ সৈয়দ আবুল কাসেম ৩৭৩
এম এস নুরুল হোসেন কাশিমপুরী ৪৬৫
এম টি টাইটাস ১৬
এস এ আল মুসভী ৪০২
এ মিনিট অন হুগলী মাদ্রাসা ৮৮
এ শর্ট এ্যাকাউন্ট অব মাই পাবলিক লাইফ ৮৯, ১২১
এ শর্ট হিস্টরি অব দি সারাসিনস ৯৮, ৯৯, ২৫৭, ৫০৮
একিনুদ্দীন আহমদ ১৪৯, ৩৪৩-৪৪, ৩৮৮, ৫২৬

একেই কি বলে সভ্যতা? ২২৭
এডওয়ার্ড টুইট ডাল্টন ৪
এডওয়ার্ড ডেনিসন বস ১৭৮, ১৭৯, ৫০৮
এডওয়ার্ড হাইড ইস্ট ৪৭৮
এডুকেশন গেজেট ২৬৫, ২৭৩, ২৯৯, ৩৩৭, ৩৯১
এনসাফ অর্থাৎ লা-মজহাবীগণের ধোকাভঞ্জন ৪৬৫, ৪৬৭
এণ্ড্রু ফ্রেজার ১৪৬
এবনে মাঔজ ৫১৪
এর উপায় কি? ১২৬
এরশাদ আলী খান চৌধুরী ১৪৪
এরশাদে খালেকীয়া বা খোদাপ্রাপ্তিতত্ত্ব ৩২৬
এলগিন, লর্ড ৩৪, ১২১
এলিয়ট হোস্টেল ৫৯, ৮৬
এলেনবরা, লর্ড ১২০
এশিয়াটিক সোসাইটি ৮৫, ১১৫, ৫৮৩-৮৪
এসকান্দর আলী ১৯৮
এসবাতে আখেরজ্জোহর ২৪০, ৩৭৫, ৪৬৫, ৪৬৬
এসলামতত্ত্ব ২৫১, ২৫৩, ২৫৮, ২৭৮, ৪৫৩, ৪৫৬, ৪৫৯
এসলাম ধর্মোত্তেজিকা সভা ১৫৬-৫৭, ২৭২
এসলামের জয় ৬৮
এসলামের প্রভাব ও ধর্মনীতি ৩৬৮
এ্যাসলে ইডেন, স্যার ১৩৪

ও

ওবায়দুল্লাহ আল ওবায়দী সোহরাওয়ার্দী ৭৪, ৮৯-৯০, ১৫০, ৪৪৪, ৪৭০, ৪৭৪, ৪৭৭, ৪৮৮
ওবায়দুর রহমান ৫৪
ওবায়েদুল হক ৩৬৯
ওবেদী বিয়োগ ৯০, ১০৭
ওমর চরিত (হজরত) ৩৪৬
ওসমান (হজরত) ১৫
ওহাজুদ্দীন আহমদ ১৯৩, ৩৫৮-৫৯, ৪৩২, ৪৩৪
ওহেদুর রহমান ৩৭২
ওয়াকফনামা ৮২
ওয়াকায়াত রিওয়ায়াত ৩৭৪
ওয়াজেদ আলী খান পন্নী ১৬৩, ১৯২, ২৪০
ওয়ারেন হেস্টিংস, লর্ড ২৭, ২৯, ৩০, ৫৮, ১১২, ৪৭২
ওয়ারেস আলী ৪৩১
ওয়াশিংটন আরভিং ২১৯, ২৬০
ওয়াহাবী আন্দোলন ১৭, ৩৭, ৪৮, ৫৯, ৮৭, ৯৬, ২১০, ৩৪১, ৪১৬, ৪৩৯, ৪৭৭, ৫১৯, ৫২০
ওয়াহিদুন্নবী ৪৬

ক

কওয়ায়েদে-খানাদারী ৩৫৫
ককবরমা বা ত্রিপুরা ব্যাকরণ ৩৩৭
কড়ির মাথায় বুড়োর বিয়ে ৩২১
কবিতা কলিকা ১০৭
কবিতাকুঞ্জ ৩০০
কবিতা কুসুমমালা ৩৩১
কবিতা কুসুমাঙ্কুর ৩৬৯
কবিতা দর্পণ ৩৭৪
কবিরুদ্দীন আহমদ ১৩৩
কমরন্নেসা বিবি ৮৪
করিমুন্নেসা খানম ৮০-৮১, ১২১, ২২৮, ২৪১, ৩১০, ৩৮২, ৪০১, ৪৮৬
কর্নওয়ালিশ, লর্ড ৩০, ৪০৯
কলিকাতা মহামেডান ইউনিয়ন ৬৬, ১০৪, ১১০, ১১২, ১৩৯, ১৬১-৬৪, ১৮০, ১৮২
কলিকাতা মুসলমান শিক্ষা সভা ১৭৭, ৬০১
কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ২০৭
কলিকাতার গো-কোর্বানী হাঙ্গামা ৩৬৬, ৪৩৪
কলির নারী চরিত্র ২৮৩
কলির বউ ঘর ভাঙ্গানী ৩২১, ৩২০
কলির বউ হাড় জ্বালানী ৩২১
কাঙ্গাল হরিনাথ মজুমদার ২২২
কাজিমউদ্দীন আলী খান ৩২৯
কাজী আবদুল আজিজ ১৫৬,
কাজী আবদুল আজিজ কোরেশী ৩৭৬
কাজী আবদুল খালেক ৩৭৯
কাজী আবদুল বারি ১১৮, ১২১

কাজী আশরফ আলী খান ৩৭১
কাজী ইমদাদুল হক ৭৬, ৩১৫-১৭, ৪০৬, ৪২১, ৪২৩, ৪৮৫, ৪৮৭, ৫০১
কাজী নওয়াবউদ্দীন আহমদ ৩৫৪
কাজী নজরুল ইসলাম ১০৭
কাজী ফকির মোহাম্মদ ৬৭, ৮৪, ৪৭৪
কাজী ফজলুর রহমান ৩৪, ১১৮
কাজী বিল ১৩৪
কাজী মোহাম্মদ আহমদ ১১৪, ১৯৮
কাজী রাজিউদ্দীন আহমদ ১৮৫
কাজেমুদ্দীন আহমদ সিদ্দিকী ১৫৪
কাদের আলী ৩২৯
কানাইলাল দে ১২২
কামালউদ্দীন আহমদ ১৭৯
কারবালা ৩৬৬
কারমাইকেল হোস্টেল ১০৪
কারামাতিয়া মাদ্রাসা ২৬৯, ২৭০
কার্জন, লর্ড ১২৭
কালাপাহাড় ৩
কালেমাতুল কুফর ২৪০
কাশীতে হয় ভূমিকম্প নাবীদের একি দণ্ড ৩২০
কাসেমবধ কাব্য ২১৭, ২৯৮-৯৯, ৪৬৪
কায়কোবাদ ৬৮, ৮৯, ২৪৭-৪৯, ৪১২, ৫১৬
কি মজাব কলের গাড়ী ৩২০
কিফাযিতুল মুসল্লীন ১৮
কিমিয়া-ই-সাদৎ ১৫৫
কুঞ্জলাল নাগ ৪০৭
কুমারখালী আঞ্জুমনে এত্তেফাক এসলাম ২০১, ২০৪, ২৬৪
কুলপ্রদীপ ৩৭৫
কুসুম কানন ২৪৭
. ৩৩৬-৩৭
২৬২
মহামেডান এসোসিয়েশন ১৪৯, ৩৬১
কৃত্তিবাস ১৯
কেরামত আলী (মৌলানা) ৮৮, ১২৪, ৪৭০, ৫২৭
কেরামত আলী মিয়া ৩৭০
কেশবচন্দ্র গুপ্ত ৪৫৮
কেশবচন্দ্র সেন ৪৩২, ৪৫৫
কোথ' চলে গেলে ২৯৪
কোরবানউল্লা ৩৭০
কোরানের বঙ্গানুবাদ ৪৫৯
১৮৬, ৩৯০-৯২
কোহিনুর সাহিত্য সমিতি ২০৫, ২০৬
ক্রিশ্চিয়ানিটি ফ্রম দি ইসলামিক স্ট্যাণ্ড পয়েন্ট ৯৮, ৪৪৩
ক্রুসেড ৯৮
ক্রুসেড ও জেহাদ ৩৬৬
ক্লাইভ, লর্ড ২৯, ৫৩৩
ক্যালকাটা স্কুল সোসাইটি ২৮, ৩৬
ক্ষীরোদ প্রসাদ ৪২৩

খণ্ড প্রলয় ৩৭০
খলিফায়ে রাশেদীন ১৫
খয়রুজ্জামান খাঁ ১৫৫, ১৬০
খাজা খিজির ৪৩৭, ৪৬৪
খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ ১১৩, ৫২৫
খাদেমুল ইসলাম সমিতি ৩০৫
খিলাফত আন্দোলন ৭৭, ৩০৩
খুতুবাতে আহমদীয়া ৪৪৩
খুলনা জেলা মহামেডান এসোসিয়েশন ১৪২
খৃস্টধর্মের ভ্রষ্টতা ৩৩৫
খোন্দকার আবুল ফজল আহমদ ৩৭৫
খোন্দকার গোলাম আহমদ ৩৬৮-৬৯
খোন্দকার জোবেদ আলী ৩৭১
খোন্দকার ফজলে রাব্বি ৪, ৬, ৭, ৩১, ৯৩-৯৫,২৪৬, ৪০৯, ৪৭৪, ৫২৮
খোন্দকার শামসুদ্দীন মোহাম্মদ সিদ্দিকী ২০৮, ৩১৮-২০
খোন্দকার শাহ মোহাম্মদ বসিরুদ্দীন ৩৭৫
খ্রীস্টান মুসলমানে তর্কযুদ্ধ ২৬৮, ২৬৯, ৪৪৬
খ্রীস্টীয় ধর্মের অসারতা ২৬৯, ৪৫৩
খ্রীস্টীয় বান্ধব ২৯১, ৪৪৫, ৪৪৮
খ্রীস্টীয়ানী ধোকাভঞ্জন ৩৭৬
খ্রীস্টের রাজ্যবৃদ্ধি ৪৪২

গ

গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ৩৭৭
গজনফর আলী খান ১১৪

গরীবের মেয়ে ২৬৭
গণেশ (বাজা) ১, ৬
গাজী মিয়াঁব বস্তানী ২৩১
গালিব ৫০২
গিরিশচন্দ্র সেন ৭১, ৩০৬
গিয়াস উদ্দীন আজম শাহ ১৯
গো-কাণ্ড ২৪১, ৪৩৩
গো-জীবন ৬৮, ২২৯, ২৩৬, ২৪১, ২৫৫, ৩৫৯, ৪৩১, ৪৩৩
গো-বধে আপত্তি কেন? ৩৫৮, ৪৩৪
গো-হত্যা নিবারণী সভা ৪২৭
গোকুল নির্মূল আশঙ্কায় ভাবতবাসীব নিকট ফকির দীন মোহাম্মদেব আবেদন ৩৬৬, ৪৩৪
গোপালচন্দ্র দত্ত ৪৪৮, ৪৪৯
গোবিন্দ পাল ২
গোরক্ষিণী সভা ১৯৭, ২৫৫, ৩০৭, ৪২৭
গোরাই ব্রিজ বা গৌরী সেতু ২২৫, ৫০২
গোলজাব এসলাম ৩৩৪
গোলাম কাদেব, মুনশী ৭১
গোলাম কিববিয়া ৩৪৩, ৪৫৯
গোলাম বব্বানী ৩২৪
গোলাম সারওযাব ১৫৯, ২৩৮, ৩৪৫
গোলাম হোসেন ৩২১
গোলাম হোসেন সলিম ৪৭৪
গোলেস্তার বঙ্গানুবাদ ৩৩০
গৌডীয় সমাজ ১১৫, ২০৮
গ্রামবার্তা প্রকাশিকা ২২২, ২২৮
গ্রিয়ার্সন, জর্জ ৪, ৯২
গ্রীস-তুরস্ক যুদ্ধ ২৮০, ৩০৩

ঘ

ঘর জামাই দুঃখের কথা ৩২৯

চ

চণ্ডীমঙ্গল ১১
চন্দ্রকিশোর রায় ২৭৩
চন্দ্রশেখরে দলনী বেগম ৩৮৮
চন্দ্রাবতী ১৮
চার্লস আলফ্রেড এলিয়ট ১৬৬
চার্লস এলিয়ট ১২৭, ১৪৩
চার্লস টিভলিয়ান ৯০
চার্লস মেটকাফ ৫১৮
চাহাব দববেশ ৩২৫
চিত্তবঞ্জন দস ২০০
চিবস্থাযী বন্দোবস্ত ৩০, ৩৩, ৪১, ৫৭, ৩৯৭
চিলহাটী মুসলমান সভা ২০৫, ২০৬
চৌকিদারী গাইড ৩৫৫
চৌধুরী আবদুল গফুর ৩৭৩
চৌধুরী গোলাম আলী ৮৩
চৌধুরী মোহাম্মদ আর্জমন্দ আলী ৩৪৩, ৪২৬
চৌধুবী মোহাম্মদ গাজী ২৭৩
চৌধুরী মোয়াহেদুর রহমান ১৪৭
চৌধুরী সোলতান আহমদ খান ৮৩, ১৭৬, ৪৯০

ছ

ছামীতত্ত্ব ৩১২
ছুটি খান ১১

জ

জকিউদ্দীন আহমদ ৩৭৫
জগৎ মোহিনী ৩২৫
জগদুদ্দীপক ভাস্কর ২৮, ২০৮, ৩৭৭
জন ডিগবী ৪৫
জন মার্শম্যান ২০৭, ৩৭৭
জন লবেন্স, স্যার ১২২
জব চার্নক ২১
জমিউত তাওযাবিখ ৮৪
জমিদাব দর্পণ ৭৯, ২২৬, ৩২৫, ৫৮৬
জরিপ শিক্ষা ৩৬৬
জর্নাল অব দি মোসলেম ইনস্টিটিউট ১৭৯
জহির মোহাম্মদ আবু আলী সাবের ৪৮৬
জহিরুদ্দীন আহমদ, ডাক্তার ১৩৩, ৩৩০-৩১, ৪৯৭
জয়নন্দ বিবাহ ৩৬৯
জয়নালোদ্ধার কাব্য ৩০০, ৪৬৪
জয়সিংহ ৭০
জাতবর্মা ৮
জাতীয় কংগ্রেস ৬৪, ১৪৭, ৩১৭, ৫২৪-২৬, ৫৭৭-৮০
জাতীয় ফোয়ারা ৭৬, ১৭২, ২০৪, ২৬২, ২৬৩, ৫৮৫

জানাজা শিক্ষা ৩৫৪
জামালনামা ৩২০
জামিউল তাওয়াবিখ ৪৭৪
জালালউদ্দীন (সুলতান) ৩, ৬, ৯, ১৯
জালালুদ্দীন (শাহজাদা) ৩৬
জিহাদ (ধর্মযুদ্ধ) ৪৭, ৮৮, ১২৪, ৫৩০
জিহাদ (গ্রন্থ) ৯৮
জিয়ান মোহাম্মদ ৮৩
জীবনচবিত ৩৩৮
জীবন মঙ্গল ৩৩৭, ৩৩৮
জীবন্ত পুতুল ৩৬৮
জীবেন্দ্রকুমাব দত্ত ৪২৫
জুম্মা ও ঈদেব ফতুয়া ৩২২, ৪৭০
জুলফিকাব আলী ১৪১
জে ডি কানিংহাম ১৪
জে পি গ্রান্ট, স্যাব ৪৬, ৫৮
জে পি নবম্যান ১২৩
জে সাটক্লিপ ১২৫
জেমস ওয়াইজ ৪, ৪৭৮
জেমস লঙ ৪, ১৪
জৈনদ্দীন ১৭
জোওয়াবোন্নাসাবা ২৬৯
জোব্দাতল মসায়েল ২৩৮
জোহবা ২৬৬
জোহাদাব বহিম জহিদ সোহবাওয়ার্দী ১৬৫, ১৮০
জোহান ভ্যান ম্যানেন ১০১
জ্যোতিঃ ২৯৯
জ্যোতিরিন্দ্রিনাথ ঠাকুব ৪১৭
জ্ঞানবৃক্ষ ৩৪৭
জ্ঞানান্বেষণ ৪৬

ট

টমাস ওয়াকাব আবনল্ড ৯
টাঙ্গাইল হিতকবী ৩৮৫
টালা অভিনয় ২২৪
টালা হাঙ্গামা ১০৪
টিপু সুলতান ৪৪, ৪৫
টেগোর আইন অধ্যাপক ৯৫, ১০৪, ১০৮

ড

ডাফবিন, লর্ড ৫১, ১৩৬
ডালি ৩০৫
ডিহি সম্বন্ধীয় কার্য চালাইবাব নিয়মাবলী ৩৭২

ঢ

ঢাকা গেজেট ২৪৮
ঢাকা প্রকাশ ৮১, ১৫০, ২২৪, ২২৮, ২৩৫, ৩২৪, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৩, ৪০৭
ঢাকা মাদ্রাসা ৮৯, ৯১
ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী ৬৭, ৯০, ১০৭, ১৫০–৫৪, ৪৯৯, ৫১৬, ৫৯৭

ত

তওজকে জাঁহাগীবি ২৭৩
তকবাবে মাকূল ৩৭০, ৪৭০
তজমুল আলী ৩৪৬–৪৭
তত্ত্ব ও জাতীয় সঙ্গীত ৮১, ৩২৭
তত্ত্বজ্ঞান ৩৭৬
তত্ত্ব দর্পণ ৩৭৪
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ২২৯, ৪৫৫
তত্ত্ববোধিনী সভা ১১৬
তবলিগ প্রথা ১৯৯
তফসীব হাক্কানী ২৭৯, ৪৪৯
তফসীব হাক্কানীব বঙ্গানুবাদ ৩৪৬
তবফেব ইতিহাস ৩৩৪, ৪৮৬
তবিকাযে মহম্মদীযা ৪৮
তবিকুল হায়াত ৪৪১
তসলিমুদ্দীন আহমদ ১৪৫
তসদ্দুদোল হোসেন ৩৭০
তহজিবুল আখলাক ৯০
তহমিনা ২৩০
তাপসকাহিনী ২৬৪
তাবিনুল কালাম ৪৪৩
তাবাচাঁদ চক্রবর্তী ১১৬, ১২০
তাবাবতী-মনোহবা ৩৫০, ৪০৫
তালিকাতুল হিন্দ ৩৭০
তিতুমীব ৩৭, ৫৯, ৪৭৬
তুবস্ক দণ্ড ২
তুবস্ক বিগ্রহ ৩০৩
তুরস্ক ভ্রমণ ৩০৮
তুবস্কেব সুলতান ৩০১, ৩০২–০৩
তুহফাতুল-হিন্দ ৩২৮

তুহফাতুল মওয়াহিদিন ৪৭৪
তৃষ্ণা ৩১২, ৫৮৮
তোয়াবিখ হেলিমী ৩৪৬
তোডরমল ১
তোহফাতুল মোসলেমিন ১৫১, ২৭৭, ২৭৯, ৩৪১
তোহফায়ে বোরজখী ৩৭৬
ত্রিত্বনাশক ও বাইবেল মোহাম্মদ ৩৬২
ত্রিপুবাশঙ্কর সেন ২৩৭
ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভা ১৭০-৭১, ৫৯৯

দ

দক্ষিণাবঞ্জন মিত্র মজুমদাব ৭১, ৩১৬, ৪২৪
দবিদ্র বান্ধব ইসলাম ধর্ম সভা ২০১
দলিল বেজিস্টাবি শিক্ষা ২৮৪
দসাবাত-ই-সিরাজুল হাযাত ৪৪১
দস্তুরি ফারসী আমোজ ৯০
দযানন্দ সরস্বতী ৪২৭
দাদ আলী ৭৬
দামেস্ক-হেজাজ বেলওয়ে ৩৮৭, ৫৩১
দারুল ইসলাম ৮৮, ১২৪, ৪৫৯, ৫২২
দাকল সলতানত ৫০৮
দারুল হরব ৪৭, ৭৪, ৮৮, ১২৪, ৫১৬, ৫২২
দাস্তানে ইব্রাতবাব ৪৪৪, ৪৮৮
দি অবিজিন অব দি মুসলমানস অব বেঙ্গল ৯৪, ২৪৬, ৪০৯
দি আলহামবা ২১৯
দি ইংলিশম্যান ৫৩০
দি ইকদ-ই-মনজুম ৯৩
দি ইণ্ডিয়ান মুসলমান ৯৪, ৩৪১, ৪০৮, ৫২২
দি ক্রিসেন্ট ২৭৬
দি নাইনটিন্থ সেঞ্চুবি ৯৮
দি পিলগ্রিম অব লাভ ২১৯, ২৬০
দি বেঙ্গল ম্যাগাজিন ৯০
দি মহামেডান অবজারভার ১০৫
দি মুসলমান ৯৩, ১০৯
দি সিলেট এসোসিয়েশন ২০৫
দিওয়ান-ই-ওবায়দী ৯০, ৪৭৪
দিগদর্শন ৩৭৭, ৪৪১
দীন মোহাম্মদ ৩৬৬, ৪৩৪
দীনেশচন্দ্র সেন ২৯৮, ৩০৫, ৪২৬
দুই সতীনের ঝগড়া ৩২০
দুগ্ধ-সরোবব ১৫৫, ২৫২, ৫১২
দুধু মিঞা ১৭, ৩৭, ৫৯, ৪৩৯
দুদ্দু শাহ ৪১৬
দুরবীন ১০৪, ৪৭৪
দুর্গানন্দ কবিবত্ন ৩২৪
দেওয়ান নাসিরুদ্দীন আহমদ ৩৬৪, ৪৬৩
দেবলা ২৯৫-৯৬
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ১১৬, ৪৫৫
দেলওযার হোসেন আহমদ ৫৪, ৬৬, ৭৪, ১০০-০১, ১১৭, ১৭৮, ১৮০, ৩৪৪, ৪১০, ৫০৮
দোভাষী পুথি ৬৭, ২০৯, ৫২৮
দৌলত আহমদ ৩৩৬
দ্বাবকানাথ ঠাকুব ৩৮, ৪১, ৪৭৪
দ্বিজেন্দ্রলাল বায় ২৬৭

ধ

ধর্মপ্রকাশ ৩২৮
ধর্মপ্রচারিণী ৩২৬
ধর্মতত্ত্ব ৩২৯
ধর্মবীব মহম্মদ ৪৪৪
ধর্মযুদ্ধ বা জেহাদ ও সমাজ-সংস্কার ৭৯, ৩৪১, ৩৪২, ৫৮৬
ধর্মসভা ১১৬
ধর্মানন্দ মহাভাবতী
ধাত্রীবিদ্যা ৩২৩
ধুপচাঁচিয়া মহামেডান এসোসিয়েশন ১৪৯
ধূমকেতু ৩৬৭, ৩৯৬

ন

নওশের আলী খান ইউসফজয়ী ১৫২, ১৫৯, ২৪৬, ২৮৩-৮৮, ৪০২, ৪১১, ৪৬৩
নগেন্দ্রনাথ বসু ৪১৯, ৪২০
নজিবউদ্দীন আহমদ ৩৭২
ননদ ভাজের ঝগড়া ও বাঞ্ছারামের গল্প ৩২০
নন্দকুমার (মহারাজা) ১০
নব-কুমুদ ২১৪, ৩৯৩

নবনূর ৯১, ১০০, ১৭১, ২৩১, ২৪৯, ২৬৩, ৩০৫, ৩৬৮, ৩৯৫–৯৬, ৫১১, ৫১৫
নবলীলা ৩২৯
নব-সুধাকর ২৭৬
নবি কাহিনী ৩১৬, ৪৮৫
নবী মাছুম অর্থাৎ হজরত মোহাম্মদ বেগুনাহ নবী ৩৬৬
নব্য বাবু ৩৫
নবীনচন্দ্র সেন ৬৯, ২৪৮, ৪১৭
নবম্যান, বিচাবপতি ৯৬, ৫২১
নর্থব্রুক, লর্ড ৮২
নাজিমউদ্দৌলা ৯
নাদির শাহ ৩
নামদার, মুনশী ২০৮, ৩২০–২১
নমাজ ৩৩৯, ৩৪০
নামাজনামা ১৮
নামাজতত্ত্ব ২৫৮
নামাজ পড়া শিক্ষা ২৯৪
নামাজ শিক্ষা ৩৭৬
নারী চিকিৎসা ৩৭০
নিউ ক্যালকাটা ডাইরেক্টরী ১১৯
নিখিলনাথ রায় ৭১
নির্মলচন্দ্র ঘোষ ৪২৫
নিষ্কর ভূমি বাজেয়াপ্ত আইন ৩২
নীলদর্পণ ৮৭, ২২৬,
নীলবিদ্রোহ ৩৮
নূর-অল-ইমান (পত্রিকা) ১৫৫, ২৫০, ৩৬৪, ৩৯৪, ৫১৭
নূর-অল-ইমান সমাজ ১৫৪–৫৬, ২৫০, ৫১২
নুর মোহাম্মদ, হাজি ১৩৩
নেচার ও নেচারিয়া ২৭৮
নোয়াখালী এসলামিয়া সভা ১৯৪, ১৯৫, ৪৩২

প

পঞ্চাইত বিধি ৩৫৫
পড়ে দেখ উচিত কথা ৩৭০
পণপ্রথা ৩৭৩
পত্র দলিল লিখন শিক্ষা ২৬৬
পদ-শিক্ষা ব্যাকরণ ২৯৪
পদ্যমালা ৩৬৯
পদ্য রত্নাকর ৩৭২
পদ্যশিক্ষা ২৬০, ৩৪৮
পদ্মরাগ ৩১১, ৪০১
পদ্মিনী উপাখ্যান ৪১৭
পবিত্র কোরানের সত্যতা ৩৪৯
পবিত্রবাক্য ৮০
পরমার্থ সঙ্গীত রত্নাকর ৩৭৫
পরাগাল খান ১১
পরিত্রাণ কাব্য ২৭২, ২৭৭, ৩১৩, ৩৯৩
পরিমল ৩২৩
পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৪০৭, ৪১৮
পর্দা ও মুসলমান সমাজ ৩৭১
পলাশীর যুদ্ধ ২৪৮, ৪১৭
পাদরী টিস্মান ২৬৮
পাদরী স্পার্জন ২৬৮, ৪৪৬
পাদ্ মনরো সাহেবের ধোকাভঞ্জন ২৯২
পান্দনামা ২৬৯
পারসী শিক্ষা ৩৫৪
পাষণ্ড দলন বা সমাজ রহস্য ৩৭৫
পিলগ্রিমশিপ বিল ১৫৯
পুরুষ প্রসঙ্গ ৩৩৭
পুষ্পহার ৩৬৪
পুষ্পোদ্যান ৩৩০
পূর্ণিমা, (পত্রিকা) ২৮৯
পূর্ববঙ্গ ও আসাম মুসলমান শিক্ষা সমিতি ৭৬, ২৬৪
পৃথ্বিরাজ ৭০
প্রচার ৩৬৩, ৩৯৩, ৪৪৫, ৪৪৯
প্রচারক ৭৫, ৭৮, ২৪৬, ২৫৫, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৯৩–৯৪, ৪৪৯, ৪৬৭
প্রণয় কি পদার্থ ৩২৯
প্রণয় কুসুম ৩৭২
প্রণয়যাত্রী ২১৯, ২৫৮, ২৬০
প্রতাপাদিত্য (রাজা) ৩৬
প্রতাপাদিত্য, নাটক ৪২৩
প্রফেট অব ইসলাম এণ্ড হিজ টিচিং ৩৫৩
প্রবন্ধ কৌমুদী ২৫৫
প্রবন্ধমালা ৩১৬
প্রবাসী ৩০০
প্রবাসের স্মৃতি ২৯৫
প্রবোধ সঙ্গীত ২৪২, ২৪৩
প্রবোধ-সুধাকর ৩৬৯
প্রভাকর ১৭৪
প্রমত্তপ্রেমিক হাফেজের উক্তি ৩৭২
প্রসন্ন কুমার ঠাকুর ১১৫

প্রাইমারী এডুকেশন ইন রুরাল এরিয়াজ ৭৭, ৩৫৮
প্রাদেশিক বঙ্গীয় মুসলমান শিক্ষা সমিতি ৬৬
প্রাণ কাঁদে কেন ৩৩৬
প্রেম কুসুম ৩৭৬
প্রেম খেলা ৩৭৬
প্রেমদর্পণ ৩৪৩, ৪২৬
প্রেম পাগল ৩৬৩
প্রেমাবলী ৩৩২
প্রেমের স্মৃতি ৩১২, ৩১৪
প্রেমের হার ২৬২
প্যান-ইসলাম ২২০, ২৫৪, ৩০৬, ৫১৬, ৫২৮-৩১
প্যারিচাঁদ মিত্র ২২৭, ৪৯৫

ফ

ফখরুদ্দীন মোবারক শাহ ৬
ফজল করিম ৩৭২
ফজলুর রহমান ৩৩৩, ৪৩৪
ফজলুর রহমান খান ২৪৯
ফতুহুল মেসের ৩৩৪
ফতুহুস সাম ৩৩৪
ফতুয়ায়ে আলমগীরী ২৩৯, ৪৫৯
ফররুখ শিয়র ২১
ফরিদপুর দর্পণ ৩৭৭
ফয়জুন্নেসা চৌধুরাণী ৮১, ৩২৭-২৮, ৩৮১, ৩৮৭, ৪৯৮
ফারায়েজী আন্দোলন ১৭, ৩৭, ২০৯, ৪১৬, ৪৩৯, ৫১৯
ফালনামা ৩৭৪
ফুলার হোস্টেল ৪৯০
ফুলের মালা ৩৫৯
ফেরদৌস চরিত ২৬৪, ২৬৫, ৩৪২
ফেসানা-এ-দিলকস ১০৩
ফ্রেডারিক জেমস হ্যালিডে ৮৭
ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ ২২, ২৭, ৩৫, ৯১, ২০৭, ২০৯
ফৌৎ আইন ২৪
ফ্রোবেলের শিক্ষানীতি ২৮৭

ব

বক্তৃতা ও মন্তব্য ৩৭৫
বক্ষঃপীড়া ৩৩৩
বখতিয়ার খিলজি ১, ৯
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ৫৪, ৬৯, ৭০, ২১১, ৪১৭
বঙ্গদর্শন ২২৬, ২৪২, ৩২৮, ৫০২
বঙ্গবাসী ২৪৮
বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ৮৩
বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সমিতি ৩৬, ১১৬
বঙ্গানুবাদ কোরান শরিফ ৩৩৪
বঙ্গানুবাদিত কোরান শরিফ ২৩৯
বঙ্গানুবাদিত তফসীর হাক্কানী ৩৬৩
বঙ্গীয় ইসলাম মিশন সমিতি ১৮৭-৮৯, ২৫০, ৩০৪, ৪৫৩
বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলমান শিক্ষা সমিতি ১১০, ১১২, ১৬৪, ১৮০-৮৭, ২৫০, ৩০৪, ৩৫০, ৩৫৮, ৪৯৩, ৪৯৯
বঙ্গীয় মুসলমান ১৫২, ২৮৪-৮৬, ৪১১, ৬০৫
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা ১৭৩, ২৪৯, ৩০৩
বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-সমিতি ১৭৩, ২৬১
বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ ২৬১, ২৬৭, ২৮৮
বঙ্গীয় সাহিত্য বিষযিনী মুসলমান সমিতি ৭৬, ১৭১
বজলুর রহিম ১১৩, ১৭০
বটতলার সাহিত্য ৬৭
বড়পীর সাহেবের জীবনচরিত ৩৪৬
বদরুদ্দোজা চৌধুরী ৩৫৯-৬০
বদরুল আনোয়ার ৩৬০
বদরুল ইসলাম ৩৬০
বদরুল মাআরেক ২৬০
বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা ৩২০
বর্গী হাঙ্গামা ৪৩
বর্ধমান মহামেডান এসোসিয়েশন ১৪৬
বসন্তকুমারী নাটক ২২৫, ৩২৫, ৫০৬, ৫৮৮
বসুমতী ২৬৫
বাউল ধ্বংসে ফৎওয়া ৪৬১
বাউল সঙ্গীত ৩২৯
বাঁশের কেল্লা ৩৭
বাকুরাতল আদব ১১২

বাকরগঞ্জ জেলার মুসলমান শিক্ষা সমিতি ১৮৫
বাঙ্গালাব মুসলমানগণের আদিবৃত্তান্ত ৯৫, ২৪৬
বাঙ্গাল গেজেট ৩৭৭
বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ ২৮৮
বারবক শাহ ১১
বান্ধব (পত্রিকা) ২২৭, ২৬২
বাল্যচিকিৎসা ৩২৩
বালারঞ্জিকা ৩২৪, ৩৭৭
বাল্যখেলা ৩৪১
বাল্য বিবাহের বিষময় ফল ৪০৭
বাসনা (পত্রিকা) ৩১২, ৫১৭, ৫৩২
বিদ্যাসুন্দব ১৮
বিধবাগঞ্জনা ও বিষাদ-ভাণ্ডাব ২৬৯, ২৭০, ৪০৫, ৪৫৯
বিধবাবিলাস ৩২২
বিধবার মনেব কথা ৩২৯
বিপিনচন্দ্র পাল ৮২, ২৪৭, ৫৩২
বিবি কুলসুম ২২১, ২৩৬
বিবি খোদেজার বিবাহ ২৩১, ২৩৩, ২৩৫
বিবিধ উপদেশ সম্বলিত প্রাচীন প্রবাদ ও খনার বচন ৩৫৫
বিরহ দর্পণ ৩৭০
বিরহ বিলাপ ২৪৭
বিরহ যাতনা যৌবন বিলাপ ৩৭৪
বিরাগ সঙ্গীত ২৪২, ২৪৩
বিলাতি বর্জন রহস্য ২৬৭
বিলাপ তরঙ্গিনী ৩৭৪
বিশুদ্ধ খতনামা ২৯৪
বিশ্বকোষ ৪১৯
বিষাঙ্কুব কাব্য ৩৪৯
বিষাদ-সিন্ধু ৮১, ২১৮, ২২১, ২২৭-২৮, ২৯৯, ৫৮৭, ৬০৪
বিয়ে পাগলা বুড়ো ৩২১
বুড়ো শালিকেব ঘাড়ে রোঁ ৩২১, ৩২৫
বুদ্ধদেব ৭২
বৃহৎ সোলেমানী পঞ্জিকা ৩৭৬
বেগম শামসি জাহান ফেরদৌস ১১২, ১৬৩, ১৮৩
বেঙ্গল সোস্যাল সায়েন্স এসোসিয়েশন ৮৮, ৪৯৫
বেথুন সোসাইটি ৩৬, ১১৬, ৪৪৪
বেন্টিঙ্ক, লর্ড ৩২, ৫০, ৪৭৯
বেদান্তসার ২০৭
বেল ইসলামিয়া বোর্ডিং ৮৪, ১০৩, ৪৮৯
বেলায়েত আলী ৩৭১
বেলায়েত হোসেন ৩৭৫
বেহুলা গীতাভিনয় ২৩০
বেহুলা নাটকাভিনয় ৩৭১
বোধোদয় ২৬৮, ২৭৩
বোধোদয়তত্ত্ব ২৭৯, ৪৮৪
বোরহানুদ্দীন আহমদ ৩৭৩
বোস্তাঁ ৯২
ব্যোমকেশ মুস্তাফি ৩৫৯
ব্রজবালা ৩৬৯
ব্রজেন্দ্রকুমার বিদ্যারত্ন ৩২৫
ব্রাহ্মসভা ৩৬
ব্রাহ্মণ সেবধি ৩৭৭, ৪৫৪
ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ৩৬, ১২০, ৩৯৭
ব্লুমফীলড ফুলার ১১১

ভ

ভক্তি-মঞ্জরী ৩৭২
ভগ্ন আশা ৩৭০
ভগ্নবীণা বা ইসলাম চিত্র ৩১২
ভণ্ড ফকীব ৪৬৩
ভাবলাভ ৩১৮
ভাবতবর্ষে মুসলমান রাজত্বেব ইতিহাস ৩৫২
ভারতবর্ষের ইতিহাসের প্রশ্নোত্তর ৩২৪
ভারতী ৩৫২, ৩৫৮, ৪১৮, ৪২০
ভারতী ও বালক ২২৯, ২৩১
ভার্নাকুলার এডুকেশন ইন বেঙ্গল ৭৭, ১৭১, ৩৫৮, ৪৮৪, ৫১২
ভার্নাকুলার লিটারেবী সোসাইটি ২০৮
ভাসান যাত্রা ও বেহুলা-লক্ষ্মীন্দরের সংহার জীবনী ৩৭৫
ভিক্টোরিয়া, মহারাণী ৩৫, ৮৮, ১৯৭, ৫২২, ৫৩০
ভিক্টোরিয়া ইসলাম হোস্টেল ৪৯০
ভিভিয়ান ডিরোজিও ১১৬
ভীষক-দর্পণ ৩৩০
ভূতনাথ ভাদুড়ী ৪১৮
ভূ-পৃষ্ঠ পরিচয় ৩৩৬, ৩৩৭
ভুবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ২৩৬

ভুবন-ভ্রমণ ৩৬৭
ভূম্যধিকারী সভা ৩৬
ভ্রমণ ৩৭৪
ভ্রাতৃবিলাপ ২৯৭

ম

মঈনুদ্দীন আহমদ ৩৬৯
মকবুল আলী ৩৩৯-৪১
মখজুল উলুম ৯০
মজিদ বখত মজুমদার ১৯৮
মতিচূর ৮০, ৩১০, ৪০১, ৪৯৮, ৫৮৭
মতীয়র রহমান খান ২৯৪-৯৫, ৩৯৩
মধুমালতী ১৮
মধু-মিয়া ৩৬২, ৩৯৪
মধু-সঙ্গীত ৩৬২
মধুসূদন দত্ত ৭০, ২৯৭, ৪৪০
মনসুব হল্লাজ ১৬, ৪৩৮
মনাজাত ৩৫৬
মনোজ্ঞ কাহিনী ৩৬৯
মনোমোহন গোস্বামী ৪২৩
মনোরমা ৩৮৮
মনোহর ফেঁসড়া ৩২০
মশীয়তউল্লা ৩৭২
মসলা বিভ্রাট ৩২৮
মহসীন ফাণ্ড ৫০, ৫১, ৮৬, ১৩৫, ৪৮০, ৪৮১
মহম্মদি আখবার ৫৩০, ৫৩১
মহম্মদীয় ল'য়ের সরল প্রক্রিয়া ৩৭১
মহরম উৎসব ১১, ৩৩৪
মহররমাত ৩৭৫
মহরম শরীফ ২৪৯
মহর্ষি মনসুর ২৬৪
মহর্ষি লোকমানের শত উপদেশ ৩৫৯
মহাত্মা হজরত ইমাম আবু হানিফা সাহেবের জীবন চরিত ৩৫৪
মহামেডান ইউনিয়ন স্পোর্টিং ক্লাব ১৭৭
মহামেডান এডুকেশন ইন বেঙ্গল ৫২, ৩৫২, ৪৮৪
মহামেডান এডুকেশনাল কনফারেন্স ৭৬, ৭৯, ১০২, ১৪৯, ১৭১, ১৮০
মহামেডান এলগিন স্পোর্টিং ক্লাব ১৬৫-৬৬
মহামেডান এসোসিয়েশন ৩৪, ৬৭, ৫২২
মহামেডান প্রভিন্সিয়াল ইউনিয়ন ১৫৪
মহামেডান রিফর্ম এসোসিয়েশন ১০৮, ১৩৮, ১৩৯, ১৬৬-৬৯, ৫৯৬
মহামেডান লিটারেরী একাডেমী ১৯১
মহামেডান লিটারেরী সোসাইটি ৩৪, ৪৫, ৪৭, ৬৫, ৬৭, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ১২১-৩০, ১৬১, ১৭৩, ৩৯৮, ৪৩৪, ৪৭৪, ৫০৫, ৫২২
মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১১৭, ১৬৪-৬৫
মহাশিক্ষা ৩০৮
মহাশ্মশান ২১৮, ২৪৭, ২৪৮-৪৯, ৪১২
মহীপুর দায়রাজ জমাত ১৬১
ময়েজউদ্দীন আহমদ ৩৬২, ৩৯৩, ৪৮৭
মাগন ঠাকুর ১১, ১৮
মাতা ভিক্টোরিয়া ৩৭৪
মাদ্রাসা লিটারেরী এণ্ড ডিবেটিং ক্লাব ১৩০
মানব সংস্কারক ৩২৮
মানব-সুহৃদ বা চতুর্দ্দশ নীতিরত্ন ৩৫০
মানসাঙ্ক ও শুভঙ্করী সম্বলিত ধারাপাত ৩৪৪
মানসিংহ (কাব্য) ৩১২, ৩৯৩
মানিকউদ্দীন আহমদ ৩৫৫
মার্ক্স, কার্ল ৩৮
মালদহ মহামেডান এসোসিয়েশন ১৪৭
মাসায়েলে এসলাম ৩৭৬
মাহমুদ আলী খান পন্নী ৩৮০
মাহমুদন্নবী ২০১
মায়াদনোল উলুম ১০৭
মিজানুল হক ৪৪১
মিন্টো, লর্ড ১২৭, ৪৪১
মিফতাহুল ইসরার ৪৪১
মির্জা আবুল ফজল ১৮৬
মির্জা মোহাম্মদ ইউসুফ আলী ১৪৪, ১৫৫, ১৫৭, ২৫০-৫২, ৩৯৪, ৪৯০, ৫১২
মির্জা সুজাত আলী বেগ ১১২, ১১৭, ১৬২, ১৭৩, ১৮০, ৪৯৭
মিহির ৩৮৭-৮৮

মিহির ও সুধাকর ৭৫, ৮৪, ১০৩, ১০৫, ১৪৯, ১৭৪, ২৫৫, ২৫৯, ২৭২, ২৯৯, ৩৫০, ৩৮৮–৮৯, ৫০০, ৫১৪, ৫৩২
মীর আতাহার আলী ৩৮০
মীর আশরাফ আলী ৩২৩–২৪
মীর কাসেম ২১
মীর জাফর ১১, ২৯
মীর মদন ১০
মীর মশাররফ হোসেন ১৪, ৬৮, ৭৯, ৮১, ১৩৮, ১৯৪, ২২১–৩৭, ৩৫৯, ৩৮৪, ৪০০, ৪২৮, ৪৩০, ৪৬২, ৪৯১, ৫০৬, ৫৩৩
মীর মোহতেশাম হোসেন ৩৮৫
মীর মোহাম্মদ আলী ৭৯, ১৩৩
মীরাৎ-উল-আখবার ৪৭৪
মুকরম খান ৪৩৭
মুকুন্দরাম ১১
মুক্তার হার ৩৭৩
মুখজুল উলুম ৪৭৪
মুখলেসুর রহমান ৩৭৪
মুজাম্মিল ১৮
মুন্সী মিএগ ৩৭০
মুন্সী মোহাম্মদী ৩২৪
মুর্শিদকুলী খাঁ ১০
মুসলমান (পত্রিক) ২৭৬
মুসলমান বন্ধু ১৪৩, ২৬২, ৩৩৩, ৩৮১
মুসলমান শিক্ষা সমবায় ২৫০
মুসলমানের ধর্মবিবরণ ৩৭২
মুসলমানের বাঙ্গালা শিক্ষা ৪৯১
মুসলিম গার্লস স্কুল ১১০
মুসলিম রিভিউ ১৮০
মুসলিম লীগ ৭৭, ১৯২, ৩৯৮
মূল্য প্রকাশিকা ৩৭৪
মেকলে, লর্ড ৩৩, ৪৭৯
মেঘনাদবধ কাব্য ২৯৮
মেটকাফ, স্যার ২১
মেদিনীপুর মোসলেম লিটারেরী সোসাইটি ২০৫–০৬, ৩৪৯
মেদিনীপুর মোসলেম সোসাইটি ১৯০
মেনহাজুল আবেদীনের বঙ্গানুবাদ ৩৩৯, ৩৪০
মেময়ার্স ৯৮
মেমোন বিল ১২৭
মেসবাহুল মসলেমিন ৩৩৪
মেহের চরিত ১৫৬, ২৯৩
মেহেরুল এসলাম ২৬৯, ৩৭৩, ৪৬২
মেয়ারাজউদ্দীন আহমদ ৭৯, ৩৪১–৪৩, ৩৮২
মেয়ারাজল জিন্নাত ৩৭৩
মেয়ো, লর্ড ৫১, ৯৬, ১২৩, ৫২১
মোক্ষপ্রাপ্তি ২৯৪
মোখতার হোসেন আনসারী ৩০৬
মোজাফফর আহমদ ৫০৮
মোজাম্মেল হক ৬৮, ১২২, ১৭২, ২০৪, ২৬১–৬৭, ৩৪২, ৩৮২, ৩৮৮, ৩৯৪, ৪৮৫
মোল্লা খোদাদাত ৩৫৬
মোশাররফ হোসেন ১১৪
মোসলমান শিক্ষাসভা ১০৭, ১৭৬–৭৭
মোসলেম ইনস্টিটিউট ১৭৯
মোসলেমউদ্দীন খান ১৬০, ৩৪৮–৪৯, ৩৮৫
মোসলেম ওয়ার্লড ৪৪৫
মোসলেম ক্রনিকল ১০৬, ১১০, ১১৩, ১৩৭, ১৩৮, ১৬২, ১৬৩, ১৬৫, ১৭৭, ১৯৮, ২৮৬, ৪১০, ৪২৮, ৪৪৫, ৪৬৪, ৫২৬
মোসলেম জগতে বিজ্ঞানচর্চা ৩১৬
মোসলেম জাতির ইতিহাস ৩৬৮
মোসলেম জাতীয় সঙ্গীত ২৮৪, ২৮৭
মোসলেম ডিবেটিং সোসাইটি ১৭৯
মোসলেম পতাকা : তারিখুল ইসলাম ৩৬৮
মোসলেম-প্রতিভা ২৬৬
মোসলেম বীরত্ব ৬৮
মোসলেম সমাজ ৩৭৪
মোসলেম সমাজ সমালোচনা ৩৩২
মোসারত আলী খান ৩৫০
মোহনলাল ১০
মোহাম্দ অখিলুদ্দীন ৩৫০, ৪০৫
মোহাম্মদ আখতার জামান ৩৭৬
মোহাম্মদ আগা খান ৪০৩
মোহাম্মদ আফতাবউদ্দীন আহমদ ৪৮৭
মোহাম্মদ আবদুর রউফ ১১৮
মোহাম্মদ আবদুর রহিম ৩৭৬
মোহাম্মদ আবদুল আজিজ ৮৪, ৩৬১–৬২

মোহাম্মদ আবদুল ওহাব চৌধুরী ৩৭৬
মোহাম্মদ আবদুল করিম ৩২৫
মোহাম্মদ আবদুল কাদের ৩৩০
মোহাম্মদ আবেদিন ৩২৬
মোহাম্মদ আব্বাস আলী ৩৩৩
মোহাম্মদ আশরাফুদ্দীন ৩৭৬
মোহাম্মদ আসাদ আলী ৩০৫, ৩৯৫
মোহাম্মদ ইউসুফ ১৬৫, ১৬৬
মোহাম্মদ ইব্রাহীম ৮৪
মোহাম্মদ ইব্রাহীম খাঁ ৩৪৭
মোহাম্মদ ইসমাইল ১৯২, ১৯৫, ৩২২-২৩, ৪৭০
মোহাম্মদ ইসহাক ৪১৯
মোহাম্মদ ইয়াকুব ৩৪৭-৪৮
মোহাম্মদ ইয়াকুব নূরী ২৬০
মোহাম্মদ ইয়াসিন ১৪৬, ৩৭৪
মোহাম্মদ উম্মর ৩৩৭
মোহাম্মদ এবরার আনসারী ৪৫২
মোহাম্মদ এহসানউল্লা ৩৩৬, ৪৪৭
মোহাম্মদ ওয়াজ্জিহ ১১৮, ১২১
মোহাম্মদ করম চাঁদ ৪০৩, ৪০৬
মোহাম্মদ কাজেম আলী ৩৫০
মোহাম্মদ খান ১৮
মোহাম্মদ গোলাম লতিফ ৪৫৩
মোহাম্মদ জান ১৮
মোহাম্মদ তৈয়ব ৮৪
মোহাম্মদ দায়েম ৫৪
মোহাম্মদ নইমদ্দীন ৬৮, ৭৮, ১৫৯, ২৩৭-৪১, ৩৮০, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩২, ৪৬৫, ৪৬৭
মোহাম্মদ নজিবর রহমান ২৬৭-৬৮
মোহাম্মদ ফসিহ ৪৬৮
মোহাম্মদ ফাররুক শাহ, প্রিন্স ১৩৩, ১৩৬
মোহাম্মদ বখত মজুমদাব ৮২-৮৩
মোহাম্মদ বখতিয়ার শাহ ৪৯৭
মোহাম্মদ বদিউল আলম ১৯৪
মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ ১৯৯, ২০০
মোহাম্মদ বিন আবদুল ওহাব ৪৩৯
মোহাম্মদ মজহর ৩৪, ১১৮
মোহাম্মদ মনিরুজ্জমান ইসলামাবাদী ৬৬, ১৬২, ১৮৬, ১৮৭, ২০৩, ২৫০, ৩০০-০৫, ৪০০
মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ ৬৬, ৬৮, ১৫৬, ১৭৫, ২০০, ২৫০, ২৬৮-৭২, ২৯৪, ৩০৭, ৪৪৫, ৪৮১
মোহাম্মদ মহসীন ২১৯
মোহাম্মদ রইসুদ্দীন ৩৬৯
মোহাম্মদ রওশন আলী ৩৭৫
মোহাম্মদ রওশন আলী চৌধুরী ১৮৭, ১৮৮, ২০৬, ৩৯০, ৪৫৮
মোহাম্মদ রহিম বক্স ৩৫৩-৫৪
মোহাম্মদ রেজা খান ২৯, ১১২
মোহাম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ৬৬, ৬৮, ৭৮, ১৫১, ১৬২, ১৭১, ২০৩, ২০৫, ২৫১, ২৫৩, ২৭৩-৮১, ৩০৩, ৩৮২, ৩৮৫, ৩৮৯, ৪০৩, ৪২৭, ৪৩৩, ৪৮৫, ৫১৪
মোহাম্মদ শাহ সাহাবউদ্দীন চিশতী ৩৭৬
মোহাম্মদ সমিরুদ্দীন ৩৬০
মোহাম্মদ সাসু ৩৭০
মোহাম্মদ সোলায়মান ১৬২
মোহাম্মদ সোলেমান ৩৭৬
মোহাম্মদ হবিবর রহমান ৩৮৮
মোহাম্মদ হানিফউদ্দীন ৩৭১
মোহাম্মদ হেদায়েতউল্লা ১০০, ৪১৪, ৪৫৩
মোহাম্মদি আখবার ৩৭৯-৮০
মোহাম্মদীয় ধর্মসোপান ৩৬৫
মোহিনী প্রেম-পাশ নাটক ৩২৯
মৌলুদ শরিফ ৬৮, ৭৭, ২২৩, ২৩৩, ৩৫৬-৫৭, ৩৭৩
মৌলুদ শরীফ ও হজরত চরিত ৩৪৫
ম্যাগনাকার্টা ৫১
ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান ১০৫

য

যকৃৎ, প্লীহা, মূত্রপীণ্ড ও তদনুসঙ্গিক অন্যান্য যন্ত্রসকলের পীড়া ৩৩৩
যজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৩৩১
যদুনাথ বসু ৫৪
যমজ ভগিনীকাব্য ও সিরাজদ্দৌলা ২১৮, ৩৬৭
যমুনা ২৯৪

যমুনা পুলিনে তুই অনাথিনী ৩৭১
যীশুখ্রীস্ট ৭২
যুবক রঞ্জিনী ৩৭০
যোগ কালন্দার ২৯০
যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার ২৫৩
যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ ১৯৭, ৪২৭
যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ৪২৪

র

রইস ও রায়ত ৫০৬
রংপুর ইসলাম মিশন ৭৮, ২০৩
রংপুর দিক প্রকাশ ৩১২
রংপুর মহামেডান এসোসিয়েশন ৭৮, ১৪৪, ১৪৫, ৫৯২
রঙ্গপুর নূরল ইমান জামায়াত ১৬০–৬১
রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ৬১, ৪১৭
রজনীকান্ত গুপ্ত ২৭৩
রজব আলী ২৮, ২০৮, ৩৭৭
রত্নবতী ২২৪–২৫
রদ্দে খ্রীস্টিয়ান ও দলিলোল এসলাম ২৬৯
রদ্দে নাসারা ও আখলাকে জমিরিয়া ২৯২
রদ্দে হানাফী ও মজহাব দর্পণ ৪৬৯
রফা ইদায়েন ২৪০, ৪৬৫
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ৭০, ২৯৮, ৩৫২, ৩৫৮, ৪১৮, ৫৩২
রমেশচন্দ্র দত্ত ৬৯, ৯৯, ২৮৬
রসিক প্রধান ৩৭১
রহমতুল্লাহ চৌধুরী ৮৩
রহস্য সন্দর্ভ ৩৭০
রহিম বক্স পেস্কার ১৯৮
রহিমন্নেসা ৮৪
রয়েজুদ্দীন আহমদ ৮৩
রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১০২
রাখালরাজ রায় ২৫৩
রাজদুর্লভ ২৪
রাজদর্পণ ৩৭০
রাজবল্লভ ১০
রাজশাহী জেলা মুসলমান শিক্ষা সমিতি ২৫০
রাজশাহী সভা ১৪৪
রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র ২০৭
রাজিয়া খাতুন ৩৮৫
রাজেন্দ্রলাল মিত্র ১২২
রাণাপ্রতাপ সিংহ ৭০
রাধাকান্ত দেব ১১৬, ৪৪০
রাধিকার মানভঙ্গ ২৯০
রামগোপাল ঘোষ ১২১
রামপ্রাণ গুপ্ত ৭১, ৯১, ৪২৫
রামমোহন রায় ৩৫, ৩৮, ৪৫, ১১৫, ২০৭, ২৯১, ৩৭৭, ৪১৪, ৪৪০
রামাই পণ্ডিত ৮
রামায়ণ ১৯
রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ২৯০
রায়নন্দিনী ৪২৬, ৫১৫
রিপন, লর্ড ৫১, ৬৩, ১২৫, ১৩৪, ৪৮২
রিয়াজ-উল-সলাতিন ১০৬, ৪৭৪
রুকন উদ্দীন বারবক শাহ ১৯
রূপ-জালাল ৮১, ৩২৭
রেয়াজ-উল-ইসলাম প্রেস ২০৫
রেয়াজুদ্দীন আহমদ মাশহাদী ৭৬, ২৩৭, ২৫৩–৫৬, ৩৮২, ৫২৯
রৈসুন্নেসা খাতুন ১৯৩
রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন ৮০, ৩১০–১১, ৪০১, ৪৯৮, ৫০০
রোজা ৩৩৯, ৩৪০
রোজাতত্ত্ব ২৫৮

ল

লতিকা ৩১৬
লহরী (পত্রিকা) ২৬৬, ৩৯৪, ৫১৪
লাইফ অব মহম্মদ ১০০, ৪৪৩
লাইফ অব মহামেডান ৬৫
লাইফ এণ্ড টিচিং অব দি প্রফেট ৪৪৩
লাল ইস্তেহার ১৯০, ৩৪৭
লা-মজহাবিগণের ধোকাভঞ্জন ২৩৯
লালচাঁদ ২৯৫
লালন শাহ ৪৬০
লায়লী-মজনু ১৯, ২৭৭, ৩১২, ৩৯৩
লিগ্যাল স্ট্যাটাস অব উইমেন ইন ইসলাম ৯৮
ল্যাণ্ডসডোন, লর্ড ১৩৬
ল্যাণ্ডহোল্ডার্স এসোসিয়েশন ৩৬, ১১৬, ৩৯৭

শ

শকুন্তলা ২০৮
শব-ই-মিরাজ ১৮
শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ৫৩১
শরীয়তুল্লাহ, (হাজি) ১৭, ৩৭, ৫৯, ৪৭৬, ৫২৭
শরেহ্ বেকায়া ৩৭৪
শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ২৭৬
শশিশেখর রায় ৪২৭
শান্তিনিকেতন (উপন্যাস) ৩৪৪
শামশ-ই-জাহান ফেরদৌস মহল ৪৯৬
শাহ আবদুল্লা ২৬৯, ৩৬৬, ৪৪৭, ৪৫১
শাহ আলম ২১, ৩৪
শাহ ওয়াজেদ আলী ৪৪
শাহ ওয়ালিউল্লাহ ৪৩৯
শাহ গোলাম রহমান ৩৭২
শাহনামা ২৩০, ২৬৪, ৩৮৮
শাহ মোহাম্মদ কলিমুদ্দী ৩৭৫
শাহ মোহাম্মদ সগীর ১৭, ১৯
শাহাদাতনামা বা মহরম পর্ব ৩৪৫
শাহাবুদ্দীন আহমদ ১৯২
শিক্ষা প্রচার ৩৪৮
শিক্ষা সোপান ৩৬৬
শিবনাথ শাস্ত্রী ৪২০
শিবমন্দির ২৪৯, ৫১৬
শিবজী বা সাজাদী রোশিনারা ৪২৩
শিবলী নোমানী ৩০৩
শিবাজী ৭০, ৫৩২
শিবাজী উৎসব ৬৪, ৫৩১-৩৩
শিল্প বিপ্লব ২১, ৭২
শিশু ব্যাকরণ ৩৭৩
শীলভদ্র ৭
শূন্যপুরাণ ৮
শুভকবী ১৭৪
শেখ আজিমদ্দী ৩২১
শেখ আবদুর রহিম ৬৬, ৬৮, ৭৯, ৯৪, ১১০, ২১৯, ২৩৭, ২৫৬-৬১, ৩৮২, ৩৮৭, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯২, ৫০৮
শেখ আবদুল কাদের ৩৭৪
শেখ আবদুল লতিফ ৩২৮-২৯
শেখ আবদুল্লাহ কুইলিয়ম
শেখ আবদুস সোবহান ১০০, ২৮১, ৪১০, ৪১৯, ৫০৯
শেখ আলীমুল্লাহ ২৮, ২০৮, ৩৭৭
শেখ ওসমান আলী ৬৮, ২৯৫-৯৭, ৫৩২
শেখ কবির ১৭
শেখ গোলাম সোবানী ৩৭১
শেখ চান্দ মোহাম্মদ সরকার ৩৭৪
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন ৬৮, ৮৪, ১৫৬, ২৬৮, ২৭২, ২৯১-৯৪, ৪০৫, ৪৪৫, ৪৫০
শেখ জালালউদ্দীন তাব্রিজী ২
শেখ জোহাদ রহিম ৩৪৯
শেখ ফজলুল করিম ৬৮, ২৭২, ৩১২-১৫, ৩৯৩, ৪১২
শেখ ফয়জুল্লাহ ১১, ১৭
শেখ বাবু ওরফে আহমদ ৩৬৯
শেখ মুত্তালিব ১৮
শেখ রেয়াজুদ্দীন আহমদ ৯৯, ৪৬৩, ৫০৭
শেখ রেয়াজুদ্দীন সরকার ৩৭৫
শেখ সাজ্জাদ করিম ৩৫৯
শেখ সাদী ৯৩
শেখ হেদায়েত বক্স ১৯৬
শের আলী আহমদ ৩৭৪
শের খান ১২৩, ৫২১
শৈশব কুসুম ২৮৪, ২৮৭
শোকানল ২৯৪
শোকার্ণব ৩৫৩
শোকোচ্ছ্বাস ৩৫০, ৩৭২, ৩৭৪
শোকোভারতী ৩৭৪
শ্যামসুন্দর দেবী ৪০৩
শ্রীকৃষ্ণ বিজয় ১৯
শ্রীমন্ত সদাগর ২৭৩
শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন ২০৭, ৪৪১
শ্রীহট্ট দর্পণ ১১৪
শ্রীহট্ট-নূর ৩৭৬
শ্রীহট্টের সম্মিলনী ৫০০
শ্রীহট্টের শাহ জালাল ৩৭৬
শ্রেষ্ঠ নবী কে ও মুনশীর ভুল ৪৫০
শ্রেষ্ঠ নবী হজরত ও পাদ্রীর ধোকাভঞ্জন ২৯৩
শ্লোকমালা ৪৩৪

স

সংক্ষিপ্ত মহম্মদ চরিত ১৪৯, ৩৬১
সংক্ষেপে বাহার ৩৭১
সংবাদ প্রভাকর ২২২, ২২৯
সংসার চমৎকার ৩৭১
সংখারাম গণেশ দেউস্কর ৫৩২
সঙ্গীত লহরী ৮১, ২২২, ২২৮, ৪৬২
সঙ্গীতসাব ৮১, ৩২৭
সচীত্র নামাজ দর্পণ ৩৪৫
সধবার একাদশী ২২৭
সমসামল মওয়াহেদিন ৪৬৮
সময় (পত্রিকা) ৩৮৮
সমাচার সভারাজেন্দ্র ২৮, ২০৮, ৩৭৭
সমাজ শিক্ষা ৭৬
সমাজ সংস্কার ৪৬৩
সমাজ ও সংস্কারক ২৫৪, ৩০৬, ৫২৯
সমাজ সম্মিলনী সভা ৯০, ১৫০
সমিনউদ্দীন আহমদ ৩৫৫
সমিরুদ্দীন আহমদ ৩৬৫
সরল পদ্য বিকাশ ৩১২
সলিমুদ্দীন আহমদ ৩৩২
সলিমুল্লাহ, নবাব ১৮৫, ৩৪৮
সহজ পারসী শিক্ষা ৩৭৩
সহবাস সম্মতি আইন বিল ১২৭
সহি বুখারী শরীফ ২৪১
সয়ফুল মোমেনিন ৪৬৮
শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল ১০৫, ৪০২, ৪৯৮
সাখাওয়াত হোসেন ৪০১
সাতক্ষীরা মুসলমান সহৃদ সম্মিলনী ১৫৬
সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ৩৬, ১১৬
সাধু সৌরভ ৩৩০
সাধু রহস্য ৩৭৫
সাবিত্রী প্রবন্ধাবলী ৪০৩
সারকথা ৩৭১
সারসংগ্রহ ২৪২
সাহিত্য প্রতিভা ২৮৪
সাহিত্য প্রসঙ্গ ২৬৭
সাহিত্য শিক্ষা ২৮৪
সি এ মার্টিন ৩৫৩
সি এইচ ক্যাম্বেল ১২৫
সি জে এস ফগুার ১৭৭, ৪৪১
সিটনকার ৩১
সিতাব রায় ২৯
সিদ্ধ দর্পণ ৩৭২
সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা ২৫৬
সিপাহী বিদ্রোহ ৩৪, ৩৭, ৪৭, ৮৫, ৮৭, ৯৬, ১২০, ৪১৬, ৪৮১, ৫০৪, ৫২০
সিমলা ডেপুটেশন ৭৭
সিরাজদ্দৌলা ১, ১০, ২১, ২৪, ৪০, ৪১৭, ৫১৮
সিবাজুল হেদায়েত ২৪১
সিরাজুল ইসলাম ৭৪, ৯৩, ১৩৩, ১৭০
সিসিল বিডন, স্যার ১২২, ৫০৬
সিহ্-নসর-জহুবি ১০৬
সুদকাহিনী ৩৭৬
সুদ প্রসঙ্গ ৩৭৪
সুধাকব ৮১, ১০৫, ১৪২, ১৫৭, ১৯৫, ২৫৭, ২৭৬, ৩৪১, ৩৪৪, ৩৫৬, ৩৮২-৮৪, ৪৩১, ৪৫৬
সুবার্বন মহামেডান এসোসিয়েশন ১৭৩-৭৪
সুরভি ২৬২
সুবিয়া-বিজয় ৭৬, ২৫৫, ৩৮৮, ৫৮৫
সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৬৪, ৬৯, ৯৭, ৯৯, ১৯৬, ২৪৭, ৫২৪
সুলতানার স্বপ্ন ৩১১, ৪৯৮
সুলতানে রুম ৩৭৪
সুলভ (পত্রিকা) ২৩০
সুলভ সমাচার ৪৩২
সুহেলী য়েমন ৩৬৯
সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরী ৩৭০
সূর্যাস্ত আইন ৩০
সেক শুভোদয়া ২
সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মহামেডান এসোসিয়েশন ৪৭, ৫১, ৬৩, ৬৫, ৬৭, ৯৫, ১০৩, ১০৬, ১২৬, ১৩১-৪০, ১৬১, ১৯৯, ৩৯৮. ৪৮২, ৫২২, ৫৬৭-৭১, ৫৯১
শাখা এসোসিয়েশন ১৪০-৪৯, ৫৭২-৭৬
সেরাজুদ্দীন আহমদ ১৯৮
সেরাতল মস্তাকিম ২৪১
সেরাতুল আসফিয়া ৩৭২
সৈয়দ আওলাদ হোসেন ১৮০
সৈয়দ আবুল কাসেম ৩৭১
সৈয়দ আবুল হোসেন ৩৬৭-৬৮
সৈয়দ আবদুর রউফ চৌধুরী ৮৪

সৈয়দ আবদুল আগফর ৩৩৪-৩৫, ৪৮৬
সৈয়দ আবদুল কুদ্দুস কমী ২০৪
সৈয়দ আবদুল গাফফার ২০০
সৈয়দ আবদুল গাফফার আলকাদরি ১৯০, ৩৪৯
সৈয়দ আবদুল জব্বার ৩৩৯
সৈয়দ আবদুল ফাত্তাহ ৪৬
সৈয়দ আবদুল বারি ১৯৬
সৈয়দ আবদুল মজিদ ১৯৯
সৈয়দ আবদুর রহিম ৩২৪, ৩৭৭
সৈয়দ আবদুল সোবহান চৌধুরী ১৪১
সৈয়দ আমানত আলী ৪৬৭, ৪৬৮
সৈয়দ আমীর আলী ৪৬, ৪৭, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫৪, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৭০, ৮৯, ৯৫-১০০, ১৩১-৪০, ১৭৮, ১৮০, ৩৫৩, ৪০৯, ৪৮২, ৪৯৬, ৫০৭, ৫২২
সৈযদ আমীর হোসেন ১৩৮, ১৬৪
সৈয়দ আলতাফ আলী ৮০
সৈয়দ আলাওল ১১, ১৮, ১৯
সৈয়দ আশরাফ উদ্দীন আহমদ ৪৬৪
সৈয়দ আসগর আলী দিলার জঙ্গ ১৬৬
সৈয়দ আহমদ, স্যার ৪৭, ৪৯, ৬৫, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯৬, ১১১, ১১৩, ১২২, ১৪২, ৩৯৩, ৪৪৩, ৫২১, ৫২৪
সৈয়দ আহমদ শহীদ ১৭, ৩৭, ৪৭, ৩৪১, ৪৩৯, ৪৭৬
সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ২০০, ২০৩, ৩০৬-১০, ৪০২, ৪১২, ৪২৬, ৫১১, ৫১৫
সৈয়দ এমদাদ আলী ১৩৮, ১৮৭, ২৩৫, ২৪৯, ৩০৫-০৬, ৩৯৫, ৪১১, ৪১৩, ৪১৮, ৪২২, ৪৯৩, ৫১১, ৫১৩
সৈয়দ এরফান আলী ৭৯-৮০, ২০১
সৈয়দ ওসমান আলী ১১৩, ১৭৪, ৩৮৯, ৪২৪
সৈয়দ ওয়ারেস আলী ৪৬, ৬৬, ৭৪
সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন ৬৬, ৭৪, ১১০-১১, ১৬২, ১৮০, ৪৯৭, ৪৯৯
সৈয়দ কেঁরামত আলী ৮৯, ৯০, ৪৭৪
সৈয়দ জামালউদ্দীন আফগানী ৯৮, ২৫৪, ৫২৮, ৫৪৩
সৈয়দ তোফাজ্জল হোসেন ৩৭১
সৈয়দ নওয়াব আলী চৌধুরী ৭৫-৭৭, ১৩৯, ১৪৭, ১৭১, ১৮৫, ১৯২, ২৬৪, ২৯৮, ৩৪৮, ৩৫৬-৫৮, ৪২১, ৪২৬, ৪৮৪, ৪৯৪, ৫১২, ৫১৬
সৈয়দ হামিদ বখত মজুমদার ১১৪
সৈয়দ মর্তুজা আলী ১১, ১৮
সৈয়দ মোয়াজ্জম হোসেন ৮৪, ১৫৯, ৪৯০
সৈয়দ মোহাম্মদ হোসেন ১৮৫, ৩৭৪
সৈয়দ রেয়াজতুল্লাহ ১০৪, ৪৭৪
সৈয়দ লুৎফর রহমান চৌধুরী ৩৭৪
সৈয়দ শামসুল হোদা ৬৬, ৭৪, ১০৪-০৫, ১৬৩, ১৮০, ১৮২, ৪৮৩, ৫২৬
সৈয়দ সুলতান ১১, ১৭, ১৮
সৈয়দ হাসিবুল হোসেন ৩৮১
সৈয়দ হোসসাম হায়দার চৌধুরী ১৮৪
সোম প্রকাশ ৮৮, ১১৯, ২৬২
সোলতান (পত্রিকা) ৭৮, ২৫০, ২৭৬, ৩০৩, ৩০৯, ৪৬৮
সোলায়মান কররানি ৩
সোহরাববধ কাব্য ২৯৪, ৩০০
সৌভাগ্য স্পর্শমণি ১৫৫, ২৫১, ৪৫৯
স্কুল বুক সোসাইটি ২৭, ৩৬
স্টুয়ার্ট কলভিন বেইলী, স্যার ১২৩, ১৪৪
স্টেনলি, লর্ড ১৬৮
স্ত্রী চিকিৎসা ৩২৩
স্পিরিট অব ইসলাম ৬৫, ৯৮, ২৫৭, ৪৫৩
স্বপ্নময়ী ৪১৮
স্বর্গারোহণ কাব্য ৩৬৮

হ

হকিকতে মুসলমানানে বাঙ্গালাহ ৪, ৯৪, ২৪৬, ৪৭৪, ৫২৮, ৫৩৬
হজ্জবিধি ২৫৮, ২৬০
হজরত ঈসা কে? ২৯২
হজরত ওমরের ধর্মজীবন লাভ ২৩৬

হজরত মহম্মদ (দ:) ১, ১২, ১৫, ১৬, ৭২, ৯৮, ২৫৮, ২৬২-৬৩, ৩৪২, ৩৮৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৪৩, ৪৫০, ৪৫৮, ৪৮২, ৪৯৫
হজরত মুহম্মদের জীবনচরিত ও ধর্মনীতি ২৫৮-৫৯, ৪৫৩
হজরত মোহাম্মদেব বেগানাহ থাকা বিষয়ে মুসলমান মৌলভী সাহেবগণের শিক্ষা ৪৫২
হবিবর রহমান ৩৮২
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ১০২
হরশঙ্কর মৈত্র ৩১২
হাড় জ্বালানী ৩২১
হাতেমের উপাখ্যান ৩২৪
হানাফী (পত্রিকা) ৪৬৫, ৪৬৯
হাফেজ (পত্রিকা) ৯৪, ৩৮৯-৯০, ৫২৫
হাফেজ মাহমুদ আলী খান পন্নী ৭৮-৭৯, ৩৪২
হাফেজ সাহেব ২৯৭
হাফেজ নিয়ামতুল্লা ৩৩৫
হাবলুল মতিন ৩০৩
হাবিলউদ্দিন ৪৬৯
হামিদউদ্দিন আহমদ ১১২-১৩, ১৪৬, ৫২৫
হামিদুল হক ৩৭০
হামিদুল্লাহ ৩৬৯
হারমিট বা উদাসীন ৩৩৩
হারুনর রশীদ ১
হার্ডিঞ্জ, লর্ড ৩২
হাসমতউদ্দীন আহমদ ৩৭১
হাসান শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৯০, ১৮০
হাসির তরঙ্গ ৩৬৪
হালিমউল্লা ৩৭০
হায়বে সেদিন কোথায় গেল ৩৬০
হিতকরী (পত্রিকা) ৩৪৮, ৩৮২, ৩৮৪-৮৫, ৫০৫, ৫১০
হিতকাব্য ১৬০, ৩৪৮
হিতসাধনী সভা ৯৩
হিন্দু কলেজ ২৭, ৫১
হিন্দুধর্ম রহস্য ও দেবলীলা ২৬৯, ২৭০-৭১, ৪৫৯
হিন্দু-মুসলমান সম্মিলনী ৭১
হিন্দু এবং মুসলমানের ধর্মশাস্ত্রেব মূলতত্ত্ব ৩২২
হিন্দুমেলা ১১৭, ৪৩৪
হিন্দুমোসলমান ১০০, ২৮১-৮২, ৪১০, ৪১৯
হিন্দুহিতৈষিণী ৪৫৬
হিন্দু-জ্ঞান প্রদ ৩৭২
হুগলীর পুল বিবরণ ৩৭১
হুমায়ুন, বাদশাহ ১৫, ৪৩৭
হুসেন শাহ ১১
হৃদয় সঙ্গীত ৩৪৩
হেদায়েতল ফাসেকিন ৪৬২
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৫, ২৪৮, ৩৬৮
হেমায়েতউদ্দীন আহমদ ১০৩-০৪, ১৫৩, ১৫৮
হেলালউদ্দীন খান ৩৭৪
হেঁয়ালী কৌমুদী ৩৩২
হোমিওপ্যাথিক সরল সংক্ষিপ্ত মেটেরিয়া মিডিকা ৩৭৫
হ্যালিডে, স্যার ১২০

আলী নওয়াব চৌধুরী

হাফিজ মাহমুদ আলী খান পন্নী

নবাব আবদুল লতিফ (১৮২৮–১৮৯৩)

ওবায়দুল সোহরাওয়ার্দী (১৮৩২-১৮৮৬)

খোন্দকার ফজলে রাব্বি (১৮৪৮—১৯১৭)

সৈয়দ আমীর আলী (১৮৪৯–১৯২৮)

হেমায়েতউদ্দীন আহমদ (১৮৬০–১৯৪১)

আবদুস সালাম (১৮৬১–১৯৪১)

সৈয়দ ওয়াহেদ হোসেন (১৮৭০–১৯৩৪)

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০–১৯৩২)

আবদুল আজিজ (১৮৬৩–১৯২৬)

সৈয়দ শামসুল হোদা (১৮৬২-১৯২২)
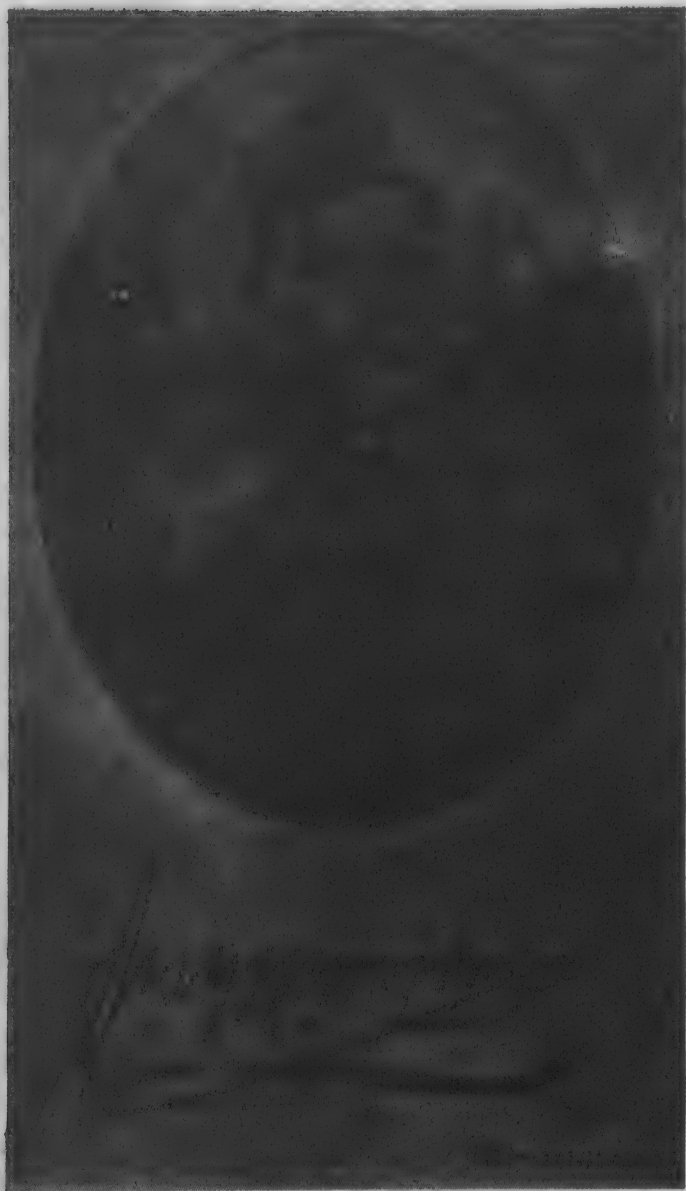
আবদুল করিম বিএ (১৮৬৩–১৯৪৩)

আবদুর রহিম (১৮৬৭-১৯৫২)

আবদুর রসুল (১৮৭৬–১৯১৭)

মীর মশাররফ হোসেন (১৮৪৭-১৯১২)

কায়কোবাদ (১৮৫৮–১৯৫২)

শেখ আবদুর রহিম (১৮৫৯-১৯৩১)

শেখ ফজলুল করিম (১৮৮২-১৯৩৬)

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ (১৮৬৯-১৯৫৩)

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন (১৮৭০–১৯৩০)

কাজী ইমদাদুল হক (১৮৮২-১৯২৬)

শ্রীমোজাম্মেল হক্ কর্তৃক
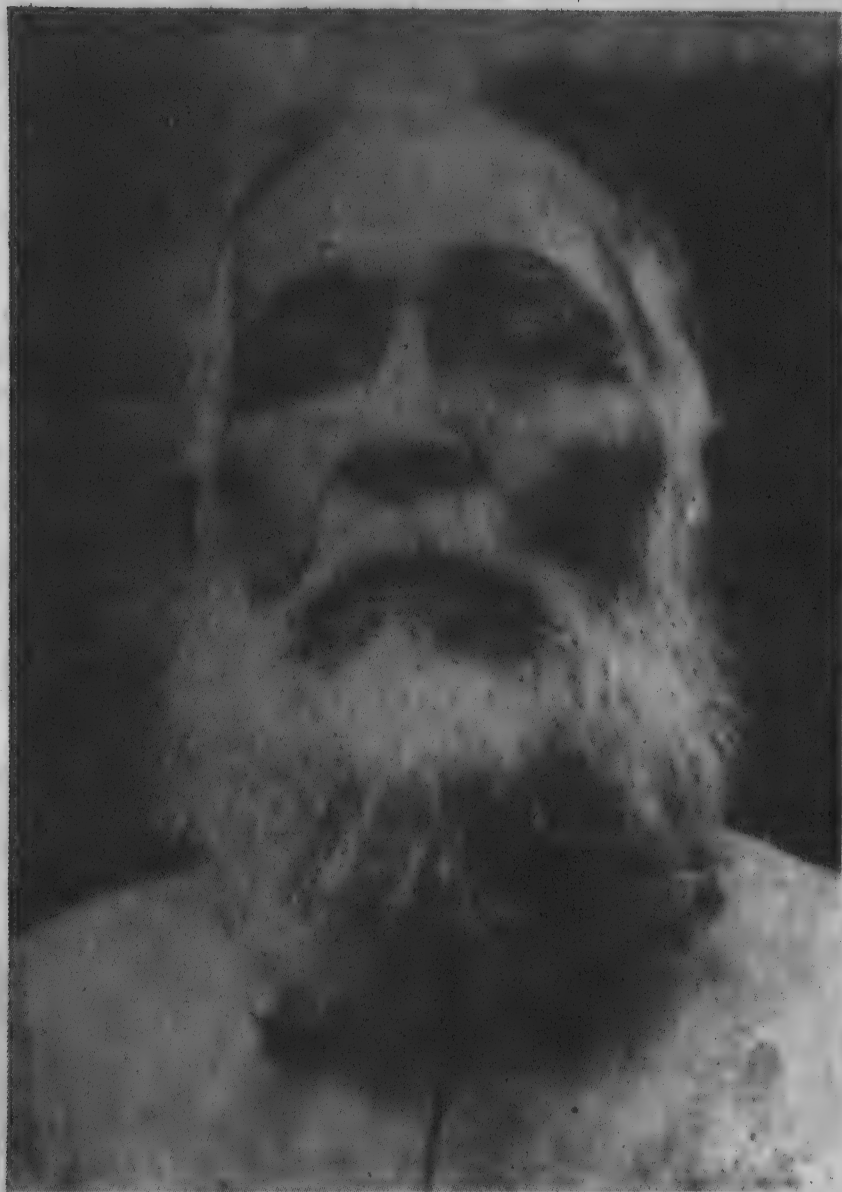
লিখিত।

CALCUTTA:

PRINTED BY S. C. CHAKRABUTTY,

AT THE KALIKA PRESS.

17, Nunda Coomar Choudhury's 2nd Lane,

AND

PUBLISHED BY M. R. ALI.

1893.

প্রেম-হার

আঁখি-জল।

প্রকাশক

শ্রীমৌলবী আবদুল গণি।

মাটিয়া বুরুজ।

কলিকাতা,

২৩ নং স্কট্স্ লেন, ভারতমিহির যন্ত্রে,

সান্যাল এণ্ড কোম্পানি দ্বারা

মুদ্রিত।

১৩০৬

আঁখি-জল

Registered under act XXV of 1867.

কাসেমবধ কাব্য।

বা

শাহাদতে ইমাম কাসেম। (আঃ)

নোয়াখালী জিলা স্কুলের সহকারী শিক্ষক,

আবুল মাআলী মহম্মদ হামিদ আলী প্রণীত।

কলিকাতা—মৌলুকাস্ প্রেস।

১৩১২।

কাসেমবধ কাব্য.

MUSALMANS OF BENGAL:

BY

KHONDKAR FUZLI RUBBEE,

Calcutta:

THACKER, SPINK AND CO.

The Origin of the Musalmans of Bengal

Vernacular Education in Bengal

সুধাকর

হিতকারী

প্রকাশিত।

কলিকাতা

ইসলাম-প্রচারক

মিহির ও সুধাকর

মাসিক পত্র ও সমালোচন।

মৌলবী সৈয়দ এমদাদ আলী সম্পাদিত।

প্রথম বর্ষ।

কলিকাতা,

১৪৩ নং কড়েয়া রোড, নবনূর কার্য্যালয় হইতে
মোহাম্মদ আসার আলী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

—)১৩১০(—

নবনূর